ইউরোপের ইতিহাস

এইচ.এ.এল. ফিশার

ইউরোপের ইতিহাস

(১৮০০—১৯৩৫)

ইউরোপের ইতিহাস

(১৮০০—১৯৩৫)

মূল
এইচ. এ. এল. ফিশার

অনুবাদ
আরশাদ আজিজ

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৪৫১৯
(প্রথমবার ২০০৫-২০০৬ পাঠ্যপুস্তক : মাসাআবা উপবিভাগ : ৬)

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
মানবিকীবিদ্যা, সামাজিকবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
এ. এস. এম. এনায়েত করিম
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
সৈয়দুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

মূল্য
তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Europer Itihas (A History of Europe), Bengali rendering by Arshad Aziz. Published by A S M. Enayet Karim, Director, Text-Book Division, Bangla Academy Dhaka-1000, Bangladesh. First Published June 2006. Price Taka 350.00 only.

ISBN 984-07-4528-X

LAETITIAE SACRUM

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১

ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতাব্দী ৩

সুইডিশ উল্কা ১৩

রাশিয়ার পিটার ১৮

তুর্কি জাতি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ২৮

শাস্তি ও প্রুশিয়া ৩৭

ইউরোপীয় যুদ্ধ, ১৭৪০–৬৩ ৪৬

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ৬৬

ইংল্যান্ড, গোটা বিশ্বের কর্মশালা ৭৩

ইতিহাসের নানাসূত্র ৮০

ফ্রান্সে বিপ্লব ৮৬

যুদ্ধ ও সন্ত্রাস ১০১

নেপোলিয়ন বোনাপার্তের পরাক্রম ১১৩

কমুনে ও সাম্রাজ্য ১২৬
মহাদেশীয় অবরোধ ১৩৯
নেপোলিয়ন এবং জার্মানি ১৪৩
নেপোলিয়নের পতন ১৪৮
মেটারনিক, কাসলরিয় এবং ক্যানিং ১৫৮
১৮৩০ সালের বিপ্লব ১৬৮
শিল্প ও ঋণ ১৭৭
জুলাই রাজতন্ত্র ১৮৫
বিসর্জিমেন্টো ১৯৪
অস্ট্রিয়া এবং জার্মানিতে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ২০০
আইবেরিয়ান সাম্রাজ্যগুলির অবসান ২১২
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ২১৯
ইতালির একত্রীকরণ ২২৫
ঐক্যের পথে জার্মানি ২৩৯
জার্মান সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ ২৫৪
তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ২৬৭
আন্তর্জাতিক ভারসাম্যতত্ত্ব ২৭৬
ভারতে বৃটিশ শাসন ২৮৫
ইউরোপ ও দাসপ্রথা ২৯২
বলকান অঞ্চলে যুদ্ধ ও শান্তি ২৯৮
বিসমার্ক ও জার্মান রাইখ ৩১১
বৃটেনের বিচ্ছিন্নতার অবসান ৩১৮
উদারনৈতিক সংস্কার এবং আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা ৩৩২
সার্বিয়া এবং দ্বৈত রাজতন্ত্র ৩৪২
বৃটিশ এবং আইরিশদের মধ্যে বিরোধ ৩৫০
জার্মানি এবং রুশদেশে বিপজ্জনক গতিবিধি ৩৫৮
যুদ্ধের সূচনা ৩৬৪
মহাযুদ্ধ : প্রথম পর্যায় ৩৭১
মহাযুদ্ধ : শেষ পর্যায় ৩৮৬
শান্তিচুক্তিসমূহ ৩৯৯
তুরস্কের রূপান্তর ৪১৬
নতুন একনায়কতন্ত্র, পুরাতন রাজতন্ত্র ৪২১
উপসংহার ৪৫০
পরিশিষ্ট
ক. কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো ৪৫৪
খ. ১৯১৮ সালের যুদ্ধ বিরতির শর্তাবলি সম্পর্কে ৪৫৫
গ. উইলসনের চৌদ্দ দফা ৪৫৬

মুখবন্ধ

আমি এই পুস্তকটি শুরু করি নব্যপ্রস্তরযুগীয় মানুষদের বিবরণ দিয়ে, শেষ করি স্ট্যালিন ও মুস্তাফা কামাল, মুসোলিনি ও হিটলার বিষয়ে বাগ্‌বিস্তার করে। এই দুই রুক্ষ এবং উচ্চাবচ সীমান্তের মাঝখানে মানুষের গর্ব উদ্রিক্তকারী কিছু ঘটনাও লক্ষ্য করা যায়। আমরা তা স্মরণও করতে পারি অতীব আনন্দের সঙ্গে। যথা—আরিয়ান জনগণের জীবন দানকারী অভিপ্লব, গ্রিক মহামহিম প্রতিভার প্রস্ফুটন, সুদীর্ঘ রোমক শান্তি, খ্রিষ্টান নীতিধর্মের ক্লেদ পরিষ্কারক জোয়ার, বর্বর জাতি গোষ্ঠীর আক্রমণের পর ধ্রুপদী (Classical) জ্ঞানবিজ্ঞানের পুনর্বিজয়, সমুদ্র যাত্রার মাধ্যমে নতুন বিশ্ব আবিষ্কার, অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকহিতব্রত ও বিজ্ঞান। তবে একটি মননব্রতী উত্তেজনা আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি। আমার চেয়ে বিজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিরা ইতিহাসে একটি পরিকল্পনা জাতীয় কিছু খুঁজে পেয়েছেন, খুঁজে পেয়েছেন ছন্দ, পূর্ব-নির্ধারিত প্যাটার্ন। এই সংগতিগুলি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আমি শুধু দেখি, একটা অনিবার্য ঘটনা অনুসরণ করে অপর একটি ঘটনা, যেমন পেছনের ঢেউ সামনের ঢেউকে অনুসরণ করে। বড়ো কোনো ঘটনা যেহেতু অদ্বিতীয়, অতএব ঘটনা সম্পর্কে কোনো সামান্যীকরণ চলে না, কাজেই একজন ইতিহাসকারের জন্য নিরাপদ বিধি হলো, সে শুধু মানুষের নিয়তিসমূহের বিকাশে আকস্মিকতা এবং অদৃষ্টের লীলাখেলা শনাক্ত করবে। এটি সিনিসিজম কিম্বা হতাশাজনক মতবাদ নয়। ইতিহাসের পাতায় প্রগতির ঘটনা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে ; তবে প্রগতি প্রকৃতির বিধি নয়। এক প্রজন্মের উজ্জ্বল উদ্ধার পরবর্তী প্রজন্মে হারিয়ে যেতে পারে। মানুষের চিন্তাধারা এমন একাধিক খাতে প্রবাহিত হতে পারে যার পরিণতি দাঁড়াবে বিপর্যয় এবং বর্বরতা।

আমার সূচনামূলক বিষয়গুলি হলো গ্রিস ও রোম, বর্বরতা এবং খ্রিষ্টান ধর্ম। নতুন বিশ্ব আবিষ্কার এবং উক্ত বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপন, জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয়, পুঁজিবাদী প্রথার পূর্ণ বিকাশ—এসব পরবর্তীকালের ঘটনা তথা সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত হয়। যদিও ইতিমধ্যে দীর্ঘ ছয় হাজার বছর সভ্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে। বাষ্প এবং বিদ্যুৎ তো আরো সাম্প্রতিক কালের ব্যাপার। অসম্ভব নয় যে, এখন থেকে দুই হাজার বছর পর এই দুটি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকে ইতিহাসের 'বিরাট বিভাজন' রেখা হিসেবে গণ্য করা হবে।

পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে লিবার‍্যাল এক্সপেরিমেন্ট বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লিবার‍্যাল বিশেষণটা এখানে দলীয় সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে সিভিল, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্থে। এগুলিকে আমরা এখন বৃটেন ও ডমিনিয়নগুলিতে তথা ফরাসি, ওলন্দাজ, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান এবং আমেরিক্যান জনগণের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই। এতদ্ব্যতীত, আমি যদি এই প্রসারিত অর্থে 'স্বাধীনতাকে' পরীক্ষাধীন বলে অভিহিত করি, তার কারণ এই নয় যে আমি মানুষের মুক্তিকে অবমূল্যায়ন

করার ইচ্ছে পোষণ করি (কারণ এখনই আমি সদ্‌গুণ বা Virtue-কে অবমূল্যায়ন করবো), আমি শুধু ইংগিত দিতে চাই যে উনিশ শতকে স্বাধীনতা দৃঢ়মূল হবার পর ইউরোপের বিরাট একটা অংশে স্বাধীনতার জোয়ারে ভাটার টান শুরু হয়ে যায়। তবু অধীনতার প্রসার কিভাবে অভিনন্দন লাভের যোগ্য হতে পারে, এর কোনো কোনো হিতকর দিক থাকা সত্ত্বেও? একজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির মাদক দ্রব্য সেবনের দরকার করে না। একটা জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড যখন ভেঙ্গে যায় তখনই শুধু দরকারি অমঙ্গল হিসেবে প্যারিসের পলেস্তারা ছাড়া চলে না।

বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জির জন্য পাঠক সম্প্রদায়কে নিম্নোক্ত কয়েকটি পুস্তক দেখার অনুরোধ করি। ক্যামব্রিজ এনসেন্ট, মেডিয়েভাল অ্যান্ড মডার্ন হিস্টোরিজ, জে.বি. বেরি সম্পাদিত গিবনের 'রোমের অবক্ষয় ও পতন' পুস্তকে উল্লেখিত লেখকবৃন্দ, লেভিস-এর হিস্টোরি দ্য ফ্রান্স, স্টাবস-এর কন্সটিটিউশনাল হিস্টোরি অব ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য উন্নত মানের ইতিহাস গ্রন্থ। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে আমি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তবে লক্ষ রেখেছি বইগুলি যেন আধুনিক এবং সহজে যোগাড় করা সম্ভব হয় এবং ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় পড়া যায়।

অত্যন্ত অনুকম্পাবশত পুস্তকের প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছেন আমার স্ত্রী, মি. লিওপোল্ড উইকহ্যাম লেগ এবং মি. ডেভিড ওগ। তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। প্রথম কয়েকটি অধ্যায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ লাভ করেছি অল সৌলস কলেজের মি. ডি. এ. রেইলির কাছ থেকে ; তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। শেষের অধ্যায়গুলি সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন আমার বহুদিনের বন্ধু, স্যার রিচার্ড লজ, আশি বছর বয়সেও তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সুবিচার ক্ষমতা রক্ষা করে চলেছেন ; তার তথ্য-ভাণ্ডারও অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

জানুয়ারি, ১৯৩৬

এইচ. এ. এল. ফিশার

ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতাব্দী

১৭১৪ সালের পর ইংল্যান্ডের মর্যাদা। দার্শনিক জন লক। ডেলাতেস্বার। প্রতেস্ক্। স্কটিস দর্শনের ভাবধারা। ফিজিওক্রাটগণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ সরকার। দ্বিতীয় জর্জের যুগ। ফ্রান্সে বিশৃঙ্খল অবস্থা। সংস্কারকর্মের প্রতি প্রতিবন্ধকতাসমূহ।

১৬৮৮ সালের ইংরেজ বিপ্লবের পর সিংহাসনে আরোহণ করে হ্যানোভারিয়ান রাজবংশ, উক্ত বিপ্লবও একটা নিশ্চিত রূপ লাভ করে। ইউরোপীয় চিন্তা-ভাবনায় ইংরেজ বিপ্লবের প্রভাব ছিলো অপরিসীম। একটা বিপ্লব সুসম্পন্ন হয় বিনা রক্তপাতে এবং জনপ্রিয় সরকারের জন্য আবশ্যিক হিসেবে গণ্য (১৬৪৮ সালের দুর্ভাগ্যজনক উত্থানের পর থেকে) অমঙ্গলসূচক একটি ঘটনাও ঘটেনি। উপরন্তু এই বিপ্লবের ফলে সুস্পষ্ট হিতকর কিছু ঘটনাও ঘটে। সূচিত হয় ধর্মীয় সহিষ্ণুতার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার। এতে প্রায় সবার মধ্যে সাধারণ বিস্ময় এবং ভক্তির ভাব জাগে। বৈপ্লবিক আলোড়ন সত্ত্বেও ইংল্যান্ড হয় পূর্বের চেয়ে ধনবান এবং শক্তিধর। স্থল ও জলভাগে ইংল্যান্ড ছিলো একটি আঁতাতের প্রধান শক্তি, যে আঁতাত চতুর্দশ লুইর অগ্রযাত্রা রুখে দেয়। অভ্যন্তরীণ আলোড়ন ব্যতিরেকে তার পক্ষে সম্ভব হয় যুদ্ধের সূচনা করা কিংবা শান্তি স্থাপন করা। তার পক্ষে রাজবংশের পরিবর্তন করাও সম্ভব হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। অথচ কাজটা মোটেই সহজ নয়। উপরন্তু ইংল্যান্ড তার ঘরোয়া অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী করে ১৭০৭ সালে স্কটল্যান্ডের সঙ্গে সংযুক্তি সম্পন্ন করে।

কোনো কালে কোনো দর্শন যদি ঘটনাস্রোত দ্বারা যথার্থ প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে সেই দর্শন হলো হুইগ দর্শন। ইংরেজ বিপ্লবের নেপথ্যে এই দর্শন বিরাট ভূমিকা পালন করে। কথিত দর্শনের মহান পয়গম্বর ছিলেন জন লক। জ্ঞানদীপ্ত যুগের সমগ্র সারাংশ খুঁজে পাওয়া যাবে এই মানবিক এবং সুশীল অক্সফোর্ড (Oxonian) পণ্ডিতের রচনাদিতে। এই যে তত্ত্ব, ধারণাদি সহজাত নয়, বরং ইন্দ্রিয়লভ্য প্রতিবেদন (Essay on Human Understanding, 1690), এই যে তত্ত্ব, সিভিল গবর্নমেন্ট গঠিত হয় শাসিতদের সম্মতিক্রমে, এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, সম্পত্তির অধিকার জন্মে শ্রমের ভিত্তিতে, এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মতবাদ, তরুণদের জন্য বুদ্ধিবাদী শিক্ষার ব্যবস্থার কথা, এ সবই লকের রচনাদির মধ্যে অনুসন্ধানযোগ্য। লক এবং তার কালের মহান বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন থেকে (কিয়ৎ পরিমাণে হেনরি সেইন্ট জন, লর্ড বলিংব্রোক থেকে) এক শুদ্ধ বুদ্ধিবাদী ভাবধারা জাল পাড়ি জমায়। ফ্রান্স এই ভাবধারা সাগ্রহে গ্রহণ করে, এ বিষয়ে মন্তব্যও করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উক্ত ভাবধারা ফ্রান্সে আরো বিকশিত হবার সুযোগ ঘটে। অবস্থাটা এক সময় এমন দাঁড়ায় যে সে দেশের ঐতিহ্যবাহী সকল প্রতিষ্ঠানকে মনে হয় শিথিল, জরাজীর্ণ, সর্বোপরি সমর্থনের অযোগ্য।

ফ্রান্সে ইংরেজদের নতুন ভাবনা ধারণা ফ্রান্সে জনপ্রিয় করে তোলার প্রধান দায়িত্ব পালন করেন তাঁর ইংরেজ একজন লেখক। তাঁর এতোটা সক্রিয়, মেধাবী, দীর্ঘজীবী এবং প্রভাবশীল ছিলেন যে ইউরোপের পরবর্তী শতাব্দীর ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ভলতেয়ার স্বীয় দেশের স্বেচ্ছাচার ও অন্যায়ের কারণে নিপীড়ন সহ্য করেন। কারণ অভিজাত এক ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য তাঁকে বাস্তিলের ভারী দেয়ালের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করা হয় বিনা বিচারে। ১৭২৬ সালে তিনি ইংল্যান্ড সফর করেন এবং ১৭২৯ সাল পর্যন্ত সেখানে থাকেন। এখানে এসে তিনি মুখোমুখি হন কবি আলেকজান্ডার পোপ-এর সঙ্গে। অ্যাডিসন এবং সুইফটের রচনাদি পাঠ করেন; বেকন, নিউটন, লক এবং শেক্সপিয়রের রচনাবলি পাঠও সাঙ্গ হয়।

১৭৩৩ সালে প্রকাশিত তাঁর Lettres sur les Anglais-এ তিনি স্বীয় দেশবাসীর কাছে এই সুখী ও বিস্ময়কর সমাজের বিবরণ পেশ করেন। এই সমাজের যে কোনো ব্যক্তি মনের কথা খুলে বলতে পারেন প্রকাশ্যে, প্রকাশও করতে পারেন অবাধে, এখানে কাউকে নির্যাতন কিংবা অন্যায়ভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় না, সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে গোষ্ঠীর উন্নতির জন্য কাজ করতে পারে। উপরন্তু কোয়েকার নামক একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী সকল ধরনের যুদ্ধকে খ্রিষ্টান নীতি বিরোধী বলে নিন্দা করার সাহস দেখিয়েছে। তিনি লিখেছেন, "একজন ইংরেজ ইচ্ছামাফিক স্বর্গের পথ বেছে নিতে পারে। অন্যায়ভাবে করের বোঝা আরোপ করা হয় না। কোনো অভিজাত ব্যক্তি কিংবা পুরোহিত নির্দিষ্ট শ্রেণীর কর প্রদান থেকে রেহাই পান না। খেত মজুররা ভালো খাবার খায়, ভালো কাপড় পরিধান করে, এবং পরবর্তী বছর কর বৃদ্ধি পেতে পারে এই ভয়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াতে শংকা বোধ করে না।" এর অনতিকাল পর (১৭২৯-৩১) আরো একজন ফরাসি পণ্ডিত ইংল্যান্ড সফর করেন। তাঁরও আগ্রহ ছিলো এই দ্বীপবাসীদের কাছ থেকে কিছু শেখা। মন্তেস্কুর প্রতিবেদনও কম উৎসাহব্যঞ্জক নয়। ট্রাভেল নোটস নামক পুস্তকে তিনি লিখেছেন, "ইংল্যান্ড হলো জগতের সবচেয়ে স্বাধীন দেশ। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রজাতন্ত্রও ব্যতিক্রম নয়। এই দেশটিকে আমি স্বাধীন বলার কারণ এই দেশের নৃপতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, এই নৃপতি কারো ক্ষতি করতে পারেন না।" Esprit des Lois নামক ইতিহাসের দর্শন বিষয়ক গ্রন্থে (এটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে, এবং ইউরোপীয় চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করে গভীরভাবে।) তিনি লিখেছেন যে (এ ক্ষেত্রে তিনি ভুল করেছেন) ইংরেজদের স্বাধীনতার প্রকৃত কারণ হলো এখানে বিচারিক, নির্বাহী এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পরস্পর থেকে পৃথক।

ফ্রান্সে সৃষ্টিত দার্শনিক আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিলো সমাজের সার্বিক পুনর্গঠন। স্বচ্ছ এবং বাস্তববুদ্ধির পোষক ভলতেয়ারকে অধিবিদ্যাবিষয়ক দূরকল্পনা বিন্দুমাত্র আন্দোলিত করতে পারেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে ভলতেয়ারের যুগের কোনো ভাবুকই এ বিষয়ে মনোযোগ দেন নি। লক এবং তদীয় শিষ্য ফরাসি চিন্তাবিদ কঁদিলাকের অধিবিদ্যা তাদের লক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট ছিলো। ঠাণ্ডা ও নিরাসক্তভাবে মানব বুদ্ধি প্রয়োগে, ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তার প্রতি অনুরাগ এবং ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা, ইত্যাদি ছিলো তাদের লক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কারণ মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনার অবশেষ নিরাকরণ, এবং মানুষের অবস্থার উন্নয়ন ছিলো তাদের প্রধান লক্ষ্য। ফলে ফ্রান্সে ব্যাপক হারে রচিত হয় এক জাতীয় দার্শনিক ও মননধর্মী সাহিত্য, প্রচারধর্মী পুস্তিকা এবং ইতিহাস জাতীয় রচনা, দার্শনিক এবং শিক্ষাবিষয়ক অসংখ্য অভিসন্দর্ভ,

বিয়োগান্তক এবং মিলনান্তক নাটক, যে প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসেবে আমরা পাই চৌত্রিশ খণ্ডের অতিকায় বিশ্বকোষ (১৭৫১-৭২)। এই বিশ্বকোষ শুধু ফ্রান্স নয়, গোটা ইউরোপের সকল প্রকার নির্দয়তার বিরুদ্ধে আঘাত হানে, আরো আঘাত হানে কুসংস্কারের মর্মমূলে, পুরাতনের বিরুদ্ধে, ইউরোপীয় সমাজের অসম ও অন্যায় গঠনও তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। সর্বোপরি তারা আঘাত হানে ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাসে লুক্কায়িত প্রতারণা এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে। এই লেখকদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে এবং জোর দিয়ে ধর্মের বিরোধিতা করেন। এদের মধ্যেকার সবচেয়ে প্রভাবশালী ভলতেয়ার এবং রুসো ছিলেন যাজকতন্ত্র বিরোধী একাত্মবাদী (deist)।

এই প্রতিবাদী সাহিত্য ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রবেশ করে ফরাসি ভাষার মাধ্যমে। (ফরাসি ভাষা এতদিনে লাতিন ভাষাকে কোণঠাসা করে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহারিক ভাষায় [lingua franca] পরিণত হয়েছে)। এই প্রতিবাদী সাহিত্য ইউরোপে সুগভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কারণ ইংল্যান্ড ছাড়া ইউরোপের অন্য কোনো দেশ সংসদীয় জীবনের জন্য তৈরি ছিলো না। ভলতেয়ার-আবহ বার্লিন, ভিয়েনা, সেন্ট পিটার্সবুর্গ এবং মাদ্রিদের স্বেচ্ছাচারী রাজদরবারগুলোতে খুবই অনুভূত হয়। এই যুগকে অভিহিত করা হয়েছে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের যুগ হিসেবে। প্রুসিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথরিন এবং অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফ মনে করেন সমাজের সংশোধন ও উন্নতির জন্য যা কিছু করা দরকার তা একজন স্বৈরশাসক পিতৃসুলভ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জন করতে পারেন।

তাহলে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে ওকালতির জন্য ফরাসি দার্শনিকদের ভাবধারা ব্যাপক প্রচার লাভ করেনি, কিংবা গভীর আবেদনের সৃষ্টি করতে পারেনি। ভলতেয়ার কোনো অর্থেই গণতন্ত্রী ছিলেন না। তার কাছে কিংবা তার মতো অন্যদের কাছে সরকার যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ কোনো ব্যাপার ছিলোনা, তাদের লক্ষ্য ছিলো সম্ভাব্য সকল রকমের স্বাধীনতা, চিন্তা, কথা বলা, লেখা এবং কাজ করার স্বাধীনতা। স্বাধীনতা হলো সার্বিক প্রতিকার, সর্ব প্রকার উন্নতির উৎস। কারণ একবার স্বাধীনতা বরাদ্দ করা হলে অন্য কোনো কিছুর খোঁজ করতে হবে না ; যুক্তিশীলতা জয়ী হবে, অবসান ঘটবে নিষ্পেষণের, অন্তর্হিত হবে প্রতিদ্বন্দ্বী গির্জাগুলোর কুসংস্কার। বিশ্বাস করা হয় যে এই কুসংস্কারই মানব প্রকৃতির উপযোগী এবং স্বাভাবিক একটি ধর্মকে বিকৃত করেছে। এর যে নিদান তা ছিলো গোটা বিশ্বের জন্য বৈধ। সর্বজনীনভাবে না হলেও ফরাসি দার্শনিকরা একটা নীতি ব্যাপকভাবে সমাদর করতেন। তা হলো মানব প্রকৃতি সকল যুগে এবং সকল ভূ-মণ্ডলে অভিন্ন। বর্তমান থেকে অতীত কতোটা ভিন্ন ছিলো সে সম্পর্কে সচেতনতা খুব পরিষ্কার ছিলো না। অথচ হাতের কাছে ছিলো ভলতেয়ার এবং গিবনের সুবৃহৎ ইতিহাসকর্ম। স্যার ওয়াল্টার স্কট কর্তৃক ওয়েভার্লি উপন্যাসসমষ্টি প্রকাশের আগে চলতি সমাজ থেকে অতীতের সমাজ কতোটা ভিন্ন ছিলো তা কল্পনা করা যায়নি। উপরন্তু এই পার্থক্য আঁচ করে পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যরা। যারা পাঠের সুযোগ পায় ওয়েভার্লি উপন্যাসসমষ্টি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের ঝোঁক ছিলো বিমূর্ত, যুক্তিশীল, বিশ্বজনীন। উপরন্তু তারা প্রভাবিত হয়েছেন বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবন দ্বারা। তারা মানুষের সুখের ব্যাপারে পোষণ করেছেন প্রচণ্ড আশাবাদ। তারা বিশ্বাস করেছেন যে কাঙ্ক্ষিত সুখের সূচনা হবে যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি দার্শনিকদের হিংস্র যাজকতন্ত্র বিরোধিতা, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কশ বেলশেভিকদের জঙ্গী নিরীশ্বরবাদের মতো, এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয় যে স্বৈরাচারী এবং সংস্কার বিরোধী পশ্চাদমুখীন ক্রমাধিকারতন্ত্র বুদ্ধিবাদী এবং সামাজিক উন্নতির পথে সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না যে ভলতেয়ার এর প্রতীয়মান ত্রুটিগুলোর প্রতি আঘাত হেনে ফরাসি খ্রিস্টান ধর্মের মান উন্নয়নে সহায়তা করেন। কিংবা দার্শনিক সমালোচনামূলক রচনাদি অগভীর এবং অন্যান্য অভিযোগে অনেক সময় আক্রান্ত হলেও ফরাসি গির্জা সম্প্রদায়ের গুরুতর অধঃপতনের জন্য যথেষ্ট ন্যায়সংগত বলে প্রমাণিত হয়। তবে ফরাসি দার্শনিক যে মহান লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করেন তা নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক ছিলো। এই লক্ষ্যসমূহের অনেকগুলো বর্তমানে ইউরোপের সর্বাধিক জ্ঞানদীপ্ত অংশে এতোটা নিরাপদ যে প্রথম প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র থেকে যে সব পুস্তক বেরোয় এবং তাতে যে সব তত্ত্বাদি থাকে তা আধুনিক পাঠকের কাছে আলোচনার যোগ্য বিবেচিত হয়নি। তবে ফরাসিদের এ জাতীয় রচনাদির একটা গুণ ছিলো যার অনন্য সাধারণ সজীবতা এবং আকর্ষণ এখনো বিদ্যমান, তাছাড়া এর সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে উক্ত রচনাদি আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত ও লোকহিতৈষী পূর্বপুরুষদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। জার্মানদের Aufklarung সাহিত্য দৃঢ় আস্থা এবং প্রত্যাশার সাহিত্য।

দার্শনিকরা যদি চার্চের মতবাদে আস্থা হারিয়ে থাকেন, তবে তারা আস্থা অর্জন করেছিলেন মানুষের মর্যাদা এবং চরম উৎকর্ষে। অষ্টাদশ শতকের ফরাসি রাজনৈতিক সাহিত্যে আশাবাদের ভরা জোয়ার বয়ে যায়। ইউরোপের সবচেয়ে বুদ্ধিবিভাসিত দেশের বিরাট সংখ্যক যুক্তিশীল জনগোষ্ঠী বিশ্বাস করতেন যে গথিক যুগের আবর্জনা ঝেটিয়ে বিদায় করতে পারলে প্রাকৃতিকভাবে সৎ মানুষের অবস্থার অপরিসীম উন্নতি সম্ভব হবে, মানুষের শক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। দিদেরো বলেছেন, "আইন যদি সৎ হয় তাহলে নৈতিকতাও নিষ্কলুষ না হয়ে পারে না।" আইনের সাহায্যে মানব প্রকৃতির উন্নতিসাধন কতোদূর করা যায় সে ব্যাপারে কেউ সীমা বেঁধে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হেলভেটিয়াস বলতেন, "সৎ বিধায়করাই কেবল সৎ নাগরিক তৈরি করতে পারেন।"

এই আশাবাদী সাহিত্যের বিরাট একটি অংশ নিয়োজিত ছিলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সেই নীতিগুলোর প্রতি যে নীতিগুলো ফ্রান্স কোলবার্ট থেকে লাভ করে উত্তরাধিকার সূত্রে। ফিজিওক্রাটগণ প্রকৃতির শক্তির উপর আস্থাশীল ছিলেন। তাদের মতে এই শক্তিকে যদি অবাধে কাজ করতে দেয়া হয় তাহলে মানুষ উন্নতির এমন একটা স্তরে পৌঁছতে পারবে যা কোনো প্রকার স্থানীয় বা জাতীয় বিধিনিষেধের আওতায় অর্জন করা সম্ভব হবে না। এই মতবাদ প্রভূত সাড়া জাগায়। তবে এটি যেমন একদিকে ভ্রমাত্মক, অপরদিকে তেমনি গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তব সত্য। ফরাসি অর্থনীতিবিদগণ মনে করতেন সম্পদের অনন্য উৎস হলো ভূমি, ফলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটাতে হবে কৃষিমূল্যের উপর এককভাবে কর আরোপ করে। এই নীতি ভ্রমাত্মক : কারণ ভূমি হলো সম্পদের নানা উৎসের মধ্যে একটি মাত্র। আর কোনো একক কর তা যতোই ন্যায়সংগত হোক না কেন রাষ্ট্রের বৈধ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে না। তবে ফিজিওক্রাটরা একটা সত্য প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন। তা হলো বাণিজ্য হলো পণ্য ও সেবার বিনিময় বৈ কিছু নয়। এখন যদি কর্তৃপক্ষ সম্পদ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিম্বা এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে স্থানান্তরে কৃত্রিমভাবে প্রতিবন্ধকতার

সৃষ্টি করে তাহলে তা হবে সমৃদ্ধি অর্জনের পক্ষে প্রতীব ক্ষতিকর। তাদের নিজেদের দেশে ফিজিওক্রাটদের মতবাদের কারণে বিপ্লব চলাকালে অভ্যন্তরীণ শুল্ক বিলোপ করা হয়। এর কুফল সম্পর্কে রেখাচিত্রের সাহায্যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তীক্ষ্ণ ইংরেজ পর্যবেক্ষক আর্থার ইয়াং। এই বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-ভাবনা ঘটেনে আসে পঞ্চদশ লুই-র ব্যক্তিগত চিকিৎসক কুয়েসনের (Quesnay) মাধ্যমে। লুকে নেন অ্যাডাম স্মিথ (গ্লাসগোর সুখ্যাত অধ্যাপক)। ফিজিওক্রাটদের ভাবনা-ধারণা ইংল্যান্ডে অধিকতর ফলবতী হয়, এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। ফলে অবাধ বাণিজ্য নীতি রাষ্ট্রীয় অনুমোদন লাভ করে। ফ্রান্সের সমৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ শতকে এবং কঠিনতম পরীক্ষার বছরগুলোতে উক্ত নীতির সুফল ভোগ করা যায়।

আমরা এ পর্যন্ত যে সাহিত্য বিষয়ে আলোকপাত করেছি তার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিলো প্রগাঢ় আশাবাদ এবং যুক্তিশীলতা। তবে একজনের শক্তিশালী বাণী, বলা চলে, সেকালে প্রভাব বিস্তার করেছিলো সবচেয়ে বেশি। উপরন্তু ইনি বহন করেছেন সবার থেকে পৃথক বাণী। জাঁ-জাক রুশো, জেনেভার অধিবাসী, না ছিলেন দার্শনিক, না ছিলেন জড়বাদী, তিনি ছিলেন কল্পনাবিলাসী। যদিও তার বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত স্বচ্ছ, তবে তা গঠিত হয় স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবৃত্তি এবং রোমান্টিক আবেগের প্রভাবে। প্রগতিতে তিনি কিছুমাত্র আস্থাশীল ছিলেন না, কিম্বা বিশ্বাস করতেন না শ্রমের উপবিভাগে, যান্ত্রিক কিম্বা বাস্তবিক কোনো উপায়ে মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন সম্ভব বলেও তার মনে হতো না। তিনি জগৎজোড়া দেখতে পেতেন শুধু নির্দয়তা, দুর্দশা, বঞ্চনা, আর ইউরোপীয় গর্বিত সভ্যতা হলো প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্নীতি এবং স্বৈরতন্ত্রের সংকলন। তিনি এমন একটি সমাজের কথা ভাবেন যেখানে সৎ লোকদের বাস করা সম্ভব হবে। Contrat Social (সামাজিক চুক্তি, ১৭৬২) এর মূল লক্ষ্যই তাই। ইউরোপ উক্ত পুস্তকে খুঁজে পায় নতুন সুসমাচার (Gospel)।

মানুষের দুর্ভোগের রুশো যে নিদান দিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। নৈতিকতার প্রয়োগ সর্বোচ্চ জরুরি। ভালো রাষ্ট্র তাকে বলবো যে রাষ্ট্রের প্রতিটি সদস্য (পৌর জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট শিক্ষিত) সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। কেবল সদগুণসম্পন্ন নাগরিকদের দ্বারা গঠিত একটি সমাজ, যেখানে সবাই সবার মঙ্গলের জন্য চিন্তা ও কাজ করে এবং বিশেষ স্বার্থ নয়, অভিন্ন সুবিধার জন্য সম্মতি প্রদান করে তাহলে সেই সমাজকেই শুধু সৎ সমাজ বলা চলে। এটিই হলো রুশোর রাজনৈতিক মতবাদের নির্যাস। সৎ রাষ্ট্রের ভিত্তি শক্তি কিংবা গুপ্তচর নয়, বরং সকল সদস্যের সদিচ্ছা।

এই বইটি জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে। এটি সংক্ষিপ্ত, বাগ্ময়, কার্যকর। সূচনা বাক্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করে সভ্যতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, "মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন হলেও সে সর্বত্রই শৃঙ্খলিত।" গণঅভিপ্সা বা সাধারণ ইচ্ছার ভিত্তিতে গঠিত সমাজের চেয়ে কাম্য বস্তু দরিদ্র নিপীড়িত জনগণের কাছে আর কি হতে পারে? এই একটি বাক্য দ্বারা এক নদী বৈপ্লবিক অনুভূতি অর্গলমুক্ত করা হয়। তবু এটা প্রায়ই ভুলে থাকা হয় যে রুশোর কাছে গণঅভিপ্সার সার্বভৌমত্ব নৈতিকতার শাসন ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

মাদাম দ্য স্টেএল রুশো সম্পর্কে বলেছেন যে, "তিনি সব কিছু উজ্জীবিত করেন, তবে নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারেন না।" 'সব কিছু উজ্জীবিত করেন', কথাটা শুধু সত্য নয়, গুরুত্বপূর্ণ সত্য। কারণ তিনি ফ্রান্সকে অভাবনীয় মাত্রায় তার অনুভূতি ও ধর্মের আনুগত্য

দ্বারা উদ্ভাসিত করেন। কিন্তু একথাটিও কি সমান সত্য যে তিনি কিছুই উদ্ভাবন করতে পারেন নি। অষ্টাদশ শতকের অভিজাততন্ত্রী সমাজে তিনি নৈতিকতার পক্ষে ঘোষণা দেন এবং বিশ্বাস করেন যে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো ঘাটতি নেই।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজদের শাসনতন্ত্র ছিলো ইউরোপীয় মহাদেশের যে কোনো দেশের চেয়ে অগ্রগামী। তবু এটি নিখুঁত ও আদর্শ শাসনতন্ত্র ছিলো না। অন্তত ফরাসি দার্শনিকরা নিশ্চিত উৎসাহের সঙ্গে যা ভাবতেন তা ছিলো না। এই শাসনতন্ত্রের ত্রুটি ছিলো একাধিক। এর ধর্মীয় সহিষ্ণুতা নীতি, এর সংসদীয় সরকার কাঠামো ছিলো ত্রুটিপূর্ণ। এখনো এই তত্ত্ব প্রাধান্যশীল যে রাষ্ট্র অ্যাংলিক্যানদের বিশেষ সম্পত্তি, প্রটেস্ট্যান্টদের প্রকাশ্য ধর্মাচরণ অনুমোদন করা হয়, তবে ভিন্নমতাবলম্বীদের সরকারি ক্ষমতার অংশীদার করা হয় না, কিম্বা তাদের কোনো দায়িত্বের অংশীদার করা হয় না। উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়। প্রভুত্ব অর্জনের জন্য অ্যাংলিক্যান ভূ-স্বামী এবং যাজকরা এতোটা জেদি যে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টের দ্বার প্রটেস্ট্যান্ট ভিন্নমতাবলম্বীদের জন্য উন্মুক্ত ছিলো না, ১৮৭১ সাল পর্যন্ত অক্সফোর্ড কিংবা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশেরও তাদের কোনো অধিকার ছিলো না। রানী অ্যানির রাজত্বকালে টোরি সদস্যরা আরো অনেক অগ্রসর হওয়ার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। অকেশনাল কনফরমিটি অ্যাক্ট দ্বারা তারা ভিন্ন মতাবলম্বীদের জন্য টাউন কর্পোরেশনের দ্বার রুদ্ধ করতেন, আর সিজাম (ধর্মবিচ্ছেদ) অ্যাক্ট দ্বারা তাদের বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দিতেন, সম্পূর্ণ ধ্বংস করতেন তাদের শিক্ষার সুযোগ। হ্যানোভারিয়ানদের ক্ষমতারোহণের অন্যতম আশীর্বাদ এই যে, হুইগরা এই বিপর্যয়জনক কর্মপন্থা বর্জন করতে সমর্থ হন, সিজাম অ্যাক্ট করেন বাতিল এবং বার্ষিক ইনডেমনিটি অ্যাক্ট পাস করে ভিন্নমতাবলম্বীদের আইনগত জরিমানা থেকে অব্যাহতি দেন। অনাথায় তাদের এই জরিমানা প্রদান করতে হতো পুরসভায় আসন গ্রহণ করে।

এতোটা সীমাবদ্ধ হবার পরও, রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সুযোগ গ্রহণ করতে দেয়া হতো না। ইংল্যান্ডে রোমান ক্যাথলিকদের ১৭৭৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশ্যে উপাসনার অধিকার ছিলো না। অপর দিকে আয়ারল্যান্ডে, যেখানে তাদের রাজনৈতিক অঘটন সংগঠনের সুযোগ ছিলো, সেখানে তাদের বিশেষ ও নির্দয় অযোগ্যতার শিকারে পরিণত করা হয়।

প্রথম দুই হ্যানোভারিয়ান রাজত্বকালে ইংল্যান্ডের সরকার ছিলো অভিজাততন্ত্রী। বিরাট হুইগ পরিবারগুলো নিয়ন্ত্রণ করেছে হাউস অব লর্ডস, পকেট বরোগুলোর উপর প্রভাবের কারণে কমন্স সভায় লাভ করেছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। টোরি সদস্যরা সংখ্যায় অধিক হলেও সম্ভবত তারা খুব বিত্তের অধিকারী ছিলো। এরা জাকবপন্থিদের সঙ্গে আপোষ করে চলতেন বলে পঞ্চাশ বছরের অধিকাংশ দুর্ভাগ্যের শিকার হন। কিন্তু দেশের প্রকৃত সরকারে, যা স্থানীয় এবং সংসদীয় নয়, কোয়ার্টার সেসন এবং পেটি সেসনে (Justices of the Peace-এর) টোরি ভূ-স্বামীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরো মাত্রায় ভোগের অধিকার অনুমোদন করা হতো। শিকার আইন প্রয়োগে, অবৈধ নিয়ন্ত্রণের বিচারে, এবং তদনুরোধের জন্য শান্তিবিধানে এই সব অবৈতনিক এবং অপেক্ষাকৃত টোরিরা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং

গুরুত্ব প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সুযোগ পেতেন। এভাবে তাদের নিরুদ্বেগ ও সন্তুষ্ট রাখা হতো। এদিকে হুইগ প্রভুরা সেন্ট স্টিফেনের চাকা নিয়ন্ত্রণ করতেন। ইচ্ছেমাফিক।

তৃতীয় উইলিয়াম ও রানী অ্যানির সময়ে একটা নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে। কাকতালীয় ঘটনার মাধ্যমে প্রথম দুই হ্যানোভারিয়ান রাজার অধীনে সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা মন্ত্রিসভা লাভ করে। এই মন্ত্রিসভার সদস্যদের কেবল একটি দল থেকে গ্রহণ করা হয় এবং তারা কেবল পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকবে। প্রথম জর্জ ইংরেজিতে কথা বলতে পারতেন না, মন্ত্রীদের সঙ্গে ফরাসি ভাষায় কাজকারবার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়লে তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগদানে বিরত থাকতেন। স্যার রবার্ট ওয়ালপোলের দীর্ঘ ও বিজ্ঞ প্রশাসন হুইগ দলকে মজবুত করে, মন্ত্রিসভার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় এবং সুনিশ্চিত রূপ দান করে, তদুপরি প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ দেয়। উক্ত গুরুত্ববহ প্রশাসনের পর প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এখন থেকে সরকার পরিচালনা করবে একটি মন্ত্রিসভা, এই মন্ত্রিসভা দায়ী থাকবে পার্লামেন্টের কাছে। আর পার্লামেন্টকে জবাবদিহি করতে হবে বৃহত্তর নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে।

মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকার প্রতিষ্ঠায় যে সাফল্য লাভ করা যায় তা অপর একটি ঐতিহাসিক কাকতালীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তৃতীয় উইলিয়াম এবং অ্যানি, উভয়ে পছন্দ করতেন মিশ্র নির্দলীয় মন্ত্রিসভা। নৃপতি প্রত্যেক দল থেকে তার কাউন্সিলে উপদেষ্টা নিয়োগ করলে তার নিরপেক্ষতা বিজ্ঞাপিত হয়। রাজতন্ত্রের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। তবে এ ধরনের কোয়ালিশন সরকার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুধু উক্ত রাজা ও রানীর রাজত্বকালে সাময়িক সাফল্যের মুখ দেখে। প্রথম জর্জ ক্ষমতারোহণের সঙ্গে সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রথম জর্জ হুইগ বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে টোরি সদস্যরা জ্যাকবপন্থিদের স্বার্থে ষড়যন্ত্র করছে তাকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করার জন্য। সেই সময় থেকে হুইগ মন্ত্রিসভা এবং পার্লামেন্টে হুইগদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়মে পরিণত হয়। এটি একটি দুর্ঘটনা এবং মজাদার দুর্ঘটনা। তৃতীয় জর্জের দীর্ঘ দশ বছর ব্যক্তি শাসনের কালে যখন মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকার নিষ্প্রাণ ছায়ায় পরিণত হয় তখন ইংল্যান্ড তার ইতিহাসের বৃহত্তম বিপর্যয় বরণ করে; আমেরিকান উপনিবেশগুলো হারাতে হয়।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণ করেছে বিত্তবান এলাকাভিত্তিক (territorial) শ্রেণী, ফলে হ্যানোভারিয়ান রাজত্বকাল সামাজিক দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করতে পারেনি। পরবর্তী শতাব্দীতে রমিলি এবং তার বন্ধুদের দ্বারা সংশোধনের আগে বৃটিশ দণ্ডনীতির কোনো হেরফের করা হয়নি। এটা একটা মানবিক এবং অমায়িক জাতির জন্য কলঙ্কের ব্যাপার ছিলো। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার জন্য সরকার কিছুই করেনি। পৌর সরকার ছিলো দুর্নীতিপরায়ণ, মধ্যযুগীয় এবং কুখ্যাত, ১৮৩৫ সালে পৌর নিগম আইন প্রণীত হওয়ার আগ পর্যন্ত। এই গৌরবময় বিপ্লব প্রধানত সংঘটিত হয় প্রাচীন প্রথা ও সনদগুলোর মর্যাদারক্ষার জন্য, একই সঙ্গে পার্লামেন্টের বিশেষাধিকার সংরক্ষণের জন্য, উপরন্তু রাজা দ্বিতীয় জেমসের উদ্ভাবনী এবং স্বেচ্ছাচারী কার্যক্রম প্রতিরোধের জন্য, তা ব্যতিরেকে রক্ষণশীলতার অনুকূলে ছিলো। হুইগরা 'গৌরবময় বন্দোবস্তে' অতিরিক্ত উল্লসিত হয়ে মনে করে যে সব কিছুই সুচারুরূপে হয়ে গেছে। এটি ছিলো নিছক ভুল। বিপ্লবের পার্লামেন্ট জেতার মতোও ছিলো না। আর পার্লামেন্টারি আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায়ের মূলমন্ত্র হিসেবে হুইগদের ধারণা হয় যে কনটিনেন্টালদের চরিত্র

জমিদার এবং ফ্রিহোল্ডার (নিরঙ্কুশ মালিক) এবং শহরগুলোর ক্ষুদ্র ধনবান শ্রেণী কর্তৃক নির্বাচিত বিধানসভা জাতীয় স্বার্থ ও অভিমতের যথার্থ এবং যথেষ্ট প্রতিফলন নয়। এমনকি ইহা লেখকদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে কল্পনাশক্তির অধিকারী সেই এডমান্ড বার্কও পার্লামেন্টারি সংস্কারের প্রয়োজনীতা দেখতে পান নি। তিনি পালামেন্টে রাজশক্তির ক্ষমতা হ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পালামেন্টারি প্রতিনিধিত্বের সম্প্রসারণের বিরোধিতা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দী সন্তুষ্ট বোধ করতো যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গরিষ্ঠ অংশ এবং দরিদ্ররা পার্লামেন্টারি গঠন তন্ত্রের পবিত্র সংঘের বাইরে থাকবে।

ইংরেজ ভক্ত ফরাসিরা পালামেন্টারি দুর্নীতির ব্যাপারটাও লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হন। বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ওয়েস্টমিনস্টার এবং নির্বাচনী এলাকাগুলোতে অবাধে দুর্নীতি চলে। ভোটদাতা এবং সদস্যদের মধ্যে ঘুষের আদান-প্রদান চলে প্রায় প্রকাশ্যে। এখন হয়তো ভাববার মতো যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় যে, এই অমঙ্গলের দিকটা তৎকালীন সমালোচকরা বড়ো করে দেখেন। দুর্নীতি যে ছিলো, এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যাশা করা হতো যে এমনকি নগণ্যসংখ্যক পদ ও ভাতা তাদের জন্য সহজলভ্য যারা সরাসরি ভোট প্রদান করে। এই প্রত্যাশা এতোদূর বিস্তার লাভ করে যে এর ফলে যারা লাভবান হয় তাদেরকেও ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য এই ত্রুটিগুলো সত্ত্বেও দেশ উন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে যায়। মানুষ সুখের মুখ দেখে। নিষ্ক্রিয় অ্যাংলিক্যান চার্চ, নিষ্ক্রিয় ও অশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, সম্ভাবনাময় শৃগালশিকারী ভূ-স্বামী, এবং টপ বুট পরিহিত, অতিরিক্ত সুরাসেবী ওয়েস্টমিনস্টারের বিধায়কগণ তদানীন্তন জরাজীর্ণ কৃষি সমাজের ধীর গতির সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে ব্যর্থ হন নি। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে গভীর বা দুস্তর কোনো ব্যবধান ছিলো না ; কোনো দুরূহ অর্থনৈতিক জিজ্ঞাসা পার্লামেন্টের স্বাভাবিক কাজকর্মে বিরাট বাধার সৃষ্টি করেনি। শিল্প বিপ্লবের দরুন তখনো উত্তর আয়ারল্যান্ডে বাস্তুত্যাগী কারখানা শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর বাড়ি-ঘর গড়ে ওঠা শুরু হয়নি। এ ধরনের জনসংখ্যার আধিক্যও দেখা দেয়নি। নগরগুলো তখনো আকারে বৃদ্ধি পায়নি। গ্রামীণ-খেলাধুলা এবং নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ তখনো বিদ্যমান। সারা দেশে স্বাচ্ছন্দ ও স্থায়িত্বের ভাব লক্ষ্য করা যায়, যার নিদর্শন জর্জিয়ান যুগের লাল ইটের তৈরি মজবুত বাড়ি-ঘর। '৪৫ সালে হাইল্যান্ডের ভয়ানক আক্রমণ ব্যতিরেকে (এই আক্রমণ সফল হলে সব কিছু তছনছ হয়ে যেত), এক অর্থে দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালে দারিদ্র সীমার উপরে যারা বাস করেছে তাদের কাছে দেশটিকে সুনিশ্চিত এবং অভ্যন্তরীণ শান্তিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এই সমাজ ছিলো অশান্তি সৃষ্টিকারী এবং নির্যাতনমূলক সন্দেহমুক্ত সমাজ। কোনো সামাজিক সমস্যা দ্বারা এই সমাজ পীড়িত হয়নি, পার্লামেন্টের বিশাল কর্মসূচি হাতে নেয়ার দরকার করেনি, স্থানীয় প্রয়োজনে ছোট-খাটো বিধান প্রণয়ন করলেই এই সমাজ সন্তুষ্ট বোধ করেছে। এই যুক্তিশীল সমাজে এখনো রোমান্স প্রবেশ করেনি, জীবনের কাছে অতিরিক্ত কোনো দাবি ছিলো না, এই সমাজের ছিলো স্থায়িত্ব এবং সামঞ্জস্য, কুসংস্কার কিংবা অতিরিক্ত আবেগের কোনো স্থান ছিলো না, এই সমাজের ছিলো গভীর আত্মবিশ্বাস, অপরদিকে অন্ধত্বের বোকামি থেকে মুক্ত। এন্টোনাইনেসের পর ইউরোপে এ ধরনের সমাজ আর দেখা যায় নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি রাজনৈতিক সাহিত্য সুখানুভূতির এই আবহ সততার সঙ্গে বহন করে। এই সাহিত্য ছিলো দৃঢ়তাপূর্ণ এবং জঙ্গী মনোভাবের, তবে সমাজের স্থূল

বুনিয়াদের সঙ্গে কোনো বিবাদ ছিলো না। কি সুইফট, কি ডিফো, এডিসন কিম্বা স্টিল, বোলিংব্রুক কিম্বা হ্যানবেরি উইলিয়ামস দেশবাসীদের বিশ্বাস করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন নি যে তারা যে রাজত্বের অধীনে বসবাস করছেন তা দুঃসহ, অমর্যাদা এবং অন্যায়ে পরিপূর্ণ। ইংল্যান্ডের বিবাদ ছিলো পার্লামেন্টারি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদ, কোনো পক্ষের প্রবেশ, কোনো পক্ষের প্রস্থানের ঘটনা। উইলকিসের মতো চরমপন্থীও, যিনি দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালের প্রথম দশকে নতুন কর্মক্ষেত্রের উদ্বোধন করেন, তিনিও ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেননি, যে নীতিমালার ভিত্তিতে উক্ত বিপ্লব সংঘটিত হয় তার মূল্য সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। ফ্রান্সের ব্যাপারটা ছিলো একেবারে বিপরীত, সেখানে একটি অসহিষ্ণু গির্জার অত্যাচার রাষ্ট্রের অস্থিরচিত্ততা এবং স্বৈরশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়, ফলে ফরাসি সাহিত্য প্রচণ্ড বিদ্রুপ এবং অবজ্ঞা প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত হয়।

চতুর্দশ লুইর রাজত্বকালের শেষের দিকের যে সমস্যাগুলো ফরাসি ভাবুকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাদের মধ্যে প্রধান হলো আর্থিক সমস্যা। কোনো ফরাসি সরকার গোটা ফরাসি জনগোষ্ঠীর উপর সমরূপ এবং সমতাভিত্তিক কর কাঠামো আরোপের সাহস করেন নি। প্রতিটি সরকার নানা শ্রেণীকে তুষ্ট করতে গিয়ে নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের কর প্রদান থেকে রেহাই দিয়েছে। অভিজাতবর্গ, যাজক শ্রেণী, বুর্জোয়াদের একটি বিরাট অংশ taille বা সম্পত্তি কর দেয়া থেকে অব্যাহতি পেতেন। অনুরূপ অব্যাহতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশও ভোগ করেছে। অন্তত ফরাসি রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত নতুন প্রদেশগুলো। কর আরোপের ক্ষেত্রে বিশেষাধিকারের নীতি এতো দূর প্রসারিত হয়, প্রাদেশিক গর্ব ও স্বাধিকারের ঐতিহ্য এবং শ্রেণী সংস্কারের সঙ্গে এতোটা গভীরভাবে যুক্ত হয় যে, এই অন্যায় প্রথা উৎপাটন দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কেবল একটি শক্তিশালী সরকার জনগণের দৃঢ় সমর্থনের সাহায্যে কায়েমি স্বার্থবাদী শ্রেণীকে পরাভূত করতে পারতেন। আর এই কায়েমি স্বার্থবাদী শ্রেণীই প্রচলিত কর প্রথা বিলোপের বিরোধী ছিলো। ফ্রান্সের পুরাতন রাজতন্ত্র অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী ছিলো। তবে অন্যায় কর প্রথা বিলোপের যোগ্য ছিলো না।

এ সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য মাত্র দুটি পথ খোলা ছিলো। একটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, অপরটি হলো স্বেচ্ছাচারী কর্মপন্থা। প্রথমটি প্রয়োগ সম্ভব ছিলো না। নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে দায়িত্বশীল আইন পরিষদের ধারণা ফরাসি ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খায় না। কোনো রাজনীতিজ্ঞ এ ধরনের প্রস্তাব করেন নি। কোনো রাজা এ ধরনের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করতেন না। তাছাড়া কোনো সরকার এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গেলে হিংসাত্মক আলোড়ন ঠেকাতে পারতেন না। চতুর্দশ লুই-র দীর্ঘ রাজত্বকালের নিয়তি হলো, শাসনতান্ত্রিক সমস্যা বিষয়ে ফলপ্রসূ চিন্তা স্থগিত রাখা হয়, ফলে উক্ত চরম আত্মাভিমানী রাজত্বের শেষ বিষণ্ণ দিনগুলোতে ফেনেলন এবং অন্যেরা স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের মূল বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন তাদের মন চলে যায় ফ্রান্সের আরো পুরাতন অভিজাততন্ত্রের সময়ে। তারা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন যে অধিক সংখ্যক অভিজাতবর্গ সরকারের কাজকর্ম পরিচালনায় নিয়োজিত, এবং মধ্যযুগীয় স্টেটস-জেনারেল পুনরুজ্জীবনের কথা চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। ১৬১৪ সালের পর স্টেটস-জেনারেলের সভা একবারও আহবান করা হয়নি। এই ভারবাহী এবং আজগুবি সংস্থার স্মৃতি, যে সংস্থার কোনো সংগঠন নেই, নির্বাহী কর্তৃত্ববিহীন,

সামাজিক সংহতিহীনতা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে অভিজ্ঞতারহিত, শুধু সফল হয়েছে, রক্ষণশীলতান্ত্রিক সংস্কারের পথ আটকে দিতে। ১৮৭৯ সালে এই স্টেটস-জেনারেলের সভা ফ্রান্সে সরকারের সূচনা নয়, মহাসংকেত ছিলো সার্বিক নৈরাজ্যের।

স্বৈরাচারতন্ত্র অন্তত পরবর্তীকালীন ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলো, তবে একে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া হয়নি। অর্লিয়-র ফিলিপ প্যারিস পার্লামেন্টকে পুরোনো কর্তৃত্বে পুনর্বাসিত করেন, বারোটি প্রাদেশিক পার্লামেন্ট এই পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন যোগায়। কিন্তু প্যারিস পার্লামেন্ট রাজস্ব সংস্কারের পথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। পার্লামেন্টের আইনবিশারদগণ নতুন কর ও নতুন ধারণা সহজে গ্রহণ করতে পারতেন না, দারুণ আতংকবোধ করতেন। তারা দার্শনিক গ্রন্থাবলি পুড়িয়ে ফেলে, জনগণের কাছে ন্যায়সংগত উপায়ে অর্থ আদায়ের পথ ভোটের মাধ্যমে রুদ্ধ করে দেয়। তবে যদিও তারা চিন্তার ক্ষেত্রে পশ্চাদমুখীন এবং আর্থিক ক্ষেত্রের বিশেষাধিকার ভোগের পক্ষপাতী ছিলেন, তবুও তারা লম্পট ও কুখ্যাত রাজদরবারের একমাত্র বিরুদ্ধ পক্ষ হিসেবে অপরিসীম জনপ্রিয়তা ভোগ করেন। রাজদরবার ১৭৭১ সালে চ্যান্সেলর মওপিওকে বলেন এদের দমন করার জন্য। মওপিও সত্যিই সফল হন। তবে রাজশক্তি কর্তৃক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়ার আগেই এই শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৭৭৪ সালে নতুন রাজা পার্লামেন্টগুলো পুনর্বাসিত করেন। কারণ তার লক্ষ্য ছিলো প্রজাকুলের অনুরাগ ফিরে পাওয়া। জনগণের অনুভূতির সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য ষোড়শ লুই সংগত কারণে ইচ্ছুক হন। তবে তার এই শুভেচ্ছা বিপর্যয়কর পরিণতির দিকে এগোয়। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে আইনবিশারদদের বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় শ্রেণী ফরাসি রাষ্ট্রের ব্যাপক ও যুক্তিশীল সংস্কার সকল শক্তি প্রয়োগ করে ঠেকানোর চেষ্টা করবেই।

সুইডিস উল্কা

ক্রিস্টিনার যুগ। দশম চার্লসের রাজ্যজয়। পোল্যান্ড ও ডেনমার্ক সংরক্ষা। উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধ, ১৭০০–২১। প্যাটকুল ও সুইডেনবিরোধী জোট। দ্বাদশ চার্লস ও বাল্টিয়ার পিটার। পলটাভা। সুইডেনের পতন।

গুস্তাভাস এবং তার সেনাপতির বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিজয় সুইডেনকে সামরিক খ্যাতির শীর্ষে পৌছে দেয়। তারপর সুইডেনের ইতিহাসে যে যুগের সূচনা হয় তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। তবে পূর্বেকার যুদ্ধাভিযান, পাল্টা যুদ্ধাভিযান, খণ্ডযুদ্ধ, অবরোধ ইত্যাদির চেয়ে কম মনোযোগের দাবিদার বলা চলে না। ক্রিস্টিনা তার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মতোই ছিলেন প্রতিভার বরকন্যা। দীর্ঘ দশ বছর (১৬৪৪–৫৪) এই বিস্ময়কর এবং খেয়ালি তরুণী ইউরোপের চোখে মণি-মুক্তার মতো জ্বলজ্বল করেছেন। দুই উদার হাতে দান স্বরূপ বণ্টন করেছেন নানা মূল্যবান উপহার, প্রদর্শন করেছেন কঠোর পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা (যা তার পিতার কঠোরতম পরিশ্রমী সেনাপতির মধ্যেও সম্ভ্রমের উদ্রেক করতে পারতো)। উপরন্তু তার মেধাবী এবং অজেয় কৌতূহল দ্বারা আকর্ষণ করতেন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের, এরা স্টকহমে ভিড় করতেন তার সহানুভূতি, আনুকূল্য এবং বদ্যান্যতায় মুগ্ধ হয়ে। অতঃপর, আকস্মিকভাবে, রোমান চার্চের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশত (তাকে ইতিমধ্যে রোমক চার্চ সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো), কিংবা আকস্মিকভাবেই, অবসন্নতা থেকে অথবা দিনানুদৈনিক একঘেয়ে কাজকর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মানোর ফলে, অথবা বিস্ময়কর একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির খেয়ালি অভিলাষবশত, এই উত্তর ইউরোপের 'পলাস' (গ্রিকদেবী এথিনি বা তার সগোত্র) স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন স্বীয় জ্ঞাতিভ্রাত্রার অনুকূলে। দশম চার্লস ছিলেন বিপজ্জনক এক বস্তু। তিনি ছিলেন সাধারণ সৈনিক বা শুধু সৈনিক। যুদ্ধাভিযান ছিলো তার একমাত্র আসক্তি। এর কারণেই উত্তরাঞ্চলে দুটি যুদ্ধের প্রথমটি বাঁধে, যার ফলে সুইডেন বলতে গেলে ভূপাতিত হয়। ব্রান্ডেনবুর্গ পরিণত হয় উত্তর জার্মানির অগ্রগণ্য সামরিক শক্তিতে, আর অতিকায় রুশ ভল্লুকের জন্য পশ্চিম ইউরোপের দ্বার খুলে যায়। এই যুদ্ধবাজ, শত্রু-অনুসন্ধানী ব্যক্তিটির কাছে পোল্যান্ড ও ডেনমার্ক যেন নিজেদের আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে হাজির করে। পোল্যান্ড পোপতন্ত্রী রাষ্ট্র, শাসিত হয় সুইডিশ ভাসা রাজবংশের জ্যেষ্ঠ পোপীয় শাখা কর্তৃক। এই রাজবংশ সুইডিশ সিংহাসনের উপর দাবি এখনো পরিত্যাগ করেনি। ডেনমার্ক পুরাতন ঐতিহ্যসিক শত্রু। এই রাজ্য এক সময় গোটা স্ক্যান্ডেনেভিয়া শাসন করেছে। এখনো নরওয়ে, এবং সুইডেনের দক্ষিণ অঞ্চলের তিনটি প্রদেশ তার অধিকারভুক্ত। তাছাড়া সাউন্ড-এর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে অবস্থানগত কারণে সমগ্র বাল্টিক অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। চার্লস প্রথমে আক্রমণ করেন পোল্যান্ড, অতঃপর ডেনমার্ক। তার কাছে পরাস্ত হয় পোল্যান্ড, পরাস্ত হয় ডেনমার্ক। সুইডিশ বাহিনীর

[illegible] যখন সম্পদ ও নিরস্ত্রকরণ বলে মনে হয় তখন দেখা যায় কি পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে, কি ডেনমার্কের ক্ষেত্রে একটা বিষয় অভিন্ন। এখানে একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার লক্ষ্য করতে হয়। যখন ব্রুন্সব্রো এবং কোপেনহেগেন (১৬৬৮) শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়, আর চার্লস যাত্রা শুরু করেন মস্কোর পথে, তখন তিনি কারো জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেননি, কিংবা অক্ষম, পোলান্ড এবং ডেনমার্ককেও তিনি সুইডেনের আশ্রিত রাজ্য হিসেবে রেখে যাননি। উপরন্তু পোলান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুইডেন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও লাভের ফসল সে ঘরে তুলতে পারেনি, এতে প্রকৃত লাভবান হয় ব্রান্ডেনবুর্গের ইলেক্টর। তিনি কিছুমাত্র ঝুঁকি না নিয়ে, বিনা প্রচেষ্টায় প্রুসিয়া নামক ভাচি অর্জন করেন পূর্ণ সার্বভৌমত্বসহ। তিনি দাবি করেন যে পোলদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতির জন্য এটি তার প্রাপ্য।

চার্লস যদি পোলিশ ভূমিদাসদের মুক্ত করতেন, তাহলে লুথারান বাহিনীর অপবিত্র কার্যকলাপের জন্য ধর্মানুরাগী ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মনে যে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে তা দূর হতো। কিন্তু তার ছিলো বুদ্ধির ঘাটতি, অন্তত নেপোলিয়নের মতো ধুরন্ধর তিনি ছিলেন না। তাছাড়া পোলদের দেবার মতো তার কিছু ছিলো না, আঘাত, অবমাননা এবং প্রটেস্টান্ট মতবাদ ছাড়া। ফলে পোলদের মধ্যে জাতীয় উত্থান ঘটে, তারা অস্ট্রিয়ার সহায়তায় চার্লসকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। এখানে অস্ট্রিয়ার ভূমিকা লক্ষ্য করবার মতো ক্যাথলিক পোলান্ড লুথারান সুইডেনের পায়ের নিচে পিষ্ট হবে এটা মহান ক্যাথলিক রাজশক্তির পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি।

পোল্যান্ডের রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে টিকে থাকা যেমন অস্ট্রিয়ার স্বার্থের অনুকূলে ছিলো তেমনি সুইডেনের কব্জা থেকে ডেনমার্ককে মুক্ত করা ছিলো হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের জন্য জরুরি। একটি ওলন্দাজ নৌবহর কোপেনহেগেন সংরক্ষার ব্যবস্থা করে। ওলন্দাজ ও দিনেমার, পোল ও অস্ট্রীয় যৌথ বাহিনী সুইডিশদের পরাস্ত করে ফুনেনে। যখন মনে হয় যে দিনেমার রাজ্য সুইডিশ সমরবাদের জোয়ারে ভেসে যাবে তখন নৌশক্তিগুলো জোটবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসে সুইডিশ প্লাবন মোকাবেলা করার জন্য। বাল্টিক অঞ্চলের বাণিজ্য আন্তর্জাতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, বহু নৌশক্তিসমূহ এতে সন্তুষ্ট ছিলেন যে দক্ষিণ সুইডেনের স্ক্যানিয়ান প্রদেশগুলো এবং বর্নহোম দ্বীপ সুইডেনের লাভ করা উচিত, তবে সাউন্ডের দক্ষিণে স্বাধীন ডেনমার্ক রাজ্যের অস্তিত্ব তাদের কাছে মনে হয়েছে আন্তর্জাতিক প্রয়োজন।

অলিভার শান্তির পর পঞ্চাশ বছর চলে যায়। অতঃপর শুরু হয় উত্তরাঞ্চলীয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৭০০–২১)। এই যুদ্ধে বৃহৎ শক্তি হিসেবে সুইডেনের অস্তিত্বের অবসান ঘটে। রাশিয়ার জারগণ দেখা দেয়, ব্রান্ডেনবুর্গে হোহেনজোলার্নরা গড়ে তোলে এক দুর্ধর্ষ বাহিনী। তবে সুইডেন নিজ ভূমি আকড়ে থাকতে সমর্থ হয় ফ্রান্সের জোরদার কূটনৈতিক সমর্থনে। তাসা রাজবংশের মর্যাদা এতোটা গভীর ছিলো যে একাদশ চার্লস (নিরব, অভব্য, আকর্ষণহীন, কিন্তু সাহসী এবং কর্তব্যপরায়ণ) ঘরে বছরের নরকঙ্কাল কাটিয়ে ওঠার পর ঐতিহাসিক দিনেমার শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করে তাঁর মর্যাদা লাভ করেন, পৌর প্রধান (Burghers) ও কৃষকদের সহায়তায় দেশের অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতাও ভেঙ্গে দিয়ে কায়েম করেন স্বেচ্ছাচারতন্ত্র। এই সার্বভৌম নৃপতির প্রয়াণ ঘটে ১৬৯৭ সালে, তিনি ছিলেন খেয়ালি, তবে দেশের জন্য রেখে যান একটি বাহিনী, জাহাজ এবং সমৃদ্ধি। সুইডেন শাসন

করে ফিনল্যান্ডে এবং বথনিয়া উপসাগরের চার পাশে মোতায়েন করে সর্বপ্রথম প্রচুর রেভাল এবং রিগার মতো বৃহৎ বন্দরগুলোতে তার পতাকা উড়তে শুরু করে। তার জন্য ব্রান্ডেনবুর্গ পশ্চিম পমেরানিয়া, হ্যানোভার ব্রেমেন এবং ভেরডেন হারায়, উলফক সুইডেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বা স্ক্যানিয়ান প্রদেশগুলো পায়নি। নেভা নদীর ক্ষুদ্র একটি দ্বীপে তিনি অবতরণ থাকেন। এখানেই অনতিবিলম্বে পিটার দ্য গ্রেট সুইডিশ কারাগার শ্রমিকদের সাহায্যে গড়ে তুলবে তার রাজধানী সেন্ট পিটারবুর্গে নেভস্কি প্রসপেক্ট।

সুইডেনের পতনের জন্য যার ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য তিনি ছিলেন বাল্টিক বারন সম্প্রদায়ের সদস্য। এই সম্প্রদায় এবং হাঙ্গেরীর ভূস্বামী শ্রেণী ছিলো সে কালের ইউরোপের সবচেয়ে গর্বিত কুলীন গোষ্ঠী। জোহান রেইনহোল্ড পাটকুল ব্যক্তিগতভাবে সুইডিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঘোর শত্রুতা পোষণ করেন। ইনি ছিলেন লিভোনিয়ান। স্বীয় শ্রেণীর অন্যদের মতো তার ঘাস তালুকেও আক্রমণ পরিচালনা করা হয়, তিনি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, অতঃপর তার অবর্তমানে তাকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। সেই সময় থেকে এই উগ্র লিভোনীয় বীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যে সুইডিশ সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করতে হবে। বিভিন্ন রাজধানীতে ঘুরে তিনি একটি সামরিক জোট গঠন করেন। দলভুক্ত করেন স্যাকসনির অগস্টাসকে। ইনি ছিলেন পোল্যান্ডের নির্বাচিত রাজা, তার লিপ্সা ছিলো লিভোনিয়া দখলের, দলভুক্ত করেন রাশিয়ার পিটারকে, এই পিটার তুর্কি সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে পশ্চিম অঞ্চল থেকে কোনো সহায়তা না পেয়ে বাল্টিক উপকূল এলাকার দিকে নজর দেন, তিনি অনায়াসে হাত করেন ডেনমার্কের ফ্রেডারিককে, তিনি সুইডিশ রাজকুমারীর সঙ্গে ডিউক অব হলস্টেন গোটোরপের পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার মধ্যে দেখতে পান ডেনমার্ক অঙ্গের মেদবহুল অংশে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। ব্রান্ডেনবুর্গের বিজ্ঞ ইলেক্টর দলভুক্ত হতে অস্বীকার করেন, তবে কথিত সামরিক জোট তার অংশগ্রহণ ছাড়াই পূর্ণশক্তির অধিকারী হয়। ১৭০০ সালের মে মাসে স্যাকসন বাহিনী লিভোনিয়া আক্রমণ করে। সূচনা হয় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের, এতে উত্তরাঞ্চলের ভার ও ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।

সময়টা খুবই প্রসন্ন বলেই মনে হয়। ১৭০০ সালে সুইডেনের দ্বাদশ চার্লস ছিলেন অনভিজ্ঞ বালক মাত্র। তার সম্বন্ধে শুধু এটুকু জানা যায় যে, তিনি দাবি করেন এবং তাকে প্রদান করা হয় স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা, যে ক্ষমতা তার পিতা ভোগ করতেন। এই দীর্ঘাঙ্গ, অনাড়ম্বর, মননব্রতী বালক তার দেশের দিশাহীন বিপদের সময় স্কান্ডেনভিয়ান বীরত্বগাথার বীরের গুণাবলি প্রকাশ করবে, অনুপ্রাণিত ও অদম্য নেতার গুণাবলির প্রমাণ দেবে। তার ইচ্ছা যেমন কর্তৃত্বব্যঞ্জক, সাহস মহীয়ান, তেমনি তার সিদ্ধান্তও আসবে দ্রুত, তিনি কোনো উদ্যোগকেই অতি বন্য কিংবা অতিরিক্ত বেপরোয়া, কোনো শত্রু সীমাহীন কঠিন, মনে করবেন না, তিনি যথাক্রমে ডেনমার্কে এবং স্যাকসনির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, পর্যায়ক্রমে আঘাত ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের অকেজো করে দেবেন, উপরন্তু পিটার দ্য গ্রেটের বাহিনীর সঙ্গে তার প্রথম মোকাবেলা হবে নভেম্বরের তুষার-ঝড়ের মধ্যে, তিনি অর্জন করবেন বিরাট বিজয়। এমনকি তার বাহিনীর চেয়ে চতুর্গুণ বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন সম্ভব না হলেও, এই যুদ্ধ যুদ্ধবিগ্রহের কালপঞ্জিতে অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হবে, এইভাবে ঘটনাবলি এগোয় এবং এতে ইউরোপের সামরিক রূপান্তরের পূর্বলক্ষণাদি খুঁজে পাওয়া যায়। বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে এই তরুণ

সুইডিশ নৃপতি শত্রুজোটের ব্যূহ ভেদ করেন, প্রতিটি রণাঙ্গনে শত্রুবাহিনী পরাস্ত হয়; মার্লবরোর মতো সমরনায়কও তাকে অনন্যসাধারণ সেনাপতি হিসেবে স্বীকৃতি দেন, তাকে সালাম জানানোর জন্য প্রস্তুত হন।

দুর্ভাগ্যবশত, এই তরুণ নৃপতির মানসিক সুস্থতার ঘাটতি ছিলো। মার্লবরো যেখানে সর্বদাই বরফের মতো ঠাণ্ডা থাকতেন, সেখানে চার্লস সহজে উত্তেজিত হতেন, সহজে প্রবল ক্রোধে ফেটে পড়তেন। এ ধরনের উগ্র ও মেজাজী প্রকৃতির লোকের আচরণ স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের কারণে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ হিসেবে কাজ করে। কারণ তার বিচারবুদ্ধির অধঃপতন ঘটলে কোনো শক্তি তাকে কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে দিতে পারে না। ব্যর্থতা, কঠোর পরিশ্রম, পরাজয়, অবমাননা তার অমানবিক আস্থা টলাতে পারে না। গোড়ার দিকে সাফল্যের কারণে তার অদৃষ্ট লিখিত হয়ে যায়। এই অদৃষ্টের তাড়নায় তিনি লঘুচিত্তে প্রতিটি উত্থান-পতন অতিক্রম করেন। এদিকে তার একগুঁয়ে উচ্চাভিলাষের জন্য সুইডেন হয়ে পড়ে রক্তশূন্য, অতি দ্রুত দেশের মর্যাদায় ধস নামে, একই সময়ে ইউরোপীয় কর্মকাণ্ডে তার বিন্দুমাত্র গুরুত্ব কিংবা মূল্য থাকে না। তিনি সবচেয়ে বড় ভুল করেন মহীরুহ রাশিয়াকে ভেরেডা জ্ঞান করে। নার্ভায় (Narva) অনভিজ্ঞ চল্লিশ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করে চার্লস বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে মস্কোর সৈনিকরা নালায়েক, এদের তিনি যে কোনো সময় শায়েস্তা করতে সক্ষম। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি বাল্টিক অঞ্চলের প্রদেশগুলোতে সুইডিশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত না করে গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি বছর নষ্ট করেন স্যাক্সনির ইলেকক্টরকে বিচ্যুত এবং সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্য। তাছাড়া পোল্যান্ডের সিংহাসনে স্বীয় মনোনীত ব্যক্তিকে বসানোর চেষ্টা করেন। তিনি যা কিছু অর্জন করেন তা সামান্য নয়। কিন্তু তিনি যখন পোল্যান্ডের নগরগুলো দখল করছিলেন, কিম্বা যুদ্ধ সম্প্রসারিত করছিলেন স্যাক্সনির অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত, তখন রাশিয়ার পিটার দখল করেন মূল্যবান প্রদেশগুলো (১৭০১-৪)। ইতিমধ্যে তিনি রুশ বাহিনীকে করেছিলেন পুনর্গঠন, আর শেরেমেটিয়েফের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতিকে। বিজ্ঞ বিচারকগণ অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে ১৭০২ সালের জুলাই মাসে ক্লিসৌতে (Klissow) বিজয়ের পর চার্লস যদি স্যাক্সনের শান্তি প্রস্তাব মেনে নিতেন তাহলে তিনিই সুইডিশ সাম্রাজ্যের এই আবশ্যিক ভূ-খণ্ড রক্ষা করতে পারতেন। অন্তত কিছুকালের জন্য।

ঘটনা যাই হোক না, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বাল্টিক প্রদেশগুলো হাতছাড়া হবার পর চার্লস উক্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য বন্যতম এবং নৈরাশ্যজনক উপায় অবলম্বন করেন। পোল্যান্ড এবং স্যাক্সনির সঙ্গে সমস্যা সুরাহা হবার পর এবং সাইলেসিয়ার প্রটেস্টান্টদের প্রতি সুবিচার করার জন্য অস্ট্রিয়াকে বাধ্য করে তিনি বিরাট বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়েন রাশিয়ার অভ্যন্তরে, রুশ জারকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য। এখানে পথ-ঘাটহীন বিশাল ভূ-খণ্ডে জলাভূমি এবং বনাঞ্চলে, রাশিয়ার শীতকালীন করুণাহীনতায়, তার ঝানু সৈনিকদের খুদে বাহিনী মুখোমুখি হয় এক বিশাল ও ভয়ানক বাহিনীর (রুশ গার্ডদের চেয়ে ভয়ানক)। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে, অথচ এ ব্যাপারে এতটুকুও ভাবা হয়নি। রোগব্যাধি এবং অন্ন-বস্ত্রের অভাবে বাহিনী ইতিমধ্যেই অর্ধেকে পরিণত হয়েছে, দক্ষিণ অঞ্চলের কসাকদের সহায়তা লাভের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এমতাবস্থায় ১৭০৯ সালের ২৯ জুন সুইডিশরা বিশাল বাহিনীর ঘোকাবেলা করে। এই যুদ্ধে তার বাহিনী শুধু পরাভূত নয়,

সর্বস্বান্ত হয় পলটাভায়। উৎফুল্ল জার বলেন, "সৃষ্টিকর্তার সহায়তায় সেন্ট পিটার্সবুর্গের অস্তিত্ব বাকি জীবনের জন্য নিশ্চিত হলো।" তিনি বিশেষভাবে খুশি হন শত্রু বাহিনীতে ফরাসি কামানের কার্যকারিতায়।

জার ছিলেন সঠিক। পলটাভার রণক্ষেত্রে তার দেশের জন্য পশ্চিমের জানালা খুলে যায়। যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে চার্লস প্রচণ্ড আঘাত পান, অচল হয়ে পড়েন। তিনি পলায়ন করেন তুরস্কের বেন্ডারে। তার সামনে আরো নয়টি রোমাঞ্চপূর্ণ বছর পড়ে রয়েছে। কিন্তু যদিও তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তুর্কিদের উত্তেজিত করেন (১৭১১-১২), এবং শেষ পর্যন্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তবে, তিনি এখনো আগের মতো বেপরোয়া এবং আপোষহীন, কিন্তু পলটাভার পরিণতি ভণ্ডুল করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। উক্ত যুদ্ধ সুইডিশ সাম্রাজ্যের সামনে চিরস্থায়ী পর্দা টেনে দেয়। পোল্যান্ড ফেরৎ যায় স্যাকসনির অগাস্টাসের কাছে। সুইডিশ পোমেরানিয়ার বৃহত্তর অংশ ব্রান্ডেনবুর্গ কেড়ে নেয়। পিটার বিজিত বাল্টিক অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করেন রিগা ও রেভাল। একটি শক্তিশালী সামরিক জোটের বাহিনী, যার অন্তর্ভুক্ত হ্যানোভার ও প্রুসিয়া, স্যাকসনি, রাশিয়া, ডেনমার্ক স্টালসুন্ডকে আত্মসপর্মণে বাধ্য করে (২৩ ডিসেম্বর, ১৭১৫)। এটি ছিলো জার্মান উপকূলে সুইডিশ সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শক্ত ঘাটি। দীর্ঘ ও বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সত্ত্বেও এটি টেকানো যায়নি। এরপরও সুইডেনে পলায়ন করে চার্লস বিজয়ের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করেন নি। শত্রুর সঙ্গে দরকষাকষিতে সুবিধা হবে মনে করে পররাজ্য গ্রাসের জন্য উদ্যোগী হন। আক্রমণ করেন নরওয়ে। সেখানে একটা তুচ্ছ দুর্গ অবরোধ করেন, অতঃপর এই বন্য, মুণ্ডিত মস্তক, টপ-বুট পরিহিত বীর, যিনি গোটা ইউরোপ ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আন্দোলিত করেছিলেন, দেশের লোকদের বারবার আত্মত্যাগের জন্য আহ্বান জানান, তাদের সমর্থন ও ভক্তিও সব সময় লাভ করেছেন, শেষে বরণ করেন বীর সৈনিকের মৃত্যু। তিন বছর পর (১৭২১ সালের ৩০ আগস্ট নিস্টাডের শান্তি চুক্তিতে) বাল্টিক প্রদেশগুলো সুইডেনের হাত থেকে রাশিয়ার অধিকারে চলে যায়। অথচ এই অঞ্চলে সংগঠিত হয় দীর্ঘতম লড়াই। আর এটিই ছিলো চার্লস কর্তৃক অর্জিত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

রাশিয়ার পিটার

সপ্তদশ শতকে রাশিয়া। পরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত আইনের প্রতি সম্ভ্রম। দুটি রাজবংশ। রোমানফ রাজবংশের উত্থান। পোলদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পশ্চিমী সভ্যতার প্রাথমিক প্রভাব। পিটার দ্য গ্রেট। পিটার পশ্চিমের দিকে নজর ফেরান। সেন্ট পিটার্সবুর্গের গোড়াপত্তন। পিটারের সংস্কার প্রচেষ্টা। পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতিতে রাশিয়ার অংশগ্রহণ

চতুর্দশ লুই-র সমসাময়িকরা যখন প্যারিস ও লন্ডনের মার্জিত বন্ধুত্বের আনন্দ উপভোগ করছেন মস্কোভির জার তখন প্রাচ্যের উপযুক্ত বর্বরতা এবং গভীর হতাশায় নিমজ্জিত। মঠের অধীন গুটিকয় বিদ্যামন্দির ব্যতিরেকে দেশে শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিলো না। বুদ্ধিজীবীদের মুক্ত জীবন সম্পর্কে দেশটিতে কোনো ধারণাই কাজ করেনি। প্রায় সর্বাংশে নিরক্ষর একটি দেশের ব্যাপার এ রকম হওয়া স্বাভাবিক। যাজক শ্রেণীও ছিলো একেবারে অজ্ঞ, নিষ্ক্রিয়, গোঁড়া এবং সংকীর্ণচিত্ত। এই যাজকশ্রেণী তাদের বিপুল সম্পদ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের পরিবর্তে, বুদ্ধিবাদী কৌতূহলের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা দিলে তা দমন করার জন্য ছিলো তৎপর। আমোদ-প্রমোদের আদিম উপায় কিছুটা প্রচলিত ছিলো না যে তা নয়, তবে তা প্রতিটি এশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়। রুশরা মহানন্দে উপভোগ করেছে গাথাকাব্য, স্তোত্রগীতি, ভ্রাম্যমান অন্ধ গায়কের গান, ভ্রাম্যমান গল্প-কথকদের বাগবিস্তার, নাচ-গান এবং গ্রাম্য-ভাঁড়ামি। জাতীয় বীরগাথাও তাদের উপভোগের বিষয় ছিলো। তবে তাদের আমোদ-প্রমোদের আরো একটি উপায় ছিলো, যা প্রকৃত প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিলো না। নর-নারী নির্বিশেষে রুশরা যে হারে মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলো তা অন্যত্র লক্ষ্য করা যায় না। কি রাষ্ট্রবিদ, কি কৃষক শ্রেণী, মঠবাসী কিংবা যাজকশ্রেণী, মদ্যপানের ক্ষেত্রে কেউ পেছনে পড়ে থাকেনি। এখানে অতি সাধারণ লোকদের কথা বোধ করি উল্লেখের দরকার করে না। আর রমণীকুল যেহেতু ছিলো কঠোর অবরোধ প্রথার অধীন, ফলে মস্কোর বিদেশীদের এলাকা ব্যতিরেকে অন্যত্র সামাজিক জীবন বলতে কিছু ছিলো না। ব্রিটানির অতি নগণ্য একজন গোপনারী হয়তো নিজের সম্পর্কে বিস্তর কথা বলতে সক্ষম। কিন্তু মস্কোর ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিরিক্ত সাজ-গোজ করা স্ত্রীও নিজের সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবে না। এই স্ত্রীদের পিঠে আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। রুশ স্বামীরা আঘাতের চিহ্ন সন্তুষ্টচিত্তে, রুশ স্ত্রীরাও তা গভীর আনুগত্যের সঙ্গে মেনে নিতেন।

জার ছিলেন তার দেশ ও জনগণের মালিক (proprietor)। দেশে পার্লামেন্ট বলতে কিছু ছিলো না, কোনো শহর বা নিগমেরও (corporation) স্বাধীন সত্তা বলতে কিছু ছিলো না (পসকোফ এবং নভগোরদের প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীনতা দুর্ভাগ্যজনকভাবে পঞ্চদশ শতকের অন্তে বিলুপ্তির পর থেকে)। সংগঠিত সামাজিক ক্রমাধিকারতন্ত্রও গড়ে ওঠেনি। দেশে বিচার বলতেও কিছু ছিলো না, ঐ বস্তুটা প্রকাশ্যে বেচা-কেনা চলতো। দুর্নীতি নামক ক্যান্সার, যার

ঐতিহাসিক উৎস খুঁজতে হবে এই ঘটনায় যে, মস্কোভর গুল্ক কর্তৃপক্ষ প্রবেশের জন্য লাভ করেন তাতার কর্মকর্তাদের মোটা অংকের ঘুষ প্রদান করে, শুরুবর্বির থেকে নয়। এই ঘুষ আদান-প্রদানের ব্যাপারটা জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়। বর্তমানে এই অভ্যাস কণ্ঠরুদ্ধ করার যে কোনো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দেশে কর সংগ্রহের যে প্রথা চালু ছিলো তাকে রাষ্ট্রীয় তরফে রাহাজানি ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশটা এতদূর পশ্চাদপদ ছিলো যে এর শিল্প ও বাণিজ্যের সিংহভাগ ছিলো স্বয়ং জারের হাতে। পর্যটকগণ সপ্তদশ শতাব্দীতে রুশ দেশ ভ্রমণ করে যে সমাজের বিবরণ দিয়েছেন তা ছিলো হাঙ্গামাবাজ, অনৈতিক এবং কিম্ভূৎকিমাকার সমাজ, বহিরাগতদের থেকে নিজেদের কঠোরভাবে আড়াল করে রাখতো, সমাজটা টিকে ছিলো শুধু বর্বরসুলভ পাশবিকতার কারণে। জার কষাঘাত করতেন বয়ার (boiar) জমিদার শ্রেণীকে, বয়ার ও জমিদারকে কষাঘাত করতেন গৃহকর্মে নিয়োজিত ক্রীতদাস এবং ভূমিদাসদের, বিশপ কষাঘাত করতেন অধীনস্থ যাজকদের, মঠাধ্যক্ষ উৎপীড়ন করতেন সন্ন্যাসীদের, স্বামী নির্দয় আচরণ করতেন স্ত্রীর প্রতি, পিতা নির্যাতন করতেন সন্তানদের। সব ধরনের পোষাক-আশাক, আচার-আচরণ, প্রথা, আইন প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাশিয়া ছিলো পশ্চিম ইউরোপ থেকে একেবারে আলাদা। রুশ পুরুষরা পরিধান করতেন লম্বা পোষাক এবং লম্বা দাড়ি। আইভান দা টেরিবল বলতেন, "দাড়ি কামানো এত বড় পাপ যে হাজার শহীদের রক্ত দিয়েও তা মুছে ফেলা যাবে না। এতে কি মানুষের গড়া সৃষ্টিকর্তার আকৃতি বিনষ্ট করা হবে না?" এখানে বর্বরতম নির্দয়তার সঙ্গে সমন্বয় ঘটে জঘন্য কুসংস্কারের। তাছাড়া পশ্চিমী জগৎ থেকে আসা যেকোনো নতুন ধারণার প্রতি সহজাত বিরূপতা প্রকাশ করা হয়। এতে উৎসাহ যোগায় কৃষ্ণ সন্ন্যাসী এবং শ্বেত যাজকরা। উক্ত যুগের রুশ মানসিকতার অন্যতম লক্ষণ এই যে, একটা ধর্মীয় বিক্ষোভ রুশদের বরফ শীতল স্থৈর্য আন্দোলিত করে। উক্ত বিক্ষোভের রূপ প্রগতিশীল নয়, বরং ছিলো তাহা পশ্চাতমুখীন। রাসকোল (১৬৬৮ f.f) ছিলো ব্যাপক এবং আবেগদীপ্ত বিরুদ্ধবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলন প্যাট্রিয়ার্ক নাইকন কর্তৃক সূচিত অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু যুক্তিশীল, গণপ্রার্থনা সংক্রান্ত বিধি পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছে।

তাহলে রাশিয়া ছিলো মূলত প্রাচী-র অঙ্গ। রুশ জনগণকে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করা হতো না। শুধু কি তাই, ফ্রান্সের চতুর্থ আঁরি-র দরবারে প্রস্তাব উত্থাপন এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যে, জেহাদি মনোবৃত্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ইউরোপীয় মাটি থেকে মস্কোবাসী ও তুর্কিদের বিতাড়িত করার জন্য। ওলিয়ারিয়াস নামক জনৈক জার্মান বুদ্ধিজীবি ১৬৩৬ সালে মস্কো ভ্রমণ করেন। উক্ত দেশ সম্পর্কে তার মনোভাব ও ছিলো সমান বিরূপ।

"যদি কোনো ব্যক্তি মস্কোবাসীদের প্রকৃত জীবনাচরণ বিবেচনা করতে বসেন তাহলে তিনি অনুমোদন করতে বাধ্য হবেন যে এদের চেয়ে বর্বর জাতি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা কখনো কলা বা বিজ্ঞান আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন না। তাদের কোনো বিষয় চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায় না ; বরং তারা মনে করে যে একটা লোক যাদুকর না হলে তার পক্ষে পঞ্জিকা তৈরি সম্ভব হবে না, চাঁদের অবস্থান্তর এবং চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করাও সম্ভব হবে না, যদি তার সঙ্গে শয়তানের কোনো প্রকার যোগাযোগ না থাকে।"

এই উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম, তথা বক্তৃতাশীল জাতি দীর্ঘ দুই হাজার বছর দু'টি রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়। একটি মূলত সুইডিশ বংশোদ্ভূত কবিক রাজবংশ, অপরটি রোমানফ রাজবংশ। শেষোক্ত রাজবংশের একমাত্র পরিচয় এই ছিলো যে এটির সঙ্গে প্রথমোক্ত বংশের সম্পর্ক তৈরি হয় বৈবাহিক সূত্রে। বংশানুক্রমিক নীতির প্রতি রুশ জনগণ এতোটা ভক্তিশীল ছিলো যে যখন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী, দক্ষ বরিস গোডুনফ গোপনে দিমিত্রিকে (আইভান দ্য টেরিবলের দ্বিতীয় পুত্র, এবং উক্ত বংশের শেষ পুরুষ, যে বংশ রুশ রাষ্ট্রের আদি প্রতিষ্ঠাতা এবং বাইজান্টিয়াম থেকে আমদানী করেন খিস্টধর্ম, প্রতিষ্ঠা করেন গ্রান্ড ডাচি মস্কোর, দেশটিকে মুক্ত করেন তাতার শাসনের অভিশাপ থেকে) হত্যা করে তখন জনগণ বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে যে দিমিত্রি মারা যেতে পারেন। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, যে রাজবংশ নবম শতাব্দী থেকে দেশটি শাসন করছে তা হঠাৎ করে হাওয়া হয়ে গেল? অতঃপর আবির্ভাব ঘটতে থাকে মিথ্যা দিমিত্রিদের। প্রথমে আসেন জনৈক সংঘত্যাগী সন্ন্যাসী, ধর্মে ক্যাথলিক, এবং জনৈক ক্যাথলিক মহিলার স্বামী; এর পর দেখা দেয় জনৈক দস্যু। কৃষক ও কসাকদের মধ্যে এরা সাড়া জাগাতে সমর্থ হন। তাছাড়া পোল্যান্ড ও সুইডেনের সহায়তায় রাষ্ট্রব্যবস্থা তছনছ করে বর্বর অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার হুমকি সৃষ্টি করেন।

কিন্তু ১৬১২ সালে, যখন দেশের অবস্থা খুবই খারাপ, যখন পোল্যান্ডের তৃতীয় সিগিসমুন্ড স্মোলেনস্কে, সুইডিশরা নভগোরোডে, পোলরা ক্রেমলিনে, তখন রাশিয়ার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। উক্ত ঘটনা একটি আবেগপ্রবণ এবং ধর্মানুরাগী জাতির বৈশিষ্ট্যসূচকও বটে। রাশিয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তারা কি পোলিশ জারের প্রতি আনুগত্যশীল হবে, এতে তাদের গোড়া ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষার নিশ্চয়তা খুব বেশি থাকবে না। ট্রোইটজার মঠ থেকে পত্র প্রেরণ করা হয় বিভিন্ন জনপদে, উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে। গোটা জাতির মধ্যে মহা জাগরণের সৃষ্টি হয়। দেশানুরাগের যে প্লাবন শুরু হয় তাতে নেতৃত্ব দেন দু'জন ব্যক্তি। একজন কসাই, অপরজন প্রিন্স। কসাই নিসনি-নভগোরোডের মিনাইন এবং প্রিন্স পোকার্স্কি। তাদের গৌরব এখানে যে তারা একটি জাতীয় বাহিনী গঠন করতে সমর্থ হন, পোলদের করেন মস্কোর মাটি থেকে বিতাড়িত এবং তাদের কাজের ফলশ্রুতি হিসেবে একটি জাতীয় সংসদ সম্মতি প্রদান করে মাইকেল রোমানফকে সাম্রাজ্যের সিংহাসনের জন্য। এই রোমানফ কুলপতি (patriarch) ফিলারেটের পুত্র।

মাইকেল ছিলেন পনেরো বছরের বালক মাত্র। তবে এই পরিবার ছিলো জনগণের কাছাকাছি এবং রোমান ক্যাথলিক গির্জার খুবই আশীর্বাদপুষ্ট। পোল্যান্ডের সেনা বাহিনীর পিঠে চড়িয়ে সিংহাসনের জন্য একজন মিথ্যা দাবিদারকে (pretender) আনার চেয়ে কিম্বা কোনো পোলিশ রাজা সিংহাসনে আরোহণ করে অর্থডক্স চার্চের অনিষ্ট হওয়া দেখার চেয়ে মস্কোর বইয়ারগণ স্থির করেন যে একজন অনভিজ্ঞ বালককে সমর্থন করবেন, জনগণও তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। রুরিক রাজবংশের প্রতি যে ভক্তি ছিলো তা এবার রোমানফ বংশের জন্য নির্দিষ্ট হলো। জার সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্বাচিত, তার প্রজাকুলের খুদে পিতা, সকল অসুবিধার নিবারক। এই রাজবংশ স্থায়িত্ব লাভ করে, সুখ্যাতি ও শক্তির অধিকারী হয়। পিটার দ্য গ্রেট এবং দ্বিতীয় আলেক্জান্ডার এই বংশের সন্তান। তাছাড়া মাঝারি মানের অনেক নৃপতি এই বংশ থেকে এসেছেন, জগতের রাজনৈতিক

কর্মকাণ্ডে সামনের সারিতে থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি শো বছর প্রবল প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করার পর হঠাৎ রোমানফ রাজবংশের অবসান ঘটে। ব্যাপারটা তাদের উত্থানের মতোই আকস্মিকভাবে এবং যুদ্ধ ও বিপ্লবের মধ্যে ঘটে। নির্দোষ এবং মানবিক, নবম শতাব্দীর পর রুশ শাসকদের মধ্যে একমাত্র নিখুঁত ভদ্রলোককে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করা হয়। তিনি নিহত হন (বস্তুত তাকে জবাই করা হয়) বোলশেভিকদের বিজয়ের বন্যোন্মত্ত উৎসবের মধ্যে।

নতুন রাজবংশ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে পোলদের সঙ্গে নৃশংস শত্রুতা। দুই দেশের মধ্যে পনেরো শতক থেকে যুদ্ধ লেগেই থাকে। রুশদের মতে পোলদের সঙ্গে তাদের শত্রুতার কারণ প্রধানত দুটি, তাদের রোমান ধর্ম এবং ডিউকশাসিত লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি (এই সংযুক্তি সংহত হয় লুবলিনে, ১৫৬৯ সালে)। সে যুগের লিথুয়ানিয়া ছিলো বিশাল ভূ-খণ্ড (আজকের লিথুয়ানিয়া খুদে প্রজাতন্ত্র মাত্র), এক সময় ছিলো রুশ, এবং যেহেতু উক্ত ভূ-খণ্ডে বাস করে অর্থডক্স চার্চের প্রতি অনুগত 'শ্বেত রুশ' এবং 'খুদে রুশ', অতএব তারা আবার রুশ হয়ে যেতে পারে। এক কথায়, মস্কোবাসীদের কাছে পোলরা ভীষণ প্রকৃতির বিপ্রবণ (heretic) জাতি এবং অন্যের এলাকায় অনধিকার প্রবেশে অভ্যস্ত বিপজ্জনক বংশজাত। উপরন্তু তারা শুধু ক্যাথলিক নয়, আগ্রাসী প্রকৃতির ক্যাথলিক। এটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত যে তাদের অধিকারে থাকবে লিথুয়ানিয়া, আরো খারাপ ব্যাপার এই যে পোলিশ জেসুইটরা লিথুনিয়ানদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করবে ধর্ম ব্যাপারে আধুনিকায়ন এবং সমঝোতার প্রস্তাব করে। চার্চ হবে uniate ধরনের, আনুগত্যের দিক থেকে রোমান, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে স্লাভ। যেহেতু তাদের গোষ্ঠীগতভাবে রোমান ধর্মের আওতাভুক্ত করা যাচ্ছে না। পোলদের চালিয়াতি এবং ধূর্ততার অবধি ছিলো না। রুশরা বিপদে পড়লে পোলরা সে বিপদের সুযোগ গ্রহণ করতে কখনো দ্বিধা করতো না। তারা মস্কোর সিংহাসনের দাবিদারদের সমর্থন করে, প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের কর্তৃত্ব, নগরীর বৃহদংশে করে অগ্নিসংযোগ, তদুপরি দাবি উত্থাপন করে রুশ সিংহাসনের উপর। পোলরা ছিলো মস্কোবাসীদের চেয়ে চতুর এবং বুদ্ধিমান। তাদের পক্ষে সহজ ছিলো জার্মান যুদ্ধের সামরিক বিশেষজ্ঞদের তালিকাভুক্ত করা, তবে সমাজের উচ্চ বংশীয়রা ছিলো প্রায় উন্মাদ ; উপরন্তু জাগেল্লো অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে উক্ত রাজবংশ হয় বিলুপ্ত। ফলে ১৫৭২ সালে মনোনয়নভিত্তিক রাজতন্ত্রের প্রথা চালু করার জন্য দেশটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। হটসপুরদের এই দেশে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তারা পরস্পরবিরোধী একাধিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য চাপ প্রয়োগ শুরু করে। অথচ এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তারা চায় ডিনেপার (Dnieper) অভিমুখে অগ্রসর হতে, বাল্টিক অভিমুখেও অগ্রসর হতে চায়, খোদ রাশিয়ার অভ্যন্তরে একটা ধাক্কা দেয়ার অভ্যাস তো তাদের রয়েছেই। রোমানফ রাজবংশ তাদের রাজত্বের গোড়াতেই পোলিশ-লিথুয়ানিয়ান নামক প্রবল উচ্ছ্বাসে রাশ টানে। ১৬৬৭ সালে, পাঁচ বছরের যুদ্ধের অবসানে, লিটল রাশিয়া এবং পবিত্র নগরী কিয়েফ মস্কোর অধীনে চলে আসে।

মস্কোর গ্রান্ড ডিউকরা প্রথম জয়লাভ লাভ করেন তাতারদের কর আদায়কারী হিসেবে। তারা ক্রমান্বয়ে এশীয় প্রভুদের হাত থেকে মুক্ত হয়। ক্রমান্বয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা বলতুচির রাজধানী থেকে অগ্রসর হওয়া শুরু করেন। এগিয়ে যান কাস্পিয়ান, কৃষ্ণ সাগর এবং বাল্টিক

পশ্চিমা ধাঁচে রুশ সেনাবাহিনী গড়ে তোলার নাম ছড়িয়ে পড়ার আগে এই ব্যাপারগুলি পশ্চিম বিশ্বে নজর কাড়েনি। এসব কাজকারবে পশ্চিমী শক্তি ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা হয় ব্যাপক হারে। আইভান দা গ্রেট, যিনি গ্রিক সম্রাটের ভাইঝি সোফিয়া প্যালিওলোগাসকে বিয়ে করেন, এবং মস্কোর প্রাধান্য বৃদ্ধি করেন দ্বিগুণ, তারা রাজদরবারে আহ্বান জানান গ্রিক ও ইতালীয় বুদ্ধিজীবী এবং প্রকৌশলীদের। আইভান যে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাট সাফল্য অর্জন করেন তাঁর অন্যতম প্রধানতম গুণী আরিস্তোতল ফিওরাবান্তি ভেলগি আলবার্তির কাছে কামানের বিজয় ছিলো ঐতিহাসিক ঘটনা। এখানে তাতার সম্প্রদায় শতাব্দীর সংঘর্ষের ইতি পরাজয় বরণ করে। আর আইভান দা টেরিবলের (ইনিই প্রথম ডিউক, যিনি জার খেতাব ব্যবহার শুরু করেন) রাজ্য কাসপিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই যুদ্ধেও তিনি ফিওরাবন্তির সাহায্য লাভ করেন অনেক জামান প্রকৌশলীর। শ্বেত সাগর বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত করার কাজটি সম্পন্ন করে দুঃসাহসিক ইংরেজরা। প্রতিভা এবং কর্মশক্তিতে পিটার দা গ্রেট ছিলেন সে কালের বিস্ময়। তবে পশ্চিম বিশ্বের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে না পারলে তিনি তাঁর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সাহস করতেন না। এই অভিজ্ঞতা পিটার অর্জন করেন মস্কোর বৈদেশিক চত্বরে সুইস, ওলন্দাজ এবং স্কটিশ বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার বদৌলতে। এবং পরবর্তী কালে পশ্চিমী সমর বিশেষজ্ঞ এবং কামান বন্দুকের সাহায্যে তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে সমর্থ হন।

পিটার রাজ্যের ক্ষমতা করায়ত্ত করেন ১৬৮৯ সালে। স্বীয় ভগ্নী সোফিয়া রিজেন্সি হিসেবে শাসন পালন করছিলেন, তাকে বল প্রয়োগ করে অপসারণ করা হয়। পিটারের বয়স তখন সতেরো, অমিত শারীরিক শক্তির অধিকারী, তিনি ছিলেন সর্বগুণান্বিত পুরুষ, ঔদ্ধত্যের এবং খামখেয়ালি হিংস্রতা এর অন্তর্ভুক্ত। রুশ জনগণের মধ্যে অনভিপ্রেত নতুনত্ব চালু করার জন্য এসব গুণের খুবই দরকার ছিলো। তার মেজাজ ছিলো বিস্ময়কর কর্মশক্তির উপযোগী। আবার প্রবল উচ্ছ্বাসপ্রবণ। ফলে একদিকে তিনি যেমন চূড়ান্ত ভাঁড়ামিতে গা ভাসিয়ে দিতে পারতেন, অপর দিকে তেমনি নিমজ্জিত হয়ে যেতেন গভীর বিষণ্নতায়। তার রাজত্বের প্রথম ছয় বছর তিনি প্রতিদিনের একঘেয়ে কাজগুলি নিজে করতেন না, অন্যদের উপর ছেড়ে দিতেন, এদিকে তিনি স্লোবোডা কিংবা মস্কোর বৈদেশিক আবাসিক এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে উৎসবে মেতে থাকতেন, নেশা ছিলো আতশবাজিতে বৈচিত্র্য সূচনায়, সদর রাস্তায় নৃত্যগীতে, জলযান তৈরি, কৃত্রিম লড়াই আয়োজন এবং বন্ধুদের সঙ্গে নির্দয় রসিকতায়। যখন তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পুরুষের সঙ্গে পালন শুরু করেন, তখনও বোঝা যেত না যে এ ব্যাপারে তিনি কতোটা আন্তরিক। পঞ্চাশ বছর বয়সেও তিনি ছিলেন নিম্ন বিদ্যালয়ের বালকসুলভ উচ্ছৃঙ্খল এবং দায়িত্বহীন। ঐ বয়সেও সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরকে বোকা বানাতেন এপ্রিল মাসের পয়লা দিন। তার কর্মশক্তি এবং কৌতূহল অফুরন্ত অথচ তার অভ্যাস ছিলো পাঁড় মাতাল, নোংরা এবং মস্কোর মজুর শ্রেণীগোত্তম। যাদের লোকদের সঙ্গে মিশে অতিরিক্ত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, কঠোর পরিশ্রম করতেন প্রসন্ন চিত্তে, নিম্ন শ্রেণীর কাজ করতেও দ্বিধা করতেন না, প্রয়োজনে সামান্য দোকানদারের দায়িত্ব পালন করতেন, জাহাজ চালাতেন, জাহাজ নির্মাণে সহায়তা করতেন ডুতের-দিগরীদের কাজে। তাকে জাহাজের দর্জির পালন করতেও দেখা গেছে। উন্নত মানের কাজে হাত লাগাতেন তো বটেই। যেমন, দন্ত চিকিৎসকের কাজ, কিংবা ঘোড়ার নালের কাজ। নৈতিক, ধর্মীয়

কিংবা সামাজিক কোনো কাজই তাকে দমাতে পারেনি। স্ত্রীকে করেন কারারুদ্ধ, পুত্রকে করেন পরিত্যাগ, কবর থেকে পিতৃব্যের লাশ উঠিয়ে করেন অপবিত্র। তার মনে একটি আশংকা কাজ করে যে তার বুদ্ধিমান কিন্তু পশ্চাদমুখীন পুত্র তার প্রগতিশীল কর্মপন্থা নস্যাৎ করতে পারে। ফলে তিনি নিজ পুত্র আলেক্সিকে গুপ্তহত্যা করেন। দাসসুলভ বশ্যতাকে তিনি ঘৃণা করতেন, এজন্য শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে দণ্ডায়মান হওয়ার প্রচলিত প্রথাকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পিটার স্বীয় মর্যাদার ব্যাপারটাকে কোনো গুরুত্ব দিতেন না, তাছাড়া গর্ববোধ সম্পর্কে অসচেতনতা কিম্বা সমাজের নীচু স্তরের মানুষের মতো সাদাসিধে জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন বলে তিনি কোনো কাজ বা অবস্থাকে নীচু স্তরের গণ্য করতেন না। তার দ্বিতীয় স্ত্রী অতি সাধারণ লিভোনিয়ান পরিচারিকা ছিলেন, তিনি নিজে লাম্পট্য ব্যাপারে লজ্জাহীন, কিংবা এক নাগাড়ে কয়েক দিন বদ্ধ মাতাল হয়ে পড়ে থাকতেন, রাজকর্ম কিংবা কোনো কাজই করতে পারতেন না, এতে জনগণের কাছে তার মর্যাদা খাটো হতো বলে মনে করতেন না। পিটার বস্তুত ছিলেন রুশ চরিত্রের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি। কাজের পরিণতি সম্পর্কে ভাবনাহীন, বিশৃঙ্খল মেজাজ, গভীরভাবে কর্মমোহিত, সহযাত্রীদের প্রতি সমবেদনায় অত্যন্ত উদার। তবে তিনি যখন তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করেন তখন সার্বজনীন স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করা যায়। জনৈক রসিক ব্যক্তির বর্ণনায়, ইঁদুর বিড়ালেরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরম উল্লাসের সঙ্গে অবলোকন করে।

যে তরুণ শাসক বৃহৎ নৌশক্তিতে পরিণত হতে চায়, বাণিজ্যের প্রসার যার লক্ষ্য, তার কাছে ডন নদীর মোহনায় অবস্থিত তুর্কিদের বিরাট ও সুরক্ষিত দুর্গ আজফ (Azoff) লোভনীয় বস্তু গণ্য হতে বাধ্য। আর মস্কো থেকে উক্ত দুর্গে পৌঁছতে হলে জলপথ ভিন্ন গতি নেই। ফলে এই দুর্গের দেয়ালগুলি ঘিরে পিটারের জীবনে প্রথম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হয় (১৬৯৫)। এখানে প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর নৌবাহিনীর উন্নতি সাধন করে তিনি ঘরে তোলেন তার ধৈর্য, কর্মশক্তি ও বুদ্ধির মূল্যবান ফসল। আজফ অধিকার (১৬৯৬) ন্যায়সঙ্গতভাবেই তুর্কিদের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় রুশদের প্রথম বিজয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু তরুণ জার ছিলেন নিরেট বাস্তববাদী। ফলে এই যুদ্ধে তার মাথা একেবারে ঘুরে যায়নি।

কৃষ্ণ সাগরের দিকে নজর নিবদ্ধ করলে প্রথমেই কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যার সমাধান পশ্চিমী মিত্রদের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। গোটা ইউরোপে তিনি উপযোগী মিত্র খুঁজে বেড়ান, তবে তাকে দেশে ফিরতে হয় খালি হাতে। ফলে তিনি কৃষ্ণ সাগর বাদ দিয়ে সামরিক লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেন বাল্টিক অঞ্চল। তাতার ও তুর্কিদের কাছ থেকে ক্রিমিয়া কেড়ে নেয়ার চেয়ে সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরের গোড়াপত্তন অনেক সহজ ব্যাপার। এখানে তিনি রাষ্ট্রবিদসুলভ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বলে মনে করা চলে।

১৭২৫ সালে পিটার আক্রান্ত হলেন সুইডেনের উপর। অতঃপর আমৃত্যু তিনি প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে একের পর এক যুদ্ধে জড়িত হয়েছেন। সুইডেন, তুরস্ক, পারস্য ইত্যাদি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পটভূমিকায় তার দেশের অভ্যন্তরে কাজের বিচার করতে হবে। তার অস্থিতিশীল মনে সব সময় কাজ করেছে কিভাবে বিরাট স্থল ও নৌবাহিনী গড়া যেতে পারে (বিশেষ করে যথাক্রমে অস্ট্রিয়া এবং ইংল্যান্ডের সমতুল্য), গঠন করা যায় সুইডেনের ধাঁচে সিভিল সার্ভিস। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিভাবে কৃষকদের কাছ থেকে বলপূর্বক আদায় করা যায় সেটাও তার মাথায় কাজ করেছে (ভূমিদাস প্রথা প্রচলনের আগে

তিনিই প্রথম কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সরবরাহ আদায় করেন)। তার কর্মপন্থায় দরিদ্রের বোঝা লাঘব, কিংবা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। জনগণের জন্য তিনি শুধু চাইতেন বিজ্ঞান, ক্ষমতা এবং পশ্চিমী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সামগ্রী।

পিটার দ্য গ্রেটের কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারতেন যে পশ্চিম ইউরোপের জীবনযাপন অনেক উন্নত। ফলে তিনি আজীবন সাধনা করে গেছেন কিভাবে রুশ সভ্যতার উন্নতি করা যায়। এ ব্যাপারে তিনি সফলও হন অনেকাংশে,যদিও তাকে দেশীয় সংস্কারের প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। পিটারের ছেলেবেলায় ফূর্তিবাজির নিত্যসঙ্গী ছিলেন জেনেভার লেফোর্ট। এই লেফোর্টের জার্মান চত্বরের বাড়ি ছিলো নাক্কারজনক ফূর্তির আড্ডাখানা। পিটার বোধ করি এই আড্ডায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে পশ্চিমী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। লেফোর্টই পিটারকে পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণের পরামর্শ দেন (১৬৯৭)। এরপর রাশিয়ার ইতিহাস দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আমস্টার্ডাম কিম্বা ডেপটফোর্ড নাবিকদের জন্য যে শিক্ষা দেয় তা পিটার কোনো দিন বিস্মৃত হননি, কিংবা বিস্মৃত হননি ভিয়েনার সামরিক বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য শিক্ষার কথা। ইউরোপের লোকেরা আয়ত্ত করেছিলো জীবনযাপনের কায়দা-কানুন এবং ক্ষমতা অর্জনের গোপন কথা। ইউরোপীয়রা নির্মাণ করতে পারে জাহাজ, তৈরি করতে পারে কামান-বন্দুক, যন্ত্রপাতি, তারা টাকা-পয়সা এবং আরাম আয়েশের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে জানে, তারা আরো জানে অর্থপূর্ণ প্রমোদে মত্ত হতে, তার পড়ে, তারা লেখে, রমণীকুলের সঙ্গে মেলামেশা করে অবাধে, তাদের রাস্তাঘাট সুন্দর এবং আলোকিত, তাদের জীবনে বর্বরতা নেই, তাদের জীবন নিঃসঙ্গ কিংবা চার দেয়ালে আবদ্ধ নয়। পিটার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ইউরোপ যা করতে পেরেছে তা রাশিয়াও করতে পারে এবং করা উচিত।

তিনি উপলব্ধি করেন যে বাল্টিকের তীরে রাজধানী করা গেলে তা দেশের বিরাট কাজে লাগবে। সেন্ট পিটার্সবুর্গ ছিলো দীর্ঘ যুদ্ধের পুরস্কার, যদিও সে যুদ্ধের সূচনা করা হয় তাড়াহুড়া করে। তিনি জানেন অতঃপর পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না। রুশ রাজনীতির প্রভাবও প্রবলভাবে অনুভূত হবে পশ্চিম জগতে। সেন্ট পিটার্সবুর্গ শুধু একটা নগর নয়, একটা দেশের পতাকা। রুশ জীবনের যে ধারা পশ্চিমী জীবনের প্রতি অনুরাগী এবং দৈশিক বিশেষ ভাবধারার প্রতি বিরূপ, এই নগরী তার প্রতীক। কথিত বিশেষ ভাবধারা উনিশ শতকে ছিলো স্লাভ জাতির অনুরাগী, বিংশ শতকে সাম্যবাদী। এরে কাছে রুশ সভ্যতা পশ্চিমী সভ্যতা থেকে একেবারে ভিন্ন এবং পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে সংমিশ্রণে মোটেই লাভবান হবার সম্ভাবনা নেই। তাদের কাছে রুশ দেশের প্রকৃত প্রাণকেন্দ্র হলো মস্কো নগরী, রুশ সরকারের যথাযথ অধিষ্ঠান। এ ধরনের লোকদের কাছে নেভার তীরে পিটারের মহানগর বাল্টিক ব্যারনদের সামাজিক মেলামেশার কেন্দ্র এবং রুশ দেশের পবিত্র মাটিতে জার্মানির একটি খুদে উপনিবেশ ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

মস্কোর রুশ রক্ষী বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহাত্মক গতিবিধি শুরু হয়। পিটার বিদ্রোহ দমন করেন অনায়াসে। তবে বিদ্রোহী সৈনিকদের প্রদান করেন কঠোর শাস্তি। ফলে একটা সন্ত্রাস অবস্থার সৃষ্টি হয়। সবার মনে এখন ভয়ানক ত্রাস। আর পিটার যে ধরনের সংস্কার কর্মে হাত দেন তার জন্য জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির প্রয়োজন ছিলো। প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী

পিটার আঘাত হানেন রুশ সামাজিক জীবনের সেই সব শক্ত কেন্দ্রগুলিতে, যে কেন্দ্রগুলি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধ্বজাধারী। পুরুষদের লম্বা দাড়ি রাখা কিংবা লম্বা আলখেল্লা পরিধানের তিনি বিরোধিতা করেন, নারীদের উপর আরোপিত অবরোধ প্রত্যাহার করেন, তাদের ফিরিয়ে আনেন সামাজিক জীবনে, মঠবাসী ও যাজকদের সম্পদ আহরণ ও স্বাধীন জীবন যাপনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং (এমনকি) তিনি মস্কো নগরী বিশপ কর্তৃক শাসনের (patriarchate) প্রথা বন্ধ করেন। চার্চের কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেন হলি সাইনডের (Holy Synod) অধীনে, উক্ত সাইনডে পুরোহিত ও বিশপ উভয় শ্রেণী থেকে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা রাখা হয়।

এতো সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন কার্যকর করার পর বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মুদ্রা ও পঞ্জিকার সংস্কার সাধন, বর্ণমালা থেকে আটটি অক্ষর বাদ দেয়া ছিলো ছোটখাটো ব্যাপার। এছাড়াও তিনি সিনেট গঠন করেন, চালু করেন সিভিল সার্ভিস, গড়ে তোলেন বিরাট নৌবাহিনী। রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি ছিলো বদ্ধমূল। এরা পিটারের আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে ঠেকায়। যদিও পিটার সাইবেরিয়ার প্রতারক গবর্নরকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে বাধ্য করেন। লিভোনিয়ান ক্যাথারিন, তার দ্বিতীয় স্ত্রী, ছিলেন নির্লজ্জ ব্লাকমেইলার।

একটা গোটা জাতি গভীর দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এই জাতির মধ্যে সভ্যতার প্রসার একজন শাসকের রাজত্বকালে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। পিটারের 'সমাজ সেবায়' ব্যয় করার মতো সংগতি ছিলো না। তার শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনা কাগজে কলমে ছিলো অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। অথচ বাস্তবে এক্ষেত্রে সামান্যই অগ্রগতি সাধিত হয়। একাধারে ছিলো তহবিলের ঘাটতি, শিক্ষক পাওয়া যেতো না, শিক্ষা গ্রহণের প্রেরণাও জনগণের মধ্যে খুব একটা কাজ করতো না। এই যদি বাস্তব পরিস্থিতি হয় তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় একটা সাফল্য অর্জন করা যায় না। আদেশ জারি করে একটা জাতির মধ্যে নতুন রুচি তৈরি করা যায় না, রুশরাও সমুদ্রের প্রতি যেমন, শিক্ষার প্রতিও তেমনি আকর্ষণ অনুভব করে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। পিটারও পলটোভা যুদ্ধের সংকট কালে যেমন মদের নেশায় বুঁদ হয়ে জগতের প্রতি অন্ধ ছিলেন, তেমনি রুশ জনগণকে প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মতো লোক ছিলেন না। দ্বাদশ চার্লস কিংবা নেপোলিয়নের মতো তিনি যদি মিতাচারী হতেন তাহলে জাতির জন্য অনেক কঠিন কর্ম সম্পাদন করতে পারতেন। তবু পিটার রুশ জনগণের জন্য বড় কাজ কম করেন নি। একটি আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য তিনটি জিনিস প্রধানত অত্যাবশ্যক। এই তিনটি বিষয় যেমন, একটা স্থল বাহিনী, নৌ বাহিনী এবং সিভিল সার্ভিস তিনি রুশ জনগণকে দিয়ে যান। যদিও তৃতীয় আইভানের সময় থেকে মস্কোর রাজদরবারে পশ্চিমী প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিলো, তবুও তিনিই প্রথম রুশ জনগণের জন্য পশ্চিমী জগতের জানালা খুলে দেন, অতঃপর উক্ত জানালা আর বন্ধ করা হয়নি। রাশিয়ার প্রথম সংবাদপত্র, প্রথম রাশিয়ান হাসপাতাল, প্রথম রাশিয়ান যাদুঘর তার একক প্রচেষ্টায় প্রথম খোলা হয়।

পিটার যদিও তার কাজগুলি ভবিষ্যতের কথা ভেবে করেননি, তবু তার কাজ টিকে থাকে। টিকে থাকে তার কাজ পূর্ব সংস্কারের জোয়ার-ভাটা অতিক্রম করে। পিটারকে

অনুসরণ করে একের পর এক সিংহাসনে আরোহণ করেন তার বিধবা পত্নী, নাতি, ভাইঝি এবং স্বীয় কন্যা।[১]

এই সার্বভৌম নৃপতিদের নেপথ্যে কাজ করেছেন অস্টারম্যানের মতো অনেক জার্মান প্রতিভা। এই অস্টারম্যান রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘ সতেরো বছর। কুরল্যান্ডের অ্যান-এর সময়, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন অপর এক জার্মান মুন্নিখ (Munnich)। এলিজাবেথের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন পিটারের অনুরাগী রুশ ব্যক্তিত্ব বেস্টুচিফ। পুরাতন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে। ১৭৬২ সালে এলিজাবেথের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিলো রুশ কর্মপন্থার মূলভিত্তি।

অতএব দেখা যায় যে, একজন প্রতিভাবান বর্বর কারিগরের উদ্যোগের ফলে রাশিয়া ইউরোপের কূটনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়। ইউরোপে তার যে মর্যাদা দাঁড়ায় তা ইংল্যান্ড যে মর্যাদা ভোগ করে তার একেবারে বিপরীত ছিলো না। একদিকে সে হয় ইউরোপের অংশ, অপরদিকে দূর-দূরান্তে তার স্বার্থ জড়িত থাকে, ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক ছিলো না; বিশাল এশিয়া মহাদেশ ছিলো তার পেছন দরোজা। একটি নিম্ন পাইন বৃক্ষ আবৃত পাহাড়ী অঞ্চল (এই অঞ্চলে প্রথম যখন পদপাত ঘটে ইয়ার মাকের তখন শেক্সপিয়র নিতান্ত বালক মাত্র), রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে বনাঞ্চল, জলপথ এবং সাইবেরিয়ার তৃণভূমি থেকে। প্রকৃতি এখানে এশিয়ার মাটিতে, যেন কানাডার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। এই অঞ্চল একই সঙ্গে যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। ব্যতিক্রম এই যে, নদীগুলি এখানে দক্ষিণ থেকে উত্তর অভিমুখী। রুশরা সমুদ্র অতিক্রম করে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়তে যাবে। তাদের কর্মপন্থায় রয়েছে এশিয়ার বিশাল প্রান্তরের প্রতি টান। তবে ব্যাপারটা তখন খুব পরিষ্কার বোঝা যায়নি। এই সেদিন, উনিশ শতকে রাশিয়া বৃটেন ও জাপানের মুখোমুখি হবার পর ব্যাপারটার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রুশ কর্মপন্থা প্রণেতাগণ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভূ-ভাগের প্রতি যতটা মনোযোগ দিয়েছে পূর্বাঞ্চলের প্রতি এতোটা মনোযোগ দেয়নি। পশ্চিম জগৎ প্রযুক্তিবিদ এবং আলোকিত স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের দর্শন সরবরাহ করে রাশিয়াকে সাহায্য করে। দক্ষিণ অঞ্চল রুশদের প্রলুব্ধ করে রাজ্য জয়ের জন্য। দৃষ্টি চলে যায় ককেশাসের নিম্নাঞ্চলের দিকে, রয়েছে ক্রিমিয়া এবং তার রৌদ্রস্নাত রিভিয়েরা, এবং বসফরাস, সবচেয়ে আকর্ষণীয় সমুদ্র পথ, যেখান থেকে ভয়ানক ইউক্সিন অতিক্রম করে চলে যাওয়া যায় গরম পানির বন্দর কন্সট্যান্টিনোপলে, অতঃপর গ্রিসীয় দ্বীপগুলি অতিক্রম করে পবিত্র ভূমিতে। এটুকু বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে এখানে রুশ জনগণের মধ্যে কি মনোভাব কাজ করেছে। তারা চায় গরম পানির বন্দর। ঈজিয়ান সাগরে পৌঁছার সহজ উপায় এবং পুরাতন গ্রিক নগরীর উপর নিয়ন্ত্রণ। কারণ রুশ জনগণ বিশ্বাস করে যে তারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বৈধ উত্তরাধিকারী। ফলে তারা তুর্কিদের মনে করে তাদের উচ্চাভিলাষের সামনে বিশাল প্রতিবন্ধক হিসেবে। তারা সকল কূটনৈতিক সম্পর্কও নির্ণয় করে এই ব্যাপারটা মনে রেখে। তুরস্কের বন্ধুরা তাদের শত্রু, তুরস্কের শত্রুরা তাদের স্বাভাবিক মিত্র। পিটারের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন মহোত্তম, সেই দ্বিতীয়

---

১. [illegible], [illegible], দ্বিতীয় পিটার, অ্যান অব কুরল্যান্ড, এলিজাবেথ।

ক্যাথারিন এই ব্যাপারটা খুব ভালো বুঝতেন। যদিও তিনি জন্মসূত্রে ছিলেন জার্মান, শিক্ষাদীক্ষায় ফরাসি। ক্যাথরিনের মাথায়ও সব সময় কাজ করেছে দক্ষিণ অঞ্চলের প্রশ্ন। তার রাজত্বকালে পোল্যান্ড বিভক্ত হয় দক্ষিণ অঞ্চলের কর্মপন্থার অংশ হিসেবে। তার সময়ে কুক্ষীগত করা হয় ক্রিমিয়া (১৭৮৩) এবং রুশ পতাকা উড়তে শুরু করে কৃষ্ণ সাগরের উপকূল অঞ্চলে।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলী

১. ক্লুশেভস্কি : হিস্টোরি অব রাশিয়া। অনু. সি. জে. হোগার্থ। ১৯১১-৩১
২. র‍্যাবো : Historie de la Russie. ১৮৮৪-
৩. এ. ব্রুকনার : পিটার দার গ্রোস। ১৮৭৮
৪. এ. টয়েনবি : অ্যা স্টাডি অব হিস্টোরি, ৩য় খণ্ড, ১৯৩৪
৫. মেকলে : হিস্টোরি অব ইংল্যান্ড। ১৮৫৮-৬২
৬. আর. নিসবেট বেইন : স্লাভনিক ইউরোপ, ১৯০৮
৭. আর. নিসবেট বেইন : পিউপিলস অব পিটার দ্য গ্রেট। ১৮৯৫
৮. কে. ওয়ালিজেউস্কি : Pierre le Grand। ১৮৯৭
৯ বি. এইচ. সামনার : পিটার দ্য গ্রেট অ্যান্ড দ্য ইমারজেন্স অব রাশিয়া। ১৯৫১

তুর্কিজাতি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়

মুক্ত বাহিনীর শক্তি : মহামহিম সুলেমান। তুর্কিদের রাজ্য বিস্তারের যুগ। ১৬০৬ সালের ঐতিহাসিক সন্ধি। তুর্কি শাসনের নির্যাতন ও প্রশ্রয়। খ্রিষ্টান জগতে দ্বিধাবিভক্তি। তুরস্কের অবক্ষয় এবং পুনরুজ্জীবন। খ্রিষ্টান রক্ষাপ্রাচীর হিসেবে অস্ট্রিয়া। পোল্যান্ড, তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং দুঃসময়ের দল। জন সোবিয়েস্কি। ফরাসি বিরোধিতা। খ্রিষ্টানদের বিজয়, ১২৮৩-৯৯। ভেনিস কর্তৃক মোরিয়া বিজয়। খ্রিষ্টান জাতীয়তাবাদ। তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রকৃত শত্রু। অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং ইউরোপসেবা।

বিশ্বজয়ী মহম্মদের নিকট উত্তরসূরীরা নিশ্চয় বিস্মৃত হন নি যে অধ্যবসায়ী সাহসিক প্রচেষ্টার দরুন একটা ক্ষুদ্র এবং রুক্ষ প্রাচ্যের গোত্র এসিয়ার হৃদপিণ্ড থেকে উঠে এসে একটা বিরাট সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করে। এই সাম্রাজ্য একদিকে বাগদাদ থেকে মরোক্কো, অপর দিকে পারস্য উপসাগর থেকে শুরু করে ক্রিমিয়া এবং দানিউব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রের জোরেই তারা সাম্রাজ্য গঠনে সমর্থ হয়। তাদের মধ্যে এতটুকু বিজ্ঞতাও ছিলো যে উন্নত অস্ত্রশস্ত্র বলেই তারা উক্ত বিশাল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হবে। ফলে সেনাবাহিনী লালন-পালনই মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। এবং যেহেতু বহু কাল যাবৎ একমাত্র তুর্কি সুলতানদের অধীনেই শুধু প্রতিষ্ঠিত বা স্থায়ী বাহিনী ছিলো (উপরন্তু ইউরোপের এক মাত্র গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীও বটে), ফলে তারা স্বীয় প্রজাকুল এবং প্রতিবেশীদের কাছে ভীতিকর রূপ ধারণ করতে সমর্থ হতো। কামান-কলুক, প্রকৌশল, সরবরাহ ব্যবস্থা, প্রতি ক্ষেত্রে সুলতানদের অবস্থান ছিলো ইউরোপ মহাদেশে সবার উচ্চে। তাছাড়া কোনো পশ্চিমের রাষ্ট্র স্পাহি ও জেনিসারিদের বিরোধিতা করার সাহস করতো না। এই বাহিনীগুলি গঠন করা হতো খ্রিষ্টান সন্তানদের নজরানা হিসেবে গ্রহণ করে। এদের দীর্ঘকাল কঠোর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। এক শতাব্দীরও অধিককাল সময় সুলতানরা তাদের সামরিক চালনার পুরস্কার ভোগ করে। আমিরুল মোমেনিনের (Commander of the Faithful) প্রতি গভীর আনুগত্য তাদের স্বীয় ধর্মের প্রতি অন্ধ অনুরাগী করে তোলে।

এতাদৃশ নেতৃত্ব এবং খ্রিষ্টান জগতে বিভক্তির কারণে সুবিধা লাভ করে তুর্কি সাম্রাজ্য নিরবিচ্ছিন্ন বিস্তার লাভ করতে থাকে। মহামহিম সুলেমানের বীরোচিত এবং কৃতিবান নেতৃত্বে (তিনি ১৫২০ সাল থেকে ১৫৬৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেন), আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তুর্কিরা হাসপাতালের রুগীদের সেবক সঙ্ঘের (Knights Hospitallers) কাছ থেকে রোডস কেড়ে নেয়, ট্রানসিলভানিয়া এবং মোলডাভিয়ার কাছ থেকে আদায় করে বিরাট নজরানা, আর অস্ট্রীয়দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় হাঙ্গেরির দশ ভাগের সাত ভাগ ভূ-খণ্ড। সাম্রাজ্যিক আকাঙ্ক্ষা এবং স্থলে খ্রিষ্টধর্ম রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের ফলে গোটা ইউরোপে আতঙ্কে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর কোনো কালে অটোম্যান সাম্রাজ্য

এতটা শক্তিশালী হতে পারেনি (এই মহান তুর্কির শাসনামলে যতটা শক্তিশালী হয়)। যদিও এক শতাব্দী পর ভেনিসিয়ানদের কাছ থেকে ক্যান্ডিয়া কেড়ে নেয়, আর কামেনিয়েক নামক গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ কেড়ে নেয় পোলদের কাছ থেকে। এখানে মহান সুলেমান সম্পর্কে উল্লেখ করা চলে যে, তিনি সৈনিকের শক্তির সঙ্গে বেসরকারি সংগঠন দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে সমর্থ হন এবং শিল্পকলা ও জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেন সুগভীর অনুরাগের সঙ্গে। এরপর শুরু হয় নীরস অবক্ষয়, অন্তত অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি ফুটে উঠতে শুরু করে। একের পর এক দুর্বল এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ সুলতানের অভ্যুদয় ঘটতে থাকে, তাদের কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু পাওয়া যায়নি। এটা অনিবার্য ছিলো। যে দেশের সবকিছু নির্ভর করে স্বেচ্ছাচারী নৃপতির উপর সে দেশের কাছে মঙ্গলজনক কিছু প্রত্যাশা করা চলে না। সরকারযন্ত্র ধ্বংসের হয় দুর্নীতিতে, সেনাবহিনীতে সূচিত হয় অরাজকতা। জেনিসারি এবং স্পাহিদের বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করা হয়। নজরানা হিসেবে খ্রিষ্টান সন্তানদের সংগ্রহে ভাটা পড়ে, আর সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে সংগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ১৬০৬ সালের তোরোক সন্ধি বলে অস্ট্রীয়দের গ্লানিকর নজরানা প্রদান বন্ধ হয়, একই সঙ্গে অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়। এই সময় থেকে ইউরোপে তুর্কিদের বিজয়ের গতি থমকে যায়, এবং তুর্কিরা শত্রুর সঙ্গে দরকষাকষির ফলে একটা সুবিধাজনক অবস্থান হারাতে বাধ্য হয়।

ওটোম্যান সাম্রাজ্য কর্তৃক বিজিত হবার আগে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অবস্থা এতটা দুর্দশাগ্রস্ত ছিলো যে ওটোম্যান সরকারের (Porte) খ্রিষ্টান প্রজাকুলের বিরাট একটা অংশ তুর্কি দৃঢ়তাপূর্ণ শাসন ব্যবস্থাকে নিশ্চয় প্রায় আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করেছে। একথা সত্য, খ্রিষ্টানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাদের একটা বিশেষ করও দিতে হয়েছে, এমন কি একাধিক বার খ্রিষ্টানরা সমূলে নির্মূল হবার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন। তবু, তাদের বিজেতাদের নানা ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, তারা সহনীয় জীবনযাপনের অপরিহার্য নিশ্চয়তা লাভ করেছেন। তুর্কিরা নির্দয়, কিন্তু অলস ছিলেন, তাদের মধ্যে প্রভুত্ব-পরায়ণতা ছিলো, আবার তারা নির্বোধও ছিলেন। শিল্প কিংবা বাণিজ্যের প্রতি তাদের কোনো ঝোঁক ছিলো না বলে তারা খ্রিষ্টানদের দোকানদারি, সওদাগরি এবং কারিগরি পেশা চালিয়ে যেতে দিয়ে সন্তুষ্ট বোধ করেছে ; যেহেতু তুর্কিদের অন্য জাতির উপর চাপিয়ে দেবার মতো কোনো সংস্কৃতি ছিলো না, অতএব গ্রিক, বুলগার এবং সার্বরা তার ঢিলেঢালা এবং অনিয়ন্ত্রিত শাসনের অধীনে বাস করেছে, নিজেদের ধর্মীয় সংস্কৃতি চর্চা করেছে নিশ্চিন্তে, পূর্বপুরুষের আচার-আচরণও রক্ষা করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, গোষ্ঠীপতির (Patriarch) সমর্থনে নিরবে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে পবিত্র কোরানের শিক্ষা প্রতিরোধ করেছে।

সুতরাং ইউরোপে তুর্কি শাসনের দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিলো ; এক দিকে তাদের শাসন ছিলো অত্যাচারী, অপর দিকে প্রশ্রয়দানকারী। খ্রিষ্টান শিক্ষা নিয়ে যে বিবাদ হয়েছে তুর্কিরা সে ব্যাপারে গভীর এবং অবজ্ঞাজনক উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে। গোটা জগৎকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষাদানের বাসনা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তারা অবিশ্বাসীদের শয়তানি করে বিশ্বাস হতে দিয়েছে ; ওদের ঝগড়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি। অন্য কোনো উপায় তুর্কিদের স্বার্থের এতটা অনুকূলে যেত না। ট্রানসিলভানিয়া এবং হাঙ্গেরির অনেক প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী জেসুইটদের কঠোর দণ্ডের অধীনে বাস করার চেয়ে বরং ক্রিসেন্টের অধীনে বাস করা পছন্দ করেছে ; এবং হাঙ্গেরির সমর্থন আদায়ের জন্য প্রতিযোগিতায় (যা ছিলো সতেরশ

শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দানুবীয় অঞ্চলের যুদ্ধ বিগ্রহের (হেতু) ধর্মীয় সহনশীলতার জন্য ভাবসাম্য যতটা তুরস্কের দিকে যায় ততটা অন্য কোনো কারণে নয়। একই কারণে ভাবসাম্য অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যায়; তাদের নির্যাতনের ঘোষিত নীতির কারণে, যে নীতির জন্য বোহেমিয়ার প্রটেস্ট্যান্টরা ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায় এবং মেগিয়ার সহ-ধর্মাবলম্বীদের জীবন ও সম্পত্তি হুমকির সম্মুখীন হয়।

অতএব দেখা যায় সুবিস্তৃত এবং যুদ্ধের লক্ষ্যে সংগঠিত তুর্কি সাম্রাজ্যের দু'টি প্রধান শত্রু ছিলো, পারস্যের শিয়া সম্প্রদায় এবং ইউরোপের বিভ্রান্ত ও অব্যবস্থিত খ্রিষ্টান জনগণ। তাদের সমগ্র ইতিহাসে তুর্কিদের দু'টি পৃথক সীমান্তে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

কিন্তু তুর্কিদের অবশ্যই অনতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হতে হতো যদি পরিস্থিতির একটা দিক তাদের অনুকূলে না যেত। ইউরোপীয় জগৎ সমবেত প্রচেষ্টা গ্রহণে সমর্থ ছিলো না। গ্রিক ও লাতিন চার্চের মধ্যে বিভক্তির সুযোগে তুর্কিরা কন্সটান্টিনোপলে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়, লাতিন খ্রিষ্টধর্মের মধ্যেকার বিবাদ, উপরন্তু প্রথম ফ্রান্সিস এবং পঞ্চম চার্লসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তুর্কিরা নিজেদের শক্তি সংহত এবং বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখতে পারে। আবার প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি রাজবংশ, হ্যাবসবার্গ ও বুরবঁদের মধ্যে ঝগড়ার জন্য ইউরোপের প্রতিটি রাজদরবারে বিরোধাত্মক আনুগত্য এবং সহানুভূতির সূচনা হয়, যার ফলশ্রুতিতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে খ্রিষ্টান ভূ-খণ্ড দখলের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় তুর্কিদের সামনে।

তবে ইউরোপের জন্য সৌভাগ্য এই যে, 'তিরিশ বছরের যুদ্ধে'র যুগে যখন প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকরা জার্মান রাজ্য তছনছ করছিলো, ঠিক সেই সময়েই ওটোম্যান সাম্রাজ্যে চলছিলো নৈতিক স্নায়ুশক্তিহীনতার পর্ব। এ রকম ক্ষতিকর পর্ব উক্ত সাম্রাজ্যে প্রায়ই দেখা দিয়েছে। পৌরুষদীপ্ত শক্তি এবং নির্দয় মেধার ক্ষেত্রে ওটোম্যানবংশ ছিলো পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশ; তবে তাদের বার বার অকারণ অযোগ্যতার পরিচয় দিতে দেখা গেছে, এবং ব্যাপারটা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তবু তুর্কিদের নৈতিক বল পুনরুদ্ধারের অসাধারণ ক্ষমতা ছিলো, যা তার শত্রুদের একাধিকবার, বস্তুত বার বার, বিভ্রান্ত করেছে। অর্ধ শতাব্দীকাল দুর্নীতি এবং অরাজকতা চলার পর আবার দেখা গেল স্বাভাবিকতা এবং শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। অব্যবস্থচিত্ত পঞ্চম মহম্মদের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে ১৬৫৬ সালে জনৈক বয়স্ক আলবানীয়কে প্রধানমন্ত্রী পদে কাজ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। আলবানিয়া একটি অতি ক্ষুদ্র দেশ, কিন্তু দেশের লোকেরা ছিলো কঠোর প্রকৃতির এবং আধিপত্যশীল, দেশটির বন্ধ্যা পর্বতগুলির মতোই। স্ক্যানডারবার্গ ছিলেন আলবানীয়; আধুনিক মিশরের স্থাপয়িতা মহম্মদ আলি ছিলেন আলবানীয়, এবং এই সংকটকালে, যখন তুর্কি সাম্রাজ্য গুরুতর অরাজকতায় নিমজ্জিত, তখন আলবানীয় মহম্মদ কিউপ্রিলি হিংস্র কঠোরতার সঙ্গে সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ বছরেরও অধিক কাল সময় কিউপ্রিলি পরিবার থেকে প্রবীণ উজির নিয়োগ করা হতো। এই উজিরদের কারণে ওটোম্যান রাজবংশ আরো একবার দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে তেজস্বী ও ভীতিকর ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়। পশ্চিমী জগতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয়।

তুর্কিদের হুমকি থেকে ইউরোপকে প্রতিরক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয় হ্যাবসবার্গ ক্যাথলিক রাজবংশের উপর। ইউরোপীয় ইতিহাসে অস্ট্রিয়ার বৃহৎ ভূমিকা, এবং অস্ট্রীয়

সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের অন্যতম প্রধান যৌক্তিকতা খুঁজতে হবে এই ঘটনায় যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে লাতিন ও জার্মান সভ্যতাকে দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে সমর্থন যুগিয়েছে। কিন্তু সুলতানের শক্তি যেখানে ছিলো ঐক্যবদ্ধ এবং ঘনবিন্যস্ত, সেখানে অস্ট্রিয়ার লিওপোল্ড তার বংশানুক্রমিক সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রভু ছিলেন না। বিশেষত হাঙ্গেরীতে তার কর্তৃত্ব নির্দ্বন্দ্ব ছিলো না, এখানকার অভিজাতদের শক্তিশালী একটি গোষ্ঠী জার্মান বাহিনীকে ঘৃণা করতো, তাদের ভয় ছিলো জার্মানরা কর আরোপ করবে, সর্বোপরি তারা রোমান চার্চের অসহিষ্ণুতার জন্য ছিলো ক্ষুব্ধ। ফলে তারা তুর্কি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করেছে। বাস্তবিকপক্ষে বোহেমিয়া অস্ট্রিয়ার গোড়ালির পেষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় ; তবে জার্মানি থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে গেলে তা করতে হবে ডায়েটের (Diet) প্রিন্সদের সম্মতিক্রমে, তাছাড়া ফ্রান্সের শত্রুতামূলক কূটনীতির মুখোমুখি হওয়া অনিবার্য। তবু, এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, মধ্যযুগীয় অনুভূতির বেশ মূল্য ছিলো। ক্যাথলিক ধর্মমতের জন্য প্রকৃত সংকটের সময়ে আর্চডিউক অব অস্ট্রিয়া, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হিসেবে ইউরোপের কুসেড মনোভাবের কাছে (এখনো যতটুকু অবশিষ্ট আছে) আবেদন করতে পারতেন, তাছাড়া লাতিন খ্রিষ্ট জগতের প্রধান হিসেবে ভ্যাটিক্যানের সমর্থন লাভের যোগ্য ছিলেন, চার্চের প্রার্থনার উপর তার দাবি ছিলো, আরো সহায়তা লাভের অধিকারী ছিলেন একটি ক্ষুদ্র, বিশ্বজনীন, বিবিধ ও সুদক্ষ একটি বাহিনীর।

তার নিকট মিত্র ছিলো (ওয়ারশতে চতুর্দশ লুই ব্যর্থ হন ধরে নিয়ে) বিশাল, হাঙ্গামাপূর্ণ এবং অনিশ্চিত পোলদের প্রজাতন্ত্র। ১৫৭২ সাল থেকে, যখন পোলরাজন্যবর্গ কোনো প্রকার শক্ত শাসনের কাছে নতি স্বীকার করতে অস্বীকার করেন, জেদ ধরেন যে নৃপতিকে নির্বাচনের মাধ্যমে আনতে হবে, তখন থেকে এই দেশটি সম্পূর্ণ নৈতিক ও রাজনৈতিক ভাঙনের মুখোমুখি দাঁড়ায়। রাজা একজন ছিলেন নামমাত্র, সাইফার বা নালায়েক বিশেষ। কর আদায়ের জন্য তার কোনো মেশিনারি ছিলো না, না ছিলো মওজুদ বাহিনী, এবং যেহেতু পোলিশ ডায়েটের যে কোনো সদস্য, যে কোনো অজুহাতে, সে অজুহাত যতোই তুচ্ছ হোক না কেন, সমস্ত কর্মকাণ্ডে ভিটো প্রয়োগের অধিকারী ছিলেন ফলে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন কিংবা সামান্য আইনগত পরিবর্তন সম্ভব ছিলো না। ডায়েটের অধিবেশন বসতো দু'বছরে একবার। কিন্তু যেহেতু ডায়েট গঠিত হয়েছিলো সশস্ত্র অভিজাতদের দ্বারা, এদের কেউ অস্ট্রিয়ার ভাতা গ্রহণ করতেন, কেউ কেউ গ্রহণ করতেন ফ্রান্সের ভাতা, আর ডায়েটের অধিবেশন কখনো হাঙ্গামা কিংবা রক্তপাত ভিন্ন শেষ হতো না, অতএব ন্যায়সংগতভাবে বলা চলে যে এই ডায়েটকে কোনো অর্থে জাতীয় সংসদ মনে করা চলে না। ইউরোপের কোনো অভিজাত শ্রেণী পোলিশদের মতো কঠিন ধাতুতে গড়া ছিলো না, পোলিশ অশ্বারোহী বাহিনীর মতো অন্য কোনো বাহিনী জাঁকাল ও বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেত না, গাত্রে জ্বলজ্বল করতো প্রচুর হিরক খণ্ড, অথচ বাহিনীতে শৃঙ্খলার অভাব ছিলো সুস্পষ্ট। যে কোনো সময় পোলিশ বাহিনীর আয়তন ও গঠনবিন্যাস নির্ভর করতো অভিজাতবর্গের অভিলাষের উপর, কিংবা তাদের কোনো অংশের উপর, আর একই স্বেচ্ছাধীন নীতির কারণে বাহিনীর দক্ষতা হতো প্রভাবিত। যুদ্ধ চলাকালে আনুগত্য নির্ণয় করা হতো প্রবণতা অনুসারে, আর অত্যন্ত সফল সেনাপতিও নানা কারণে দক্ষতা হারাতেন। সবচেয়ে ক্ষতি করতো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। লিথুয়ানিয়ার অধিবাসীরা ছিলেন পোলদের

একেবারে ধনশালী, আর পোলরা ছিলেন একে অপরের চেয়ে ভিন্ন। ভূমিদাস কৃষকশ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত ইহুদিরা শাসনতন্ত্রের আওতায় আসতে পারতেন না, তাদের ঘৃণা ও নির্যাতন করা হতো। তাদের সঙ্গে কখনো বন্ধুসুলভ আচরণ করা হতো না। পুরাতন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সংরোধের মতো পাইতাশ করায় এই হতভাগা জাতিকে দুটি বিরাট বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়। পোলিশ সিংহাসনে সিগিসমুণ্ড ভাসাকে বসানোর পর (১৫৮৭), অতঃপর তাকে রোমান চার্চে গ্রহণ করা হয়, তারা প্রটেস্টান্ট সুইডেনের শত্রুতাভাজন হন। এটি ছিলো ভয়ানক বোঝাস্বরূপ। উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিমান দেশের সঙ্গে বিবাদ পোলদের প্রতিরক্ষার ক্ষমতা বিনষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিলো ; তবে পোলরা এখানে একা ছিলেন না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সমগ্রটা জুড়ে ইউক্রেনের কসাকদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষুব্ধ আলজেরিয়ার সৃষ্টি হয়। জেসুইট মিশনারিরা অর্থডক্স চার্চের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। নবপ্রতিষ্ঠিত ভূস্বামীরা অবজ্ঞেয় ইহুদিদের নিয়োগদান শুরু করে খাজনা আদায়ের জন্য। ১৬৪৮ সালের দিকে কসাকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তাদের সর্দার (Hetman) বোগদান খেলমনিংস্কি-র অধীনে কসাকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাছাড়া রুশ ও তাতারদের সাহায্যে তারা পোলিশ রাষ্ট্রকে উচিত শিক্ষা দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দৈবিক কারণে ঘটনা একই সঙ্গে ঘটায় তারা সুইডিশদের সহায়তাও লাভ করে। ১৬৫০ সালের মধ্যে পোল্যান্ড রাষ্ট্রের টিকে থাকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং দেশটিকে বিভাজনের একাধিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। কিন্তু যদিও উক্ত প্রজাতন্ত্রের প্রতি ঈর্ষাপুষ্ট প্রতিবেশীর সংখ্যা খুব বেশি ছিলো, তবে খ্রিস্টান জগত কথিত সময়ের জন্য মনে করে যে দেশটির টিকে থাকা উচিত, অন্তত যতদিন দেশটি দুর্বল থেকে অস্ট্রিয়ার জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে না পারে, এবং ফ্রান্সের লক্ষ্য উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট অর্থগৃধ্নুতার পরিচয় দেয় (অর্থাৎ ফ্রান্সের কোনো কাজে না লাগে)।

পোডোলিয়া নামক একটি দেশ বা বিস্তৃত ভূভাগ ওয়ালাচিয়া এবং পোলিশ পোল্যান্ডের মাঝখানে সীমান্ত ভূখণ্ড হিসেবে অবস্থিত। এই পোডোলিয়া ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে পোলিশ বাহিনীকে অবশ্যই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তুরস্ক অভিমুখে অগ্রসর হতে হবে, আর পোডোলিয়ার বিশাল সমতল ভূমি অতিক্রম করে তাতার ও তুর্কিদের উত্তর দিকে পোলদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হয়। এই সুপরিচিত রণক্ষেত্রে (যেখানে সপ্তদশ শতাব্দীর তাতার যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের অবশেষ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়) জন সোবিয়েস্কি হঠাৎ সমরনায়ক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ইনি ছিলেন একটি সুপ্রাচীন পরিবারের পোলিশ অভিজাত।

পোলিস ইতিহাসে হাতে গোনা কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘটনার অন্যতম হলো ১৬৭৪ সালে এই সমরনায়ককে পোল্যান্ডের রাজা হিসেবে নির্বাচন। আগের বছর পোডোলিয়ায় চমৎকার বিজয় অর্জন করেন বলে তাকে রাজা হিসেবে নির্বাচন সহজ হয়। তিনি খোকজিমে আহমেদ কিউপ্রিলির বিশাল ও শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে এই বিজয় অর্জন করেন। তাদের ইতিহাসের একটা চরম সংকটকালে, ফরাসিদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে, পোলরা তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বেছে নেন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে। এতে প্রকাশ পায় তাদের বিজ্ঞতার বিরল দীপ্তি। মহাযুদ্ধের পর পুনরুজ্জীবিত পোলিশ প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এম. পেডেরেউস্কি-কে নিযুক্তির আগে এতটা বিজ্ঞতার পরিচয় আর কখনো মেলেনি। তখন দ্বিতীয় বারের মতো, পোলরা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে সার্বজনীন ব্যক্তিকে আহ্বান জানান রাষ্ট্রের কর্ণধার হবার জন্য।

সোবয়োস্কির জীবন নিরাবচ্ছিন্ন ভাবে সংগ্রামপূর্ণ ছিলো না। যৌবনে তিনি কস্যাক তুর্কের বিরুদ্ধে লড়াই করেন সুইডিশদের পক্ষে। তবু তিনি ক্যাথলিক এবং দেশপ্রেমিক ছিলেন তার সকল বৈশিষ্ট্য ছিলো বৃহৎ আয়তনের। তার দেহ ছিলো বিশাল ও স্থূল, তিনি ছিলেন সংস্কৃতিবান, কর্মক্ষেত্রে তেজস্বী, ক্ষুদে ষড়যন্ত্র ও ঈর্ষার উর্ধ্বে অবস্থান, মেজাজের দিক থেকে সমৃদ্ধ ও সদয়। তিনি ছিলেন তার সময়ের গুটিকয় নেতার মধ্যে একজন, যিনি কঠিন আঘাত হানতে সক্ষম ছিলেন, আঘাতও করতেন প্রায়ই, যুদ্ধেও জয়ী হতেন প্রায়ই। পোল্যান্ডের রাজা যখন রণপ্রান্তরে হাজির হতেন তখন তিনি পোলদের যুদ্ধে জয়ী করতেন। ১৬৭৫ সালের মধ্যে তিনি তুর্কিদের পোডোলিয়া (কামেনিয়েক দুর্গ বাদে) এবং ইউক্রেনের তিন ভাগের দুই ভাগ ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন। অতঃপর ভূখণ্ড দুটি পোল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু তার লক্ষ্য ছিলো অনেক বড়ো। স্থানীয় বিজয় কিংবা পোডোলিয়া কুক্ষীগত করা তার মূল লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। তিনি ক্রুসেডের স্বপ্ন দেখতেন, তিনি স্বপ্ন দেখতেন তুর্কিদের ইউরোপ থেকে বিতাড়নের। তার ইচ্ছা ছিলো তুর্কিদের ধ্বংসাবশেষের উপর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য গঠন। এই কাজটিকেই তিনি মনে করতেন বীরোচিত ; এই কাজটিই মহৎ ও বিজ্ঞজনোচিত এবং চূড়ান্ত বিজয়সূচক।

গোটা ইউরোপের মনোভাব অনুরূপ ছিলো না। সোবিয়েস্কি যেখানে সমগ্র বিশ্বকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, চতুর্দশ লুই সেখানে সকল রকম চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন আসন্ন বিপদের সময় পোল্যান্ডকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য। এই উদ্যোগে তিনি সফল হন নি ; কিন্তু প্যারিস ও ভিয়েনার মধ্যেকার স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন (আরো কিছু কারণ ছিলো) তুর্কিরা ভিয়েনার বিরুদ্ধে বিরাট অভিযান পরিচালনার সুযোগ পেয়ে যায়। অতঃপর রোমের বিরুদ্ধেও আক্রমণ পরিচালনা করে।

ভিয়েনার অদূর থেকে ১৬৮৩ সালে অযোগ্য কারা মুস্তাফা পিছু হঠতে বাধ্য হলে তুর্কিদের অবক্ষয়ের দীর্ঘ প্রক্রিয়া সুরু হয়, যার পরিণতি লুসান সন্ধি ১৯২৩ সালে। সোবিয়েস্কি কর্তৃক কয়েকটি প্রাথমিক আঘাত হানার পর মধ্য দানিউব অঞ্চলের উপর অধিকার নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এরপর পুরাতন অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য জার্মানি এবং স্যাভয় থেকে সেনাপতি সংগ্রহ ও নিয়োগ করে তুর্কিদের দানিউব এলাকা থেকে বিতাড়িত করে। এই যুদ্ধাভিযানগুলিতে প্রিন্স ইউজিন, মার্লবরোর মিত্র এবং প্রটেস্ট্যান্ট ইংল্যান্ডের প্রিয়পাত্র, প্রথম সুখ্যাতি অর্জন করেন। জেন্টার বিরাট বিজয়ের ফলে কার্লোভিৎসের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, ফলে সমগ্র হাঙ্গেরি এবং ট্রানসিলভানিয়া অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়, আর সমগ্র পোডোলিয়া এবং ইউক্রেন পোলদের অধিকারে চলে যায়।

এই যুগান্তকারী সন্ধিতে নথিবদ্ধ ব্রিটানদের একটি বিজয় ছিলো অসময়োচিত। পোপ কর্তৃক উদ্দীপিত এবং তুর্কিদের বিতাড়নে উৎসাহী হয়ে ভেনিশিয়ানরা গ্রিস বিজয়ের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। হ্যানোভারের রেডকোট (বৃটিশ সৈনিক) এবং অন্যান্য ভাড়াটে জার্মান সৈনিকের সাহায্যে তারা ডালমাটিয়ার উপর পুনরায় দখল কায়েম করে, মোরিয়া থেকে তুর্কিদের তাড়িয়ে দেয় এবং এথেন্সের এক্রোপলিসে লাগামহীন বোমার আঘাতে অপূরণীয় ক্ষতি করে পার্থেননের। কার্লোভিৎসের সন্ধি তাদের বিজয়সমূহ অনুমোদন করে। কিন্তু গ্রিসের ভেনিসের উপনিবেশ হবার কথা নয়। দীর্ঘ তেইশ বছর লড়ন অব সেইন্ট মার্কের অধীনে থাকার পর মোরিয়া ফিরে যায় তাদের তুর্কি প্রভুদের কাছে। ভেনিশিয়ানরা

ফ্রান্সেসকো মরোসিনির অধীনে যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে, তবে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা তাদের ছিলো না। কোনো গ্রিক কোনো ইতালীয়কে পছন্দ করে না, কোনো অর্থডক্স কোনো রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীকে দু'চোখে দেখতে পারে না। আবার কোনো প্রোটেস্ট্যান্ট সওদাগর ভেনিসিয়ানদের কঠোর একচেটিয়া ব্যবসার নীতি অনুমোদন করে না। প্রজাতন্ত্রের মৃদু শাসন নিঃশব্দে ধ্বংস হয়ে যায়, কারণ এই প্রজাতন্ত্র জনগণের মধ্যে কোনো প্রকার উৎসাহ জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়, এরা শতাব্দীর পর শতাব্দী নিষ্পেষিত হয়েছে, ফলে তারা নাতিন মনের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না, বরং সুলতান এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের গ্রিক প্যাট্রিয়ার্ককে যথাক্রমে ইহজাগতিক এবং ধর্মীয় প্রধান হিসেবে গণ্য করতে আগ্রহী।

আঠারো, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষকরা যে গুটিয়ে যায় তার জন্য ভ্যাটিকানের আহ্বান কোনো প্রকার অবদান রাখেনি। গডফ্রে দ্য বুইলোর ঢাকে শেষ বার আঘাত করেন জন সোবিয়েস্কি, অথচ তখন ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টরা দ্বিতীয় চার্লসের দরবারে প্রাধান্য লাভের জন্য দলাদলিতে ব্যস্ত, আর চতুর্দশ লুই আক্রমণ পরিচালনা করছেন স্পেনীয় নেদারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। উপরন্তু সাহায্য করছেন সুলতানকে। যে শক্তি সুপ্রাচীন তুর্কি সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ করে তা রোমান নয়, গ্রিক, কসমোপলিটান নয়, জাতীয়তাবাদী। বলকান অঞ্চলের জনগণ, গ্রিক, সার্ব, বুলগার ও রুমানীয়দের (তারা খুব বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিলো যে তুর্কি দুঃশাসনের জোয়াল ছুড়ে ফেলে দিতে হবে, ভোগ করতে হবে স্বাধীন জাতীয় জীবন। বলকান অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীগুলির এই আশা-আকাঙ্ক্ষা কিভাবে, ধীরে ধীরে, পরিপক্কতা লাভ করে, কিভাবে তারা রাশিয়ার অর্থডক্স চার্চ, প্যানস্লাভ জাতিগোষ্ঠী, এবং রুশ জারের সাম্রাজ্যিক উচ্চাভিলাষের জন্য দৃঢ় অনুপ্রেরণা লাভ করে, শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার সমর্থনে সার্বীয় জাতীয়তাবাদ অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের জন্য হুমকির সৃষ্টি করে, চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিণতি লাভ করে ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে, সে সম্পর্কে পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। তখন এ ব্যাপারটাও লক্ষ্য করা হবে কিভাবে, রোমানফ রাজবংশের জাররাজ্যের পতনের পর এবং রাশিয়া বিপ্লবের দরুন বিলীন হয়ে গেলে, পুরাতন কূটনৈতিক ঐতিহ্যে ফিরে যায়, এবং তুর্কিরা যাতে কনস্ট্যান্টিনোপল কব্জায় রাখতে পারে তার জন্য সাহায্য করে।

ইতিমধ্যে প্রিন্স ইউজিনের বিজয়গুলির ফলে হাঙ্গেরি পুনরায় অস্ট্রিয়ার কুক্ষীগত হয়। এতে হ্যাবসবার্গ সম্রাট অভ্যন্তরীণ সরকার পরিচালনায় এমন একটি সমস্যার সম্মুখীন হয় (অ্যাংলো-আইরিশ সমস্যার মতো) যার নির্ভেজাল এবং সন্তোষজনক সমাধান প্রায় অসম্ভব। অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক দেখতে পান যে মনোনয়নকর (elective) হাঙ্গেরি রাজ্যে রয়েছে একটি শক্তিশালী ম্যাগিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়, তারা তিন কোটি উদ্ধত প্রজাদের উপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। তারা যে ভাষায় কথা বলে তা এখন কোনো জার্মানবাসীর জানা নেই, তাদের আচার-আচরণ জার্মানদের মধ্যে প্রচলিত নয়, অনেক পরিবার প্রটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী, অনেক পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম তুর্কিদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে—তারা রুক্ষ, আধা-এশিয়াটিক অভিজাত, ভূমির মালিক এবং ঘোড়া শ্রেণীভুক্ত। নেতৃত্বের দিক থেকে এদের বরং পোলদের সঙ্গে মিল রয়েছে, কিন্তু জার্মানদের সঙ্গে কোনো মিল নেই, তিনেরও সাংস্কৃতিক ও মৈশিক শ্রেণীর সঙ্গে এদের একাত্মতার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্রাট

কিভাবে এই জটিল, তেজস্বী, আধা-প্যাগান লোকদের শাসন করবেন? টিউটন ও স্লাভদের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবেন? এই বিভিন্ন ও পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগহীন জাতিগুলি নিয়ে একটি ক্যাথলিক এবং বাস্তব শাসিত রাজ্য গড়বেন? বোহেমিয়ান আদর্শ অনুসারে কি সমগ্র জনসংখ্যাকে কেন্দ্রীভূত এবং জার্মান করে তোলা সম্ভব? এমন একটি ফেডারেশন বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ কি গড়ে তোলা যায় যেখানে প্রতিটি জাতি ক্ষমতার যথাযথ অংশীদার হতে পারবে? নাকি সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো জার্মান ও মেগিয়ারদের হস্তে সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত করা, তারা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের অধীন বর্বরদের নিয়ন্ত্রণ করবে?

সুপ্রাচীন অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য এই সমস্যাগুলি আঠারো এবং উনিশ শতকে সমাধানের চেষ্টা করে। অতঃপর ওটোম্যান সাম্রাজ্যের মতো মহাযুদ্ধের পর বিলীন হয়ে যায়, এটা ঘটে অভ্যন্তরীণ জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির প্রচণ্ড আঘাতে। এই অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অনেক ভক্ত ও সমর্থক ছিলেন, যারা জাতীয়তাবাদকে মানব জাতির প্রধান রাজনৈতিক অভিশাপ বলে গণ্য করেন। কারণ এই ক্যাথলিক রাষ্ট্রের প্রতি অনেকের বিরাট আকর্ষণ ছিলো। এ জন্য যে এই রাষ্ট্রের ধর্মীয় নীতি পরিচালনা করতেন জেসুইটরা, এ রাষ্ট্র প্রজাদের মধ্যে ধর্ম ও ভক্তি প্রচারের জন্য উদ্যোগী হয়। অথচ অধিকাংশ প্রজা অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে ছিলেন আধা বর্বর এবং আধা প্যাগান। অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অনুরাগীরা লক্ষ্য করেন যে এই সাম্রাজ্য খ্রিষ্টীয় সমাজ বাস্তবায়নের জন্য ছোট মাপের একটা উদ্যোগ হাতে নেয়। আর চার্চের লক্ষ্য হলো পৃথিবীর সকল জাতিকে মমত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। এটি খ্রিষ্টান ধর্মের ঘোষিত লক্ষ্য। প্যাক্স ব্রিটানিকার মতো প্যাক্স অস্ট্রিয়াকায় তারা দেখতে পায় এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা যা জাতীয় রাষ্ট্রের চেয়ে উন্নত। এই রাষ্ট্র আবেদন সৃষ্টি করে, জাতীয়তাবাদের নয়, উচ্চতর এবং বৃহত্তর মানবসঙ্ঘ তৈরির নীতির প্রতি। তারা অনুধাবন করতে পারে যে কি অসুবিধার ভেতর সুপ্রাচীন অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে চলতে হয়েছে, কি ধরনের নিষ্পেষণ তাকে চালাতে হয়েছে, অবশেষে অর্জন করতে হয়েছে চূড়ান্ত কুখ্যাতি। তবু এই সাম্রাজ্যের ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাওয়ার ঘটনা তাদের কাছে দুঃখজনক। অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে অনেক সময় মনে হয়েছে কিম্ভূতকিমাকার, নির্যাতনকারী, বোধবুদ্ধিহীন, তবু এটি ইউরোপের বিশাল ও সমস্যাক্রান্ত এলাকায় টিকে ছিলো, তাছাড়া ভাবাবেগী এবং সামঞ্জস্যহীন অনেক জাতিকে পশ্চিমের লাতিন ও টিউটনিক সংস্কৃতির ছিটেফোটা দেয়ার চেষ্টা করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য যদি স্ব-শাসিত রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীন সঙ্ঘ হতো, তাহলে এটি অনায়াসে কথিত সময়ের ঝড়ঝঞ্ঝা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হতো। একটি সাম্রাজ্যের অপরিহার্য ভিত্তি হলো অঙ্গসমূহের সম্মতি। এই সাম্রাজ্যে তার অভাব ছিলো। রাজবংশসমূহের মধ্যে আপত্তিক বিবাহের ফল এই সাম্রাজ্য, একটি পরিবারের প্রতি আনুগত্যই ছিলো সবচেয়ে বড়ো কথা, কোনো অভিন্ন কৃষ্টির ভিত্তি এখানে অনুপস্থিত, বরং ঐক্য অর্জিত হয় নির্যাতনকারী শক্তির জন্য। জেসুইট, সৈনিক এবং পুলিশরা রাজ্যের বন্ধন টিকিয়ে রাখে, এ ধরনের যান্ত্রিক বন্ধনের অভাব হলে রাষ্ট্রদেহের অঙ্গসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। সুপ্রাচীন অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যে জীবন ছিলো হাসিখুশি, সুখি এবং সুকলাপ্রসূ। এটি ছিলো একটি ক্যাথলিক রাষ্ট্র, রাজতন্ত্রী, জীবনাচরণে প্রথানুগ শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সেবা লাভ

করেছে যেখানে ইহুদিরা যেখানে সংখ্যায় খুব বেশি সেখানে এটা ঘটবেই), তবে রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিলো না।

এটিই প্রতীয়মান হোলো। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অস্ট্রিয়া ছিলো কাউন্টার রিফর্মেশনের অগ্রণী ভূখণ্ড, বোহেমিয়ার স্বাধীনতা দমনে সে একক ভাবে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে সেটি ইউরোপের জন্য কিছু করে দু'ভাবে। পূর্বাঞ্চলে তুর্কিদের করে প্রতিহত, পশ্চিমাঞ্চলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দুটি প্রটেস্টান্ট এবং নৌশক্তিকে অপরিহার্য ও অনুপম সমর্থন জোগায়। একটি রাষ্ট্রের কর্মপন্থা উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকদের ধর্মবিশ্বাস থেকে এতটা কম অনুমান করা যায় যে, ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের নিরবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা, স্পেনীয় সাম্রাজ্যের ভাঙন এবং ইংল্যান্ডে প্রটেস্টান্ট নৃপতির নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় সুপ্রাচীন জেসুইট প্রভাবিত অস্ট্রিয়ার জন্য। এই সাম্রাজ্য সেইন্ট জার্মেইন এবং ট্রিয়ননের সন্ধির ফলে বিলীন হয়ে যায় (১৯১৯-১৯২০)।

মূলগ্রন্থপঞ্জি

১. হল্লিউ. জন. হ্যারিস : পোল্যান্ড। ১৮৯৩।
২. হাইবেন্স্কি : পোল্যান্ড (ন্যাশন্স অব দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড)। ১৯৩৩।
৩. এন এ দা স্যালবাঁজি : Histore du roi Jean Sobioski দুই খণ্ডে। ১৮৭৬।
৪. জে বি মর্টন : সোবিয়েস্কি, কিং অব পোল্যান্ড। ১৯৩২।
৫. হল্লিউ. কলস : হাউস অব অস্ট্রিয়া। ১৮৪৭।
৬. জি ফিনলি : হিস্টোরি অব গ্রিস। স. এইচ. এফ. টোজার। ১৮৭৭।
৭. ডি. এম. ডন : ইউরোপ অ্যান্ড দ্য তুর্ক। ১৩৫০-১৭০০। ১৯৫৪
৮. বি. এইচ. সামনার : পিটার দ্য গ্রেট অ্যান্ড দি ওটোম্যান এম্পায়ার। ১৯৪৯।
৯. হল্লিউ. সি. বেডলো : ক্যামব্রিজ হিস্টোরি অব পোল্যান্ড. প্রথম খণ্ড।

শান্তি ও প্রুসিয়া

হেভুবাদের যুগ। ইংরেজ-ফরাসি সখ্য। স্পেনীয়দের ভীতি প্রদর্শন। ষষ্ঠ চার্লস ও হ্যাপ্সবুর্গিক স্যাংশন। পোলদের উত্তরাধিকার যুদ্ধ। ফ্রান্স কর্তৃক লরেন বিজিত। ওয়ালপোল ও ফ্লিউরি। অষ্টাদশ শতকের যুদ্ধের স্বরূপ। প্রুসিয়ার উত্থান। প্রুসীয় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান। হোহেনযোলার্ন রাজবংশ। প্রুসীয় জনগণের চরিত্র। প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ম।

স্পেনের উত্তরাধিকার যুদ্ধের অবসান হলে সূচিত হয় শান্তিপর্ব, এটি ইউরোপের ইতিহাসের জন্য বিরল ঘটনা, আর সভ্যতার বিকাশের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। ইউট্রেখটের সন্ধি সম্পাদিত হয় একাধিক সমঝোতার ভিত্তিতে। ফলে এই সন্ধির ফলশ্রুতি হিসেবে অবিলম্বে ফ্যাসাদ শুরু হবার সুযোগ ছিলো না। অস্ট্রিয়া ও স্পেন হতাশ হলেও যুধ্যমান সকল পক্ষ স্পেনীয় উত্তরাধিকার বিভক্তির কারণে লাভবান হয়। ফ্রান্সের রিজেন্ট, অর্লিয়ঁর ফিলিপ এবং ইংল্যান্ডের প্রথম জর্জের দুর্বল ও দুর্ভাগ্যপীড়িত সরকারের জন্য শান্তিপর্ব ছিলো নিরাপত্তার আবশ্যিক শর্ত।

এটাই স্বাভাবিক যে হেভুবাদের যুগের সূচনা হবে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে রাজনৈতিক মৈত্রী সৃষ্টির মাধ্যমে। তবে এই দৃশ্য স্বাভাবিক নয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই ছিলো যে, ইংরেজ ও ফরাসিরা মননের ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। জুলিয়ান দ্য এপোস্টেট থেকে শুরু করে হেগ ও ফচের সময় পর্যন্ত ইংরেজ ও ফরাসি যৌথ বাহিনীর ব্যর্থতা ছিলো বিরল ঘটনা। এখন তাদের সমবেত কূটনীতির সাফল্য শুরু হয়েছে। মানতেই হবে যে, এই দুটি দেশের কূটনৈতিক সাফল্যের কারণে ইউরোপে দীর্ঘ পঁচিশ বছর সার্বিক যুদ্ধাবস্থার সূচনা হয়নি। তাই বলে যুদ্ধ একেবারে এড়ানো যায় নি। বিবাদ হয়েছে স্পেন ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে, ইংল্যান্ডের সঙ্গে স্পেনের, এবং পরিশেষে, পোল্যান্ডের উত্তরাধিকার প্রশ্নে ফ্রান্স লড়েছে প্রুসিয়া এবং রাশিয়ার সঙ্গে। স্পেন ও স্যাভয় কাজ করেছে সহযোগী শক্তি হিসেবে। কিন্তু এই বিবাদ গুলিতে কঠিন অধ্যবসায় লক্ষ্য করা যায়নি। ব্যয়কুণ্ঠ কার্ডিনাল ফ্লিউরি এবং বলিষ্ঠ হিসেবি রবার্ট ওয়ালপোলের কাছে বেহিসেবি খরচ এবং যুদ্ধ করা অপচয় মাত্র, অতএব অবজ্ঞেয়। এই দুজনই মনে করতেন যুদ্ধ যদি করতেই হয় (এবং তারা যুদ্ধ একেবারে এড়িয়ে চলতে পারেন নি) তা হলে তা করতে হবে ন্যূনতম খরচে, যুদ্ধের পরিধি হবে সীমিত, এবং সম্ভাব্য প্রথম সুযোগেই যুদ্ধের ইতি টানতে হবে।

যারা মনে করেন ফ্রান্স এবং স্পেনের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় কয়েকটি কারণে, প্রথমত, তারা জাতির লাতিন এবং ক্যাথলিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, তাদের উপনিবেশগুলি ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, উভয় জাতি অভিন্ন বুরবঁ রাজবংশের প্রজা, তাছাড়া ইউট্রেখটের সন্ধির আওতায় নেদারল্যান্ডস স্পেনের হাত থেকে অস্ট্রিয়ার কাছে

হস্তান্তরের ফলে যে বিবাদের সৃষ্টি হয় তার অবসান ঘটে, অতঃপর যদি ফ্রান্স স্পেন নয় ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রীকে অধিকতর মূল্যবান মনে করে তাহলে এই শ্রেণীর লোকেরা নিশ্চয় বিস্ময় মানবেন। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, কোনো ব্যক্তির কারণে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক দারুণভাবে প্রভাবিত হতে পারে। চতুর্দশ লুই রেখে যান এক ভঙ্গুর শিশু পুত্র, অনেক দিন অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কেটেছে যে এই শিশু পুত্র শেষ পর্যন্ত সাবালকত্বে পৌঁছতে পারবে কিনা। তাছাড়া ১৭২৯ সালে ডাফিনের জন্ম হওয়ার আগে নিশ্চিত হওয়া যায় নি যে প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী পাওয়া যাবে কি যাবে না। এই সব ঘটনার বিরতিকালে আশংকা করা হয় যে স্পেনের প্রথম বুর্বর রাজা পঞ্চম ফিলিপ ফরাসি সিংহাসনের উপর দাবি প্রত্যাহারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করলেও, এক সময় ফরাসি রাজার মুকুট দাবি করে বসতে পারেন। এদিকে প্যারিসের কেউ ফিলিপকে চায়নি। ফলে একটা আশংকা জাগে যে তিনি ভার্সাই-এর সঙ্গে মাদ্রিদের বিনিময় করতে পারেন। এজন্যই দুটি বুঁরব রাজবংশের মধ্যে বিবাদের বীজ বোনা হয়ে যায়; এজন্যই, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যেকার অনিশ্চিত বন্ধুত্বের প্রতি সমর্থন তৈরি হয়।

ইউরোপের সাধারণ বিধানের প্রতি প্রথম বিপদ আসে স্পেনের রাজা পঞ্চম ফিলিপের উচ্চাভিলাষী দ্বিতীয় পত্নী এলিজাবেথ ফারনেসের (অথবা ফারনেজ) তরফ থেকে। তিনি তার পুত্রদের জন্য পারমা এবং তুসকানি নামক ডাচিদ্বয় থেকে পর্যাপ্ত নজরানা চান। প্রয়োজনে, এর জন্য তিনি সারা ইউরোপে আগুন জ্বালিয়ে দিতে রাজি আছেন। এই কর্তৃত্বব্যঞ্জক মহিলার হিংসাত্মক অভিলাষ সমর্থন করেন ইতালির জনৈক ভাইন ড্রেসারের মেধাবী ও শক্তিমান পুত্র। এর তেজ ও প্রেরণা, অদ্ভুৎ ও হীন চেহারা সত্ত্বেও, তার পছন্দকৃত দেশের লোকেরা তাকে দীর্ঘকাল মনে রেখেছে। কার্ডিনাল অলবেরনির স্বপ্নগুলি যদি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হতো তাহলে অস্ট্রীয়দের ইতালি থেকে বিতাড়িত হতে হতো, হ্যানোভারবাসীরা ইংল্যান্ডে থাকতে পারতেন না, রিজেন্টকে বিদায় জানাতে হতো ফ্রান্সকে। উপরন্তু তিনটি দেশই চলে যেত পুনরুজ্জীবিত স্পেনের প্রভাবাধীনে ও নিয়ন্ত্রণে। কার্ডিনালের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাঞ্চাল করে দেয় ফরাসি এবং ইংরেজ সরকারদ্বয়। সিসিলির উপকূলের অদূরে স্পেনীয়দের একটি নৌবহর ধ্বংস করে দেয় ইংরেজদের নৌবাহিনী; অপর একটি নৌবহর এগিয়ে আসছিলো স্কটিশ জ্যাকবপন্থিদের সাহায্য করার জন্য। বিস্কে উপসাগরে উক্ত নৌবহর ঝড়ের মুখে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এ দিকে রিজেন্টকে অপহরণ করার ষড়যন্ত্র চলছিলো। প্যারিসে উক্ত ষড়যন্ত্রের খবর ফাঁস হয়ে যায়। অস্ট্রীয়রা যখন হলি সি-র (Holy See) মদদে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, তখন কার্ডিনাল অস্ট্রীয়দের আঘাত করে বসেন। এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি কিছুমাত্র বিবেকের দংশন বোধ করেন নি। কিংবা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের যৌথ চাপের ফলে তিনি স্পেনীয় রাজদরবারের চাকুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তার কোনো পরিকল্পনাই সফল হয়নি, উপরন্তু তার পতনের ফলে (১৭১৯) ইউট্রেখট সন্ধির ব্যবস্থাদি ব্যাপক পরিবর্তনের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অকুতোভয় ও চিকিৎসাতীত এলিজাবেথ ফারনেস তাই বলে তার দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করেন নি। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ পরিচালনা করে অলবেরনি যে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিলেন, স্পেনের অপর একজন বিদেশ মন্ত্রী ওলন্দাজ রিপার্ডা (Ripperda) তা অর্জন করতে চেষ্টা করেন ভিয়েনা রাজদরবারের সঙ্গে বোঝাপড়ার

মাধ্যমে। ইউরোপ মহাদেশ ফের সার্বিক যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। ফের হ্যাপ্সবুর্গদের আধিপত্যের ভূত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, ফের হ্যানোভার রাজবংশ ক্ষমতাসীন ছিল এবং ইংল্যান্ডের বৈদেশিক শত্রুদের মধ্যে গোপন বোঝাপড়ার দরুন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। তথাপি আরো একবার ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বিজ্ঞ শাসকরা ইউরোপে শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হন।

এই সময় অস্ট্রীয়ার যিনি শাসনকর্তা ছিলেন তাকে ইংল্যান্ড স্পেনের সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অথচ লোকক্ষয় ও ধনক্ষয় হয় প্রচুর, ইংল্যান্ডের পক্ষে। ষষ্ঠ চার্লস অপ্রত্যাশিতভাবে ভিয়েনায় তার ভ্রাতা জোসেফের স্থলাভিষিক্ত হন। এই চার্লস ছিলেন হ্যাবসবার্গ বংশের কঠিন মাটিতে গড়া, অতীতে সাহায্য লাভের জন্য মোটেই কৃতজ্ঞ নন, অতীতে উত্থাপিত সিংহাসনের প্রতি দাবি পরিত্যাগের মানাবৃত্তিও তার নেই। তিনি এতটা নির্বোধ ছিলেন যে, একটা ঘটনা না ঘটলে ইউরোপে তিনি এলিজাবেথ ফারনেসের মতোই হয়তো বড় ধরনের গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে ফেলতেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক, একমাত্র কন্যার পিতা। স্যালিক ল অনুসারে তার কন্যা অস্ট্রীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। ফলে তিনি ইউরোপের নেতৃস্থানীয় দেশসমূহের সম্মতি আদায় করেন যে তার মৃত্যুর পর তদীয় কন্যা মারিয়া থেরেসা অস্ট্রীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারবে প্রাগমেটিক স্যাংশন অনুসারে। অতঃপর মারিয়া থেরেসার হ্যাবসবার্গ রাজবংশের উত্তরাধিকারী হতে আইনগত কোনো বাধা থাকবে না। যে সার্বভৌম নৃপতি অন্যদের কাছ থেকে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব অনুসন্ধানে ব্যস্ত সে কখনো সুবিধা আদায়ের জন্য উপযোগী অবস্থানে থাকতে পারে না। লন্ডন ও প্যারিসের ঝানু কূটনীতিকদের এটা বোঝার জন্য কিছুমাত্র সময় লাগেনি যে, দরকষাকষি করার জন্য হাতের কাছে কতো বড়ো সুযোগ এসে গেল। রবার্ট ওয়ালপোলের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে চার্লস কার্যত অস্টেন্ড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপ বন্ধ করে দেন। এই কোম্পানি ভারত মহাসাগরে ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ফরাসিরা কঠিন মনোভাবের পরিচয় দেয়। তারা সফলও হয় অনেক বেশি। সম্রাটের প্রয়োজনকে কাজে লাগিয়ে তাদের বিচক্ষণ প্রধান মন্ত্রী কার্ডিনাল ফ্লিউরি লরেন প্রদেশে বিরাট সুবিধা আদায় করেন।

শেষোক্ত সুবিধা আদায় করতে গিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত এবং সীমিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সময়টা ছিলো কূটনৈতিক সংযম ও সার্বিক উন্নতির। সে জন্যই যুদ্ধ ব্যাপকতা লাভ করেনি। পোল্যান্ডে শুরু হয় উত্তরাধিকার নির্বাচনের প্রশ্নে যুদ্ধ। কারণ ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুই বিয়ে করেন পোল্যান্ডের ক্ষমতাচ্যুত রাজা স্ট্যানিস্লস লেসঝিনস্কির কন্যা মেরি-কে। তিনি এখন লেসঝিনস্কিকে পোল্যান্ডের সিংহাসনে পুনরায় ক্ষমতাসীন দেখতে চান। কার্ডিনাল ফ্লিউরি পরিষ্কার দেখতে পান যে পঞ্চদশ লুইর এই কর্মপন্থা অবলম্বন নির্বোধসুলভ আচরণ মাত্র। কারণ রাশিয়া পক্ষাবলম্বন করবে অস্ট্রিয়ার, স্যাক্সন প্রার্থী অগাস্টাসের সমর্থনে। রুশ বাহিনী এর জন্য প্রস্তুত। অথচ পোল্যান্ড থেকে ফ্রান্সের অবস্থান কতো দূরে।

দূর পোল্যান্ডের সমতল ভূমিতে ফ্রান্সের সামরিক লক্ষ্য হাসিল হওয়ার চিন্তা অলীক কল্পনা মাত্র। হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের ইতালীয় অধিরাজ্য এবং রাইন বরাবর অবস্থিত অধিরাজ্যগুলি বরং হাতের কাছে রয়েছে। এগুলি করায়ত্ত করার চিন্তা অধিকতর বাস্তবসম্মত। বস্তুত ইতালীয় ভূমিতেই পোল্যান্ডের উত্তরাধিকার প্রশ্নে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ প্রকৃত

প্রস্তাবে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ফ্রান্স, স্পেন ও স্যাভয়ের নামমাত্র সাহায্যে, প্রতিপক্ষের উপর প্রবল আঘাত হানতে সমর্থ হয়; যদিও ভাগ্যের চাকা কোনো পর্যায়ে স্থির অবস্থায় ছিলো না। জেনারেল মন্টেমারের অধীনে স্পেনীয় বাহিনী নেপলস থেকে অস্ট্রীয়দের বিতাড়িত করে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন দুর্ভাগ্যপীড়িত নিওপলিটান বুরবঁ রাজবংশ। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্পেনে গ্লাডস্টোন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন; অতঃপর গ্যারিবল্ডির রেড শার্টের দল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

নেপলস রাজ্য বিজয় ছিলো টিলেঢালাভাবে পরিচালিত সীমিত পরিসরের এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় অর্জন, এই যুদ্ধের ইতিও টানা হয় প্রথম সুযোগেই। ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড এই বিবাদে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলে সম্রাট স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, এবং যেহেতু স্পেনীয় সাম্রাজ্যের বিজয় ইতালিতে ব্যর্থতার দরুন একটা ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়, তাই ভিয়েনার রাজদরবার কার্ডিনাল ফ্লিউরির প্রস্তাবে গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে যে সন্ধি হয় এবং যা ভিয়েনার তৃতীয় সন্ধি নামে পরিচিতি লাভ করে এবং উক্ত বয়োবৃদ্ধ যাজকের প্রচেষ্টায় পোলিস যুদ্ধের অবসান ঘটে, তাকে ন্যায়সংগতভাবে ফরাসি কূটনীতির সুন্দর আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও ফ্লিউরি এ ব্যাপারে যথারীতি ব্যয়কুণ্ঠার পরিচয় দেন, কোনো দুঃসাহসিক উদ্যোগও গ্রহণ করেন নি, তবু তিনি এই যুক্তিবিবর্জিত এবং অজনপ্রিয় যুদ্ধ থেকে বিরাট সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হন। সাব্যস্ত হয় যে লরেনের ডিউক ফ্রান্সিস মারিয়া থেরেসাকে বিয়ে করবে, এবং মেডিচি বংশের শেষ শাসকের মৃত্যুর পর তিনি তুসকানির শাসক হবেন। এইসব উজ্জ্বল সম্ভাবনার বিনিময়ে ফ্রান্সিস লরেনের ডিউকের আসন পরিত্যাগ করবেন স্ট্যানিসের অনুকূলে। শুধু তাই নয়, উক্ত বৃদ্ধ পোলিশ রাজার মৃত্যুর পর প্রদেশটি ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হবে। ফরাসি ইতিহাসকারগণ সকল সময় নিজেদের গুণগান করেছেন এই মর্মে যে পোল্যান্ডে ফরাসি প্রত্যাশা তিক্ত ব্যর্থতা বরণ করলেও লরেন কুক্ষীগত করা সম্ভব হয় অসাধারণ কূটকৌশলের বদৌলতে। তবে এই অসম্ভব কাজটা সম্ভবপর হয় দু'টি কারণে, চার্লসের দরকার ছিলো প্র্যাগমেন্টিক স্যাংশনের প্রতি ফরাসি সম্মতি, আর রবার্ট ওয়ালপোল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে কোনো অবস্থাতেই শান্তিভঙ্গ হতে দেয়া যাবে না। কাজেই দেখা যায় যে, পোলিশ যুদ্ধের কারণে যেখানে গোটা ইউরোপকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াবার কথা সেখানে তার পরিসমাপ্তি ঘটে এখানে-সেখানে বিচ্ছিন্ন অবরোধ এবং খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে। এতে পরিবর্তনের মধ্যে শুধু এই ঘটে যে, নেপলসে হ্যাবসবার্গ রাজবংশের স্থলাভিষিক্ত হয় বুরবঁ রাজবংশ এবং লরেন প্রদেশ ফরাসি রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্তি নিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু ইউরেপের রাজনৈতিক মানচিত্র কার্যত অপরিবর্তিত থেকে যায়। এই পঁচিশ বছর ইউরোপীয় কূটনীতি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। এটি ছিলো সম্মেলনের (Congress) যুগ, তিন জাতি এবং চার জাতির মধ্যে মৈত্রীর সময়, সর্বত্র ছিলো যুদ্ধের বিপদ সংকেত, সকল ধরনের ষড়যন্ত্র এবং কূটচালাকি তো ছিলোই। কিন্তু এইসব অনিঃশেষ বিক্ষোভের পেছনে, সৌভাগ্যবশত, লন্ডন ও প্যারিসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা শান্তি রক্ষার নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। ইঙ্গ-ফরাসি বোঝাপড়ার সূচনা করেন সাহসী ইংরেজ ভদ্রলোক স্ট্যানহোপ জনৈক চতুর ফরাসি দুর্বৃত্ত ডুবোয়-এর সহযোগিতায়। তাদের কাজ সংহত করেন, এবং ধারা বজায় রাখেন অসাধারণ দুই রাষ্ট্রবিদ। এই দুই রাষ্ট্রবিদের মধ্যে যে চারিত্রিক বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেছে তা সচরাচর চোখে পড়ে না। কার্ডিনাল ফ্লিউরি ফ্রান্সের

প্রধান মন্ত্রী ছিলেন দীর্ঘকাল। চুয়াত্তর বছর বয়স থেকে একাশি বছর বয়স পর্যন্ত। স্যার রবার্ট ওয়ালপোল এর চেয়েও দীর্ঘকাল ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাঁর অস্তিত্ব বজায় রাখেন। একজন অতি কৃশ মননব্রতী, বিজ্ঞ, সহিষ্ণু, প্রশান্ত, কূটনৈতিক দ্রুদর্শিতায় তুলনারহিত, মৃদু, তার অবস্থান ছিলো জগতের সকল প্রকার বাগ্মিতা এবং অসদ্‌গুণের উর্ধ্বে। অপরজন ছিলেন স্থূল, আমোদপ্রিয়, নরফোক স্কোয়ার বা তুখোড়, কিন্তু তার যুগের সবচেয়ে কীর্তিখ্যাত আর্থিক ব্যাপারে এবং বিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে। সে কালে ইউরোপের যুদ্ধংদেহী প্রবৃত্তি দমনের উপযোগী রাষ্ট্রবিদের দরকার ছিলো। এই দু'জনকে উক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উভয়ে সর্বাগ্রে বিবেচনা করতেন জাতীয় স্বার্থের কথা। আর জাতীয় স্বার্থের কথা মনে রেখেই তারা অভিন্ন পথে চলেন, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার পক্ষে কাজ করেন।[১]

অষ্টাদশ শতকে সংঘটিত সশস্ত্র বিবাদগুলি জনপ্রিয় ধরনের কিংবা জাতিগত আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হয়নি, কোনো প্রসিদ্ধ সংবাদ সংস্থার সমর্থনও মেলেনি। জনগণকে যে যুদ্ধের খরচ বহন করতে হয় সেটা তাদের জন্য ছিলো দণ্ডস্বরূপ। কারণ এইসব যুদ্ধের সঙ্গে তাদের সুদূর সম্পর্কও ছিলো না। তাই বলে অষ্টাদশ শতকের সরকারগুলি বংশানুক্রমিক রাজত্ব রক্ষার জন্য মূলত সচেষ্ট হলেও বাইরের মতামত থেকে নিরাপদ দূরত্বে ছিলো না। ফরাসি রাজা অগ্নিশর্মা অভিজাত বর্গের কথা শুনতে বাধ্য হতেন। স্পেনের রাজতন্ত্র ইংরেজদের জিব্রালটার থেকে বিতাড়নের ব্যাপারে সকল সময় জনগণের অনুভূতির উপর নির্ভর করতে পারতেন। বংশানুক্রমিক শত্রুতাগুলি, অন্তত বড়ো মাপের গুলি, যতোই যুক্তিবিবর্জিত কিংবা সময়োপযোগী না হোক, যেমন ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে বিবাদ, কিংবা ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে বিবাদ যুক্তিসিদ্ধ কিংবা সময়োপযোগী ছিলো না, তবে এই শত্রুতাগুলির শেকড় জনগণের চেতনার গভীরে প্রথিত ছিলো, ফলে এসব এক প্রজন্মের মৌলিক কূটনীতি দ্বারা নিরাকরণ সম্ভব ছিলো না। স্যার ওয়ালপোল এবং কার্ডিনাল ফ্লিউরি তাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করেছেন ইউট্রেখ্‌ট এবং রাস্টডট-এর শান্তি চুক্তি অনুসারে গড়া ইউরোপীয় কাঠামো বজায় রাখতে। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, ইউরোপ কখনো স্থির কাঠামোয় আবদ্ধ থাকবে না, ইউরোপ সর্বদাই অস্থির এবং অশান্ত। ওয়ালপোল এবং ফ্লিউরির প্রশাসনের শেষ দিকে একটি চমকপ্রদ এবং অমিত শক্তির অধিকারী নতুন রাষ্ট্রসভা বীয় অস্তিত্বের ঘোষণা দেয় অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে। ইউরোপকে নিক্ষেপ করে সার্বিক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে। এই শক্তিটি হলো হেডারিক দ্য গ্রেটের প্রুসিয়া।

বিলেত দেশটি স্বাভাবিক অবস্থার ভেতর গড়ে ওঠে। প্রুসিয়া নামক রাষ্ট্রসভাকে তৈরি করতে হয়। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকেও জার্মানির রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায় নি যে এই শক্তিধর রাষ্ট্রসভার আবির্ভাব আসন্ন। অতঃপর হোয়েনযোলার্ন রাজবংশ ইউরোপীয় মঞ্চে হাজির করে একজন প্রকৃতই করিৎকর্মা ব্যক্তিকে (এই রাজবংশ ব্রান্ডেনবুর্গ শাসন করে আসছিলো ১৪১৭ সাল থেকে)। গ্রেট ইলেক্টর খেতাবে ভূষিত হেডারিক উইলিয়াম ফারবেলিনে ১৬৭৫ সালে সুইডিশদের পরাজিত করার পর (এমনিতে

---

১. ১৭৩১ সালের পর থেকে এই দুই দেশের মধ্যে যে বিভিন্ন কূটনৈতিক সম্পর্ক হয় তার সঙ্গে এই তথ্য সম্পর্কযুক্ত।

এটি বড়ো এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা নয়। সবত্র কানাকানি শুরু হয়ে যায় যে একজন বড়ো ধরনের মানুষের আবির্ভাব ঘটছে। তৎকালে দক্ষতার সঙ্গে সরকার পরিচালনার ব্যাপার অষ্টাদশ শতকের কাছে পরিষ্কার ছিলো না। কিন্তু ফ্রেডারিক উইলিয়াম ছিলেন সুদক্ষ প্রশাসক। নগণ্য, জনশূন্য এবং বিভক্ত একটি রাজ্যকে তিনি প্রায় আধুনিক রাষ্ট্রের রূপ দেন। এর জন্য তাকে ভিন্ন রাজ্যের লোকদের তার রাজ্যের অধিবাসী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হয়। তাছাড়া প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে তিনি আমূল সংস্কার সাধন করেন। করও তিনি ধার্য করতেন দেশের লোকদের ইচ্ছে মতো তৈরি করে নেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ফ্রেডারিক উইলিয়াম যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তাতে কোনো প্রকার আনাড়িপনা কিংবা অপেক্ষাকৃত কোনো ছিলো না। তিনি গঠন করেন সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, সিভিল সার্ভিস, উন্নতমানের ডাক ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান আয়কর প্রথা, এমন কি আফ্রিকায় উপনিবেশ। এসব তার উচ্চাভিলাষের সঠিক পরিচয় বহন করে। তাই বলে তার সকল উচ্চাভিলাষ বাস্তবায়িত হয়নি। তার গড়া উপনিবেশ ওলন্দাজদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে টেকেনি। নৌবাহিনীকে প্রকৃত শক্তি অর্জনের জন্য টিরপিৎস এবং দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়াম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে তার উচ্চাভিলাষের পরিচয় চিহ্নিত হয়ে যায়।

ফ্রেডারিক উইলিয়ামের উত্তরাধিকারীর কাছে ইলেক্টর খেতাব এখন আর যথেষ্ট মনে হয় না। প্রথম ফ্রেডারিক প্রুসিয়ার রাজা খেতাব লাভ করেন সম্রাটের কাছ থেকে। উপরন্তু রাজকীয় ইউরোপকে আতংকের মধ্যে ফেলে রাজমুকুট পরিধান করেন কনিজবার্গের ক্যাথিড্রালে। নতুন এই প্রটেস্ট্যান্ট রাজ্যের মৈত্রী আগ্রহের সঙ্গে কামনা করা হয়, এবং মার্লবরোর যুদ্ধে প্রুসীয়া অংশগ্রহণ করে, তাদের রক্তে সিক্ত হয় ব্লেনহেইম, র‍্যামিলিস এবং ওডেনার্ড।

এই রাজ্য দুর্বল ছিলো ভৌগোলিক কারণে বিভক্তির জন্য। মধ্যভাগে ব্রান্ডেনবুর্গ। পূর্ব দিকে কয়েকটি ভূখণ্ড পেরিয়ে অবস্থিত ডিউক শাসিত প্রুসিয়া। উক্ত ভূ-খণ্ডগুলি এক সময় ছিলো জার্মান, তবে ১৪৬৬ থেকে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত পোল্যান্ড শাসন করেছে। দূর পশ্চিম অঞ্চলে রাইনল্যান্ডের কয়েকটি ডাচি (ক্লিভিস, মার্ক এবং রেভেন্সবার্গ) ১৬৬৬ সাল থেকে গ্রেট ইলেক্টর শাসন করেন। এই ডাচিগুলির উপর তার পূর্ণ কর্তৃত্ব বর্তমান। অপরিকল্পিত এই রাষ্ট্রের বিভক্ত ও বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই, প্রয়োজনীয় কিংবা স্বাভাবিক। আকস্মিকভাবে এই ভূ-খণ্ডগুলি একত্রিত হয়েছে অভিন্ন নৃপতির অধীনে ; আকস্মিকভাবেই এই অভিন্ন সত্তা একাধিক সত্তায় পরিণত হতে পারে। ডিউক শাসিত প্রুসিয়া বা পূর্ব প্রুসিয়া চলেছে এক পথে ; ব্রান্ডেনবুর্গের পথ ছিলো ভিন্ন। পূর্ব প্রুসিয়া যে ভূ-খণ্ডের অংশ ছিলো সেখানকার আদিবাসীরা ছিলো প্রকৃতির সন্তান, হিদেন, অ-জার্মান। ত্রয়োদশ শতকে জার্মান নাইটের দল গায়ের জোরে এদের উপর খ্রিষ্ট ধর্ম চাপিয়ে দেয়, তারা এদের শাসন করে দীর্ঘ দুইশত বৎসর, অতঃপর নাইটের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় পোল্যান্ডের বর্ধমান সামরিক শক্তির আঘাতে ; পূর্ব প্রুসিয়া পরিণত হয় পোল্যান্ডের রাজার জাগিরে। ব্রান্ডেনবুর্গের গোড়ার দিককার ইতিহাস খুব প্রতিশ্রুতিশীল ছিলো না, শুধু হোয়েনযোলার্ন রাজবংশের পর এই অঞ্চল বিভক্তি, পুনঃবিভক্তি এবং বন্ধকী অবস্থা থেকে রক্ষা পায়। মূলত গোটা জার্মান অঞ্চলের অবস্থা ছিলো অভিন্ন এবং দুর্ভাগ্যজনক। ইউরোপীয় পরিবারগুলির মধ্যে হোয়েনযোর্লানরা ছিলো অন্যতম সমর্থ ও সুদক্ষ পরিবার। নুরেমবার্গের

বুরগ্রেভ থাকাকালে এই পরিবার সম্রাটের আনুকূল্য লাভ করেছে। তাদের ধ্বংসের উৎস ছিলো নগর থেকে আহরিত শুল্ক। ব্রান্ডেনবুর্গে তারা সূচনা করে কেলভিন মতবাদ, তখন ব্যাপারটা ছিলো একেবারে নতুন, সুসময়ে দীক্ষা গ্রহণ করে লুথারের মতবাদে, ফ্রান্স থেকে আগত কঠোর পরিশ্রমী উগানো শরণার্থীদের সমাদরে বরণ করার জন্য গ্রহণ করেন কেলভিন মতবাদ। লুথারান প্রজাদের প্রটেস্টান্ট মতবাদের অন্যান্য ধারার প্রতি সহনশীল করার জন্যও কেলভিন মতবাদ গ্রহণ করা হয়। কারণ এতে বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়া হবে, তদুপরি এ ধরনের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা লাভজনকও বটে। একটা রীতি অবশ্য তাদের আয়ত্তে ছিলো না ব্রান্ডেনবুর্গারেরা কখনো পূর্ব প্রুসিয়ার সুনজর কাড়তে পারে নি। এখানে লক্ষণীয় যে, ১৬১১ সালে পোল্যান্ডের রাজা যখন জন ক্যাসিমিরকে পোলিশ জাগির হিসেবে গ্রহণ করে, এবং ১৬৬০ সালে গ্রেট ইলেক্টর পূর্ণ সার্বভৌমত্বসহ ডাচি লাভ করেন, তখন পূর্ব প্রুসিয়া তীব্র অস্বস্তি বোধ করে। বাস্তবিকপক্ষে, পরবর্তীকালে বলপ্রয়োগ করে পূর্ব প্রুসিয়ার ডায়েটের (সংসদ) বিরোধিতা দূর করা হয়।

প্রুসীয়রা ছিলো ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। মহাকবি গ্যেটে, যিনি বাস করতেন ভেইমারে, বলতে গেলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রুসীয়দের সম্পর্কে মধ্য জার্মানদের অভিমত। তিনি বলেছেন যে প্রুসীয়রা বর্বর প্রকৃতির। এই অসাধারণ জাতির মধ্যে ছিলো অমার্জিত তেজ এবং কঠোর রুক্ষতা, মার্জিত এবং সংবেদনশীল স্যাক্সন, ফ্রাঙ্কোনিয়ান এবং বাইন ল্যান্ডারদের সঙ্গে এদের কোনো মিল ছিলো না। কি কারণে জাতি হিসেবে প্রুসীয়া বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, তাদের শিরায় শিরায় স্লাভ রক্ত প্রবাহিত বলে, নাকি উত্তর জার্মানির রুক্ষ আবহাওয়ার জন্য অথবা ভৌগোলিক সীমান্ত দ্বারা উক্ত রাজ্য সুরক্ষিত নয় বলে, প্রকৃতি প্রুসীয়দের মধ্যে কঠোর সামরিক ঐতিহ্য আরোপ করেছে বলে, নাকি এই সবগুলি কারণই তাদের মধ্যে নানাভাবে কাজ করেছে, তার সঠিক জবাব খুঁজে পাওয়া যায় না। এটাও বোঝা যায় না যে সবগুলি উপাদানই যদি কাজ করে থাকে তাহলে সেগুলি কি অনুপাতে কাজ করেছে। এখানে শুধু এটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্ধেক ফুরাবার আগেই গোটা জগৎ জেনে যায় যে এই প্রাণবন্ত এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক জাতির মধ্যে অনেক সদ্‌গুণাবলির ঘাটতি থাকলেও, তারা মিতব্যয়িতা, শৃঙ্খলা, অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতার কারণে এবং বীরের ন্যায় আত্মত্যাগে সক্ষম ছিলো বলে ইউরোপের রাষ্ট্রবিদদের সামনে একটা নতুন ও ভয়ানক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হতে সক্ষম হয়।

প্রুসীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রের সেবা করার মনোভাবটা খুব কাজ করেছে। অন্যান্য জার্মান জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এই ব্যাপারটা খুব লক্ষ্য করা যায় নি। শাসক শ্রেণী জনগণের বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে পারতেন না। কারণ জনগণের রাজনীতি ব্যাপারে আগ্রহের অভাব ছিলো। কিন্তু জনগণের আদেশ পালনে আগ্রহের ঘাটতি ছিলো না মোটেই। এদের কোনো দায়িত্ব প্রদান করা হলে যে তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করা হবে এ ব্যাপারে শাসক শ্রেণী নিশ্চিত ছিলেন। প্রুসিয়া বস্তুত শর্তহীন বিধানের (Categorical Imperative) দেশ। তবে ইমানুয়েল কান্টের কাজের জন্য কাজ মতবাদের অর্থে নয়। কর্তব্য যেন প্রুসীয়দের স্বভাবের মিশে আছে। তাছাড়া এই দেশে কাজের প্রতি শ্রদ্ধা যে কঠোরতা এবং সাফল্যের সঙ্গে আরোপ করা হয় তা অন্যত্র বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের

সত্ত প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা ছিলো অত্যন্ত উজ্জ্বল। কোনো রুশ জার মতো মিতব্যয়ী নৃপতি আশা করতে পারে না, কিংবা আশা করতে পারে না এরূপ সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ নৃপতি, যার মধ্যে জাতির শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলির সুন্দর সমাবেশ ঘটেছে।

প্রুশিয়া এই সাধারণে, কিন্তু একটু অহংস্বভাব রাজার শান্তিপূর্ণ রাজত্বের কাছে নানা কারণে ঋণী। প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম গঠন করেন একটি বিশাল, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশাসন, জনপ্রিয় ধরনের বিদ্যালয় ব্যবস্থা, কর আদায় এবং বাজেট তৈরির সুন্দর রীতি, এবং একটি পরিপূর্ণ অর্থ ভাণ্ডার। অথচ এই নৃপতির মন ছিলো ভ্রান্ত সংস্কারের, আচার-আচরণ গেঁয়ো, মেজাজ বর্বরসুলভ। তিনি তার বাহিনীর জন্য ক্রীতদাস সৈনা যোগাড় করতেন ক্রীতদাস সংগ্রহের কায়দায়। প্রচণ্ড দাঙ্গাবাজ মনোবৃত্তি তথা উন্মাদরোগগ্রস্ততার কারণে তার গৃহে শান্তি বলতে কিছু ছিলো না। ফ্রেডারিক উইলিয়মের পাশবিক মনোবৃত্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো বাইবেলের পুরাতন নিয়মের নৈতিকতা। ফলে তার প্রতিভাবান, অথচ দুর্বোধ্য পুত্রকে সাক্ষী হতে হয় একাধিক ক্রুর প্রকৃতির শাস্তির। এমনকি তার অনুরাগী সহযোগী এবং বন্ধুকে প্রেরণ করা হয় যমালয়ে। বস্তুত তাঁর জীবন্ত দেহকে বিভক্ত করা হয় কয়েক খণ্ডে।

জীবন সায়াহ্নে ফ্রেডারিক তার পিতার প্রতি ঐতিহাসিকের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এই পিতার বর্বরসুলভ অত্যাচারে তার বয়ঃসন্ধিকাল বিষিয়ে উঠেছিলো। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক লিখেছেন প্রথম ফ্রেডারিকের রাজত্বকালে বার্লিন উত্তর ইউরোপের এথেন্সে পরিণত হয়। প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ামের সময়ে পরিণত হয় স্পার্টায়। এর সরকারের প্রতিটি স্তম্ভ পুষ্ট হয় সামরিক আদর্শে। এই রাষ্ট্রের রাজধানী পরিণত হয় রোমকদের রণদেবতা মার্সের শক্তি কেন্দ্রে। সেনাবাহিনীর জন্য স্থাপিত প্রতিটি শিল্পকারখানা প্রভূত উন্নতি সাধন করে। বার্লিনে স্থাপন করা হয় গোলাবারুদ, কামান ও রাইফেল তৈরির একাধিক কারখানা। প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম নতুন কারখানা স্থাপনের চেয়ে অকেজো কারখানা বন্ধ করে দেয়ায় উৎসাহী ছিলেন বেশি। আগে শোক পালনের জন্য ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো । কারো শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে ব্যয় করা হতো ব্যাপক হারে। এসব রাষ্ট্রীয় খাতের অপচয় তিনি বন্ধ করে দেন। ঘোড়া ও ঘোড়াচালিত গাড়ি কালো কাপড়ে আচ্ছাদনের নিয়মের তিনি অবসান ঘটান। ভৃত্যদের মধ্যে কালো কাপড় বিতরণের প্রথাও তিনি রদ করেন। অতঃপর কারো মৃত্যু হতো নিঃশব্দে । সরকারের সামরিক চারিত্র্য বিভিন্ন কায়দা-কানুন ও রীতিনীতি প্রভাবিত করে। সমাজ পরিগ্রহ করে সামরিক চারিত্র্য। কেউ লম্বা কোট পরিধান করতে পারতেন না। রমণী তপর্ণের যুগের অবসান ঘটে। মহিলারা পরিত্যাগ করেন পুরুষের সমাজ, পুরুষ সমাজ ঘাটতি পূরিয়ে নেয় পানোৎসব, তামাক এবং বাজে রসিকতায় সময় কাটিয়ে।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলি

১. ডব্লিউ. ই. এইচ. লেকি: হিস্টোরি অব ইংল্যাণ্ড ইন দ্য এইটীন্থ সেনচুরি। আট খণ্ড-১৮৭৮-৯০।

২. বি. উইলিয়ামস : স্ট্যানহোপ। ১৯২১।
৩. ই. আর্মস্ট্রং : এলিযাবেথ ফারনেস। ১৮৯২।
৪. টি. কার্লাইল : লাইফ অব ফ্রেডারিক ॥ অব প্রুসিয়া।
৫. ই. ল্যাভিসে : Historie de France
৬. এফ. এস. অলিভার : দি এণ্ডেলস এডভেন্চার (১৯০০-১)
৭. Ocuvres historiqnes de Frederic le Grand ; Nouvelle edition. ১৮৫০ ; ॥, Histore de mon temp.
৮. এ. সোরেল : L' Europe et la Revolution Francaise. ১৮৮৫-১৯০৩।
৯. পি. ভাউচার : Sir Robert Walpole et la politique de Fleury. ১৯২৪।
১০. আর. লজ: গ্রেট বৃটেন অ্যান্ড প্রুসিয়া ইন দি এইটিনথ সেনচুরি। ১৯২৩।
১১. জে. এইচ. প্লাম্ব : স্যার রবার্ট ওয়ালপোল : দ্য মেকিং অব অ্যা স্টেটসম্যান। ১৯৫৬।
১২. পি. গ্যাম্বোট : ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট। অনু. আর. এ. বেল। ১৯৪১।

ইউরোপীয় যুদ্ধ , ১৭৪০-৬৩

সাইলেসীয় দ্বন্দ্ব। ইংল্যান্ড এবং বুরবঁ রাজশক্তির মধ্যে নৌশক্তি এবং উপনিবেশ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও মারিয়া থেরেসা। অস্ট্রীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ। ইংল্যাণ্ডের হস্তক্ষেপ এবং প্রুসিয়ার পুনরায় অংশ গ্রহণ। ১৭৪৫ সাল। আই-লা-সাপলের শান্তি। কূটনৈতিক বিপ্লব। ফ্রান্সের ভুল নীতি। সাত বছরের যুদ্ধ। উইলিয়াম পিট। ফ্রেডারিকের বিস্ময়জনক কার্যকলাপ। প্রুসিয়ার উদ্ভবনের কারণসমূহ। ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বে ইংল্যান্ডের সুবিধা অর্জন। কানাডা। ভারত। রবার্ট ক্লাইভের প্রতিভা। প্রুসীয় শান্তি। ইংল্যাণ্ড ও প্রুসিয়ার মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল বিষয়ে তুলনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বছর গুলি চিহ্নিত হয়ে আছে দু'টি বিশাল দানবীয় সংঘর্ষের জন্য। এই সংঘর্ষের প্রথম ও শেষ পর্যায় আবর্তিত হয় দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে। প্রথমটি ছিলো অস্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার মধ্যে বিরোধ। এই বিরোধ ছিলো একই সঙ্গে চমকপ্রদ এবং হৃদয়বিদারক। কারণ ঘটনার নতুনত্বে সবাই অবাক মানে। অপর বিবাদটির প্রকৃতি ছিলো সর্ব ইউরোপীয় এবং সুপরিচিত। অস্ট্রীয় উত্তরাধিকার প্রশ্নে যুদ্ধ এবং সপ্ত বর্ষের যুদ্ধের উৎস ছিলো অভিন্ন। ১৭৪০ সালে প্রুসিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক স্বীয় তরবারি কোষমুক্ত করেন সাইলেসিয়া কুক্ষীগত করে ইউরোপে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ার জন্য। ১৭৫৬ সালে তিনি দ্বিতীয় বার ভয়াবহ যুদ্ধের সূচনা করেন এই ভয় থেকে যে পাছে সাইলেসিয়া তার অধিকার থেকে কেড়ে নেয়া হয়। সাইলেসিয়ার ছিলো লিনেন ইণ্ডাস্ট্রি, আকরিক লোহা, এবং বাণিজ্যিক জলপথ। ফলে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে প্রদেশটি, ক্যাথলিক অষ্ট্রিয়াকে এক পক্ষে এবং রুক্ষ, ভুঁইকোড়, প্রটেস্ট্যান্ট প্রুসিয়াকে দাঁড় করায় অপর পক্ষে। আর একবার অগ্নিসংযোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সকল ধরনের রাজনৈতিক ক্ষুধা চাঙা হয়। প্রশ্নাতীত রাজনৈতিক সীমান্তগুলি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। মহাদেশের প্রায় পুরোটা বিবাদে জড়িত হয়ে পড়ে, রক্ত ও সম্পদের অপচয়ের কোনো সীমা থাকে না। ভাগ্যের বিরাট উত্থান পতন ঘটে বার-বার। এক সময় মনে হয় অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য ভূপাতিত হবে। আবার মনে হয় ফ্রান্স কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং হল্যান্ড ও লেদারল্যাণ্ড ফ্রান্স কুক্ষীগত করবে। এক সময় এমনও মনে হয় যে রুশ ও অস্ট্রীয়দের সমবেত শক্তি প্রুসিয়াকে পরাস্ত করবে। অথচ এইসব হিংস্র দোলাচলের মধ্যেও ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। এই পনেরো বছরের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে সাইলেসিয়া প্রুসিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়া ভিন্ন কিছু ঘটেনি। সাইলেসিয়া প্রুসিয়া যুদ্ধের সূচনাতেই কুক্ষীগত করে ইতিহাসের জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে। তবে প্রদেশটিকে অধিকারভুক্ত রাখা সম্ভব হয় একজন বিরাট সৈনিকের প্রতিভা এবং একাগ্রচিত্ততার জন্য। এই সৈনিককে লড়তে হয় এক গুচ্ছ শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

হতঃমধ্যে একেবারে ভিন্ন কারণে এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে একটি বিবাদের সূচনা হয়। একপক্ষে ইংল্যাণ্ড, অপরপক্ষে বাণিজ্যিক ও নৌশক্তি সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেন ও ফ্রান্স। ইংল্যান্ড এবং স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ বাধে ১৭৩৯ সালে, স্পেনীয়দের নৌবহর অনুসন্ধানের অধিকার বিবাদের মূলে কাজ করে। এই যুদ্ধে অনতিবিলম্বে ফ্রান্স জড়িত হয়ে পড়ে, ফলে সংকট আরো ঘনীভূত হয়। এখানে লক্ষ্য করবার মতো ব্যাপার হলো, এই সংকট বা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের জন্য লন্ডন, প্যারিস কিংবা মাদ্রিদের কোনো রাষ্ট্রবিদ দায়ী নয়। গভীর সমুদ্রে যখন ইংরেজরা স্পেনীয় বা ফরাসিদের দেখতে পায় তখন তারা বোঝে যে প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা শত্রুর সম্মুখীন হয়েছে। এটি রাজদরবার কিংবা মন্ত্রিসভার মধ্যে বিবাদের ব্যাপার ছিলো না। এটি ছিলো গভীর সমুদ্রে উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিবাদ। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে নাবিক ও সওদাগর, চোরাকারবারি ও ভাড়াটে সৈনিক, করাতি, বসতি স্থাপনকারী, স্বাধীন বণিক, প্রতিদ্বন্দ্বী বাণিজ্যিক সংস্থা ইত্যাদির মধ্যে দ্বন্দ্ব। এক বিবাদে লিপ্ত হয়েছে স্পেনিশ মেইন কিংবা অকাডিয়ায় এবং নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে, কিংবা অহাইও বা সেইন্ট লরেন্সের তীর বরাবর, ভারতীয় জলন্ত সূর্যের নীচে(কর্নাটকের ধান খেত গুলিতে, অথবা বেঙ্গলের ইক্ষু ও আম্রকুঞ্জে)। অনিবার্য কারণেই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা, এসিয়া এবং আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন কিংবা প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অ্যাংলো-স্যাকসন এবং তাদের লাতিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করেছে। অননুমোদিত বিবাদ অননুমোদিত সার্বিক যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। স্যার রবার্ট ওয়ালপোল বৃথাই চেষ্টা করেন, ১৭৩৯ সালে স্পেনীয়দের তল্লাসির অধিকার ব্যাপারে যাতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে না হয়। পাল্টা দাবির কাছে নতি স্বীকার করে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। পার্লামেন্টে বিরোধী দলও গণ দাবির সমর্থনে মুখর হয়ে ওঠে। স্পেনিশ মেইনে ইংরেজদের সওদাগরি জাহাজ গুলিতে স্পেনীয় রক্ষীরা তল্লাশি চালাবে আর সিকল পড়া ইংরেজ নাবিকরা স্পেনীয়দের নোংরা কারাগারে পচে মরবে, এটুকুই যথেষ্ট ছিলো। ইংল্যান্ডে ইংরেজ নাবিক ও বণিকদের অভিযোগে গুরুত্ব দিয়ে শোনার লোকের অভাব হয়নি। এদিকে রটে যায় যে জনৈক স্পেনীয় দুর্বৃত্ত ক্যাপ্টেন জেনকিনের কান কেটে নিয়েছে। এতে গোটা দেশ ক্রোধে ফেটে পড়ে। এই ক্রোধ প্রশমনের এক মাত্র উপায় হলো অন্যায়ভাবে এবং নির্বোধের মতো যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান।

ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যে নৌ ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় তা মাঝে মাঝে সাময়িক বিরতি দিয়ে (কারণ আনুষ্ঠানিক বিবাদের বিরতির সময়ও অনানুষ্ঠানিক এবং স্থানীয়ভাবে বিবাদ চলতে থাকে) ১৭৬০ সালের প্যারিস শান্তি চুক্তি পর্যন্ত চলে। অতঃপর একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ঔপনিবেশিক আধিপত্যের রাজদণ্ড ফ্রান্সের হাত থেকে খসে বৃটেনের মতে চলে গিয়েছে। ভারতে, কানাডায় ক্লাইভ এবং উল্‌ফের ধন্যবাদার্হ বিজয়ের কারণে বৃটিশ প্রভাব-প্রতিপত্তি এখন গৌরবোজ্জ্বল এবং কোথাও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন নয়।

এই যে ঔপনিবেশিক শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন সূচিত হলো তার প্রকৃত তাৎপর্য সেকালে তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করা যায় নি। অথচ এটি ছিলো মানবিক ইতিহাসের একটি বড় ধরনের বিপ্লব। একটি মহাদেশীয় যুদ্ধ ব্যতিরেকে এ ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা সম্ভব ছিলো না। ইংরেজদের কি বাণিজ্যিক, কি রাজকীয় নৌবাহিনীর জাহাজের সংখ্যা ছিলো ফ্রান্স ও স্পেনের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশি। কারণ ইংল্যান্ডের কাছে, তবে দ্বিতীয়

ফ্রান্সের কাছে নয়, অন্যান্যকারে স্পেন নৌশক্তি এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থ। পক্ষান্তরে, ফ্রান্স ও স্পেন সমুদ্রের গুরুত্বকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে স্থলভাগে শক্তি বৃদ্ধির উপর জোর দিত বেশি। ফলে সমগ্র ইতিহাসে যতগুলি ভুল করে তার মধ্যে সবচেয়ে বিপর্যয়কর ভুল ছিলো ১৭৪০ সালে মারিয়া থেরেসার বিরুদ্ধে আক্রমণে প্রুসিয়ার ফ্রেডারিকের পক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের ফলে ফ্রান্স মহাদেশীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। শুরু হতে থাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট তার সামনে তুলে ধরা হয় নানা প্রলোভন, তাকে নানাবিধ ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়, একাধিক ক্ষেত্রে তাকে বিসর্জন দিতে হয় স্বীয় স্বার্থ, ফলে সমুদ্র পারের তার লোকদের ওও একটা যুক্তি খুব বেশি রাখতে পারেনি। একই কারণে ফরাসি নৌবাহিনী অবহেলিত হয়। কানাডা এবং ভারত ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে উক্ত ক্ষতি পূরণে সমর্থ হয়নি। ইতিহাসের অন্যতম পরিহাস এই যে, ফরাসিদের যে ভুলের জন্য ইংরেজরা সামুদ্রিক জলভাগে একাধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় সেই একই ভুলের জন্য প্রুসিয়া সক্ষম হয় জার্মানিতে আধিপত্য কায়েমে।

ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত ভুল ছিলো বললে কম বলা হয়। বস্তুত এটি ছিলো একটি বড় ধরনের অপরাধ। ফ্রান্স আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাগমেটিক স্যাংশন মেনে নেয়। উক্ত স্যাংশন অনুসারে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে মারিয়া থেরেসা অস্ট্রীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। তবে ফ্রান্স বরাবরই সামরিক অভিজাততন্ত্রের হঠকারী আবেগের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। রাজা ও কার্ডিনাল ফ্লিউরির বিজ্ঞতাকে পাত্তা দেয়া হয়নি। মার্শাল বেলিয়ল (Belleisle) এবং তার উগ্র অনুসারীরা অভিমত পোষণ করেন যে পুরোনো শত্রুতা সাধনের সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না। অন্তত যখন সেই পুরোনো শত্রুকে নিঃসহায় এবং বন্ধুহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে তখন বিবেক এবং দূরদৃষ্টির মূল্য থাকা উচিত নয়। তাদের প্রশ্ন "সুযোগের কাছে প্রতিশ্রুতির মূল্য থাকতে পারে কি?" অবশেষে আন্তর্জাতিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পাপের জন্য সর্বাধিক মূল্য দিতে হয়। হয়তো এত বড় মূল্য দেয়ার ঘটনা ইতিহাসে কমই ঘটেছে।

পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার কুয়াসা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের চোখকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ঠাণ্ডা মাথার তরুণ ফ্রেডারিক জার্মান হিসেবে খারাপ হলেও, তিনি ছিলেন প্রুসিয়ার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, অস্ট্রিয়ার প্রতি ঈর্ষা বা শত্রুতার মনোভাব তার ছিলোনা। তার নিষ্ক্রিয় এবং একান্ত অরাজনৈতিক প্রজাকুলও পর রাজ্য গ্রাসের বাসনা কখনো পোষণ করেনি। কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিলো উচ্চাভিলাষের জন্য। একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী, কোষাগার পূর্ণ, জনগণ অনুগত, অতএব উক্ত হোয়েনযোলার্ন ছিলেন স্বীয় ভাগ্যের নিয়ন্তা। কোনো আনুগত্য, কারো প্রতি আনুগত্যই তার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তিনি যে কোনো পক্ষের অনুকূলে অস্ত্রধারণে প্রস্তুত ছিলেন, শুধু দেখতেন এতে প্রুসিয়ার স্বার্থ কতোটা চরিতার্থ হবে। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের রাজত্বের বিশেষ পরিচয় এই যে, তিনি রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে ইচ্ছামাফিক ঢেলে সাজাতে পারঙ্গম ছিলেন, এর জন্য ধর্ম কিংবা বীরধর্মের তোয়াক্কা করতেন না, চুক্তির বরখেলাপ করা তার কাছে কোনো ব্যাপারই ছিলোনা। জার্মান জাতির প্রতি অনুরাগ তার মধ্যে কখনো কাজ করেনি। আর জার্মান জনজীবনের জন্য এসবই ছিলো তার ন্যূনতম অবদান। তিনি গোটা জগৎটাকে দেখতেন স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে, ফূর্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়া তিনি পছন্দ করতেন না, ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, নিজেকে সব সময় প্রুশীয় রাষ্ট্রের পয়লা নম্বর ভৃত্য গণ্য করতেন, আর রণক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানে তিনি যে দোদাতার

পরিচয় দিতেন তার তুলনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয়না। এসব কৃতিত্বের জন্য গোটা বিশ্বের সম্ভ্রম কুড়াতে সমর্থ হন। জার্মানরা হয়তো তার মধ্যে অনেক ত্রুটি খুঁজে পাবে। কারণ তিনি প্রকাশ্যে পিতৃভূমির ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অবজ্ঞার মনোভাব ব্যক্ত করতেন। তবে প্রুসীয়রা সঠিক ছিলেন যে, এই মহান নৃপতিই ছিলেন তাদের রাষ্ট্রের জন্য সব প্রধান নির্মাতা। তাছাড়া তিনি দেশ ও দশের যে সেবা করেন তার সঠিক পরিমাপ একেবারে অসম্ভব। অতএব তারা কিছু ব্যাপার ক্ষমার চোখে দেখে। তারা ভুলে যায় যে এই মহান নৃপতি ধর্মের ব্যাপারে দ্রোহী, রাজনৈতিক ব্যাপারে ছিলেন অসূয়ক, বুদ্ধিজীবিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ভলতেয়ারের ভাবশিষ্য। প্রুসীয়রা শুধু বিবেচনার মধ্যে আনে যে এই বীর্যবান পুরুষ দ্বিতীয় ফ্রেডারিক প্রুসীয় সেনাবাহিনীকে এতটা শক্তিশালী করেছেন যে, ইউরোপের এমন কোনো দেশ নেই যে দেশ এই সেনাবাহিনীকে ভয় করে চলে না। উপরন্তু তিনি প্রুসিয়াকে পরিণত করেছেন সমরবাদী বা সামরিক রাষ্ট্রে। কয়েকটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ প্রুসিয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে করেছেন যুক্ত। প্রুসীয়রা তাকে প্রধানত সম্ভ্রম করে সর্বাধিনায়ক হিসেবে, যিনি সাধারণত দেশের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনেন, কিন্তু তিনি মহোত্তম দেশের দুঃসময়ে, পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলে অধিকতর উদ্ভাবনী দক্ষতার পরিচয় দেন সংকট অতিক্রমের ব্যাপারে। রাজা হিসেবে নানা সংকট কাটিয়ে দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শান্তি, দেশটিকে করেছেন নিরাপদ। কোনো শত্রুদেশই এই রাজ্যের জন্য বিপদের কারণ নয়। তাছাড়া জার্মানিতে প্রুসিয়া রাষ্ট্রের জন্য যে প্রাধান্য সৃষ্টি করেছেন তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সাহস ও শক্তি কোনো অন্য রাষ্ট্রের নেই। যাদের বিবেক নামক বস্তুটা রয়েছে তারা ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের কার্যকলাপ সুনজরে দেখতে পারেন না। ঐ নৃপতির যাত্রা শুরু হয় বিশ্বাস ভঙ্গ করে সাইলেসিয়া কুক্ষীগত করে। যাত্রাশেষে পোল্যান্ডের বিভাজন ঘটান। এদের বিবেক থেকে উত্থিত প্রশ্নের জবাবে বলা হয় যে সেকালের আন্তর্জাতিক নৈতিকতার ধরনটাই ছিলো ওরকম। তাছাড়া হোয়েনযোলার্ন সমকালীন অন্যান্য নৃপতির চেয়ে খারাপ কিছু করেন নি। বস্তুত প্রুসীয়রা ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের সমর্থনে বলতে চান যে উপেয় উপায়ের যাথার্থ প্রমাণ করে।

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উচ্চাভিলাষী ছিলেন বটে, তবে তা কখনো আকাশস্পর্শী ছিলো না। জনগণের কাছে তার দাবি ছিলো বিরাট, তবে তিনি ভাবতেন শুধু প্রুসীয়দের কথা, তার লক্ষ্যও ছিলো বাস্তবসম্মত। আবার তিনি শক্তির ভারসাম্যের সুবিধাদি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। যে ইউরোপের জন্য তিনি যুদ্ধ করেন সেই ইউরোপে প্রুসিয়া সাইলেসিয়ার জন্য শক্তিশালী হয়ে মুখোমুখি হয় অস্ট্রিয়ার। অথচ বলা চলে যে অস্ট্রিয়া অতিরিক্ত শক্তিধর ছিলো। কার্যত ইউরোপ ১৭৪৮ সালের আর-লা-শাপেল-এর শান্তি চুক্তি অনুসারে তার হাতে তুলে দেয়া হয়। প্রুসীয় বাহিনীকে কূটনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করে তিনি তার লক্ষ্য হাসিল করেন। একবার তিনি তার বাহিনীকে একটা হাঙ্গামায় জড়িত করেন, অতঃপর আকস্মিকভাবে প্রত্যাহার করে নেন, আবার হয়তো নিযুক্ত করেন পুরোনো শত্রুর বিরুদ্ধে। একবার তিনি অস্ট্রিয়াকে ফ্রান্সের হাত থেকে রক্ষা করেন সন্ধি প্রণয়ন করে ; আবার ফ্রান্সকে অস্ট্রিয়ার হাত থেকে বাঁচান স্বীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তার হস্তক্ষেপ এবং প্রত্যাহার ঘটনার চূড়ান্ত রূপ দান করে। ফলে ঐ আট বছরের সকল যুদ্ধমান নৃপতির মধ্যে একমাত্র ফ্রেডারিকই যৌক্তিকতার সঙ্গে সন্তুষ্টি বোধ করতে পারেন। আবার ঘরে

ফিরতে হয় শূন্য হাতে, একমাত্র ফ্রেডারিক পুরস্কার হিসেবে লাভ করেন সাইলেসিয়া। তবে ব্যাপারটা একেবারে নিভেজাল ছিলো না (মলম প্রলেপিত জায়গায় ঠাঁই করে নিয়েছিলো একটা মাছি) কারণ আরো দীর্ঘ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। নতুবা মারিয়া থেরেসার গর্বিত আত্মশক্তি পরিবর্তিত পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হবে না।

১৭৪০ সালের অক্টোবর মাসে সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তার মৃত্যুতে ইউরোপের জন্য একটা সুযোগের সৃষ্টি হয়। এখন ইউরোপ প্রদর্শন করতে পারবে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে মর্যাদা, বীরোচিত আচরণ এবং সরল বিশ্বাসের মতো ব্যাপারগুলি সমূলে নিরাকৃত হয়নি। তার একমাত্র কন্যা মারিয়া বিবাহিত তবে তার বয়স খুব বেশি নয়। রাজনীতি, রাজকার্য পরিচালনা ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা নেই বললে চলে। মারিয়া থেরেসার কোষাগার শূন্য, তার সেনাবাহিনী অত্যন্ত দুর্বল। হ্যাবসবার্গ রাজবংশের অখণ্ড উত্তরাধিকার হওয়ায় তার দাবি ইউরোপের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাজদরবার (ব্যাভারিয়া ছিলো ব্যতিক্রম) মেনে নেয়, এর জন্য প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যও দিতে হয়। অথচ তিনি যে অবলা, তার যে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তার পিতার কাছে প্রায় সবাই যে পবিত্র অঙ্গীকার করেছে, তার কোনোটাই হাঙ্গেরির রানীর অনুকূলে যায় নি। হ্যাবসবার্গ রাজবংশের সিংহাসনে আরোহণের পর বছরখানেক যেতে না যেতেই তিনি বেপরোয়া ভয়ানক দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি যে সিংহাসন লাভ করেছেন তা এবার রক্ষা করতে হবে। তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে একটি লোভী এবং স্বার্থান্ধ শক্তিজোট। এই জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই সব বৃহৎ শক্তি যারা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অঙ্গীকারের পক্ষে এক সময় জোর গলায় কথা বলেছেন।

সর্ব প্রথম আঘাত হানেন দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। বিনা উস্কানিতে তিনি সাইলেসিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মলভ্যিসের রণাঙ্গনে অস্ট্রিয়ার দুর্বলতা জগতের সামনে তুলে ধরেন প্রুসীয় বাহিনীর দৃঢ়তার সাহায্যে। এখন এটা মনে করা অসার কল্পনা হবে যে অস্ট্রিয়ার বিপর্যয়ের পর সংঘর্ষ বিস্তার লাভ করবে না। বস্তুত আকাশের সকল প্রান্ত থেকে শকুনেরা ভিড় জমাতে শুরু করে শিকারের অনুসন্ধানে। ফ্রান্স চায় অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ কেড়ে নিতে। ব্যাভারিয়া বাসনা পোষণ করে সম্রাটের মুকুট এবং পূর্বদিকে তার সীমানা সম্প্রসারণ। স্যাক্সনির ইলেক্টর (তিনি একই সঙ্গে পোল্যান্ডের রাজা) বিগঠনের হুমকির সম্মুখীন সাম্রাজ্যে ভাগ বসাতে চায়। অস্ট্রিয়া বিরোধী জোটে হ্যাবসবার্গ রাজবংশের চিরশত্রু ফ্রান্স আক্রমণের পুরোভাগে ভূমিকা পালন করে। তার দৃঢ় বিশ্বাস সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। নতুন ও অপ্রত্যাশিত প্রুসীয় শক্তির সহায়তায় ইউরোপে চিরস্থায়ী প্রাধান্য স্থাপন সম্ভব হবে। কিছুকাল দেশটির নকশা অনুসারে সব ঠিকঠাক চলে। তার সেনাবাহিনী বোহেমিয়ার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, কুক্ষীগত করে প্রাগ নগরী। অপরদিকে ব্যাভারিয়া ভিয়েনার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবস্থা রাখা হয় যে সাম্রাজ্যের যে মুকুট তিন শো বৎসরের অধিককাল হ্যাবসবার্গ রাজবংশের প্রধানের মাথায় শোভা পেয়েছে তা ব্যভারিয়ার চার্লস এলবার্টের মাথায় পড়িয়ে দেয়া হবে। এই চার্লস এলবার্ট মারিয়া থেরেসার খেতাব কুক্ষীগত করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, মারিয়া থেরেসার ভূখণ্ডে আক্রমণ পরিচালনার অভিলাষও তিনি পোষণ করতেন। মারিয়া থেরেসার দীর্ঘ, এবং বর্ণময় জীবনে,

মহাযুদ্ধের শেষ বৎসরে, অর্থাৎ ১৭৪১ সালের গ্রীষ্মকালে, অস্ট্রিয়ার ভাগ্য এতটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়নি।

অতঃপর ভাগ্যের উল্লেখযোগ্য উল্টোযাত্রা শুরু হয়। নিদারুণ দুর্দিনের সময় মারিয়া থেরেসা তার হাঙ্গেরীয় অনুগত প্রজাদের কাছে করুণ আবেদন জানান। হাঙ্গেরীয় বীর ও যুদ্ধপ্রিয় অভিজাত সম্প্রদায় তার আবেদনে প্রচণ্ড সাড়া দেয়। ব্যাভারীয়দের বিতাড়িত করা হয় মিউনিখ থেকে। ফরাসিদের ছেড়ে দিতে হয় প্রাগ নগরীর উপর দখল। ভাগ্যের অদ্বিতীয় পরিহাস, নতুন সম্রাট চার্লস এলবার্ট একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। উক্ত সন্ধির শর্তানুসারে তিনি অস্ট্রিয় সিংহাসনের দাবিদার হতে পারবেন না। তাছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিরাজ্যগুলি হাঙ্গেরির রানীর হাতে তুলে দেবেন এবং এই অবস্থা সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত চলবে। ১৭৪২ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে ঘটনা সম্পূর্ণ হয়। ফ্রান্সের আগ্রাসী নীতি মারিয়া থেরেসার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বোহেমিয়া আক্রমণকারী এখন আলসেস ও লরেন প্রতিরক্ষার জন্য তৎপর। ইংল্যান্ড ও সার্দিনিয়া অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দিয়েছে। তাছাড়া ডেটিংগেনের অনুকূল যুদ্ধে ১৭৪৩ সালে (এই যুদ্ধে ইংল্যান্ডের রাজা শেষবারের মতো সশরীরে অংশগ্রহণ করেন) এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে এই তো সুবর্ণ সুযোগ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার। এই আক্রমণ পরিচালনা করবে দুটি বাহিনী। একটি বাহিনী আক্রমণ করবে রাইনের মধ্যভাগ থেকে, অপরটি আপার রাইন অঞ্চল থেকে।

এই যে বিরাট ও আকস্মিক পরিবর্তন সাধিত হলো তার প্রধান কারণ খুঁজতে হবে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আচরণে। ফ্রেডারিক সাইলেসিয়া ধরে রাখতে চান। কিন্তু এর জন্য, বিনা প্রয়োজনে, একটি কানাকড়ি কিংবা একটি প্রুসীয় জীবন ব্যয় করতে রাজী নন। তিনি যে কোনো সময় হাঙ্গেরির রানীর সঙ্গে সমঝোতা করতে প্রস্তুত। তবে সাইলেসিয়া তার দখলে থাকতে হবে। এই কথার ভিত্তিতে তিনি ১৭৪১ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধে ক্ষান্তি দেন। একই কথার ভিত্তিতে তিনি আবার যুদ্ধে ক্ষান্তি দেন ১৭৪২ সালের জুলাই মাসে, তবে এবার অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে সাক্সনিকে দলভুক্ত করেন। বার্লিন শান্তিচুক্তি মোতাবেক ভয়াবহ শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণের আশংকা থেকে মুক্ত হয়ে, উপরন্তু কয়েকটি বিস্ময়কর বিজয় অর্জন করে উল্লসিত হয়ে মারিয়া থেরেসা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে এই সাফল্যকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে হবে। তার পূর্ণগর্ভ কল্পনায় দেখতে পান যে সবচেয়ে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে যদি ব্যাভারিয়া কুক্ষীগত করা যায়, আলসেস এবং লরেনকে করা যায় তার সাম্রাজ্যভুক্ত, আর পুনরায় দখল কায়েম করা যায় নেপলস এবং সাইলেসিয়ার উপর। যে যুদ্ধের সূচনা করা হয়, পরিকল্পনা মোতাবেক, অস্ট্রিয়ার ধ্বংস সাধনের জন্য, তা প্রকারান্তরে ফরাসি রাজ্য বিগঠনের রূপ পরিগ্রহ করে। ক্রোধের উত্তাপের বশবর্তী হয়ে এবং কয়েকটি বিজয় অর্জনের ফলে আত্মহারা হয়ে হাঙ্গেরির রানী শান্তি ব্যাপারটাকেই বিদ্রূপের বস্তু বলে গণ্য করতে শুরু করেন।

এ ধরনের অপ্রশস্য মনোভাবের সময়ে ইংল্যান্ড দেশের প্রকৃত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের উপদেশ উপেক্ষা করে মারিয়া থেরেসার পক্ষাবলম্বন করে। ওয়ালপোল স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। এবার ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ প্রক্রিয়ারও বিরোধিতা শুরু করেন। কারণ তিনি পরিষ্কার দেখতে পান যে, এ ধরনের যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ার প্রথম ফলশ্রুতি এই দাঁড়াবে যে, জ্যাকবপন্থিদের উত্থান ঘটবে, এতে হ্যানোভার রাজবংশ ধুলোয় মিশে যেতে

পরে কিন্তু সময় শান্তির অনুকূল ছিলো না, শান্তি ব্যাপারটাকে তখন মনে করা হতো [illegible] ফলে ওয়ালপোলকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা হয়, যাতে এমন [illegible] ক্ষমতা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো যায় যারা দেশ ও দেশের রাজার মনোভাবের অনুকূলে কাজ করবে। কার্টেরেট ছিলেন সবচেয়ে সার্থকাম ব্যক্তি, তবে বিজ্ঞতার জন্য তিনি সুখ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। তিনি ক্ষমতার আসনে আরূঢ় হন এবং স্বীয় প্রভুর সহযোগিতায় (যিনি সর্বোপরি ছিলেন হ্যানোভারিয়ান) দেশটিকে মহাদেশীয় যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেন। ওয়ম-এ একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় ১৭৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং সার্দিনিয়ার মধ্যে। এই সন্ধিবলে পুনরুজ্জীবিত করা হয় মহামৈত্রী জোট। ইংল্যান্ড জোটের প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য যোগাবে। ফ্রান্সের উচ্চাভিলাষের পেছনে কাঁটা বিছানো এই জোটের অনন্য লক্ষ্য। মহামৈত্রীর সদস্যরা হিসাব কষে ফ্রেডারিককে বাদ দিয়ে। উক্ত বিচক্ষণ নৃপতি নিদারুণ উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে পশ্চিমাঞ্চলে অস্ট্রিয়া একের পর এক জয় লাভ করছে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, "রাজনীতিতে মারাত্মক ভুল করা হয় শত্রুর সঙ্গে সমঝোতাকে বিশ্বাস করা হলে।" ফ্রেডারিক মারিয়া থেরেসাকে বিশ্বাস করেন না। বার্লিন শান্তির প্রতি মারিয়া থেরেসা আস্থাশীল, একথা বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, তিনি মনে করেন উক্ত রানী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কথা ভাবছেন। ফ্রেডারিক এ ব্যাপারে নিঃসংশয়। তদনুসারে, লরেনের প্রিন্স চার্লসের অধীনে ইমপিরিয়াল বাহিনী যখন আলসেসে ব্যস্ত তখন ফ্রেডারিক সকল নীতি বিসর্জন দিয়ে শান্তিভঙ্গ করেন। আক্রমণ পরিচালনা করেন বোহেমিয়ার বিরুদ্ধে, উপরন্তু কুক্ষীগত করেন প্রাগ নগরী (সেপ্টেম্বর ১৬, ১৭৪৪)। তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধের সামগ্রিক চেহারা বদলে যায়। ফ্রেডারিক পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করায় অস্ট্রিয়া আবার আত্মরক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ফ্রান্স মুক্ত হয় গুরুতর বিপদ থেকে। ফ্রান্সের সামনে এখন একাধিক চকচকে পুরস্কারের হাতছানি। পঞ্চদশ লুই-র সরকার পরিষ্কার দেখতে পায় বেলজিয়াম গ্রাস করা এখন কোনো ব্যাপারই নয়। রাজা জর্জকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় অনায়াসে, সর্বোপরি ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসানো যায় ক্যাথলিক রাজবংশ। প্রিন্স মরিস দ্য স্যাক্স নামক জনৈক সমরনেতার অধীনে একটি ফরাসি বাহিনী অস্ট্রীয় নেদারল্যান্ডে ঢুকে পড়ে, এবং দুবার (১৭৪৪ সালের মে মাসে ফর্তেনয়তে এবং ১৭৪৬ সালের ২ জুলাই লৌফেল্ডে) ইংরেজ অধিনায়ককে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করে।

তবু ফরাসিদের মহাপরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তার জন্য দায়ী দু'টি কারণ। প্রথমত ইংরেজদের জলভাগে একচ্ছত্র প্রাধান্য। অপর কারণটি হলো, ইংরেজদের প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ। চ্যানেলে আক্রমণকারী রণবহরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। বেসরকারি ইংরেজ রণবহর ফরাসিদের বাণিজ্য ধ্বংস করে দেয়। যে চার্লস এডওয়ার্ড ১৭৪৫ সালে স্কটিশ পার্বত্য প্রদেশে স্টুয়ার্ট পতাকা উড়িয়ে দেন তাকে এই তিক্ত সত্য আস্বাদন করতে বলা হয় যে অজনপ্রিয় হ্যানোভারিয়ান রাজা এখনো অলস, নিশ্চেষ্ট, অথচ প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগী জনগণের নিষ্ক্রিয় সমর্থন লাভে সক্ষম। জ্যাকবপন্থা অনেক আকাশ-ছোঁয়া প্রত্যাশা এবং আনুগত্যের দাবী করে, তবে তাদের সকল আশা ভূলুণ্ঠিত হয় কুল্লোডেনের রণক্ষেত্রে ১৭৪৬ সালের ১৬ এপ্রিল। তবে তাদের সকল ভরসা তখনই বিনষ্ট হয় যখন ইংরেজরা প্রিন্স চার্লির পাশে দাঁড়াতে অস্বীকার করে। এ সময় উক্ত প্রিন্স কার্লাইল

থেকে দক্ষিণ অভিমুখে ডার্বির দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় জর্জের প্রজাকুলের অনুরাগ দাবি করার অধিকার খুব বেশি ছিলো না, তবে তার সিংহাসন ছিলো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্কটল্যান্ডের পার্বত্য প্রদেশের জন্য গেলিক অস্ত্রধারীদের ক্ষুদ্র বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিলো না তাকে সিংহাসনচ্যুত করা। দুঃসাহসিক অভিযান (স্যার ওয়ালটার স্কটের উপন্যাসে যার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে) প্রটেস্ট্যান্ট রাজতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। পার্বত্য প্রদেশগুলিকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা ছিলো ১৭৪৫ সালের সবচেয়ে বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল। মার্শাল ওয়াড-এর অশ্বারোহী বাহিনী এবং পিটের পার্বত্য বাহিনী অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন সম্পন্ন করে এবং উত্তর স্কটল্যান্ডের অধিবাসীদের সামনে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রভূত সম্পদ এবং নানামুখী সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

উত্তরাঞ্চলের রণাঙ্গনে কোনো পক্ষই বিশেষ একটা সুবিধা করতে পারেনি। ফ্রেডারিক যদি বোহেমিয়ার উপর তার নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে বাধ্য হয়ে থাকেন তবে তিনি শত্রুদের হোয়েফ্রিডবার্গ এবং সর (Sohr)-এর রণাঙ্গনে পরাস্ত করতে সমর্থ হন, এবং এসব ব্যক্তিগত বিজয়ের উপর নির্ভর করে, এবং তার স্যাক্সন মিত্রদের একটি বিজয়ের সহায়তায় তিনি অস্ট্রীয়দের ড্রেসডেনে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এতে সাইলেসিয়া এবং গ্লাৎসের উপর তার দখল নিশ্চিত হয়ে যায় (১৭৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে)।

সমান হিংস্র, সমান অনিশ্চিত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয় আলপস পর্বতমালার দক্ষিণাঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য। এখানে অস্ট্রিয়া ও সাভয় যুদ্ধ করে দুটি বুরবঁ রাজ্যের বিরুদ্ধে। জার্মানির মতো এখানেও অস্ট্রিয়রা এক সময় বিরুদ্ধ পক্ষের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। আই-লা-স্যাপলের শান্তি চুক্তি মোতাবেক যুদ্ধের অবসান ঘটে। আর চুক্তি অনুসারে (ডাচি) পারমা লাভ করে স্পেনের ডন ফিলিপ।

এই যুদ্ধে একাধিকবার একাধিক পক্ষের ভাগ্যের উত্থান-পতন ঘটে। এই যুদ্ধে কোনো জাতি বিজয় অর্জন করতে গিয়ে বিরাট ক্ষতি এড়াতে পারেনি। আর এই যুদ্ধের যে শেষ পর্যন্ত অবসান ঘটে তার জন্য সন্তুষ্টি নয়, অবসন্নতা দায়ী। আই—লা-সাপলে যে সমঝোতা সৃষ্টি হয় তাতে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো সমস্যার কিছুমাত্র সুরাহা হয়নি। ইংল্যান্ড এবং বুরবঁ রাজবংশগুলির মধ্যে নৌ ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। অস্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার মধ্যে সাইলেসিয়া প্রশ্নে বিবাদের কোনো মীমাংসা হয়নি, ইতালিতে প্রাধান্য স্থাপন ব্যাপারে যে সংঘর্ষ চলছিলো তারও কোনো মীমাংসা হয়নি, নেদারল্যান্ডের ভাগ্যও অনির্ধারিত থেকে যায়। উক্ত রাজ্য বলপূর্বক অস্ট্রিয়ার অধিকারে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে শেষ পর্যন্ত বৈপ্লবিক ফ্রান্স উক্ত রাজ্য পুনরায় গ্রাস করে। ভারতে ইংরেজদের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়; তবে দীর্ঘকালের জন্য নয়, অনতিবিলম্বে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে বিপর্যয় বিজয়ে রূপান্তরিত করা হয়। কানাডায় প্রবেশের পথ, সুরক্ষিত বন্দর লুইসবার্গও তারা দখল করে, এটি ছিলো কেপ ব্রেটন দ্বীপের প্রধান সরবরাহকেন্দ্র।

ইংরেজরা অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ মোটেই পছন্দ করেনি। তখন বিরোধী পক্ষের নেতা ছিলেন জনৈক তরুণ উইলিয়াম পিট। ইনি ছিলেন সুবক্তা। জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন। পরবর্তীকালে তিনি ইংল্যান্ডের সদর মন্ত্রী হিসেবে সুখ্যাতি কুড়ান। হ্যানোভার এবং হেসের বাহিনীদ্বয়কে ভর্তুকি প্রদানের বিরুদ্ধে তিনি বিবেচনার করেন। উপরন্তু অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, (অন্যায়ভাবে নয়) বৃটিশ কূটনীতি পরিচালনা করছে

হ্যানোভার ইলেক্টরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে মধ্যদেশীয় যুদ্ধ পরিপুষ্টির জন্য। আর এই যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো (অনুমান করা যায়) হ্যানোভার রাজ্য প্রতিরক্ষা, এদিকে উক্ত যুদ্ধের ফল এই দাঁড়ায় যে নেদারল্যান্ড ফ্রান্স কর্তৃক হয় পদদলিত, আর ইংল্যান্ড আক্রমণ করে স্কটল্যান্ডের পার্বত্য সৈনিকরা। ফরাসিরা তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য একেবারে ধ্বংস হয়ে যাক এটা চায়নি (ইংরেজ বেসামরিক রণপোতগুলির লক্ষ্য তাই ছিল)। তারা এটাও সহ্য করতে পারে না যে তাদের নৌবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিম্বা ব্যর্থ হবে তাদের ঔপনিবেশিক উদ্যোগ। ইংরেজদের স্কটীশ তহবিলও তাদের মুক্তির কারণ হতে পারে না। এই স্কটীশ তহবিল ফ্লাঙ্ডার্সের রণাঙ্গনে দু'বার পরাজয় বরণ করে প্রস্তুত হয় রুশ সেনা চড়া করবার জন্য। লক্ষ্য : শক্তির ভারসাম্য সুরক্ষা। এবার ফরাসিরা তিরিশ হাজার রুশ সৈন্যের মোকাবেলা করবার চেয়ে বরং শান্তির প্রত্যাশী হয় এবং লুইসবার্গ বন্দরের বিনিময়ে ফ্লান্ডার্স এবং নেদারল্যান্ড থেকে স্বীয় বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়।

অনেক মতে প্রকার প্রায়োগিক কলা সম্পর্কে জানি কূটনীতি হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বশীল। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে ইংল্যান্ড অস্ট্রিয়ার মিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, আর ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। পূর্বে যেমন ঘটেছে, অনুমান করা হয় যে ভবিষ্যতেও তেমনি ঘটবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না। অতীতকালের বিবাদাদির স্মৃতি (যেমন তুরেন ও কঁদে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিবাদে অবতীর্ণ হন কিম্বা মার্লবরো এবং ইউজেন চতুর্দশ লুই-র সেনাপতিদের মোকাবেলা করেন) রাষ্ট্রনায়কদের কল্পনা রঞ্জিত করে, তাদের কর্মপন্থাও নির্ধারিত হয় তদনুসারে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে উপরোক্ত কূটনৈতিক পন্থার উপর ভিত্তি করে একটা দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যয়বহুল যুদ্ধ পরিচালনা করে নিশ্চিতরূপ কোনো ফলাফল লাভ করা গেল না, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে লাগল উক্ত কূটনৈতিক আদর্শ বা প্যাটার্ন অসঙ্গতিপূর্ণ কিনা। ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে অস্ট্রিয়ার কি লাভ হলো? ফ্রান্স কোন যুক্তিতে প্রুসিয়ার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে উল্লসিত হতে পারে? ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রশ্নে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের সংঘর্ষ বাধার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাতে ইংল্যান্ড মিত্র হিসেবে কোন দেশকে পেলে অধিকতর লাভবান হবে? ক্যাথলিক অস্ট্রিয়া নাকি সৈনিক রাজা পরিচালিত প্রটেস্ট্যান্ট প্রুসিয়া? এইসব নানাবিধ সন্দেহ এবং অসন্তোষ থেকে কূটনৈতিক বিন্যাসের জগতে আকস্মিক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই ১৭৫১ সালে মারিয়া থেরেসা ফরাসি রাজার তৎকালের প্রিয়তম মিসট্রেসের কাছে পত্র লিখতে শুরু করেন 'মাদাম আমার প্রিয়তম ভগ্নী' সম্বোধন করে।

কূটনৈতিক জগতে ব্যক্তিত্ব একটি বিরাট ব্যাপার। মহান ফ্রেডারিক ছিলেন নারীবিদ্বেষী। সেকালের তিন প্রধানশীল রমণীর মধ্যে তিনি বিদ্রূপের বিরাট খোরাক খুঁজে পান। মারিয়া থেরেসা ধর্মপ্রাণ, কর্তব্যশীল সম্রাজ্ঞী; মাদাম দ্য পঁপাদুর পঞ্চদশ লুই-র সর্বশক্তিমান মিসট্রেস; এলিজাবেথ, কামমোহিত, ভক্তকামেবী, রাশিয়ার জারিনা (Tzarina)। এদের নিয়ে ফ্রেডারিক নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করে দেন, যা ভিয়েনা, ভার্সাই এবং সেন্ট পিটার্সবুর্গের রাজদরবারগুলিতে প্রচণ্ড আঘাত হানে। এই দরবারগুলিতে ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে ক্রোধ চরমে পৌঁছে। ফ্রেডারিক দ্য অ্যাপসটলিক হ্যাগ এবং মাদমোয়াজেল পরসঁ (কোরল বলা হয়ে থাকে যে তিনি মৎস্য শ্রীর কন্যা)র প্রতি যে নিষ্করুণ বিদ্রূপ ছুড়ে দেন তা কূটনৈতিক বিন্যাসের

সূচনা না করলেও অনেকাংশে ত্বরান্বিত করে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। জনসন ছিলেন কঠিন প্রকৃতির। তবু যখন তিনি বিরল মুহূর্তে প্রমত্ত অবস্থায় থাকতেন না তখন ফ্রেডরিক প্রদত্ত ব্যাঙ্গাত্মক উপনামের জন্য ক্রোধে ফেটে পড়তেন। কারণ উক্ত উপনামের তাৎপর্য যা দাঁড়ায় তাতে তিনি পাশবিকতা, কুখ্যাতি এবং অসদগুণের প্রতিভূতে পরিণত হন।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রী ছিলো ফরাসি কূটনৈতিক ঐতিহ্যের প্রচণ্ড বিরোধী। এই মৈত্রী প্রথম থেকেই জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। আর যেহেতু এই মৈত্রীর দরুন অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় ফলে রাজতন্ত্রের সঙ্গে গোটা জাতির বিভেদ বাড়তে থাকে। তবু এ কথা ভাবলে ভুল করা হবে যে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের সন্ধি প্রণীত হয় একজন সুন্দরী রমণীর আহত গর্বের কারণে। ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয় সংগত কারণেই। যেহেতু এটা সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় যে ফ্রেডারিকের প্রুসিয়ার মতো একটি শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্র ইতোমধ্যেই প্রমাণ রেখেছে যে এই রাষ্ট্র ভবিষ্যতে এতটা শক্তিশালী হতে পারে যা ফ্রান্সের জন্য আরামদায়ক ব্যাপার হবে না।

যাহোক, প্রথম ফ্রাংকো-অস্ট্রীয় সন্ধি কোনো সমালোচনার বস্তু ছিলো না। কারণ ঐ সন্ধি ছিলো প্রকৃতই আত্মরক্ষামূলক। পরবর্তীকালে (আগস্ট, ১৭৫৫) ফ্রান্স যে মারিয়া থেরেসার সঙ্গে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রতিশ্রুতিতেও আবদ্ধ হয় সেটাই ছিলো সমালোচনার বিষয়। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আর একটি মহাদেশীয় যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ায় ফ্রান্সের ক্ষতি স্বীকার করতে হয় অপরিমেয়। ফরাসিরা ইতোমধ্যেই তার সুপ্রাচীন শত্রুর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলো পশ্চাদপদ আমেরিকা এবং কনাটকের সমভূমিতে। এই সময় ফ্রান্স প্রকৃত বিজ্ঞতার পরিচয় দিতো যদি সে বৈদেশিক স্বার্থ সংরক্ষণে অধিকতর মনোযোগী হতো। কারণ তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজরা উক্ত স্বার্থের বিরুদ্ধে বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তথাপি এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে ফরাসিরা বলতে গেলে মোটেই অবগত ছিলেন না দেশের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞরা তাদের কি ধরনের মহাদেশীয় যুদ্ধে জড়িত করছেন। ভারত, কানাডা কিংবা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ব্যাপারে ভাবিত হওয়া তো দূরের কথা, ফরাসি জাতির যে অতি ক্ষুদ্র অংশ রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিতে সক্ষম, তারাও ব্যস্ত হয়ে পড়েন রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের দ্বন্দ্ব ব্যাপারে, জেনসেনিস্ট ও ডিইস্টদের উদারবাদের মধ্যে ঝগড়ায়, কিংবা জেসুইট সঙ্ঘের অত্যাচারী ক্যাথলিক মতবাদ ব্যাপারে। উপরন্তু তাদের মনোযোগ কাড়ে বড় বড় সব সাংবিধানিক সমস্যা। তাদের মনে এসব সমস্যা ব্যাপারে প্রশ্ন জাগে ইংরেজদের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে ফ্রান্সের গোপনতা প্রবণ স্বেচ্ছাতন্ত্রের তুলনা প্রতিতুলনার মাধ্যমে। রাজা ছিলেন অত্যন্ত কুখ্যাত, পুরোহিতরা ছিলেন সবার ঘৃণার পাত্র, জনগণের মধ্যে সমালোচনা এবং বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ছিলো প্রচণ্ডরূপ। ফলে মার্কুইস দ্য আর্গেনসন এবং আর্ল অব চেস্টারফিল্ডের মতো সুবিবেচক ব্যক্তিরাও শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখতে গিয়ে সুস্পষ্ট অনুমান করেন যে মহা বিপ্লবের সূচনা হতে আর দেরি নেই। এমতাবস্থায়, একটি মহাযুদ্ধ ব্যাপারে তেজস্বী এবং বুদ্ধিদীপ্ত নির্দেশনা প্রত্যাশা করা যায় না। একদিকে বিদ্বান ব্যক্তি ও লেখকরা সহনশীলতা এবং স্বাধিকারের পক্ষে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, অপরদিকে আইনবিদরা পার্লামেন্টে (পার্লামেঁ) কর আরোপের ভিত্তি সম্প্রসারণের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। তখন প্রয়োজন ছিলো যুদ্ধের লক্ষ্যগুলি আলোকিত বুদ্ধির সঙ্গে উপলব্ধি। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সদা-প্রস্তুতি, উপরন্তু ফরাসিদের সঠিক পথে পরিচালনা।

জনগণকে একতাবদ্ধ করা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এ সবের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। অথচ বুদ্ধিমান হলেও ক্ষীণদৃষ্টি আইনজ্ঞ সঙ্ঘের এসব বোঝার বুদ্ধির ঘাটতি ছিলো। এই আইনবিশারদরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিক্ত বিসংবাদে। ফলে দেশের বৃহত্তর সমস্যাগুলি অবহেলিত থেকে যায়।

প্রুসীয় বাহিনীর স্যাক্সনিতে উপস্থিতি (১৭৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে) বিখ্যাত সাত বছরের যুদ্ধের সূচনা করে। এই ব্যাপারটাকে তুলনা করা চলে বেলজিয়াম আক্রমণের সঙ্গে, যা অপর একটি বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই তুলনা যদি সঠিক না হয়ে থাকে (না হলে অবাক হবার কিছু নেই কারণ, স্যাক্সনি আপাত দৃষ্টিতে নিরপরাধ হলেও একথা বলা বলা যাবে না যে দেশটি দুষ্কর্মের পরিকল্পনা করছিলো না) তথাপি এটুকু সত্য যে ফ্রেডারিক যে হঠাৎ করে শান্তিপ্রিয় একটি প্রতিবেশী দেশে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে, উক্ত দেশের রাজধানীতে ধন-সম্পদ কুক্ষীগত করেন, দেশটির সৈনিকদের স্বীয়দলের সঙ্গে যুক্ত করেন, তা আন্তর্জাতিক আইনের নগ্ন লঙ্ঘন ছাড়া আর কিছু নয়। এই যে ড্রেসডেনে প্রমাণসহ আবিষ্কৃত হয় যে প্রুসিয়াবিরোধী একটি জোট গঠিত হয়েছে তবু তা এই প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতার বিপক্ষে যায় না যে প্রুসিয়ার রাজাই প্রথম শান্তিভঙ্গ করেন। ভিয়েনার আউলিক কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ফ্রেডারিককে তার অধিরাজ্যগুলি এবং খেতাবাদি থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং জার্মান ডায়েটকে আহ্বান জানানো হয় একটি সেনাদল প্রেরণের জন্য। লক্ষ্য কথিত অপরাধীকে শায়েস্তা করতে হবে।

এবার ফ্রেডারিক যে বিপদ এবং অসুবিধাগুলির সম্মুখীন তার ভয়াবহতা কল্পনা করাও কঠিন। চতুর্দিক থেকে একাধিক শক্তিশালী শত্রুরাষ্ট্র তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে; দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থান নিয়েছে অস্ট্রীয় বাহিনী; পূর্বাঞ্চলে অতিকায় রুশ বাহিনীর উপস্থিতি; পশ্চিমে অবস্থান ফরাসি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের; উত্তরাঞ্চলে প্রস্তুত সুইডেন। তাহলে বোঝাই যায় বিরাট শত্রুগোষ্ঠীর সম্মুখীন। এই শত্রুগোষ্ঠীর জনশক্তির উৎস অফুরন্ত। তারা ফ্রেডারিকের দ্বিগুণ সৈনিক রণাঙ্গনে প্রেরণে সক্ষম। ফলে বোঝাই যায়, ফ্রেডারিক গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন। যেখানে রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া রণক্ষেত্রে খোয়া যাওয়া বাহিনীর স্থলে নতুন বাহিনী পাঠাতে পারে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে, সেখানে প্রুসিয়ার জনবলের ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়।

চারদিকে শত্রুর মাঝে ফ্রেডারিক ইংল্যান্ড-এর মধ্যে খুঁজে পায় এক বিশ্বস্ত মিত্র। দ্বিতীয় জর্জ এই ফ্রেডারিক সম্পর্কে এক সময় এ রকম মন্তব্য করেন, "প্রুসিয়ার রাজা দুর্বৃত্ত ও বদমাস, বন্ধু হিসেবে অবিশ্বস্ত, বাজে মিত্র, বাজে প্রতিবেশী, বস্তুত ইউরোপের সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রিন্স।" কিন্তু এখন ইংল্যান্ডের কর্মপন্থা রাজা দ্বিতীয় জর্জ পরিচালনা করেন না, বর্তমানে এই দায়িত্ব পালন করছেন উইলিয়াম পিট, এই রাজনীতিবিদের জ্বালাময়ী প্রেরণায় প্রুসিয়ার রাজা আকস্মিকভাবে (যেন যাদু বলে) ইউরোপের মুক্তির চ্যাম্পিয়ন এবং প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের মূল স্তম্ভে রূপান্তরিত হন। উইলিয়াম পিট পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে ইংরেজ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন নি; কিন্তু ইংরেজদের দেয়া ভর্তুকির দরুন মহাদেশীয় যুদ্ধ পরিপুষ্টি লাভ করে। অপরদিকে ইংরেজরা ফরাসি উপকূলে আক্রমণ পরিচালনা করায় এবং ইংল্যান্ড ও হ্যানোভার প্রিন্স ফার্দিনান্দ অব ব্রান্সউইককে সমর্থন যোগানোর জন্য (এই প্রিন্স ফার্দিনান্দ

জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলে ফ্রেডারিককে সহায়তা করেন। পঞ্চম রণাঙ্গনে ফ্রেডারিকের উপরে ফরাসিরা যে চাপ সৃষ্টি করতে পারতো তা করতে পারেনি।

তথাপি রাজা ফ্রেডারিকই, বলতে গেলে স্বীয় একক চেষ্টায় বলে প্রুসিয়া রাজ্যকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মুছে যেতে দেন নি। প্রুসীয় বাহিনী প্রধানত বিদেশী সৈনিকদের দ্বারা গঠিত হলেও এই বাহিনীকে এমন শিক্ষা প্রদান করেন এর ধর্মদ্রোহী সর্বাধিনায়ক যে, এই বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক এখন যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো সময় চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। এই বাহিনী রণাঙ্গনে কর্মকাণ্ডে প্রেরণা লাভ করে শিল্পী রাজার অনন্য সাধারণ বাগ্মিতার দরুন, উদ্বুদ্ধ বোধ করে লুথারান সমবেত বন্দনাগান শুনে, এই বাহিনীর সদস্যদের সাফল্যের সঙ্গে বোঝানো হয় যে প্রটেস্ট্যান্ট ভগবান তাদের পক্ষ হয়ে লড়াই করছেন। যুদ্ধে ক্ষতি হয় বিস্তর। কিন্তু তাদের নেতার লৌহ কঠিন লক্ষ্য বিন্দুমাত্র টলাতে বা দুর্বল করতে পারে না। সেনাদলেও মনোবল ভেঙে পড়ার লক্ষণ দেখা যায় না। কারণ প্রতিটি সৈনিক উক্ত মহান নৃপতির মন্ত্রমুগ্ধ এবং অনুগত। যুদ্ধের প্রথম বছরই প্রুসীয় বাহিনী তিন ভাগের এক ভাগে দাঁড়ায়, কিন্তু ফ্রেডারিকের বাহিনী প্রুসীয় রাজ্য রক্ষার লড়াই-এ সমান প্রেরণাবলে লড়ে যায়। ১৭৫৭ সালে শত্রুরা যে বার্লিন নগরী ব্যাপক হারে লুণ্ঠন করে তা কোনো ব্যাপার বলেই গণ্য করা হয় না। যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে মাসের পর মাস বিশাল রুশ বাহিনী প্রুসিয়ায় বর্বরতার চরম নমুনার স্বাক্ষর রাখে, তাও ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না। প্রুসিয়া রাজ্যের আত্মার অবস্থান কোনো স্থানে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এই আত্মার অবস্থান একজন মানুষের মধ্যে। এই মানুষটি তার সাধারণ গুণাবলী, আচরণে সাবলীলতা, কৃতিত্ব, ফিউগ ও সনাটা, তার ফরাসি কবিতাকর্ম এবং দার্শনিক দূরকল্পনার অন্তরালে সব সময় লালন করতেন তার যুদ্ধপ্রিয় জাতির সুপ্রাচীন গ্র্যানিট শিলা।

যুদ্ধের প্রথম বছর তিনি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মেধার যে পরিচয় দেন গোটা যুদ্ধে তার কোনো তুলনা মেলেনি। তার বোহেমিয়া আক্রমণ বিপর্যয়কর ব্যর্থতার ভেতর অবসান ঘটে। প্রাগের যুদ্ধে তিনি জয়ী হন, কিন্তু পর্যুদস্ত হন কোলিনে (Kollin), আরসে গেবার্জের (Erz gebirge) পূর্বাঞ্চলে তার পর্যুদস্ত বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে প্রত্যাহার করে নিতে হয়। একই বছরের গ্রীষ্মের শেষের দিকে শত্রুদেশগুলির (ফরাসি ও সাম্রাজ্যবাদীরা, অস্ট্রীয়ান, রুশ, সুইডিশ) সুকৌশলী জাল তাকে ঘিরে ফেলে। এবার তিনি প্রিয় ভগ্নীর সঙ্গে আত্মঘাতী সন্ধি রচনার কথা ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু কাজের ডাক যখন পড়ল তখন এই মেজাজি ব্যক্তিটির অন্ধকার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটলো। দ্রুত অভিযান শুরু করলেন পশ্চিম অভিমুখে, স্যাক্সনিতে, ফরাসি বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য। এসেই রসবাখের রণাঙ্গনে পর্যুদস্ত করলেন প্রিন্স দ্য সুবাইসের বাহিনী। বস্তুত উক্ত বাহিনী ফ্রেডারিকের বাহিনীর হাতে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে। এই বিজয়ের উৎসব যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করেন লন্ডনের টেবারনেকলে বাক্সটু মেথডিস্ট ধর্ম প্রচারক মি. হোয়াইটফিল্ড। তিনি দাবি করেন যে এটি প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের জন্য বিরাট বিজয়। ইতোমধ্যে জন-এর পক্ষপাত ঘটে সাইলেসিয়ায়, এখানে, ডিসেম্বরের নিষ্করুণ আকাশের নিচে লিউথেন রণাঙ্গনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই-এ ফ্রেডারিক উক্ত অস্ট্রীয় আলু সমরনায়ককে পরাস্ত করেন। অথচ মাত্র কয়েক বছর আগে উক্ত জেনারেলের বাহিনীর কাছে ফ্রেডারিকের বাহিনী পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়।

এই শারদীয় যুদ্ধাভিযানে যে তেজস্বিতা এবং দক্ষতার সঙ্গে ফ্রেডারিক, একটি অতি দুর্বল এবং একাধিক রণক্ষেত্রে পরাজয় বরণকারী বাহিনীর সাহায্যে শত্রুবাহিনীকে স্যাক্সনি ও সাইলেসিয়া থেকে বিতাড়িত করেন তা পরবর্তীকালীন প্রতিটি প্রজন্মের সৈনিকদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা কুড়াতে সমর্থ হয়। এই সৈনিকদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য, সেই নেপোলিয়ন লিউথেনের যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "এটি ছিলো গতি, সুকৌশলী পরিচালনা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।" এই রণাঙ্গনে দক্ষ অধিনায়কত্বের জন্যই ফ্রেডারিক সেনাপতি হিসেবে অমরত্ব লাভ করবেন।

তবে এই বিজয়গুলির জন্য পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনের মূল চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। প্রুসিয়া রাজ্য ছিলো চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হবার উপযোগী একটি ভূ-খণ্ডগত অস্তিত্ব। অতএব এটা একেবারে আশা করা যায়নি যে এই রাজ্যকে কার্যকরভাবে আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যাবে। এখানে শুধু একটি প্রশ্নই অমীমাংসিত ছিলো। এই ক্ষুদ্র, দরিদ্র এবং জনবিরল রাজ্যের সার্বভৌম নৃপতি ফ্রেডারিক তার বাহিনীকে দু'টি বৃহৎ সাম্রাজ্যের সম্মিলিত শক্তির সামনে টিকিয়ে রাখতে পারবেন কিনা। উভয় সাম্রাজ্যই ফ্রেডারিকের চেয়ে সংখ্যা বিচারে বৃহত্তর এবং অধিকতর স্থিতিস্থাপক বাহিনী রণাঙ্গনে প্রেরণে সক্ষম। উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব যে ফ্রেডারিকের অনুকূলে যায় তার জন্য দায়ী শুধু তার আলোকসামান্য সামরিক প্রতিভা নয়, যে প্রতিভার আশীর্বাদে তিনি জয়ী হন, বার বার, যেমন ১৭৬০ সালের ১১ আগস্ট লিয়েজনিৎসে (Liegnitz) এবং ১৭৬০ সালের ৩ নবেম্বর টরগোতে (Torgoau) এবং ১৭৬২ সালের ৯ আগস্ট শবেইনিৎস-এ (Schweidnitz)। তার কারণ রুশ ও অস্ট্রীয় শত্রুপক্ষের দুর্বলতা থেকেও ফ্রেডারিক সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হন। ঐ দুই বৃহৎ সাম্রাজ্যের বাহিনীদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যাপারটা ছিলো ত্রুটিপূর্ণ, তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিলো পারস্পরিক ঈর্ষাবোধ। তাছাড়া ছিলো বদ্ধমূল মেজাজজনিত নানা ত্রুটি। ফ্রেডারিক এ সবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং সময় মতো কাজে লাগান। রুশদের নৈতিক শক্তি যদি তাদের বাহিনীগুলির সমতুল্য হতো, যরনডরফের সিদ্ধান্তহীন যুদ্ধের পর ফারমর যদি পূর্বাঞ্চল অভিমুখী না হতেন (যরনডরফের যুদ্ধে প্রুসিয়ার লোক ক্ষয় হয় খুব বেশি), কুনারসডরফের রণাঙ্গনে বিপুল বিজয় লাভের পর সলটিকভ যদি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার কাছে আত্মসমর্পণ না করতেন, কিংবা অস্ট্রীয়-রুশ বাহিনীদ্বয়ের বিরাট বিজয়ের পর অস্ট্রিয়রা যদি সেনাপতি ডন-এর অধীনে দ্রুত সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য নিয়োজিত হতেন, তাহলে ফ্রেডারিককে অবশ্যই সেই আত্মঘাতী অষুধ গলাধঃকরণ করতে হতো, যে অষুধের একমাত্র বিকল্প ছিলো সম্মান বিসর্জনকারী শান্তি। যাহোক, রুশ চরিত্রে সম্ভবত সুশৃঙ্খলভাবে লেগে থাকা কিংবা অধ্যবসায়ের ব্যাপারটা ছিলো না। 'সাত বছরের যুদ্ধে' রুশ বাহিনী বার বার প্রুসীয় ভূখণ্ডে হাজির হয়েছে। তারা কুক্ষীগত করে কোলমার, স্থায়ী শিবির গড়ে প্রুসীয় পোমেরানিয়ায়। তারা এক সময় একাকি, ঢুকে পড়ে ফ্রাংকফুর্টে-অন-অডারে, খোদ বার্লিন শহরেও তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাদের তিনটি বর্বর ধরনের খণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় প্রুসীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে, তিনটি যুদ্ধেই প্রুসীয়দের প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, তবে রুশরা একটিবারও চূড়ান্ত বা পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে পারে নি। ১৭৫২ সালের ৫ জানুয়ারি রুশ সম্রাজ্ঞী জারিনার মৃত্যু হলে, লেপোল্ড, রুশ, মলিন মুখ ফ্রেডারিক, পোষাক-পরিচ্ছদ জীর্ণ, তদুপরি তৈলাক্ত এবং স্পেনীয় নস্যের সংস্পর্শে অতিশয় নোংরা, তবু

বীণাবাদন এবং ফরাসি ভাষায় কাব্য রচনায় কিছুটা সময় পান, কিছুটা সময়ও ব্যয় করেন, যেমন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে শ্বেইডনিৎসের (Schweidnitz) রণক্ষেত্রে (এই রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড আঘাত হানেন), এখনও তিনি সাইলেসিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে কিছুটা শক্ত অবস্থানে রয়েছেন, যদিও তার যুদ্ধে পর্যুদস্ত সৈনিকেরা তার মতোই নিশ্চেষ্ট। জারিনা এলিজাবেথের মৃত্যুর খবর তার জন্য মুক্তির বার্তা বয়ে আনে। কারণ যে-ব্যক্তি রুশ সিংহাসনে আরোহণ করেন তার কোনো শত্রু নয়, জনৈক অনুরাগী মিত্র। তৃতীয় পিটার ছিলেন ফ্রেডারিকের পরম ভক্ত। অতঃপর রাশিয়া রণক্ষেত্র থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। অপরদিকে অস্ট্রিয়ার পূর্ব সীমান্তে তুর্কিদের বিপজ্জনক গতিবিধি শুরু হয়। ফলে মারিয়া থেরেসা ১৭৬৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি হিউবার্টসবার্গের শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই যে ধারণা করা হয়েছিলো যে আউলিক কাউন্সিলের বদৌলতে প্রাশিয়াকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলা যাবে, তা নিতান্ত অলস স্বপ্নকল্পনা বলে প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, ইউরোপের তিনটি বৃহৎ শক্তি সমর্থন করলেও সেরকম কিছু হবার সম্ভাবনা ছিলো না।

পশ্চিমাঞ্চলে এবং সামুদ্রিক ভূলভাগে ইংল্যান্ডের নৌশক্তির সাহায্যে, উইলিয়াম পিটের প্রতিভাদীপ্ত নির্দেশনায়, প্রটেস্ট্যান্ট শক্তি সমবায়ের বিরাট বিজয় ছিলো অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। আবার পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধের বা মহাদেশীয় যুদ্ধের ফলাফল যদিও ছিলো পরিমিত, কিন্তু ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে বিবাদের ফলাফল ছিলো বৈপ্লবিক, যা সকল প্রত্যাশা অতিক্রম করে যায়। ফ্রেডারিক কঠোর পরিশ্রম দ্বারা জার্মান শক্তির ভারসাম্যের আকস্মিক পরিবর্তন ঠেকিয়ে দেন। তিনি শুধু প্রাশিয়ার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঠেকিয়ে দেননি, সাইলেসিয়ার উপর স্বীয় দখলও কায়েম রাখেন। কিন্তু ইংল্যান্ড প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে দুটি নতুন সাম্রাজ্য অর্জন করে। ফলে বিশ্বের ভারসাম্যের বিরাট পরিবর্তন ঘটে। যুদ্ধের অবসানের পর দেখা যায় উত্তর আমেরিকায় অ্যাংলো-স্যাক্সনদের সম্প্রসারণের পথ খুলে গেছে, আর ভারতে সম্ভব হয়েছে নতুন উপনিবেশ স্থাপন। ফরাসিরা হুমকি দিয়েছিলো যে তারা ইংরেজ উপনিবেশিকদের উত্তর আমেরিকায় অগ্রসর হতে দেবে না, কিন্তু ফল দাঁড়ায় এই যে, প্রকারান্তরে তাদের ওহাইও বরাবর স্থাপনাগুলি থেকে বিতাড়িত হতে হয়। কুইবেকের দুর্গের উপর বৃটিশ পতাকা উড়তে শুরু করে। একটা সুবৃহৎ মহাদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরুণ অফিসার রবার্ট ক্লাইভ একটি সংগঠিত রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। উত্তরাঞ্চলের এবং প্রটেস্ট্যান্ট জনগণের রাজনৈতিক নির্দেশনার অধীনে এই রাজ্যে শাসিত হয় তিন শত মিলিয়নের অধিক প্রাচ্যবাসী। এই অধিবাসীরা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তাদের ভাষা ও ধর্ম বিভিন্ন। ফলে তাদের নিরপেক্ষ প্রভুরা একদিকে যেমন প্রভূত সুযোগ লাভ করে, অন্যদিকে তেমনি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়।

প্রথমদিকে ইংরেজদের অবস্থা খুব ভালো যায় নি। কারণ ফরাসিরা ব্রেভ ইন্ডিয়ান মিত্রদের সহায়তায় প্রাথমিক যুদ্ধে বিরাট সুবিধা ভোগ করে। ক্রমব্যাসাদর অঞ্চলে ইংরেজদের হাত ছাড়া হয় মিনোর্কা, এতে তাদের অহংকার দারুণভাবে খর্ব হয়। কারণ তারা নৌ যুদ্ধে পরাজয় মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিলো না। এদিকে কলকাতায় পতন ঘটে, অন্ধ পতের অধিকারে চলে যায়। বার্বাডস রক্ষা করতে হয় রণকৌশলে, এদিকে প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে বৃটিশ রণতরীসমূহ দুইবারে বিকল হয়ে যায়। তবে এখানেই ইতিহাসের ইতি ঘটেনা।

ইংরেজরা এভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে নৈতিক ও বাস্তবিক শক্তি সঞ্চয়ে বিফল হয় না। তারা এক্ষেত্রে সবসময়ই যোগ্য নেতৃত্বের নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা লাভ করে।

পৃথিবীর সবত্র সমন্বিত এক বিরাট বাহিনী ফরাসিদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে। আর ইংরেজরা বিজয় কুড়ায় সর্বত্র। লুইসবার্গ (কানাডাকে কব্জা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ) ফোর্ট দুকুএসনে (Duquesne ওহাইও-তে ফরাসিদের মূল সেনা ছাউনি, ফরাসি কানাডা এবং ফরাসি লুসিয়ানার সংযোগস্থল এবং উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যভাগে সম্ভাব্য ফরাসি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল) ইংরেজদের দখলে চলে যায়। একইভাবে ইংরেজরা দখল লাভ করে গোরি, ফরাসি পশ্চিম আফ্রিকান দাস ব্যবসাও তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসে। ইতিমধ্যে ইংরেজরা ব্রান্সউইকের ডিউক ফার্দিনান্দ-এর প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্য যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং একদল ইংরেজ সৈনিক প্রেরণ করে। ডিউক ফার্দিনান্দ তখন হ্যানোভার অঞ্চলে প্রটেস্ট্যান্ট স্বার্থ সুরক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। এদিকে ফরাসি উপকূলে ইংরেজ নৌবাহিনী প্রচণ্ড আঘাত হানে। ফলে ফার্দিনান্দের পরিশ্রম অনেকটা লাঘব হয়। সমধিক সৈনিক দ্বারা গঠিত একটি ফরাসি বাহিনী জুন মাসের তেইশ তারিখে ক্লিভেল্ডে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে। এবার বোঝা গেল অ্যাংলো-প্রাসীয় পক্ষে একজন অনকোরা নতুন ও প্রতিভাবান সমরনেতা যোগ দিয়েছেন।

পিটের প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিলো আমেরিকা। রাষ্ট্রবিদ হিসেবে তার অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ এখানে পাই যে তিনি অ্যাংলো-স্যাক্সন অন্তর্দর্শনের আশীর্বাদে অনুমান করতে সমর্থ হন যে আমেরিকার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য যুদ্ধ প্রচেষ্টার অন্যান্য ক্ষেত্রের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন যে, আমেরিকা হলো "আমাদের সম্পদের উৎস, আমাদের শক্তির স্নায়ুকেন্দ্র, সুলুকসন্ধান এবং আমাদের নৌশক্তির ভিত্তি।"

পিটের পরিকল্পনা ছিলো পশ্চিম, দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক থেকে কানাডায় ফরাসি শক্তির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা। তবে উক্ত পরিকল্পনা নকশা অনুসারে কার্যকর করা সম্ভব ছিলো না। তবে এটুকু বোঝা গেছে যে তার যুদ্ধিসঙ্গত পরিকল্পিত কার্যক্রমের উপযোগী ছিলো। বস্তুত তার পরিকল্পনা সফলও হয়। ১৭৫৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর আব্রাহাম পর্বতের শিখরে মন্টকামের বিরুদ্ধে উলফ যে বিজয় ছিনিয়ে নেন তার বিরুদ্ধে পাল্টা কোনো ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। ফরাসি কানাডা ছিলো ফ্রেঞ্চটাইপ্রাসীদের নীতি, ভাষা ও দৃষ্টিকোণের কাছে দুঃপ্রবেশ্য। অথচ তা ইংরেজদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কেবল প্রাচীন ফ্রান্সের কওাংশ উত্তরাঞ্চলের বরফাবৃত প্রান্তরে টিকে থাকতে পারে। বিজিত অঞ্চল প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে ইংল্যান্ডের নৌশক্তি।

সে সময় দুটি পক্ষের নৌশক্তির মধ্যে যে তারতম্য ছিলো তাতে যুদ্ধের ফলাফল অন্যথা হবার উপায় ছিলো না। (কি পশ্চিম, কি পূর্ব সমুদ্রসমূহে)। এসব ঠিক ফরাসি কানাডায় জনশক্তি যুদ্ধের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক ছিলো। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে মহাসাগর ধরাবর ইংরেজদের যে তেরোটি উপনিবেশ ছিলো তার সুবিধা অবশ্যই কানাডার একটিমাত্র সুবিধার প্রমাণিত হয়। দুই মিলিয়ন জন শক্তির পক্ষে ধারণা করার সেরকম কিছুতে মুষ্টিমেয় অর্ধেক বাস্তবিক হবেন। তবে ইংরেজ উপনিবেশগুলির একটি বিষয় সুবিধাজনক ছিলো। যা তাদের সাহস জিগিয়ে উৎসাহের জোগান দিয়েছে। তাদের অর্থনীতি ছিলো সমুদ্রের শক্তির তত্ত্বাবধানে। একটা ইংরেজ জনবসতি, একটা ফরেস্ট বাণিজ্য, একটা উন্নত মানের কৃষি অর্থনীতি (যুক্তরাষ্ট্রসহ)

সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। এই কাজের জন্য তাদের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতিও ছিলো। এজন্য তার যথাযথ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতেও সমর্থ হন।

এই সময় ইংল্যান্ড নৌশক্তির ক্ষেত্রে এবং উপনিবেশিক যুদ্ধে যে বিরাট বিজয় অর্জন করে তার জন্য ইংরেজ পার্লামেন্ট কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। কারণ ইংরেজ পার্লামেন্ট তখন নাবিক, বণিক এবং উপনিবেশবাদীদের আসক্তি, ধন-সম্পত্তির প্রতি লালসা এবং ক্ষোভ প্রকাশের যথার্থ মঞ্চে পরিণত হয়। লন্ডন নগরীর পক্ষে সম্ভব ছিলো না মহাসমুদ্রের পরপারের এলাকাসমূহে দেশের লোকদের যে স্বার্থ রয়েছে তা উপেক্ষা করে চলা। প্যারিস নগরীর পক্ষে হয়তো তা সম্ভব ছিলো।

ইংরেজ নির্বাচকমণ্ডলীর বিরাট উপনিবেশিক স্বার্থ ছিলো, তারা ছিলেন উপনিবেশসমূহের সঙ্গে নানা সূত্রে জড়িত। পুল (poole) অঞ্চলের সভ্যরা ছিলেন নিউফাউন্ডল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন। ডেভিজেসের প্রবল আগ্রহ ছিলো দুই ক্যারোলাইনা সম্পর্কে। প্যারিস নগরীর এ ধরনের কোনো ব্যাপার ছিলো না। ফলে ফরাসি নৌ প্রশাসন ছিলো রাজদরবারের একান্ত করুণানির্ভর। মাশোল (Machult)-এর মতো সৎ মন্ত্রিদেরকে নিঃশব্দে সরে যেতে দেয়া হয়, অথচ মোরা-র মতো বাজে মন্ত্রিরা বিনা চ্যালেঞ্জে প্রশাসন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান। ১৭৫৯ সালে, গভীর সংকটের সময় ভূমধ্যসাগরীয় ফরাসি নৌবহর পঙ্গু করে দেন বসকাউয়েন, লাগোসে। অপরদিকে ফরাসি আটলান্টিক মহাসাগরীয় রণতরীসমূহের সিংহভাগ ধ্বংস করেন হক (Hawke), কুইবেরন উপসাগরে। এ জন্যই বলা যায় যে, উলফের যুদ্ধাভিযান ব্যর্থ হলেও এই দু দুটি নৌ যুদ্ধ আমেরিকান যুদ্ধের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

এদিকে, ভারতে, মুঘল সাম্রাজ্য বিগঠনের পর ইউরোপীয়দের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার অঢেল সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এখানে ফরাসিরা প্রথম ভাগ্যদেবীর প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করে। আবার ভাগ্যদেবী এই ফরাসিদেরকেই পরিত্যাগ করে। দুটি ঘটনাই ঘটে অভিন্ন কারণে। প্রতিটি অঞ্চলে ইংরেজদের অবস্থান ছিলো তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে অধিকতর সুবিধাজনক। বন্দর হিসেবে বম্বে* ছিলো সুরাটের চেয়ে অধিকতর উন্নত, মাদ্রাজ* ছিলো পণ্ডিচেরির চেয়ে কেন্দ্রের অনেক নিকটে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য চন্দননগরের ফরাসি স্থাপনার চেয়ে ইংরেজদের কলকাতা ছিলো অনেক বেশি উপযোগী। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব এবং ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে ফরাসিরা প্রথমদিকে ইংরেজদের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে ছিলো। অস্ট্রীয় উত্তরাধিকার প্রশ্নে যুদ্ধের সময় ফরাসি রণতরীসমূহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন লা বুরদন। এ সময় পণ্ডিচেরি থেকে সেনাপতি দুপ্লে ভারতীয়দের সঙ্গে আঁতাত করে। তিনি ভারতীয় সিপাহীদের সহায়তায় একটা বিশাল সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। এদিকে ক্লাইভের বুসি (একজন মেধাবী অবাধিদ) হায়দরাবাদে কূটনীতির জটিল জাল বুনছিলেন, তখন দক্ষিণ ভারতে ফরাসিরা ছিলো প্রধান শক্তি। এমনকি মাদ্রাজ শহরও কয়েক বছরের জন্য তাদের হাতে চলে যায়।

---

* বম্বে এখন মুম্বাই।
* মাদ্রাজ এখন চেন্নাই।

[illegible] সম্পাদিত হবার পর গোটা অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্ব ভারতীয় কোম্পানির মধ্যে ইংরেজরা তুলনামূলকভাবে বাণিজ্যিক এবং আর্থিক দিক থেকে ছিলো অধিকতর মজবুত অবস্থায়। ইংরেজরা নিয়োগ প্রদান করে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তিদের, গোটা দেশ তাদের কার্যকর সমর্থন ও সহায়তা প্রদানের জন্যও প্রস্তুত ছিলো। এদিকে ফরাসিরা লা বুরদন এবং দুপ্লেকে প্রত্যাহার করে নেন, আর ইংরেজরা আবিষ্কার করে রবার্ট ক্লাইভ, স্ট্রিঞ্জার লরেন্স এবং আর্থার কুটের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিদের। আবার, ফরাসি জাহাজগুলি যেখানে বর্ষা মরসুমে দূর মৌরিশাসের সরবরাহ ঘাঁটি থেকে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করতে অস্বীকার করে। সেখানে বছরের প্রতিটি ঋতুতে ইংরেজদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নৌশক্তির সহায়তা লাভ করা গেছে। সামান্য ক'জন ফরাসি বণিক কিংবা সৈনিক দাক্ষিণাত্য শাসন করতে সমর্থ হবে, এ ধরনের ধারণাকে ফরাসি রাজনীতিকরা মনে করতেন লাগামহীন ও বন্য নির্বুদ্ধিতা। অথচ হাতে গোনা কয়েকজন ইংরেজ রবার্ট ক্লাইভের অনুপ্রেরণায় এটা প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে, এর চেয়েও বন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব। রবার্ট ক্লাইভের কর্মজীবন জগতের গুটিকয় রোমাঞ্চকর কাহিনীর অন্যতম। এই রবার্ট ক্লাইভ ছিলেন জনৈক নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তির সন্তান (বস্তুত তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লাঠিয়াল গোছের লোক)। এই ক্লাইভ কর্মজীবন শুরু করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নগণ্য করণিক হিসেবে। অথচ নির্মাণ করতে সমর্থ হন এক বিশাল সাম্রাজ্য। উনপঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি স্বীয় জীবন সংহার করেন। ভারতে তার কর্মজীবনের পরিধি ছিলো মাত্র বারো বছর। এর মধ্যে দু'বার তিনি দেশে (ইংল্যান্ড) ফেরেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি কর্নাটক অঞ্চলে ইংরেজদের নিঃসংশয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি সিরাজুদ্দৌলার (Suraj-ud Dowlah) দখল থেকে পুনরুদ্ধার করেন কলকাতা নগরী। পলাসীতে পরাস্ত করেন সিরাজের বিশাল বাহিনীকে। এদিকে ওলন্দাজরাও পরাস্ত হয় তার বাহিনীর কাছে, বেঙ্গল থেকে তিনি বিতাড়িত করেন ফরাসিদের। তারই কূটকৌশল ও শক্তির কাছে ধ্বংস হয় হায়দরাবাদে ফরাসিদের প্রাধান্য। উপরন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত করেন বৃটিশদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। তার কর্মজীবনের তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ও কম মর্যাদাজনক ছিলো না। এই সময় তিনি বেঙ্গলের প্রশাসন সংগঠিত এবং দুর্নীতিমুক্ত করেন। তার সামরিক কর্মকাণ্ড ছিলো অসাধারণ সাহসিকতাপূর্ণ। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি আরকটে পাঁচশ সৈনিক দ্বারা গঠিত বাহিনী পরিচালনা করেন। এই আরকট ছিলো কর্নাটক রাজ্যের রাজধানী। এখানে তিনি একটি ভঙ্গুর দুর্গ দশ হাজার ভারতীয় সৈনিক দ্বারা গঠিত একটি বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন যুদ্ধ করে টিকিয়ে রাখেন (কথিত ভারতীয় বাহিনীকে দুর্ধর্ষ ফরাসি সৈনিকরাও সহায়তা করে)। পলাসীর রণপ্রান্তরে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে তিনি তিন হাজার সৈনিক দ্বারা গঠিত একটি বাহিনী পরিচালনা করেন। এই সেনা দলের অধিকাংশই ছিলো ভারতীয়। কেবল নয়শত ইউরোপীয় সৈনিক ক্লাইভের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়। অথচ বিপক্ষে পদাতিক সৈনিকের সংখ্যা ছিলো চল্লিশ হাজার, পনেরো হাজার ছিলো অশ্বারোহী সৈনিক। এই বিরাট সেনাদলকে ক্লাইভ অনায়াসে পরাস্ত করেন। তার পক্ষে কেবল শ খানেক সৈনিকের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়।

একটা ব্যতিক্রম বাদে ভারতে বৃটিশ শাসনের সকল রহস্য তার সামনে ছিলো অনাবৃত। তিনি স্পষ্ট দেখতে পান যে, ভারতীয় বাহিনীর যে ইউরোপীয় সেনাপতি

ব্যক্তিগতভাবে আঁতারিক ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত আছেন তার পক্ষে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব তিনি সঠিক উপলব্ধি করেন যে, ভারতীয়দের সঙ্গে মৈত্রী ব্যতিরেকে এবং তাদের সহায়তা ভিন্ন বড় মাপের রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং দাবি করেন যে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিটি প্রভাবাধীন এলাকা অভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির অধীনে আনয়ন সম্ভব। এই সাহসী অথচ অনুভূতিশূন্য ব্যক্তির চরিত্রে একটি অমোচনীয় কলঙ্কের কালিমা থেকে যায়। কারণ তিনি জনৈক হিন্দু ব্লাকমেইলারের সঙ্গে বিরাট প্রতারণা করেন। উমিচাঁদ ছিলেন এক ঘাগু বদমাস। অথচ একজন বদমাসের জন্যও ইংরেজদের বিশ্বাসযোগ্যতা বিনষ্ট করার জন্য প্ররোচিত হওয়া সঠিক কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

১৭৬১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ফরাসিদের জন্য ভারত সাম্রাজ্যের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকেনি। ভারতে তাদের সর্বশেষ শাসনকর্তা জন্মসূত্রে ছিলেন আইরিশ বংশোদ্ভূত। ইনি ৪৫ সালে জ্যাকবপন্থীদের হয়ে লড়াই করেন। এখনও ইংরেজরা তার চক্ষুশূল, তীব্র ঘৃণার পাত্র। লালি টোলেনডালের ছিলো জন্মসূত্রে প্রাপ্ত (জাতিগত) অসংযমী দুঃসাহস। কিন্তু তিনি ভারত সম্পর্কে কিংবা ভারতের জনগণ সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে। তাছাড়া তিনি ছিলেন বদমেজাজী। ফলে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে ভুল করেন। এ ধরনের আইরিশম্যানের পক্ষে যে কোনো অবস্থায় যে কোনো নৌকো ডুবিয়ে দেয়া সম্ভব। বন্দেশের (wandewash) যুদ্ধে ভাগ্যহত লালি হন পরাজিত। ফরাসিরা হারায় ভারতে তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা। তার সাহসিকতা কিংবা আনুগত্যে কোনো খুঁত ছিলো না। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি ছিলেন আয়ার কুট, তাকে হয়তো কেবল স্বয়ং রবার্ট ক্লাইভ প্রতিভা ও সাহসিকতায় অতিক্রম করে যেতে পারতেন। বিপর্যয়ের সময় মহানুভবতা প্রদর্শনের মতো নমনীয়তা ফরাসি চরিত্রে ছিলো না। পণ্ডিচেরি পতনের ছয় বছর পর (১৭৬১) বর্বর প্রকৃতির এক দল লোক প্লে দ্য লা গ্রিভ ঘিরে ফেলে। তারা উৎসুক কম্পিত এরিন তনয়ের অন্তিম দুর্দশা ও সন্তাপ অবলোকন করে আনন্দ উপভোগ করবেন। জনৈক ফরাসি ঘাতক তার প্রাণ সংহার করে। প্রো-কনসাল হিসেবে ব্যর্থতার জন্য লালিকে এই মূল্য দিতে হয়। এদিকে একটি কৃতজ্ঞ অথচ সতর্ক দেশ ক্লাইভকে করে নানাভাবে পুরস্কৃত। আইরিশ পিয়ারিজ (poerage) লাভ ছিলো তাদের অন্যতম।

অবশেষে ১৭৬৩ সালে প্যারিসে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তির শর্তাবলি পিটের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সন্ধির শর্তানুসারে ইংল্যান্ড যে ভূখণ্ডগুলি লাভ করে, তার উপনিবেশগুলির সঙ্গে যা কিছু যুক্ত হয় তাতে উক্ত দেশের তৎকালীন ইতিহাস বদলে যায়। ১৭৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতে ফ্রান্সের যে ফ্যাক্টরিগুলি ছিলো সেগুলি গণনার বাইরে রাখলে বলতে গেলে ফরাসিরা ভারত থেকে উৎখাত হয়। কানাডা এবং সেনেগাল হয় ভারতের কৃষ্ণীগত। মিনোরকার উপর ইংল্যান্ডের অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পেন ফ্লোরিডার উপর অধিকার প্রত্যাহার করে নেয়। ইংরেজ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আকার-আয়তন স্ফীত হয় সেন্ট ভিনসেন্ট, টোবাগো, ডোমিনিকা এবং দ্য গ্রেনাডাইনস যুক্ত হওয়াতে। এদিকে যদিও নিউফাউন্ডল্যান্ডের অদূরে ফরাসিদের মাছ ধরার অধিকার অস্বীকার করা হয় না। সেন্ট লরেন্সেও তাদের মাছ ধরার অধিকার অস্বীকার করা হয়নি, তাদের কয়েকটি মূল্যবান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপও প্রদান করা

হয়। তবু ইংরেজদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই শান্তি চুক্তি ছিলো বিরাট ব্যাপার। সে কালের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ন্যায়সংগতভাবেই বলেছেন যে, "এই জাতির জন্য সবচেয়ে মর্যাদাজনক শান্তি।"

ব্যাপক বাণিজ্যিক উন্নতির কারণে তেমন কোনো দুর্দশায় পতিত না হয়েই ইংল্যান্ড দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। এই যুদ্ধের অবসানে, পরবর্তীকালে কৃতি অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ কর্তৃক ব্যক্ত মন্তব্য অনুসারে, "দেশের (অর্থাৎ ইংল্যান্ডের) কৃষিক্ষেত্রে আগের মতোই উন্নতি হতে থাকে। দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন সমান তালে চলে, বাণিজ্য ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যায়।" ইউরোপীয় মহাদেশে ইংল্যান্ডের প্রধান মিত্র প্রুসিয়ার অবস্থান ছিলো একেবারে ভিন্ন। ফ্রেডারিক লিখেছেন, "প্রুসিয়ার জনসংখ্যা সাত বৎসরের যুদ্ধে পাঁচশ হাজার কমে যায়। যেখানে গোটা লোক সংখ্যাই মাত্র সাড়ে চার মিলিয়ন সেখানে আকস্মিকভাবে পাঁচশ হাজার লোক কমে যাওয়া বিরাট ব্যাপার। দেশের অমাত্যবর্গ এবং কৃষকদের সম্পদ এতটা লুণ্ঠন করা হয় যে, তাদের কাছে থেকে মুক্তিপণ হিসেবে এতটা বেশুমার অর্থ আদায় করা হয় যে (বিভিন্ন সেনাদল কর্তৃক) তাদের সম্বল বলতে থাকে মাত্র পুরোনো ছেঁড়া কাপড়, যা দিয়ে শুধু নগ্নতা আড়াল করা সম্ভব। তাদের পক্ষে দিনানুদৈনিক প্রয়োজন নিবারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো শহরে পুলিশ বাহিনীর লোকদের চোখে পড়ে না। মিতাচার ও শৃঙ্খলার স্থান দখল করে অরাজকতা এবং ব্যক্তিগত হীন স্বার্থ। বিচারপতি এবং রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তারা তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করে দেন ঘন ঘন বৈদেশিক বাহিনী কর্তৃক আক্রমণে অতিষ্ট হয়ে। আইনের শাসনের অবর্তমানে এক ধরনের বেপরোয়া আচরণ এবং অর্থগৃধ্নুতার বাড়াবাড়ি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অমাত্যবর্গ ও বণিক শ্রেণী, কৃষক সম্প্রদায়, সাধারণ শ্রমজীবী গোষ্ঠী ও কারখানার মালিক কর্মচারিগণ তাদের শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি করে অস্বাভাবিক হারে। উৎপাদিত সামগ্রীর দামও চলে যায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে। মনে হয় সবাই স্বীয় স্বার্থে একে অপরকে ধ্বংস করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। যুদ্ধের অবসানে সাবেক উন্নতিশীল প্রদেশগুলিতে উপর্যুক্ত অবস্থা স্বাভাবিক দৃশ্য বলে গণ্য হয়। তিরিশ বছরের যুদ্ধের পর ব্রাডেনবুর্গের যে অবস্থা হয়েছিলো সাত বছরের যুদ্ধের পর প্রদেশগুলির অবস্থা তার অনুরূপ প্রতিভাত হয়।" এহেন দুর্বিপাকে পতিত হয়ে প্রুসিয়রা ইস্পাত-কাঠিন্য লাভ করবে। আর শিল্প-সাহিত্যে অগ্রগামী জার্মানির অন্যান্য রাজ-দরবার প্রুসিয়াকে মনে করবে বর্বরোচিত, ভীতিপ্রদ, মারমুখো।

সাইলেশিয়া প্রদেশের জন্য ভয়ানক খরচের তুলনায় সাত বছরের যুদ্ধে ইংরেজদের আত্মত্যাগকে জার্মানিদের কাছে মনে হয় নিয়তির কঠোর অসাম্য। পলাসীর রণ প্রান্তরে কেবল কুড়ি জন ইউরোপীয়কে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, বন্দেশের যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয় এক শ চুরানব্বই জন ইউরোপীয়কে। পিটের হিসাব অনুসারে কানাডা কুক্ষীগত করার জন্য দেড় হাজারের অধিক লোককে আত্মাহুতি দিতে হয়নি। ইংরেজদের দু'টি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে রক্ত ঝরাতে হয় তার পাঁচগুণের অধিক রক্ত ঝরে ফ্রেডারিকের যুদ্ধাভিযানে। তবে লোক ক্ষয় হিসাব করতে গেলে সংখ্যাটা যদিও খুব বেশি হবে না, তবু অদূর ভবিষ্যতে সম্মুখীন হতে হয় নিদারুণ দুর্বিপাকের। কয়েক বছর যেতে না যেতেই ইংল্যান্ডের সঙ্গে তার

আমেরিকান ঔপনিবেশিকদের বিরোধ বেঁধে যায়। এর ফলে গোড়াপত্তন হয় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলি

১. টি. কার্লাইল, লাইফ অব ফ্রেডারিক অব প্রুসিয়া/১৮৫৮-৬৫।
২. বি. উইলিয়ামস : দ্য লাইফ অব উইলিয়াম পিট, আর্ল অব চ্যাথাম। ১৯১৩।
৩. জে. আর. সিলি : দ্য এক্সপানসন ইংল্যান্ড। ১৮৮৫।
৪. এ. ডুক-দ্য ব্রলি : বৈএডএরইচ লল এট মঅনএ থওতসএ ২ খণ্ডে।
৫. এ. জি. ব্রাডলি : দ্য ফাইট উইথ ফ্রান্স ফর নর্থ আমেরিকা। ১৯০০
৬. এ.সি. লাইয়াল : ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৮৮৯।
৭. এ.সি. লাইয়াল : দ্য রাইজ অ্যান্ড এক্সপানসন অব দ্য ব্রিটিশ ডমিনিয়ন ইন ইন্ডিয়া। ১৯০৭।
৮. মেকলেস এসেস (ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, চ্যাথাম)। ১৮৫২।
৯. এল.বি. নেমিয়ার : দ্য স্ট্রাকচার অব পলিটিক্স এট দ্য একসেসন অব জর্জ III. ২ খণ্ডে। ১৯২৯।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

কানাডা বিজয়ের ফলশ্রুতি। উত্তর আমেরিকার ইংরেজদের কলনিসমূহ। বাণিজ্যিক বিধি নিষেধ। প্রত্যক্ষ করারোপ। রাজা জর্জের একগুয়েমি। বোস্টন টি পার্টি এবং ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন (কংগ্রেস)। বৃটিশ বাহিনীর আমেরিকায় অসদাচরণ। জর্জ ওয়াশিংটন, ফ্রান্স ও স্পেনের অংশগ্রহণ। ইংল্যান্ডের বিপদ। দেশটির পরাজয়ে ভ্রমাত্মক ধারণার সৃষ্টি।

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের কারণগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট হলো ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক সহজে অর্জিত বিজয়সমূহ। ইংরেজরা কানাডা থেকে ফরাসিদের এবং ফ্লোরিডা থেকে স্পেনীয়দের বিতাড়িত করে। ফলে আমেরিকার ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা দু'টি বিপজ্জনক প্রতিবেশীর হুমকি থেকে মুক্ত হয়, মূল দেশের প্রতি (mother country) তাদের নির্ভরতাও অনেকাংশে হ্রাস পায়। এখন যেহেতু ইংরেজদের সাহায্যের প্রয়োজন তেমন একটা নেই, অতএব ঔপনিবেশিকরা তাদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়। ফরাসিদের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধের সময় অনেকেই স্বেচ্ছায় যোগ দেয়। কিন্তু এখন যুদ্ধের আর্থিক দায় গ্রহণের ইচ্ছে তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। ঔপনিবেশসমূহ প্রতিরক্ষার জন্য যে সেনাবাহিনী তার ব্যয়ের একটা অংশ বহনের জন্য জর্জ গ্রেনভিল স্ট্যাম্প কর আরোপের প্রস্তাব করেন। এবার ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের মধ্যে ব্যয়কুণ্ঠ এবং সংকীর্ণ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। একে অ্যাংলো-স্যাকসন জাতির চিরাচরিত রাজনৈতিক অভ্যাস বলে গণ্য করা চলে।

নতুন বিশ্বে ইউরোপের যতগুলি উপনিবেশ ছিলো তার মধ্যে উত্তর আমেরিকায় ইংরেজদের তেরোটি উপনিবেশ সর্বাধিক স্বাধীনতা ভোগ করতো। যদিও তারা বৃটিশ রাজশক্তি এবং পার্লামেন্টের প্রজা ছিলো, কার্যত তাদের নিজেদের কর্মকাণ্ড অবাধে চালাতে দেয়া হতো। এ ব্যাপারে বলতে গেলে ওয়েস্টমিন্সটার কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতো না। তবে একটি ব্যাপারে ব্যতিক্রম হতো। ইম্পিরিয়াল ট্রেড কার্যত ছিলো নিয়ন্ত্রণাধীন। মনে করা হতো যে এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে মূল দেশ ও তার অধীন উপনিবেশসমূহের (colonial daughters) পারস্পরিক স্বার্থে। বিরাট আকারে 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' একটা নির্দিষ্ট সময়কালে সাধারণত সফল হয় না। উপরন্তু পুরোনো ইংলিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা এমন ধরনের সংঘর্ষের উদাহরণ উপস্থাপন করে যা কখনো এড়ানো সম্ভব হয় না যদি দূরবর্তী কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একাধিক বাণিজ্যিক এবং শিল্প প্রধান জীবন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য কল্যাণকর হলেও সংঘর্ষ বাঁধে। ঔপনিবেশসমূহকে এমন ধরনের কারখানা চালু করতে বারণ করা হয় যা মূল দেশের কারখানাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে। তাদের রপ্তানীযোগ্য পণ্য বৃটিশ কিংবা ঔপনিবেশিক

জাহাজে রপ্তানী বাধ্যতামূলক করা হয়; তাছাড়া রপ্তানীযোগ্য পণ্য বহনকারী জাহাজগুলির নাবিক ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা অবশ্যই দুই তৃতীয়াংশ বৃটিশ কিংবা ঔপনিবেশিক হতে হবে। তাদের প্রধান প্রধান উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ইংরেজদের বন্দরগুলিতে খালাসের উপরও বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকাও ছিলো অত্যন্ত দীর্ঘ; অপরদিকে, ইংরেজদের উপর এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় যে, তারা যে তামাক সেবন করবে তা অবশ্যই আমেরিকা কিংবা বারমুদায় উৎপাদিত না হলে চলবেনা। নৌবাহিনীর স্টোরগুলিতে তামাক ব্যবসা উৎসাহিত করার জন্য নিউ ইংল্যান্ডের লাম্বারম্যানদের উদারভাবে উপহার প্রদান করা হয়।

রাজা তৃতীয় জর্জের রাজত্বের সূচনাকালে ইংরেজ উপনিবেশগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের যে স্তরে পৌছায় তাতে কথিত নিয়ন্ত্রণগুলি গুরুতর বোঝাস্বরূপ মনে হয় নি। ঔপনিবেশিক কারখানা বিকাশের সময় তখনো আসেনি। এবং যতদিন ঔপনিবেশিকরা প্রস্তুত ছিলো মূল দেশে তৈরি পণ্য সামগ্রী গ্রহণের জন্য, ততদিন ইংরেজদের বন্দরগুলিতে কাঁচা মাল প্রেরণে এবং বিনিময়ে ইংরেজদের কারখানায় তৈরি পণ্য আমদানিতে কোনো বাধা ছিলো না।

তবে একটি নিষেধাজ্ঞা বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি করে। নিউ ইংল্যান্ডের ধার্মিকতার ভিত্তি যদি হয়ে থাকে বাইবেল, তাহলে তার সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিলো রাম জাতীয় মদের উপর। ১৭৩৩ সালে প্রণয়ন করা হয় মল্যাসিজ (Molasses) অ্যাক্ট। এই আইন করে ফরাসিদের চিনি, গুড় এবং রাম (Rum) জাতীয় মদ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা হয় বৃটিশ ঔপনিবেশিক আবাদের স্বার্থে। এতে নিউ ইংল্যান্ডের ভাটিখানাগুলির চরম ক্ষতি হয়। তবে ঔপনিবেশিক চোরাকারবারীরা তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারে। নচেৎ সম্পর্কে তখনই ফাটল দেখা দিত। এখানে একটা কথা বলতেই হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চোরাই মদ্যকারবারীদের কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকলে যে প্রাথমিক প্রেরণা আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করে তা হতো ওয়েস্টমিনস্টারের মদ্যপায়ী (port-drinking) আইন প্রণেতাদের স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে আমেরিকার রাম জাতীয় মদের ব্যবসার ক্ষেত্রে আরোপিত বিধিনিষেধ।

দুইপক্ষের মধ্যে সম্পর্কে প্রকৃত ফাটল সৃষ্টি হয় অবশ্য প্রত্যক্ষ কর আরোপের কারণে। ইংরেজরা চিরকালই টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ করেছে, আর আমেরিকায় ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা (তখন আমেরিকায় আইরিশ জনসংখ্যা ছিলো নামমাত্র) তাদের পূর্বসূরীদের অভ্যাসের প্রতি ছিলো অতিরিক্ত বিশ্বস্ত। এই উপনিবেশিকরা জর্জ গ্রেনভিলের স্ট্যাম্প ট্যাক্সের বিরোধিতা করে। পুরাতন ও সুপরিচিত 'প্রতিনিধিত্ব ব্যতিরেকে কর প্রদান নয়' নীতির ভিত্তিতে তারা প্রতিবাদ উত্থাপন করে বলে যে, তাদের হিসেবি বাজেটের তুলনায় উক্ত কর বোঝাস্বরূপ (প্রকৃত প্রস্তাবে করের পরিমাণ খুব বেশি ছিলো না)। এই সমস্যা ছিলো ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের প্রকৃত প্রতিফলন। আর এটিই অতলান্তিক মহাসাগরের দুই তীরের ইংরেজদের বিভক্তির পথে নিয়ে যায়। আমেরিকায় যেমন ছিলো টোরি এবং লয়ালিস্ট, তেমনি ইংল্যান্ডে ছিলো আমেরিকান এবং ছইগ। সেই সময়ের তিন জন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ চ্যাথাম, বার্ক এবং ফক্স উপনিবেশগুলিতে বল প্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। বৃটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরাট অংশ তাদের মতামতকে অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান করেছে। প্রাথমিক

তবে বিরাটের পরিত্র এতটা ঘরোয়া ছিলো যে রাজার বাহিনীর অফিসাররা কমিশন পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়, তবু তারা মহাসমুদ্রের ওপারের স্বজনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে সম্মত ছিলো না। এতে তারা সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হতো বলেও মনে হয় না।

আমেরিকার ইতিহাসকারগণ আজকাল স্বীকার করেন যে, তাদের পূর্বসূরীরা অস্বীকার করলেও ইংরেজদের পক্ষের যুক্তির জোর অনেক বেশি ছিলো। উত্তর আমেরিকার ভবিষ্যৎ এখনও নিরাপদ নয়। ইন্ডিয়ানদের পক্ষ থেকে বিপদের ভয় সব সময় ছিলো। ইউরোপের যে অবস্থা তাতে ফ্রান্স কিংবা স্পেন পুনরায় আক্রমণ শুরু করতে পারে। একটা ঔপনিবেশিক প্রতিরক্ষা বাহিনী তা যেভাবেই গঠিত হোক না, যে কোনো ঝুঁকির বিরুদ্ধে মোটামুটি বিমা হিসেবে কাজ করতো। পারস্পরিক ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে এ ধরনের কোনো প্রচেষ্টায় অর্থ যোগান দিতে উপনিবেশগুলি অসমর্থ হয়। তাছাড়া এখানে ভাববার মতো কোনো কারণ ঘটেনি যে ১৭৫৪ সালে, যখন ফরাসি তরফ থেকে বিপদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, একটু বিপজ্জনক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও দশ বছর পর তা সফল হতো (যখন ফরাসিদের চূড়ান্তভাবে বিতাড়িত করা হয়)। তাহলে কি মানতে হবে যে বৃটিশ পার্লামেন্ট তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি ঔপনিবেশিকদের উপর কর আরোপ করে সেটা হবে দৌরাত্মপূর্ণ এবং অন্যায় কাজ? অন্তত যেখানে উক্ত টাকা ব্যয় করা হবে উপনিবেশগুলিতে একটি বাহিনী পোষার জন্য, যে বাহিনী শুধু উপনিবেশগুলির প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে?

আয়েসি, সুখ-সন্ধানী বৃটিশ উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আইন প্রণেতাগণ আকস্মিকভাবে তাদের দূরবর্তী সাম্রাজ্যগুলির প্রশাসনের অদ্ভুত সমস্যার সম্মুখীন হন। এই আইন প্রণেতাগণ উপলব্ধি করতে পারেন নি যে অতলান্তিকের ওপারের সাম্রাজ্যগুলির অসংস্কৃত গণতন্ত্র এখনও অতি উৎসাহের সঙ্গে ক্রমওয়েলীয় যুগের আদর্শ পোষণ করে। আরো গুরুতর ব্যাপার এই যে, রাজা দেখতে পান যে তিনি এখন একই সঙ্গে মন্ত্রিসভা এবং পার্লামেন্টের প্রভু। অতএব তার পক্ষে সমস্যাটা উপলব্ধি করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। গ্রেনভিল প্রস্তাবিত ট্যাক্সের কারণে যে প্রচণ্ড সোরগোল ওঠে, তাতে উক্ত কর প্রস্তাব বর্জন করা সাধারণ বুদ্ধির কাজ। তাছাড়া কলনিগুলি থেকে তাদের ইচ্ছের বাইরে সরবরাহ বন্ধ করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক ছিলো। কিন্তু রাজা তৃতীয় জর্জ ভাবতেন অন্য রকম। তিনি মনে করেন উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ দমনে শক্তি প্রয়োগের বিকল্প নেই। নীতির ব্যাপারে তিনি কোনো প্রকার ছাড় দিতে প্রস্তুত নন। ১৭৬৫ সালে স্ট্যাম্প ট্যাক্স প্রত্যাহার করা হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়ম্বরে পার্লামেন্ট থেকে ঘোষণা করা হয় যে, উপনিবেশগুলির উপর কর আরোপের পূর্ণ অধিকার বৃটেনের রয়েছে। কাচ, দস্তা, কাগজ, চা ইত্যাদির উপর কর আরোপ করা হয় ১৭৬৭ সালে। করেন চার্লস টাউনসেন্ড। যদিও করের পরিমাণ ছিলো খুবই কম। রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্য এই করগুলি আরোপের পেছনে কাজ করেনি। কর্তারা চেয়েছিলেন গৃহীত নীতির প্রতিফলন ঘটাতে। এবার উপনিবেশিকদের অসন্তোষ সকল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। যখন দেখানো হয় যে, যে পরিমাণ কর আরোপ করা হয়েছে তা আদায় করতে খরচ হয় তার চেয়ে বেশি, তখনও উত্তেজনা প্রশমিত করা যায়নি, ম্যাসাচুসেটস দ্রুত বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায়, এবং তখনও রাজা স্বীয় নীতি থেকে বিচ্যুত হতে অস্বীকার করেন। এক ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে লর্ড নর্থের মন্ত্রিসভা চার্লস টাউনসেন্ড প্রস্তাবিত সকল কর প্রত্যাহার করে, তবে চায়ের উপর আরোপিত শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়নি। এর চেয়ে বড় ধরনের

বোকামির কথা ভাবা যায় না। চায়ের উপর আরোপিত শুল্ক থেকে বছরে সবচেয়ে বেশি হলে ষোল হাজার পাউন্ড অর্জন করা যেত। এদিকে মন্ত্রিসভা সর্বসাধারণকে বশীভূত করার জন্য ১৭৬৯ সালের মে মাসে ঘোষণা দেয় যে, রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য তারা আমেরিকানদের উপর আর কোনো প্রকার কর আরোপ করবে না। আমেরিকানরা এর যে জবাব দেয় তাকে যুদ্ধের সঙ্কেত বলে গণ্য করতে হয়। ১৭৭৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মাসে মোহাওক (Mohawk) ভারতীয়ের ছদ্মবেশ ধারণ করে এক দল লোক বোস্টন পোতাশ্রয়ে নোঙর করা তিনটি জাহাজে ওঠে, এবং জাহাজভর্তী সকল চায়ের বস্তা জলে ফেলে দেয়। এর প্রতিশোধ হিসেবে বৃটিশ মন্ত্রিসভা বোস্টন নৌবন্দর বন্ধ করে দেয়, ম্যাসাচুসেটস চার্টার বা সনদ সংশোধন করে। উপরন্তু আইন করে যে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত কারাবন্দীদের বিচারের জন্য অন্য কোনো উপনিবেশ কিংবা গ্রেট বৃটেনে প্রেরণ করতে হবে। তবে কথিত রাজ্যে তাদের ন্যায্য বিচার পাবার সম্ভাবনা তিরোহিত হলো।

এই সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে অন্যান্য উপনিবেশ ম্যাসাচুসেটসকে ঘিরে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলে। অতঃপর তারা গঠন করে বিধিসম্মত লিগ ও কভেনান্ট। এর সদস্যরা প্রতিজ্ঞা করে যে ঘৃণিত আদেশগুলি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তারা গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে কোনো প্রকার বাণিজ্য করবে না। ১৭৭৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বারোটি রাজ্যের প্রতিনিধিরা ফিলাডেলফিয়ায় একটি সম্মেলনে (Congress) যোগ দেয়। লক্ষ্য হলো বৃটিশ রাজশক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য কোন কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। প্রতিটি পক্ষ একে অপরের দুর্বলতা ও শক্তি সম্পর্কে বিবেচনা করে।

বৃটিশদের যুদ্ধ পরিচালনা ছিলো দুর্ভাগ্যজনক। যে নীতির দরুন যুদ্ধ এড়ানো যায়নি যুদ্ধ পরিচালনার নীতি ছিলো তার চেয়ে খারাপ। উপনিবেশসমূহের বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশের অভিমত ছিলো বৃটিশদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার অনুকূলে। অপর পক্ষে এর চেয়েও বড় একটি সংখ্যা কথিত ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন কিংবা বলা যায় অনিশ্চিত অবস্থায়। এই বন্ধুসুলভ এবং অনিশ্চিত ঔপনিবেশিকদের তোষণ বা তুষ্ট করা, বন্ধুসুলভ আমেরিকানদের সম্পত্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, এবং যেখানে সম্ভব সেখানে বেসরকারি প্রশাসন পরিচালনায় বন্ধুসুলভ আমেরিকানদের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত ছিলো বৃটিশ কর্মপন্থার মূল লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবে সে ধরনের কিছু করা হয়নি। যেখানে ইণ্ডিয়ানদের সমর্থন বৃটিশরা সুন্দরভাবে নিশ্চিত করেনি, সেখানে প্রতিটি সীমান্তবাসীকে শত্রুতে পরিণত করা হয় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে। লর্ড হাউই-র বাহিনী (হেসিয়ান ও হ্যানোভারিয়ানদের দ্বারা গঠিত) বন্ধু ও শত্রুতে পার্থক্য না করে নির্বিচারে সবার বাড়ি ঘরে লুণ্ঠন চালায়। বৃটিশ সৈনিকদের নিন্দাজনক আচরণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গেলে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, মাত্র আড়াই হাজার অনুগত স্বেচ্ছাসেবক বৃটিশদের পক্ষে যোগ দেয়।

তথাপি, ফ্রান্স ও স্পেন আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধে যোগ না দিলে উপনিবেশিকদের হয়তো যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে হতো। এমনকি জর্জ ওয়াশিংটনের মতো প্রতিভা (তিনিই ছিলেন উভয় পক্ষের মধ্যেকার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি) আমেরিকান বিপ্লবের পর্যায়ক্রমিক পরাজয় থেকে রক্ষা করতে পারতেন না। "স্বাধীনতার পুত্রদের" সামরিক ইতিহাসের জন্য লঙ আইল্যান্ড, ট্রেনটন, ব্রান্ডিওয়াইন ছিলো কালো দিবস। এখানে কিছু আশ্চর্য হবার মতো কোনো ব্যাপার নেই। আমেরিকা রাষ্ট্র তখন নির্মাণের পথে। সদ্য গঠিত ফেডারেশনের রাজধানী

ফল [illegible] সব কিছু ছিলো কাঁচা অবস্থায়, সব কিছু পরীক্ষামূলক, রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা, [illegible] অনুভূতি এবং রাষ্ট্রীয় সংহতি এখনো তৈরি হয়নি। সিভিলিয়ানরা সৈনিকদের [illegible] এবং দিক নির্দেশনা দিতে সমর্থ হন। এই জন্য ওয়াশিংটন, বলতে গেলে তিনি একাই ভ্যালি ফোরজের (Valley Forge) শিবিরে সুতীব্র শৈত্য প্রবাহের মধ্যে কঠিন অবস্থায়, একটি অনুন্নত বাহিনীকে (এদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীরও অভাব ছিলো) সুশৃঙ্খল করেন, তাদের মধ্যে সাহস সৃষ্টি করেন শক্তিধর, এদের রূপান্তরিত করেন, আরো একবার বিজয়ের বীজ হিসেবে। এটি ছিলো একেবারে ক্ষুদ্র একটি বিপ্লব। কারণ, জনগণ এতটা দৃঢ়প্রত্যয়ী এবং একতাবদ্ধ ছিলেন যে যুদ্ধের কোনো পর্যায়ে জর্জ ওয়াশিংটনের বাহিনীর সংখ্যা বিশ হাজারের অধিক ছিলো না।

১৭৭৭ সালের সেপ্টেম্বরেই অক্টোবর জেনারেল বুরগয়েনের অধীনে একটি ইংরেজ বাহিনী কানাডা অভিমুখে, লিউইয়র শহরের দিকে যাত্রা শুরু করে। তাদের সারাটোগায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়। এই আকস্মিক বজ্রপাত গোটা পৃথিবীতে ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হয়, এবং এতে রাজতান্ত্রিক ফ্রান্স অনুপ্রাণিত বোধ করে। তথা বন্য ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে, প্রতিশোধ স্পৃহা এবং অতুৎসাহে আমেরিকান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় (১৭৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে)।

ষোড়শ লুই এবং মারি আঁতোয়ানেতের জন্য এর চেয়ে অবিচক্ষণ কর্মপন্থা আর কিছু হতে পারে না। কারণ আমেরিকার যুদ্ধ শুধু ফরাসি ভঙ্গুর আর্থিক ব্যবস্থায় চূড়ান্ত আঘাত করেনি, এই যে প্রজাতন্ত্রবাদের জয় হলো, অতলান্তিক মহাসাগরের ওপারে রাজতন্ত্রের ঘটলো পূর্ণ পরাজয় তা প্রতিটি প্রাগ্রসর ফ্রান্সবাসীর মন ইউরোপকে নবরূপ দানের আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত করে। তারা এখন চায় ইউরোপকে নতুন আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীনতার আদর্শে নবরূপ দিতে। এই যে আমেরিকার ঔপনিবেশগুলি ফ্রান্স ও স্পেনের সহায়তায় মুক্তি লাভ করলো, তা অতলান্তিক মহাসাগরের উভয় প্রান্তের লোকদের উক্ত বিবাদ সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণায় পরিবর্তনের সূচনা করে। অতঃপর আমেরিকান যুদ্ধ আর ঘরোয়া বিবাদ হিসেবে গণ্য হলো না। এটি রূপান্তরিত হলো আন্তর্জাতিক ক্যাসাদে। ঔপনিবেশিকরা ইংল্যান্ডের বৈদেশিক শত্রুদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলো। ইংল্যান্ডের কয়েকটি শত্রু দেশের সাহায্যও তারা লাভ করে। ঔপনিবেশগুলিতে যে বিদ্রোহের সূচনা হয়, তা প্রথমে ঘরোয়া বিবাদ হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু অবিলম্বে তা বৈশ্বিক ঘটনায় রূপান্তরিত হয়। গ্রেট বৃটেন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে শত্রুর মোকাবেলা করে, করতে হয়। তাদের সম্পদের উপর টান পড়ে। যেন বুরবঁ রাজতন্ত্রের শত্রুতা যথেষ্ট নয়, এজন্য ওলন্দাজরা পুরোনো বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উত্তরাঞ্চলীয় নিরপেক্ষ শক্তিগুলিও রাশিয়ার ক্যাথারিনের নেতৃত্বে একটি জোটও গঠন করে। জলভাগে নিরপেক্ষ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃটিশ নৌবাহিনী যদি পূর্বের মতো অন্যায় আচরণ করে তবে তারা হস্তক্ষেপ করবে। গ্রেট বৃটেন এতটা বান্ধবহীন কিংবা বিপদগ্রস্ত হয়নি ইতিপূর্বে। করুণওল উপকূলে তাদের যদি ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হতে হয়, এমনকি সিংহল ও সুমাত্রা দ্বীপেও, যদি হায়দার আলি কর্নাটকে রক্ত গঙ্গার সূচনা করে থাকেন, যদি ফরাসি নৌবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৃটেনকে আটটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ হাত-ছাড়া করতে হয়ে থাকে, মিনোর্কা এবং ফ্লোরিডা তাদের দখল থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়ে

থাকে, তাহলে তার জন্য দায়ী করতে হবে দেশটির ঔপনিবেশিক সন্তানদের একগুঁয়েমিকে। লর্ড চ্যাথাম আমেরিকানদের একমাত্র বৃটিশ বন্ধু ছিলেন না, যিনি (বিদ্রোহীরা বিদেশী শক্তিগুলির কাছে সাহায্যের আবেদন জানানোর পর) অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অনুভব করেন যে অতঃপর আত্মসমর্পণের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

যুদ্ধ নানা প্রকার ভুল বোঝাবুঝির জন্মদাতা। ফরাসিরা একটি দাস মালিকদের প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ও সাম্যের স্বরূপ না বুঝেই তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। ধর্ম এবং মেজাজের দিক থেকে আমেরিকার অধিবাসী এবং ফরাসিদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে মিল ছিলো না। অথচ তারা ফরাসিদের বীরব্রতী এবং আদর্শ হিসেবে গণ্য করে। ইংরেজদের গণ্য করে বদমেজাজী হিসেবে, যে ইংরেজদের জাত থেকে তারা উদ্ভূত, যে ইংরেজদের ভাষা, সাহিত্য এবং শাসনতন্ত্র তারা গ্রহণ করেছে। আরো একটি বিভ্রমের ফলশ্রুতি ছিলো গুরুতর। ঔপনিবেশিক যুদ্ধে বৃটেনের পরাজয়ের ফলে একটা সাধারণ বিশ্বাস প্রচার পায় যে ইংরেজদের ইতিহাসের অবসান ঘটেছে। ওয়েস্টমিনস্টারের পার্লামেন্টের সঙ্গে তুলনা শুরু হয় ওয়ারশর (পোল্যান্ডের রাজধানী) ডায়েটের। ইংরেজদের রাজনৈতিক জীবনাচরণের বিভক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয় পোলদের ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক মতভেদের।

প্রুসিয়ার রাজা ফ্রেডারিক, রাশিয়ার রানী ক্যাথরিন এবং অস্ট্রিয়ার শাসক জোসেফের মতো ক্ষমতাধর এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে ইংল্যান্ডের সূর্য অস্তমিত। ১৭৬৩ সালে ইংল্যান্ডের মর্যাদা ছিলো তুঙ্গে। অথচ মাত্র আঠারো বছর পর অকটাডনের আত্মসমর্পণের পর তাদের পতিত হতে হয় নিদারুণ দুর্দশায়। বৃটেনের কর্মকাণ্ড জরিপ করা সকল কালেই কঠিন ব্যাপার ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তিকে অতিরিক্ত খাটো করে দেখলে, গুরুতর আঘাত পেতেই হবে। একদলে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানি যেমন দুর্ভাগ্য বরণ করেছে। নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উপরোক্ত হিসাব-নিকাশ একেবারে অন্যায্য ছিলো না। যে ইংরেজ সরকার (১৭৭০—১৭৮২) আমেরিকান উপনিবেশগুলি হারায় সে সরকার কোনো গৌরবজনক ছিলো না। সরকারের পরিচালকরা ন্যূনতম মাপের দক্ষতারও পরিচয় দিতে পারেনি। প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ যুদ্ধে বিশ্বাস করতেন না, তবে রাজার ইচ্ছানুসারে সবকিছু করেন। ক্যাবিনেট ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। হুইগ দল ভেঙে পড়ার যোগাড় হয়েছিলো। চ্যাথামের নড়বড়ে ভাগ্য ১৭৭৮ সালে চূড়ান্তভাবে তলিয়ে যায়। তার পুত্রের ঠাণ্ডা এবং শক্তিশালী মেধার আলোকশিখা তখনো দিগন্তকে আলোকিত করেনি। যুদ্ধ পরিচালনায় কোনো প্রকার দক্ষতার পরিচয় মেলেনি, জনপ্রিয়তাও অর্জন করেনি, সাফল্যও আসেনি। কেবল চার্লস ফক্সের মেধাবী যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতার দরুন ওয়েস্টমিনস্টারে রাজনৈতিক কল্পনা-প্রতিভার শিখা জ্বলতে দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে দেশের জনগণের মধ্যে অস্থিরতার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রচলিত ব্যবস্থায় সর্বত্র দুর্নীতি এবং অযোগ্যতার ছেয়ে যায়। বার বার ব্যর্থতা ঢুকাতে হয়। শিল্প শহরগুলির জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি ওঠে। বিকল্প হিসেবে রাজার ক্ষমতাকে খাটো করতে বলা হয়। তিনি যেন পার্লামেন্টকে দুর্নীতিগ্রস্ত করতে না পারেন। কিন্তু সবশেষে ১৭৮২ সালে হুইগ দল আরো একবার ক্ষমতায় ফিরে আসে, এবং পরবর্তী বছর ভের্সাইতে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় আমেরিকার সঙ্গে, আমেরিকার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তখন ইউরোপীয় মহাদেশ শুধু লক্ষ্য করে যে একটা

সাম্রাজ্যের অবসান ঘটলো। অথচ কেউ লক্ষ্য করেন নি যে একটা শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করা হলো। অথচ এটিই ছিলো ঘটনা। রাজার আমেরিকান নীতির ব্যর্থতার দরুন ব্যক্তি শাসনের কার্যকর পরীক্ষা নিরীক্ষার (বৃটেনে) ইতি টানা হলো।

তবে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার নজর এড়িয়ে যায়। পরাজিত দেশটি একের পর এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পরিবর্তন কার্যকর করে গোটা জগতের কর্মশালায় পরিণত হয়। একই সঙ্গে পরিণত হয় জগতের প্রধান আর্থিক বাজারে।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলী

১. ডব্লু. ই. এইচ. লিকি : হিস্টোরি অব ইংল্যান্ড ইন দ্য এইটিন্থ সেনচুরি। ৮ খণ্ড। ১৮৭৮–৯৫

২. জেমস ট্রাসলো অ্যান্ডামস : দ্য ফাউন্ডিং অব নিউ ইংল্যান্ড। ১৯২১।

৩. জি. বি. হাংস : দ্য ওল্ড কলোনিয়াল সিসটেম। ১৯০৫

৪. জি. এল. বিইর : কর্মাশিয়াল পলিসি অব ইংল্যান্ড টুওয়ার্ডস দ্য আমেরিক্যান কলনিস ১৮৯৩।

৫. জে. এল. হ্যামন্ড : চার্লস জেমস ফক্স ১৯০৩।

৬. স্যার জেমস ট্রিভেলিয়ান : দ্য আমেরিক্যান রিভোলিউশন ১৯০৫।

৭. এস. ই. মরিসন : দ্য অক্সফোর্ড হিস্টোরি অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, ১৭৮৩–১৯১৭, ২য় খণ্ড ১৯২৭।

৮. ক্যামব্রিজ মডার্ন হিস্টোরি, ৩য় খণ্ড।

৯. ই. বি. থ্রিন : দ্য রিভোলিউশনারি জেনারেশন, ১৭৬৩–১৭৯০। ১৯৪৩।

১০. বি. ল্যাভাস্টার ও জে এইচ. প্রাব দ্য রিভোলিউশন। ১৯৫৮।

১১. এল. এইচ. জিপসন : দ্য কামিং অব দ্য রিভোলিউশন ১৭৬৩–৭৫, ১৯৫৪।

১২. জে. সি. মিলার : ওরিজিনস অব দ্য আমেরিক্যান রিভোলিউশন ১৯৪৫।

ইংল্যান্ড, গোটা বিশ্বের কর্মশালা

ইংরেজ বাণিজ্যিক ঋণের ভিত্তিস্থাপন। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এবং জাতীয় ঋণ. প্রটেস্টান্টদের ক্ষমতা লাভের ফলশ্রুতি এবং শিল্পের বিকাশ। জাহাজে বহন করা কাঠ ও কয়লা। ইংল্যান্ড গোটা বিশ্বের কর্মশালায় পরিণত। প্রাকৃতিক প্রাচুর্য। সরকারের অবহেলা পিউরিট্যান শক্তি। একদল উদ্ভাবক। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। পুঁজিবাদী যুগ। ফরাসি যুদ্ধের বিপর্যয়। অবোধ্য অবস্থা ব্যাপারে উদাসীনতা। অ্যাডাম স্মিথ এবং কার্ল মার্কস।

চতুর্দশ লুই-এর বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধের একাধিক ফলশ্রুতি ছিলো। প্রথমত স্থাপিত হয় ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এবং জাতীয় ঋণ। শুরুতে এই উদ্ভাবনাগুলির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অথচ এই উদ্ভাবনাগুলির জন্য সুদূর সুফল পাওয়া যায়। নচেৎ তুলনামূলকভাবে কৃষিক্ষেত্রে দরিদ্র একটি দ্বীপ, চমৎকার যান্ত্রিক কলাকৌশল উদ্ভাবন এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপের প্রধান কর্মশালায় পরিণত হতে পারতো না, প্রধান ঋণ বাজারে পরিণত হওয়াও সম্ভব ছিলো না। তৃতীয় উইলিয়ামের সময় ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা হওয়ার দরুন স্টিম ইঞ্জিন এবং তাতকলের অর্থনৈতিক ফলশ্রুতি পুরোটা কাজে লাগানো সম্ভব হয়। ইংল্যান্ডের আর্থিক ব্যবস্থা যদি ত্রুটিপূর্ণ হতো, যেমন ফ্রান্সের আর্থিক ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিলো, তাহলে এই ঘটনা কোনো মতেই ঘটতে পারতো না। শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ডকে সমৃদ্ধ এবং ক্ষমতাশালী দেশে পরিণত করে, অন্যথায় দেশটির পক্ষে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের চাপ সহ্য করা সম্ভব হতো না। এই শিল্প বিপ্লবের চাকা সচল রাখে সঠিক আর্থিক ব্যবস্থা। ইংল্যান্ডের আর্থিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ছিলো ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।

ইউরোপ দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যাংক এবং ব্যাংক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সুপরিচিত। মুদ্রা পরিবর্তন, মুদ্রা সঞ্চয়, ধার প্রদান বহুকাল যাবৎ চলে আসছে। বলতে গেলে এগুলি ব্যাবিলন এবং মিশরের বাজারগুলির মতোই পুরাতন। গ্রিস ও রোমের মানি চেঞ্জারগণ, ইহুদি কুসীদজীবীগণ, যাদের আবির্ভাব ঘটে কুখ্যাত বর্বর আক্রমণের পর, ব্যাংক অব জেনোয়া (ধর্মযুদ্ধে অর্থের যোগানদার), লোম্বার্ডগণ, ইংল্যান্ডের একটি বিখ্যাত রাস্তার নাম এদের নামানুসারে রাখা হয়েছে, ফ্লোরেন্সের মেডিসি বংশ, পোপতন্ত্রের জন্য এই বংশ রাজস্ব সংগ্রহ করে, সাম্রাজ্য টিকে যায়, লন্ডনের স্বর্ণকারগণ, এরা প্রভূত ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, এবং অনেক সময় দ্বিতীয় চার্লসকে অগ্রিম দেয়, এই এজেন্সিগুলি বিভিন্ন মাত্রায় আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার কিছু কিছু কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়, বণিকবৃত্তি অনেক সহজ করে তোলে, ধনসম্পদ সঞ্চয়েও অবদান রাখে। যাহোক, ১৬০৯ সালে আমস্টার্ডাম ব্যাংক স্থাপিত হবার পরই শুধু বাণিজ্য এবং আর্থিক ব্যবস্থা আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে। এই জনবহুল এবং উন্নতিশীল নগরীতে শস্য ও সোনার অবাধে বেচা-কেনা চলেছে, সোনারের স্বাভাবিক ওঠানামাও তখন লক্ষ্য করা গেছে, বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় চলেছে, বিভিন্ন সরকারকে ধার প্রদান করা হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর ব্যাণিজ্যিক কারবার চলেছে ব্যাংকের মাধ্যমে, ফলে কাজটা সহজে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ওলন্দাজদের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে তাদের উপরোক্ত উদাহরণ মুগ্ধ না হয়ে পারে না। লন্ডন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে যে একটি ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশ অবলীলায় ও সেনা বাহিনীর জন্য অর্থের যোগান দিয়ে যাচ্ছে। বিরাট ও বায়বহুল কার্যক্রম গ্রহণ করছে। তাদের উদ্যোগসমূহের আয়তন কোনো প্রকার অনুপাত গ্রাহ্য করে চলে না, দেশের আয়তনের দিক থেকেও না, জনসংখ্যার দিক থেকেও না। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালের অন্যতম বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ স্যার উইলিয়াম টেম্পল সঠিক উপলব্ধি করেন যে ইংল্যান্ডের সকল শক্তির উৎস তার জাতীয় ঋণ ও জাতীয় ব্যাংক। তিনি ইংল্যান্ডকে ওলন্দাজ উদাহরণ অনুসরণের জন্য আহ্বান জানান। ওলন্দাজরা যে ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে তার মূল তাৎপর্য। সাধারণ নাগরিকের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদ বিনিয়োগের ব্যবস্থা তৈরি করে, ফলে জনসাধারণ খরচের ব্যাপারে সতর্ক হতে শেখে। দেশের পক্ষেও পুঁজি গঠন সহজ হয়, ফলে বড় উদ্যোগের বোঝা বহন দুঃসাধ্য হয় না। রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে। এই সাধারণ মানুষদের বণিকবৃত্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। একটা অর্থ-লিপ্সু সরকারের সামনে বিকল্প হিসেবে দাঁড়ায় আর্থিক নিয়ম-শৃঙ্খলা। ব্যাংকিং প্রথা এবং সরকারে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানের নিয়ম চালু হওয়ার আগে ইউরোপ মহাদেশের প্রায় প্রতিটি সরকার নিয়মিতভাবে অর্থাভাবে ভুগেছে। রানী এলিজাবেথ ছিলেন সবচেয়ে ব্যয়কুণ্ঠ। ফলে তার সময়ে দেশে আর্থিক যোগানে কখনো ঘাটতি দেখা দেয়নি। কিন্তু ওলন্দাজরা খরচের ব্যাপারে ছিলেন মুক্তহস্ত, অথচ তারা গোটা সপ্তদশ শতাব্দী স্বচ্ছলতায় কাটিয়েছে। কারণ তারা রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে একটি কার্যকর আর্থিক পদ্ধতি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়।

ওলন্দাজদের উদাহরণ অতিরিক্ত জোর পায় নীতিহীন মূল্য এবং ব্যয়বহুল যুদ্ধের চাপে। একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গঠনের জন্য সরকারকে প্রথম আহ্বান জানান স্কটল্যান্ডের উইলিয়াম প্যাটারসন। ইনি ছিলেন মেধাবী এবং কল্পনা প্রতিভায় ঋদ্ধ। লন্ডন নগরীতে কারবার করে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হন। তার পরিকল্পনা ১৬৯৪ সালে বাস্তবায়িত করেন আর্ল অব হ্যালিফ্যাক্স, চার্লস মন্টেগু। যেহেতু যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, ফলে গভর্নর অ্যান্ড কোম্পানী অব দ্য ব্যাংক অব ইংল্যান্ড নামে একটি নিগম গঠন করা হয়। লক্ষ্য টাকা যোগাড়। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্যাংক অব ইংল্যান্ড গঠনের জন্য হুইগরা পার্লামেন্টে বিল পেশ করে, পার্লামেন্টের অনুমোদনও লাভ করা যায়। এই প্রকল্পের বাস্তবতা ব্যাপারে রাজনীতিকদের মধ্যে কোনো সন্দেহ ছিলো না। লন্ডন নগরীও ছিলো সন্দেহমুক্ত। ফলে হিসাবের খাতা খোলার দশ দিনের মধ্যে গোটা ঋণের টাকা উঠে আসে (১,২০০,০০০ পাউন্ড)। এই ঘটনা না ঘটলে ইংরেজরা সমুদ্রে জাহাজ ভাসাতে পারতেন না।

সপ্তদশ টোরি সদস্যদের কাছে হুইগদের নতুন আর্থিক ব্যবস্থা ঘৃণ্য চক্রান্ত হিসেবে গণ্য হয়। তাদের কাছে এটি ছিলো জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী, এবং এটা দেশের জন্য ক্ষতি থেকে অনেক। কিন্তু ব্যাংকের ভিত্তি ছিলো সুদৃঢ়, ফলে এর শত্রুরা পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পায়নি। জমিদার শ্রেণী এই ব্যাংকের বিরুদ্ধে আঘাত হানে, একটি ল্যান্ড ব্যাংকও এর বিপক্ষে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তবে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড সকল বাধা অতিক্রম করে। ব্যাংককে নোট ইস্যু করার অধিকার প্রদান করা হয় (১৬৯৭) এবং ১৮১০ সাল পর্যন্ত এ

ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার থাকে। যেসব কারণে সিংহাসনে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী বংশ সমর্থ হন তার মধ্যে প্রধান হলো মনে করা হয় যে (এই বিশ্বাস প্রায় সব সাধারণের ছিল জ্যাকবপন্থীদের সিংহাসনে আরোহণ করতে দিলে তারা জাতীয় ঋণ পরিশোধে সম্মত হবে না। আর এর জন্যই মার্লবরো তার বিজয়গুলি অর্জনে সক্ষম হন। শিল্প বিপ্লবের পথে প্রথম পদক্ষেপ তখনই নেয়া হয় যখন ইংলিশ ক্রেডিট আধুনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই শিল্প বিপ্লবই সারা জগতে কারখানা প্রথা ছড়িয়ে দিয়েছে, এবং সম্পদ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে বহুগুণ।

জার্মানির বনবিহারী সংগীত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একটা যুগ ছিলো যখন উত্তর ও মধ্য ইউরোপের বস্তুগত সভ্যতা পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলো বন-সম্পদের উপর। দুই হাজারেরও অধিক কাল সময় মানুষ প্রধানত কাঠের বাড়ি-ঘরে বাস করেছে। তারা ভাসিয়েছে কাঠের জাহাজ, কাঠ দিয়ে উনুন জ্বেলে ঘর গরম রেখেছে, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তৈরি করেছে কাঠের গৃহস্থালী সামগ্রী, কৃষি ও শিল্পের হাতিয়ার। ইতালিয়রা পাথর, ইঁট, মার্বল ব্যবহার শেখায়। তারা ইঁট নির্মাণের পদ্ধতিও উদ্ভাবন করে (প্রাচীন রোমে অবশ্য ইঁট নির্মাণের পদ্ধতি জানা ছিলো ; উক্ত পদ্ধতি পুনরায় আবিষ্কার করে ক্র্যাঙ্কটনের সমকালীনরা)। এর বহুকাল পরও উত্তর ইউরোপের প্রধান নগরগুলি নির্মাণ করা হয় কাঠের উপকরণ ব্যবহার করে। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে লন্ডন নগরী আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়। উক্ত নগরী তখন ছিলো কাঠের তৈরি। কাঠের তৈরি মস্কো নগরী নেপোলিয়নের চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গ্রামীণ ঐতিহ্য এতটা গভীরে প্রোথিত ছিলো যে প্রথম স্টিম ইঞ্জিন কাঠের তৈরি গাড়িতে মোড়া হয়। যেমন শক্তিচালিত তাঁত (power loom) টানার দায়িত্ব পালন করে সুস্থদেহ ষাঁড়।

বনের বৃক্ষ উজার হওয়া ঠেকানোর চিন্তা শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। কারণ রূপার খনির জন্য, চিনে মাটি ও কাচের পাত্র তৈরির জন্য নির্বিচারে বৃক্ষনিধন যজ্ঞ শুরু হয়। কিন্তু পশ্চিমের সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির জন্য (এদের বিকাশ ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীতে) কাঠের সরবরাহ কোনো স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপার ছিলো না। তা জাতীয় শক্তির জন্য মূল প্রয়োজনে রূপান্তরিত হয়। কমনওয়েলথের নৌবাহিনী গঠনের জন্য প্রায় এক মিলিয়ন ওক গাছ কাটার পর, অমায়িক এবং মানবতন্ত্রী জন ইভলিন তার আনন্দদায়ক পুস্তক Sylva-তে প্রশ্ন রাখেন কতো তাড়তাড়ি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃক্ষ রোপণ করে ইংল্যান্ড তার সমুদ্রনির্ভর অবস্থানের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করবে। আমরা অনুমান করতে প্রলুব্ধ বোধ করি যে, সারের উক্ত ভদ্রলোকের ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য নেলসনের নৌবহর কাঠ দ্বারা নির্মাণ করা সম্ভবপর হয়। তবে ইংল্যান্ড এতটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটানোর জন্য শুধু অভ্যন্তরীণ সরবরাহের উপর নির্ভর করেনি। উইন্ডসর, হসটফিল্ড এবং সেলউড বন উজার হওয়া থেকে রক্ষা পায় ম্যাসাচুসেটসের বনের জন্য। সেই প্রথম ম্যাসাচুসেটসের বনে মানুষের হাত পড়ে। এক্ষেত্রে যেমন, তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরাতন পৃথিবীর ঘাটতি পূরণের জন্য নতুন পৃথিবীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

ইতিমধ্যে স্কালানির ভিন্ন উৎস (মধ্যযুগে জানা ছিলো) বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের চিন্তা শুরু হয়। নিউকাসল থেকে জাহাজ ভর্তি কয়লা আসতে শুরু করে লন্ডন নগরীতে সাধারণ ব্যবহারের জন্য। ইউরোপীয় ইতিহাসের জন্য এই নতুন যুগ (যার সূচনা অবিলম্বে ঘটবে)

ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কালে সবচেয়ে অগ্রসর সমুদ্রনির্ভর ও বাণিজ্যিক একটি রাষ্ট্র তাদের রাজধানীকে পুনঃনির্মাণ করে পাথর ও ইট দ্বারা, একটা সর্বাঙ্গীণ ব্যাংক চালু করে, তাছাড়া কয়লার ব্যবহার প্রচলন করে ব্যাপক হারে। এতে সবাই একটা নতুন শক্তির উৎস সম্পর্কে জানতে পারে, যা জগতের অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটায়। এই রূপান্তরের তাৎপর্য এবং প্রতিক্রিয়া ছিলো সুদূরপ্রসারী।

এর আগে, পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল আগে, ইউরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে ইংলান্ড বেশিমাত্রায় আধুনিক কারখানা প্রধান শিল্প রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে। দেশটি কৃষি ও কুটির শিল্প প্রধান অঞ্চল হিসেবে আর থাকেনি। দেশের রাস্তাঘাট এতটা বাজে ছিলো যে ঘোড়ার পিঠে চড়েও (পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম) অর্ক শহর থেকে লন্ডন নগরীতে পৌছতে সপ্তাহ খানেক লেগে গেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মধ্যযুগীয় কৃষি ব্যবস্থার অপ্রয়োজনীয় প্রথারও অবসান ঘটে। জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, তারা কৃষিখামার প্রথার প্রবর্তন করেন। বৃক্ষাদির মূল ও ঘাসের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পর্যায়ক্রম শস্য চাষের রীতি অবলম্বন করে, এতে খাদ্য সরবরাহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়, ফলশ্রুতিতে বাড়ে জনসংখ্যা। প্রথমে জলশক্তি, অতঃপর বাষ্পীয় শক্তি অর্থনৈতিক জীবনের রূপ বদলে দেয়। লৌহ শিল্প রাণী অ্যানির রাজত্বকালে জ্বালানি সংকটে পতিত হয়। তবে অবিলম্বে মধ্য ও উত্তর অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণে। ফলে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। কাঠের স্থান দখল করে লৌহ। গ্রাম্য মেলা এবং ভ্রাম্যমাণ পণ্য বিক্রেতার স্থানে দখল করে পণ্য সামগ্রীর রমরমে খুচরা ব্যবসা, সারাদেশে, গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন দোকানে। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে (১৭৬০ থেকে ১৮২১) ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা সোয়া ছয় মিলিয়ন থেকে উত্তীর্ণ হয় বারো মিলিয়নে। চার প্রজন্মের কার্যকলাপ এবং উদ্ভাবনের ফলে বৃটেন যে অবস্থায় পৌছে তার তুলনা আজ পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যে দ্রুততর যোগাযোগের ব্যবস্থা করে, তা বন্য কল্পনাকেও হার মানায়, কারখানাগুলিতে শ্রম-সাশ্রয়ী উদ্ভাবনকুশল যন্ত্রপাতির ভিড় জমে, ধুম্রায় কলুষিত করে নির্মল বাতাস, শিল্প কারখানাগুলি এক গোলার্ধ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে উৎপাদিত সামগ্রী অপর গোলার্ধে প্রেরণ করে, বিশাল ও ধ্বংসিত নগরী রাতারাতি গড়ে ওঠে, একটা জনসংখ্যার সৃষ্টি হয় যারা শৈশব থেকেই পরিচালিত হতে থাকে কারখানার ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজে, তারা বাধ্য হয় প্রতিশ্রুতিহীন, ক্লান্তিকর শ্রম প্রদানে।

যেসব কারণে বৃটেন শিল্প পুঁজির জন্মভূমিতে পরিণত হয় তার জন্য একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে প্রাকৃতিক প্রাচুর্য। আবহাওয়া ছিলো ঈষৎ আর্দ্র, ফলে তা তুলা শিল্পের জন্য সহায়ক হয়। ইংল্যান্ডের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে জলশক্তির কোনো অভাব ছিলো না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও লোহার অবস্থান ছিলো। জলপথে তা পরিবহণে সুবিধাও হয়। বৃটেনের কয়লা খনিগুলি ছিলো ফ্রান্স ও জার্মানির কয়লা খনিগুলির চেয়ে অনেক বড়ো। উপরন্তু এই খনিগুলির অবস্থান ছিলো পোতাশ্রয়ের সন্নিকটে। লোহা, কয়লা এবং বস্ত্রশিল্পের আশীর্বাদে বৃটেন যে সভ্যতা গড়ে তোলে তা গোটা পৃথিবী অনুকরণ করে।

এই প্রাকৃতিক সুবিধাগুলির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যে সম্ভব হয় তার কারণ জনসাধারণের শিক্ষার স্তর উচ্চে পৌছেছিলো বলে নয়, তার কারণ বাস্তব অবস্থাটাই ছিলো শৈশিল্পিক

উদ্ভাবনের অনুকূলে। উদ্ভাবনের ফলাফলগুলি দ্রুত কাজে লাগানোর ব্যবস্থাও প্রতিকূলে ছিলো না। ইংল্যান্ডের শাসক অভিজাত শ্রেণী ফরাসি অভিজাত সম্প্রদায়ের মতো ছিলেন না। ইংল্যান্ডের অভিজাত শ্রেণীর বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ ছিলো প্রবল। বিলাসিতা করতে গেলে টাকার দরকার। ফলে হুইগ লর্ডরা কারখানা খুলে, খনি ক্রয় করে কিংবা ভারতে বিনিয়োগ করে টাকার পাহাড় গড়তে ঘৃণাবোধ করেনি। উপরন্তু সাফল্যের সঙ্গে রাজশক্তির ক্ষমতা খর্ব করার পর তারা চায়নি অন্য কোনো আবরণে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র সরকারে কায়েম হয় কিংবা স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটে। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ পার্লামেন্টকে কিছুই না করার জন্য হয়তো দোষারোপ করা চলে, তবে তারা অতিরিক্ত কিছু করেনি, এর জন্য তাদের গালমন্দ করাও চলে না। টাকার প্রতি আসক্ত একটি জনগোষ্ঠীর স্বনির্ভর, অর্জনেচ্ছু শক্তির প্রতি পার্লামেন্ট এমন কোনো অন্যায় করেনি যাকে গুরুতর বলে শনাক্ত করা চলে।

এই তুলনামূলক স্বাধীনতার আবহে (এখানে উল্লেখ করতে হয় যে স্কটিশ ইউনিয়নের পর বৃটেন ইউরোপের বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্যিক অঞ্চলে পরিণত হয়) পিউরিট্যানদের উত্তরপুরুষরা আত্মপরিচয় খুঁজে পায়। ১৮২৮ সাল পর্যন্ত সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে ননকনফরমিস্টরা (যারা ইংল্যান্ডের সরকারি গির্জার প্রতি অনুগত নয়) কেবল সম্পদের পেছনে ছুটেছে অকুতোভয়ে। শ্রম প্রদানকে তারা মনে করেছে অপসুদীক্ষা, সুখান্বেষণ মারাত্মক ধরনের পাপ, আর ঐশ্বর্য সৃষ্টি এমন সংকেত যা স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের সেবা পরম প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য। বলীয়ান দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে তারা সকল ধরনের শিক্ষা ও বাণিজ্যের চর্চা করেছে, তবে তারা প্রধানত আগ্রহ বোধ করেছে লৌহ শিল্পের প্রতি, তারা নতুন ইংল্যান্ড নির্মাণে পালন করেছে বিরাট ভূমিকা, এই ইংল্যান্ড কিছুটা কম প্রশান্ত এবং কমনীয় বটে, কিন্তু অধিকতর সম্পদশালী, অধিকতর শক্তিশালী, আগের চেয়ে অনেক বেশি জনবহুল। এই সব পরিবর্তনের ঘটনা ঘটা একেবারে অসম্ভব ছিলো যদি কয়েকটি উদ্ভাবনের ঘটনা না ঘটতো। গুটিকয় অত্যন্ত কীর্তিখ্যাত স্কট ও ইংরেজ (একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্যও এর চেয়ে কম খেলোয়াড়ের দরকার করে), তাদের উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক জীবন একেবারে পাল্টে দেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তারা তাদের যুগের পরিমণ্ডল থেকে প্রয়োজনীয় সমর্থন এবং অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ফ্রান্সিস বেকন কর্তৃক আরোহী পদ্ধতির পক্ষে প্রচারের শুরু থেকেই বিজ্ঞানের প্রভাব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিলো। কোনো কোনো আবিষ্কর্তা, বিশেষ করে জেমস ওয়াট ছিলেন বিজ্ঞানী। জেমস ওয়াট সাহেবই প্রথম শিল্প ক্ষেত্রে স্টিম ইঞ্জিনের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তবু, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চেয়েও (সম্ভবত) গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই ছিলো যে, সকলে অনুধাবন করেন যে জ্ঞান জিনিসটা প্রবৃদ্ধিশীল, এবং পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নতুন সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব (রয়েল সোসাইটিও এই ধারণা প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করে)। একবার কৌতূহল জাগ্রত হবার পর বৃটিশ জাতির তার প্রিয় ভাবনা বিষয়ে সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা শুরু হয়। তবে এবার পিউরিট্যান যুগের মতো বিষয়টা ধর্ম ছিলো না, এবার সার্বক্ষণিক ভাবনার বিষয় দাঁড়ায় শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে ঐশ্বর্য আহরণ।

মহান উদ্ভাবকদের মধ্যেকার কয়েকজন ছিলেন দরিদ্র কারিগর মাত্র, এদের আয়ত্তে না ছিলো বিজ্ঞান, না কোনো প্রকার শিক্ষা। এরা পরিচালিত হয়েছে যন্ত্রকৌশল দ্বারা, নিজেদের কারখানার উপযোগী সে কৌশল। এদের ছিলো সহজাত প্রতিভা। এমন একজন প্রতিভাবান

[illegible] ছিলেন কে অব বোর, ইনি ১৭৩৩ সালে তাঁত শিল্পের জন্য উদ্ভাবন করেন ফ্লাইং শাটল। ফলে বস্ত্রের উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। যা সাধারণ তাঁতিদের সাধ্যের মধ্যে ছিলো না। অতঃপর জেমস হারগ্রিভসের উদ্ভাবিত চরকা (১৭৫৪) বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করে আটগুণ। প্রেস্টনের রিচার্ড আকরাইটের (১৭৩২-৯২) উদ্ভাবনও ছিলো অনুরূপ প্রকৃতির। তিনি উদ্ভাবন করেন স্পিনিং ফ্রেম। ইনি ছিলেন ইংরেজদের তুলা শিল্পের স্থাপয়িতা, কারখানা প্রথার অভিভাবক। খুব কম ইংরেজই ল্যাংকাশায়ারের এই কারিগরের অধিক প্রভাবিত করেছেন মানব সভ্যতাকে। ইনি এক সময় ক্ষৌরকর্ম শেখার চেষ্টা করেছেন, অতঃপর হাত পাকাতে চেষ্টা করেন পরচুলা নির্মাণে, অতঃপর তুলা পরিষ্কার এবং সুতা বুননের জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করেন। এতে ব্যাপক হারে সুতা উৎপাদন সম্ভবপর হয়। এবং স্বীয় উদ্ভাবনাগুলি কাজে লাগানোর জন্যই তিনি একাধিক কারখানা স্থাপন করেন, সেখানে শ্রম শক্তিকে নিয়মমাফিক কাজে লাগান। পরবর্তীকালে এটা পুঁজিবাদী যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

জলশক্তির উপর নির্ভরশীল বিধায় প্রথম যুগের বস্ত্রকলগুলি জলপ্রপাতের ধারে কাছে স্থাপন করা হতো, সাধারণত উচ্চ স্থানে, জনসাধারণের স্বাভাবিক আবাসস্থলগুলি থেকে অনেক দূরে। এ ধরনের স্থানগুলিতে এখনো উঁচু চিমনিওলা অট্টালিকার টুকরো-টাকরা খুঁজে পাওয়া যায়। জলশক্তির স্থান বাষ্প গ্রহণ করার পর বস্ত্রকলগুলি সহরাঞ্চলে স্থাপন লাভজনক হয়ে পড়ে। এখন যেহেতু সুবিধাজনক স্থানে শক্তি উৎপাদন সম্ভব অতএব শ্রমিকদের দূরাঞ্চলে, জলের ধারে নিয়ে যাওয়ার দরকার করে না। গ্রামীণ কারখানাগুলি কুটির শিল্প অনুসরণ করে পুরাতত্ত্বের বিষয়ে পরিণত হয়, আর যন্ত্রপাতিতে স্টিমের ব্যবহার চালু হওয়ার ফলে গড়ে ওঠে কারখানা প্রধান শহর।

গ্রিনক প্রকৌশলী জেমস ওয়াট মূল শক্তি হিসেবে স্টিম অবিষ্কার করেন নি, এমন কি তিনি স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তাও নন। স্টিম ইঞ্জিনের বয়স তখন আটান্ন বছর পার হয়ে গেছে। এই ক্ষীণাঙ্গ, অস্থির এবং বিষণ্ণ প্রকৃতির প্রতিভাবান ব্যক্তিটির মনে পৃথক কনডেনসার-এর রহস্য উঁকি দেয় (১৭৬৯), এটি কারখানাগুলির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। তিনি স্টিম ইঞ্জিনের ত্রুটিগুলি নিয়ে ভাবছিলেন। নিউকোম্যান ইঞ্জিন খনিগুলিতে পাম্পের কাজে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু খনির গভীর তলদেশে এই পাম্প দিয়ে কোনো কাজ হতো না, আর সকল স্তরে তাপের অপচয় এবং অন্যান্য কারণে শক্তি উৎপাদন ছিলো ত্রুটিপূর্ণ, পাম্প কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও নিশ্চিত বোধ করা যেত না। ওয়াট এই ত্রুটিগুলি দূর করেন তার পৃথক কনডেনসারের সাহায্যে। এই মেধাবী চিন্তা মানব জাতিকে খনি সাম্রাজ্যের মালিকে পরিণত করে। আর বিজয়ের ফলশ্রুতি থেকে আমরা পাই অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি, অতিরিক্ত আলো ও উত্তাপ, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য উচ্চমানের আরামের ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হয় রোটারি মোসন, এটি জলচালিত চাকার অনুকরণে তৈরি করা হয়। এই রোটারি মোশনের কারণে তুলার কারখানায় স্টিম ইঞ্জিন কাজে লাগানো সম্ভব হয়। এটি ঘটে ১৭৮১ সালে, যে বছর অর্কটাউনে বৃটিশরা আত্মসমর্পণ করে। এ সময় কেউ লক্ষ্য করেন নি যে সাম্রাজ্যিক সুযোগ-সুবিধার সকল সূত্র ছিন্ন হয়ে গেলেও অধিকতর লাভজনক একটা সংযোগ সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের মধ্যে এই সংযোগ সৃষ্টি করেন উক্ত

লাজুক যন্ত্র উদ্ভাবক। আমেরিকার তুলা ল্যাংকাশায়ারের কলগুলিতে বিনাশুল্কে গোটা পৃথিবী পরিক্রমণ করে।

এই সব যন্ত্রকৌশলের ধারণা কার্যকর করা সম্ভব হয় শুধুমাত্র উক্ত উদ্ভাবকের সঙ্গে জনৈক বিরাট ব্যবসায়ীর নিবিড় সম্পর্কের ফলে। এই বণিকের স্টিম ইঞ্জিনের উপর ছিলো অগাধ আস্থা, কোনো প্রকার ক্ষতির চিন্তা তার আস্থায় চিড় ধরাতে পারেনি। বার্মিংহামের হার্ডওয়ার প্রস্তুতকারক ম্যাথিউ বুলটনের সাহায্য ব্যতিরেকে ওয়াটের উদ্ভাবনাগুলি হয়তো অব্যবহৃত থেকে যেত। বুলটন ১৭৭৫ সালে জেমস ওয়াটকে আহবান জানান অধিক সংখ্যায় স্টিম ইঞ্জিন তৈরির জন্য যাতে তা বাজারে বিক্রয় করা চলে। বুলটন পুঁজি সংগ্রহ করেন, শ্রমিকের সমাবেশ ঘটান, ইঞ্জিন তৈরি করেন, অতঃপর জনসাধারণ এ ব্যাপারে আশ্বস্ত বোধ করতে শুরু করে। তার আশাবাদী তেজ এবং সম্পদের উৎস বন্ধুর যান্ত্রিক উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক যুগের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। ভিন্ন পরিস্থিতিতে এতটা সাফল্য অর্জন করতে হয়তো পুরো একটা শতাব্দী লেগে যেত। প্রথম সফল ইঞ্জিন নির্মিত হয় ১৭৭৬ সালে সোহোর কর্মশালায়। চার বছর পর চল্লিশটি ইঞ্জিন প্রেরণ করা হয় কর্নওয়ালের খনিগুলিতে। ১৭৮৯ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের প্রধান প্রধান শিল্প-কারখানাগুলিতে স্টিম ইঞ্জিন নির্ণায়ক উপাদানে পরিণত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৃটেনে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধক ছিলো যোগাযোগের ব্যবস্থা। যেখানে ফ্রান্সে ছিলো সুন্দর সুন্দর খাল ও সড়ক-পথ, যা পর্যটকদের সম্ভ্রম কুড়িয়েছে, সেখানে ইংল্যান্ডের রাস্তাঘাট ছিলো করুণ অবস্থায় (এসবের তদারকি করেছে গির্জার অবৈতনিক কর্মকর্তারা)। খাল বলতে কিছু ছিলোনা। এই অবস্থা যত দিন চলেছে, এবং অনেক রাস্তা গ্রীষ্মকাল ব্যতিরেকে ব্যবহার করা যায়নি, অন্যান্য রাস্তা ছিলো গাড়ি চলার অনুপযোগী (কেবল মালবাহী ঘোড়া চলতে পেরেছে), তত দিন শিল্পায়ন বড় আকারে সম্ভব হয়নি। অবশেষে, শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃটিশ জনগণ সচেতন হয়ে উঠে, তারা উপলব্ধি করে যে এই অবস্থা আর অধিককাল চলতে দেয়া যায় না। টার্নপাইক আইন পাস করা হয়। এই আইনের অধীনে, নিয়মমাফিক না হলেও, অবস্থার বেশ উন্নতি হয়। জনৈক নিরক্ষর প্রতিভাবান ব্যক্তি, উইলিয়াম ব্রিণ্ডলি, লিভারপুল থেকে মাঞ্চেস্টার পর্যন্ত ব্রিজওয়াটার খাল খনন করেন। অতঃপর মেটকাফ, টেনফোর্ড এবং ম্যাকাডেম, এই তিন জন প্রকৌশলীর আগ্রহে বিরাট সংস্কার কর্ম সাধিত হয়। সারা দেশে ছেয়ে যায় রাস্তাঘাট, সেতু এবং খালে। এগুলির মান ইউরোপের যে কোনো দেশের তুলনায় হীন ছিলো না। এক সময় মালবাহী ঘোড়ার যুগের অবসান ঘটে, সূচনা হয় ক্ষণস্থায়ী পালকি যুগের। ১৮১৬ সালে প্রকাশিত হিস্টরি অব মানচেষ্টারে জোসেফ অ্যাস্টন লিখেছেন : "১৭৭০ সালে লন্ডন এবং লিভারপুলে একটি করে পালকি গাড়ি ছিলো। এসব অ্যাস্টন থেকে মাঞ্চেস্টার যেতো, যাতায়াত করতো সপ্তাহে মাত্র দু'বার। এখন অন্তত সত্তরটি দূরপাল্লার গাড়ি রয়েছে, এর মধ্যে চুয়াল্লটি প্রতিদিন যাত্রা করে, অপর ষোলটি সপ্তাহে তিন বার। এসব গাড়ির গন্তব্যস্থল একাধিক। ১৭৫৪ সালে একটি নতুন গাড়ির বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় (flying coach), গর্ব করে বলা হয় যে "যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক না কেন এই গাড়ি প্রকৃত প্রস্তাবে (কোনো প্রকার দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হলে) মাঞ্চেস্টার থেকে যাত্রা করে সাড়ে চার দিনের মধ্যে লন্ডন পৌঁছাতে পারবে।" ডাক বহনকারী গাড়ি কর্তৃক দূরত্ব আজকাল নিয়মিত তিরিশ ঘন্টার মধ্যে

অতিক্রম করতে পারে এবং কয়েকবার, যখন বোনাপার্ট ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছেন, এবং ওয়াটারলুর যুদ্ধের অবসানের খবর পৌঁছার পর, ট্রাভেলার ডেফিয়ান্স ও টেলিগ্রাফ নামক দুটি মাত্র আমেরিকা জাহাজ উক্ত পথ অতিক্রম করেছে। এটি ছিলো সংক্ষিপ্ত কিন্তু ইংরেজদের ভ্রমণের স্বর্ণযুগ, পিকউইকের পাতায় পাতায় এসব ঘটনা অমর হয়ে আছে। ঘোড়ার জন্য জিনসুদ্ধ ছিলো গৌরবের, পর্যটকদেরও সময় ছিলো দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পথ অতিক্রমের আনন্দের। জর্জ স্টিফেনসনের রেলওয়ে সূচিত হওয়ার পর (১৮২৯) ইংরেজদের ইতিহাসের উক্ত অধ্যায়ের অবসান ঘটে, শুরু হয় ব্যাপক চলাফেরা, বৃহত্তর সম্পদ এবং মানবতার প্রচণ্ড অস্থিরতার যুগের।

নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের অবসানের সময় পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য বৃটেনে সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় (অতঃপর সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়)। ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে পুঁজিবাদ কোনো না কোনো আকারে সবকালে ছিলো। তবে নব্য পুঁজিতন্ত্রের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে, এটি পূর্ববর্তী যুগের মতো প্রধানত কৃষি কিংবা বাণিজ্যভিত্তিক ছিলো না। এটি ছিলো প্রধানত শিল্প নির্ভর। এতে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। অথচ আগে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৃহত্তর পরিসরে পুঁজি ও শ্রম সাধারণত ছিলো সমন্বিত। নতুন কারখানা পরিবেশ করেছে ধুম্রাচ্ছন্ন; এতে কারিগরদের শ্রম বিক্রয় করা ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব ছিলো না। নিয়োগকারী শ্রেণী শ্রম ক্রয় করেছে, কর্মী শ্রেণী শ্রম বিক্রয় করেছে। পূর্বে যেখানে প্রথা ও মানবিক অনুভূতি সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে, বর্তমানে সেখানে প্রভু ও প্রজার মধ্যে সম্পর্কের মূল বন্ধন দাঁড়ায় নগদ অর্থ।

এই দ্রুত ও হৃদয়হীন শিল্পায়ন থেকে উদ্ভূত অকল্যাণ উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের আগে জাতির বিবেককে বিশেষ নাড়া দেয়নি। সমস্যাটা ছিলো নতুন; তাছাড়া গ্রামীণ ভদ্রলোকদের দ্বারা গঠিত পার্লামেন্ট এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হতে বাধ্য। ল্যাংকোশায়ার ও ব্লাক কান্ট্রিতে যা ঘটছিলো, নারী ও শিশুর ঘাম-ঝরা শ্রম, আবাসনের লজ্জাকর অবস্থা, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অপ্রতুলতা, মজুরী ও মুনাফার মধ্যে বৈষম্য, চাকুরিতে অনিশ্চয়তা এবং অস্থায়িত্ব ওয়েস্টমিনস্টারের আইন প্রণেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কিংবা তাদের নাড়া দিতে পারে নি। এমনকি বার্ক ভারত ও আমেরিকার পরিস্থিতি উপলব্ধি করলেও ফরাসি বিপ্লবের ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করলেও শিল্প বিপ্লবের দরুন জরুরি কিছু সমস্যার যে সৃষ্টি হয়েছে তা বুঝতে পারতেন না। এদিকে আইন করে শ্রমিক সমাবেশ বা ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধ করে দেয়া হয়, ফলে শ্রমিকরা ছিলেন অসংগঠিত এবং বাকশক্তিহীন।

ফ্রান্সের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ে যদিও বৃটিশ শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ রুদ্ধ হয়নি বা থমকে যায় নি, তবে অন্য সব দৃষ্টিকোণ থেকে বৃটেন ও গোটা পৃথিবীর জন্য তা ছিলো অমিশ্র দুর্ভাগ্য। নতুন শিল্প সমাজের সমস্যাগুলি যেমন একদিকে নতুন ছিলো, তেমনি একটা শ্রমসাধ্য এবং চতুর সরকারের জন্য অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। তাছাড়া যুদ্ধের কারণে সমস্যাগুলি বিবেচনার সুযোগ হয়নি। সরকার যেখানে বিপ্লবী এবং নেপোলিয়ন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে রত, তাছাড়া শাসক শ্রেণী ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে দেশের

• চার্লস ডিকেন্সের একটি উপন্যাসের নাম।

ভেতর না আবার বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেখানে আশা করা যায় না যে, অজানা শিল্পে নিযুক্ত অর্ধ-বর্বর লোকদের সমস্যা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার সুযোগ হবে। দ্বীপের উত্তর ভূভাগের কারখানাগুলির অদ্ভুৎ পরিস্থিতির ভেতর এদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিলো দ্রুততার সঙ্গে। ইউলিয়াম পিট এদের সমস্যার ব্যাপারে মনোযোগ দেয়ার জন্য একবার উৎসাহিতবোধ করেন, এদের সমস্যার প্রকৃতি বোঝার জন্যও চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রমজীবী শ্রেণীর কষ্ট লাঘবের প্রশ্ন ওঠায় গুটিয়ে যান। যে মানসিকতা পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে দাস ব্যবসা ১৮০৭ সাল পর্যন্ত টিকিয়ে রাখে সেকালের মানসিক পরিমণ্ডলে তার প্রাধান্য ছিলো খুব বেশি। আর একটি কারণ ছিলো বিপ্লবভীতি। এ দু'টি কারণই শিল্প বিপ্লবজনিত সমস্যাদি বিজ্ঞতার সঙ্গে মোকাবেলার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

অ্যাডাম স্মিথ তার ওয়েলথ অব নেশন্স-এ (১৭৭৬) বিপুল সম্পদ আহরণের জন্য উল্লাস প্রকাশ করেছেন। তিনি অভিমত পোষণ করেছেন যে এটা সম্ভব হয়েছে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার জন্য। এই ব্যবস্থায় বাণিজ্য ছিলো মুক্ত, যন্ত্রপাতি সার্বিক, এবং শ্রম বিভাগ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। উল্লিখিত চিরায়ত পুস্তকে, যাকে অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে বাইবেল হিসেবে গণ্য করা হয়, গ্লাসগোর বিচক্ষণ অধ্যাপক, বৃটিশ জাতির মধ্যে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক শক্তি সুপ্ত অবস্থায় দেখতে পান, যা মুক্ত পরিবেশে বাস্তবায়িত হতে পারে। এই স্কটিশ অর্থনীতিবিদের প্রশান্ত আস্থা যে ন্যায্য ছিলো তা প্রমাণিত হয়। অবাধ বাণিজ্যের ফল পাওয়া যায় : শিল্পায়ন বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জনের উৎসে পরিণত হয় ; যে কোনো মানদণ্ডে জাতীয় সম্পদের পরিমাণ জরিপ করা হোক না কেন গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সম্পদের প্রবৃদ্ধি নির্বাধে ঘটতে থাকে। কিন্তু তার ওয়েলথ অব নেশন্স প্রকাশিত হবার একানব্বই বছর পর, যখন বৃটিশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিপক্কতা অর্জন করেছে, এবং গোটা ইউরোপে এই ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ছে, তখন কার্ল মার্ক্স, লন্ডন প্রবাসী জনৈক ইহুদি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চুলচেরা বিচার করেন। অ্যাডাম স্মিথ যেখানে শুধু সূর্যের আলো দেখতে পেয়েছেন, কার্ল মার্ক্স সেখানে শুধু দেখতে পান ছায়া। এই ছায়া মানব জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে ব্যক্তি স্বাধীনতার অবাধ ব্যবহারের দরুন। তাছাড়া সূক্ষ্ম শ্রম বিভাগের ফলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ভোতা হয়ে গেছে, কারিগর শ্রেণীর জীবন করেছে ফাঁকা এবং নিরানন্দ, প্রাচুর্য এবং দারিদ্র্যের মধ্যে ফারাক বেড়েই চলেছে, প্রাচীন সামাজিক প্রথায় শ্রমিকের যে নিরাপত্তা ছিলো তা বিনষ্ট হয়েছে, আর নিয়োগ কর্তা কর্তৃক সর্বহারার অবাধ শোষণ শুরু হয়েছে। মার্ক্স যে চিত্র আঁকেন তাতে অতিরঞ্জন ছিলো, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ছিলো বাস্তবতা এবং প্রাপ্ত তথ্যাদির পরিপন্থী। কিন্তু মার্ক্স গুরুতর এবং নিঃসংশয় ত্রুটির দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা বিপ্লবের ন্যায্যতা প্রতিপাদন না করলেও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা মানতে আমাদের বাধ্য করে।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলী

১. পি. ম্যান্টু : La Revolution industrielle au XVIII eme shiecle অনু. এম ভারনন। ১৯২৮।

২. জে. অ্যাস্টন : অ্যা পিকচার অব ম্যানচেষ্টার, ১৮০৪। ১৮২৬।

৩. এডওয়ার্ড বেইন্স : হিস্টোরি অব দি কটন ম্যানুফেকচার ইন গ্রেট ব্রিটেন। ১৮৩৫।

৪. আর. এন. বস্তড : কোল পিটস অ্যান্ড ফায়ারম্যান : এ শর্ট হিস্টোরি অব দি কোল ট্রেড অ্যান্ড দি লেজিসলেশন অ্যাফেকটিং ইট। ১৮৯২।

৫ আর ই প্রথেরো : দি পাইওনিয়াস অ্যান্ড প্রথ্রেস অব ইংলিশ ফার্মিং। ১৮৮৮।
৬ আর এইচ থার্সটন : এ সেনচুরিস প্রথ্রেস অব দি স্টিম ইঞ্জিন। ১৯০১।
৭ এস স্মাইলস : দি লাইভস অব দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স। ৫ খণ্ড। ১৮৭৪।
৮ সি বিয়ার্ড : দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভোলিউশন। ১৯০১।
৯ জে এল অ্যান্ড বি হ্যামন্ড : দি টাউন লেবারার। ১৯১৭।
১০ জে এল অ্যান্ড বি হ্যামন্ড : দি স্কিল্ড লেবারার। ১৯১৯।
১১ জে এ হবসন : দি ইভোলিউশন অব মডার্ন ক্যাপিটালিজম। ১৮৯৪।
১২ এ টয়েনবি : লেকচার্স অন দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভোলিউশন অব এইটিনথ সেনচুরি ইন ইংল্যান্ড : স লর্ড মিলনার ১৯০৮।
১৩ টি এস অ্যাশটন : দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভোলিউশন। ১৯৪৮।
১৪ টি এস অ্যাসটন : অয়ন ইকনমিক হিস্টোরি অব ইংল্যান্ড : দ্য এইটিনথ সেনচুরি। ১৯৫৫।

ইতিহাসের নানা সূত্র

স্বাধীনতা। সমাজতন্ত্র। জাতীয়তাবাদ। বিপ্লব। যুদ্ধ।

আসন্ন যুগের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই ছিলো যে, একটি ফাঁকা মহাদেশের একটি বিজয়ী প্রজাতন্ত্র শ্লোগান হিসেবে স্বাধীনতা এবং সাম্যের পক্ষে ঘোষণা দেয় এবং এটি পরিণত হয় একটি নতুন গসপেলে। আর ফাঁকা বলে উক্ত মহাদেশে উদ্ভাবন এবং উদ্যোগের ছিলো সীমাহীন সুযোগ। পুরাতন পৃথিবীর স্বাধীনতার মিত্ররা অনুপ্রেরণা লাভ করে মার্কিনী মানবাধিকারের পক্ষে ঘোষণা থেকে। আমেরিকানরা বৈপ্লবিক উপায়ে যা করতে পেরেছে ইউরোপীয়রা তার অনুরূপ সাহসী কিছু করে তা অর্জন করতে পারে। স্বাধীনতার শক্তি নানা রূপ পরিগ্রহ করে। এটি মিরাবোর জন্য ছিলো নিয়মতান্ত্রিক, দাঁতোঁর জন্য বৈপ্লবিক, শিলার, শেলি এবং লামার্তিনের জন্য রোমান্টিক, মাৎসিনির জন্য ভবিষ্যৎসূচক, কর্দরসে এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক, কবডেন এবং কভুরের জন্য অত্যন্ত বাস্তবিক, কসরেন (Cochrane) এবং গ্যারিল্ডির জন্য জঙ্গী এবং দুঃসাহসিক ; তবে স্বাধীনতার বোধ জাগ্রত হবার পর প্রতিযোগিতার সূচনা হয়, যার মীমাংসা আজ পর্যন্ত হয়নি। ফরাসি বিপ্লবের তাণ্ডবলীলা এবং নেপোলিয়নের সন্ত্রাসের পর টিকে গিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এটি ইউরোপের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দেশে পার্লামেন্টারি প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপনে সফল হয়। বাদ থাকে কেবল রাশিয়া।

আলেকজান্দ্রীয় যুগের মতো, আমরা যে সময়কালের জরিপ করতে বসেছি, তা ঘটনাবলির পরিধি, গতিবেগ এবং জটিলতার ব্যাপক বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করে। দেড় শো বছরের কম সময়ের মধ্যে ইউরোপ মহাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তিন শত পঞ্চাশ মিলিয়নেরও বেশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এক শো তিরিশ মিলিয়ন।[১] নগরগুলির আকার আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপক হারে, বিভিন্ন সরকার হয়েছে আগের চেয়ে শক্তিশালী। সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনী, বাজেট ও ব্যবসা, সরকারি, রাজস্ব এবং ব্যক্তিগত সম্পদ যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা এ যাবৎকাল কল্পনা করা যায়নি। নতুন পরিবহন ব্যবস্থার দরুন বিরাট সংখ্যক সম্পন্ন লোকদের তাদের বাড়ি থেকে কয়েকশো মাইল ঘুরে ছুটিতে যাওয়া সম্ভব, তাদের বছরের পর বছর দূরবর্তী অঞ্চলে টিকে থাকার ব্যবস্থাও করা আর প্রয়োজনীয় রসদ-সামগ্রীর যোগান দিয়ে। যোগাযোগের নব নব পদ্ধতি দূরত্বের অবসান ঘটিয়েছে, নব নব প্রচার ব্যবস্থা সংগঠন করেছে মতামতের। সমকালের হাতে রয়েছে সমযোগের অভিনব

---

১. আর আর কুরচিনস্কি হিসাব করেছেন যে ১৮০০ সালে ইউরোপের জনসংখ্যা ছিলো ১০০ মিলিয়ন, ১৯০০ সালে ৪৫½ মিলিয়ন, ১৯০৯ সালে ১১৩ মিলিয়ন, ১৯৩৩ সালে ৫৩৫ মিলিয়ন।

অসাধারণ ও সম্পূর্ণ বলে চলে। শুধু একদিনে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যত কাজ এসেছে এবং কাজের নিষ্পত্তি হয়েছে তৃতীয় জর্জের সময়ে এক বছরের মধ্যেও তত কাজ হয়নি।

এই যে ইউরোপে ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বাড়লো তার জন্য সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি নয়, প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রমবৃদ্ধিশীল প্রভুত্বের আশীর্বাদ কাজ করেছে। তার অর্থ আবার এই নয় যে, আমরা যে যুগের জরিপ করতে বসেছি সে যুগে রাজনৈতিক চিন্তায় বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়েছিলো, কিংবা এক্ষেত্রে কিছুই উন্নতি হয়নি। অর্থনীতিবিদ রিকোর্ডো খাজনার বিস্তারিত সংজ্ঞা এভাবে দেন যে, উদ্বৃত্ত হিসেবে খাজনা শ্রম কিংবা পুঁজি থেকে উদ্ভূত হয় না, আসে মাটির আদি ও অবিনাশী শক্তি থেকে। এতে সকল আকারের অনুপার্জিত আয়ের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। সমাজতন্ত্রবাদও সপক্ষে প্রবল তাত্ত্বিক যুক্তি খুঁজে পায়। সরকারি রাজস্ব সংক্রান্ত বেড়ি থেকে মুক্ত হলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, আর প্রতিযোগিতা শাসিত বিশ্বে শ্রমিকদের পুঁজিবাদী ঘোষণা থেকে বাঁচানো দরকার, এই দুটি আবিষ্কারের দরুন দুটি ভিন্ন পথ একটি সমাজের সৃষ্টি করেছে যে সমাজে বস্তুগত সুখ সংখ্যায় আগের চেয়ে অনেক বেশি, এদের বণ্টনও আগের চেয়ে ভালো। তবু দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রতিটি শ্রমজীবীর বুকে পিস্তল ঠেকানো আছে। ফ্যাশনের কোনো পরিবর্তন, কোনো নিয়োগকর্তার দেউলে হয়ে যাওয়া, দূরবর্তী কোনো অঞ্চলে শষ্যহানি, কোনো ব্যাংকে ধস নামা, একজন শ্রমিকের জন্য দুর্ভাগ্য ডেকে আনতে পারে। তিনি বেকার হয়ে যেতে পারেন, তার পরিবার হতে পারে নিদারুণ দুর্দশার শিকার।

ভাড়াটে শহুরে শ্রমিকদের দ্রুত সম্প্রসারণশীল গণতন্ত্রকে সুখী করার সমস্যাটা ব্যাপক ও জটিল। এই সমস্যার সহজ সমাধান যেমন সম্ভব নয়, তেমনি গুটিকয় রাজনীতিকের এক্ষেত্রে সফল হওয়ার কথা ভাবা যায় না। অথচ এ সময় থেকে শ্রমিকরাই ইউরোপীয় সমাজের প্রধান অংশে পরিণত হয়। কারখানা আইন করে, খনি অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায় ভাণ্ডার গঠন করে, রাষ্ট্রীয় বীমা এবং রাষ্ট্রীয় অবসর ভাতা প্রবর্তন করে, সরকারিভাবে ছোটদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে, বৃদ্ধদের জন্য সরকারি সহায়তার ব্যবস্থা করে দরিদ্রের কষ্ট লাঘবের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। তবে ব্যাপারগুলি ধীরগতিতে এবং পর্যায়ক্রমে হাতে নেয়া হয়। আর ব্যবস্থাগুলি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। "জনগণের অবস্থার প্রশ্ন" যদিও সকল যুগে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে, তবে কখনো দৃঢ়তার সঙ্গে এবং ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক মনোযোগের অগ্রভাগে স্থান পায়নি।

অন্যান্য কারণ এবং সমস্যা ছিলো অধিকতর অতি নাটকীয়, এগুলির আকর্ষণও ছিলো অধিকতর। যেমন, জাতিসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার তৃষ্ণা, এবং বৃহত্তর বাজার লাভের ক্ষুধা। এসব রাজনীতিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে বেশি, তদনুপাতে জনগণের ভাবাবেগও উদ্দীপিত হয়েছে। তাহলে ইউরোপের ইতিহাসকে অগণিত এবং প্রায় দুর্জ্ঞেয় পরিবর্তন হিসেবে বর্ণনা করলে কাজটা সম্পূর্ণ হবে না। এই পরিবর্তন সমাজের যে রূপান্তর ঘটায় তাতে মিল মালিক ও জমির মালিকদের ছিলো প্রাধান্য। একজন শহুরে করণিক, প্রকৌশলী, মেডিক্যাল অফিসার বা স্কুল শিক্ষকের পক্ষে সমাজের জন্য কিছুই করা সম্ভব নয়। আমরা যদি বলি ইউরোপের ইতিহাসকে কেবল শ্রেণীসমূহের বিবাদ কিংবা অর্থনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীগুলির সংঘর্ষ হিসেবে গণ্য করি তাহলে প্রকৃত সমস্যার অতি-সরলীকরণ করা হবে মাত্র। উপরন্তু মানব প্রকৃতির উন্নত এবং বৈচিত্রময় উপাদানকে করা

হবে উপেক্ষা, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের চিত্তবিক্ষেপ এবং ঘটনাবলীর স্বেচ্ছাচারী স্বরূপকেও জানা হবে না। বাস্তবিক জীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাও গবেষণাগারে স্থান পায় না এবং নিরাসক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাৎক্ষণিকভাবে আগাগোড়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাধান করা হয় না। সামাজিক অসুস্থতা হয়তো বছরের পর বছর উপেক্ষা করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহান ফরাসি ভদ্রলোক গিজোর স্মৃতিকথা আমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করে দেখতে পারি। কিন্তু কোথাও এমন লক্ষণ খুঁজে পাবো না যে তিনি ভূতল জগতের স্বরূপ ও অসুবিধাগুলি সম্পর্কে কোনো প্রকার ওয়াকেফহাল ছিলেন।

তাহলে, ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ঘটনাবলীর মুখোমুখি হয়ে ইউরোপ কোনো প্রকার আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়নি। বলেনি যে, "যে অদ্ভুত ও নতুন ঘটনাবলী ইংল্যান্ডে ঘটেছে তা ইউরোপ মহাদেশেও যথাসময়ে ঘটবে। এখানেও কারখানা প্রধান শহর গড়ে উঠবে এবং কারখানাগুলি থেকে কালো ধোয়া আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যাবে। এখানেও শিশুদের শ্রম শক্তি লাভের জন্য শোষণ করা হবে, তথাপি প্রতিদিন জন্ম হবে মানব সন্তানের। তাদের বাসস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং শাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বত্র অনেককাল অতিবাহিত হবার আগেই ইংরেজদের অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সর্বত্র সমাজের রূপান্তর ঘটবে যান্ত্রিক কৌশল এবং পুঁজির কারণে, সর্বত্র সরকারসমূহ টিকে থাকতে হলে নবাগত জনসংখ্যার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই জনসংখ্যার হাতে টাকা থাকবে না, তারা হবে ছিন্নমূল গ্রামীণ জীবনের স্থায়ী অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সুপ্রাচীন ধর্মানুরাগ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের জীবনের কোনো মান নেই, ঐতিহ্য নেই, আনুগত্য নেই। রুক্ষ ও নির্দয় প্রতিযোগিতার টানাপোড়েনে দুর্দশাগ্রস্ত। আমরা বাস্তবিকই শিল্প যুগে প্রবেশ করছি। এই যুগের বিপদগুলি আমাদের আগাম প্রতিরোধ করতে হবে, শিল্প যুগের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করতে হবে, সর্বোপরি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে এই যুগের গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করার দরকার করবে।" ইউরোপ মহাদেশ এ ধরনের উক্তি এ পর্যন্ত করেনি। আসন্ন শিল্প প্রধান গণতন্ত্রের অস্পষ্ট সংকেতে সচেতন না হয়ে বরং ফরাসি বিপ্লব এবং সাম্রাজ্যিক যুদ্ধে নিমজ্জিত হয়েছে।

ফ্রান্সে বিপ্লব

ফ্রান্সের শক্তি ও দুর্বলতা। বিশেষ সুবিধা। খাদ্য সরবরাহ। রাজার সুযোগ। ঘাটতি। দ্য এস্টেটস জেনারেল। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের আশা-ভরসা। ভের্সাই ও প্যারিস। প্রথম দেশান্তর। পূর্বতন সমাজের (ancien regime) পতন। সর্বহারা এবং ক্লাবসমূহ। মিরাবো। ১৭৯১ সালের গঠনতন্ত্র। বিপ্লব এবং গির্জা কর্তৃপক্ষ। বিপ্লব এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কৃষককুলের নানাবিধ লাভ। ভারেন। আইনসভার অবসান।

আমেরিকায় বিজয়মাল্যভূষিত, জনসংখ্যা গ্রেট বৃটেনের তিন গুণ, কৃষি সম্পদের প্রাচুর্য। কাপড় তৈরির কারখানা উন্নতিশীল, রাস্তাঘাট ও খালগুলির অবস্থা চমৎকার, বৈদেশিক বাণিজ্য চতুর্দশ লুই-র মৃত্যুর পর পাঁচ শত ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। তথাপি ফ্রান্স গুরুতর অভ্যন্তরীণ সমস্যাদির সম্মুখীন। যে বিপদ তাৎক্ষণিকভাবে তাড়া করতে শুরু করে তা ছিলো আর্থিক। দেশের জন্য যা বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, কিংবা বিশ্বাস করা হয় যে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হৃতসর্বস্ব অবস্থা (bankruptcy)। অধিকতর মৌলিক সমস্যা এই ছিলো যে, দেশে সামাজিক সাম্য বলতে কিছু ছিলো না, কর ব্যবস্থা ছিলো অসাম্যভিত্তিক, শূন্যতা ছিলো রাজনৈতিক স্বাধীনতার, নির্বাহী কর্মকর্তাদের ছিলো যোগ্যতার ঘাটতি। রাষ্ট্রদেহের সকল অঙ্গে প্রসার লাভ করে মধ্যযুগীয় এবং অলাভজনক বিশেষ সুবিধা। গির্জা কর্তৃপক্ষ, অভিজাত সম্প্রদায়, প্রাদেশিক এস্টেটস বা বিধান সভা, বিচার নিগমসমূহ এবং ট্রেড গিল্ডগুলি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত। এই বিশেষ সুবিধা কলুষিত করে ন্যায় বিচার, করের অন্যায় বোঝা ন্যস্ত হয় দরিদ্র জনগণের স্কন্ধে, আর ইউরোপের সবচেয়ে দীপ্তিমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী বঞ্চিত হয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, গির্জা এবং হাকিমি ব্যবস্থার সুবিধা থেকে। এই বিশেষ সুবিধাকে এখন আর সমর্থন করা চলে না। এটি এখন অধিকাংশের চোখে নিতান্ত ঘৃণ্য ব্যাপার। ফ্রান্সের উচ্চবিত্ত যাজক শ্রেণী, যারা কোনো প্রকার কর প্রদান করে না। এখন আর জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র নয়, কারণ তারা গড়ছে সম্পদের পাহাড়, তাদের দিনানুদৈনিক কাজেকর্মে এখন ইহজাগতিকতার লক্ষণ সুপ্রকট, তারা নানা প্রকার জঘন্য দোষে দুষ্ট। অভিজাত সম্প্রদায় যাদের অধিকাংশ প্রকৃত প্রস্তাবে অনাবাসী, এখন তারা কোনো সামাজিক দায়িত্ব পালন করেনা। তারা কেবল খাজনা এবং অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক সুবিধা আদায় করে, আদায় করে শ্রমিকের শ্রম (Corvees), এবং যেহেতু তাদের কোনো কাজ নেই, ফলে তারা সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ। এর ব্যতিক্রম যে কোথাও ছিলো না তা নয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ভূ-স্বামী সামাজিক কল্যাণের পথ বেছে নেন। যেমন কতকগুলি জেলায়, উদাহরণত ভঁদেতে, অনেক ভূ-স্বামী ইংরেজ স্কোয়ারদের নিয়মে চলতেন। তারা অধীন লোকদের আন্তরিক ভক্তিও আদায় করতে সমর্থ হন।

তবে ভূ-স্বামী বা অভিজাত শ্রেণীর অনাবাসী জীবন যাপনই ছিলো সাধারণ নিয়ম। তৎকালীন অনেক প্রতিবেদক এমনকি বিশ্বাস করতেন এবং লিখতেন যে, ফরাসি অভিজাত সম্প্রদায় ফ্রাঙ্ক বংশোদ্ভূত, যেমন টিউটনরা বিদেশ ভূমে উপনিবেশ গড়ে এবং স্থানীয় কেলটিক জনগণকে শোষণ করে আত্মোন্নতি ঘটায়।

বিপ্লবের সূচনা হয় এজন্য যে রাজতন্ত্র বিশেষ সুবিধা সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়, তাছাড়া সামন্ততন্ত্রের অবশেষ নিশ্চিহ্ন করাও ফ্রান্সে সম্ভব হয়নি। অথচ ইউরোপীয় মহাদেশের অন্যান্য রাষ্ট্রে অন্তত অধিকাংশ রাষ্ট্রে, এ কাজটি অনেক আগেই সম্পন্ন হয়। পূর্বতন সমাজের শাসকদের আরো একটি আর্থিক ধরনের সমস্যা বিব্রত করে। জনগণের জন্য খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করা যায়নি (তখনও বাজারে আলুর প্রবেশ ঘটেনি)। ফ্রান্সের কৃষি সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, উচ্চবিত্তের বিভাসিত বিলাসিতা চলতে থাকলেও, জনগণের বিভিন্ন অংশকে মাঝে-মাঝে অনাহারে থাকার আতংকে পতিত হতে হয়েছে।

এর জন্য জবরদস্তি শিল্পায়ন কিন্তু দায়ী নয়। সেকালে জার্মানির তুলনায় ফ্রান্স যদিও অনেক বেশি শহর প্রধান ছিলো, প্যারিস নগরীর লোক সংখ্যাই ছিলো সাড়ে সাত শত হাজারের মতো, তবু কৃষি পদ্ধতির মতো শিল্পায়নের পদ্ধতিও ছিলো মধ্যযুগীয়। ফরাসি বিপ্লবের প্রলেতারিয়েতরা যাযাবর কিংবা ছিন্নমূল কারখানা শ্রমিক বা কারিগর ছিলেন না। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় অসংগঠিত গৃহকর্মী এবং কৃষকদের দ্বারা। এ ধরনের সমাজের পুঁজি কিংবা জমির মালিকানার বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকতে পারে না। এদের একটিমাত্র দাবি ছিলো রুটি চাই। এ দিকে অংশত মাল্কাতার আমলের কৃষি ব্যবস্থা এবং অংশত অভ্যন্তরীণ কাস্টম শুল্কের কারণে তাদের রুটি পাবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত ছিলো না। এর ফলশ্রুতি দাঁড়ায় ভয়ানক গুরুতর—আহার্যের দাবিতে দাঙ্গা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়, বড় বড় শহরে, এমনকি গ্রামাঞ্চলে ক্ষুব্ধ দরিদ্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

১৭৭৪ সালে ষোড়শ লুই যখন ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আলোকিত স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের পক্ষে প্রবল জোয়ার কাজ করছে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে। প্রুসিয়ার ফ্রেডারিক একটা রীতির প্রবর্তন করেন যা অন্যেরা অনুসরণ করার প্রচেষ্টা চালায়। ক্যাথলিক অস্ট্রিয়া এবং স্পেনে অভিজ্ঞতা এই দাঁড়ায় যে প্রগতির সূচনা হবে উপর থেকে। প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নিচ থেকে। তাছাড়া রাজা ও রানীর দল সাধারণত উদারপন্থী, রক্ষণশীলতার পরিচয় দেয় সংসদগুলি (Diet)। পঞ্চদশ লুই-র সুদীর্ঘ এবং অগৌরবজনক রাজত্বের পর ফ্রান্স একজন নতুন শার্লমেনকে অভিনন্দন জানানোর জন্য তৈরি। এই নতুন শার্লমেন তার প্রজ্ঞার প্রাচুর্য দ্বারা রাষ্ট্রদেহের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করবেন।

এ ধরনের ভূমিকা বা দায়িত্ব পালনের জন্য তরুণ রাজা মোটেই উপযুক্ত ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে লুই নানা সদগুণের অধিকারী ছিলেন : তিনি ছিলেন দুর্নীতিমুক্ত, তার ছিলো প্রগাঢ় ধর্মানুরাগ, অমায়িকতা, তার কাণ্ডজ্ঞানের ঘাটতি ছিলো না। তবে শাসকের যোগ্যতা তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি স্বচ্ছ চিন্তায় ছিলেন অপারগ, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেন, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে জানতেন না, পরিকল্পনা দৃঢ়তার সঙ্গে বাস্তবায়নে তিনি ছিলেন অসমর্থ। অথচ এসব গুণ একজন রাষ্ট্রবিদের থাকা একান্ত জরুরি। ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে তিনি ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে দিতেন। অস্ট্রীয় মারি আঁতোয়ানেৎ ছিলেন কঠিন ধাতুতে গড়া। কিন্তু দেশের রাজনীতিক ও জনগণের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তার

শক্তিও এবং আকর্ষণ কোনো কাজে লাগেনি। বলতে গেলে তিনি ছিলেন দেশের শত্রু। তিনি কোনো প্রকার সমঝোতা করে চলতে কিংবা ক্ষমা করতে জানতেন না। ভের্সাই-এর সমালোচকদের বিবেচনায় তিনি ছিলেন সাইরেন বা মোহিনী নারী, যিনি রাষ্ট্র নামক তরীখানি চড়ায় ঠেকানোর জন্য তৎপর।

তখন রাজা আসন্ন বিপুল সংস্কার কর্মে হাত দিয়ে ঠেকানোর শ্রেষ্ঠ সুযোগ বিনষ্ট করেন সংসদের অধিবেশন আহ্বান করে। এটি তিনি করেন জনপ্রিয়তা অর্জনের মোহে পড়ে। সংসদের অধিবেশন আহ্বানের ফলে প্রগতির পথে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। একটা সংগঠিত শক্তি সকল সময়ই অসংগঠিত মতামত স্তব্ধ করবে। ফ্রান্সের বুদ্ধিবিভাসিত লোকেরা ছিলেন তুর্গোর পক্ষে; লুই-র মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। বুদ্ধিবিভাসিত সম্প্রদায় তাকে সমর্থন দেয় যখন তিনি গিল্ডগুলি বিলুপ্ত করার প্রস্তাব দেন এবং শস্য ব্যবসার উপরে থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করতে বলেন। আবার প্যারিসের পার্লামেন্ট রাজার উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্য খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অন্য কোনো সংস্থার পক্ষে এই কাজটি করা সম্ভব হতো না। ফলে রাজা যখন তেরো মাস পর তুর্গোকে পরিত্যাগ করেন, অথচ এদিকে রাষ্ট্র দেহের সংস্কার বলতে কিছুই হয়নি তখন কোনো ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের ধ্বনি ওঠেনি, তবে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই চরম উদাসীন্যের সঙ্গে সাব্যস্ত করে যে ফ্রান্সের প্রতিশ্রুত সংস্কার উপর থেকে আসতে পারে না। এই কাজটি সম্পাদনের উৎস অন্যত্র খুঁজতে হবে। অতঃপর রাজা তার পরামর্শকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন জেনেভার ব্যাংকমালিক নেকারকে। ভদ্রলোক ধর্মীয় আনুগত্যের দিক থেকে প্রটেস্ট্যান্ট। প্রজাতন্ত্রী। ইনি আমেরিক্যান যুদ্ধের খরচ বহনের জন্য ঋণ প্রদান করে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেন। নেকার প্রাদেশিক বিধানসভা গঠন শুরু করতে গিয়েই কুখ্যাতি কুড়ান। এবং বলতে গেলে রাতারাতি। তার লক্ষ্য ছিলো অ্যাতাঁদের প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান। নেকারকে ১৭৮১ সালে বরখাস্ত করা হয়, অতঃপর আর্থিক সমস্যা ফ্রান্সের যাবতীয় ঘরোয়া সমস্যার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। ঘাটতি কিভাবে পূরণ করা যায়? নগদ টাকায় হিসাব করলে, সমস্যাটাকে যত বড়ো করে দেখা হয় ততো বড়ো ছিলো না। কারণ মাথা পিছু অতিরিক্ত ছয় কি সাত ফ্রাঙ্ক ধার্য করলেই দেশের বাজেট সমভার করা সম্ভব হতো। কিন্তু রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের কারণে বাজেট সমভার করতে গেলে নানা প্রকার জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। কারণ তাহলে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীকে অঙ্গীকার করতে হবে যে তারা আনুপাতিক হারে করের বোঝা বহন করবে। একের পর এক মন্ত্রী প্রচেষ্টা চালান যাতে অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অন্তত একটা বিষয়ে ছাড় প্রদানের অঙ্গীকার আদায় করা যায়। কিন্তু ব্যাপার এই দাঁড়ায় যে, কোনো মন্ত্রীই এ ব্যাপারে সফল হন নি। অথচ অভিজাত সম্প্রদায় সামান্য ছাড় দিতে অঙ্গীকার করলেই আসন্ন দুর্বিপাক এড়ানো সম্ভব হতো। এই মন্ত্রীদের অন্যতম ছিলেন ক্যালোন, সবচেয়ে সাহসী এবং বুদ্ধিদীপ্ত। ১৭৮৭ সালে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মেলন আহবানের সুন্দর ধারণা তার মাথায় ছিলো। কিন্তু তিনি অন্যান্যদের যতোই

• Turgot Anna-Robert Jacques (১৭২৭-৮১)। ফরাসি অর্থনীতিবিদ : লিমোজ জেনেরালিয়েতের অ্যাডভা ছিলেন। পরে ষোড়শ লুই-এর অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ফিজিওক্রাত মতবাদ অনুযায়ী তিনি রাজস্ব সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবন্ধকতায় সংস্কার কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।

ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তার ব্যর্থতাও ছিলো অন্যান্যদের চেয়ে বড়ো মাপের। কারণ তিনি জাতির সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তিনি লেখেন, "ফ্রান্স নামক রাজ্য কয়েকটি রাষ্ট্র ও দেশ নিয়ে গঠিত, প্রশাসন মিশ্র প্রকৃতির, একটি প্রদেশ অপর প্রদেশ সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না, কোনো কোনো জেলা বিন্দুমাত্র দায়িত্ব পালন করেন, এদের দায়িত্ব পালন করতে হয় অন্যদের। ধনী লোকদের কর প্রদান করতে হয় নামমাত্র। বিশেষ সুবিধা থাকায় কোনো ভারসাম্যের বালাই নেই, এখানে কোনো স্থায়ী নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, এখানে সাধারণ ইচ্ছা কার্যকর করাও দুঃসাধ্য ; ফলে এটি একটি সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ রাজ্য (kingdom)। সর্বত্র অবিচারের ছড়াছড়ি এবং বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তাতে এই রাজ্য *শাসন করা যায় না।*" সব রকম প্রচেষ্টা বিফল হবার পর একটা উপায় অবলম্বনের জন্য সকল মহল থেকে চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। অর্থাৎ সরকার সবদিক থেকে একটা উপায় অবলম্বনের জন্য চাপের সম্মুখীন হন। ১৭৮৮ সালের ৮ই আগস্ট অতিরিক্ত আতংক, সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহ, এবং আশা-ভরসার ভেতর রাজা পরবর্তী বছরের জন্য এস্টেটস-জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করেন। অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে দিব্যজ্ঞানের অধিকারী বলে খ্যাত নেকারকে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। পূর্বের মতো তিনি অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করবেন।

সেকেলে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে বড় মাপের কোনো সংস্কার কর্ম কোনো দিন সম্ভব হয়নি। এই ব্যবস্থায় যাজক শ্রেণী, অভিজাত সম্প্রদায় এবং থার্ড এস্টেট* এ যাবৎকাল আলাদাভাবে কাজ করেছে, ভোট প্রদানও করেছে আলাদাভাবে। নেকার এ ধরনের কিছু পছন্দ করেন না। তিনি প্রত্যাশা করেন যে স্টেটস্ জেনারেল অর্থের ব্যবস্থা করবে, যা দিয়ে সম্ভব হবে বাজেট সমভার করা এবং যে বিরাট ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করা যাবে। সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য কোনো পরিকল্পনা আগেভাগে গ্রহণ করেনি, তাছাড়া বারো শত অনভিজ্ঞ সদস্যের (বিধান সভার) কর্মকাণ্ড নির্ধারণের জন্যও কোনো নির্দেশনা তৈরি করেনি। যদিও ২৪ জানুয়ারি সাব্যস্ত হয় যে থার্ড এস্টেটের সদস্য সংখ্যা হবে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মোট সদস্য সংখ্যার সমান কিন্তু সরকার এখনো মনস্থির করতে পারেন নি যে এই তিনটি সংস্থা একত্রে অধিবেশনে বসবে না তারা বিধান সভার কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবে পৃথকভাবে। ভের্সাইতে বিধান সভার অধিবেশন আহ্বান করার পর যে দৃঢ় সংকল্প এবং উত্তেজিত রাজনৈতিক মতামতের সৃষ্টি হয় তা রাজার প্রত্যাশার মধ্যে ছিলো না। অভূতপূর্ব কিছু যে ঘটতে পারে তার কোনো লক্ষণ রাজা লুই-র নজরে পড়ে নি।

অথচ কাইয়ার (cahiers) নির্দেশাবলীতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিলো। এই সংস্কারের বাস্তব রূপ যাই হোক না কেন। ফ্রান্সের প্রতিটি মহল কথিত নির্দেশাবলী তৈরি করে, তা প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। সংকট যখন ঘনীভূত, তখন এই কাজটি করা হয়। ফ্রান্সের জনসাধারণ তখন প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে কাজ করেনি। কথিত নির্দেশাবলী বা দলিলগুলি থেকে তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কিন্তু কর আরোপ করা হবে সর্ব সাধারণের সম্মতি ব্যতিরেকে, কিংবা তেই (taille)*

---

* যাজক ও অভিজাত শ্রেণী বাদে প্রায় সমগ্র জাতি তৃতীয় এস্টেটভুক্ত।
* যেটি আদায় উপর কর যা একচ্ছত্র কৃষকদেরই দিতে হতো বলা চলে।

বদেশ করা হবেনা, তা কেউ চায়নি। যদিও সবার স্বার্থ অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করেনি। একটি লিখন ব্যাপক প্রচার লাভ করে। এটি প্রণয়ন করেন জনৈক তরুণ মেধাবী ধর্মযাজক। এই লিখনে একটি শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের রূপরেখা তুলে ধরা হয়। বস্তুত এ ধরনের রাজতন্ত্র ফ্রান্সে কায়েম হয় মহান নেপোলিয়নের পতনের পর। কথিত তরুণ ধর্মযাজকের নাম তালেরা[১]। অজু ব বিশপ। বৈপ্লবিক কলহের অবসানের পর ১৮১৪ সালে ফ্রান্সে তিনি যে অষুধ প্রয়োগ করেন যুবা বয়সে তার অনুরূপ কিছু করতে গিয়ে বিফলতা কুড়িয়েছিলেন। তিনি যে নিদান দেন তা প্রস্তাবিত অনেক নিদানের চেয়ে বাস্তবসম্মত ছিলো।

সংবিধান সভা বসার পরই থার্ড এস্টেটের সভ্যরা জনতার মনস্তত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই সভায় মিলিত হয় বিপুল উত্তেজনা এবং লাগামহীন আশা-আকাঙ্ক্ষার জোয়ার চলাকালে। থার্ড এস্টেটের সভ্যরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তারা ফ্রান্সে এমন প্রতিষ্ঠানাদির সূচনা করবেন যা পরবর্তীকালে গোটা জগতের ঈর্ষার বস্তু এবং আদর্শ হিসেবে গণ্য হবে। নতুন প্রজন্মের আশা-ভরসার অন্ত ছিলো না। তাদের অতি আশাবাদের অনুকূলে একাধিক কারণও কাজ করছে। ফলে থার্ড এস্টেটের সভ্যরা সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীগুলির বিরোধিতা মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ১০ই জুন তারা নিজেদের পক্ষে জাতীয় সভা হিসেবে ঘোষণা দেন এবং ২০শে জুন টেনিস কোর্টের বিখ্যাত সম্মেলনে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেন যে ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান রচনার আগে ক্ষান্ত হবেন না।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রতিশ্রুত কাজটি ছিলো বড়ো মাপের। আমেরিকার সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিলো কোয়েকার নগরী বলে পরিচিতি প্রশান্ত ফিলাডেলফিয়ায়, একটি অর্গলবদ্ধ ঘরে। প্রণয়ন করেন অত্যন্ত যোগ্য কয়েকজন ব্যক্তি। তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না। ভের্সাই-এর সংবিধান সভার সদস্য সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিই ছিলো বলা চলে। উপরন্তু তারা যখন কাজ করতে বসেন তখন দেশে নিদারুণ অরাজক অবস্থা। তাছাড়া প্যারিসের অধিবাসীদের আক্রমণাত্মক চাপ তো ছিলোই। অথচ যে কোনো অবস্থায় ফরাসি রাজতন্ত্রের সুপ্রাচীন কাঠামোর সংস্কার সাধন ছিলো দুরূহ কর্ম। এই কাজটি আরো কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ ফরাসি রাজ্য শাসনের ভার চলতি ঘটনাবলি সংবিধান সভার উপর চাপিয়ে দেয়।

এদিকে রাজদরবারের অবস্থান ছিলো একটি ষড়যন্ত্রকারী দলের। এরা জনগণকে কোনো প্রকার ছাড় দিতে রাজী নয়। সংবিধান সভার ক্ষমতা খর্ব করাও তাদের অন্যতম লক্ষ্য। রাজধানীতে অরাজকতা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই গোষ্ঠী আরো চায় বল প্রয়োগ করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। এদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে রাজা লুই নেকার-কে বরখাস্ত করেছেন। এই নেকার অন্তত তিনটি কারণে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত নেকার প্রটেস্ট্যান্ট, দ্বিতীয়ত তিনি এক ভুঁইফোড় ব্যক্তি, তৃতীয়ত, তিনি ছিলেন

---

১ Talleyrand-Perigord, Charles Maurice de (১৭৫৪–১৮৩৮)। ১৭৮৮ সালে তালেরা প্রাথমিক রাজকীয় সংবিধান মেনে কূটনৈতিক কাজ নিয়ে লন্ডনে যান। কিন্তু ফিরে না আসায় দেশ ত্যাগী হিসেবে গণ্য হন। কিছুদিন আমেরিকায় কাটিয়ে ১৭৯৬ সালে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ১৭৯৭ সাল থেকে ১৭৯৯ সাল-এর জুলাই এবং ১৭৯৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮০৭ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে কলহের পর ১৮১৪ সালে বুরবঁ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করেন। তিয়েস সম্মেলনে ফ্রান্সের ন্যায্য মর্যাদা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং অনেকাংশে সফল হন।

সংস্কারপন্থী। তাছাড়া রাজা তাদের দাবি অনুসারে ভের্সাই ও সন্নিকটে বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত নিয়মিত সৈনিক দ্বারা গঠিত একটি বাহিনীর জন্য শিবির স্থাপনে রাজী হন। লুই স্বেচ্ছায় সংস্কার পরিকল্পনায় সম্মত হয়েছিলেন। এবার তিনি কট্টরপন্থীদের ঘায়েল করেন।

প্যারিসের জনতা একে হুমকি বলে গণ্য করতে বাধ্য হয়। তারা এর যে ভাষ্য দেয় তা শুধু প্রসিদ্ধি অর্জন করেনি। অতঃপর জুলাই মাসের ১৪ তারিখ জাতীয় উৎসবের মর্যাদা লাভ করে। আজকের দিনেও ফ্রান্সে উক্ত দিবস জাতীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়। বাস্তেই-এর পতন ঘটে উচ্ছৃঙ্খল জনতার কাছে, এরা শক্তি অর্জন করে ইনভ্যালিডদের (Invalides) লুণ্ঠন করে। সম্ভবত পুঁজিপতিরাও তাদের আর্থিকভাবে সাহায্য করেন। কারণ তারা দেখতে পান যে একমাত্র নেকারের পক্ষে সম্ভব অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার। বাস্তেই দুর্গের বন্দুকগুলি ছিলো অকেজো এবং সেকেলে। অতএব এই দুর্গ আক্রমণ কোনো গৌরবজনক ব্যাপার ছিলো না। তাছাড়া বাস্তেই দুর্গ পতনের আগে ও পরে যা কিছু ঘটে তা ছিলো নিতান্ত লজ্জাজনক। কারণ রাজধানীর নিরীহ জনসাধারণ নিতান্ত আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সর্বত্র চলে লুণ্ঠনের মচ্ছব, কিছু সেনা বিদ্রোহী হয়। কিছু সেনা যোগ দেয় তাণ্ডবলীলায়। উপরন্তু শর্তসাপেক্ষে দুর্গের লোকেরা আত্মসমর্পণ করে। অথচ তাদের নিধন করা হয় নির্দয়ভাবে এবং নির্বিচারে। প্যারিস নগরীর প্রান্তদেশের এই প্রাচীন কারাগার অধিগ্রহণ এবং ধ্বংসসাধন যদিও ঘৃণ্য অপরাধ দ্বারা কলুষিত হয়, তবু এটি ছিলো রাজনৈতিক মহাযজ্ঞ (masterpiece) বিশেষ। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে বাস্তেই দুর্গের পতনকে লোক চক্ষুর আড়ালে নির্দয় নির্যাতন এবং খেয়াল-খুশি মতো নিরীহ জন সাধারণকে কারাগারে নিক্ষেপের ঘটনার অবসান হিসেবে হর্ষধ্বনির ভেতর অভিনন্দন জানানো হয়। উপরন্তু মনে করা হয় যে স্বাধীনতার যুগের শুভ সূচনা হলো। অতঃপর প্যারিস নগরী ইতিহাসের সম্মুখভাগে চলে আসে। প্যারিসের কমিউন পরিণত হয় শক্তিশালী সরকারে, নগরীর ন্যাশনাল গার্ড (অলিকাভুক্ত অনেক অপরাধীও এর অন্তর্ভুক্ত) ছিলো জাতীয় সেনা বাহিনীর অঙ্কুরবিশেষ, এবং প্যারিসের জনতার ভয়ংকর পাশবিকতা অদূর ভবিষ্যতে অনিবার্য আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তেই-এর পতন রাজদরবারের জন্য এই বার্তা বহন করে যে প্যারিস নগরী প্রত্যাশা করেনি যে সংবিধান ব্যর্থ হয়। রাজদরবারকে আরো একটা জিনিস বুঝে নিতে হয় যে প্যারিস নগরী যা চাইবে সমগ্র ফরাসি রাজ্য তা অঙ্গীকার করতে বাধ্য। এই সংবাদ শোনার পর রাজা লুই মন্তব্য করেন, "এটি একটি মহাবিদ্রোহ।" এই মন্তব্যের জবাবে Duc de Liancourt বলেন, "তা নয়, জনাব, এটি একটি মহান বিপ্লব।"

রাজতন্ত্রের অবসান এখন সম্পূর্ণ বলা চলে। এই রাজতন্ত্রের পক্ষে এখন আর সম্ভব নয় মিত্রদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, কিংবা শত্রুপক্ষের ধ্বংসে সাধন। কমবখত রাজার মর্যাদা লঙ্ঘন করা হয় সম্ভাব্য প্রতিটি উপায়ে। প্যারিস নগরীর সন্নিকটে সৈনিকদের শিবির স্থাপনের আদেশ তাকে প্রত্যাহার করে নিতে হয়, তিনি নেকারকে পুনরায় রাজকার্যে নিয়োগ করতে বাধ্য হন, বাস্তেই-এর পতনকে প্রকাশ্যে জানাতে হয় আশীর্বাদ, প্রকাশ্যেই তাকে গ্রহণ করতে হয় ত্রিবর্ণ ককেইড (টুপিতে)। এটির নকশা তৈরি করেছিলেন লাফায়েৎ*

---

* La Fayatte, Marie Jean Paul Roch Yves Guilbert Matiez, Marquis de, (১৭৫৭-১৮৩৪)। মুক্তপন্থী, ফরাসী অভিজাত। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব হয়েছিলো। প্রথমদিকে ফরাসি বিপ্লবের সক্রিয় সমর্থন করে

ভোটাধিকার প্রাপ্ত জাতীয় পতাকা হিসেবে। এই নায়কের ছিলেন আমেরিকার মুক্তিদাতা এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনীর নির্বাচিত কমান্ডান্ট। কিন্তু প্যারিস নগরী তখন লক্ষ্য স্থির করতে পারে নি। তবে রাজা যত দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবেন ততদিন তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠা সম্ভব। তিনি ফের প্রতিক্রিয়াশীল চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন, পুনরায় গঠন করতে পারেন সেনাদল। বানচাল করতে পারেন আজ্ঞা। এমন কি পলায়ন করতে পারেন। এই ধারণা জন্ম নিতে থাকে যে প্যারিস নগরীই তার জন্য নিরাপদ, এখানে কমিউন তার উপর নজরদারি করতে পারবে, জাতীয় রক্ষী বাহিনী পারবে তাকে ঘিরে থাকতে। অসাধারণ সুন্দরী এবং বাকপটু এক রমণী, 'রলাঁর স্ত্রী', এই তত্ত্ব প্রচার করেন তার গুণগ্রাহী বন্ধুচক্রের কাছে

এর মধ্যে বৈপ্লবিক বিক্ষোভের কায়দা-কানুন রাজধানীর সর্ব সাধারণ সম্যক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন। দাঙ্গাবাজির জন্য ছিলো প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সংগঠকের যোগান, সরল-সোজা মানুষ এবং চরমপন্থীদের যোগানেও ঘাটতি ছিলো না। গুণ্ডাপাণ্ডার সরবরাহও ছিলো পর্যাপ্ত সংখ্যায়। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে একটা অভ্যুত্থান ঘটানোর অজুহাতও ছিলো। রাজা ফ্লান্ডার বাহিনীকে ভের্সাইতে তলব করেন, পলায়নের কথাও ভাবেন। রাজকীয় রক্ষীবাহিনী ত্রিবর্ণ পতাকা পদদলিত করে। জুলাই মাসে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যে কার্যক্রম হাতে নেয় তা বাস্তবায়নের চেষ্টা পুনরায় শুরু হয়। এসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয় রুটির অভাব। ফলে ভের্সাই অভিমুখে যাত্রা শুরু করে সেই ইতিহাসখ্যাত মিছিল ৫ অক্টোবর। এই মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন ক্ষুধার্ত মহিলারা। তাদের একমাত্র দাবি ; রুটি চাই। তবে মিছিল অনুসরণ করে অগ্রসর হয় জাতীয় রক্ষীবাহিনী, লাফাইয়েতের নেতৃত্বে। অক্টোবর মাসেই রাজা ও রানীকে প্যারিস নগরীতে ফিরিয়ে আনা হয়। তুইলারি প্রাসাদে শুরু হয় তাদের বিষণ্ন বন্দী জীবন।

বাস্তিই দুর্গের পতনের পর জুলাই মাসের এক রাত্রিতে, যখন রাজ্যে অরাজকতা চরমে পৌঁছেছে, অভিজাত সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘর বা প্রাসাদগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন তালেরাঁ (Talleyrand) গোপনে কঁৎ দার্তোয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই কঁৎ দার্তোয়া হলেন রাজা লুই-ব অনুজ। তালেরাঁ দার্তোয়াকে পরামর্শ দেন যে রাজা যেন সংবিধান সভা ভেঙে দেন এবং বল প্রয়োগ করে রাজ্যে অরাজকতার অবসান ঘটান। মানবতার খাতিরে রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হন নি, আর দার্তোয়া যখন দেখতে পেলেন যে তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত নয় তখন তিনি নিঃশব্দে সীমান্ত অতিক্রম করেন। তিনিই প্রথম দেশত্যাগ করেন,

---

তিনি দুই জগতের নায়ক নামে পরিচিত হন। ১৭৯২ সালে ফরাসি বিপ্লব থেকে সরে দাঁড়ান এবং দেশত্যাগী হন। কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষ তাকে বন্দী করে। নেপোলিয়ন তার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। বুরবোঁর পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। বুরবোঁ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি আবার রাজনৈতিক জীবনে ফিরে আসেন। ১৮৩০-এ লুই ফিলিপকে সিংহাসনে বসানোর ব্যাপারে তার হাত ছিলো।

• মাদাম রলাঁ : Madame Roland, Manon Jean Philipon (১৭৫৪-১৭৯৩)। প্যারিসে জন্ম। ১৭৮০-তে জাঁ মারি রলাঁকে বিয়ে করেন। প্যারিসে মাদাম রলাঁ তাঁর সালঁ (Salon) খোলেন ১৭৯১ সালে। মাদাম রলাঁর সালঁতে জিরন্ডীয় বা বিসপন্থীরা আসতেন। ১৭৯৩-এর ২রা জুনের বিপ্লবের পর মাদাম রলাঁকে গ্রেফতার করা হয় ; ওই বছরের অক্টোবর মাসে তাকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়।

ফলে অপরের জন্য অনুসরণীয় নজির স্থাপিত হয়। শুরু হয় দেশত্যাগের জোয়ার। এর জন্য ফ্রান্স ও বাকী ইউরোপের যে ক্ষতি হয় তার পরিমাপ দুঃসাধ্য ব্যাপার।

ক্রুদ্ধ, তেজি, আদর্শহীন অভিজাত সম্প্রদায় ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করায় যে প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হয় তা বাড়িয়ে বলার কোনো অবকাশ নেই। যেহেতু তারা দেশের শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলায় তাতে ক্ষতিটা একটু বেশিই হয়। এই দেশত্যাগীদের লক্ষ্য ছিলো বিদেশী শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা কিংবা গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে বিপ্লবী দলগুলির সকল প্রচেষ্টা ভণ্ডুল করে দেয়া। বৈপ্লবিক ফ্রান্সকে যে সব বৃহত্তর বিপর্যয় নাস্তা-নাবুদ করে, যেমন রাজা ও রানীকে নিধন, ক্ষতিকর সন্দেহজনক আবহের সৃষ্টি, সন্ত্রাস, নির্দয় নির্যাতন, নমনীয় এবং মানবিক অভিমত নিষিদ্ধকরণ, এর সঙ্গে দেশত্যাগী (emigres)দের দ্বারা সৃষ্ট ভীতিকর পরিস্থিতির সংযোগ সহজেই অনুমান করা যায়। দেশত্যাগীরা পোষণ করতেন অদম্য ঘৃণা। তাছাড়া দেশের ভেতর এবং বাইরে তাদের সশস্ত্র মিত্রদের অবস্থানও ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অবদান রাখে। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ফ্রান্সের সর্বত্র রাজতন্ত্র সমর্থকদের উপস্থিতি।

ইতিমধ্যে সংবিধান সভা অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে ফ্রান্সের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করে, যেন দর্শনের দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতরা ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ধাঁধার সমাধান দিতে সক্ষম হবেন। একদিক থেকে বিচার করতে গেলে সংবিধান সভার দায়িত্ব খুব কঠিন ছিলো না। কারণ এই সংস্থার হাতে কোনো কিছু ধ্বংস করার দায়িত্ব ছিলোনা। বাস্তেই দুর্গ যেমন কোনো প্রকার প্রতিরোধ খাড়া করেনি, তেমনি সামন্ততন্ত্রের দুর্গও বাস্তবতা সহজে মেনে নেয়। আগস্ট মাসের এক রাত্রির ভেতর অভিজাত সম্প্রদায় এবং যাজক শ্রেণী, প্রদেশসমূহ, পৌরসভাসমূহ, নিগমসমূহ* ভীতি এবং উদারতার আকস্মিক আবেগের বশবর্তী হয়ে তাদের সামন্ততান্ত্রিক অধিকার এবং সুবিধাসমূহ পরিত্যাগ করে। পুরাতন ব্যবস্থা বৈপ্লবিক প্লাবনের আঘাতে ধসে যায়, এর অংশভাক সংবিধান সভার স্কন্ধেও অর্শায়, তবে উক্ত সংস্থা এর উদগাতা কিংবা নির্দেশক নয়। এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। ইতোপূর্বে কোনো সুখ্যাত সমাজ এভাবে তার ঐতিহ্য পরিত্যাগ করেনি। একটা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের ভেতর এই রাজতন্ত্র যদি পরাস্ত কিংবা চূড়ান্ত গ্লানিকর অবস্থায় নিমজ্জিত হতো, তাহলেও ব্যাপারটাকে এর চেয়ে বড় কিছু মনে করা হতো না। বাস্তেই-এর পতনের পর শৃঙ্খলা বলতে কোথাও কিছু থাকেনি : প্রশাসন, সেনাবাহিনী, রাজকীয় নৌবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। নৌবাহিনীর জীর্ণদশায় জলভাগে ফ্রান্স এখন নিঃসহায়। অথচ নৌবাহিনীই আমেরিকার যুদ্ধে চমৎকার সাফল্যের পরিচয় দেয়। কৃষকরা প্রভুদের স্বত্ব অস্বীকার করে। কেউ আর আইনের শাসন মানেনা এবং কর প্রদানে বিরত থাকে। জাতীয় রক্ষীবাহিনী ফ্রান্সের সর্বত্র গজিয়ে ওঠে। তাদের কাজ দাঁড়ায় বিপ্লবের সংরক্ষণ। দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে একটি সুরই বাজতে থাকে। জনগণ সার্বভৌম। পুরাতন ব্যবস্থার অতিকায় রাজতন্ত্র ছিলো বিশাল প্রতারণা। ফরাসিরা আর কারো প্রজা নয়, কোনোকালে ছিলো না। তারা নাগরিক, তারা মুক্ত ও সাম্যভিত্তিক ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য, তাদের রয়েছে শান্তি স্থাপন কিংবা যুদ্ধ করার ক্ষমতা, তারা সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতার অধিকারী,

---

* রাষ্ট্র প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বৃত্তিজীবী মানুষের শ্রেণী।

নাগরিকদের করা তাদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তারা রাজা, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী নিয়ন্ত্রণে সক্ষম, তারা আইন তৈরি করতে পারে, এবং আরোপের ক্ষমতাও তাদের রয়েছে। আইনানুগ কাজ বলে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সংসদের মাধ্যমে প্রকাশিত সব সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা কিংবা জনগণের ইচ্ছা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। বিশেষ কোনো সংস্থা, তা সে প্রদেশ, পুরসভা, সামাজিক শ্রেণী, পেশাদার শ্রেণী, ব্যবসায়ী সঙ্ঘসমূহ কিংবা নিগম, আনুগত্য প্রকাশ করবে এক ও অবিভাজ্য ফরাসি রাজ্যের প্রতি। প্রতিটি পেশাজীবী (যেমন কামার, কুমার ও কৃষক) দেখতে পায় যে সে সার্বভৌম ফ্রান্সের অংশভুক্ত, তবে প্রভুর মতোই সেও একজন মানবসন্তান, তার অধিকারসমূহ অলঙ্ঘনীয়, সে স্বাধীন জীবন যাপনের অধিকারী, তার সম্পত্তির মালিক হবার অধিকার রয়েছে, তার রয়েছে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার, তাকে নিষ্পেষণ করা চলবে না। ১৭৮৯ সালের গ্রীষ্মকালে এটিই ছিলো ফ্রান্সের চিন্তা-ভাবনার রূপ, ফ্রান্সের মনোভাব। ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রজাকুলের কাছেও নতুন গণতন্ত্র এ ধরনেরই আবেদন সৃষ্টি করে। ১৭৯১ সালের সংবিধানের মুখবন্ধে 'মানুষের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা' যুক্ত করা হয়। আর এই দর্শন বা ভাবধারা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। অগণন মানুষের হৃদয়ে এই ভাবধারা জ্বালিয়ে দেয় আত্মমহিমা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ।

এই গণতান্ত্রিক যুক্তির প্রলুব্ধকর শক্তির বিরুদ্ধে মিতাচার ও প্রজ্ঞার বাণী ছিলো অরণ্যে রোদন। উপরোক্ত তত্ত্বগুলির মূল কথা এই ছিলো যে মানুষ স্বভাবতই সৎগুণসম্পন্ন। এই বিশ্বাস সেকালে সবাই কম বেশি পোষণ করেছেন। আর এই বিশ্বাসই ফ্রান্সের জন্য একাধিক বিপর্যয় ডেকে আনে। উপরন্তু বিপর্যয়গুলি ফ্রান্সের রাষ্ট্রদেহ আক্রমণ করে দ্রুততার সঙ্গে। ফরাসিরা জাতি হিসেবে রাজনৈতিক ফেরেশতা ছিলেন না, কিন্তু ফরাসিদের মহান গুণাবলির পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিলো একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোর। বোধ হয় অন্য কোনো জাতির চেয়ে তাদের এই প্রয়োজনটা একটু বেশিই ছিলো। অথচ এই শাসন কাঠামো উক্ত চকচকে এবং অত্যন্ত আশাবাদী তত্ত্বের জন্য স্বীয় কায়দা-কানুনের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

বুর্জোয়াদের নিচের স্তরে অবস্থান ছিলো প্রলেতারিয়েৎদের। তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র। এই শ্রেণী পশুর পর্যায়ে নেমে যায় সামাজিক অবহেলা ও অসাম্যভিত্তিক আইনের দরুন। এদের অধিকাংশই ছিলো চোরাকারবারি, দস্যু শ্রেণীভুক্ত, বেপরোয়া দুর্বৃত্ত এবং নানাবিধ অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। বাস্তেই দুর্গ পতনের রাতে অগণন নারী ও শিশু-কিশোর তিন জন নির্দোষ ফরাসি ভদ্রলোকের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথা ঘিরে মশাল হাতে নৃত্য করে। এই নির্দয় ঘটনার মর্ম কেউ উপলব্ধি করেনি। রাজা ও তার মন্ত্রিপরিষদ সংবিধান সভা নিয়ন্ত্রণ করেনি, সংবিধান সভা ফরাসি রাজ্য শাসনে বিরত থাকে, পুলিশ বিরত থাকে প্যারিস নগরীতে বিরাজিত অরাজকতা মোকাবেলায়। যখন রাজা ও সংবিধান সভাকে রাজধানীতে স্থানান্তর করা হয়, তখন সার্বভৌমত্বের প্রকৃত কেন্দ্র রাজনৈতিক ক্লাবগুলির হাতের মুঠোয়। এই ক্লাবগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো জ্যাকবাঁ ক্লাব। এই ক্লাব অবিলম্বে একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান এবং ফ্রান্সের প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়। এই বৈপ্লবিক সংস্থা বা ক্লাবগুলি আইনসভাকে সন্ত্রস্ত করে তোলে এবং সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটায়। অথচ এদের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি।

ইতিহাস সকল যুগেই মিরাবোর প্রতি উৎসাহী নজর দেবে। মিরাবো ছিলেন রোমাঞ্চ সন্ধানী, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, বক্তৃতাবাগিশ এবং প্রচারবিদ। গোটা রাজ্যে অরাজকতা বেড়েই চলেছিলো। তিনি এই অরাজকতা বন্ধ করার জন্য চেষ্টিত হন, কিন্তু ব্যর্থতা বরণ করেন। রাজতন্ত্রকে রক্ষা করার ইচ্ছে তার ছিলো। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ হন। যেমন মিরাবো, তেমনি মুনিয়ে এবং আরো অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে একমাত্র একটি সবল নির্বাহী সংস্থা দেশটিকে রসাতলে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে কিন্তু এই শক্তি কোথা থেকে আসবে? রাজার মধ্যে, কিংবা তদীয় প্রভেসের কাউন্ট-এর মধ্যে এই শক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্যারিসের জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, অসার লাফায়েতের মধ্যেও এই শক্তি নেই।

একটা শক্তিশালী রাজকীয় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য একাধিক চক্রান্ত অনুষ্ঠিত হয়। তবে কোনোটিই সফল হয়নি। যে সকল প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে নতুন শাসনতন্ত্রে নির্বাহী ক্ষমতা সুরক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো (যেমন দ্বিতীয় একটি চেয়ার, ভিটো প্রদানের চূড়ান্ত ক্ষমতা, কিংবা রাজার মন্ত্রিদের আইনসভায় বসার অধিকার) তার সবই ভেস্তে যায় কথিত গণতান্ত্রিক মতবাদের শৈল খণ্ডে ধাক্কা খেয়ে। এমনকি মিরাবো রাজতন্ত্র সমর্থকদের শতাংশে ভোট পাবার ভরসা পাননি। কারণ অনেক রাজতন্ত্র সমর্থক ছিলেন অন্তর্ঘাতক। তারা চাইছিলেন যে একটা অত্যন্ত বাজে ধরনের সংবিধান প্রণয়ন করা হোক। তাহলে গণতন্ত্রের সুনাম ক্ষুণ্ন করার সুযোগ পাওয়া যাবে। মিরাবো বিবেচনা করে দেখলেন পরিষদ যদি ভের্সাইতে অবস্থান করে তাহলে কিছুই করা সম্ভব হবে না। তিনি রাজদরবারের কাছে গোপনে প্রস্তাব করেন যে তাদের প্রকাশ্যে রুয়েঁ-তে চলে যাওয়া উচিত। তিনি একাধিক কৌশল প্রস্তাবিত করেন কিন্তু সম্ভবত এই প্রস্তাবটিই ছিলো কম দুঃসাহসিক। তবে উক্ত প্রস্তাব আসে অনেক বিলম্ব হয়ে যাবার পর। কারণ ফ্রান্স ইতোমধ্যে অজ্ঞাতসারে মনে-মনে প্রজাতন্ত্রী আদর্শ গ্রহণ করে ফেলেছে। প্রচণ্ড বাদানুবাদের পর শেষ পর্যন্ত যে সংবিধান প্রণীত হয় তাতে দেখা যায় যে পূর্বেকার অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। ক্ষমতার নিয়মনীতিহীন বিকেন্দ্রীকরণজনিত অসুবিধাগুলি থেকে যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে পরিষদ অনিয়মসমূহ দূর করার চেষ্টাই করেনি। সে যাত্রা রাজতন্ত্র টিকে গেল, তবে রয়ে গেল অতীতের নিষ্প্রাণ ছায়া হিসেবে। কারণ ক্ষমতা ইতিমধ্যে চল্লিশ হাজার পুরসভার হাতে চলে গেছে। এই পুরসভাগুলি যে পরিমাণ কর আরোপ করতো নিজেরাও কর হিসেবে প্রদান করতো তার সমপরিমাণ। উপরন্তু এদের নির্দেশ ব্যতিরেকে জাতীয় রক্ষী বাহিনীর নড়াচড়ার কোনো অধিকার ছিলো না। ফরাসি রাজ্য সংগঠন করতে গিয়ে বিপ্লবীরা প্রথমেই যে প্রধান ও গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হন তা এই যে, নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রতি কেউ আস্থা পোষণ করেনা। সকলেই সার্বজনীন নির্বাচনের প্রতি অতিরিক্ত আস্থাশীল।

একই গণতান্ত্রিক যুক্তিধারা থেকে আরো একটি ত্রুটি অনেকের নজরে পড়ে। তাহলো রাজকতন্ত্রের লৌকিকীকরণ। ফরাসি বিপ্লবের প্রধান নীতি এই ছিলো যে সংঘবদ্ধ দলসমূহ (corporate bodies) সমাজের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক, আর যেহেতু কোনো পৌরী নির্মাণ মতো বিত্তবান, প্রভাবশালী ছিলো না কিংবা সির্জার মতো দীর্ঘকাল অসহিষ্ণুতা প্রদর্শনের সুযোগ পায়নি, অতএব রাজক বিরোধী সভা সির্জাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বিক্ষুব্ধ হয়।

একের পর এক কঠোর থেকে কঠোরতর আঘাত হানা হয় যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে। প্রথমেই টাইদ আদায়ের প্রথা রহিত করা হয়, অথচ এর জন্য কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি। অতঃপর গির্জার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধর্মীয় সঙ্ঘসমূহের কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নিয়ন্ত্রণ। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনীদের করা হয় সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত। (অর্থাৎ অতঃপর এরা কোনো প্রকার ব্রত পালনে বাধ্য নন)। উপরন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আকার-আয়তন অনেকাংশে হ্রাস করা হয়। তথাপি, যেহেতু ধর্মীয় মতবাদ এবং উপাসনা ব্যাপারে কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়নি, ফলে উপরোক্ত ব্যবস্থাদি যতোই কঠোর হোক না কেন, তা হয়তো কিছুতেই অনতিক্রম্য অন্তরায়ের সৃষ্টি করতে পারেতা না। এখন যাজকরা সহজেই ক্ষুব্ধ হতে পারেন যে তাদের প্রভাববলয় হ্রাস করা হলো, অনুদান লাভের পথও খোলা রইলো না। উপরন্তু তাদের করা হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদেয় বেতনের উপর নির্ভরশীল। তবে ফ্রান্সে বহুকাল একটি রাষ্ট্রীয় গির্জাতন্ত্র টিকে ছিলো ; তাছাড়া কোনো সৎ খ্রিস্টান এমন ব্যবস্থার নিন্দা করতে পারেন না যে ব্যবস্থায় প্রিলেটদের অতিরিক্ত আয়ের পথ বন্ধ হয় এবং পল্লীর পাদরিদের সামান্য আয় কিছুটা স্ফীত হয়। যাজকতন্ত্রের সঙ্গে বিপ্লবীদের এই যে বিবাদ শুরু হলো তা চরমে পৌঁছে যখন বলা হয় যে, বিশপরা দেপার্তমের নির্বাচকদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন, আর পল্লীর ক্ষুদে পাদরিদের (cure)* নির্বাচিত করবেন জেলার প্রশাসনিক সভা। তাহলে ক্যাথলিক বিশপ এবং ক্যাথলিক কিউরে (ক্ষুদে পাদরি)দের সাধারণ লোকেরা নির্বাচিত করতে পারবেন। এই নির্বাচকদের অনেকে প্রটেস্ট্যান্ট, এমনকি নিরীশ্বরবাদী হতে পারেন। এখন অনুমান করা যায় যে, এভাবে নির্বাচিত লোকদের দ্বারা পরিচালিত গির্জা পুরাতন খোলস পরিত্যাগ করবে। বিশেষত, যেহেতু কোনো ফরাসি নাগরিক এমন কোনো বিশপ বা মেট্রোপলিটানকে স্বীকৃতি প্রদান করতে পারবেন না যার যাজকীয় অঞ্চল ফরাসি রাজ্যের সীমার বাইরে অবস্থিত। এটা অনিবার্য ছিলো যে, যেহেতু এইসব আইন প্রণয়নের কোনো পর্যায়ে পোপের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি, অতএব পোপ যাজকতন্ত্রের লৌকিক গঠনতন্ত্রের নিন্দা করবেন। তাছাড়া এতে ক্যাথলিক জগৎ বিরাট আঘাত পাবে। শাসনতান্ত্রিক সভা অনেক ভুল করে। তবে জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে যে ভুল করে তার ফলশ্রুতি ছিলো সবচয়ে সুদূরপ্রসারী। বিপ্লবের সূচনাকালে পল্লীর পাদরিরা (cure) জনগণের সঙ্গে যোগ দেয়, তাদের সমর্থনও বিপ্লবের জন্য ছিলো অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এবার যাজক সম্প্রদায় দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। নীতির দিক থেকে নমনীয় যাজকরা লৌকিক গঠনতন্ত্র অনুসারে শপথ গ্রহণ করে, তারা স্বপদেও বহাল থাকে, তারা বেতনও পায়। অন্যেরা নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিভক্তিপ্রবণ গির্জার অনুগত হওয়ার চেয়ে তারা বরং পালিয়ে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অনাহার, কারাভোগ এবং মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকি কবুল করে। কিন্তু তারা প্রাচীন বিশ্বাসে অবিচল থাকে। বিপ্লবী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এরাই প্রথম প্রতিরোধের সূচনা করে। এদের দেখা পাওয়া যায় ভঁদে এবং ব্রিটানি অঞ্চলে। ত্রিবর্ণ পাতাকার বিরুদ্ধে শাদা ব্যাজ যেখানে বিদ্রোহ করেছে সেখানেই তাদের দেখা গেছে। পরাজয় এবং নির্যাতনের ভেতরও তারা ছিলেন বিজয়ী, কারণ দুর্ভোগের ভেতর বিশুদ্ধ হয়ে ফরাসি গির্জা নতুন নৈতিক জীবন লাভ করে।

---

* নতুন প্রশাসনিক এলাকা এভাবেই সৃষ্টি হয় পুরাতন স্থানীয় আনুগত্য এবং বিশেষ সুবিধা রহিত করার জন্য।

বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডে অবশ্য সমাজতন্ত্রের নামগন্ধও ছিলো না। ফরাসি বিপ্লব বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে আঘাত হানে, সম্পত্তির বিরুদ্ধে নয়। সংবিধান সভার সদস্যবৃন্দ ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর এতোটা জোর দেয় যে তারা ট্রেড ইউনিয়নের মতো স্বাধীনতিক সংস্থারও বিরোধিতা করে। অথচ পরবর্তীকালে সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ইউনিয়ন করার অধিকারকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে। কৃষকদের ইচ্ছামতো কৃষিকার্য এবং বিক্রয়ের অধিকার প্রদান করা হয়। ভূমিদাস প্রথা তাৎক্ষণিকভাবে বিলোপ করা হয়, কুইট রেন্ট করা হয় অপসারিত, শিকার আইন করা হয় শিথিল, সাধারণ মানুষের উপর সামন্ত প্রভুদের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। তবে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হলেও তার ভিত্তি পরিবর্তিত হয়নি। ফ্রান্সের ভূমি কর্ষণের দায়িত্ব এখনো সামন্ত প্রভু মালিকরা পালন করে, কিংবা পুরানা ভাগচাষের উপর নির্ভরশীল, যেখানে জমির মালিক এবং ভাগচাষীরা লাভ-ক্ষতি ভাগ করে নেয়। কৃষিভিত্তিক কমিউনপ্রথা কিংবা জমির রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরিকল্পনা কখনো গ্রহণ করা হয়নি।

বস্তুগত কারণেই (রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে উদ্ভূত) কৃষকরা বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হয়। সংবিধান সভার অন্তত একটি অংশ যাতে নস্যাৎ হয়ে না যায় এটাও তারা নিশ্চিত করে। ফরাসি রাজ্য শাসনের জন্য সংবিধান সভার অর্থের প্রয়োজন : তারা এই প্রয়োজন মেটায় কাগজী মুদ্রার (assignats) প্রচলন করে। প্রথমে গির্জা এবং পরবর্তীকালে রাজা এবং দেশত্যাগীদের সম্পত্তি কাগজী মুদ্রার স্থিতি নিশ্চিত করে। ১৭৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চারশো মিলিয়ন ফ্রাঁ বাজারে ছাড়া হয় গির্জার সম্পত্তি বিক্রয় থেকে লভ্য অর্থের আগাম হিসেবে। কিন্তু অনতিবিলম্বে দেখা যায় উক্ত পরিমাণ মুদ্রা যথেষ্ট নয়। অতিরিক্ত প্রয়োজন মেটানো হয় নতুন করে কাগজী মুদ্রা ইস্যু করে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, কাগজী মুদ্রার মূল্য হ্রাস পায়, শুরু হয় হাস্যকর মূল্যে জমির হস্তান্তর। দেশের মুদ্রা যদি অতি দ্রুত মূল্য হারায় তাহলে অনেকের জন্য তা সর্বনাশ ডেকে আনে। আবার অনেকে লাভবানও হয়। ফরাসি কাগজী মুদ্রার পতনের দরুন রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রায় শূন্যের কোঠায় ঠেকে, বিনিয়োগকারী (rentier) এবং শহুরে লোকেরা দরিদ্র হয়ে পড়ে। এখন প্যারিস নগরীতে বৈপ্লবিক উত্তেজনা বজায় রাখা একমাত্র সম্ভব ফাটকাবাজী এবং সন্ত্রাসের আবহ সৃষ্টি করে। তবে বৈপ্লবিক ঐকতানে যোগ দিয়ে যে কৃষক ভূমির মালিক হয় তার লাভ হয় বৈকি এবং অন্যান্য কারণের মধ্যে এই কারণেও লাভবান কৃষক এবং শহরাঞ্চলের জমির ফাটকা ব্যবসায়ীরা বিপ্লবের প্রশংসায় মুখর হয়, উপরন্তু সব সময় আতংকে থেকেছে এই বুঝি বৈপ্লবিক সকল কর্মকাণ্ড ভণ্ডুল হয়ে যায়।

তুইলারি প্রাসাদের বন্দীরা নিঃসহায় আতংক এবং গভীর বিরাগের ভেতর বিপ্লবের জোয়ার স্ফীত হওয়া লক্ষ্য করে। তাদের চোখের সামনে ঘটে জ্যাকবাঁ ক্লাবের হিংস্রতা, খবরের কাগজগুলির রক্তলোলুপ উত্তেজনায় ইন্ধন যোগানো এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতার কাছে প্রতিনিয়ত সংবিধান সভায় আত্মসমর্পণ। রাজার কাছে প্রতিটি চলতি ঘটনা বিরাগ উদ্রেককারী তবে যাজকতন্ত্রের জন্য লৌকিক গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ছিলো বেয়াদবির চূড়ান্ত। রাজা অনুভব করেন যে এ ধরনের আইন মেনে নিতে তার বিবেক সায় দেবে না, কিংবা কোনো লৌকিক যাজকের কাছ থেকে তিনি অপস্বীকার গ্রহণ করতে পারেন না। ১৭৯১ সালে ইস্টারের আগের সোমবার একটা ঘটনা ঘটে, যা থেকে অনুমান করা যায় যে, একেবারে

ব্যক্তিগত বিবেকের তাগিদকেও মর্যাদা দেয়া হবেনা। ঐ দিন রাজা ও রানী সে ক্লুদে ইস্টার কমুনিয়ন পালনের ইচ্ছে করেন। উচ্ছৃঙ্খল জনতা তাদের ফিরিয়ে দেয়। একে চূড়ান্ত অবমাননা বলেই গণ্য করতে হয়। রাজকীয় পরিবার সীমান্তে পালিয়ে যাওয়া মনস্থ করে। সেখানে কিছু অনুগত বাহিনীর সাহায্যে বুইয়ে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। প্যারিস ত্যাগ করার আগে রাজা একটি ইশতেহার রচনা করেন। তাতে সকল শাসনতান্ত্রিক আজ্ঞা রদ করা হয়। এই আজ্ঞাগুলিতে সম্মতি প্রদান করতে এক সময় তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। উক্ত আজ্ঞাসমূহ সংশোধন করারও আহ্বান জানান।

পলাতকদের তারেন থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয় ২১শে জুন। সেই সময় থেকে রাজতন্ত্রের ভাগ্যে আর কিছু থাকে না। কারণ রাজা খোলাখুলিভাবে শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, তিনি মনে প্রাণে দেশত্যাগী, শপথ গ্রহণে অস্বীকৃত যাজকদের মিত্র, গৃহবিবাদের উস্কানিদাতা, উপরন্তু বৈদেশিক প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের বন্ধু। দীর্ঘ দশ সপ্তাহ তাকে রাজকার্য পরিচালনা করতে দেয়া হয়নি। আর নামে না হলেও কার্যত প্রজাতন্ত্রী সরকার এই আশঙ্কা দূর করার চেষ্টা করে যে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটলে ফরাসি রাজ্য বিগঠনের সম্মুখীন হবে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পূর্ণ হলে (১৭৯১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর) সংবিধান সভা স্বীয় অস্তিত্বের অবসান জারি করে। ইতোমধ্যে আত্মবিলোপের একটি আইন দ্বারা (এতে ফরাসি রাজ্যের কোনো লাভ হয়নি) ঘোষণা করা হয় যে সংবিধান সভার সদস্যরা নতুন আইন সভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না। এভাবে দু'বছরে অর্জিত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে প্রথম ফরাসি শাসনতন্ত্রের প্রণয়নকারীরা অনভিজ্ঞ লোকদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়। অথচ কোনো কিছুই পরিকল্পনা মোতাবেক এগোয়নি। যে সংবিধান সভা স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলো, এবং কাজ করেছে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য (যার রক্ষাকবচ হবে সার্বজনীন ও গণতান্ত্রিক শান্তি), তা সামরিক স্বেচ্ছাচারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ মসৃণ এবং সার্বিক যুদ্ধের বীজ বপন করে।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলি

বিপ্লবের গোটা সময়কাল জরিপের জন্য পাঠকেরা নিম্নলিখিত বইগুলি দেখতে পারেন :

১. জি.পি. গুচ : অ্যানালস অব পলিটিক্স অ্যান্ড কালচার। ১৯০১।
২. দ্য ক্যামব্রিজ মডার্ন হিস্টোরি। ১৯০২-১০।
৩. দ্য ক্যামব্রিজ হিস্টোরি অব দ্য বৃটিশ এম্পায়ার। ১৯২৯।
৪. এ.জে. গ্রান্ট ও টেমপারলি : ইউরোপ ইন দি নাইনটিনথ অ্যান্ড টুয়েনটিয়েথ সেনচুরিজ। (১৭৮৪-১৯৩২)। ১৯৩২।
৫. এডওয়ার্ড ফুয়েটার : ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি, অনু. এস. জি. কে। ১৯২৩।
৬. সি. এ. ফাইফ : হিস্টোরি অব মডার্ন ইউরোপ। ১৯২৪।
৭. বি. ক্রোচে : হিস্টোরি অব ইউরোপ ইন দি নাইনটিনথ সেনচুরি। অনু. এইচ. ফার্স্ট। ১৯৩৪।
৮. সি. সেইনোবস : পলিটিক্যাল হিস্টোরি অব কনটেমপোরারি ইউরোপ সিনস ১৮১৪। ১৯০১।

সম্প্রতিকালে প্রকাশিত পুস্তকাদি

১. দ্য অ্যানুয়াল বুলেটিন অব হিস্টোরিক্যাল লিটারেচার, ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত।

৬৫ থেকে ৭২ অধ্যায়ের জন্য দেখুন :

১. দ্য ক্যামব্রিজ মডার্ন হিস্টোরি, অষ্টম ও নবম অধ্যায়।
২. এল. মেডেলিন : দ্য ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন। অনু. কার্টিস। ১৯৩৪।
৩. লর্ড এ্যাকটন : লেকচারস অন দ্য ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন। ১৯১০।
৪. এ. সোরেল : L'Europe et la Revolution francaise। ১৮৮৯।
৫. এ. দ্য তকভিল : Ancien Regime। ১৯৩৩।
৬. এইচ. তেইন : Origines de la France contemporaine। ১৮৭৬
৭. কার্লাইল : ফরাসি বিপ্লবে। ১৯০৭।
৮. জে. এম. টমসন : French Revolution : Documents। ১৯৩৩।
৯. A. Aulard : Historic Poltitiqwe de la Revolution francaise । ১৯১০।
১০. লেকি : হিস্টোরি অব ইংল্যান্ড ইনদি এইটিনথ সেনচুরি। ১৮৯২।
১১. সিলি : লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব স্টেইন। ১৮৭৮।
১২. ওমান : পেনিনসুলার ওয়ার। ১৯০২-৩০।
১৩. ফিশার : বোনাপার্টিজম। ১৯০৯।
১৪. ই. এল উডওয়ার্ড : French Fevolution. ১৯৩৪।
১৫. ফিশার : নেপোলিয়ানিক স্টেটসম্যানশিপ : জার্মানি। ১৯০৩।
১৬. এফ. ম্যাসঁ : Napolcon inconnu. ১৮৯৫।
১৭. ভ্যান্ডাল : L'avenement de Bonaparte. ১৯০২।
১৮. এইচ. হুসাই : ১৮১৫, ওয়াটারলু। ১৯০০।
১৯. এল. জি. উইকহ্যাম লেগ : Select Documents . ১৯০৫।
২০. এ. টি. মাহান : ইনফ্লুয়েন্স অব সি পাওয়ার অন দ্য ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন। ১৮৯৩।
২১. এল. গেরশয় : ফ্রম ডেসপটিজম টু রিভোলিউশন, ১৭৬৩-৮৯।
২২. লেফেবর : দ্য কামিং অব দ্য ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন, ১৭৮৯।
২৩. পি. নেইল : নেপোলিয়ন, ফর অ্যান্ড এগেইনস্ট। ১৯৪৯।
২৪. জে.ম. টমসন : দ্য ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন। পঞ্চম সংস্করণ। ১৯৫৫।

জীবনী গ্রন্থ

১. মিরাবু-পি. এফ. উইলার্ট। ১৮৯৮।
২. রোবেসপিয়ব-এ. ম্যাথিয়েজ। ১৯২১, ১৯২৫।
৩. দাতোঁ-এইচ. বেলোক। ১৯২৮।
৪. তালেরাঁ-ডাফ কুপার। ১৯৩২।
৫. নেপোলিয়ন-ফিশার (১৯২৪), জে. হ্যাল্যান্ড রোজ, (১৯০২), জে. বি. ফুর্নিয়ে (১৯১২), জ্যাক বাঁভিল (১৯৩২)।
৬. উইলিয়াম পিট - রোজবেরি (১৯১০), জে. হল্যান্ড রোজ (১৯২৫)।
৭. বার্ক-জন মর্লি। ১৯২১।
৮. ফক্স- জে. এল. হ্যামন্ড। ১৯০৩। ক্লিস হেয়াটস। ১৯৩৪।
৯. ওয়েলিংটন-কিলিপ গুরেডালা। ১৯৩১।
১০. দ্য ফরেন পলিসি অব কাসলরিয়-সি. কে. ওয়েবস্টার। ১৩৩৫।

কল্পনাপ্রধান সাহিত্য

১ ভিক্টর হুগো : এ টেল অব টু সিটিজ
২ আলেকজান্ডার ডুমা : Les Dieux out Soif
৩ স্তাঁদাল : La Chartreuse de Parme
৪ চার্লস ডিকেন্স : ওয়ার অ্যান্ড পিস
৫ টমাস হার্ডি : দ্য ডাইনাস্টস।

যুদ্ধ ও সন্ত্রাস

জিরদ্যাগোষ্ঠী। যুদ্ধের সূচনা। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াসমূহ। দাঁতোঁ। ব্রুটেনের সঙ্গে বিবাদ। উইলিয়াম পিট। পোল জাতিসংক্রান্ত প্রশ্ন। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রভাব। জিরদ্যা সম্প্রদায়ের পতন। মহা সন্ত্রাস। রোবসপিয়েরের-এর শাসনকাল। ত্যরমিদর। রাজতন্ত্রী সরকারের টিকে থাকার লড়াই। দিরেকতোয়ার এবং বোনাপার্ত।

নতুন বিধান সভার নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসা কয়েকজন তরুণ ও বাক্‌পটু ব্যক্তির স্কন্ধে ন্যস্ত হয়। এদের নিবাস ছিলো ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিরঁদে। ফলে তারা জিরদ্যা নামে খ্যাত হন, আজকের দিনেও তাদের জিরদ্যা নামে স্মরণ করা হয়। সরকার পরিচালনার কৌশল ও বিজ্ঞান সম্পর্কে জিরদ্যা গোষ্ঠীর বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলো না। কিন্তু তারা প্রজাতন্ত্রী ধারণার অধিকারী ছিলেন এবং অন্যদের মধ্যে উক্ত ধারণা প্রচারে প্রবল উৎসাহ বোধ করতেন। তারা চাইতেন গোটা ইউরোপেও প্রজাতন্ত্রী ধারণা প্রসার লাভ করুক। এক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিলো মিশনারিসুলভ। ভ্যর্জিনো এবং ম্যাদ্রিমাঁ ইসনার ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী, ব্রিস ছিলেন কূটনৈতিক ব্যাপারে পরামর্শদাতা, রলাঁ-র স্ত্রী ছিলেন দলের ইজেরিয়া বা মহিলা উপদেষ্টা। চকচকে স্বপ্ন, আবেগতাড়িত উৎসাহ এবং জিরদ্যাগোষ্ঠীর ট্র্যাজিক পরিণতি অগণন বন্ধু লাভে সহায়ক হয়। যাহোক, একটি দীর্ঘ ও সন্ত্রাসী যুদ্ধের জন্য প্রধান দায়িত্ব অবশ্যই তাদের বহন করতে হবে। এই যুদ্ধের ফলে রিশেল্যু* প্রবর্তিত ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়, আর ফরাসি রাজ্য ইউরোপীয় সমাজের স্থায়ী দুর্বল সদস্যে পরিণত হয়। সে পূর্ব সীমান্তে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পায় অতিরিক্ত করের বোঝা এবং সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে চাকুরির নিয়ম চালু করার জন্য।

ক্রোধোন্মত্ত সন্দেহের পরিমণ্ডলে (প্যারিসে) দেখা যায় যে বিপ্লবের প্রধান শত্রু দেশত্যাগীরা (emigre) এবং অবাধ্য যাজকরা (non-juring priest)। অস্ট্রিয়ার সম্রাটও অন্যতম প্রধান শত্রু।[১] ফলে জিরদ্যারা তাদের শত্রুতা এদের প্রতিই নিবদ্ধ করে। তারা মনে করে যে, রাজা ও রানীর অবস্থান অসম্ভব করে তুলতে হলে এবং প্রজাতন্ত্রে পৌঁছার পথ মসৃণ করতে হলে দেশত্যাগীদের এবং অবাধ্য যাজকদের বিরুদ্ধে তীব্র ডিক্রি জারির পন্থা অবলম্বন করতে হবে। অতঃপর শুরু করতে হবে রানীর ভ্রাতার বিরুদ্ধে বৈদেশিক যুদ্ধ।

---

* রাজা ত্রয়োদশ লুই-এর মন্ত্রী। কেন্দ্রীকৃত শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তার কীর্তি। অভিজাতদের প্রাদেশিক স্টেট, পার্লাঁ এবং অন্য সব ক্ষমতার কেন্দ্রকে খর্ব করে রাজার হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। রিশেলুকে ফরাসি রাজতন্ত্রের যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্রনীতিবিদ বললে অত্যুক্তি হবে না। (১৫৮৫—১৬৪২)।

১. নিয়ম অনুসারে ১৮০৪ সাল পর্যন্ত আচটিউক (অস্ট্রিয়ার) এবং ১৮০৬ সাল পর্যন্ত পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের সম্রাট।

একটা যুদ্ধ বাঁধানোর জন্য অজুহাতের কোনো ঘাটতি ছিলো না। অস্ট্রিয়ার লিওপোল্ড অভিযোগ করতে পারতেন যে ফরাসিরা বেলজিয়ামে বিপ্লবের ইন্ধন যুগিয়েছে, জার্মান শাসকরা (Princes) আলসেসে সামন্ত অধিকার হারিয়েছে, আভিনন পোপের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফরাসি রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। একটি দেশের জনগণের স্বীয় আনুগত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রয়েছে, এই নতুন ও শান্তিভঙ্গকারী নীতির বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠতে পারে। সংঘর্ষের এতসব অজুহাত ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে। লিওপোল্ডের ভগ্নী, ফ্রান্সের রানী মারি আতোয়ানাতের বিপজ্জনক অবস্থান। মারি আতোয়ানাত জানান যে তিনি ইউরোপীয় কংগ্রেস ডাকবেন ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কিত সমস্যা আলোচনার জন্য এবং উক্ত কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সমাবেশ ঘটাবেন। অতঃপর লিওপোল্ডের পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। ভারেনের পর প্রুসিয়ার রাজার সঙ্গে একটি ঘোষণা প্রচার করেন পিলনিৎস থেকে (১৭৯১, আগস্ট)। এতে ইউরোপীয় শক্তিগুলির পক্ষ থেকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হুঁসিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। বলা হয়, রাজা লুই-কে রাজার মর্যাদায় পুনর্বাসিত না করলে ইউরোপীয় শক্তি সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবু, পরিস্থিতি গুরুতর রূপ পরিগ্রহ করলেও আয়ত্তের বাইরে চলে যায় নি। লিওপোল্ড ছিলেন ঠাণ্ডা প্রকৃতির, বিজ্ঞ, অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত। তিনি ফ্রান্সের বিশৃঙ্খল গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আজগুবি ক্রুসেডে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছুক ছিলেন না। হুমকি প্রদানে তিনি বিলম্ব করেন নি, কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে ইতস্তত করেন। উপরন্তু মনে করেন যে লুই যেহেতু সংবিধান অঙ্গীকার করেছেন, অতএব ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু যতই শরতের পর শীতকালের পদধ্বনি হয়, প্যারিস থেকে প্রতি সপ্তাহে বিপ্লবী হিংসার নতুন নতুন খবর পৌঁছতে থাকে, সম্রাট লিওপোল্ডের মন ততই সশস্ত্র হস্তক্ষেপের অনুকূলে চলে যায়। সব দিক থেকে চাপ আসতে থাকে তিনি যেন ফরাসি গণতন্ত্রের জঙ্গী জোয়ার রোধ করার জন্য চেষ্টা করেন। কবলেনৎসে জড়ো হওয়া দেশত্যাগীরা ; রাশিয়ার ক্যাথারিন, সুইডেনের গুস্তাফাস, স্পেনের রাজা, সর্বোপরি মারি আতোয়ানাত তার উপর প্রবল চাপের সৃষ্টি করেন। মারি আতোয়ানাত দেখতে পান যে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ফরাসিদের অসফল প্রতিরক্ষার ফলেই শুধু তার স্বামীর রাজত্ব রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু লিওপোল্ডের মন্থর গতিতে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ রূপ লাভ করার আগেই তিনি মারা যান। ঘটনা অপ্রত্যাশিত বটে। তার উত্তরসূরি ফ্রান্সিস, তরুণ, তেজোদ্দীপ্ত, বাধাবন্ধনহীন, অতি দ্রুত জিরদ্যা গোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। এতে দাবি করা হয় যে ট্রেভেসের ইলেক্টর তার ভূখণ্ড থেকে সশস্ত্র দেশত্যাগীদের অবশ্যই বিতাড়িত করবে। এই দেশত্যাগীরা সমবেত হয়েছিলো কবলেনৎসে। লক্ষ্য হলো, এই দাবির ফলে দ্রুত যুদ্ধ বেঁধে যাবে। যদিও ফরাসি সেনাবাহিনী ছিলো অসংগঠিত, এবং অস্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়া তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তবু ব্রিস এবং তার অনুসারিগণ যুদ্ধে জয়ের ব্যাপারে খুবই আশাবাদী ছিলেন। যুদ্ধের আঘাতে ইউরোপের জনগণ তাদের স্বেচ্ছাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। সর্বত্র ঘটবে রাজসিংহাসনের পতন। স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের নীতি পৃথিবীর সর্বত্র জয়ী হবে। জ্যাকবাঁ ক্লাবের দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন নেতা রোবেসপিয়েরের* অন্য রকম

---

* আরার মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া পরিবারে জন্ম।

যুক্তি দেখান। তিনি বলেন, যুদ্ধে ফরাসি রাজার মর্যাদা পুনর্বাসিত হবে। তবে রোবেসপিয়েরের সময় এখনো আসেনি। একটি জিরদ্যাঁ মন্ত্রিসভা, বৈদেশিক দপ্তরের সুযোগ্য দুমুরিয়ের সহায়তায়, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। (১৭৯২, ২০শে এপ্রিল)।

অতঃপর আবিষ্কার করা হয় যে, বিপ্লবী ফ্রান্সকে অসংশোধিত (unreformed) রাজতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে রক্ষা করতে হলে ষোড়শ লুই ও রাজত্বের অবসান অবশ্যই ঘটাতে হবে, ফ্রান্সে প্রবর্তন করতে হবে কঠোর স্বৈরশাসন। এটি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণের একেবারে বিরোধী হবে। যদিও বিপ্লবের সূচনাকালে কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ ছিলো মূল লক্ষ্য। যুদ্ধে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে সরাসরি, প্রতিষ্ঠিত হয় প্রজাতন্ত্র, গঠিত হয় মহাসন্ত্রাসের রাজত্ব বা সন্ত্রাসী সরকার। এই স্বৈরশাসন জনগণের উদ্বেগের সঙ্গে যুক্ত করে আদিম আশঙ্কা এবং ভাবাবেগ। জনগণের উদ্বেগের কারণ ছিলো রুটির অভাব এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সর্বত্র ব্যাপক অরাজকতা, এবং রক্তলোলুপ মুদ্রণ মাধ্যম গুলির পাল্টা-বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিরামহীন বিক্ষোভ। ফলে এটি ভয়ানক অপরাধের উত্তেজনাকর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর যে রক্তলোলুপতা প্রদর্শিত হয় তা শুধু আধুনিক কালে রাশিয়ার কম্যুনিস্টরা অতিক্রম করতে পেরেছে। তবে এই যুদ্ধের অন্য ফলশ্রুতিও ছিলো, এবং তা ছিলো সুগভীরও দীর্ঘকাল স্থায়ী। বিপ্লবকে দেশপ্রেমের সঙ্গে অভিন্ন স্তরে স্থাপন করা হয়। যেন বিপ্লব এবং দেশপ্রেম অভিন্ন। প্রথম বারের মতো ফরাসি জনগণের ব্যাপক সুপ্ত শক্তিকে এমন একটি লক্ষ্য উদ্ধারের জন্য নিয়োজিত করা হয়, যে লক্ষ্যকে গণ্য করা হয়েছে ফরাসি রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের অভিন্ন স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। প্রথম বারের মতো ফ্রান্স পূর্ণাঙ্গ এবং সংগঠিত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, এই জাতির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত, সশস্ত্র জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় বিপ্লবী জনগণ, একটি বিপ্লবী রাষ্ট্রের প্রভু ও প্রজাবৃন্দ।

অপর একটি ফলশ্রুতি ছিলো অনিবার্য। ফরাসি জনগণের সামরিক তেজ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নালস শান্তিবাদ এবং বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ববোধ দ্রুত পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করে। অথচ এক সময় এটি ছিলো বৈপ্লবিক বক্তৃতার প্রধান উপাদান। পুরাতন রাজনৈতিক আদর্শ, ভূখণ্ডগত সুপরিচিত উচ্চাভিলাষ পুনরায় সামনের কাতারে স্থান লাভ করে। যেন চতুর্দশ লুই-র প্রেতাত্মা ফিরে আসেন জ্যাকবাঁদের পরামর্শ প্রদানের জন্য। ভ্রাতৃত্বের গালভরা বুলি কোথায় উড়ে যায়। জিরদ্যাঁগোষ্ঠী মিথ্যা গৌরবে এবং রাজ্যজয় লিপ্সায় মদমত্ত হয়ে পড়ে। তারা অস্ট্রিয়াকে নির্বান্ধব করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তারা চায় বেলজিয়াম অস্ট্রিয়ার হাত-ছাড়া হোক, এবং ফরাসি রাজ্যের সীমা প্রসারিত হোক রাইনের তীর পর্যন্ত।

যাহোক, কোনো প্রকার কৌশলের তোয়াক্কা না করে জিরদ্যাঁগোষ্ঠী একেবারে অপ্রস্তুত ফ্রান্সকে (কারণ রাজকীয় বাহিনী তখন ছত্রভঙ্গ) প্রুসিয়া এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। অথচ ঐ দু'টি দেশ তখন ইউরোপীয় মহাদেশের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী। এর ফলাফল প্রত্যাশা অতিক্রম করেনি। যুদ্ধের প্রারম্ভেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে বিপ্লবের পক্ষে যে বাহিনী ছিলো তা দেশটির প্রতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। উক্ত বাহিনীর উপর কোনো মতেই নির্ভর করা চলে না। বাহিনীতে ভীরুতা, বিশৃঙ্খলা, ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া সামরিক বিপর্যয় ঘটলেই যেমন বিশ্বাসঘাতকতার অজুহাত খাড়া করা হয়, এখানেও তার ব্যত্যয় হয়নি। এই যন্ত্রণাদায়ক অনিশ্চয়তার সময়, যখন পুরাতন বাহিনী অযোগ্যতার যথেষ্ট

ব্যাস্তব বোধের, যন্ত্রণের ডাকে সাড়া দেয়া নতুন স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ এখনো রাখতে পারেন নি, তখন প্রশ্ন ওঠে, কিভাবে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় যেখানে রাজা লুই, রাজ পরিবারের বন্ধু, টুইলারি প্রাসাদে বাস করে রাজকার্য পরিচালনা করছেন, জিরন্দ্যা মন্ত্রীদের করছেন বরখাস্ত, পারিসের নিকটে সামরিক শিবির স্থাপনের বিরোধিতা করছেন, উপরন্তু, বিশ্বাস করা হয় যে রাজা লুই গোপনে আক্রমণকারীদের উৎসাহ যোগাচ্ছেন?

এই গভীর সংকট কালে, যখন প্রুসিয় সেনাবাহিনী ফ্রান্সে ঢুকে পড়ছে, বাহিনীর প্রধান হুমকি দিচ্ছেন যে রাজকীয় পরিবারের কোনো ক্ষতি হলে প্যারিস নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হবে, তখন একজন বিপ্লবী হুরহাঙ্গামার ভেতর থেকে মাথা উঁচু করে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দাতোঁর স্মৃতি রক্তাক্ত সহিংসেতাপূর্ণ। এই দাতোঁই টুইলারি প্রাসাদে আক্রমণ পরিচালনা করেন ১৭৯২ সালের ১০ই আগস্ট। বীরব্রতী সুইস রক্ষীদের ব্যাপক হারে হত্যা করা হয়, রাজা ও রানীকে করা হয় বন্দী, তাছাড়া প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ঘোষণা প্রদানের জন্য একটি সম্মেলন বা কনভেনশিয়ঁ আহ্বান করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে কারাগারে হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব দাতোঁকেই গ্রহণ করতে হবে, নতুন পার্লামেন্টের নির্বাচন প্রভাবিত করার ঐ কাজটি পরিকল্পিতভাবে করা হয়। তথাপি তৎকালীন যে কোনো বিপ্লবী ব্যক্তির চেয়ে দাতোঁ ছিলেন বড় রাজনীতিজ্ঞ এবং দেশপ্রেমিক।* নানাবিধ প্রয়োজনের প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি ছিলো, তার চিন্তাভাবনা ছিলো স্বচ্ছ, কোনো প্রকার বিভ্রান্তিতে ভুগতেন না, দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মনের জোর তার ছিলো। আনুগত্যহীন রাজতন্ত্রের পরিবর্তে ফ্রান্সে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন স্থায়ী প্রজাতন্ত্র। তিনি গঠন করতে চেয়েছিলেন একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী, যাদের বিপ্লবের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা থাকবে। এরা সন্দেহজনক এবং খণ্ড-বিখণ্ড রাজকীয় বাহিনীর স্থান দখল করবে। জিরন্দ্যাগোষ্ঠীর ইচ্ছে ছিলো ইউরোপের প্রতিটি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা। দাতোঁর কাছে এটিকে অবাস্তব ধারণা মনে হয়েছে। যে ব্যক্তি ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান, তিনিই কূটনীতির ক্ষেত্রে পূর্বতন সম্রাজ্যের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দেন।

সকল রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের মতো দাতোঁও মনে করতেন যুদ্ধের সময় সন্ত্রাস কর্মপন্থার প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বিবেচিত হতে বাধ্য। ফরাসি রাজ্যের মাটিতে যতদিন বিদেশী শত্রু অবস্থান করেছে ততদিন ফরাসিদের মধ্যে কোনো একতা ছিলো না। এটা একটা অসহনীয় ব্যাপার। আর একতা বলতে যে কিছু নেই তা প্রায় সবাই বিশ্বাস করতেন। দেশে এবং দেশের বাইরে যত রকমের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে, যেমন পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, বাণিজ্যে মন্দাভাব, বৈদেশিক যুদ্ধ, রাজা এবং রাজকর্মের সম্পর্কে দুশ্চিন্তা, মনে করা হতো যে তার সবই অসন্তুষ্ট লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। তাহলে একটা পাল্টা বিপ্লবের সম্ভাবনা

---

* Danton, George Jacques (১৭৫৯—১৭৯৪)। জন্ম আর্সিস্যুর অবে। ফরাসি বিপ্লবের প্রতিভাবান বিপ্লবীদের অন্যতম। ছিলেন বাকসাধারণ বাগ্মী। তাঁকে কেন্দ্র করে প্রচুরকল্পকাহিনী গড়ে ওঠে। এই দাতোঁকেও গিলোটিনে যেতে হয়। তাকে দেশত্যাগের পরামর্শ দেয়া হলে জবাবে বলেন, কুতার ভেতর পুরে দেশান্তরে তো নিয়ে যাওয়া যাবে না। অন্যান্য বিপ্লবীর মতো তিনিও বিত্তবৈভবে উদাসীন ছিলেন না। অনু

উড়িয়ে দেয়া যায় না। একটা বিপ্লবী রাষ্ট্রের শত্রুদের কাবু করার জন্য যে ধরনের সন্ত্রাসী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি দাঁড়ায় তা গ্রহণ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত ছিলেন।

প্রজাতন্ত্রের জন্ম হবার পরই কয়েকটি সহজ বিজয় অর্জিত হয় (যেন প্রজাতন্ত্রের জন্ম বিজ্ঞাপিত হবার জন্যই ঘটনাগুলি ঘটে)। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে (২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ নবেম্বরের মধ্যে, ১৭৯২ সাল) সাভায় এবং নিস, রাইন অঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ এবং অস্ট্রীয় নেদারল্যান্ড লুণ্ঠনজীবী ফরাসি সেনাদলের পদতলে স্থান লাভ করে। ভালমির প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সময় জার্মান মহাকবি কবি গ্যয়টে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ব্রুনসহিবকের ডিউকের প্রুসীয় বাহিনী (ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত) সামান্য ক্ষতি স্বীকার করার পর কেলারম্যানের কাছে পরাজয় বরণ করে। এই ঘটনার পর গ্যয়টে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে মানবেতিহাসের নতুন যুগের সূচনা হলো। গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশুদ্ধ সাহিত্যের চেয়ে অধিক বাস্তবধর্মী ছিলো। এর আগে প্রুসীয় রক্ষীরা পশ্চাদপসারণ করে। দেখা যায় যে যে-কোনো রাজতন্ত্রের চেয়ে ফ্রান্সের বিশৃঙ্খল গণতন্ত্র ক্ষমতার প্রকৃত রহস্য অনেক বেশি উদঘাটন করতে পেরেছে। এখানে যান্ত্রিক কলাকৌশল নয়, মানসিক উৎসাহই বড়ো কথা। উপরন্তু, ফরাসি প্রজাতন্ত্র ছিলো পররাজ্য দখল ও প্রচারণার সরকার। একটি সার্বজনীন মতামতের বাধ্যবাধকতা এবং অর্থের অনটন, একযোগে প্রজাতন্ত্রের উপর চাপের সৃষ্টি করে মিশনারি উৎসাহের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির সমন্বয় সাধনের জন্য। ফ্রান্সের পক্ষে শান্তির ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। তাকে বিজিত রাষ্ট্রের সম্পদ শোষণ করতে হবে। অস্ট্রীয় বেলজিয়াম ছিলো সবচেয়ে লোভনীয় বস্তু। এখানে রয়েছে সমৃদ্ধ সোনার খনি, তবে এই খনির সম্পদ থেকে লাভবান হতে হলে শেলডট নদী চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এ্যান্টউইর্পকে পুনরুজ্জীবীত করতে হবে জগতের বাজারসমূহে লন্ডনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। কনভেনশনের কাছে এটা কোনো ব্যাপার বলেই মনে হয়নি যে শেলডট নদী বন্ধ করে দেয়া হয় আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে। ফ্রান্সও উক্ত চুক্তির অন্যতম পক্ষ। এ ধরনের চুক্তিকে প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ হিসেবে গণ্য করার জন্য প্রস্তুত। এভাবে জগতের সামনে শেলডট নদী উন্মুক্ত ঘোষণা করে, এবং ফ্রান্স সকল দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের পাশে দাঁড়াবে বলে ঘোষণা দিয়ে উক্ত প্রজাতন্ত্র লঘুচিত্তে যে পথ বেছে নেয় তাতে তাকে নাছোড়বান্দা এবং ভয়ানক বৃটিশ শত্রুতার মুখোমুখি হতে হয়।

এই জাতি, একটি গর্বিত জাতি, সংহত, ঐশ্বর্যশালী, এবং এই জাতির শাসকশ্রেণী একই সঙ্গে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত এবং গণতান্ত্রিক। ফ্রান্স বর্তমানে বিপ্লবের মাধ্যমে যে একতা অর্জন করেছে, ইংল্যান্ড তা অর্জন করে দ্বাদশ শতকে। ফরাসিরা যে সিভিল লিবার্টি ভোগ শুরু করেছে তা নতুনত্বের গন্ধবহ, ইংল্যান্ডের জনগণ তার আস্বাদন লাভ করছে দীর্ঘকাল যাবৎ। পার্লামেন্টারি সরকার বিষয়ে বিপ্লবী ফ্রান্সের বৃটেনকে শেখানোর কিছু নেই। এই ব্যাপারটা প্যারিসের চেয়ে ওয়েস্টমিনস্টারের চালকরা অনেক ভালো বোঝে। ইউরোপের কোনো অংশেই বিপ্লবের সুমাচার (gospel) বৃটেনের চেয়ে কম আকর্ষণীয় গণ্য হবার কথা নয়, কারণ প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স বিপ্লবের পক্ষে যা কিছু প্রচার করছে তার শ্রেষ্ঠাংশ এই রক্ষণশীল দ্বীপে ইতিমধ্যেই কার্যকর করা হয়েছে।

১৭৮৩ সাল থেকে উইলিয়াম পিট ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। তিনি মূলত হুইগ, অর্থ-বিশেষজ্ঞ, আর পার্লামেন্টারি বক্তৃতায় তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দেন, তা ইউরোপীয়

ইতিহাসের জন্য ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা নিয়তিনির্দিষ্ট ছিলো যে, তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবেন দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের জন্য। অথচ তাকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে হয়, যার পরিণতি ঘটে ওয়াটারলুতে। ঐ যুদ্ধের অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বেপরোয়া বারোটি বছর তার চোখের সামনে অতিবাহিত হয়। কোনো কোনো ব্যাপারে তিনি স্বনামধন্য সমরমন্ত্রী হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য ছিলেন না, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তুচ্ছ অথচ ব্যয়বহুল অভিযান পরিচালনা করে তিনি দেশের সম্পদ বিনষ্ট করেন। তবে নেলসনকে ভূমধ্যসাগরে প্রেরণ ছিলো মূল্যবান ঘটনা। কিন্তু যুদ্ধকৌশল ব্যাপারে বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন নি। আবার ফরাসিরা কিন্তু সঠিকভাবে উইলিয়াম পিটের মধ্যে তাদের সবচেয়ে বড়ো ও জেদি শত্রুকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে সব ইউরোপীয় জোট গঠিত হয় পিট ছিলেন সেগুলির আত্মা। ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে তিনি যখন উঠে দাঁড়াতেন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, তার গুরুগম্ভীর এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাগ্মিতা দ্বারা ইংরেজ ভদ্রলোকদের হৃদয়ে নতুন করে সাহস সঞ্চারের জন্য, তখন তাকে মনে হতো সমষ্টির ইচ্ছার প্রতিভূ, যে প্রতিভূ কখনো পরাজয়ের চিন্তা গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারে না।

চতুর্দশ লুই-এর দিনগুলিতে যেমন, বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘ দ্বন্দ্ব শুরু হয় উক্ত দ্বীপরাজ্যের নির্ধারিত নীতির কারণে। ইউরোপের কোনো মহাশক্তি বেলজিয়াম এবং হল্যান্ড কুক্ষীগত করবে, এটা বৃটেন কোনো দিনই মেনে নেবে না। এই নীতির ব্যত্যয় তাদের কাছে একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়। আর বিপ্লবী ফ্রান্স যে এই কাজটি করার ইচ্ছে পোষণ করে তা ১৭৯৩ সালের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায়। সে বেলজিয়াম দখল করে, হল্যান্ডকে হুমকি দেয়, শেলডট সন্ধির পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলে, ১৯শে নবেম্বর ডিক্রি জারি করে আয়ারল্যান্ডের রাজার প্রজাদের উত্তেজিত করে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্য (একই উত্তেজনা অন্যত্রও ছড়ায়), অতঃপর ১৭৯৩ সালের ২১শে জানুয়ারি রাজা ষোড়শ লুই-কে বধ করে বৃটিশ জনগণের অনুভূতিতে নিদারুণ আঘাত হানে। ফরাসি রাজ্যের কোনো নৌবাহিনী নেই। অথচ তারা দুনিয়ার পয়লা নম্বরের নৌশক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসে।

যুদ্ধে বৃটেনের অংশগ্রহণের ফলে বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে একনিষ্ঠ এবং সংহত প্রতিরোধের সূচনা হয়। এই ব্যাপারটার ঘাটতি অবশ্যই অনুভূত হচ্ছিলো। রাশিয়া, প্রুসিয়া এবং অস্ট্রিয়া তখন পোল্যান্ড নিয়ে ব্যস্ত। ফ্রান্স নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাদের নেই বললে চলে। উক্ত হতভাগ্য রাষ্ট্র ইতিমধ্যে প্রথম বিভাজনের শাস্তি ভোগ করেছে। উচ্চাভিলাষী প্রতিবেশীদের দ্বারা দ্বিতীয়, এমনকি তৃতীয় বিভাজনের শাস্তি ভোগ করার জন্য দেশটি অপেক্ষামান। আর দুর্ঘটনাগুলি অবিলম্বে ঘটবে বলে মনে হয়। যে সময় ফরাসি প্রজাতন্ত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নামক উদার মতবাদের পক্ষে ঘোষণা দিচ্ছে, তখন পূর্ব ইউরোপের সামরিক রাজতন্ত্রগুলি একটি জাতির বিলোপ সাধনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এটি ইউরোপ মহাদেশের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান লজ্জাজনক ঘটনা। ১৭৯১ সালের ৩রা মে তারিখে পোল্যান্ডের রাজা স্ট্যানিস্লাস প্যানিসাটোস্কি একটি সংবিধান অনুমোদন করেন। এতে একটি প্রধান দুর্বলতার প্রতিকার হবে, যে দুর্বলতা এতকাল পোলিশ রাষ্ট্রকে পঙ্গু করে রেখেছে। Liberum veto প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়। সূচনা করা হয় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের। অভিজাত সম্প্রদায়কে কর প্রদানে বাধ্য করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈচিত্র অনুমোদন পায়। এতসব সংস্কার বাস্তবায়নের পর সংগত কারণেই অনুমান করা হয় যে,

পোল্যান্ড ইউরোপীয় অর্থ ব্যবস্থায় মর্যাদাবান এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে। কিন্তু যদিও প্রুসিয়া এবং অস্ট্রিয়া গৃহীত সংবিধান অনুমোদন করে, কিন্তু পোল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের রাজ্যে পরিণত হবে, এই সম্ভাবনা রাশিয়ার ক্যাথারিনার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে গৃহণযোগ্য নয়। ১৭৯২ সালে ক্যাথারিন পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। পোলদের সাহসী প্রতিরোধ পর্যুদস্ত এবং সংবিধান নাকচ করে প্রুসিয়া এবং অস্ট্রিয়াকে নিমন্ত্রণ করেন লুটের মালে ভাগ বসানোর জন্য। মর্যাদার প্রশ্ন যে ভাবেই বিবেচনা করি না কেন এই দুটি শক্তির উচিত ছিলো সংবিধান নস্যাৎ করা থেকে বিরত থাকা (কারণ তারা উক্ত সংবিধানের পক্ষে প্রকাশ্যে নিশ্চয়তা প্রদান করেছে), উক্ত দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেও তারা অন্যায় করেছেন। কারণ তারা ইতিপূর্বে দেশটির প্রতিরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। প্রলোভনের চাপে তারা প্রতিশ্রুতির প্রতি আন্তরিকতা হারায়। বিভাজন, পুনঃবিভাজন এবং পোল্যান্ড রাষ্ট্রের বিলুপ্তিতে প্রুসিয়া এবং অস্ট্রিয়া, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেও, এক্ষেত্রে অমর্যাদাজনক এবং ষড়যন্ত্রমূলক ভূমিকা পালন করে। তারা লুণ্ঠিত মালে ভাগ বসায় এবং Kosciuszko-র দেশাত্মক উত্থান নস্যাতে অবদান রাখে। ১৭৯৫ সালের ১০ই অক্টোবরের আগে পোল্যান্ড রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে যায় নি। তৃতীয় বিভাজন চুক্তি বলে এই অপকর্মটি করা হয়। অস্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়া উক্ত বিশাল ভূ-খণ্ড আত্মসাৎ ও বিভাজনে দীর্ঘ চার বছর ব্যয় করে। এই চার বছর তাদের প্রধান মনোযোগ পোল্যান্ড ব্যাপারে নিবদ্ধ ছিলো। অথচ উক্ত চার বছর তাদের জন্য ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতার কার্যকারিতা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফ্রান্সও ইউরোপে প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ লাভ করে।

বিপ্লবাদির মূলকথা বোঝার সূত্র হলো এসব সংগঠিত হয় গোঁড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা। যে ফরাসি কনভেনশন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ঘোষণা দেয়, রাজাকে দণ্ডিত করে প্রাণদণ্ডে, জিরদ্যাগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রেরণ করে বধ্যভূমিতে, কায়েম করে সন্ত্রাসের (Terror) রাজত্ব, তারা ছয় শতাংশ ভোটে জয়ী হয়। উৎসাহের প্রবল জোয়ারে ভাটা শুরু হতেই ফরাসি জনগণের প্রধান অংশ নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে, এমন দাবি করেনি। রাজনীতি ব্যাপারটা ক্লাবের লোকদের হাতে ছেড়ে দিতে তারা সম্মত ছিলো। হয়তো তারা অতিরিক্ত নিষ্ক্রিয় কিংবা অতিরিক্ত ব্যস্ত ছিলো, অতিরিক্ত স্বার্থপর কিংবা অতিরিক্ত উদাসীন প্রকৃতির, অত্যন্ত ভীত কিংবা অত্যন্ত বিরক্ত, কিংবা অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার সমর্থতা তাদের মোটেই ছিলো না, ফলে সাধারণ সম্ভ্রান্ত ফরাসি একজন নাগরিক সকল প্রকার বিবাদ থেকে দূরে সরে থাকে। প্যারিস নগরীতে রাজনৈতিক উৎসাহ সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে। অথচ জনৈক সতর্ক পর্যবেক্ষকের প্রতিবেদন থেকে প্রমাণ মেলে যে, একশত তিরিশ জনের মধ্যে মাত্র একজন ত্রাসের রাজত্বের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানায়।

কর্ডসিয়-র বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ Plain বা Marais নামে পরিচিতি লাভ করে। এরা ছিলেন মধ্যপন্থী, বর্ণহীন, অনিশ্চিত, কিন্তু ফরাসি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আপাগোড়া সম্ভ্রান্ত অংশ। জাতীয় শক্তির এরাই মূল স্তম্ভ। এরা যে নির্দেশনার জন্য জিরদ্যা গোষ্ঠীর দিকে মুখ ফেরাবে, সেটাই স্বাভাবিক। জিরদ্যা গোষ্ঠীর শক্তি এখন ১২০। সংবিধান সভায় তাদের মুখপাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। এই গোষ্ঠী ছিলো উদারনৈতিক ধারণার সর্বশেষ ধ্বজাধারি। তারা স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতায় আস্থাশীল ছিলেন। তাদের স্বপ্ন ছিলো প্রজাতন্ত্রী কন্সটিটিউসিঁ-র অধীনে

ক্ষমতা নিযুক্ত এবং উৎকট সন্তাস পরিলক্ষিত হবে। তাদের কন্সিটিউশনিস্ট হবে জগতের সবচেয়ে ভয়ংকর। তারা মূলত মানবধর্মী ছিলেন বিশ্বাস করলে এবং সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ডের প্রতিও সমর্থন পান। কিন্তু তারা সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করার সমর্থ হলেও সাহসী এবং ঐকান্তিক সংকল্পের দৃঢ়তার ছিলেন অপারগ। তারা রোবেসপিয়েরকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তাকে কাবাকদ্ধ করেন নি ; সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডের নায়কদের উপর তারা হামলা চালায়, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে মামলার ব্যবস্থা করেনি। বিপ্লবী প্যারিস নগরীর বিপজ্জনক ক্লাবগুলি তারা বন্ধ করে দেয়নি, ফুল মনোবলের সৈন্যদলও খর্ব করেনি, কর্তব্যিধ-র নিরাপত্তার জন্য নির্ভরযোগ্য সশস্ত্র বাহিনীও নিয়োগ করেনি। একজন ব্যক্তি তাদের ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারতেন ; তিনি সমাধান করার প্রস্তাবও করেন। কিন্তু জিরন্দা গোষ্ঠীর সদস্যরা দাঁতো-র রক্ত-কলঙ্কিত হাতের সাথে হাত মেলাতে পারেন না ; তাদের রুচিবোধে বাধে। একজন সাধারণ কথাসাহিত্যিকের কাছে একটি দলের কোনো প্রকার মর্যাদা থাকতে পারে না, যে দল রাজতন্ত্রহত্যা ডেকে নিয়েছে, এবং যখন জিরন্দা গোষ্ঠীর সদস্য ভীরুতা এবং অবোধ্যতাবশত নিজেদের বিবেকের নির্দেশ উপেক্ষা করে মতাঁগ্রিদের কৌশলের কাছে পরাভূত হয় এবং রাজা ষোড়শ লুইকে গিলোতিনে প্রেরণ করে, তখন তারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিজেদের বিলুপ্তির অনুকূলে ডিক্রিজারি করে। এ ঘটনার পর কোনো সমাপ্তী ক্ষমতাশালী তাদের সাহায্য করার জন্য বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করেনি। রাজা লুই-র প্রাণদণ্ড কার্যকর করার পর আসে বসন্তকাল। এ সময় রাজতন্ত্রহন্তা রাষ্ট্রের জন্য নানা বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটে। ইংল্যান্ড, স্পেন, হলান্ড তার শত্রুচক্রে যোগ দেয়, বেলজিয়াম থেকে তার সকল বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়, রাষ্ট্রের যোগ্যতম জেনারেল দুমুরিয়ে শত্রুপক্ষে যোগ দেন, ভেন্দি ও ব্রিটেন-এ শুরু হয় প্রচণ্ড উত্থান, তুলো বন্দিশ নৌঘাটিতে করাসের উপর নিষ্ক্রিয়তা হয়ে পড়ে। প্রজাতন্ত্রের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়। অথচ তাকে সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে হবে। এসব ভয়ানক ঘটনার চাপ জিরন্দা গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে একেবারে মুছে ফেলে। পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় মুক্ত এবং ভয়ংকর স্বেচ্ছাচারী শাসনের যুগ। এই যুগই রক্তের বন্যা এবং প্রচণ্ড নির্মমতায় ভেজা সামরিক পরিস্থিতি সামলে নিতে সমর্থ হয়।

ভ্যালমী সমরের পটভূমি হয় একটি ভুল ও ফোলা অর্থনীতি বা অর্থনিয়ন্ত্রণ কমিটি তার (এদের দায়িত্ব হলো কর্মপন্থা নির্ধারণ করা), একটি বিপ্লবী বিচারবিভাগ এর অন্তর্ভুক্ত, এর দায়িত্ব হলো সন্ত্রাসের প্রসার। জেনারেলদের কর্মকাণ্ড তদারকির জন্য সিভিল এজেন্ট নিয়োগ করা হয়, এরা ছিলো অভিনব ধরণের। এদের পরিচয় হয় representants en mission বা অভিপ্রেত প্রতিনিধি হিসেবে। যুদ্ধমন্ত্রিকে কর্মনির্দেশ করার অধিকার সহ তিনদল দূর্বৃত্ত এবং চালাক অর্থোপার্জনের সন্ধানী হিসেবে কর্মরত করেন। এই কর্মীরা অভিযোগকে নিয়ন্ত্রিত করে, নিয়ন্ত্রণের সূচনা করে, তাদের আদিম জোড়া লাগাতেও দেখা যায়। কিন্তু এই সমস্যা সমূলে বিলুপ্ত। আমিঁ-র নেতৃত্বে পরিচালিত একটি অনুসন্ধান (দেরা হয়ে) যেই জিরন্দা রাজতন্ত্রবাদীদের অপসারণ করে তাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মেরিতে এবং নিযুক্ত করেছে। এমন যোগ্যতা আদর্শবাদীদের দোষী তাদের মেয়াদের মধ্যে সমাধা করতে পারেনি। তাদেরকে কার্যক্রম দিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে ওয়াশিংটনের থেকে তুলে আনা হয়েছে। নিজস্ব সমাধা নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্ত্রণও এরা সমর্থ হয়নি। যে প্রয়োজনে তাদের ডাকা হয়েছে শুধু তারা শেষ হয়ে যায়, তিনিদের পক্ষেই তাদের মেয়াদ বর্ধিত করতে পারেনি। এমিল মনুর অভিযোগ, পরিচালনা প্রতিভা,

জ্যাকবাঁ এবং কর্দেলিয় ক্লাব এদের কার্যকলাপ খর্ব করে। সুশৃঙ্খল এবং প্রকাশ্য গুণ্ডামিও এদের কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আটচল্লিশটি সেকাসঁয় বা নির্বাচনী জেলায় বিভক্ত রাজধানীর প্রতিটি বিপ্লবী কমিটিতে এই গুণ্ডাদের ছিলো একক প্রাধান্য। সমরের প্রয়োজনে সময়োচিত উপায় অবলম্বন করতে হয়। যুদ্ধের চাপে কর্মকাণ্ডের গতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় ; এতকাল অন্তহীন বাকপটুত্ব সরকারি কাজকর্মে কেবল বাধার সৃষ্টি করেছে, সরকার অন্ধের মতো পথ খুঁজে বেরিয়েছে। এবার সমর দপ্তরের কারনো* এবং ম্যারিনের সৈতান্তে দ্রুত ও নির্দয় পন্থা অবলম্বন করেন। যে জ্যাকবাঁরা প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করেন তারা ছিলেন শিল্পের মালিক শ্রেণীভুক্ত। বিজ্ঞান তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। জুলাই মাসের সাতাশ তারিখে প্যারিস থেকে সীমান্তের বাহিনীগুলির কাছে একটি আদেশ পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যায়। প্রত্যাসন্ন একটি জঙ্গী সাম্রাজ্যের অন্যতম গুপ্ত শক্তি সেমাফোর টেলিগ্রাফ ফরাসি রাজ্যের সেবায় নিয়োগ করা হয়।

নতুন যুগের নায়ক ছিলেন রোবেসপিয়েরের, আরাসের কৃশকায় আইনজীবী। তিনি ১৭৯৩ সালের ২৮শে জুলাই গণনিরাপত্তা কমিটির সদস্য হন। একটি বিস্ময়কর বছরের জন্য (সামরিক গৌরব এবং ঘরোয়া ব্যাপারে লজ্জাজনক ঘটনার জন্য স্মরণীয়) ফ্রান্সের প্রকৃত শাসক এবং ইউরোপের প্রধান শক্তিতে পরিণত হন। রোবেসপিয়েরের রাজত্বকালে জ্যাকবাঁদের কৃতিত্বের তালিকা কতো দীর্ঘ। রাজতন্ত্রী বিপ্লব দমন করা হয় লিয়োঁতে, তুলোঁ করা হয় পুনর্দখল, হোণ্ডশুতে ডিউক অব অর্ক হন পরাভূত, (Wattignies) ওয়াত্তিইনি এবং Fleurus ফ্লিউরাস-এ অস্ট্রীয়রা পরাস্ত হয়, বেলজিয়াম পুনরায় হাতের মুঠোয় চলে আসে, হল্যান্ডে ফরাসি সৈন্য প্রবেশ করে, সর্বত্র ফরাসি ভূ-খণ্ড আক্রমণকারীদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়। এটি ছিলো সৈন্য সংগ্রহের (Levee en masse) প্রথম বছর। যে ভাবে সৈন্য সংগ্রহ করা হয় তা এখনো প্রতিটি ফরাসির জীবনে কালো ছায়া বিস্তার করে। এই বছর কারনো সেনাবাহিনী সংগঠনের কাজে হাতে দেন। তার তৈরি বাহিনীই নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

প্যারিস নগরীতে রোবেসপিয়েরের শাসনের এক বছরে জ্যাকবাঁ সন্ত্রাস তুঙ্গে পৌঁছে। এই লোকটি ছিলেন লেনিনের সগোত্র, একটি উদ্দীপ্ত কেতাবের প্রতি তার ছিলো অবিচল আস্থা। রুশ দেশের জন্য কার্ল মার্ক্স যা ছিলেন, ফরাসি বিপ্লবীর জন্য রুশো তার অনুরূপ ভূমিকা পালন করেন। প্যারিস নগরীর জনতার মধ্যে তিনি যে জনতার অধিকারী হন সে জন্য আশীর্বাদ জানাতে হয় তার লক্ষ্যের স্বচ্ছতা ও সরলতাকে। উপরন্তু তার চরিত্র ছিলো

---

* Carnot, Lazare Nicolas Marguerite (১৭৫৩—১৮২৩)। বাইনবাঁয়ির পুত্র। গণিতজ্ঞ। তিনি রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার বাহিনীতে যোগ দেন। ১৭৮৪ তে ক্যালেস পাস উন্নীত হন। পা-দ-ক্যালে (Pas-de Calais) থেকে নির্বাচনপ্রার্থী এবং কঁভাসিয়তে নির্বাচিত হন। মুলত রাজনীতি ও সামরিকবিদ হিসেবে তার কৃতিত্ব অসামান্য। কমিটিগুলির সদস্য ছিলেন। তার উপাধি-রাজনীতি যুদ্ধ পরিচালনা সচিব নাম হয়েছিলো। 'বিপ্লবের সংগঠক' তার অসামান্য কীর্তি। রাজনীতিতে পরে তার আগ্রহের অবসান ঘটেনি। ডিরেক্টরেটের আমলে তিনি পাঁচজন ডিরেক্টরদের একজন ছিলেন। ব্রুমেয়ারের কুশলতার পর তিনি মুখ্যকনসালে পরিণত হন। কুশলতার পর তিনি যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি নেপোলিয়নের মুখোমুখী ছিলেন। অবসর গ্রহণ করেন ১৮০৭-এ। ১৮১৫-১৬ সন্ত্রাসবাদের জন্য তাকে রাজনীতিতে যোগ দেয়। ১৮১৬-তে দেশ থেকে নির্বাসিত হন। এসময় কিন্তু তিনি লেখালেখি ও প্রতিভার খুব ফেরেন। ১৮৩৩-এ অবসরপ্রাপ্ত তার মৃত্যু হয়। অনু

এবং লঘুচিত্ততার রাজত্বের পুনরায় সূচনা হয়। তবে ফ্রান্সে ত্রাসের রাজত্বের অবসান হলেও, দেশটি এখনও বিপ্লবপন্থী। রাজতন্ত্রহন্তা পার্লামেন্টের সদস্যদের জন্য এখন জীবন-মরণ সমস্যা। ফ্রান্সের ভাবী সরকার যে চরিত্রের হোক না কেন ক্ষমতার লাগাম কর্ভসিয়ঁর রাজতন্ত্র হন্তাদের হাতে থাকতে হবে।

ভবিষ্যতের সরকারের রূপ কি হবে সেটিই এখন ভাববার বিষয়। জিরদ্যাঁ চিন্তাবিদদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কঁদরসে একটা শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। ১৯১৮ সালের জার্মান শাসনতন্ত্রের মতো এতে থাকবে গণতান্ত্রিক দর্শনের সুন্দর আদর্শগুলো। এই শাসনতন্ত্র বাস্তবধর্মী ছিলো, তবে তা কখনো বাস্তবায়িত করা হয়নি। এমন কিছুর প্রত্যাশা করা হয় যাতে গণতান্ত্রিক উপাদান কমই থাকবে, অধিক থাকবে সংহত শক্তি, একই সঙ্গে মধ্যপন্থী বিপ্লবী শক্তির প্রাধান্য নিশ্চিত করতে হবে (অন্তত যারা তারমিদরে বিজয় অর্জন করে)। সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে একটা গুরুতর বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তারমিদরে প্যারিসের যারা পরাস্ত হয়, তারা কমিউনগুলি বন্ধ করে দেয়ার ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু এখনও তারা সশস্ত্র, এখনও ক্ষমতাধর, বিপ্লবী কুদেতার কলাকৌশল এখনও তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে। ১৭৯৫ সালের ১লা মে এবং ২রা জুন তারা কর্ভসিয়ঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে, তবে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। অবশেষে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্তটি যদি আগে গ্রহণ করা হতো তাহলে রাজতন্ত্রকে রক্ষা করা যেত। জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে সৈনিকদের একটি কমিটির অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

শাসনতান্ত্রিক সমস্যার জবাব অবশেষে খুঁজে পাওয়া যায় একটা প্রতারণা বা ভণ্ডামির মধ্যে। দিরেকতোয়ার নামে এই শাসনতন্ত্র মোটামুটি চার বছর টেকে। যেহেতু একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবার মতো সুযোগ তখনো আসেনি, ফলে সকল নির্বাহী ক্ষমতা পাঁচজনের একটি পর্ষদের উপর ন্যস্ত করা হয়। এরা মোট পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে উশৃঙ্খল জনতার শাসন এড়ানোর জন্য দু'টি চেম্বার গঠন করা হবে। একটির নাম হবে লেজাঁসিয়ঁ বা বর্ষিয়ানদের সভা, অপরটির নাম হবে লে স্যাকঁ-সঁ। অর্থাৎ পাঁচ শতজনের সভা। এদের নির্বাচিত করা হবে সীমিত ভোট গ্রহণের মাধ্যমে। উপরন্তু গণমতের প্রতি দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রতি বছর নির্বাহীদের এক পঞ্চমাংশ এবং আইনসভার এক তৃতীয়াংশ সদস্য পরিবর্তন করা হবে। কিন্তু এই সুখকর আধুনিক স্বাধীনতার পর্দার অন্তরালে একটা বাস্তবতা লুক্কায়িত থাকে। তা হলো, রাজতন্ত্র হন্তাদের দ্বারা গঠিত একটি সরকার জনগণের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে না। শাসনতন্ত্রের সঙ্গে একটি ডিক্রি সংযুক্ত করা হয়। তাতে বলা হয় যে, যে কর্ভসিয় ভোট দিয়ে রাজা ও রানীকে গিলোতিনে প্রেরণ করে তাদের থেকে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নতুন পার্লামেন্টে গ্রহণ করতে হবে। সকল মধ্যপন্থী এবং রাজতন্ত্রীরা নির্বাচনী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা মহাসন্ত্রাস থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। তারা এবার চির দিনের জন্য সেইসব রাজনীতিবিদদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় যাদের ভীরুতা এবং সংকীর্ণতার জন্য মহাসন্ত্রাসের সূচনা হতে পেরেছিলো। নগরীর বিদ্যমান, মর্যাদাবান কিংবা রক্ষণশীল অংশের লোকেরা একটি আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের লক্ষ্য হলো : রাজতন্ত্র হন্তা সংস্থা নির্মূল করতে হবে। বলা হয়ে থাকে যে, অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাব্বিশ হাজার লোক আক্রমণ পরিচালনার জন্য সংগ্রহ করা হয়।

নিষ্কলুষ। তৎকালীন জনৈক পর্যবেক্ষক বলেছেন, "আপনারা তাকে নিয়ে গবেষণা করতে পারেন, তবে সে বহুদূর যাবে। তিনি যা বলেন তার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেন।" তার বাগ্মিতার সহজ ভঙ্গি ও বিপ্লবের প্রচার, তার দৃষ্টিভঙ্গির হিংস্রতা, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দক্ষতা তাকে প্রায় প্রথম থেকেই জ্যাকবাদের নেতায় পরিণত করে। জাতীয় পন্থা নির্ধারণের পরিচালক হওয়ার আগে তিনি প্যারিসের বিপ্লবী যন্ত্রের কর্তৃত্ব লাভ করেন। বিবেকবান, বেশভূষায় রুচিশীল, সদাচারী, অনাড়ম্বর, প্রজাতান্ত্রিক গুণের অধিকারী, প্রতিটি ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তির জন্য একটি মাত্র প্রতিকারের কথাই ভাবতে পারতেন (সংকীর্ণ নীতির কারণে) ; আর তা হলো, গিলোটিন। মার্চ মাসে এবার ও কামেতকে তিনি বধ্যমঞ্চে প্রেরণ করেন তাদের অরাজক এবং নিরীশ্বরবাদী নীতির জন্য। এপ্রিল মাসে তিনি শিরোচ্ছেদ করেন দাতোঁ এবং কামিই দেমুল্যার। শেষোক্ত ব্যক্তি Vieux Cordelier পুস্তকে (বিপ্লব চলাকালে রচিত গুরুত্বপূর্ণ একটি পুস্তক) অভিমত ব্যক্ত করেন যে ক্ষমা ও নমনীয়তার নীতিতে ফিরে যাওয়া উচিত। অবশেষে এই নরভুক ব্যাঘ্র সকল সীমা লঙ্ঘন করেন একটি আইন দ্বারা (২২ প্রেইরিয়ল আইন), এতে কর্ডসিয়ঁ-র সকল সদস্যের জীবন হুমকির সম্মুখীন হয় এবং রাজনৈতিক অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের রক্ষাকল্পে প্রচলিত রক্ষাকবচও অপসারণ করা হয়। কিন্তু আত্মরক্ষার্থে কাপুরুষরাও সাহসের পরিচয় দিতে পারে। কর্ডসিয়ঁতে কয়েকজন ব্যক্তি বারা এবং তালিয়েঁ-র নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অবসান হওয়া দরকার। তারা বুঝতে পারে যে বাহিনীসমূহ সতর্ক সংগঠনের মাধ্যমে এই কাজটি করা যায়। তবে কাজটি করতে হবে বিধান সভার বাইরে। তারা ঠিকই জ্যাকবাদের মোকাবেলা করে, তবে জ্বালাময়ী বক্তৃতার সাহায্যে নয়। তারা কাজটি করে হিসাব করে, শক্তির সহায়তায়। এই সুযোগ্য ব্যক্তিরা সাফল্যও অর্জন করে দ্রুত এবং অনায়াসে। ১৭৯৪ সালের ২৮শে জুলাই (প্রজাতন্ত্রী দিনপঞ্জি অনুসারে ৯ই তারমিদর) অতেল দ্য ভিলে আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। বাহিনী প্রধানত যোগাড় করা হয় সেকসিয়ঁ লেপেলেতিয়ে থেকে। এই সেকসিয়ঁ লেপেলেতিয়ে ছিলো নগরীর বিত্তবানদের এলাকা। সেখানে রোবেসপিয়েরকে পাওয়া যায়, তার চোয়াল বুলেটের আঘাতে হয় ছিন্নভিন্ন, অতঃপর তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় বধ্যমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে ছুরির নিচে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন, যেমন তার আগে অনেকেই অনুরূপ ভাবে দেহত্যাগ করেছেন।

দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটে। ঘুনাখুনির ঘৃণ্য মহামারীর (যে মহামারীতে শুধু প্যারিস নগরীতেই দুই হাজার ছয় শত লোক প্রাণ হারায়) এখানেই ছেদ পড়ে। মধ্যপন্থী এবং দাতোঁর অনুসারীরা ক্ষমতার লাগাম হাতে তুলে নেয়, কমিউন বিলোপ করা হয়, বন্ধ করা হয় জ্যাকবাঁ ক্লাবের দরজা, ভিদিয়ঁাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, জিরন্দ্যা গোষ্ঠী পুনরায় ক্ষমতা লাভের জন্য আমন্ত্রণ লাভ করে। সন্দেহের যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্যারিসের রাজনৈতিক জীবন বিষাক্ত করে তুলেছিলো তার অপচ্ছায়া দূর হয় রোবেসপিয়েরের পতন এবং ফ্লিউরাসে জুর্দ্যার বিরাট বিজয় অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে। ত্রাস ও গ্লানি থেকে হঠাৎ মুক্ত হবার পর আনন্দমুখরতা এবং আশা-ভরসার রৌদ্রালোকে স্নাত হয় দেশটি। সংকীর্ণ হতাশার ভাব আর নয়। রক্তলোলুপ মুদ্রণ মাধ্যমের প্রলাপপ্রবাহের অবসান ঘটেছে। সাহসী, কল্যাণময়, সুন্দর ও নিরপরাধ লোকদের জন্য গিলোটিন আর নয়। দীর্ঘকাল স্থগিত থাকার

দিরেকতোয়ারের নতুন সদস্যরা ছিলেন বিভিন্ন ধাঁচের, তারা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেন শুধু রাজতন্ত্র উচ্ছেদ ব্যাপারে। অন্যথায় তারা বিপ্লবী শিবিরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রতি আনুগত্যশীল। রাউবেল আলসেসের অনমনীয় জ্যাকোবা আইনজীবী। কারনো এবং লতুনাবর (Letourneur) ছিলেন প্রকৌশলী, লেপু ছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা জিরদ্যা। একমাত্র বারাস-এর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাস্তব বোধ ছিলো। অথচ এর প্রসিদ্ধি ছিলো সবচেয়ে কম। দু' দুটি সংকট কালে এই প্রভেসের অমার্জিত, নাটুকে, অর্থলিপ্সু ব্যক্তি প্রকৃত যোগ্যতার পরিচয় দেন। তারমিদরে তিনি রোবেসপিয়েরের পতন ঘটান। ভদেমেয়ারে তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্তকে আবিষ্কার করেন।

গোলন্দাজ বাহিনীর এই তরুণ করসিক্যান জেনারেল, যিনি ১৭৯৩ সালের শরৎকালে তুলো অবরোধের সময় বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন, সেই অক্টোবর মাসের উদ্বেগাকুল দিনগুলিতে প্যারিসে অবস্থান করেছেন বেকার যুবক হিসেবে। তখন প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় কেবল শোনা যেত একটা চিৎকার 'রাজা দীর্ঘজীবী হোক' (Vive le Roi), এই ধ্বনি জনগণের কাছে তখন গ্রহণযোগ্যও ছিলো। বিপ্লবের সর্বশেষ সভাও তখন প্রতিক্রিয়াশীল ঝড়ের আন্দোলনে কম্পমান। এখানে তিনি শক্তিধর দিরেকতোয়ার সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হন, এরা তার মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তাকে হুমকির সম্মুখীন চেম্বার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। জেনারেল বোনাপার্তের সামরিক মেজাজ ঘোষণা দেয় যে একজন প্রভুর আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি মুরাকে দ্রুত স্যাবল যেতে নির্দেশ দেন (বন্দুক সংগ্রহের জন্য) এবং কামান-বন্দুকহীন বিশৃঙ্খল বাহিনীর বিরুদ্ধে অবিলম্বে সুনিশ্চিত সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করেন। নিশানা ঠিক রেখে কামানের অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণের বদৌলতে প্যারিসের রাস্তাগুলি করেন কন্টকমুক্ত। সরকার রক্ষা পায়। মুক্তিদাতা বোনাপার্ত এখন পদোন্নতির যোগ্য। তাকে তাৎক্ষণিকভাবে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের (Interior) জেনারেল হিসেবে নিযুক্তি প্রদান করা হয়, পরবর্তী বছরই আবার বারাসের পক্ষপাত ও সমর্থনে জোসেফাইনকে বিয়ে করেন এবং ইতালিতে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নেপোলিয়ন বোনাপার্তের পদসঞ্চার

ফ্রান্স ও ইউরোপ। ইতালির আকর্ষণ। বোনাপার্তের ইতালিতে একাধিক বিজয়। ক্যাম্পো ফরমিও। ইতালির জন্য ফলশ্রুতি। ফরাসি গণমতের উপর সিরিয়া অভিযানের প্রভাব। সিয়েস। ব্রুমেয়ার। সামাজিক সাম্যের উদ্বর্তন। কর্সুলা। মারেংগো এবং লুনেভিল। বৃটিশদের মনোভাব। আয়ারল্যান্ড। অবরোধ এবং নিরপেক্ষদের অধিকারসমূহ। আমিয়েঁর শান্তি।

এতোদিনে দিরেকতোয়ারের জেনারেল ও কূটনীতিকরা পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের জন্য উচ্চাসন নিশ্চিত করেছেন। পিশেগ্রু (Pichegru) হল্যান্ড অধিকার করেন, বাট্যাভীয় প্রজাতন্ত্রকে অধীনে আনা হয়, বেলজিয়াম এবং রাইন সীমান্তের সকল জার্মান অঞ্চলকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। স্যাভয় এখন ফরাসি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইতালীয় রিভিয়েরায় ফরাসি বাহিনী শিবির স্থাপন করে। প্রুসিয়া, স্পেন এবং তুসক্যানি যুদ্ধে ক্ষান্তি দেয়। মঞ্চ এখন তৈরি দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্য। একটি বিপ্লবী শক্তি। অপরটি (বস্তুত দুটি রাজ্য নিয়ে গঠিত জোট) পাল্টা বিপ্লবী শক্তি, অত্যন্ত ক্ষমতাধর এবং নিরতিশয় নাছোড়বান্দা। দুটি রাজ্যের একটি প্রটেস্ট্যান্ট বৃটেন, অপরটি ক্যাথলিক অস্ট্রিয়া।

রক্ষাকর ঢেউ এবং বায়ুর পেছনে বৃটেনের দুর্ভেদ্য অবস্থান। প্রকৃতি তার জন্য মিত্র স্বরূপ, আয়ারল্যান্ডে অভিযান পরিচালনাকারী অসের (Hoch) বাহিনী প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাতে পর্যুদস্ত হয়, ইংরেজ গণতন্ত্রে অবস্থানকারী সকল বিদ্রোহীদের ক্ষুদ্র পরিকল্পনাও ব্যর্থ করে দেয়। এই একগুয়ে দ্বীপের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করলে একটা দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র অতিসামান্য সুবিধা পাবে। আর আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে নৌবাহিনী দ্বারা, এবং যেহেতু পুরাতন রাজকীয় নৌবাহিনী বিপ্লবের কারণে মনোবল হারিয়ে ফেলেছে, অতএব এতাদৃশ অভিযানের পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। অভিযান হবে ব্যয়বহুল, কিন্তু অনুকূল ফল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে না।

একেবারে ভিন্ন অবস্থান অস্ট্রিয়ার। অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের একটি জুয়েল, বাটাভিয়ার মূল্য তার মালিকের কাছেই অতি সামান্য (কারণ উক্ত ভূখণ্ডের অবস্থান ভিয়েনা থেকে অনেক দূরে)। অস্ট্রিয়া একাধিকবার চেষ্টা করে ব্যাভারিয়া ভূ-খণ্ডের পরিবর্তে বাটাভিয়া হস্তান্তর করতে। অথচ ফরাসিরা ইতিমধ্যেই বাটাভিয়া দখল করে বসে আছে। উপরন্তু ফ্রান্সের দখলে রয়েছে বেলজিয়াম। ফরাসিরা উক্ত কয়লা-সমৃদ্ধ এবং শহুরে প্রদেশ দখলে রাখতে চায়। এই প্রদেশ তাদের সীমান্ত সংলগ্ন, এবং তাদের রাজধানীর হৃদয়ের নাগালের মধ্যে। তবে বেলজিয়ামের চেয়েও সমৃদ্ধ, আরো জাকজমকীয় এবং রোমান্টিক হলো ইতালীয় উপদ্বীপের সেই প্রদেশগুলি, যেগুলি অস্ট্রিয়ার প্রত্যক্ষ শাসন স্বীকার করে, কিংবা অস্ট্রিয়ার পথ অনুসরণ

করে তারা সন্তুষ্ট। মিলান তার এক গুচ্ছ সুখ্যাত লোম্বার্ড নগরীসহ অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশ। তুসকানি কার্যত হ্যাবসবার্গ ডাচি। নেপলস, অধঃপতিত স্পেনীয় বুরবঁ রাজা কর্তৃক শাসিত হয়। এই রাজা তার হ্যাবসবার্গ পত্নী মারি ক্যারোলাইনের কঠোর নির্দেশে চলেন। ফলে প্রচারণা ও লুণ্ঠনের জন্য ফ্রান্সের শত্রুদের তালিকাভুক্ত হতে পারে। ইতালির গোটা অবস্থা ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সামরিক অভিযান পরিচালনার অনুকূলে। পুরোনো ঐতিহ্য, জলবায়ুর চমৎকারিত্ব, শস্যের বৈচিত্র এবং প্রাচুর্য, শহরগুলির ঐশ্বর্য, আর্ট গ্যালারি এবং যাদুঘরে রক্ষিত মূল্যবান সামগ্রী, শত্রুর সুপরিচিত দুর্বলতা, ফরাসিদের প্রলুব্ধ করতে সমর্থ। উপরন্তু ইতালির জনগণ চায় অস্ট্রীয় জোয়াল থেকে মুক্ত হতে।

ইতালিতে অভিযান পরিচালনার জন্য আরো একটি উদ্দীপনার ব্যাপার ছিলো। যাজক বিরোধী প্যারিসের সরকারের কাছে এটাকেই বড়ো ব্যাপার বলে মনে করা হয়। পোপ একটা কঠিন অবস্থান গ্রহণ করেছেন। যাজকদের জন্য গৃহীত লৌকিক গঠনতন্ত্র গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেছেন। তাছাড়া অবাধ্য যাজকদের প্রতিরোধে উৎসাহ যোগাতে শুরু করেছেন। ইউরোপের সকল পাল্টা-বিপ্লবী শক্তিগুলির মধ্যে ভ্যাটিক্যান সর্বাধিক অসুবিধার সৃষ্টি করে। ভ্যাটিক্যানের লম্বা হাত সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়; কবলেনৎসের দেশত্যাগীদের মধ্যে, ভিদি এবং ব্রিটানির বিদ্রোহীদের মধ্যে, ফ্রান্সের অবাধ্য যাজকদের নিয়ন্ত্রণাধীন গির্জাগুলির মধ্যে। একজন ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে রোমে হত্যাও করা হয়। ফলে উক্ত পন্টিফকে (যাজক) সমুচিত শাস্তি প্রদান এবং তার পশ্চাদপদ এবং কুশাসনাধীন রাজ্য দিরেকতোয়ারের সদস্যদের কাছে আকর্ষণীয় প্রকল্প হিসেবে গণ্য হয়। লাক্সেবুর (Luxembourg) প্রাসাদ আনুষ্ঠানিক পোষাক পরিধান করে, এবং আনুষ্ঠানিক কেতায় তারা উক্ত প্রকল্প হাতে নেয়। ইউরোপকে আবর্জনার স্তূপ থেকে উদ্ধার করতে হবে।

ফরাসি বাহিনীতে এখন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ভিড়। যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিলো তা দূর হয় গেছে। ভুঁইফোড় ব্যক্তি (Parvenus) এবং মুনাফাশিকারীদের মধ্যে এখন কোনো বিভ্রান্তি কাজ করে না, এবং এদের দ্বারাই প্যারিস নগরীর রাজনৈতিক সমাজ গঠিত। যে তরুণেরা পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে বোনাপার্তের পথ ধরে ইতালিতে যায় তারা এখনও বিশ্বাস করে যে ফ্রান্স গোটা জগতে মুক্তির বাণী প্রচারের উপযুক্ত। ইতালীয়দের প্রতি তারা করুণা বোধ করে, কারণ জাতি হিসেবে তারা সভ্যতার অগ্রগতির দিনপঞ্জিতে স্থান লাভ করতে পারে নি। তবে তারা ফরাসিদের অভিভাবকত্বে জীবন যাত্রার নতুন পথ অনুসরণে সক্ষম হতে পারে (যে পথের উদ্ভাবক এবং পথিকৃৎ হলো ফ্রান্স)। এই ভাবনাগুলি দ্বারা তরুণ এক জেনারেল, যিনি নিজেও আশ্চর্য আকর্ষিত বোধ করে থাকতে পারেন, অতএব গোড়ার দিকে একটি ঘোষণায় ইতালির জনগণকে জানান:

> 'ইতালির জনগণ, ফরাসি বাহিনী এসেছে আপনাদের পরাধীনতা ছিন্ন করার জন্য; ফরাসি জনগণ পৃথিবীর সকল জনগণের বন্ধু; আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করুন। আপনাদের সম্পত্তি, আপনাদের ধর্ম, আপনাদের জীবনাচরণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার বস্তু হিসেবে গণ্য হবে। আমরা যুদ্ধ করি উমার শত্রু হিসেবে, আমরা শুধু নির্যাতনকারী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমরা যুদ্ধ করবো, যারা আপনাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে তাদের বিরুদ্ধে।'

রাজতন্ত্রের পক্ষে ছিলো ক্ষুদ্র সার্দিনিয়া রাজ্য। এই রাজ্য সমগ্র ইতালিকে অভিন্ন পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই রাজ্যকে নেপোলিয়ন বোনাপার্ত চেরাস্কোর যুদ্ধবিরতি (Armistice of Cherasco) মেনে নিতে বাধ্য করে। চুক্তিবলে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তা ভঙ্গ করার ক্ষমতা সার্দিনিয়া কখনো অর্জন করতে পারেনি। এখানে বোনাপার্ত যে সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেন তা জগৎজোড়া সুখ্যাতি অর্জন করে। যে দক্ষতার সঙ্গে তিনি মিত্র পক্ষগুলির সংযোগস্থলে আঘাত করেন, তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গুটিয়ে যেতে বাধ্য করেন সার্দিনীয়দের, তাদের পরাজয় মেতে নিতেও বাধ্য করেন, তা সামরিক অভিযান পরিচালনার কলাকৌশলের পরাকাষ্ঠা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সমগ্র ইউরোপকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে পরম ক্ষমতাশালী অস্ট্রীয়দের বিরুদ্ধেও সাফল্য অর্জন করেন। লোদির যুদ্ধে তিনি মিলান দখলে সক্ষম হন। রিভোলির যুদ্ধে আদায় করেন মন্টুয়ার (Mantua) আত্মসমর্পণ। আর্চডিউক চার্লস বুলু (Beaulieu) বা হবুরমজের (Wurmser) পি.ভি. কোয়াসদানোভিচ, বা ব্যারন আলভিকনজির অধিক সফল হননি। ত্যাগলিয়ামেন্তোতে পরাস্ত হয়ে তাকে পাহাড় অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তবু তিনি শান্তির আয়োজনকে সানন্দে অভিনন্দন জানান। এই শান্তি লিওবেনে স্বাক্ষরিত হয় ১৮ই এপ্রিল, ১৭৯৭ সালে।

গোটা গ্রীষ্মকালে মিলানের সন্নিকটে মবেলো প্রাসাদে তরুণ জেনারেল অবস্থান করেন। তার উচ্চাভিলাষ এখন আর গোপন কোনো ব্যাপার নয়। বাগানে পায়চারি করার সময় একবার তিনি অনুচরদের বলেন, তোমরা কি মনে করো উকিল এবং দিরেকতোয়ারের সদস্যদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমি বিজয় অর্জন করেছি? প্যারিসের সঙ্গে কোনো প্রকার সংযোগ ছাড়াই তিনি যুদ্ধ করেন, তৈরি করেন চুক্তির খসড়া এবং জন্ম দেন কয়েকটি রাষ্ট্রের। আকোনায় পোপের বাহিনীকে পরাজিত করার পর ভ্যাটিক্যান থেকে অর্থ আদায় করতে দ্বিধা করেন নি, কয়েকটি প্রদেশে লুণ্ঠন চালান—অভিয় (Avignon) ও ভেনাসিন (ফ্রান্সের), ইতালির লিগেশন (Legations)। লোম্বার্দিকে রূপান্তরিত করেন সিজালপাইনে, জেনোয়াকে পরিণত করেন লিগুয়ারিয়ান প্রজাতন্ত্রে, প্রতিটির জন্য ফরাসি আদর্শ অনুসারে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়, এগুলিকে তিনি ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সীমানার বাইরে ফরাসি দুর্গ হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি ছিলেন তার প্যারিসীয় প্রভুদের চেয়ে অধিক বিজ্ঞ। এজন্যই নেপলসে যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি রাজি হননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নেপলসে শান্তি অর্জন করা যাবে না। শান্তি অর্জন করতে হবে উত্তর ইতালিতে। বিশেষভাবে উদ্দেশ্য হাসিল হবার সম্ভাবনা ভেনিসে। যে অস্ট্রিয়া দু'বার 'পোল্যান্ডের ইউক্যারিষ্ট অঙ্গে'র আস্বাদ লাভ করেছে তাকে ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের শিষ্য আব্বান জানায় জার্মান বিবেক পরিত্যাগের জন্য। তাকে বেলজিয়াম, রাইন সীমান্ত ও লোম্বার্দি এবং রাইখের সংহতি সমর্পণ করতে বলা হয়। পরিবর্তে তাকে ভাগ বসাতে বলা হয় প্রসিদ্ধ অথচ নিঃসহায় ভেনিস-প্রজাতন্ত্রের শরীরে। অস্ট্রিয় সরকার এই কলঙ্কজনক ব্যবস্থায় সম্মত হয়।

ক্যাম্পো ফরমিও সন্ধি ছিলো নেপোলিয়নের ইতালি অভিযানের জাঁকালো ফসল। তবে এই সন্ধি করা হয় ন্যায়-নীতির প্রতি কোনো তোয়াক্কা না করে। একটি স্বাধীন ও নিরপরাধ রাষ্ট্রকে বিভক্ত করায় নীতিবান লোকেরা মোটেই উৎসাহ বোধ করেন নি। তবে নীতিকথার প্রশ্ন উহ্য রাখলে বলতে হয় যে এটি ছিলো প্রজাতন্ত্রের জন্য বিরাট বিজয়। ইউরোপের

নেতৃস্থানীয় বক্তব্যগুলি থাকে উক্ত বিজয় অনুমোদন করে। রোমান ধর্মের প্রধান সেক্যুলার প্রবক্তা এই কথা দস্যুবৃত্তিকে অনুমোদন করতে দ্বিধা করেনি। জার্মান রাইখের সরকারি ভেতাবাদী ভাব অধিকার পরিত্যাগ করে, উপরন্তু সম্মত হয় যে ফরাসি ভূ-খণ্ড রাইন এলাকা পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য ভূ-খণ্ডগত পুনর্বিন্যাস জরুরি। এর জন্য বাসটাডটে কংগ্রেস অনুষ্ঠান করতে হবে। বোনাপার্তের বিজয় এখন সম্পূর্ণ হলো। তিনি ইতালিতে ফ্রান্সকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী করলেন।

ইতালির জনমনের ইতিহাসে বোনাপার্তের প্রথম ইতালি অভিযান ছিলো সে দেশের জাতীয়তাবোধ পুনরুজ্জীবনের জন্য চিহ্নিত। ইতালিয় জনগণের এই জাগরণ রিসরজিমেন্টো নামে পরিচিত। বোনাপার্ত তার ইতালিয় স্বদেশবাসীদের প্রতি নমনীয় আচরণ করেন নি। ব্যাপক লুটন চালান আর্ট গ্যালারি এবং যাদুঘর গুলিতে। অতিরিক্ত কর আদায় এবং সামরিক বাহিনীর জন্য রসদ সংগ্রহ করে দেশটিকে চরম দুরবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তার কর্তৃত্বের প্রতি কিঞ্চিমাত্র অবাধ্যতার লক্ষণ পাওয়া গেলে তিনি তা দমন করতেন অত্যন্ত কঠোর হস্তে। কিঞ্চিমাত্র করুণা প্রদর্শন তার ধাতে ছিলো না। তিনি নিধন করেন ভেনিসের সুপ্রাচীন এবং ঐতিহাসিক স্বাধীনতা। কিন্তু তিনি ছিলেন মূলত ইতালিয়, তার চরিত্রে ছিলো সাম্রাজ্যিক ধ্যান-ধারণা, ফলে নানাভাবে প্রাচীন রোমের গৌরব ফুটিয়ে তোলেন। তিনি কঠোর হলেও, মনে হয় মুক্তিদাতা হিসেবেই ইতালিয় অভিযানে বের হন। নিয়ে আসেন নতুন স্বাধীনতার হাওয়া, ইতালিকে শক্তিতে পরিণত হওয়ার পথও তিনি প্রশস্ত করেন। এই তরুণ সেনাপতির অনেক অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখা হয়, কারণ তিনি ইতালি থেকে অস্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন দূর করেন, দেশটিকে আধুনিকতার পথে পা বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানান। ইতালির পণ্ডিত সমাজ নেপোলিয়নের প্রশংসায় লাগামহীন হয়ে পড়ে, লোম্বার্দের সুধিজনেরা তার দরবারে ভিড় জমাতে শুরু করে। সিজালপাইন প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিলো ফরাসি বেয়নেটের শক্তির উপর নির্ভরশীল। দেশটি রাষ্ট্র বিদ্যাচর্চার সেমিনারি হিসেবে কাজ করে বেশ কয়েক বছর। অথচ দীর্ঘকাল দেশটি বিদেশী শাসনের অধীনে থাকার ফলে জনগণের কর্তব্যবোধ ভোতা হয়ে গিয়েছিলো।

প্রুসিয়া এবং অস্ট্রিয়া যুদ্ধ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়ার ফলে বৃটেন ও ফ্রান্স পরস্পরের মুখোমুখি হয়। পক্ষ দুটির মধ্যে দু'টি প্রশ্ন গভীর প্রভাব বিস্তার করে। রাইন সীমান্ত বৃটেন কখনোই মেনে নেবে না, আর বিজয়ী ফরাসি বাহিনী রাজতন্ত্রী ধারণা কিছুতেই গ্রহণ করবে না। ফ্রান্সের মধ্যপন্থী কিছু ব্যক্তি উদারবাদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে রাজি ছিলেন, তারা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সম্ভাবনা বিষয়েও ভাবতেন। ইংরেজদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনও তাদের কাম্য ছিলো। এই মধ্যপন্থীরা যখন বিরাট সংখ্যায় আসন লাভ করেন, তখন প্যারিস নগরীর শাসক (ডিরেক্টর) বারাস এবং তার ইতালীয় সৈনিক বন্ধু বোনাপার্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে এদের সঙ্গে বসবাস করা বিপজ্জনক। ফ্রুক্তিদরের কুদেতার জন্য প্যারিসে বাহিনী এনে জেনারেলের দূত ওজেরো বলেন, তার স্বভাবসুলভ খোলামেলা মেজাজে, "আমি এখানে এসেছি রাজতন্ত্রীদের নিধন করার জন্য"। সন্দেহভাজন ডেপুটিদের ঘুমন্ত অবস্থায় আটক করা হয়, তাদের বিচারের জন্য জাহাজে প্রেরণ করা হয় কায়েনেতে (Cayenne)। প্রদেশগুলিতে মিলিটারি কমিশন পাইকারি হারে দেশান্তর এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। উনপঞ্চাশ দেপার্তমেঁ প্রস্তাবিত নির্বাচন বাতিল করা হয়। এই সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড ফ্রান্সের

অনেক মহান ব্যক্তিও বলি হন : হল্যান্ড বিজয়ী পিশেগ্ন; বার্তেলেমি, কূটনীতিবিদ, যিনি প্রুসীয় সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন; এবং কারনো, যিনি ছিলেন বিজয়ের সংগঠক। সাবেক সন্ত্রাসী বারাস অবশ্য নিরাপদেই ছিলেন, তৎসঙ্গে টিকে যায় সাময়িকভাবে জ্যাকবি সরকার, ক্লান্তি এবং উদাসীনতার জন্যই বোধ করি এটি ঘটে। অবশেষে নেপোলিয়ন বোনাপার্ত সকল নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেন।

কৃষ্টিবান জার্মানরা যখন গ্যয়টের হিবেলহেম মাইস্টার পড়ে ফুর্তিতে আছে, কিংবা কোনিগসবুর্গ থেকে প্রকাশিত এবং ইমানুয়েল কান্ট কর্তৃক রচিত শান্তির নতুন পরিকল্পনা পড়ছে, তখন ফরাসি জ্যাকবাঁরা, বংশানুক্রমিক বিরোধিতা থেকে অব্যাহতি লাভ করায়, আর একবার নতুন জীবন লাভ করে। লুণ্ঠন ও পররাজ্য গ্রাসের আকর্ষণীয় কর্মপন্থাও জারি রাখে। তারা প্রাপ্ত সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহারও করে। সুইৎসারল্যান্ড, রোম এবং নেপলসে বিপ্লবের সূচনা হয়। এলভেশিয়ান, রোমান পার্থেনোপিয়ান[১] প্রজাতন্ত্রগুলি ফরাসি সাম্রাজ্যের মক্কেলের মর্যাদা লাভ করে। বোনাপার্ত জানতেন লাতিন কৃষকরা ধর্মানুরাগী, এদের তার দরকার যুদ্ধের জন্য। ফলে রাজতন্ত্রবিরোধী ফরাসি শাসকদের বিষয়টা তিনি আমল দেন নি। ফ্রান্সের রাজার চেয়ে রোমের পোপকে বেশি মর্যাদা দেয়া হয়নি। তাকে জোর-জবরদস্তি করে ফ্রান্সের সীমানা পেরিয়ে ভালেসে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ইতালিতে বোনাপার্তের বিজয়ের বছর ছিলো ইংরেজদের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন। যে নৌবহরের উপর ইংরেজদের শক্তি সবতো নির্ভরশীল, তাতে এপ্রিল ও মে মাসে, স্পিটহেড ও নোরেতে গুরুতর বিদ্রোহের সূচনা হয়, অবস্থা এখন বিপজ্জনক। উক্ত সংকট মোচন করা হয় দৃঢ়তা এবং শুভবুদ্ধির মিশ্রণ ঘটিয়ে। এই দু'টি উপাদানের মিশ্রণ ঘটিয়ে ইংল্যান্ড একাধিকবার দীর্ঘকালের পুঞ্জিভূত অনুভূতিহীনতার জরিমানা অনেকাংশে লাঘব করতে সক্ষম হয়েছে। নাবিকদের বৈধ বিক্ষোভ দূর করা হয়, নাটের গুরুদের ঝুলানো হয় ফাঁসির দড়িতে, নৌবহরে শৃঙ্খলাও ফিরিয়ে আনা হয়। অতঃপর দ্রুত ও স্মরণীয় স্বাভাবিকতা প্রদর্শন করে নৌবাহিনী দুটি বিজয় অর্জন করে : ক্যাম্পারডাউন এবং নাইলে। ফলে ইউরোপের ইতিহাস বদলে যায় (অক্টোবর, ১৭৯৭)। দুটি যুদ্ধের প্রথমটিতে ডানকান ওলন্দাজদের নৌবাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে নেলসন ফ্রান্সের একটি নৌবাহিনী ধ্বংস করেন (আগস্ট, ১৭৯৮)। উক্ত নৌবহরে বোনাপার্ত মিশরে এসেছিলেন। অতঃপর ইংরেজরা আবুকির বে-তে কামান থেকে প্রবল গোলাবর্ষণ শুরু করে। এতে ভূমধ্যসাগরে ইংরেজদের যে নৌপ্রাধান্যের সূচনা হয় তা আর কোনো দিন বিলুপ্ত হয়নি।

কারণ, ১১৭৯৮ সালে বোনাপার্ত ছিলেন মিশরে। দিরেকতোয়ার তাকে দেশে ফিরে আসতে বলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান পরিচালনার জন্য। কিন্তু বোনাপার্ত ভাবলেন অন্য রকম। সতর্ক বিচার বিবেচনার পর তিনি সাব্যস্ত করেন এখান থেকে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে মারণাঘাত হানবেন। তার প্রত্যাশা ছিলো যে, ফরাসিরা যদি সাফল্য অর্জন করতে পারে তাহলে শত্রুপক্ষের আত্মবিশ্বাস চূর্ণ হয়ে যাবে। বোনাপার্তের মনে এখন একাধিক অবাস্তব অথচ জাঁকালো পরিকল্পনার ভিড়। এদিকে তিনি আলেকজান্ডারের খ্যাতি এবং উদাহরণে দারুণ উত্তেজনায় ভুগছেন। মিশর থেকে তিনি একটা বিরাট পূর্বাঞ্চলীয়

---

১. অর্থাৎ নিওপলিটান।

সাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন। হয়তো ভারতবর্ষ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করবেন, ইস্তাম্বুল অভিমুখেও যাত্রা শুরু করতে পারেন, উক্ত দ্বীপের বাণিজ্য ধ্বংস করে তাদের ভিক্ষুকে পরিণত করাও সম্ভব। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি টিপু সুলতান (Tippo) এবং জ্যাকবাঁদের সাহায্যের উপর আস্থা রাখেন। তুলোঁতে তিনি তার বাহিনীকে বলেন, "তোমরা ইংলণ্ডের সেনা বাহিনীর অন্যতম পক্ষ।"

আধুনিক মিশরের সূচনা (তার ফরাসি সভ্যতার অগভীর প্রলেপসহ) পিরামিডের যুদ্ধ থেকে। এখানে বোনাপার্ত মামলুকদের বর্বর ক্ষমতার অবসান ঘটান। তার অভিযানের ফলে বহুকাল পর হলেও একটি এলাকা ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়। নাইল উপত্যকা থেকে ঔপনিবেশিক অতিক্রম করে এই চমৎকার বিদেশীর অভিযান সর্বত্র স্বাধীনতার আশা জাগ্রত করে। সভ্য ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার প্রত্যাশাও জাগে। নাইল উপত্যকায় তিনি একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করেন। নেপোলিয়নের অনুসারীদের মধ্যে কারো প্রভাব মেহেমেৎ (মহম্মদ) আলির চেয়ে বেশি ছিলো না। তিনি ছিলেন পাশা, খেদিব এবং রাজাদের উত্তরসূরী। এই মহম্মদ আলি তার জ্বালাময় এবং প্রাধান্যশীল শক্তি দ্বারা নেপোলিয়নের আদর্শ অনুসারে নতুন মিশরের জন্ম দেন। আজকে আমরা যে মিশরকে জানি তা মহম্মদ আলির সৃষ্টি।

নেলসনের বিরাট বিজয়ের খবর পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় জোট গঠন সম্ভব হয়। নেপলস থেকে (যেখানে বিজয়ী বীরের উপস্থিতির দরুন রানী ও তার বান্ধবী এম্মা হ্যামিলটন বন্য উল্লাসনায় নিমজ্জিত হন) যুদ্ধের প্রেরণা দ্রুত গতিতে ভিয়েনা হয়ে সেন্ট পিটার্সবুর্গ ও ইস্তাম্বুলে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিটের সঠিক রাষ্ট্রনায়কত্বে এবং বৃটিশদের আর্থিক সাহায্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ফরাসিদের তাড়িয়ে দেয়া হবে তাদের পুরোনো সীমান্তের ওপারে, আর জ্যাকবাঁ সরকারকে করা হবে উৎখাত। গোড়ার দিকে মিত্রপক্ষ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। ১৭৯৯ সালের গ্রীষ্মকালে একটা সংক্ষিপ্ত অভিযানে নেপোলিয়ন যা কিছু ইতালিতে অর্জন করেছিলেন এবং দিরেকতোর উক্ত অর্জনসমূহের সঙ্গে যা কিছু যুক্ত করেন, তার সবই হারাতে হয়। সুভোরফ, বাত্যা-বিক্ষুব্ধ নিষ্পাদপ প্রান্তরের উল্কা, একজন কৃষক সমরনায়ক, অতি বৃদ্ধ, খর্বকায় কিন্তু অতিশয় অগ্নিগর্ভ, তার রুশ অনুসারীদের মধ্যে প্রণিত করেন অদম্য আত্মশক্তি। তিনি নিজেও যেমন ছিলেন অদম্য আত্মশক্তির অধিকারী। ক্যাসানোতে তিনি পরাস্ত করেন মরো-কে, নোভিতে জুবারকে পর্যুদস্ত করতে সাহায্য যোগান, উপরন্তু ফ্রাংকো-ইতালীয় প্রজাতন্ত্রগুলিকে তাসের ঘরের মতো ধসিয়ে দেন। কিন্তু এই বন্য প্রতিভাবান সৈনিক তার পণ্ডিতম্মন্য এবং স্বেচ্ছাচারী মিত্রদের আচরণ সহ্য করতে পারেন নি। সুভোরফের বন্য প্রচণ্ডতা এবং অস্ট্রীয় যুদ্ধের মন্থর ও সুচিন্তিত আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে কোনো মিল ছিলো না। ফ্রান্সের জন্য সৌভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, ইতালীয় নাটকের পরবর্তী অঙ্ক অনুষ্ঠানের আগেই রুশ জার জোটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তার সুভোরফ তখন তার বহু দূরবর্তী জন্ম স্থানে। ইতিমধ্যে জুরিখে ম্যাসেনার বিজয় এবং হল্যান্ডে রুশদের, ফ্রান্সকে মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করে।

ইতিমধ্যে তুরস্ক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ফলে নেপোলিয়ন তার ভারত অভিযানের স্বপ্ন পরিত্যাগে বাধ্য হন। তাকে সিরিয়া অভিযানের মতো ছোটোখাটো একটেরে হাত দিতে হয়।

তেরো হাজার যোগাড় করা সৈন্য নিয়ে তিনি হাজির হন একরে (মার্চ, ১৭৯৯)। এখানে তাঁর গতিরোধ করেন দু'জন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ, সিডনি স্মিথ এবং ফেলিপিউস (Phelipeaux)। দু'জন একই স্কুলে একই সঙ্গে পড়াশুনা করেছেন। এটি ছিলো ভদ্রবেশে হ্যানিবাল বধের সিরিয়া অভিযানে ভয়ের ব্যাপার একটাই ছিলো। তুর্কি বাহিনীর যোগ্যতা নিয়ে কোনো কথা নয়। তাদের যোগ্যতা খুব বেশি ছিলো না। ভয়ের ব্যাপার হলো, যদি তুর্কি বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়, বিশাল জলশূন্য প্রান্তর অতিক্রম করে, তাহলে দক্ষ নির্দেশনায় শত্রুসেনা পেছনে লাগতে পারে। নেপোলিয়ন তার বাহিনীকে সিরিয়া থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হন বিরাট ও গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করার পর। তিনি আনাতোলিয়ার পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করে তার বাহিনীকে নিয়ে যেতে পারতেন (তার সে রকম ইচ্ছে থেকে থাকলে), এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ ধরনের বিপজ্জনক প্রলোভন থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন একটি সৌভাগ্যজনক এবং গ্লানিকর পরাজয়ের কারণে।

স্বীয় পেশায় চূড়ান্ত সার্থকতা অর্জনে তুর্কি যুদ্ধ নেপোলিয়নের জন্য বিরল ও অপ্রত্যাশিত সুযোগের সৃষ্টি করে। মিশর অভিযান যদি কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক হয়ে থাকে, সিরিয়া অভিযান ছিলো অধিকতর কাব্যিক এবং আকর্ষণীয়। গৃহ-গহ্বরমুখী ফরাসিরা, তারা যতোই পোপ ও যাজকদের নিয়ে ব্যঙ্গ করুন না কেন, তারা তরুণ সেনাপতি কর্তৃক প্যালেস্টাইন অধিকার করায় অত্যন্ত উত্তেজনা বোধ করেছেন। এই খবর এবং নাজারেথের মঠগুলিতে তিনি শিবির স্থাপন করেছেন জানতে পেরে ফরাসিরা পুলকে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তাছাড়া সিরীয় আকাশের নিচে, যিশু এবং তার অনুগামীদের পদস্পর্শে ধন্য ও পবিত্র, প্রথম ধর্মযুদ্ধের কারণে ফরাসিদের চোখে গৌরবজনক স্থানে তিনি অফিসারদের বাইবেল থেকে পাঠ করে শুনিয়েছেন, এটাও কম শ্লাঘার ব্যাপার নয়। তুর্কিদের অধিকার থেকে প্যালেস্টাইন পুনরুদ্ধার করায় মহাযুদ্ধের পর এমন কি বৃটিশ মন্ত্রিসভার ব্যাপ্টিস্ট প্রধানও পুলক অনুভব করেন। একই সঙ্গে সেঁ. লুই-র দেশবাসীরাও সমধিক গৌরবের ব্যাপার বলে গণ্য করে। অথচ তাদের বাস করতে হয় দিরেকতোয়ারের জঘন্য শাসনাধীনে। সবার ঠোঁটে এখন শুধু একটা নামই উচ্চারিত হয় নেপোলিয়ন বোনাপার্ত। নিজের বাহিনী পেছনে ফেলে রেখে দেশে ফেরার আগেই তিনি জাতীয় বীর এবং মুকুটহীন প্রভুর মর্যাদা লাভ করেন। আবুকিরে (জুলাই, ১৭৯৯) তুর্কিদের বিরুদ্ধে চমৎকার বিজয়ের খবর একটা হতাশাব্যঞ্জক বাস্তবতাকে সমভার করে। একটা চমৎকার বাহিনী ইতিপূর্বে অলাভজনক অভিযানে নিয়োজিত হয়ে কেবল অপচয়ের পরিমাণ বাড়িয়েছে। তুর্কিদের বিরুদ্ধে জয়ের ব্যাপার না ঘটলে হতাশার ব্যাপারটা থেকেই যেত।

দীর্ঘ দশ বছর যুদ্ধ ও বিপ্লব চলার পর ফরাসিরা এখন চায় শুধু শান্তি এবং নিয়মতান্ত্রিক স্ব-শাসন। গোটা দেশ বিভ্রান্তি এবং অরাজকতার কারণে ক্লান্ত। রাস্তা-ঘাটগুলির নিদারুণ দুর্দশা, দস্যুবৃত্তি শুরু হয়েছে মহামারী আকারে, স্কুলগুলিতে নেই শিক্ষক, হাসপাতালগুলিতে নেই কোনো সেবিকা, এদিকে রাজতন্ত্রীদের পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা, যার ফলে চৌদ্দটি দেপার্তমেঁর জন-জীবন অচল হয়ে পড়েছে। প্যারিস নগরীর রাজনীতিবিদরাও এখন মনে করেন যে, সৈনিকের তরবারিই শুধু পারে ফ্রান্সে দলাদলির অবসান ঘটাতে এবং নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতার যুগের সূচনা করতে। এদের অন্যতম ছিলেন জনৈক প্রসিদ্ধ

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যাকে ১৭৩৯ সালের সবচেয়ে ভয়ানক দিনগুলিতে বার্লিনের দূতাবাস থেকে ফিরিয়ে এনে দিরেকতোয়ারের সদস্য করা হয়। এর নাম সিয়েস।[২]

বিপ্লবকে একটি নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী আকার দেয়ার কথা সিয়েসের মতো গুরুত্ব দিয়ে কেউ ভাবতেন না। সিয়েস ছিলেন স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী, অনানুষ্ঠানিক যাজক। তৃতীয় এস্টেটের প্রবক্তা, গণপরিষদ সম্পর্কে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, কৃত্রিম দেপার্তমসমূহের স্রষ্টা, গির্জার হাতুড়ি এবং জিরদ্যাদের উপদেষ্টা। সিয়েস এখন দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিপ্লবকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেয়ার জন্য। এ ধরনের একজন ভাবুক, কর্তৃত্ব লাভ করার পর, সরকারের ভেতর বৃত্তে অবস্থান করে সৈনিকদের সহায়তা করার জন্য যে আহ্বান জানাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তার তাৎপর্য খুব বেশি। বোনাপার্ত তার উচ্চাভিলাষ বাস্তবায়নের জন্য ৯ই অক্টোবর ফ্রেজুতে অবতরণ করে সিয়েসের চেয়ে দক্ষ এবং কর্মক্ষম মিত্রের আশা করতে পারতেন না।

নবেম্বর মাসের এক নীরস সন্ধ্যায় ফরাসি বিপ্লবের শেষ দৃশ্যের অভিনয় হয় সেঁ ক্লুদে। সেখানে জ্যাকবাঁ ষড়যন্ত্রের বানানো অভিযোগ করে কাউন্সিলসমূহকে করা হয় বদলি, তাদের সশস্ত্র ব্যক্তিরা ঘেরাও করে রাখে। অতঃপর তরবারি দেখিয়ে তাদের বিতাড়িত করা হয়। অবমাননাকর পরিস্থিতিতে ভয়ঙ্কর এবং অনিশ্চয়তাপূর্ণ দিনটির চরম মুহূর্ত উপস্থিত হয় তখন যখন লুসিয়ে বোনাপার্ত, পাঁচ শতের পরিষদের তরুণ প্রেসিডেন্ট, সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। এবার নেপোলিয়ন মিথ্যে অভিযোগ খাড়া করেন যে তার ভ্রাতাকে মারণাস্ত্রের ভয় দেখানো হয়েছে। অতঃপর সশস্ত্র বাহিনী তলব করেন, তারা আশেপাশেই ঘুরাফিরা করছিলো। প্যারিস নগরী এ হেন হিংসাত্মক উপায়ে সংসদীয় স্বাধীনতা নস্যাৎ এবং ভন্ডামিপূর্ণ ঘটনায় অনড়। দিরেকতোয়ার এবং কাউন্সিলের কেউ অশ্রু বিসর্জন করেনি। কারণ তারা লাগামহীন কথা বলেছে এবং চালিয়েছে কুশাসন। গোটা ফ্রান্স ব্রুমেরের (৯ই নবেম্বর) কুদেতাকে নতুন যুগের আগমন বার্তা হিসেবে গ্রহণ করে এবং অভিনন্দন জানায়। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরই দেশটি বিপুল ভোটাধিক্যে একটি সংবিধান অনুমোদন করে। নতুন সংবিধান অনুসারে তিনজন কসুঁল (consul) নিয়োগ করা হয়। নেপোলিয়ন পরবর্তী দশ বছরের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতাসহ প্রথম কসুঁল হিসেবে নিযুক্তি পান।

প্রজাতন্ত্র টিকে যায়, এবং শুধু বাহ্যিক আকারে নয়। বোনাপার্ত ছিলেন বিপ্লবের সন্তান। অনেক মেধাবী ব্যক্তির মতো তিনিও বিরাট সামাজিক আলোড়নের কারণে সামনের কাতারে জায়গা লাভ করতে সমর্থ হন। তাছাড়া তার তরুণ মন গঠিত হয় সমালোচনা সাহিত্য এবং

---

২ শার্ত্রের ক্যানন এবং অসংখ্য রাজনৈতিক পুস্তিকার লেখক। তৃতীয় এস্টেট কি? (Quéstce que le tiers-é tat) এই রাজনৈতিক পুস্তিকা তাকে দেশব্যাপী খ্যাতি এনে দেয়। ১৭৮৯-এ তিনি প্যারিস থেকে তৃতীয় এস্টেটের ডেপুটি নির্বাচিত হন। ১৭৯২-এ কর্তসিঙ্গতে তিনি তৃতীয় এস্টেটের ডেপুটি নির্বাচিত হন। ১৭৯৫-এর সংবিধান তিনিই প্রণয়ন করেন বলা চলে। দিরেকতোয়ারের পতন ঘটানোর জন্য ১৮-১৯ ব্রুমেরের কুদেতায় তিনি নেপোলিয়নের সহযোগী ছিলেন। কসুলার যুগে তিন জন কসুলের অন্যতম ছিলেন তিনি। কিন্তু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিলো নেপোলিয়নের হাতে। সাম্রাজ্যের যুগে নেপোলিয়ন তাকে কাউন্ট উপাধি দিয়ে এবং সিনেটের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে প্রকৃত ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। ১৮১৬-তে তিনি ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত হন। ফ্রান্স ফিরে যান ১৮৩০-এ। ১৭৯১ থেকে ১৭৯৪ পর্যন্ত তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি যে উত্তর দেন তা স্মরণীয়: আমি বেঁচে আছি (J'ai vécu)। —অনুবাদক।

বিদ্রোহের প্রভাবে। সমালোচনা সাহিত্য এবং বিদ্রোহই ছিলো ঝড়ের বার্তাবাহক। মুক্ত কর্মজীবনের আকর্ষণ তার মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হতে পারে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা চলে যেতে পারে কিন্তু সাম্যের নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোটা ইউরোপে কন্সুলা এবং সাম্রাজ্যের কালে ফ্রান্স ইউরোপে যে বিস্ময়কর প্রাধান্য লাভ করে তার ব্যাখ্যা শুধু এর নেতার প্রতিভার মধ্যে খুঁজলে চলবে না। দেখতে হবে যে দেশ থেকে বিশেষ সুবিধা অপসারণ করার ফলে পশ্চিমের সবচেয়ে কৃষ্টিবান এবং সবচেয়ে জনবহুল দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বোনাপার্তের কাজে সাহায্য করার জন্য লাগানো সম্ভব হয়। তাঁরেরা দায়িত্ব পালন করেন বৈদেশিক দপ্তরে, ফুশে নিয়ন্ত্রণ করেন পুলিশ বিভাগ। বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণের সুযোগ পান। বিলেতের হোয়াইট হলের ক্ষেত্রে এটি কল্পনাই করা যায় না। স্টেট কাউন্সিলে অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়। ইউরোপে এ ধরনের ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। বিজয়ী বাহিনীর অধিকাংশ মার্শালই মেধা এবং যোগ্যতা বলে নিচের পদ থেকে উপরে উঠে আসতে সমর্থ হন।

ফ্রান্সকে শান্ত বা তুষ্ট করার জন্য বোনাপার্ত তার সকল দক্ষতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং নিরাসক্তিকে কাজে লাগান। বিদ্যমান সমস্যা মোকাবেলার জন্য এর দরকার ছিলো। তিনি না ছিলেন জ্যাকবাঁপন্থী, না করতেন রাজতন্ত্র সমর্থন। দলীয়তা তার মধ্যে ছিলো না। ফলে দলাদলির উর্ধ্বে উঠে ফ্রান্সের সমস্যার সমগ্র চিত্রটা দেখতে পান। বোনাপার্ত দেখতে পান যে কৃষক শ্রেণী ধর্মানুরাগী। কাজেই ক্যাথলিকদের ধর্ম পালনের অধিকার ফিরিয়ে দেন এবং পোপের সঙ্গে সমস্যার নিরসন (Concordat) করেন। ভঁদেতে বিরাজিত অশান্ত অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনেন। জ্যাকবাঁদের প্রণীত সকল নির্যাতনমূলক আইন বাতিল করা হয়। বিশিষ্ট অর্থশাস্ত্রবিশারদ গর্দ্যাকে তিনি আহ্বান জানান ফ্রান্সে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর প্রথা চালু করার জন্য। এই কাজে তিনি সফল হন। তার হিসাব ছিলো নিঃখুত, ধার্য কর কারো কাছে বোঝাস্বরূপ মনে হয়নি। অতঃপর স্থাপিত হয় ব্যাংক অব ফ্রান্স ১৮০০ সালে। এই দুটি ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে গোটা দেশে আর্থিক ক্ষেত্রে যে স্থায়িত্বের সূচনা হয় তা অনেক কাল ছিলো না। এই সব অতি দরকারি এবং প্রত্যাশিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে প্রথম কন্সুল সমগ্র জাতির মনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেন। একটা সময় থেকে উদার বিরোধিতার ক্ষীণ সুর কেবল ত্রিবুনাৎ নামক ক্ষুদ্র সভায় শোনা যায়। এই ত্রিবুনাত ছিলো সিয়েসের উদ্ভাবনী মস্তিষ্কের অবদান। তিনি চেয়েছিলেন জনগণ যেন তাদের ক্ষোভ জানানোর সুযোগ পায়। এই সামান্য স্বাধীনতাও প্রথম কন্সুল নেপোলিয়নের কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। ত্রিবুনাৎ এখন আর কোনো সুবিধাজনক যন্ত্র হিসেবে গণ্য নয়। ফলে ১৮০৭ সালে এটির অস্তিত্ব শাসনতন্ত্র থেকে মুছে ফেলা হয়। অতঃপর ত্রিবুনাতের প্রতি কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করেন নি, কিংবা উক্ত যন্ত্র বিলোপ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি তোলেন নি।

ইউরোপে শান্তি স্থাপন ছিলো অধিকতর জটিল। যদিও রুশ জার পল জোট থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, শুধু তাই নয় নেপোলিয়নের প্রতি দ্রুত ভক্তিশীল হয়ে উঠছেন, কিন্তু অস্ট্রিয়া এবং ইংল্যান্ড এখনো সশরীরে বিদ্যমান, তারা প্রথম কন্সুলের আত্মাসন মেনে না নিতে বদ্ধপরিকর। কন্সুলের তখনকার দুটি প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে অস্ট্রিয়ার অবস্থা ছিলো একটু নড়বড়ে, ফলে ঐ দেশটিকেই প্রথমে আক্রমণ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দেশটি পরাভূত হয় অতি সহজে, অথচ বিগত বছরের যুদ্ধের পরিণতি ছিলো

অন্য রকম। ১৮০০ সালের জুন মাসে মারেংগোর যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ফ্রান্স প্রবল উল্লাসে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কর্সুলকে সামরিক গৌরবে অভিষিক্ত করা হয়। মারেংগোর যুদ্ধের ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, গেল বছর বোনাপার্তের মিশরে অবস্থান কালে অস্ট্রিয়া রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সহায়তায় ইউরোপে যে সুবিধাজনক অবস্থানে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলো তা আর রইলো না। তাকে নিচে নেমে আসতে হলো। তবে প্যারিস নগরীর কেউ লক্ষ্য করেন নি কিংবা লক্ষ্য করতে চান নি যে, বোনাপার্ত জেনোয়ায় মেসেনাকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, উপরন্তু, দক্ষিণাঞ্চল থেকে দেস্যা (Desaix) হঠাৎ প্রত্যাবর্তন করায় তিনি মারেংগোতে বিপর্যয়কর পরাজয় এড়াতে সমর্থ হন। কিন্তু এখানে এটুকুই যথেষ্ট যে তিনি হ্যানিবলের মতো আলপস পর্বতমালা অতিক্রম করেন, দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে শত্রুপক্ষের সরবরাহ ব্যবস্থা তছনছ করে দেন, সর্বোপরি একশো বন্দুকের বিরুদ্ধে মাত্র পনেরোটি বন্দুকের সাহায্যে মনোবলচ্ছণকারী বিজয় অর্জন করেন। উক্ত বছরের ৩রা ডিসেম্বর মাসে হোহেনলিন্ডেনে ফ্রান্স আরো একটি বিজয় অর্জন করে। অস্ট্রীয়দের সমরনায়করা যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন না, ফলে এ ক্ষেত্রে ভাগ্য তাদের সহায় হয়নি। বস্তুত, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বৃদ্ধ মেলা, মরু মুখোমুখি হন আঠারো বছর বয়স্ক জনৈক আর্চডিউক-এর।

কথিত দু'টি কঠিন পরাজয় বরণের পর সম্রাট শান্তির জন্য হাত বাড়ান। ১৮০১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তাকে লুনেভিলে ইউরোপের একটি নতুন মানচিত্রের প্রতি সম্মতি জানাতে হয়। উক্ত মানচিত্র অনুসারে ফরাসি রাজ্যের সীমানা রাইন অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। তদুপরি বাটাভিয়ান, এলভেসিয়ান, সিজালপিয়ান এবং লিগুরিয়ান নামক চারটি মক্কেল প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। উক্ত প্রজাতন্ত্র চতুষ্টয় সৃষ্টি করা হয়েছিলো বিপ্লবী প্রচার ও প্রভাব ত্বরান্বিত করার জন্য। এভাবে গঠিত একটি ইউরোপ উইলিয়াম পিটের মন্ত্রিসভার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

প্রথম থেকেই ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে বৃটেনের সামগ্রিক মনোভাব গঠিত হয়, একটি বিস্ময়কর রাজনৈতিক পুস্তিকার প্রভাবে। উক্ত পুস্তিকা অতিরিক্ত আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় এজন্য যে পুস্তিকাটি প্রণয়ন করেন জনৈক আইরিশম্যান এবং হুইগ দলের সম্মুখ সারির নেতা। বার্কের Reflections (নবেম্বর, ১৭১০) সংখ্যাগরিষ্ঠ টোরিদের (দেশটি তখন তারাই শাসন করছিলেন) মধ্যে বিপ্লব সম্পর্কে আতংকের সৃষ্টি করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ত কর্তৃক সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষীগত করার পরও কথিত আতংকিত মনোভাবের কিছুমাত্র লাঘব হয়নি। চার্লস ফক্সের মতো গুটিকয় স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী নিরপেক্ষ রাজনীতিক প্রথম কর্সুলের মহান কিছু গুণাবলি সম্পর্কে অনুমান করতে সমর্থ হন। কিন্তু দেশের বৃহদংশের কাছে তা স্পষ্ট ছিলো না। অধিকাংশ ইংরেজের কাছে বোনাপার্ত ছিলেন একটি জঘন্য ও অপরাধপ্রবণ আন্দোলনের সৃষ্টি, তিনি ছিলেন বিপ্লবী দস্যুদের সর্বশেষ ও ভয়াবহতম প্রতিনিধি। তিনি গোটা ইউরোপকে রক্তের বন্যায় প্লাবিত করেছেন। লোকটি রাক্ষস বিশেষ, ইতালিতে দীর্ঘকাল লুণ্ঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সম্প্রতিকালে সিরিয়ায় চালিয়েছেন অবাধ নির্যাতনযজ্ঞ, তুরস্কে আত্মসমর্পণকারী বন্দীদের করেছেন হত্যা, পঙ্গুদের করেছেন বিষপ্রয়োগ, তাদের বাঁচানো বোঝাস্বরূপ ছিলো বলেই।

তথাপি, ১৭৯৯ সালে প্রথম কর্সুল বৃটিশ সরকারের কাছে শান্তি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে জবাব আসে যে ফ্রান্স যদি তাদের দেশের বৈধ নৃপতিকে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য

আহ্বান জানায় তাহলেই শুধু দেশটির উক্ত বিষয়ে আন্তরিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এই জবাব ছিলো যুগপৎ ঔদ্ধত্য এবং বোকামিপূর্ণ। এ সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিলো তাৎক্ষণিক : স্টুয়ার্ট সিংহাসনে উপবিষ্ট জনৈক স্কটম্যানের উক্ত জবাবে সততার অভাব রয়েছে।

ফ্রান্সের সঙ্গে দীর্ঘ বিতণ্ডার সময় বৃটেনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে উদ্বেগের ভেতর কাটাতে হয়েছে আয়ারল্যান্ডের মর্মপীড়া, অসন্তোষ এবং ষড়যন্ত্রের জন্য। আমেরিকায় বিদ্রোহের সময় বৃটেনের অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়; ফরাসি বিপ্লবের সময়ও তার ব্যত্যয় হয়নি। উত্তরাঞ্চলের শিক্ষিত প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে প্রথম বৈপ্লবিক ধারণা আশ্রয় লাভ করে, অতঃপর তা দ্বীপের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের নিপীড়িত এবং নিষ্ক্রিয় ক্যাথলিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপীয় সকল জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পুরোহিত প্রধান আইরিশ ক্যাথলিকরা ফরাসি বিপ্লবের নতুনত্ব এবং অধার্মিকতা সম্পর্কে ছিলো সবচেয়ে কম অবহিত। কিন্তু যখন কোনো জনগোষ্ঠীকে বলা হয় যে তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে; যখন তারা উপলব্ধি করে যে তারা নিজেদের দেশেই ভোটদানের ক্ষমতা রাখে না; যখন মুক্তি ও সাম্যের নামে তাদের আহ্বান জানানো হয় বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য, তখন, তারা যতই রক্ষণশীল হোন না কেন, উল্লিখিত আবেদনসমূহে সাড়া না দিয়ে পারেন না। এই ঘটনাটিই আয়ারল্যান্ডে ঘটে। উত্তরাঞ্চলের প্রটেস্ট্যান্টদের নেতা, ইউনাইটেড আইরিশম্যান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, উলফ টোন তার ক্যাথলিক স্বদেশবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান তারা যেন ডাবলিন পার্লামেন্টে বসার অধিকার দাবি করেন। ক্যাথলিকরা দাবি উত্থাপন করে, তাদের দাবিও যথারীতি প্রত্যাখান করা হয়। প্রতিবাদে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ; তাদের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয়। অতঃপর উইলিয়াম পিট দেখেন যে একই রাজশক্তির অধীনে দুটি পার্লামেন্ট থাকায় নানাবিধ অসুবিধা এবং বিপদ দেখা দেয়। এজন্য তিনি ১৮০০ সালে লেজিসলেটিভ ইউনিয়ন সম্পাদন করেন। উক্ত ব্যবস্থার অধীনে প্রটেস্ট্যান্ট আইরিশম্যানদের জন্য কমন্স সভায় এক শত আসন এবং লর্ড সভায় বত্রিশটি আসন বরাদ্দ করা হয়। এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন যদিও ডাবলিন পার্লামেন্টের প্রটেস্টান্ট দেশপ্রেমিকরা ভঙ্গি মনোভাব নিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করে, আর পরিবর্তনটা কার্যকর করা হয় ব্যাপক ঘুষের বিনিময়ে, তবে তা কথিত সময়ের জন্য কাজে লাগে। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সময় আয়ারল্যান্ড গুরুতর কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করেনি। তবে আইরিশ প্রশ্ন, যা বৃটিশ রাজনীতিকদের জন্য চিরকাল বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে, উইলিয়াম পিটের প্রসিদ্ধ মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটায়। উক্ত বিজ্ঞ রাষ্ট্রবিদ গোড়াতেই অনুধাবন করেন যে ইউনিয়ন সফল হতে হলে ক্যাথলিক আইরিশম্যানদের ওয়েস্টমিনস্টার পার্লামেন্টে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ক্যাথলিকদের মুক্তি ন্যায়সংগত; তিনি যুক্তি দেখান যে এই কাজটি করা হবে বিচক্ষণতার পরিচায়ক; তিনি জানতেন, এই কাজটি করা নিরাপদ। ক্যাথলিক ভোট ডাবলিনে বিপজ্জনক হবার সম্ভাবনা থাকলেও ওয়েস্টমিনস্টারের প্রধানত প্রটেস্ট্যান্ট পরিবেশে হবে অত্যন্ত নির্দোষ। কিন্তু রাজা অভিষেক শপথের প্রতি শ্রদ্ধাবশত এর প্রবল বিরোধিতা করেন। এর পর যে পিট পদত্যাগ করেন এবং পরবর্তীকালে কোনো সময় স্বীয় নীতির উপর জোর দেন নি, তা আইরিশ ইতিহাসের জন্য বিরাট বিপর্যয়ের কারণ হয়।

নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডকে ধূলিসাৎ করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে গোটা মহাদেশে অবরোধ সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন। প্রথমেই তিনি ধরে নেন যে ইংল্যান্ড হলো একটা দোকানীদের দেশ। ফলে মহাদেশের প্রতিটি বাজারে যদি বৃটিশ পণ্য বিক্রয় বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দেশটির যে ক্ষতি হবে তার চেয়ে বড়ো কোনো ক্ষতি হতে পারে না। পরিকল্পনা অনুসারে স্পেনকে নির্দেশ প্রদান করা হয় পর্তুগাল আক্রমণ করার জন্য, অন্য দিকে একটি ফরাসি সেনাছাউনি নেপলসের দুর্দশাগ্রস্ত নৃপতিকে এমন বাণিজ্যিক নীতি অবলম্বনে বাধ্য করে যা ফরাসি পরিকল্পনার অনুকূলে কাজ করবে। সে যাইহোক, একটা ব্যাপার কিন্তু প্রথম থেকেই পরিষ্কার ছিলো যে ভূমধ্যসাগরীয় অবরোধের ফলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। ইংরেজদের তৈরি পণ্য যদি হামবুর্গ কিংবা লুবেক, এমনকি স্টকহোম অথবা সেন্ট পিটার্সবুর্গের বাজারে প্রবেশ করতে পারে তাহলে অবরোধের কোনো মূল্য থাকলো না, অবসান হবে সকল খেলার। অবরোধ এমন একটি পন্থা, যা আরোপ করতে গেলে আধা-আধি ব্যবস্থার কাজ হবে না। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সফল হবে কিংবা একটুও হবে না। তবে এই ঘটনার সবচেয়ে মজার দিকটি হলো : নেপোলিয়ন বিশ্বজনীন অবরোধ আরোপের মতো অবাস্তবতার পেছনে ছুটে পরিশেষে বাধ্য হন বিশ্বসাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্নের পেছনে ছুটতে। এর পরিণতি দাঁড়ায় ভয়াবহ, এক পর্যায়ে তিনি ধ্বংস হয়ে যান। অবশ্য ১৮০১ সালের গোড়ার দিকে, একটা পর্যায়ে, এই ব্যয়বহুল এবং আড়ম্বরপূর্ণ বোকামি প্রায় সফল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের পরবর্তী কোনো পর্যায়ে এ ধরনের সুযোগ আর একবারও আসেনি। যখন রাশিয়ার প্রথম পল এই নাটকে প্রবেশ করেন। প্রথম পল ছিলেন অর্ধোন্মাদ অত্যাচারী শাসক; তার মাল্টার নাইটদের প্রতি ছিলো অযথা অত্যুৎসাহ, আর নেপোলিয়নের প্রতিভার প্রতি তার ছিলো টগ্‌বগে ভক্তি। ১৮০০ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোর এই বিকট বর্বর নৌযুদ্ধে উচ্চতর নৈতিকতার প্রতিভূ হিসেবে আবির্ভূত হন। ডেনমার্ক, সুইডেন এবং প্রুসিয়াকে অভিন্ন পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে পল 'সশস্ত্র নিরপেক্ষতার লিগ' গঠন করেন। তার লক্ষ্য দুটি : নিরপেক্ষতা বজায় রাখার অধিকার সংরক্ষণ এবং বৃটেনের স্বার্থের ক্ষতিসাধন। তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দেন শেষোক্ত লক্ষ্য উদ্ধারে। এই দেশটির একটা দুর্বলতা এই ছিলো যে, তার নৌবাহিনী নিরপেক্ষ নৌযানে তল্লাসি চালায় শত্রুপক্ষের পণ্য বা যুদ্ধের নিষিদ্ধ পণ্যের খোঁজে। আর এই কাজটি করতে গিয়ে নৌযানের মালিকদের অশেষ ক্ষতি সাধন করেন। অনেক সময় নানা অসুবিধারও সৃষ্টি করে। নৌযান তল্লাসির অধিকার কি ভাবে প্রয়োগ করা হবে, এ ব্যাপারে কেমন নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষাকবচ, সৌজন্য এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকবে, তা তখনকার মতো এখনও আন্তর্জাতিক আইনের একটি কণ্টকবহুল সমস্যা। "সামুদ্রিক জলপথে নৌ চলাচলের স্বাধীনতা" মতবাদ প্রথম ঘোষণা করেন রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথরিন ১৭৮০ সালে। এই মতবাদে বলা হয় যে; বৈধ সময়ে নিরপেক্ষ জাহাজ চলাচলে যুধ্যমান কোনো নৌবাহিনী বাধা প্রদান করতে পারবে না বা নিরপেক্ষ নৌযানের ক্ষতি করতে পারবে না। এই মতবাদের পক্ষে পুনরায় ঘোষণা দেন পল। আজকের দিনেও এই সমস্যা ব্যাপারে ঐকমত্য নেই। ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে আমেরিক্যান নৌবাহিনী উক্ত মতবাদ তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করেন। প্রথম পল যে উত্তরাঞ্চলের শক্তিগুলিকে সশস্ত্র নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হন তা নেপোলিয়নের জন্য অপ্রত্যাশিত সুযোগ এনে দেয়। নেপোলিয়ন সে সুযোগ গ্রহণও করেন।

কিন্তু শক্তিগুলি যখন হুমকি হয়ে দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় পৌঁছতে শুরু করেছে, প্রুশীয়রা হ্যানোভারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছে, দিনেমার বাহিনী হ্যামবুর্গ এবং লুবেকে অবস্থান গ্রহণ করছে, তখন সকল আয়োজন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ১৮০১ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার জারকে তার প্রাসাদে গলা টিপে হত্যা করা হয়। ব্যাপারটা প্রাসাদ বিপ্লব জাতীয়। এপ্রিল মাসে কোপেনহেগেনে নেলসনের বন্দুক দিনেমার নৌবহর ধ্বংস করে। এই দুটি মারণাঘাতের ফলে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের আকস্মিক এবং অগৌরবজনক অবসান ঘটে। অথচ উক্ত জোট এক পর্যায়ে মহাদেশীয় অবরোধ সম্পূর্ণ করার মতো অবস্থায় পৌঁছেছিলো।

এই ঘটনাসমূহ, জারের হত্যাকাণ্ড, কোপেনহেগেনের যুদ্ধ, এবং উইলিয়াম পিটের অবসরগ্রহণ, আমিয়েনের শান্তিচুক্তির (মার্চ, ১৮০২) পথ তৈরি করে। ইংরেজ লেখকদের প্রচলিত রীতি এই যে, তারা বলবেন নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যাডিংটন কঠিন ধাতুতে গড়া ছিলেন না। ফলে তিনি বড় বেশি ছাড় দেন। এ ব্যাপারে ফরাসি লেখকরা বিপরীত অভিমত পোষণ করেন। ইংরেজরা অন্তত নৌশক্তির ক্ষেত্রে একক প্রাধান্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়। সমুদ্রের ওপারে বিজিত অনেক ভূ-খণ্ড হাত-ছাড়া করেনি। তারা ত্রিনিদাদ ছিনিয়ে নিয়েছিলো স্পেনীয়দের কাছ থেকে, আর সিংহল দ্বীপ কেড়ে নিয়েছিলো ওলন্দাজদের কাছ থেকে। এ কথা যদি সত্যও হয় যে সমুদ্রের ওপারের বিজিত ভূ-খণ্ডগুলি প্রত্যর্পণে ফরাসিরা কোনো মতেই বাধ্য করতে পারতো না, তাহলে একথাও ঠিক, যুদ্ধ পুনরায় শুরু হলে অধিকতর শক্তিধর কোনো নৌবাহিনী সেগুলি সহজে পুনর্দখলে সমর্থ হতো। ভবিষ্যতে শান্তির জন্য সবচেয়ে বড়ো কুলক্ষণ এই ছিলো যে কোনো প্রকার বাণিজ্যিক চুক্তি প্রণীত হয়নি। ইংরেজ বণিকদের যতদিন ফ্রান্সে বৈদেশিক শত্রু হিসেবে গণ্য করা হবে ততদিন ফরাসি এবং ইংরেজ জনগণের পক্ষে কোনো প্রকার বোঝা-পড়ায় পৌঁছা সম্ভব হবে না।

কসুঁলা ও সাম্রাজ্য

নেপোলিয়নের সামাজিক গুণাবলি। কঁকরদাত। আইন সংহিতা। দ্য ইউনিভার্সিটি অব ফ্রান্স। পুনরায় যুদ্ধের সূচনা। সাম্রাজ্য। নতুন শার্লমেন। বুলনের শিবির।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কর্তৃত্বের প্রতি সম্ভ্রম ফিরিয়ে আনেন। তার আগমন বিশৃঙ্খলার সময়ে, বিদায় নেন শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে। তার আগমন কালে বিদ্রোহের বিস্তার ঘটেছে চারদিকে, অতঃপর আইনের শাসন সর্বত্র। যে ভাবাবেগ দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ সমাজ কাঠামো আন্দোলিত করে, সমাজ কাঠামোয় ভাঙন ধরায়, তার দাপট চলে অবাধে, আর যে নৈতিক শক্তিগুলি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সহায়ক ছিলো তা বিলীন হয়ে যায়। এর বিপর্যয়কর ফলশ্রুতি সহজে অনুমেয়। সম্ভ্রম বোধকে হেসে উড়িয়ে দেয়া হয়। ধর্ম, প্রাচীন কালের নিদর্শন, ফ্রান্সের দীর্ঘকালের পুরাতন ঐতিহ্য, এমন কি জীবন সম্পর্কে সাধারণ রুচিবোধকে আজগুবি এবং যুক্তিহীন বলে প্রচার করা হয়। আরো প্রচার করা হয় যে এসব স্বেচ্ছাচারী অতীতের অবশেষ মাত্র। নেপোলিয়ন ছিলেন ভলতেয়ারের অনুসারী। আনুষ্ঠানিক ধর্ম কিংবা প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতাকে তিনি পাত্তা দিতেন না। তার সামাজিক আচরণ সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে, তা অনেক সময় যেমন ছিলো সৌজন্যময়, সদয় এবং মর্যাদাবান, তেমনি ছিলো অনুভূতিহীন পাশবিকতাপূর্ণ। কিন্তু তিনি প্রকৃত নেতার গুণাবলি নিয়ে জন্মেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে জাতীয় শক্তির উৎস হলো জাতীয় ঐক্য। যে শক্তি সমাজে সংহতির পক্ষে কাজ করে তিনি তার কদর করতেন। তিনি ধর্মের অনুরাগী ছিলেন ; কারণ সমাজ কাঠামোর শক্তি ধর্মে লুক্কায়িত; তিনি শিক্ষার পক্ষে ছিলেন, কারণ তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে শিক্ষার নবরূপ দিতে পারবেন; সরকারে সূক্ষ্মতা ও বিজ্ঞান তার কাছে মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে, কারণ এসব ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক। বাহ্যিক আদব-কায়দাও তার পক্ষপাত লাভ করে, কারণ এর সাহায্যে প্যারিসবাসীদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ স্তব্ধ করা সম্ভব হতে পারে। তার দায়িত্ব ছিলো নতুন ফ্রান্সের সঙ্গে পুরাতন ফ্রান্সের সমঝোতা সৃষ্টি, এবং যাজক ও দেশত্যাগী, ইহুদি, প্রটেস্ট্যান্ট, ঈশ্বরদোহী এবং জ্যাকঁবাদের রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত করা, রাষ্ট্রের জৌলুষ বৃদ্ধির অনুকূলে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা। রাষ্ট্রে সুস্থিত অবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি ইউরোপের সবচেয়ে গর্বিত এবং প্রাচীনতম বংশে বিয়ে করেন। তিনি যে শাসনব্যবস্থা উপহার দেন তা ফ্রান্সের জন্য ছিলো একেবারে নতুন, গণভোটভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত স্বেচ্ছাচারতন্ত্র। তিন বার, ১৮০০, ১৮০২ এবং ১৮০৪ সালে জনগণের কাছে তিনি কর্তৃত্ব চান এবং লাভ করেন। অতি দ্রুত এবং জনগণের স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি প্রথমে প্রথম কসুঁল হন দশ বছরের জন্য, তারপর কসুঁল হন সারা জীবনের জন্য, সবশেষে হন ফরাসি রাজ্যের সম্রাট। ইউরোপের কোনো রাজা এতটা সর্বাঙ্গসুন্দর বা নিঃখুত পদবী বা আখ্যা দাবি করতে পারেন না।

ফরাসি জনগণ নেপোলিয়নের প্রতি পর্যায়ক্রমে বৃহত্তর মাত্রায় আস্থা স্থাপনের সময় আশা করেছিলো যে তিনি তাদের শান্তির সোনালি আশীর্বাদ এনে দেবেন। কিন্তু শান্তি তিনি এনে দেন নি, কিংবা দিতে পারেন নি। শুধু তাই নয় তার ক্ষমতারোহণের ফলে এমন একটি যুদ্ধের সূচনা হয় যার ফলশ্রুতিতে প্রায় গোটা মধ্য ইউরোপ ফরাসি শাসনাধীনে চলে আসার পর, পরিণতি ঘটে ফরাসি সেনাবাহিনীর অভূতপূর্ব বিপর্যয়ে। ফরাসি রাজ্যের আয়তন দাঁড়ায় পুরানা রাজতান্ত্রিক আমলে যতটুকু ছিলো ততটুকু। একে ইতিহাসের অন্যতম পরিহাস বলেই গণ্য করতে হয় যে, যে পরিবারের নাম সামরিক সুখ্যাতির সমার্থক ছিলো সেই পরিবারই ফরাসি রাজ্যের আয়তন সংকুচিত করে। প্রথমে নেপোলিয়ন হাত-ছাড়া করেন বেলজিয়াম। তার ভাইপো কূটনৈতিক দরকষাকষির মাধ্যমে স্যাভয় এবং নিস অধিকার করতে সমর্থ হলেও, বলপ্রয়োগের ব্যর্থ প্রয়াসের পরিণতিতে আলসেস ও লরেনের উপর থেকে অধিকার প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। বরং বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের কালো কোট পরিহিত উকিল ও বৈদ্যরা বৃহৎ মিত্রচক্রের সহায়তায় হারানো ভূখণ্ডের কতকাংশ এবং কিছুটা প্রভাব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন ; নেপোলিয়ন বংশের কারণে যা হাত-ছাড়া হয়েছিলো।

যদি নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ী কৃতিত্বগুলি ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে, তবে তার বেসরকারি কর্মকাণ্ডগুলি ছিলো দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেসরকারি প্রশাসন দক্ষ পরিচালনার জন্য যে গুণগুলি থাকা দরকার, সঠিক অনুমান এবং উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে, প্রচালক ক্ষমতা তথা খুঁটিনাটি ব্যাপারে মনোযোগ প্রদানে, স্বচ্ছ চিন্তা এবং কাজ করার সমর্থতায় তিনি ছিলেন সবার উপরে। বিপ্লবের দরুন দেশের যে ক্ষতি হয় তা তিনি অচিন্তনীয় দ্রুততার সঙ্গে পূরণ করেন। কর্সুলা রাজত্বের দেশে বিরাজ করে প্রত্যাশা এবং উদ্দীপনা। এই প্রত্যাশা এবং উদ্দীপনার পরিবেশে তিনি জনগণের বাস্তব অবস্থার উন্নতির জন্য প্রশাসনের কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় স্তরের প্রতিটি বিভাগে চমকপ্রদ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। পূর্বতন সমাজের (ancient regime) অতিরিক্ত বিষয়গুলি উৎখাত করা হয়। কোনো নিগম, পার্লমঁ কিংবা প্রাদেশিক এস্টেটসমূহের অস্তিত্ব আর থাকলো না। সাধারণ আইনের নাগালের বাইরে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিক শ্রেণীর অস্তিত্বও বিলুপ্ত হলো। দিপার্তম-এর প্রশাসক, উপ-দিপার্তমের সহকারী প্রশাসক, নগর পাল তার কমিউনে বসে, রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশ পালন করেছে মুক্ত পরিবেশে।

নেপোলিয়নের অন্যতম কর্মপন্থা এই ছিলো যে, নতুন জগতের সঙ্গে পুরাতন জগতের সমন্বয় সাধন হবে। তিনি যে পোপের সঙ্গে সমঝোতায় (concordat) উপনীত হন তা ছিলো উক্ত কর্মপন্থার অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেনানায়ক, রাজনীতিক এবং প্যারিসের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা এখনো বিপ্লবী যুগের নিরীশ্বরবাদিতায় আস্থাশীল তাদের কাছে এই পরিবর্তনটাকে মনে হয়েছে অরুচিকর। তারা ব্যাপারটাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসাও করেছেন। তাদের কাছে মনে হয়েছে যে সভ্যতার জন্য যা কিছু অর্জন করা হয়েছিলো তা হাত-ছাড়া করা হলো, প্রত্যাবর্তন করা হলো মধ্যযুগীয় রাত্রির অন্ধকারে, মানুষের মনে রাজত্ব কায়েমের জন্য পুনরায় আমন্ত্রণ জানানো হলো যাজকশ্রেণীকে। কিন্তু নেপোলিয়নের দৃষ্টি সেনানায়ক এবং প্যারিসের বুদ্ধিজীবীদের অতিক্রম করে বিশাল কৃষক সম্প্রদায়ের দিকে নিবদ্ধ, এই কৃষক সম্প্রদায়ই তার বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান নীতির ভিত্তিতে গঠিত তার বাহিনীর জন্য জনসম্পদের যোগান দেবে। ওদের বিদ্রোহে যাজকশ্রেণীর নেতৃত্বের স্বরূপ তিনি সঠিক

উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর লক্ষ্য করেছেন পথের ধারের সমাধিমন্দিরে ইতালীয় কৃষকরা হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে, তাঁর আরো জানেন সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম বিরাট শক্তি হিসেবে কাজ করে। সমাজের মধ্যে বিভেদ বা বিচ্ছেদ (schism) উন্মুক্ত ক্ষত ছাড়া কিছু নয়, এই ক্ষত যদি অবিলম্বে মুছে ফেলা না যায় তবে তা রাষ্ট্রদেহকে করবে বিকৃত, বিপদও ডেকে আনবে। ১৮০২ সালে, দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা এবং দর-কষাকষি শেষে, তার পক্ষে শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের মেধাবী মিশ্রণ ঘটিয়ে কৌশলও পরিচালনা করে নেপোলিয়ন একটা সমঝোতায় উপনীত হন নতুন পোপ সপ্তম পিয়ুসের সঙ্গে।

তবে কনকর্ডাট এবং নতুন যে নীতিমালার আলোকে নতুন রোমান ক্যাথলিক সমাজ গঠন করা হয় তা ছিলো পূর্বতন সমাজের গির্জাতন্ত্র থেকে একেবারে ভিন্ন। গির্জার বিশাল ভূসম্পত্তি এবং লাভজনক টাইদ (tithes), মোটা বেতন, জাঁকাল দপ্তর, বিরাট সভামণ্ডলী, সমাজের উপর প্রায় একচ্ছত্র প্রভাব, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী গ্যালিক্যান গির্জার যাজকরা ভোগ করেছে তা এখন দূর অতীতের ব্যাপার মাত্র। নেপোলিয়নীয় বিশপরা মুষ্টিবদ্ধ রাষ্ট্রের তরফ থেকে এখন বেতন পান নাম মাত্র, এখন বিশপ আর স্বীয় অঞ্চলের (diocese) বাইরে পরিভ্রমণ করতে পারবেন না, তাদের যাজকসভায় (Synod) ধর্মীয় বক্তৃতা প্রদানের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, সর্বোপরি লৌকিক ক্ষমতা বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া যাজকরা রোমের যাজকশ্রেণীর সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ করতে পারবে না। গির্জা কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তারা কর্মকাণ্ডও চালাতে পারে। অ্যাঞ্জেলাস কৃষকদের পুনরায় প্রার্থনা সভায় যোগ দানের জন্য আহ্বান জানান, যাজকের শুভ্র উত্তরবাস (surplice) পুনরায় সূর্যের আলোয় ঝিলিক দেয়া আরম্ভ করে, বিশ্বাসীদের মিছিল পুনরায় বেদির চারপাশে জড়ো হয়। এখন আর তাদের মনে নির্যাতিত হবার আশঙ্কা কাজ করে না। আবার বিশপদের পূর্বতন সমাজের নিয়ম অনুসারে মনোনীত করার প্রথা চালু হয়। তাদের বরণ করাও শুরু হয় পূর্বতন সমাজের প্রথা অনুসারে। কিন্তু গির্জার সকল প্রকার স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে, তার অবস্থান নেমে গেছে লৌকিক ক্ষমতার নিচে। তাদের এখন চলতে হয় লৌকিক ক্ষমতার নির্দেশ অনুসারে। যাজকদের এখন আর দায়িত্ব নয় স্বীয় অনুসারীদের আধ্যাত্মিক পিতার ভূমিকা পালন করা, রোগব্যাধিগ্রস্তদের সেবা করা। মৃত্যুপথযাত্রীকে সান্ত্বনা প্রদান, তরুণদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। যাজকদের এখন কাজ হলো গির্জার উঁচু বেদি থেকে সেনাবাহিনীর বুলেটিন পাঠ করে শোনানো, অশক্ত দেহের অধিকারী ব্যক্তিকেও সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো, উপরন্তু তরুণদের নেপোলিয়নের নির্দেশ অনুসারে বোঝানো যে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি অনুগত হওয়া তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

তথাপি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নেপোলিয়নের সত্যিই কি পোপের সঙ্গে কোনো প্রকার বোঝাপড়ায় আসার দরকার ছিলো। গ্যালিকান চার্চ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ ছিলো, তবে তারা কাজ করেছে স্বাধীনভাবে, রোমের আজ্ঞার তোয়াক্কা করেনি। তাছাড়া তখন ধর্মীয় জীবনে চরম অবসাদ বিরাজ করছে, গৃহ যুদ্ধে অগণন আন্তরিক পুরোহিত জীবন দিতে বাধ্য হয়েছেন। অতএব গ্যালিক্যান চার্চ বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যেতো। ফরাসি যাজক সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশের কাছে তা গ্রহণযোগ্যও বিবেচিত হতো। তবু নেপোলিয়ন বিরোধ নিরসনের জন্য আলোচনায় অংশগ্রহণকারী কার্ডিনালদের গ্যালিক্যান চার্চ গ্রহণের হুমকি

প্রদান করলেও তিনি তা গ্রহণ করেন নি। কারণ তার কাছে পোপতন্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা তখন অনেক নিচে নেমে গেছে। এতটা নিচে যে উইলিয়াম পিট এবং অস্ট্রীয় চ্যান্সেলর ধুগুটের মতো নেপোলিয়নও ভাবতে শুরু করেছেন যে পোপতন্ত্রের দিন ফুরিয়ে এসেছে। তবু তিনি উক্ত সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানের সমর্থন অবজ্ঞাভরে পায়ে ঠেলে দিতে পারেন না। "ঐ পুরাতন জীর্ণ যন্ত্র স্বীয় চাপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে", তবু উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে অন্যান্য দেশের ক্যাথলিকদের সংগঠিত করা যায়।

ফরাসি আইনের সার সঙ্কলন ছিলো নেপোলিয়নের কৃতিত্বগুলির মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। এই কাজটি সম্পন্ন করার স্বপ্ন দেখা হয়ে আসছে সেই পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। আর এটি ছিলো বিপ্লবীদের নীতিমালার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে যে কাজের জন্য দরকার আইনের পুরো অবস্থা জরিপ করা, তার জন্য ঝড়ের বেগে আইন প্রণয়নের ধারা কিছুতেই উপযোগী হতে পারে না। বিপ্লবীরা ঘোষণা দেন যে একটা আইন সংহিতা থাকতে হবে, তারা একাধিক খসড়াও প্রণয়ন করেন, কিন্তু তারা অসম্ভব দ্রুত গতিতে চলতে গিয়ে কিছুই অর্জন করতে পারেন নি। নেপোলিয়ন কাজটি সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, এবং ব্যক্তিগত প্রাণশক্তি তথা ইচ্ছার জোরে অবিলম্বে সফল হন। অবশ্য মানতে হবে যে সিভিল কোড কেবল একজন অতি প্রতিভাবান আইনপ্রণেতার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হয়নি। পূর্বতন সমাজের প্রধান প্রধান আইন, যেমন দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচলিত রোমান ল, উত্তর অঞ্চলে প্রচলিত ফ্রাংকিশ Coutumes, তৎসঙ্গে নেপোলিয়ন এবং তদীয় পরামর্শদাতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিপ্লবী যুগের আইনগুলি উক্ত সংহিতায় জায়গা করে নিতে পারে। এই আইন সংহিতা এতটা স্বচ্ছ ও সুন্দর ছিলো যে একজন সাধারণ লোকও তা স্বচ্ছন্দে পড়তে পারতেন, উপরন্তু এতটা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হয় যে উক্ত সংহিতা কোটের পকেটে নিয়ে ঘুরাফিরা করা সম্ভব হয়। সিভিল কোড উচ্চ মানের বলে বিবেচিত হয়নি এজন্য যে তা ছিলো আকর গ্রন্থ, কিংবা এটি কেস ল-র বিস্তারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, অথবা এটি আকার ও সারসত্তার দিক থেকে ছিলো নিখুঁত; সিভিল কোডের গ্রহণযোগ্যতা এখানে ছিলো যে এটি একটি সভ্য লৌকিক সমাজের কাঠামো বিধিবদ্ধ এবং নির্ধারণ করে দেয়। এই সমাজের ভিত্তি হলো সামাজিক সাম্য এবং ধর্মীয় সহনশীলতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং আসঞ্জনশীল পারিবারিক জীবন। সময়টা ছিলো সুবিধাজনক। কয়েক বছর আগে এই কাজটি সম্পাদন করা হলে তা বিপ্লবী আধিক্যে চকচক করতো, কয়েক বছর পরে করা হলে তা হতো স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের ছায়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। সংহিতার খসড়া প্রণয়ন করা হয় কর্সুলা রাজত্বের তাজা ঔজ্জ্বল্যের সময়, যখন নেপোলিয়ন ফরাসি সমাজের প্রতিটি স্তরে ন্যায় বিচারের স্বাক্ষর রাখছেন। সংহিতাটি শুধু ফ্রান্স নয়, গোটা ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য দরকারি প্রস্তাবিকা (Prospectus) হিসেবে কাজের উপযোগী ছিলো। অন্তত যে দেশগুলির দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর বিশ্বস্ততার, তাছাড়া যারা একটি লৌকিক ও উদার বিপ্লবের সুফল ভোগ দরকারি মনে করেছে তারা উক্ত সংহিতার মর্যাদা বুঝেছে। সিভিল কোডের এটিই ছিলো ইউরোপীয় তাৎপর্য। লৌকিক বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ প্রথার মাধ্যমে কোড সমগ্র ইউরোপে এই ধারণা ছড়িয়ে দেয় যে যাজকদের সহায়তা ছাড়াও একটি সমাজ চলতে পারে। ধর্মীয় মন্ত্র পাঠ করে বিবাহ করলে সেটা অপ্রসূদীক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে কোড বা লৌকিক বিবাহ অনুসারে বিবাহ একটা

চুক্তি মাত্র। এই চুক্তি যেমন সস্তা দরে করা যায় তেমনি সস্তা দরে অস্বীকার করা চলে। একজন সাধারণ মানুষ, সাধারণ পোষাক পরিধান করে তৈরি ও ভঙ্গ করার দায়িত্ব পালন করতে পারেন। সম্রাট কন্সট্যান্টাইন কর্তৃক খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর এই প্রথম একটি সুস্থিত ও নিয়মানুগ ইউরোপীয় দেশ আইন সংহিতায় সর্বাঙ্গ লৌকিক জীবন বৈধ করে।

তাই বলে একথা মনে করলে ভুল করা হবে যে নেপোলিয়ন ধর্মীয় শক্তি কিংবা পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলার নেতিবাচক মূল্যায়ন করতেন। সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্য এই উপাদানগুলির গুরুত্ব তিনি ঠিকই অনুভব করতেন। বরং ব্যাপারটা একেবারে উল্টো। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে নেপোলিয়নের ধারণা ছিলো রোমকদের অনুরূপ, অর্থাৎ তা ছিলো নিয়ম নীতিপরায়ণ। তার মতে পিতার কর্তৃত্ব অতিরিক্ত কঠোর হতে পারে না, কিংবা স্ত্রীর অধীনতা অতিরিক্ত সম্পূর্ণ। তিনি বলেন, "তোমরা কি জান না স্বর্গীয় দূতরা ঈভ-কে স্বামীর অনুগত হতে বলেছেন? সকল ভাষায় এই বিষয়টা লিখিত হয়েছে। অধিকতর প্রত্যয়জনক যুক্তিতে (A fortiori) কোডে ফরাসি ভাষায়ও এটি লিখিত থাকতে হবে।" তবে তখন বিপ্লবী ইহজাগতিকতার ভরা জোয়ার। এই জোয়ার রোধ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। নেপোলিয়ন বিবাহ বিচ্ছেদের সুবিধা কিছুটা কাট-ছাট করেন (এই সুবিধা বিপ্লবের কারণে সূচিত হয়েছিলো), কিন্তু তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের রীতি মেনে নিতে বাধ্য হন।

নেপোলিয়নের মহত্ত্বের লক্ষণ এখানে খুঁজে পাই যে, তিনি সিভিল কোড চালু করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের আইন পর্ষদে এ বিষয়ে আলোচনায় বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। অনেক সময় তার ভূমিকা ছিলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক। আইনের সূক্ষ্ম মারপ্যাচ বিষয়ে তার কোনো উৎসাহ ছিলো না। তবে কোনো সমস্যার নীতিগত দিক সম্পর্কে তার ছিলো সজাগ ও শ্যেন দৃষ্টি। এসব ব্যাপারে তিনি জোর দিয়ে নিজের অভিমত জ্ঞাপন করতেন। সাধারণভাবে নেপোলিয়ন চাইতেন যে ফ্রান্স নমনীয় একটি দেশ হবে। সম্পত্তির বিভাজন খুব হবে না, পিতারা স্বেচ্ছাচারী হবে না, এবং সন্তানরা হবে না অতিরিক্ত নতজানু, নারীকুলের অধিকার থাকবে, এবং তারা একান্তভাবে পরনির্ভরশীল হবে না। এসব বিষয়ে তিনি ফরাসি আইনে নিজের দৃঢ় বিশ্বাসের ছাপ রাখতে সক্ষম হন।

অন্য যে কোনো ব্যাপারের চেয়ে, সিভিল কোড গোটা ইউরোপে নতুন ফ্রান্সের চালু প্রথাদির খ্যাতি অধিক প্রচারিত করে। বস্তুত কোড হলো বিপ্লবী দর্শনের সারমর্ম, সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের উপযোগী করে প্রকাশিত। কোডে ফলপ্রসূ উদ্ভাবন এবং সুপ্রাচীন রীতিনীতির সহাবস্থান ঘটে। এখানে স্বাধীনতার সঙ্গে সহাবস্থান ঘটানো হয় শৃঙ্খলার। কথিত আইন ব্যাপক হারে অনুসরণ করা হয়। জাস্টিনিয়ানের অনুশাসনের পর এত বড় ঘটনা আর ঘটেনি।

আরো চারটি নেপোলিনীয় কোড ছিলো। এর দুটি গৃহীত হয় সাম্রাজ্যের যুগে, অপরাধের বিচার ও শাস্তি প্রদানের জন্য। ফলে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার প্রভাবে এদুটি বৃহদংশে বিকৃত রূপ লাভ করে। বর্বরসুলভ শাস্তির দীর্ঘ তালিকা (সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ অন্তর্ভুক্ত) থেকে দেখা যায় যে, শাস্তিদানের বিধি (Penal Code) প্রণেতারা যে যুগের সুমহান চিন্তাধারার পরিচয় দিতে পারেন নি। কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর একই দোষে দুষ্ট। তবে এক্ষেত্রে মাত্রাটা একটু মৃদু। যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রকাশ্য বিচার এবং জুরির সুবিধা প্রদান করা হয়, তবে বিপ্লবের সুফল এই সুবিধাগুলি অন্যান্য ব্যবস্থা থাকার দরুন ভোগ করা যেত না। এই

অন্যান্য ব্যবস্থা ধার করা হয় পূর্বতন সমাজের আইনবিজ্ঞান এবং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য পরিচালনার প্রয়োজন থেকে। এগুলি দুর্বল ও নিরীহ ব্যক্তিদের অনুকূলে কাজ করেনি। এখানে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ব্যবস্থা রাখা হয় যে, জুরির সদস্যদের নিযুক্ত করবেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

আইন প্রণয়নের কাজগুলি যখন চলছিলো তখন নেপোলিয়নের মনে অপর একটি পরিকল্পনা বাসা বাঁধে। তাহলো সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে জেসুইট সংঘের মতো কঠোর নিয়মানুবর্তী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে তোলা। ইংল্যান্ডের জীবন ভাবনামুক্ত, সকলের লক্ষ্য আনন্দের পেছনে ছোটা, ভদ্রঘরের তরুণদের কাজ হলো ক্রিকেট ও স্কোয়াশ খেলা। পণ্ডিতের দল বলপূর্বক এদের মাথায় কিছুটা গ্রিক ও লাতিন রূপতত্ত্ব ঢোকাতে চেষ্টা করে। এই পণ্ডিতদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা স্বয়ং রাজা জর্জেরও নেই। সম্রাট নেপোলিয়ন এ সবের বিন্দুমাত্র মূল্যায়ন করেন না। জনগণের শিক্ষার ব্যাপারটা ব্যক্তির উদ্যোগ বা ধনী লোকের অনুদানের উপর নির্ভরশীল হবে, এটা তার কাছে রাজনৈতিক উন্মাদগ্রস্ততার নামান্তর। বেসরকারি বিদ্যালয় অবশ্যই থাকবে, কারণ যুদ্ধ চলাকালে চাপের সৃষ্টি হয়, তখন সরকারের পক্ষে শিক্ষা খাতে অর্থের যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। তবে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। আমোদ-প্রমোদ শিক্ষার অঙ্গ হতে পারে না। জীবনটা ছেলেখেলা নয়। তরুণদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য। আর একটি সামরিক সাম্রাজ্যে তরুণদের শেখাতে হবে রাষ্ট্রের সেবা করতে, রণক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে এবং মৃত্যুবরণ করতে। সবই করতে হবে রাষ্ট্রের জন্য।

উল্লিখিত আদর্শগুলি বাস্তবায়নের জন্য ১৮০৮ সালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে পুরোপুরি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত এবং রাষ্ট্রের সহযোগী। এই প্রতিষ্ঠান জনশিক্ষার প্রতিটি শাখার সংগঠন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করবে। নেপোলিয়নের ইউনিভার্সিটি (কতিপয় স্থানীয় একাডেমিতে বিভক্ত) নানা রূপান্তরের ভেতর বিংশ শতাব্দীতেও অস্তিত্ব বজায় রাখে। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে গণতন্ত্রের ব্যাপার কমই ছিলো। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য কিছুই করা হয়নি, সে দায়িত্ব ব্যাপারে ব্যক্তি উদ্যোগের উপর নির্ভর করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় লিসেই (lycees) ও কলেজগুলি সম্ভাব্য দূরত্বের অর্ধেকও অতিক্রম করতে পারেনি। তাহলে নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ফ্রান্সের শিক্ষার ইতিহাস যদি উল্লেখ করবার মতো হয়, তবে তা এজন্য নয় যে তার সময়ে রাষ্ট্র শিক্ষার প্রতি উদার ছিলো, বরং সময়টা বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলেই উল্লেখযোগ্য। চ্যানেলের এক দিকে অমনোযোগী, মজা-লোটা ঈটনের ছাত্রবৃদ্ধ, তাদের নিয়মিত বেত্রাঘাত করা হয়, তাদের পড়ানোও হয় গা-ছাড়া ভাবে। অপর পারে লিসেইতে বিরাজ করে মঠের বিষণ্ণতা এবং সেনাছাউনির কঠোরতা, বাস করে নিরানন্দ ছাত্ররা, আটসাট ইউনিফরম পরিহিত, তাদের প্রত্যহ কুচকাওয়াজে যোগ দিতে হয়, তাদের নিয়ত থাকতে হয় সরকারি গোয়েন্দাদের নজরদারির মধ্যে, তাদের মাথায় জোর করে ঢোকানো হয় নানা তথ্য। আর সম্রাটের স্পার্টান লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে তাদের জীবন হয় নিরস, তারুণ্যের ফূর্তি বলতে তাদের মধ্যে কিছু থাকে না।

নেপোলিয়নের সুখ্যাত বিজ্ঞতার জন্য কলঙ্কই বলতে হবে যে, শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হলে তিনি অনেক কিছু অর্জন করতে পারতেন, অথচ তিনি তার কর্মপন্থা যেভাবে নির্ণয় করেন

ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যে সর্বাধিক মাত্রায় আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। লন্ডন নগরীতে গভীর আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করা হয় যে, এক দিকে সকল ফরাসি বন্দরে ইংরেজ জাহাজ ও পণ্য দ্রব্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে, অপর দিকে ফরাসিদের শক্তি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এই পরিবর্তনগুলির ব্যাপারে ইংরেজ মন্ত্রিসভা উদাসীন ছিলেন না। যখন তারা দেখে যে ফরাসিরা হল্যান্ডে সেনা ছাউনি ফেলেছে, তখন তারা কেপ ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা শুরু করে। ইংরেজরা যখন বুঝতে পারে যে, পিডমন্ট এবং ভালেস ফ্রান্স কুক্ষীগত করেছে, এবং সুইস ও সিসালপাইন প্রজাতন্ত্রগুলি নতুন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেছে, এতে এগুলি ফরাসি প্রভাবের আওতায় চলে এলো আগের থেকে অনেক বেশি, তখন তারা ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উত্থাপন করে। যখন ইংরেজরা জানতে পারে যে, ফরাসিরা প্রতিশ্রুত লক্ষ্যের জন্য স্পেনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে স্যান ডোমিনিগো নামক কৃষ্ণ প্রজাতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য, তখন তাদের মনে সংগত কারণেই সন্দেহ জাগে যে পশ্চিম গোলার্ধ সম্পর্কে নেপোলিয়ন বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এসবের চেয়েও আশঙ্কাজনক ব্যাপার হলো মিশর পুনরুদ্ধার এবং ভারতে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ এখনও প্রথম কন্সুলার বৃহত্তর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তার পরিকল্পনা হলো মিশর পুনরুদ্ধার এবং হিন্দুস্তান-ভূমি দখল। ১৮০৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি Monitcur পত্রিকায় কর্নেল সেবাস্টাইন লিখিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় যে প্রাচ্যে ফরাসিরা অত্যন্ত জনপ্রিয়, তারা অতি সহজে মিশর পুনরায় জয় করতে পারবে। এতে ইংরেজরা নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আশঙ্কাজনক সন্দেহের নিশ্চয়তা খুঁজে পায়। তবে প্রাচ্যে যদি পুনর্বার যুদ্ধের সূচনা হয় তাহলে ইংরেজদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য মালটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান বলে গণ্য হবে। কারণ পোতাশ্রয় হিসেবে মাল্টার গুরুত্ব খুব বেশি। তাছাড়া এখানকার দুর্গ সুরক্ষিত। অতএব আমিয়েনের সন্ধির শর্তাবলি সত্ত্বেও ইংরেজরা উক্ত দ্বীপ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে অস্বীকার করে। তবে কৌশলগত দিক থেকে ইংরেজদের এই সিদ্ধান্ত ছিলো ত্রুটিপূর্ণ। যদিও নেপোলিয়নের প্রাচ্য নীতির ভয়ে রাশিয়া এবং তুরস্ক ইংরেজদের এই কাজটি করার জন্য আহ্বান জানায়। তবে ইংরেজদের উপর যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়, আর ইংরেজরা সে ক্ষেত্রে সন্ধির শর্ত পালনে রাজি না হয় তাহলে তাদেরকে কি অভিযুক্ত করা চলবে? নেপোলিয়ন গোপনে জেনারেল ডেকেনকে (Decaen) যে নির্দেশ দেন তাতে দেখা যায় যে, তিনি ভারতে ফরাসি প্রভাব সম্পূর্ণ করবার জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

যুদ্ধে বড়ো ধরনের কোনো আঘাত হানার আগেই ফ্রান্সে বিরাট আকারে শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা হয়। ফরাসি জনগণ নিঃসন্দেহে ইচ্ছা পোষণ করে যে, যেহেতু নেপোলিয়নের শাসন ফ্রান্সের জন্য নানা সুবিধা, বড়ো মাপের সেতুলি, বয়ে এনেছে, অতএব তার শাসন ব্যবস্থাকে জ্যাকবীনদের হিংস্রতা এবং রাজতন্ত্রীদের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। জ্যাকবীন এবং রাজতন্ত্রীদের তরফ থেকে বিপদের মাত্রাটা এখনো তীব্র। কিন্তু ওঁদের বিদ্রোহ দমন করার পর ঐ দুটি পক্ষের প্রতিক্রিয়া ষড়যন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। তারা এখন চায় নেপোলিয়নকে হত্যা করতে, বোমার আঘাতে কিংবা সশস্ত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাধ্যমে। ১৮০০ সালে রাজতন্ত্রীরা একবার অনুরূপ প্রচেষ্টা চালায়। তবে তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আরো একবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এই প্রচেষ্টা ছিলো ব্যাপক, কিন্তু প্রচেষ্টার সমন্বয়ের অভাব

ছিলো। কারণ এবার ষড়যন্ত্রে শুধু জর্জ কাদুদলের মতো চরম রাজতন্ত্রী যোগ দেন না, মোরো এবং পিশেগ্রুর মতো প্রজাতন্ত্রের প্রাসঙ্গ সমরনেতাগণও অংশগ্রহণ করেন। নিম্ন পর্যায়ের কিছু মন্ত্রী এই ষড়যন্ত্রের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সাহায্য করেন এবং নিলজ্জ ভাবে। এটি ঘটে ১৮০৩ সালের শরৎ ও শীতকালে এবং পরবর্তী বছরের বসন্তকালে। নেপোলিয়নকে রক্ষা করে তাঁর পুলিশ বাহিনী এবং কূটকি অপরাধিগণ (agents-provocateurs)। নেপোলিয়ন জানতেন সুখ্যাত প্রজাতন্ত্রী সৈনিকদের সুকৌশলে রাজতন্ত্রী জালে বাঁধা হয়েছে, এই জাল রচনা করেছেন কঁৎ দার্তোয়া তার ইংল্যান্ডের আশ্রয়স্থলে বসে, মোরু কথা বলেছেন পিশেগ্রুর সঙ্গে, নরমাদি ও ব্রিটানিকে বিদ্রোহে শরিক হওয়ার জন্য উস্কানি প্রদান করা হবে, সর্বোপরি এই ষড়যন্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটবে কোনো এক বুরবঁ প্রিন্সের ফরাসি ভূমিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে।

কে হতে পারেন এই বুরবঁ প্রিন্স? দেখা গেল যে কদঁ রাজবংশের সর্বশেষ প্রতিভূ Duc d' Enghien ১৮০৪ সালের মার্চ মাসে ফ্রান্সের সীমান্ত সংলগ্ন বাডেনের এটেনহেইমে অবস্থান করছেন। নেপোলিয়ন তার প্রাণ সংহারের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। যদিও মোরু, পিশেগ্রু এবং জর্জ-কে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে, ফলে সকল আসন্ন বিপদ কেটে গেছে, তবু এই নির্দোষ যুবককে (নির্দোষ এজন্য যে, নেপোলিয়ন জানতেন d' Enghien-এর ষড়যন্ত্রে কোনো হাত ছিলো না) অপহরণ করে টেনে-হিচড়ে ভিসেনেতে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং সেখানেই ১৮০৪ সালের ২১শে মার্চের ভোরবেলা তাকে তাড়াহুড়ো করে এবং গোপনে গুলি করে হত্যা করা হয়।

হিমশীতল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সঙ্গে এই জঘন্য অপরাধ করে নেপোলিয়ন কাঙ্ক্ষিত ফল পান। অতঃপর কোনো বুরবঁ প্রিন্স নেপোলিয়নকে হত্যার ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করেন নি, প্রজাতন্ত্রীরাও তাকে আর আত্মগোপনকারী রাজতন্ত্রী বলে সন্দেহ করে নি। ঐ নির্দোষ তরুণ প্রিন্সের রক্ত প্রমাণ করে যে প্রথম কন্সুল রাজহন্তাদের কাতারে সামিল হয়েছেন। এমনকি শক্ত জ্যাকবাঁপন্থীরাও অনুভব করেন যে একটি রাজবংশকে যে পরম্পরাগত ক্ষমতায় অভিষিক্ত করা হয়েছে তা পূর্বতন সমাজের সঙ্গে বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়েছে। সমানাধিকার নামক যে বিরাট বিজয় অর্জন করা হয়েছে তা আর বিপদগ্রস্ত নয়। অনেক রক্তের বিনিময়ে এই অধিকার অর্জন করা হয়। ২৩শে এপ্রিল জনৈক রাজহন্তা, কুরি (তিনি চরমপন্থী ছিলেন না), ত্রিবুনাতে পরম্পরাগত নীতি গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাব এমন একটি আকার লাভ করে যা একদিকে যেমন নেপোলিয়নের উচ্চাভিলাষের অনুকূলে যায়, অপর দিকে তেমনি মনঃপূত হয় সেই সব লোকদের যারা এখনো বিপ্লবী নীতিতে আস্থাশীল এবং রাজতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের ভয়ে নিদারুণ আতংকগ্রস্ত। ১৮০৪ সালের ১৮ই মে সিনেটের আজ্ঞায় (Senatus Consultum) নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের সম্রাট পদবিতে ভূষিত করা হয়। এই পরিবর্তন কথিত সময়ের সকল শাসনতান্ত্রিক যন্ত্রের অনুমোদন লাভ করে। সিনেট অনুমোদন দেয়। জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের সম্মতি জানায়। মহামান্য পোপ তার সম্রাট পদ পবিত্র বলে আনুষ্ঠানিক রায় দেয়। কেউ সন্দেহ করেন নি যে এই ব্যবস্থা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো। কারণ হত্যার ষড়যন্ত্রের লাল বাতির অর্থ সবাই উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। বংশগতি ব্যর্থ হলে ফ্রান্স ও অরাজকতার মাঝখানে কেবল একজন লোকই সোজা হয়ে দাঁড়ান।

অনিবার্য কারণেই নতুন সম্রাটের কল্পনায় ভর করে শার্লমেনের নাম ও দৃষ্টান্ত। তিনি হবেন নতুন শার্লমেন, তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করবেন লাতিন ও টিউটনিক জনগোষ্ঠীগুলিকে, রাজ্য ও প্রিন্সিপালিটিগুলি স্বীয় বংশের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন, পোপকে গণ্য করবেন ব্যক্তিগত যাজক হিসেবে, জাকালো দরবারে সমাবেশ ঘটাবেন বংশানুক্রমিক অভিজাতদের (নতুন ধরনের)। শেষোক্তরা যেহেতু তার দয়ায় মর্যাদাবান হবে, অতএব তারা সিংহাসনের নিরাপত্তা বিধান করবে। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তিনি বলেন, "আমি বিচ্ছিন্ন বোধ করি, ফলে নিরাপত্তা নামক নোঙরগুলি স্থাপন করি চার দিকের গভীর জলে।" তবু প্রতিটি নোঙর ছিলো ভিয়েনার জন্য চ্যালেঞ্জস্বরূপ, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যিক মর্যাদা বৃদ্ধির সোপান, মিলানে লোম্বার্ড রাজমুকুট ধারণের উপায়, শার্লমেনের নগরী আসেনে ভ্রমণের সুযোগ। এই ভ্রমণের কারণ হলো রাইনল্যান্ডের নতজানু আনুগত্য পরীক্ষা। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তাচলগামী। আরো পরিষ্কার যে, জার্মান অট্টালিকা থেকে নিরর্থ রাজনৈতিক মাকড়শার জাল নতুন শার্লমেনের ঝাড়ুর আঘাতে মুছে গেছে, ১৮০৪ সালে। ইতিমধ্যে দুই বছর আগে সৃষ্ট নতুন বংশানুক্রমিক সাম্রাজ্য, ১৯১৮ সালে ধ্বংস হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট, বিপর্যয়কর পরাজয়ের আস্বাদন লাভ করে।

'তৃতীয় জোটের' যুদ্ধ সংগঠিত হয় (১৮০৪), এক পক্ষে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, সুইডেন এবং নেপলস, অপর দিকে ফ্রান্স এবং তার উপগ্রহ স্পেনের মধ্যে। জোটের স্থপতি ছিলেন উইলিয়াম পিট। তিনি স্থির করেন যে, যুদ্ধের পর এবং যুদ্ধে জয়ী হলে ইউরোপে শান্তি বজায় রাখার জন্য কংগ্রেস আহ্বান করে ফেডারাল সিসটেম কায়েম করবেন। নেপোলিয়নের ভাবনায়ও একটা কিছু করার পরিকল্পনা ছিলো। তিনি পরিকল্পনা করেন যে, ইউরোপকে আলোকিত কিন্তু পরাধীন জাতিগোষ্ঠীগুলির সাধারণতন্ত্র (Commonwealth) হিসেবে পুনর্গঠন করা হবে (ফরাসি আধিপত্যের তদারকিতে) ; আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইউরোপের ঐক্যের প্রতি অনুরাগী অনেকে এখনও দুঃখ প্রকাশ করেন যে নেপোলিয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি।

এবার যুদ্ধাভিযান শুরু হবে ইংল্যান্ড আক্রমণ এবং বিজয়ের মাধ্যমে। এই দ্বীপটি অতি সন্নিকটে, অথচ কি রহস্যময়! নেপোলিয়ন ভেবেছিলেন এই দ্বীপে পদসঞ্চার করে তিনি পদদলিত লোকদের সাক্ষাৎ পাবেন। ফরাসি মুক্তিসেনারা ইংল্যান্ডের মাটিতে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা তৃতীয় জর্জের অত্যাচারী শাসন সমূলে উৎপাটনের জন্য দারুণ উৎসাহী বোধ করবে। ফরাসি সহায়তায় আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা যেমন এ কাজটি আগে করেছে। সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়ন বলেছিলেন, লন্ডনের সাধারণ মানুষেরা (Canaille) নিশ্চয় তাকে অভ্যর্থনা জানাতেন, সবার করতালির ভেতর তিনি ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডে প্রজাতন্ত্র গঠন করতে সমর্থ হতেন। ইংরেজ জনগণের ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রবণতা এবং নবজাত শিল্পকারখানার শক্তি সম্পর্কে তিনি কিছুই অনুমান করতে পারেন নি। বৃটিশ সরকারের কঠোর শ্রমসাধ্য প্রস্তুতি তিনি যদি প্রত্যক্ষ করতে পারতেন, কিংবা ধারণা রাখতেন ইংরেজদের দেশাত্মবোধ সম্পর্কে, কিংবা অনুমান করতে পারতেন যে ইংল্যান্ড কখনো "ওলেরো কিংবা করসিকার মতো ফরাসি দ্বীপ" হবে না। উপরন্তু চ্যানেল অতিক্রম করা বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার ছিলো। আক্রমণ করতে গেলে তারা নিজেদের জন্য মহাবিপদ ডেকে আনতেন।

উক্ত সংকীর্ণ সাগর বস্তুত অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। উত্তর সাগর এবং চ্যানেল উপকূল বরাবর দুই লাখ দশ হাজার সৈনিকের বিরাট বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করে। চ্যানেল অতিক্রমের আদেশ পাওয়ার জন্য তাদের দুই বৎসর অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু কোনো রকম সংকেত পাওয়া যায়নি। নেলসন তুলোঁর রণতরীবহর চোখে চোখে রেখেছেন, কর্নওয়ালিস অবরোধ করছেন ব্রেস্ট। প্রতিটি ফরাসি কিংবা স্পেনীয় স্কোয়াড্রন লক্ষ্যবস্তুর দিকে কড়া নজরে রয়েছে। এই বাহিনী দক্ষতায় উন্নততর, সংখ্যায়ও অনেক বেশি। পক্ষান্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মনোবল বলতে কিছু নেই। দেখা যায় যে, একটা শর্ত পূরণ না হলে গোটা উদ্যোগ বিফল হতে বাধ্য এবং উক্ত শর্ত কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। নেপোলিয়ন চ্যানেলে একটি রণবহর প্রস্তুত রাখেন ক্ষুদ্র একটি বাহিনী পরিবহণ ও অবতরণ করার জন্য। এই রণবহরের অবস্থান বারো ঘণ্টার অধিক স্থায়ী হয়নি। যখন তার কাছে খবর পৌঁছে যে (১৮০৫ সালের আগস্ট মাসে) ফরাসি-স্পেনিশ নৌবাহিনীর অধিনায়ক ভিলেনিউভ ক্যাডিজ পোতাশ্রয়ে ফিরে গেছেন তখন নেপোলিয়ন সকল আশা পরিত্যাগ করেন। বুলনের যে কলাম এখনও তার বিরাট উচ্চাভিলাষের স্মারক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, তা একই ইংরেজ নাবিকদের বীরত্বব্যঞ্জক সজাগ দৃষ্টিরও স্মারক। এই নাবিকরা স্বীয় অবস্থানে অনড় থেকে প্রায় পচা বিস্কুট, শুটকি মাংস আহার্য হিসেবে গ্রহণ করে। আবহাওয়ার পরিবর্তনশীল অবস্থানও তাদের টলাতে পারেনি। তাদের লক্ষ্য ইংল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে সেই সঙ্গে রক্ষা করতে হবে গোটা ইউরোপের স্বাধীনতা।

অক্টোবরের এক ধূসর দিবসে যখন আক্রমণের সকল বিপদ বিদূরিত, আর নেপোলিয়ন বহুদূরে ব্যাভারিয়ার মর্মস্থলে অবস্থান করছেন, নেলসন তখন ভিলেনিউভের বিরুদ্ধে বিস্ময়কর বিজয় অর্জন করেন। যার পরিণতিতে যুদ্ধের অবসানে দেখা যায় যে সমস্ত জলভাগে বৃটিশদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব কায়েম হয়েছে, যে প্রভুত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো প্রায় অসম্ভব। ফরাসি-স্পেনিশ সমন্বিত নৌবাহিনীকে ক্যাডিজ পোতাশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসতে প্রলুব্ধ করে নেলসন গোটা বাহিনীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। কিন্তু ট্রাফালগারে বিজয়ের কারণে ফরাসি এবং স্পেনিশ উপনিবেশগুলি বৃটিশ নৌশক্তির করুণার উপর নির্ভরশীল হলে, বৃটিশ জাতির জন্য কোনো আনন্দ-বার্তা বহন করেনি। নেলসন যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন, অপর দিকে ম্যাকের অধীনে একটি শক্তিশালী অস্ট্রীয় বাহিনী (জেনারেল ম্যাকের কাছে বিরাট প্রত্যাশা ছিল) মাত্র একদিন আগে উলমে আত্মসমর্পণ করে (২০ অক্টোবর, ১৮০৫ সাল), ফরাসি বাহিনী তাকে ঘিরে ফেলেছিল।

মহাদেশীয় অবরোধ

মধ্য ইউরোপে ফরাসি আধিপত্য। নেপোলিয়নের কূটনীতি। তিলসিট। মহাদেশীয় অবরোধ। ইংলন্ডের সমস্যা। পর্তুগাল সঙ্গে বিবাদ। স্পেনীয়দের হস্তক্ষেপ। স্পেনীয় যুদ্ধের গুরুত্ব। বুরবন স্পেনের রাজতন্ত্র অনুবাদ। স্পেনীয় উদারবাদের উদ্ভব। ১৮১২ সালের শাসনতন্ত্র।

নেপোলিয়নের জলভাগের পরিকল্পনা চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়। কিন্তু তার পরই ক্রমান্বয়ে একাধিক বিজয় আসে উলম ও অস্টারলিৎস, জেনা এবং ফ্রিডল্যান্ডে। এতে প্রথমে অস্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়া বাধ্য হয় চরম অবমাননাকর শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করতে। অতঃপর তিলসিটে নেপোলিয়ন এবং রুশিয়ার আলেজান্ডারের ভেতর বোঝাপড়ার মাধ্যমে মধ্য ইউরোপে ফরাসি সাম্রাজ্যের আধিপত্য কায়েম হয়। আমরা ভাবি, ইতিহাসে আজগুবি কোনো ঘটনা ঘটার সুযোগ নেই। কিন্তু ১৮০৫, ১৮০৬ এবং ১৮০৭ সালের যুদ্ধাভিযানের দরুন রাজনৈতিক দৃশ্যপটের উপর তার প্রতিক্রিয়ায় যে আকস্মিকতা ও সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করি তাকে আজগুবি বলেই মানতে হয়। অন্যান্য ঘটনার মতোই নেপোলিয়ন তার বিরুদ্ধ পক্ষের সামরিক কৌশলগত একাধিক ভুল থেকে সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হন। এই ভুলগুলির মধ্যে যে ভুলটি ছিল গুরুতর তা হলো : প্রুসিয়া যুদ্ধে শরিক হওয়ার আগেই এমনকি নেপোলিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য হুমকি সৃষ্টি করবার মতো অবস্থানে পৌছার আগেই, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া অস্টারলিৎসে শত্রু পক্ষের মুখোমুখি হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসে। এ ধরনের সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচার-বিবেচনার ভুল তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয় অপর একটি অসুবিধা। অন্যান্য জোটের মতো এই জোটেও একটা মারাত্মক দুর্বলতা ছিল। এই দুর্বলতার উৎস হলো নেতৃস্থানীয় মিত্রবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ। প্রুসীয় এবং অস্ট্রীয়দের মধ্যে মৈত্রীভাব বলতে কিছু ছিলো না। ১৭৯৫ সালে নিজেদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাহার করে নেবার পর, প্রুসিয়া, তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ামের দুর্বলচিত্ত শাসনাধীনে স্থির করে যে শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষতা নীতির বদলে সে যতটুকু সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হয়েছে তা বিপদের মুখে ঠেলে দেবে না। অতঃপর শুধুমাত্র রুশ জারের বিশেষ চাপে এবং রাইন বাহিনী দক্ষিণ-উত্তর দিকে উলম অভিমুখে অগ্রসর হতে গিয়ে তার ভূ-খণ্ডের মর্যাদা লঙ্ঘন করায় সে সশস্ত্র নিরপেক্ষতার নামে কিছুটা বিরুদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করে। তবে ততক্ষণে বড়ো বেশি বিলম্ব হয়ে গেছে। অস্টারলিৎসে অস্ট্রীয়রা ধরাশায়ী হয়, অথচ প্রুসীয়রা আঘাত করার জন্য মোটেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেনি।

এই চোখ ধাঁধানো বিজয়ের বছরগুলিতে নেপোলিয়ন কূটনীতির অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। তবে তার কূটনৈতিক চালে গুরুতর ত্রুটিও ছিল। ফ্রান্সের একজন বন্ধুর জরুরি দরকার। তালেরাঁ ছিলেন সৎ ইউরোপীয়ান, কূটনৈতিক হিসাব-নিকাশ তিনি খুব ভালো বুঝতেন। তিনি পরামর্শ দেন যে অস্ট্রিয়া হতে পারে সেই

অতি দরকারি বন্ধু। উলমের ঘটনার পর, আবার অস্টারলিৎসের ঘটনার পর, এই বিজ্ঞ বিদেশ মন্ত্রী তার উচ্চাভিলাষী বন্ধুকে সমঝোতার পন্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। নেপোলিয়ন তার পরামর্শে কর্ণপাত করেন নি। তালেরাঁর পরামর্শ এই ছিল যে, অস্ট্রিয়াকে ইতালিতে এবং পশ্চিম ভূ-ভাগে ক্ষতি স্বীকার করতে বলা হবে, অতএব তাকে বলকান অঞ্চলে কিছুটা সুবিধা দেয়া যেতে পারে। এতে তার ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে যাবে। নেপোলিয়ন কোনো পরামর্শ শোনার পাত্র নন। এমনকি ১৮০৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বরের অঙ্গছেদকারী প্রেসবুর্গ সন্ধি, যার অধীনে অস্ট্রিয়া হারান তিন মিলিয়ন (তিরিশ লক্ষ) অধিবাসী এবং তার অনুগত টাইরোলিস ব্যাভারিয়ার কাছে হস্তান্তর করা হয়, তা নেপোলিয়নের বিচারে ছিল অতিরিক্ত উদার ব্যবস্থা। পরাজিত শত্রুর অনুকূলে তোষণ-মূলক কিছু করতে তিনি নারাজ। তিনি জানেন শুধু বর্ধমান মাত্রায় তাদের গ্লানিতে নিমজ্জিত করতে। এতে পরাজিত শত্রুর প্রতিশোধস্পৃহা কেবল প্রবল থেকে প্রবলতর হয়।

প্রুসীয়দের যে গ্লানিকর অবস্থানে ঠেলে দেয়া হয় তা ছিল অধিকতর গুরুতর প্রকৃতির। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একটা জাতির জন্য এটা কখনোই সুখকর হতে পারে না যে সে বিদেশী শক্তির চাপে বাধ্য হবে বন্ধুস্থানীয় কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্র লুণ্ঠন করতে, উপরন্তু যে রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের কোনো ব্যাপারে বিবাদের সূচনা হয়নি। অথচ অস্টারলিৎসের পর এভাবে প্রুসিয়াকে আত্মমর্যাদা বিসর্জনে বাধ্য করা হয়। নেপোলিয়ন প্রুসিয়াকে হ্যানোভার দখল করতে এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলেন (শয়েনব্রানের সন্ধি, ১৫ ডিসেম্বর, ১৮০৫)। মর্যাদাবান প্রুসীয়দের জন্য এটা গ্লানিকর প্রস্তাব, আর কিছুকাল পর যখন জানা গেল যে গোপনে হ্যানোভার রাজ্য ইংল্যান্ডের হাতে তুলে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, তখন তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ামের সরকারও এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ অমর্যাদায় কুঁচকে যান। অতঃপর প্রুসিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং জেনা ও অয়েরস্টাড্টের (Auerstadt) রণাঙ্গনে পরাস্ত হয়।

তিলসিটে (৮ জুলাই, ১৮০৭) বিজেতা, রানী মেরি লুইসার বাঙ্ময় অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও, সর্বোচ্চ জরিমানা আদায় করেন, তার সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তবে সম্পূর্ণ বিনাশ করেন নি। পূর্বাঞ্চলে স্যাক্সনির রাজার অধীনে নতুন ডাচি অব ওয়ারস এবং পশ্চিম ভূ-ভাগে জেরোম বোনাপার্টের অধীনে ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য সজ্জিত করা হয় লুণ্ঠিত কয়েকটি প্রুসীয় প্রদেশের সাহায্যে। লক্ষ্য হলো, পরাজিত শত্রু প্রুসিয়া যেন আর মাথা তুলতে না পারে। ক্ষতিপূরণের বিরাট বোঝা, ব্যয়বহুল দখলদার বাহিনী, দেশীয় সশস্ত্র বাহিনীর সীমা কঠোরভাবে বেঁধে দেয়া, এই দৃঢ়চিত্ত এবং সাহসী জাতির পরাধীনতা সম্পূর্ণ করে। সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়ন নমনীয়তা প্রদর্শনের জন্য অনুতপ্ত বোধ করেন, বিজেতার অবাস্তব বিভ্রান্তিবশত জোর দিয়ে বলেন যে, একটি পরাস্ত জাতিকে স্থায়ীভাবে ধ্বংস করা সম্ভব।

ইতিমধ্যে প্রথম আলেকজান্ডার, অমায়িক, উৎসাহী, তিলসিটের নবলব্ধ বন্ধু নেপোলিয়নকে কিছু সুবিধা প্রদানের জন্য প্রস্তাব করেন। আলেকজান্ডার যে ধরনের বাস্তবিক সুবিধার প্রস্তাব করেন তা অস্ট্রিয়া কিংবা প্রুসিয়ার সঙ্গে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পাওয়া যাবে না। রুশ জার প্রকাশ্যে নেপোলিয়নের অর্জনগুলি স্বীকার করেন এবং চুক্তির গোপন অনুচ্ছেদগুলির আলোকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে ইংল্যান্ড যদি রাশিয়ার মধ্যস্থ মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে মহাদেশীয় অবরোধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন, উপরন্তু

ডেনমার্ক, সুইডেন, পর্তুগাল এবং অস্ট্রিয়াকে বাধ্য করবেন ইংরেজদের বাণিজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে। এই বড়ো শক্তির সাহায্যে, নেপোলিয়নের প্রত্যাশা জাগে, এবার তিনি লন্ডনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন। তিনি এখন সৌভাগ্যের শীর্ষ স্পর্শ করেছেন। হাজারটা হৃদয় থেকে তিনি বিস্ময়করভাবে মুছে দিয়েছেন ফ্রিডল্যান্ডে বিরাট বিজয় অর্জনের জন্য। অস্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়ার স্থান এখন তার পদতলে। রাশিয়া তার মিত্র। পিট কবরে শেষ শয্যা গ্রহণ করেছেন। ঐ দ্বীপবাসীরা ডেনিস অথবা পোর্তুগীজদের মতো মানুষের অধীনে কি তার শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবে?

কিন্তু ঐ দ্বীপবাসীদের নেপোলিয়নের প্রত্যাশা পূরণের মোটেই আগ্রহ নেই। তাদের অবস্থা সম্পর্কে টিলসিটের গোপন অনুচ্ছেদগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে পোর্টল্যান্ড মন্ত্রীসভার তরুণ বিদেশ মন্ত্রী জর্জ ক্যানিং শত্রুপক্ষ দ্বারা কুক্ষীগত হওয়ার আগেই কোপেনহেগেনের ডেনমার্ক নৌবহর কব্জা বা আটক করেন। একটা দুর্বল ও নিরীহ জাতির উপর নির্মমভাবে আক্রমণ পরিচালনা করে জর্জ ক্যানিং ট্রাফালগারে নেলসনের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করলেন। একই সঙ্গে নিশ্চিত করলেন সামুদ্রিক জলভাগে স্বীয় দেশের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য।

এখন থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের এক মাত্র অস্ত্র হলো মহাদেশীয় অবরোধ। এটি করতে হলে ইতালি এবং স্পেনের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম একান্ত জরুরি। নচেৎ অবরোধ মোটেই কার্যকর হবে না। এই দুটি লাতিন দেশের মধ্যে ইতালিকে নিয়ে সমস্যা খুব বেশি হবার কথা নয়। তবে স্পেন একটি মূর্তিমান সমস্যা। এখানে হিংস্র এবং একগুয়ে প্রকৃতির জাতীয়তাবাদ লক্ষ্য করা যায়। নেপোলিয়নের দেহে ইতালীয় রক্ত, তবে ভাষা ইতালীয়। অতএব ইতালীয় জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য। যদিও এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ রয়েছে। তবু তারা জাতীয় গর্বের ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করতে পারে না। উপরন্তু ইতালি দীর্ঘকাল যাবৎ উত্তরাঞ্চলের আক্রমণের শিকার হতে অভ্যস্ত। স্পেনীয়দের এই অভিজ্ঞতা নেই। ফরাসি শাসন যদি বিদেশী শাসন হয়, তাহলে পূর্বেকার অস্ট্রীয় এবং স্পেনীয় শাসনও ভিন্ন কিছু ছিলো না। বরং ফরাসি শাসন সমপ্রকৃতিসম্পন্ন। লোম্বার্ডির কর্মব্যস্ত শহরগুলিতে ফরাসি বিপ্লবের প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা অনেকে গ্রহণ করেছে এবং তা ঘটেছে ইতালির সমভূমিতে বোনাপার্টের বাহিনীর প্রবেশের আগেই। ফলে ইতালি নেপোলিয়নকে প্রতিরোধ করার জন্য নৈতিকভাবে প্রস্তুত ছিলো না। তার না ছিলো জাতীয় রাজতন্ত্র, না ছিলো জাতীয় সেনাবাহিনী, এমনকি জাতীয় ঐতিহ্য বলতেও কিছু ছিলো না। উত্তরাঞ্চলে অস্ট্রীয় প্রতিরোধের ক্ষমতা একবার ভেঙে গেলে (মারেংগো এবং অস্টারলিৎসে বিপর্যয়ের দরুন বস্তুত তাই ঘটে) নেপলসের বুরবঁ রাজাকে উচ্ছেদ করতে বিন্দু মাত্র বেগ পেতে হয়নি, ফ্লোরেন্স এবং রোমে ফরাসি সরকার প্রতিষ্ঠা করতেও দেখা যেতনি কোনো জটিলতা। ইতালীয় বন্দরগুলিতে বৃটিশ পণ্য অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান করতে গেলে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। কারণ, উদাহরণত, বৃটিশ সহায়তায় সিসিলি থেকে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। তবু প্রতিবন্ধকতা অপসারণের মতো ক্ষমতা নেপোলিয়নের কব্জায় ছিলো। গুরুতর যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা ছিলো নৈতিক। ইতালীয় অবরোধ সাময়িকভাবে কার্যকর করতে হলে পোপের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়বে। একে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির বিচারবোধের ত্রুটিই বলতে হবে যে,

নেপোলিয়ন জানতেন, নেপোলিয়ন বুঝতেন, ক্যাথলিক অনুভূতির সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হবে ; অথচ তিনি ভ্যাটিক্যানের নিরপেক্ষতা উপেক্ষা করে পোপকে বিতাড়িত এবং আটক করেন, পোপের ভূখণ্ড করেন কুক্ষীগত, এবং ফরাসি সাম্রাজ্যের দেপার্তমঁ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করেন। ভূমধ্যসাগরীয় জাতিগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ইতালীয়রা সম্ভবত ছিলো সবচেয়ে কম ধর্মানুরাগী, তবে পোপতন্ত্র তাদের দেশের জন্য অন্যতম জাতীয় গৌরবের ব্যাপার, ফলে তারা এই মর্যাদা হ্রাসের জন্য দারুণ ক্ষুব্ধ হয়। নেপোলিয়ন যতগুলি মারাত্মক ভুল করেন তার মধ্যে গুরুতর ভুল এই ছিলো যে নিতান্ত খেয়ালবশত পোপের ভূখণ্ড এবং রোমান ঐতিহ্যের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেন। এতে শুধু ইতালিতে নয়, সমগ্র বিশ্বে তার ক্ষমতার কাঠামো নড়বড়ে হয়ে যায়।

পোপের সঙ্গে এই তীব্র বিবাদ যখন তীব্রতর হয়েছে, সে সময় তিনি স্পেনের বিরুদ্ধে আক্রমণের সূচনা করেন। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে স্পেন ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মানুরাগী দেশ, ধর্মীয় সংস্কারের ছোঁয়া এই দেশটিকে আন্দোলিত করেছে সবচেয়ে কম এবং যদিও এই দেশটির সরকার দুর্বল, গৌরববিহীন, দেশে সেনাবাহিনী বলতে কিছু নেই, তবে জনগণ দারুণ অহংকারী এবং বিকট প্রকৃতির দেশানুরাগী। নেপোলিয়ন এই কাজটি করেন, অথচ তিনি নিশ্চয় জানতেন আইবেরীয় দেশের ভূ-প্রকৃতি এবং আবহাওয়া কেমন, কিভাবে স্পেনের পর্বতমালা এবং নদীপথ উভয় দিক থেকে আক্রমণকারীর জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মধ্য স্পেনের কোথাও চলে অসহনীয় তাপপ্রবাহ, কোথাও আর্কটিক বায়ুর আঘাতে হিমশীতল। কোনো বৃহৎ বাহিনী এই অঞ্চলে টিকতে পারবে না যদি তাদের দরকারি সামগ্রীর সরবরাহ নিয়মিত না হয়। তবে সূর্যের তাপ ও তুষার ঝড়, নদী, পর্বত ও পড়োজমির চেয়েও গুরুতর প্রতিবন্ধকতা লুক্কায়িত ছিলো দেশের জনসাধারণের মনস্তত্ত্বে। স্পেনীয়রা সাধারণ ইউরোপীয় জীবন থেকে নিজেদের গুটিয়ে রাখে। তাদেব আদর্শ, চিন্তা-ভাবনা এবং সামাজিক প্রথা একেবারে ভিন্ন। তাদের উদাসীনতা, আধা গর্ব, আধা শ্রমবিমুখতা জাগতিক উন্নতির বিপক্ষে কাজ করেছে। এ বিষয়টা অন্যত্র বুদ্ধিজীবীদের কৌতূহল জাগ্রত করবে। দেশের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র চাষাবাদের অধীনে আনা হয়েছে। মহাসাগরের ওপারে রয়েছে বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। অথচ স্পেনীয়দের কোনো বাণিজ্যিক নৌবহর ছিলো না। এমন কি ভূমধ্যসাগরীয় পরিবহণ বাণিজ্য বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়া হয়। সর্বত্র অজ্ঞতা, দারিদ্র্য প্রায় সার্বজনীন। স্পেনীয় জনসংখ্যার প্রধান অংশ কৃষক ও সন্ন্যাসী, যাজক, ভবঘুরে, চোরাকারবারী এবং দস্যুদের দ্বারা গঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুক্তির দর্শন এদের মধ্যে কোনো প্রকার আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। বুরবঁ রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তৃতীয় চালর্সের মতো প্রবুদ্ধ রাজা, যিনি জেসুইটদের বিতাড়িত করেন, ষাঁড়ের লড়াই বন্ধ করে দেন, দেশের ঝিমিয়ে পড়া শিল্পকারখানাগুলিকে সদর্থে সচল করার চেষ্টা করেন, তিনি প্রজাদের প্রশংসা কুড়ানো তো দূরের কথা, নানাবিধ সংস্কার সাধনের জন্য বরং তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হন। ১৭৮৮ সালে তার মৃত্যু হলে কুসংস্কার অতি দ্রুত রাজদরবার ও সরকারি মহলে পুনরায় জায়গা করে নেয়। অবশ্য প্রদেশগুলি থেকে কুসংস্কার কখনো দূর হয়নি। তাহলে এটুকু উপলব্ধি করতে বিলম্ব হবার কথা নয় যে ফরাসি রেয়নেটের জোরে পোপ-বিরোধী দর্শন স্পেনে প্রয়োগ জনগণের কাছে কতোটা অগ্রহণযোগ্য। এই গর্বিত এবং গভীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীদের জাতির কাছে ইউরোপের নিয়ম-কানুন কিছু মাত্র পাত্তা পায় না। এদের

কাছে মাদ্রিদ বহরের চেয়ে নিকটবর্তী, প্রদেশের চেয়ে শহর নিকটবর্তী, আর বাকী পৃথিবীর থেকে নিকটবর্তী তাদের রাজা। নেপোলিয়নের ক্ষমতা তাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। গুস্টাবরাস একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ, সৈন্য সংখ্যা মাত্র আঠারো হাজার। অথচ তারা ফরাসি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করতে কিছুমাত্র ইতস্তত বোধ করেনি। দেশের সড়ক ব্যবস্থার কেন্দ্র মাদ্রিদ যে বছরের পর বছর ফরাসিদের দখলে ছিলো তাকে দক্ষিণের আন্দালুসিয়রা, পশ্চিমের পাহাড়িয়ারা, এবং উত্তরাঞ্চলের উপকূলবর্তী ক্যাটালোনীয়রা বিশেষ ব্যাপার বলে গণ্য করতে রাজী ছিলো না। স্পেনীয়রা সম্ভাব্যতা নিয়ে সতর্ক বিচার করে যুদ্ধে নামেনি। তারা ফরাসি জেনারেলদের দ্বারা প্রায়ই পরাস্ত হয়েছে, তবে ফরাসি মর্যাদায় বিহ্বল হয়নি। যদিও তাদের সৈনিকদের বন্দুক সংখ্যায় খুব বেশি ছিলো না, অশ্বারোহী বাহিনী ছিলো নাম মাত্র, তাদের মধ্যে অভাব ছিলো শৃঙ্খলার, তাদের নৈতিক সাহস ছিলো অনিশ্চিত, কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের জন্য তাদের দেশ ছিলো খুবই উপযুক্ত, ফলে শত্রু পক্ষকে হয়রানি করবে দক্ষতায় তাদের তুলনা কোনো জাতির সঙ্গে চলে না। ফরাসিদের প্রতিনিয়ত বাস করতে হয়েছে ঘরে, পলায়নে কুশলী এবং নাছোড়বান্দা প্রতিপক্ষের মাঝখানে। পিরেনিজ পর্বতমালা থেকে মাদ্রিদ পর্যন্ত সুদীর্ঘ যোগাযোগ কোনো সময় নিরাপদ ছিলো না ; প্রায়ই তাদের আক্রমোপনকারী স্পেনীয় বন্দুকধারীদের শিকারে পরিণত হতে হতো। গোপন আস্তানা থেকেও স্পেনীয়রা ফরাসিদের নাস্তানাবুদ করতো সুতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করে।

ফরাসি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। প্রথমে বিদ্রোহী হয় স্পেনীয়রা। এদের বিদ্রোহ নেপোলিয়ন বাহিনীর জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হয়। যেহেতু ইংল্যান্ডের ক্ষুদ্র স্থলসেনারা দাঁড়াবার মতো একটা জায়গা পেয়ে যায়, যেখান থেকে তারা শক্তি প্রয়োগের সুযোগ পাবে। যে মুহূর্তে বৃটিশ মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে স্পেন ও পর্তুগালকে সাহায্য করতে হবে, তার আগেই ইংরেজ বাহিনী ভেদতে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, হল্যান্ডে, দক্ষিণ ইতালিতে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে বিস্তর শক্তি ক্ষয় করে ফেলেছে। এই উদ্যোগগুলি যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি। এখন তাদের সামনে বিরাট দায়িত্ব। স্পেন ও পর্তুগালের সংগৃহীত সৈন্যের সাহায্যে তাদের ফরাসিদের তাড়িয়ে দিতে হবে পিরেনিজ পর্বতমালার উত্তরে। এক্ষেত্রে ইংরেজ সৈনিকরা শুধু শক্তিবত্তার পরিচয় দেয়নি, আইবেরীয় জাতিগোষ্ঠীগুলির প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করেছে।

এই যে বড়ো একটা সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হলো, ক্ষুদ্র ইংরেজ বাহিনী স্পেনে অবশ্য শক্তিক্ষয় করেনি, বরং স্থানীয় মিত্রদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশাল ফরাসি বাহিনীকে স্পেনে আটকে রাখতে সমর্থ হয়, এমনকি চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের পিরেনিজ পর্বতমালার ওপারে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়, তার জন্য সকল কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন একজন বিরাট সমরনেতা। আর্থার ওয়েলেসলি ইতিমধ্যে আসাইয়ের (Assaye) রণাঙ্গনে মারাঠাদের পর্যুদস্ত করেন। উপদ্বীপের যুদ্ধে তিনি প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে সাফল্যের জন্য সমরিক এবং কূটনৈতিক বিজ্ঞতার সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। এটি না করলে পর্তুগাল ও স্পেনের যৌথ শক্তি অতিম শত্রুর বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হতো না। তিনি প্রথমে যে কৌশল অবলম্বন করেন সেটিই ছিলো তার শেষ ইউরোপীয় যুদ্ধ জয়ের কীর্তি। ওয়াটারলুর মতো ডিমিয়েরোর বিজয় নির্ভর করেছে পদাতিক বাহিনীর উপর। তাদের বলা

হয়েছে অস্ত্রের মজুদ টিকিয়ে রাখতে হবে শেষ সময় পর্যন্ত। শত্রু পক্ষের অভ্যাভিযান ঠেকাতে হবে মজুত আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে। বৃটিশ বাহিনীর অবস্থানের উপর যে পুরো নির্ভর করা চলে তা ছিলো ওয়েলেসলির রণনীতির মূল কথা এবং উপদ্বীপীয় যুদ্ধের প্রধান শিক্ষা।

নেপোলিয়ন যেভাবে স্পেনে প্রবেশ করেন এবং যে আঘাত হানেন তার প্রকৃতি ও ফলশ্রুতি সম্পর্কে এখানে দুচার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

জেনার ঘটনার পূর্বে, প্রুসীয় বিজয়ের জোয়ার লক্ষ্য করে স্পেনের রানীর পুরুষ প্রিয়পাত্র এবং দেশের প্রকৃত শাসক গডয় (Godoy) সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ দেন: এই গভীর অবিজ্ঞতা নেপোলিয়ন মেকিয়াভেলীয়ান দক্ষতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন। তাৎক্ষণিক জরিমানা আদায়ের পরিবর্তে তিনি স্পেনকে বাধ্য করেন ফতেনব্লুতে একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে। এই সন্ধির শর্তানুসারে স্পেন পর্তুগালের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনায় যোগ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। পর্তুগালের সঙ্গে ইংরেজদের বাণিজ্য তখন অবাধে চলছে। ইংরেজদের নৌবহরও পর্তুগালের বন্দরে আশ্রয় লাভ করেছে। ইংরেজদের ভাণ্ডার এখন পর্তুগিজ দামি মদে পূর্ণ। কিন্তু অনায়াসে বিজিত পর্তুগাল ছিলো বৃহত্তর পরিকল্পনার মুখবন্ধ মাত্র। এটাই যথেষ্ট নয় যে পর্তুগিজ রিজেন্ট রাজধানী থেকে বিতাড়িত হবেন, এবং ব্রাজিল অভিমুখে সমুদ্রযাত্রা করবেন। নেপোলিয়ন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে বুরবঁ রাজকে স্পেন থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। পর্তুগালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুকূল অজুহাতে ফরাসি বাহিনী পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে, সীমান্তের দুর্গগুলি করায়ত্ত করে এবং মাদ্রিদ অভিমুখে অভিযান শুরু করে। ইতিমধ্যে প্রিয়পাত্রের বিরুদ্ধে ক্রোধ চরমে পৌছে, কারণ তিনি কাফের শত্রু সেনাদের প্রবেশের জন্য নগরের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আরানুয়েজে (Aranjues) দাঙ্গার সূচনা হয়। এটি ছিলো রাজা ও রানীর বসন্তকালীন নিবাস। যখন চারদিকে প্রচারিত হয় যে, রাজা ও রানী তাদের প্রিয় পাত্রকে নিয়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পলায়নের পরিকল্পনা করছেন, তখনই দাঙ্গা বাঁধে। দুর্দশায় পতিত চার্লস গডয়-এর জীবন রক্ষার জন্য সিংহাসন পরিত্যাগ করেন, সিংহাসনে বসানো হয় তার পুত্র ফার্দিনান্দকে। ইতিমধ্যে মুরা মাদ্রিদে পৌছে গেছেন, আর সমস্ত ঘটনা এখন নেপোলিয়নের করায়ত্তে। তিনি নতুন রাজাকে স্বীকৃতি প্রদান করতে অস্বীকার করেন, উপরন্তু চার্লসকে নির্দেশ প্রদান করা হয় সিংহাসন পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিতে। ঘটনাক্রমে স্পেনের গোটা রাজকীয় পরিবারকে, রাজা, রাণী, বৈধ উত্তরাধিকারীকে প্রলুব্ধ করে বেয়নে (Baynne) নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাদের এই ঘোষণা দিতে বাধ্য করা হয় যে তারা স্পেনের সিংহাসনের উপর থেকে সকল দাবি প্রত্যাহার করে নিলেন। শূন্য সিংহাসনে লুই আরোহণ করতে অস্বীকার করলে জোসেফ বোনাপার্ট এগিয়ে আসেন। মুরাকে পর্তুগাল কিংবা নেপলসের সিংহাসনে আরোহণ করতে আহ্বান জানানো হয়। তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে নেপলসের শাসন ভার গ্রহণ করেন।

স্পেনীয়রা ছিলেন রাজতন্ত্রী এবং যাজকভক্ত। তারা ছিলো খুবই পশ্চাদপদ, এজন্যই তারা বিনা বাক্যে চতুর্থ চার্লসের অযোগ্য স্বেচ্ছাচারতন্ত্র মেনে নেয়। এদিকে করটেস (সংসদ) অচল হয়ে পড়েছিলো, সংবাদপত্রের যুগের সূচনাই হয়নি। তাছাড়া যে দাঙ্গা ও ষড়যন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করে বেয়নের কুদেতা অনুষ্ঠানে নেপোলিয়ন সফল হন তা মূলত রাজতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি, উক্ত কুদেতার মূল লক্ষ্য ছিলো রাজকীয় প্রিয়পাত্রের ঘৃণীত প্রভাব। স্পেনীয়রা চার্লসের অযোগ্যতা, তার স্ত্রী মেরি লুইসার কদর্য

প্রসঙ্গগুলাবলি, কিংবা সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী ফার্দিনান্দের ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার দরুনও রাজতন্ত্রের প্রতি বিমুখ হয়নি। বেয়নে একটা উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা হয়, এতেও স্পেনীয়রা কিছুমাত্র আকৃষ্ট বোধ করেনি। জোসেফ বোনাপার্টের অধীনে একটি প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদী সরকার গঠনের সম্ভাবনাও তাদের নিরাগ্রহ কাটাতে পারেনি। জোসেফ বোনাপার্ট যদি দেবদূত হতেন কিংবা কথিত শাসনতন্ত্র হতো অনুপ্রেরণা সঞ্চারী তবু স্পেনীয়রা ফার্দিনান্দের প্রতি আদর্শিক অনুরাগ পরিত্যাগ করতো না। উপদ্বীপে যুদ্ধ চলাকালে এই কমবখ্‌ত প্রিন্স স্পেনীয়দের কাছে আদর্শ পুরুষ হিসেবে থেকে যান। ফার্দিনান্দ যে নেপোলিয়নের সঙ্গে দাসসুলভ আচরণ করেন, তিনি যে ঘৃণাই কাপুরুষতার পরিচয় দেন, তিনি স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন, তার মাথায় যে ঘিলু বলতে কিছু ছিলো না, তিনি তার বন্ধুদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এসব ব্যাপার একদম বিবেচনার মধ্যে আনা হয়নি। কারণ তারা অর্থাৎ স্পেনীয়রা কেবল একটা কথাই ভেবেছে যে ফার্দিনান্দ স্পেনীয় সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী। ফলত স্পেনে নেপোলিয়নের রাজত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফার্দিনান্দ সিংহাসনে বসতে সমর্থ হন। ঘটনাবলির এই পরিণতি ছিলো অনিবার্য।

তথাপি, ফার্দিনান্দের সঙ্গে পুরোনো স্পেন ফিরে এলেও, উপদ্বীপের যুদ্ধের সংঘর্ষ এবং দুরবস্থার কারণে দেশের ভেতর একটা উদারনৈতিক ও জাতীয় দল গড়ে ওঠে। রাজার অবর্তমানে স্পেনীয়দের নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে। তারা একটা কেন্দ্রীয় জান্তা বা কাউন্সিল গঠন করে। এই জান্তা বা কাউন্সিল ফরাসি দিগ্বিজয়ের জোয়ারের চাপে প্রথমে সেভিল, অতঃপর ক্যাডিজে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে কর্টেসের (সংসদ) সভায় একটা শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাদানুবাদের সূচনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মতো মৌলিক প্রশ্নে। ফলে দুটি পক্ষ বা দল দাঁড়িয়ে যায়। একটি পক্ষ পরিচিতি লাভ করে Liberales অপরটি Serviles হিসেবে। তবে এই যে রাজনৈতিক বিভাজন ঘটে তা গোটা উনিশ শতক জুড়ে স্পেনের রাজনৈতিক জগৎ বিভক্ত করে রাখে। ১৮১২ সালে শাসনতন্ত্রে বংশানুক্রিম রাজতন্ত্রের নীতি গ্রহণ করা হয়, ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ রাখে রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে। উপরন্তু শাসনতন্ত্রে সমুদ্র উপকূলবর্তী শহরগুলির চরমপন্থি মতামত স্থান পায়, কিছু কিছু সমরনেতার মতামতও গ্রাহ্য করা হয়, কিন্তু স্পেনের মধ্য অঞ্চলের কট্টর রক্ষণশীলতা স্থান পায়নি। সাব্যস্ত হয় যে ভোটাধিকার হবে সার্বজনীন, সংসদ হবে এক কক্ষ বিশিষ্ট, উপনিবেশ গুলি সংসদে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবে, ইনুকুইজিশন বিলুপ্ত করা হবে, এবং এই ধর্মীয় পুলিশ বাহিনীর সকল সম্পত্তিও রাষ্ট্রে বাজেয়াপ্ত হবে। বোঝাই যাচ্ছে শাসনতন্ত্রে প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থাগুলি পশ্চাদপদ স্পেনের জন্য অতিরিক্ত প্রাগ্রসর, ফলে এগুলি কোনোদিনই কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তথাপি স্পেনের ইতিহাসে এই উদারনৈতিক শস্ত্র দীর্ঘস্থায়ী গুরুত্ব লাভ করে। এটি কোনো দিনই সরকারি যন্ত্রে পরিণত হয়নি, তবে এটি বিদ্রোহের পতাকা হিসেবে কাজ করে। সর্ব-স্পেনীয় সংসদ গঠনে সহায়ক হয়। কর নির্ণয় করে, আইন প্রণয়ন করে, রাজা ও যাজকতন্ত্রের ক্ষমতাও সীমিত করে। ইউরোপের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল কোণ্ স্পেন থেকে 'উদারনৈতিক' শব্দ ইংরেজদের রাজনীতিতে জায়গা করে নেয়।

নেপোলিয়ন ও জার্মানি

নেপোলিয়নীয় সরকার। পুনর্জাগরণের পথে প্রুসিয়া। মুক্তিদাতা হিসেবে নেপোলিয়ন। ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চায় জার্মানদের অবদান।

জার্মানীর নেপোলিয়নীয় সরকার কঠোর ছিলো, তবে জার্মান জনগণের জন্য সেটি ছিলো কল্যাণকর পর্ব। জঞ্জালের পাহাড় পরিষ্কার করা হয়। কল্যাণকর তথা দরকারি অনেক ধারণা বিস্তার লাভ করে। যে সম্প্রদায়গুলি অসাড় আত্মনির্ভরতায় নিমজ্জিত ছিলো সেগুলি উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়ার দরুন কার্যকর সংস্কার ব্যাপারে ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উৎসাহী হয়। ১৮০৩ সালে প্যারিসে জার্মানির জটিল রাজনৈতিক ভূগোলের সহজীকরণ করা হয়। এই কর্মসূচির মধ্যে প্রধানত অন্তর্ভুক্ত ছিলো একশত বিশটি ক্ষুদ্র জার্মান রাজ্য নিয়ন্ত্রণ। এটি করতে হয় জার্মান প্রিন্সদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয় বলে। এই প্রিন্সরা ফরাসি বাহিনীর চাপে বাধ্য হয় রাইনের বাম তীরের দাবি প্রত্যাহার করে নিতে।

ইতিহাস কোনো অবস্থাতেই এই হীন স্বার্থ প্রণোদিত লেনদেনের ব্যাপারগুলি উপেক্ষা করতে পারে না। মধ্যস্থতা আইন (Act of Mediation) অনুসারে যে জার্মানির জন্ম হয় তা শাসন ও ঐক্যবদ্ধ করা সহজ ছিলো। ফলে এই নতুন জার্মানি তার পশ্চিমী প্রতিবেশির জন্য ভয়ানক রূপ পরিগ্রহ করে।

ব্যাপক আকারে নেপোলিয়নের জার্মানি সংক্রান্ত পরিকল্পনা চিরায়ত ফরাসি কূটনীতি অনুসরণ করে। ফরাসি সম্রাটের 'অভিভাবকত্বে' রাইন রাষ্ট্রসঙ্ঘ (confederation) গঠন করা হয় দুটি পরাস্ত ও ক্রুদ্ধ শত্রু অস্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে। এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোনো কোনো সদস্য সৃষ্টি হয় বিজিত এবং শত্রু ভূখণ্ড দ্বারা, কোনো কোনো সদস্য, যেমন ব্যাভারিয়া এবং ভুরটেমবার্গ, ছিলো রাইখের (Reich) পুরানো সদস্য। ঐ সময়ের পর জার্মানিতে যে পরিবর্তন আসে তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ এখানে মেলে যে অতি অনায়াসে সঙ্ঘের সূচনা করা সম্ভব হয় এবং জার্মান জাতীয়তার প্রতিকূল নীতির পক্ষে জার্মান প্রিন্সরাই ব্যাপক সমর্থন জানায়। তবে নেপোলিয়ন শাসকদের নানা ভাবে তুষ্ট করেন। ব্যাভারিয়া এবং ভুরটেমবার্গকে রাজতন্ত্র গণ্য করতে হয়। ব্যাডেন ডাচির মর্যাদা লাভ করে। ইম্পিরিয়াল পরিবারে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ারও সুযোগ ঘটে। উপরন্তু অস্টারলিৎস এবং জেনার পর গ্রান্ড আর্মির[১] বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো কোনো শক্তিশালী বাহিনী জার্মানদের মধ্যে রইলো না। তবে এইসব ঘটনার প্রকৃত ব্যাখ্যা ভীতি কিংবা দুর্নীতির মধ্যে খুঁজলে চলবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাভারিয়া এবং রাইনল্যান্ডের জনমত ছিলো ফ্রান্সের অনুকূলে। কারণ ব্যাভারিয়ার জনগণ দীর্ঘকাল যাবৎ অস্ট্রিয়াকে হুমকি হিসেবে দেখে আসছে। আর

---

১. নেপোলিয়নের বাহিনীর সুপরিচিত নাম। অনু

রাইনল্যান্ডের অধিবাসীদের প্রুসিয়ার প্রতি কোনো অনুরাগ ছিলো না। তবে নেপোলিয়নের ব্লাড ট্যাক্স নীতির দরুন অনুকূল মনোভাব নিদারুণ ঘৃণায় পর্যবসিত হয়। কার্যত অনুকূল মনোভাবের সময় অস্ট্রিয়া জার্মানিতে তার সুপ্রাচীন অগ্রগণ্যতা হারালে রাইনিশ কনফেডারেশনের কোনো প্রিন্স অশ্রু বিসর্জন করেন নি, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটার দরুনও কেউ শোক অনুভব করেন নি। প্রুসিয়ার মর্যাদা বিনষ্ট হলেও কারো মনে সহানুভূতি জাগেনি। এমন কি, ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্যে, যেখানে হেসিয়ান, হ্যানোভারিয়ান এবং ব্রুনসভিকারদের বলপূর্বক মিশ্রণ ঘটানো হয় নেপোলিয়নের আকর্ষণীয় অথচ লঘুচিত্ত অনুজ রাজা জেরোমের অধীনে, সেখানেও শ্রেষ্ঠ জার্মান পরিবারগুলি এগিয়ে আসে বিদেশী শাসকদের সহায়তা করার জন্য।

কেউ কেউ মনে করেন এতটা সমভার ও সংগঠিত জার্মান রাজ্য একটি অধিকতর সুস্থিত বিশ্বের অনুকূলে যাবে। উপরন্তু যেখানে প্রুসিয়া ওয়েস্টফেলিয়ান ও পোলিশ প্রদেশ দুটি থেকে বঞ্চিত, অস্ট্রিয়া হিসাবের বাইরে অবস্থিত, বা বিশেষ আকার প্রাপ্ত। সে যাই হোক শান্তি কালে এটি পরীক্ষিত হয়নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নের জার্মানি ছিলো ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার। ঔপনিবেশিক বাণিজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন, একই সঙ্গে ফরাসি বাজারগুলিতে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞার অধীন, বিদেশী দখলদার বাহিনী কর্তৃক উৎপীড়িত (এই বাহিনী লুণ্ঠন ও পরদ্রব্য আত্মসাতে অভ্যস্ত), লোকক্ষয় এবং অর্থের অভাবে বিপর্যস্ত, তবু জার্মানদের ক্ষমা করা যায় যদি তারা ফরাসিদের মিত্র বিবেচনার নীতি সংশোধন করে, যদি তারা বিদেশী শাসনের জোয়াল ছুড়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে চায়, এবং রাইনের প্রতিরক্ষার জন্য দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শুধুমাত্র ইহুদিরা, যাদের বস্তি (Ghetto) থেকে মুক্তি এবং সাধারণ জার্মান ভদ্রলোকের সমানাধিকার দেয়া হয়, তারা নেপোলিয়নের পতনে শোক অনুভব করে। এই নেপোলিয়নই তাদের মুক্তিদাতার ভূমিকা পালন করেন।

পরিশেষে যখন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হলো জার্মানিতে, দেখা গেল সে প্রতিক্রিয়ার গুরুভার বহন করছে প্রুসীয়ার জনগণ। এই রাজ্য এক সময় গোটা দেশের প্রতিটি কোণের সমর্থ মানুষদের আকর্ষণ করেছে, তারা যোগ দিয়েছে প্রুসিয়া রাজ্য গঠনকর্মে। এখন দেশের কতিপয় তেজদীপ্ত ও ভাবুক প্রকৃতির দেশানুরাগীর মনের গভীরে গেথে যায় জেনার ঘটনা। শানহর্স্ট ও ক্লাউজেহিবটৎস, স্টেন ও হার্ডার প্রুসিয়ার সমস্যা সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। তারা বুঝতে পারেন যে সমস্যাটা সামরিক বাহিনীতে সংস্কার প্রবর্তনের সমস্যা নয়। জাতীয় পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে। প্রুসীয়দের জাতিগতভাবে করতে হবে আত্মসচেতন। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে, এই চার জন ব্যক্তিত্বের বদৌলতে একটা দাস মনোভাবাপন্ন বাহিনী, একটি দাসমনোভাবপন্ন জাতি কিছুটা স্বাধীনতার মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

একটা সামরিক বিপর্যয়ের প্রকৃত পাঠ নৈতিক ক্ষেত্র থেকে প্রায়শ গ্রহণ করা হয় না। কেবল স্টেনের মতো প্রকৃত রাষ্ট্রবিদ উপলব্ধি করেন যে প্রুসিয়ায় সামরিক পুনর্জাগরণ ঘটাতে হলে প্রুসীয় শহরগুলিকে কিছুটা স্ব-শাসনের অধিকার দিতে হবে। তাছাড়া কৃষকদের সামাজিক অবস্থা ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া দরকার। স্টেন ফরাসিদের কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই ফরাসিরা পোল্যান্ড ও ওয়েস্টফেলিয়ার কৃষকদের মুক্তিদাতা। স্টেনও যে

ফরাসিদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন তাতে তার সুবিখ্যাত বিজ্ঞতা কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না।

অষ্টাদশ শতকের শেষে জার্মান সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা এই ছিলো যে, গ্যয়টে, যিনি ছিলেন নতুন জার্মান সাহিত্যের স্রষ্টা, তিনি না ছিলেন খ্রিষ্টান, না বাঁর, কিংবা দেশাত্মবোধে আপ্লুত। তিনি ছিলেন দীর্ঘায়ু। জীবন শুরু করেন ১৭৪৯ সালে, শেষ করেন ১৮৩২ সালে। জার্মানিতে যখন হিংসাত্মক এবং নিয়ত পরিবর্তনের যুগ চলছে, তিনি ছিলেন তার সমকালীন। সাত বছরের যুদ্ধের আরম্ভের সময় তিনি ছিলেন সাত বছরের বালক। পঞ্চদশ লুই-র রাজত্বের শেষ বছর তিনি লেখেন Götz Von Berlichingen, এর কিছু কাল পর স্বদেশের এবং বিদেশের পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে তুফান তোলেন 'হেবরথেবের দুঃখ (Dic leiden des jungen Werther) প্রকাশ করে। ফরাসি বিপ্লবের সূচনাকালে তার বয়স ছিলো চল্লিশ। তখন তিনি নেপোলিয়নের চেয়ে বিশ বছরের বড়ো এবং ইতিমধ্যেই ইউরোপের সবচেয়ে খ্যাতিমান সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। বিপ্লব ও সাম্রাজ্যের তুফান জার্মানির উপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যায়, অথচ তার মর্মরতুল্য দৃঢ়তা এতটুকুও টলেনি, জার্মান রাজ্যগুলির ভাগ্য ব্যাপারে সমান উদাসীনতা বজায় রেখেছেন। হিবেমার-এর ক্ষুদ্র রাজদরবারে রাজ কর্মচারী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনি ধ্যান-ধারণা নিভৃতে চর্চা করেছেন, অপরের লেখা পুস্তকাদি থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে হলে, (একঘেয়ে নিষ্প্রাণ জার্মান রচনাদি থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেন নি) অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছেন শেক্সপিয়রের বিশাল রোমান্টিক বিষয়বস্তু থেকে, ইতালি ও স্পেনের নাট্যকার ও কবিদের রচনা থেকে, শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী ও প্রাচ্যের সাহিত্য থেকে। জার্মান সংস্কৃতি থেকে তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নি, আর প্রুসীয়দের বর্বর জ্ঞানে ঘৃণা করতেন, ফলে তিনি নেপোলিয়নের প্রতিভা এবং কৃতিত্বকে অভিবাদন জানান। ফরাসি সম্রাট লিপজিগে পরাজয় বরণ করলে তিনি নিদারুণ হতাশ বোধ করেন। জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্যে কোনো প্রকার অবদান রাখেন নি।

অথচ গভীর অর্থে জার্মানির মুক্তিদাতাদের বাহিনীতে তার সমতুল্য ব্যক্তিত্ব একজনও ছিলেন না। গ্যয়টে তার বিশাল ও কৃতিত্বপূর্ণ গদ্য ও পদ্যের সাহায্যে জার্মান জনগণকে ফরাসি আদর্শ নির্বোধ ও দাসভাবাপন্ন অনুকরণের পথ থেকে মুক্ত করেন। এই দাস মনোভাব জার্মান জাতির জন্য বিরাট কলঙ্ক বিশেষ। তার গীতি কবিতা একজন প্রেমিকের আসক্তি থেকে সদ্য উদ্গত। তার গদ্য, প্রাঞ্জল, ভাবগম্ভীর, অভিজাত, কেজো জ্ঞানচর্চার উপযুক্ত বাহন, গভীর অনুধ্যানেরও উপযোগী, অযাচিত তত্ত্বজ্ঞান কিংবা অপক্ক ধারণা প্রকাশের প্রতিকূল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নয়, তিনি একই সঙ্গে চর্চা করেছেন শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য। তিনি কেতাব লিখেছেন আলোকবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে, চর্চা করেছেন প্রাচ্যের ভাষাসমূহ, আবিষ্কার করেন intermaxillary bone, বিজ্ঞানে প্রবর্তন করেন অনুমানের রীতি (art of divination), এটি সূক্ষ্ম পরিমাপের চেয়ে মূল্যবান। ফলে তার ধারণাদি ও নির্দেশনাগুলি ছিলো উন্নতমানের, যা পরবর্তীকালে অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। জার্মান সাহিত্যের মোটা দাগের ত্রুটিগুলির মধ্যে প্রধান ছিলো দুর্জ্ঞেয়তা, নিতান্ত পণ্ডিতিপনা, এবং লাগামহীন ভাবালুধর্মিতা। গ্যয়টে নিজেও অনেক ক্ষেত্রে নীরস, কিন্তু কখনো দুর্জ্ঞেয় নন, কখনো বিদ্যাভারনত, তবে কখনো পণ্ডিতিপনা তার মধ্যে কাজ

ওয়েমার রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হন, এই প্রেমের আসক্তি তাকে [illegible] করেছে, তবে তাঁর বিশুদ্ধ রূপজ্ঞান কখনো বিকৃত করতে পারেনি। রূপজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন একজন সার্থক অহংবাদীর অনন্য বৈশিষ্ট্য। ফরাসিদের কাছে তিনি যদি সংক্ষিপ্ত ও পাঠযোগ্য মাপের পুস্তক রচনার রীতি আয়ত্ত করতেন তাহলে জার্মান জনগণকে অন্তত একটি ক্ষেত্রে সেবা দানে সমর্থ হতেন।

ফরাসি বিপ্লবের অনুগামী লেখকরা মনে করতেন মানুষের সদ্‌গুণ নির্ভর করে আইন প্রণেতাদের উপর। গ্যয়টে এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তার সারা জীবনের শিক্ষাদর্শ এই ধারণার বিরোধী। গ্যয়টে বিশ্বাস করতেন স্ব-নির্ভর প্রতিভার নীতিতে। রাজনীতি কোনো ভাবে যেন প্রতিভার বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে না পারে। জাতীয় প্রয়োজনও যেন প্রতিভার পথে দেয়াল তুলে না দেয়। ফরাসিরা বিশ্বাস করেন মানুষের উন্নতির অপরিহার্য শর্ত হলো আইন। এর বিরুদ্ধে গ্যয়টে একজন মানুষের চিত্র তুলে ধরেন যার নেতৃসুলভ শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলি রয়েছে। যে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান এবং প্রশাসনের সাহায্যে নিয়ত প্রচেষ্টা চালায় স্বীয় আত্মার বিকাশ সাধনে। একটি ক্ষুদ্র রাজদরবারে, জার্মানির সবচেয়ে পশ্চাদপদ এলাকায়, যেখানে জীবন প্রবাহিত হয় নিশ্চল ও সংকীর্ণ চ্যানেলে, বাস করে এই অসাধারণ তেজোদীপ্ত পুরুষ, বহুমুখী প্রতিভাধর লেখক প্রমাণ করেন যে একজন শিল্পী বাহ্যিক উদ্দীপনার সাহায্য ছাড়াই স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগাত্মক গুণের সহায়তায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন। হিবেমারের চারপাশের সব কিছু যখন নিশ্চল, স্থবির, গ্যয়টের মনের গতি তখন সজীব এবং অভিজ্ঞতা আহ্বানে উন্মুখ, তার প্রতিভা সর্বদাই গতিশীল, একের পর এক নাটক, কবিতা, উপন্যাস, নিবন্ধগ্রন্থ লিখে প্লাবিত করছেন দেশ। তার কোনো লেখাই চালু রীতির অনুগামী নয়। মধ্যযুগের রোমান্টিক নাটক থেকে দূরে সরে যান (ওয়াল্টার স্কটের যা ছিলো প্রধান প্রেরণাস্থল), আশ্রয় গ্রহণ করেন কঠোর ক্লাসিসিজমে, অতঃপর নিমজ্জিত হন প্রাচ্যের সাহিত্য সাগরে, সর্ব শেষে অভিবাদন জানান বায়রনের চমৎকারিত্বকে। এই স্থায়ী এবং নব নব সৃষ্টি প্রতিভার আশীর্বাদে অহংবাদী ও দেশানুরাগ বিরোধী গ্যয়টে জার্মান জনগণকে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্যপরম্পরায় একটি নতুন অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেন।

এই মহৎ কর্ম সম্পাদনে তিনি অবশ্য একা ছিলেন না। ন্যায়সংগতভাবেই লেসিং, শিলার, হার্ডার এবং হাইনেকে জার্মান সাহিত্যের গৌরব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এদের মধ্যে হাইনে ছিলেন ইহুদি বংশোদ্ভূত। জার্মান জাতীয়তাবাদের অনুসারীদের মধ্যে তার স্থান গ্যয়টের নিচে নির্ধারণ করা হয়। হাইনের শৈশব কাটে ডুসেলডর্ফে (১৭৯৯—১৮৫৬), তখন এটি ছিলো বার্গ নামক গ্রান্ড ডাচির রাজধানী এবং নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের অংশ। হাইনে জার্মানদের থেকে ফরাসিদের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন, এবং সকল জার্মান ইহুদির মতো সেমেটিক জাতির মুক্তিদাতা নেপোলিয়নের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রমশীল। একমাত্র শিলারের মধ্যে ছিলো জার্মান বৈশিষ্ট্যসূচক রাজনৈতিক উদ্দীপনা ; এমনকি জার্মান জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে বাঙ্‌ময় প্রবক্তা শিলারও স্বাধীনতা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন গ্রিকদাজদের কাছ থেকে।

জার্মান জনগণের প্রচণ্ড কোলাহলপূর্ণ আন্দোলন (এই সময়ের) এবং অনেক জার্মান লেখকের বিরাট কৃতিত্ব মাদাম দ্য স্তায়েল[২] কর্তৃক প্রকাশিত জার্মান বিষয়ক মেধাবী গ্রন্থে বর্ণিত না হওয়া পর্যন্ত সাধারণভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। অতঃপর আবিষ্কৃত হয় যে, যে জাতিকে নেপোলিয়নের বাহিনী পদদলিত করে, হীন ও পরাধীন জাতি জ্ঞানে অবজ্ঞাপূর্ণ চোখে দেখে তারা সমকালীন গদ্য ও পদ্যের বিরাট ভাণ্ডারের অধিকারী। এদের কল্পনার বিমূর্ত কল্পনার বিস্তার ও গভীরতা, এদের রূপকারী শুদ্ধতা ও মৌলিকতা ইউরোপের যে কোনো দেশের সাহিত্যিক কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছে। ১৮১৫ সালের মধ্যে জার্মানি রাজনৈতিক এককসত্তা না হলেও, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট শক্তি। জার্মানি তখন যে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে, যে প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় তা আর অধিকার করা সম্ভব হয়নি। এখানে উল্লেখ করবার মতো ঘটনা এই যে জার্মানি যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে শিখরচূড়া স্পর্শ করে তখন দেশটি রাজনৈতিক বিচারে ছিলো অথর্ব এবং দ্বিধাবিভক্ত, তখন হিবেমারে গ্যয়টে ও শিলার ছিলেন পরস্পরের বন্ধু, জার্মানদের দেশানুরাগ তখন শূন্যের কোঠায় ঠেকেছে। সেকেলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইম্পেরিয়াল শাসনতন্ত্র তাহলে একেবারে সদ্‌গুণবিবর্জিত ছিলো না, জার্মান জাতীয়তাবাদের বিজয়ী অগ্রগমনও ছিলো না একেবারে নির্দোষ। সর্বশেষ বিচারে জিজ্ঞাসা উত্থাপন করা যায় যে, তাহলে হিবেমার কি মানবতার জন্য বার্লিনের অধিক কিছু করেনি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্মান রাষ্ট্রগুলি কি স্বাধীনতার জন্য সমধিক অনুকূলে ছিলো না, আবেগের লালন ও বিশুদ্ধকরণে তুলনামূলকভাবে বেশি ভূমিকা পালন করেনি, অন্তত আধুনিক রাইখের (Reich) চেয়ে। যে রাইখ বিশ্ব রাজনৈতিক ঝড়ে নাস্তানাবুদ হয়, লণ্ডভণ্ড হয় গৃহবিবাদের উন্মাদনায়।

---

২ Staël, Madame de (১৭৬৬—১৮১৭)। নেকেরের কন্যা মাদাম দ্য স্তায়েলের জন্ম হয় প্যারিস নগরীতে। লেখালেখি করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচনার মধ্যে Delphine, Corinne, De L' Allemagne সমধিক বিখ্যাত। যুক্তিপন্থী প্রবণতা ছিলো তার। তাই নেপোলিয়ন তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। রোমান্টিক আন্দোলন তার রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ভাবাদর্শের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। অনু

নেপোলিয়নের পতন

প্রথম কাহিনী। স্পেনীয় যুদ্ধ। জার্মানদের মুক্তি সংগ্রাম। জার্মান ঐক্য স্থগিতকরণের কারণসমূহ ১৮১৩ সালের যুদ্ধ। নেপোলিয়নের হারানো সুযোগসমূহ। তার ধারাবাহিক সম্ভাব্য দক্ষতা। এলবা। বুরবঁ বংশের প্রত্যাবর্তন। দ্য কংগ্রেস অব ভিয়েনা বা ভিয়েনা সম্মেলন। ইউরোপের পুনঃ বন্দোবস্ত। বৈধতার বিজয়। ১৯১৯–২০ সালের শান্তি চুক্তির সঙ্গে তুলনা।

স্পেনে নেপোলিয়ন কর্তৃক অভিযান পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি সাম্রাজ্যের কাঠামোয় একাধিক ফাটলের সৃষ্টি হয়। ১৮০৮ সালের ১৯শে জুলাই বেলেন-এ (Baylan) তেইশ হাজার ফরাসি সৈনিক আত্মসমর্পণ করলে একটা সুস্পষ্ট সংকেত পাওয়া যায় যে স্পেনীয় জাতীয়তাবাদে একটা নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে, যে শক্তি ফরাসি সাম্রাজ্যকে বিপর্যস্ত করে দিতে সক্ষম। স্পেনের উদাহরণ থেকে সাহস সঞ্চয় করে কাউন্ট স্টেডিয়নের পরামর্শে অস্ট্রিয়া পুনরায় বিবাদে লিপ্ত হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, আর নেপোলিয়ন যখন স্যার জন মুরকে কোরুন (Corunna) পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে যান অস্ট্রীয়রা তখন ব্যাভারীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করছে। মধ্য স্পেনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর নেপোলিয়ন যে দ্রুততার সঙ্গে অস্ট্রীয় হুমকি অকেজো করার জন্য ফিরে আসেন, যে অসাধারণ গতিময়তার সাহায্যে তিনটি প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ যুদ্ধে (অ্যাবেন্সবার্গ, একমুল ও ল্যান্ডশাটের রণাঙ্গনে) মধ্য দানিউবে অস্ট্রীদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন, ভিয়েনার সন্নিকটে তিনি যে বাধার সম্মুখীন হন, বাগরামের রণপ্রান্তরে যে যে কষ্টার্জিত বিজয় অর্জন করেন, পক্ষান্তরে পরিচয় দেন তার অটুট সামরিক অধিনায়কত্বের, তাতে বোঝা যায় যে তিনি চারদিক থেকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তার মাত্রা ক্রমবর্ধমান। মারেংগো এবং অষ্টারলিৎসের রণাঙ্গনে যে অস্ট্রীয় বাহিনীকে তিনি পর্যুদস্ত ও পরাস্ত করেন তার থেকে বর্তমান অস্ট্রীয় বাহিনী একেবারে ভিন্ন। এই বাহিনী উন্নততর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, এদের পরিচালনাও করা হয় সমধিক দক্ষতার সঙ্গে, এই বাহিনীর মনের জোরও আগের থেকে অনেক বেশি। এর অনতিপর লেইন যখন নেপোলিয়নকে আপত্তির সুরে বলেন অস্ট্রিয়ার শক্তি সমূলে বিনষ্ট হয়েছে তখন তিনি এই জবাব পান : "তাহলে এটা পরিষ্কার হলো যে বাগরামের রণ প্রান্তরে তুমি উপস্থিত ছিলে না।" উপরন্তু অস্ট্রিয়ার তৎপরতা ছাড়াও সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে স্পেনের উদাহরণ অন্যান্য দেশে সংক্রমণ শুরু হয়েছে। ব্যাভারিয়ানদের বিরুদ্ধে টাইরলে বিদ্রোহ, প্রুসিয়ানদের পুনরুত্থানের অসংলগ্ন প্রচেষ্টা, বড়ো ধরনের হুমকি না হলেও, এবং অনায়াসে তা দমন করা গেলেও, এতটুকু টের পাওয়া যায় যে সাম্রাজ্যিক কাঠামো চাপের সম্মুখীন। খোদ ফ্রান্সেও অবসন্নতার চিহ্ন দেখা দেয়। ১৮০৮ সালে এরফুর্টে নেপোলিয়ন একটা সম্মেলনে মিলিত হন আলেকজান্ডারের সঙ্গে। এখানে তালেঁরা মন্তব্য করেছিলেন যে, রেনজিয়াস এবং রাইন সীমান্ত জয় করে ফ্রান্স, অন্যান্য জয়ের কৃতিত্ব নেপোলিয়ন একা দাবি করতে পারেন।

ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন ক্রমান্বয়ে লাগামহীনভাবে রাশিয়া অভিযানের পথে এগিয়ে চলেছেন। উপদ্বীপের যুদ্ধ কিংবা বৃটিশ নৌবাহিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে তার যে ক্ষতি হয় রুশিয়া অভিযানে ক্ষতি হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। বস্তুত এই অভিযানে ফরাসি সমৃদ্ধি ধ্বংস হয়ে যায়। রুশদের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধের আপাত কারণ হলো, ১৮১০ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া তার নৌবন্দরগুলিতে নিরপেক্ষ জাহাজ নোঙর বন্ধ করতে যৌথভাবে অস্বীকার করে। তাছাড়া রাশিয়া যে শুল্ক নীতি অবলম্বন করে তা উপনিবেশিক বাণিজ্যের অনুকূলে যায়, পক্ষান্তরে ফরাসি আমদানি বাণিজ্যের জন্য প্রতিকূল প্রমাণিত হয়। মহাদেশীয় বন্দোবস্ত থেকে রাশিয়া নিজেকে প্রত্যাহার করে নেবে এটা নেপোলিয়নের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। যে দ্রুততার সঙ্গে ১৮০৭ সালে টিলসিটে ভেলায় বসে রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় সে বিষয়ে নেপোলিয়নের অনেক দিন যাবৎ সংশয় ছিলো। তিনি রুশ জারকে বিশ্বাস করতেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও জানতেন যে এই অবিশ্বাস পারস্পরিক। তিনি আরো জানতেন, তার পোলদের উৎসাহ প্রদান, কিংবা অস্ট্রীয় রাজবংশে বিবাহকে আলেকজান্ডার কোনো দিন সহজভাবে গ্রহণ করেন নি। তাছাড়া মহাদেশীয় অবরোধ সর্বত্র নিন্দা কুড়ায়, তবে এই অবরোধ রুশ বণিক ও অভিজাত শ্রেণীর কাছে ছিলো সব চেয়ে অগ্রহণযোগ্য। অতএব নেপোলিয়ন পণ করেন যে এবার বল প্রয়োগ করতে হবে। হয়তো তিনি প্রত্যাশা করেন যে, ফ্রিডল্যান্ডের মতো রুশ সাম্রাজ্যের সীমান্তে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা গেলে বিজয়ীর শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে। তিনি হয়তো উপরন্তুস্বরূপ আশা করেন যে রাশিয়াকে ইউরোপ ও প্রাচ্যের মাঝখানে বিরামস্থল হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। তিনি এটি প্রত্যাশা করেন এজন্য যে, তখন তিনি পার্লামেনের ভূমিকার সঙ্গে আলেকজান্ডারের সুখ্যাতি যুক্ত করার উচ্চাভিলাষ পোষণ করছেন। তিনি বলতেন, "জনগণ হয়তো জানতে চাইবে যে আমরা কোথায় চলেছি। আমরা গোটা ইউরোপকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে চলেছি, অতঃপর আমরা আমাদের চেয়েও দুঃসাহী দস্যুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো, আর আমরা হবো ভারতবর্ষের প্রভু।"

এবার কোনো দ্বিতীয় ফ্রিডল্যান্ড নয়, কোনো শান্তি নয় বরং ১৮১২ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে নেপোলিয়ন স্মোলেনস্কএ, স্থানটা নিয়েমেন ও মস্কোর মাঝখানে, উল্লেখ করার মতো কোনো বিজয় তিনি অর্জন করতে পারেন নি, বরং তার বিশাল বাহিনী (গ্রান্ড আর্মি নামে কথিত) এক লো হাজার জোয়ান হারিয়ে দিশেহারা। অতঃপর তিনি পূর্বেকার এবং অধিকতর বিজ্ঞজনোচিত দুই বছরের যুদ্ধের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে সঙ্কল্পবদ্ধ হন যে রাশিয়ার হৃদপিণ্ডে ঢুকে পড়বেন, লক্ষ্য তাৎক্ষণিক বিরাট বিজয় অর্জন করা যাতে রুশ জার আর একবার নতজানু হন; কিন্তু স্পেনের মতো রাশিয়াতেও ফেলাদুরাও ব্যাপারটা প্রকৃত বাস্তবতা। আক্রমণকারীর স্বাচ্ছন্দ বিঘ্নিত করার জন্য রুশরা সকল প্রকার আত্মত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত , এমন কি তাদের প্রিয় মস্কো নগরীতে অগ্নিসংযোগ করতে কুণ্ঠিত নয়। যদিও নেপোলিয়ন ক্রেমলিন প্রাসাদে তাবু ফেলেছেন, কিন্তু আলেকজান্ডার, তার হাতের কাছেই রয়েছেন রুসিয়ার স্টেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলাপ-আলোচনার সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এক মুহূর্তের জন্যও আলোচনায় বসতে রাজি নন। এবার নেপোলিয়ন রুশদের তরফ থেকে উপযুক্ত জবাব পাবেন। এই জবাব রাশিয়া তার প্রতিটি শত্রুকে দিয়ে থাকে, যদি শত্রুরা রাশিয়ার সৈন্যপ্রবাহের বিরুদ্ধে জলম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত

হয় ১৮১৩ অক্টোবর থেকে নেপোলিয়ন বাহিনীর পশ্চাদপসরণ আরম্ভ হয়। অতঃপর বিধ্বংস হয় তাঁর বাহিনী, যে বাহিনীর সাহায্যে তিনি ইউরোপে আধিপত্য কায়েম করেছিলেন। এই খবরে জার্মান জনসাধারণ বিদ্রোহের সংকেত পেয়ে যায় (নেপোলিয়নের শাসনের বিরুদ্ধে), এবং লীপজিগ সংঘর্ষের পর নেপোলিয়ন পরাস্ত হন, তাকে সিংহাসন পরিত্যাগ করে নির্বাসনে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

জার্মানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নেপোলিয়নের মধ্য ইউরোপে যে ক্ষমতা ছিলো তা ধ্বংস করার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে বটে, তবে এই সংগ্রাম নিখিল জার্মান আনুগত্যের প্রবল অনুভূতির বীজ বপন করে, যা গোটা বিশ্বের রাজনীতির চরিত্র বদলে দেয়। এই প্রথম জার্মান জাতীয়তাবাদীগণ অভিন্ন আবেগের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। প্রতিটি জার্মানবাসী নেপোলিয়নের কঠোর মহাদেশীয় অবরোধ এবং বাধ্যতামূলক সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগের কারণে দুর্ভোগের শিকারে পরিণত হয়। নিপীড়নকারী বৈদেশিক শাসনের জোয়াল থেকে পিতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য, এবং কোনো উপায়ে ফরাসি বিপদের পুনরাবৃত্তি রোধের অভিপ্রায় সকলের কাছে সমান গুরুত্ব লাভ করে, এই অভিপ্রায় সর্বাধিক জোরদার রূপ পরিগ্রহ করে উত্তর জার্মানিতে, সেখানে কবি, দার্শনিক এবং প্যামফলেট রচয়িতাগণ জার্মান জাতির আদর্শ ঘোষণার জন্য ঐক্যবদ্ধ হন।

যাহোক, সে রকম কোনো জাতির অস্তিত্ব লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে জাতীয় অনুভূতির সাহায্যে, সবল রাজনৈতিক নির্দেশনায়, চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি জাতি গড়ে তোলা সম্ভব। এই নির্দেশনা এখনো মেলেনি। কোনো জার্মান রাষ্ট্র নেপোলিয়নকে এককভাবে পরাস্ত করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। কোনো জার্মান রাষ্ট্রের পক্ষে এককভাবে গোটা জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করাও অসম্ভব। প্রুসিয়ার জাতীয় অনুভূতি সর্বাধিক শক্তিশালী, দেশের নেতৃত্বও সবচেয়ে জ্ঞানদীপ্ত, তবে দেশটির সেনাবাহিনী লক্ষ্য উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। গোড়ার দিকে প্রুসীয় এবং রুশরা বটজেন ও লুটজেনের রণপ্রান্তরে পরাজিত হলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায় যে জার্মানি শুধু প্রুসিয়ার সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না, এমন কি রুশ বাহিনীর সক্রিয় সমর্থনেও কোনো কাজ হবে না [কালিশের (Kalisch) সন্ধি অনুসারে রাশিয়া সমর্থন যোগাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়]। ফলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের সক্রিয় সমর্থন ব্যতিরেকে জার্মানির পক্ষে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা সম্ভব নয়। এখন, অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য মূলত অ-জার্মান শক্তি, এই শক্তি পশ্চিম ইউরোপে কর্মকাণ্ড হ্রাস করেছে। পরিত্যাগ করেছে বেলজিয়াম এবং রাইন সীমান্ত, সোয়াবিয়ার উপর পুরাতন অধিকার প্রত্যাহার করেছে, 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে'র পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাওয়া নিরবে পর্যবেক্ষণ করেছে, এবং এতে বরং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। এই সাম্রাজ্যের সমধিক নজর এখন উত্তর ও মধ্য ইতালির উপর নিবদ্ধ, এই দু'টি এলাকার উপর নিজেদের অধিকার নিশ্চিত করতে চায়, একই কারণে ভ্যাটিক্যানের উপর তার নজর নিবদ্ধ। পশ্চিম অঞ্চলে ফরাসি আগ্রাসন থেকে জার্মানিকে রক্ষা করার বিপজ্জনক ও অকৃতজ্ঞ ঝুঁকি নিতে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

বস্তুত, ঐক্যবদ্ধ জার্মানি গঠনের আগ্রহ অস্ট্রীয়দের উদ্দীপিত করতে পারে না। প্রিন্স মেটারনিক বর্তমানে অস্ট্রীয় কর্মপন্থার পরিচালক। জার্মানির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তা বার্লিনের হার্ডেনবার্গ এবং স্টেনের একেবারে বিপরীত। যেখানে

প্রুসিয়ার রাষ্ট্রবিদগণ চান বল প্রয়োগ করে নেপোলিয়নকে জার্মান ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হোক, অতঃপর গঠন করা হোক ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র, মেটারনিক সেখানে বিবদমান দলগুলির উপর স্বীয় মধ্যস্থতা আরোপ করতে আগ্রহী, তিনি চান প্রলোভন-প্রলোভনের মাধ্যমে নেপোলিয়নকে জার্মানি থেকে বিদায় করতে, আর সম্ভব হলে, ফ্রান্সের উপর নির্ভরতা থেকে রেইনবান্ডকে বিযুক্ত করা। অতঃপর সমান ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রপুঞ্জ নিয়ে বন্ধনমুক্ত ফেডারেশন বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন। এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের নেতৃত্বদান লাভ করবে অস্ট্রিয়া। সবশেষে অস্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য লাভ করে; আর জার্মান জাতিসমূহের এক ১৮৭০ সাল পর্যন্ত স্থগিত থাকে। কারণ ১৮১৩ সালে জার্মানির স্বাধীনতার জন্য অস্ট্রিয়ার সামরিক সমর্থন ছিলো অত্যাবশ্যক। ফলে, দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রগুলির ইচ্ছুক সহযোগিতায়, অস্ট্রিয়া নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে জার্মানির রাষ্ট্রিক কাঠামোর রূপ দিতে সমর্থ হয়।

প্রুসিয়ার ইতিহাসকারগণ একে জার্মানির ইতিহাসের অন্যতম ট্র্যাজেডি হিসেবে গণ্য করেন। কারণ জাতীয় এবং উদারনৈতিক অনুভূতিকে (স্বাধীনতা যুদ্ধ দ্বারা অনুপ্রাণিত) এভাবে বিনষ্ট হতে দেয়া হয়, যেমন কোনো আফ্রিকান নদী মরুপথে হারিয়ে যায়। উপরন্তু সে সময়ের বীরত্বব্যঞ্জক প্রচেষ্টা এবং দুর্ভোগের কারণে জার্মানি একটি ফেডারেল গঠনতন্ত্র লাভ করে, তবে উক্ত গঠনতন্ত্র যে আকৃতি পায় তাতে কাজ করার কোনো সুযোগ থাকে না এবং ইউরোপের মন্ত্রণাসভায় জার্মানি হয়ে পড়ে ক্ষমতাহীন।

তাহলে দেখা যায় যে, ১৮১৩ সালে নেপোলিয়ন জার্মানিতে যে প্রচণ্ড যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন তা একটা ঐক্যবদ্ধ জনশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ছিলো না, এটি পরিচালিত হয় কয়েকটি সরকারের বিরুদ্ধে, যে সরকারগুলি যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে, এবং তাদের অনুভূতি অভিন্ন হলেও, অভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য কখনো মিলিত হতে পারেনি। অস্ট্রিয়া সর্বদাই রাশিয়ার প্রতি ঈর্ষা বোধ করেছে। রেইনবান্ডের বাহিনীগুলি বছরের শেষের দিকে নেপোলিয়নের হয়ে কাজ করেছে। ফ্রান্সের আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্য ছাড়া ভিয়েনা এবং বার্লিনের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে ঐকমত্য ছিলো না। তবে রাশিয়া, প্রুসিয়া এবং অস্ট্রিয়ার একটা ব্যাপারে লক্ষ্য ছিলো অভিন্ন। তা হলো, নেপোলিয়নকে অবশ্যই পোলিশ ও জার্মান বিজিত অঞ্চলগুলি ছেড়ে দিতে হবে। নেপোলিয়ন এব্যাপারে সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। মেটারনিককে তিনি ১৮১৩ সালের ২৬শে জুন বলেন, "তোমরা আমার কাছে কি চাও? আমি নিজেই নিজের মর্যাদা বিনষ্ট করবো? কখনো নয়। তোমাদের নৃপতিরা সিংহাসনে বসে জন্মগ্রহণ করেন, তারা বিশ বার পরাজিত হলেও রাজধানীতে ফিরে আসতে পারবেন। আমি পারবো না। কারণ আমি ক্ষমতার তখ্‌তে বসতে পেরেছি সেনা ছাউনিগুলির মাধ্যমে।"

এই দুঃশাস্য আত্মশক্তি, অবিলম্বে সংঘটিত সামরিক বিপর্যয়সমূহ নয়, নেপোলিয়নকে সিংহাসন থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে। লিপজিগের রণপ্রান্তরে বিশাল বিজয় অর্জন করার পরও (যেখানে নেপোলিয়নের কঠোর পরিশ্রমে গঠিত শেষ বিরাট বাহিনী মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়ে) মিত্রপক্ষগুলি প্রস্তাব করে যে (১৮১৩ সালের নবেম্বর মাসে) ফ্রান্স তার স্বাভাবিক সীমান্ত রক্ষা করতে পারবে (রাইন, আলপস ও পিরেনিজ অঞ্চলে)। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। পরবর্তীকালে যখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়, আত্মরক্ষাকারী বাহিনী পরাজয়ের স্বাদ ভোগ করে, তখন শান্তির শর্তাবলি কঠিনতর হয়,

কিন্তু তবু (১৮১৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি), স্যুভয় ও বেলজিয়ামের উপর দাবি পরিত্যাগ করে, বৈপ্লবিক যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলগুলি ব্যতিরেকে, ফরাসি রাজতন্ত্রের পুরাতন সীমান্ত মেনে নিয়ে নেপোলিয়ন তার সিংহাসন হয়তো রক্ষা করতে পারতেন। এই সবশেষ সুযোগও প্রত্যাখ্যাত হবার পর মিত্র পক্ষের শক্তিগুলির মাথায় তখন একটা চিন্তাই বাসা বাঁধে। নেপোলিয়নের রাজত্বেরও অবসান ঘটাতে হবে, তিনি যেমন অনেক রাজপরিবারের অবসান ঘটিয়েছেন।

নেপোলিয়ন কর্তৃক বেলজিয়াম স্থায়ীভাবে অধিকার ইংল্যান্ড কখনো অনুমোদন করবেনা, পক্ষান্তরে বিপ্লবের এই আকর্ষণীয় পুরস্কার যদি ছেড়ে দিতে হয় তাহলে ফ্রান্স অবাধ্য হবে, এই অবস্থার অনুকূলে বার বার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যখন ফরাসি বিপ্লব ও সাম্রাজ্যের ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়, একটা নাটক হিসেবে, যে নাটকের অনিবার্য পরিণতি ঘটে বেলজিয়াম দখলের মারাত্মক বাস্তবতার জন্য, যে দখল বজায় রাখতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নেপোলিয়ন বাধ্য হন, ইংল্যান্ডও সমান জোরালো যুক্তির কারণে বিরোধিতা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তখন এটা মনে করা যথার্থ বলেই মনে হয় যে, লিপজিগের ঘটনার পর মিত্রশক্তিগুলি এমন একটি সন্ধির অনুকূলে ভাবতে ইচ্ছুক ছিলেন, যে সন্ধির অধীনে বেলজিয়াম ফ্রান্সের থেকে যেত। এই ঘটনা থেকে একটা বিষয় অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে শত্রুপক্ষ নেপোলিয়নের সামরিক শক্তি সম্পর্কে কতো সম্ভ্রম পোষণ করতেন।

যুদ্ধের সমস্যাটা যতটা সংখ্যাশক্তির উপর নির্ভর করেছে তার অনেক বেশি নির্ভর করেছে ইচ্ছাশক্তির উপর। তার সর্বশেষ দুটি যুদ্ধাভিযানে (জার্মান ও ফরাসি) নেপোলিয়ন মুখোমুখি হন বিশাল বাহিনীর। প্রায় সমগ্র ইউরোপ তার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়। এমন কি তাঁর একজন প্রবীণ অফিসার, বর্তমান সুইডেনের ক্রাউন প্রিন্স, রণক্ষেত্রে সুইডিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হন প্রাক্তন প্রভু নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তার লক্ষ্য নরওয়ে কুক্ষীগত করা, এবং, সম্ভব হলে, লুটের মাল ভাগাভাগি শুরু হলে, ফরাসি সিংহাসনের উপর অধিকার কায়েম। জার্মান রণ প্রান্তরে যখন রাশিয়া, প্রুসিয়া, অস্ট্রিয়া এবং সুইডেন নেপোলিয়নকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলতে শুরু করেছে, ওয়েলিংটন তখন ফরাসিদের তাড়া করছেন পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে। এতসব দুর্বিপাকের ভেতর নেপোলিয়ন শেষ যুদ্ধাভিযানগুলি যে স্বাভাবিক দক্ষতার সঙ্গে লড়ে যান তাতে উত্তরকালের অনেকে বিস্ময় মানেন। যদিও তার কাহিনী বৃহদাংশ তরুণ, এবং তাদের কোনো প্রশিক্ষণ ছিলো না, তার সেনাপতিরা ছিলেন যুদ্ধক্লান্ত, তার অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তি যথেষ্ট ছিলো না, তার বিরুদ্ধ পক্ষের সৈন্য সংখ্যাও ছিলো অনেক বেশি, তবু তিনি শোয়ারজেনবার্গের অধীন মিত্রপক্ষের প্রধান বাহিনীকে দুদিনের যুদ্ধে আগস্ট মাসের ২৬ ও ২৭ তারিখে ড্রেসডেনের অদূরে পরাস্ত করতেন সমর্থ হন। তিনি যদি তার প্রথাগত রীতিতে দক্ষতার সঙ্গে এবং কার্যকরভাবে তাড়া করতেন তাহলে হয়তো প্রতিপক্ষের উপর শর্ত আরোপে সমর্থ হতেন। শৈথিল্যবশত নিজেকে ঘিরে ফেলার সুযোগ দেন এবং লিপজিগের ভয়ানক হত্যাযজ্ঞে চূর্ণবিচূর্ণ হন। তথাপি পরবর্তী বছর গুটিকয় প্রশিক্ষণবিহীন সেনার সাহায্যে ব্লুখার ও শোয়ারজেনবার্গের বাহিনীর বিরুদ্ধে সেইন ও মার্ন উপত্যকায় যে যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন তা সেনাপতি হিসেবে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হিসেবে গণ্য হয়। এই গণ্ডযুদ্ধগুলিতে তিনি অভ্যন্তরীণ অবস্থান থেকে উত্তরে প্রুসীয়দের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণে অস্ট্রীয়দের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা

করেন। নেপোলিয়ন তার গতিময়তা এবং আক্রমণের প্রচণ্ডতা দ্বারা বার বার শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেন। তবে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ব্লুচার এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বী যার ইচ্ছাশক্তি তার মতো হিংস্র এবং অদম্য, স্নায়ুর চাপে ক্লিষ্ট হবার মতো জেনারেল তিনি নন, ক্রোধ পুষতে পরিশ্রান্ত বোধ করেন না, পরাস্ত হলেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন না। তিন বার পিছু হটতে বাধ্য হয়ে বৃদ্ধ প্রুসীয় সেনাপতি উত্তর দিকে ছুটে যান উপরন্তু শক্তি সঞ্চয়ের লক্ষ্যে, অতঃপর প্রত্যাবর্তন করেন লাও এবং ওয়েভনের রণপ্রান্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণের জন্য। তাৎক্ষণিকভাবে সফল হন প্যারিস অভিমুখী সড়ক নিজের ও মিত্রবাহিনীর জন্য উন্মুক্ত করতে। গতি হারিয়ে নেপোলিয়ন পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং যখন দেখেন যে রাজধানী শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তখন তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন ফতেনব্লুতে। সেখানে যুদ্ধ ক্লান্ত মার্শালরা, নিজেদের অবস্থা বুঝে এবং গোটা দেশের অবসন্ন ভাব লক্ষ্য করে, নেপোলিয়নকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। নেপোলিয়ন 'রক্ষীদল'কে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে এলবা অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রা পথে তিনি শুধু জনগণের অভিসম্পাত এবং হুমকি কুড়ান। পরবর্তী দশ মাসের ইতিহাস রচনা করেন অন্যেরা।

তালেরাঁ, দলত্যাগী যাজক এবং বিবাহিত বিশপ, প্রথম আলেকজান্ডারকে বোঝান যে বুরবঁ রাজবংশকে ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো উচিত। এটা অসম্ভব বলেই মনে হয় যে ফ্রান্স স্বেচ্ছায় একজন স্থূলকায় ও বৃদ্ধ ভদ্রলোকের শাসন মেনে নেবে। এই ভদ্রলোক দীর্ঘ পঁচিশ বছর দেশের বাইরে নির্বাসনে কাটিয়েছেন, ঐ সময়ের উত্তেজনাকর ও গৌরবজনক কোনো ঘটনার সঙ্গেই নিজেকে সম্পৃক্ত করেননি। তবু অন্য কোনো বিকল্পের কথা ভাবা যায়নি। অষ্টাদশ লুই তবু একটা নীতি, ঐতিহ্য এবং ফ্রান্সের একটা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতিভূ ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের ক্লান্ত ও শঙ্কিত জনগণকে ইউরোপের আস্থা ও সদিচ্ছার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। বিপ্লব ও সাম্রাজ্যের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের পর পুরাতন রাজতন্ত্রকে মনে হয় লক্ষ্য হাসিলের জন্য সবচেয়ে কম অনিরাপদ, কিন্তু ফরাসি লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাঙ্ময় শাতুব্রিয়ার কলমও একে গৌরবান্বিত করতে পারেনি। তদুপরি মিত্রপক্ষ কর্তৃক আরোপিত ইংরেজদের অনুরূপ শাসনতন্ত্রও একে বিজ্ঞ ও উদারনৈতিক করতে ব্যর্থ হয়। বিখ্যাত ত্রিবর্ণ পতাকার স্থান দখল করে শ্বেত পতাকা, এই শ্বেত পতাকা ছিলো পুনর্বাসিত রাজবংশের উপযুক্ত প্রতীক। এই রাজবংশ হৃতহৃদ্যমাপূর্ণ পরিবর্তনের সময়ে কিছুই শেখেনি, কিছু বিস্মৃতও হয়নি।

বিজিত ফরাসি দেশের উপর যে শর্তগুলি আরোপ করা হয় তা সুবিবেচনাপ্রসূত নমনীয়তার পরিচায়ক (প্যারিস চুক্তি, ৩০শে মে, ১৮১৪)। কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়নি, বিদেশী বাহিনী অবস্থানের জন্যও চাপ দেয়া হয়নি। এমন শর্তও আরোপ করা হয়নি যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আর্ট গ্যালারিসমূহ থেকে যেসব শিল্পকর্ম চুরি করা হয়েছে তা তাদের প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে নেপোলিয়ন যে সব বিদেশী ভূ-খণ্ড জয় করেন সেগুলির উপর থেকে দখল প্রত্যাহার করে নেয়া হয়; কিন্তু এখানে উল্লেখ করার মতো ব্যাপার এই, ফ্রান্সের দীর্ঘ স্থায়িত্ব এবং প্রচণ্ড ভিতরের সত্ত্বেও অষ্টাদশ লুই-কে যে ভূখণ্ড শাসন করতে দেয়া হয় তা ছিলো বিপ্লব পূর্বের

আগের ফ্রান্সের চেয়ে আয়তনে বড়ো, কিছুটা হলেও। তখন শাসন করতেন তার অগ্রজ। কাণ্ডজ্ঞানের ন্যূনতম ব্যবহার থেকে মিত্র পক্ষ অনুধাবনে সমর্থ হয় যে কার্থাজিনিয়ান শান্তির ছায়ায় তাদের মক্কেল লুই তার সিংহাসন টিকিয়ে রাখতে পারবেন না।

ইউরোপের বিস্তারিত বন্দোবস্তের জন্য ভিয়েনায় সম্মেলন (কংগ্রেস) ডাকা হয়। কংগ্রেস মিলিত হবে নবেম্বর মাসে। এখানে পূর্বতন শাসন ব্যবস্থার অভিজাতবর্গ মুক্তিলাভের আনন্দে লঘুচিন্তার পরিচয় দেয়। আমোদ-ফূর্তিতে মেতে ওঠে। প্যারিস নগরী যেমন নৃত্য করেছে থামিদরের পর, লন্ডন নগরী উল্লাসে মেতে উঠেছে ১৯১৮ সালের যুদ্ধবিরতির পর, তেমনি গোটা শরৎ ও শীতকাল জুড়ে ভিয়েনা নৃত্য করে প্রচণ্ড উল্লাসে, এদিকে উক্ত করসিক্যান (অর্থাৎ নেপোলিয়ন) এলবায় নিরাপদে আছেন, আর সরকারি কর্মচারীরা দিন-রাত পরিশ্রম করছেন নতুন ইউরোপের কাঠামো তৈরির জন্য। সম্রাট ও রাজা, অভিজাতবর্গ, প্রিন্স এবং কূটনীতিকদের মহাসমাবেশে নেপোলিয়নের বিশ্বাসহন্তা স্ত্রী মেরি লুইসা অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে তার ক্ষুদে পদযুগল প্রদর্শন করেন।

ইউরোপের নতুন মানচিত্র যারা প্রণয়ন করেন তাদের কাছে ফরাসি বিপ্লব মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড়ো বিপদ হিসেবে গণ্য।

ফলে ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত বরাবর কয়েকটি সংঘর্ষবারক (buffer) রাষ্ট্র অথবা প্রদেশ খাড়া করা হয়। মনে করা হয় যে এই রাষ্ট্র বা প্রদেশগুলি বিপ্লবের থেকে নাজুক ইউরোপকে রক্ষা করবে। উত্তরে গজিয়ে ওঠে নেদারল্যান্ড রাজ্য, টিকে থাকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত, যখন ক্যালভিনিষ্ট হল্যান্ডের সঙ্গে ক্যাথলিক বেলজিয়ামের অস্বস্তিকর সংযুক্তি স্রোতের টানে ভেসে যায়। দক্ষিণ ভাগে মস্তক উত্তোলন করে সার্দিনীয় রাজ্য, জেনোয়া এবং স্যাভয়-এর সঙ্গে যুক্ত হলে তা বেশ শক্তিশালী হয়। অপরপক্ষে, রাইনল্যান্ডের মতো মধ্যবর্তী অঞ্চল প্রুসিয়ার অভিভাবকত্বের অধীনে সমর্পণ করা হয়। এটি করা হয় বৃটিশ সরকারের উস্কানিতে। তখন কেউ অনুধাবন করতে পারেন নি যে প্রুসীয় রাজশক্তির অধীনে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করলে কিংবা ইউরোপে শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন করলে তার ফলাফল কি দাঁড়াতে পারে। ফলত, জার্মানি এখনো তার প্রতিবেশীদের জন্য বিপজ্জনক। ১৮১৪ সালের রাষ্ট্রবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো একেবারে ভিন্ন। তখন ফ্রান্সকে গণ্য করা হয়েছে অভিন্ন শত্রু হিসেবে। আর প্রুসিয়াকে এমন একটি শক্তি হিসেবে দেখা হয়েছে যে রাইন এলাকার উপর কড়া নজরদারি করতে পারবে।

ইউরোপে রক্ষণশীলতা ও সংযম আনয়নের অভিন্ন ধারণার বশবর্তী হয়ে উত্তর ও মধ্য ইতালিতে অস্ট্রিয়াকে প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ প্রদান করা হয়, এতে ইতালীয় জাতীয়তাবাদ ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের উস্কানি লাভ করে। অস্ট্রিয়া লাভ করে লোম্বার্ডি রাজ্য এবং ভেনেসিয়া, তারা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয় ত্রিয়েস্ত ও দালমাতীয় উপকূল, তারা চূড়ান্ত সন্তুষ্টির সঙ্গে লক্ষ্য করে অস্ট্রীয় আর্চডিউক শাসন করছেন ফ্লোরেন্স, জনৈক আর্চডাচেস পারমার সিংহাসনে আসীন। উপরন্তু, যেহেতু তারা পরিবার, রাজনীতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে চতুর্থ ফার্দিনান্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং এই চতুর্থ ফার্দিনান্দ ১৮১৫ সালে মুরার মৃত্যু হলে নেপলসের শাসন ভার লাভ করেন, ফলে উপদ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অস্ট্রীয়দের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। বাস্তবিক পক্ষে, বিপ্লব ও সাম্রাজ্যিক

যুদ্ধের বদৌলতে প্রাপ্ত লুটের মালের বৃহত্তম ভাগ লাভ করে। এক লাফে অস্ট্রিয়ার জনসংখ্যা সাড়ে চার মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়, ইতালির উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রায় সম্পূর্ণ হয়। তাছাড়া ঢিলেঢালাভাবে গঠিত জার্মান রাষ্ট্রসংঘের সে হয় প্রধান মাতব্বর।

এই ব্যবস্থাগুলি অনুমোদন করতে অতিরিক্ত বাদানুবাদের প্রয়োজন করেনি। কারণ সাধারণ লক্ষ এই ছিলো যে, সেই সব দেশ থেকে ফরাসি প্রভাব মুছে ফেলতে হবে যে সব দেশে ফরাসি প্রাধান্য লাভ করেছিলো নেপোলিয়নীয় বিজয়াত্মক যুদ্ধের কারণে। প্রধান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় ইউরোপের মধ্য-পূর্ব অঞ্চলে। এখানকার সমস্যা এখনো কন্টকাকীর্ণ। ওয়ারসর গ্রান্ড ডাচি-র অবস্থা কি হবে, যা নেপোলিয়ন প্রুসিয়ার পোলিশ প্রদেশগুলির পাকস্থলি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং স্যাকসন রাজার হাতে তুলে দেন শাসন করার জন্য?

স্যাক্সনি রাজ্য নিয়েই বা কি করা যায়? রাশিয়া অধিকার করতে চায় পোল্যান্ড, প্রুসিয়া চায় স্যাকসনি, আর এই দুটি রাজ্যকে যদি স্বাধীন ভাবে চলতে দেয়া হতো, তাহলে দুটি রাজ্যই মানচিত্র থেকে মুছে যেত। এ ধরনের ব্যবস্থা, যা হোক, অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, অস্ট্রিয়ার পক্ষে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রুসিয়ার এতটা মুনাফা লোটা সহ্য করা সম্ভব নয়, অপর দিকে স্বাধীন পোলিশ রাষ্ট্র সম্পর্কে ফ্রান্স ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। এই প্রশ্নে কংগ্রেস প্রায় মহাদেশীয় যুদ্ধের সূচনা করে। অবশেষে একটা সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব হয়। সমঝোতা মোতাবেক প্রুসিয়া স্যাক্সনির দুই-তৃতীয়াংশ ভূ-খণ্ড লাভ করে, তাছাড়া অধিকার করে রাইন অঞ্চলের প্রদেশগুলি, পক্ষান্তরে পোল্যান্ডকে খাড়া করা হয় রুশ জারের অধীনে শাসনতান্ত্রিক রাজ্য হিসেবে।

তালেরাঁর ফরমুলা অনুসারে বন্দোবস্ত নিশ্চিত রূপ লাভ করে। বৈধতার নীতি অনুসারে বুরবঁ রাজা ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণে সমর্থ হন, ভেটিন রাজবংশের জন্য থাকে স্যাক্সনি, তাছাড়া সার্দিনিয়ার রাজবংশের ক্ষমতা অনুমোদন লাভ করে। সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির স্বকীয়তা কিংবা জনগণের ইচ্ছাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা দেয়া হয়নি। বর্তমানে আমরা যে ইউরোপে বাস করি তার নির্মাতাদের লক্ষ্য ও নীতি থেকে ভিয়েনার বন্দোবস্তকারী রাষ্ট্রবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো একেবারে বিপরীত। ১৯২০ সালের শান্তি চুক্তিগুলি গণতান্ত্রিক বন্দোবস্তের পক্ষে যায়। এবং তা সম্ভব হয় সেই সব রাজতন্ত্রগুলির পতনের দরুন, যে রাজতন্ত্রগুলিকে ভিয়েনা কংগ্রেসে ইউরোপের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯২০ সালের বন্দোবস্ত কয়েকটি নতুন প্রজাতন্ত্র গঠন করে, সীমান্তগুলির পুনর্বিন্যাস করা হয়, পুরাতন অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের বিগঠন অনুমোদন লাভ করে, আর যে ইউরোপ নবজন্ম লাভ করে তার ভিত্তি ছিলো আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি। ফরাসি বিপ্লবীরা মূলত এই নীতিই প্রচার করেন, যা পরবর্তী কালে দীর্ঘ সময়ের জন্য দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। ভিয়েনা কংগ্রেসের নীতিনির্ধারকদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসনের নীতিমালা মোটেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতো না। মেটারনিক, তালেরাঁ এবং কাসলরিয় কর্তৃক পরিচালিত হয়ে কংগ্রেস এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যে ইউরোপের উন্নতি নিশ্চিত করতে হলে সংশ্লিষ্ট জনগণের অনুমানলব্ধ ইচ্ছাসমূহ অনুসারে কাজ করলে চলবে না। বৈধ কর্তৃত্বের প্রতি যথাযথ আনুগত্যই এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

১৮১৫ সালের ৭ই মার্চ জানা গেল যে নেপোলিয়ন আবার ফ্রান্সের মাটিতে পা রেখেছেন। রক্ষণশীল পক্ষের জন্য নিতান্ত ভাগ্যের ব্যাপার এই যে মিত্র পক্ষের নৃপতিবৃন্দ এবং মন্ত্রীরা

তখনও ভিয়েনায় অবস্থান করছেন। কংগ্রেসের বাকী কাজ সম্পাদনের জন্য, নেপোলিয়নকে সন্দেহভাজন এবং আইনের আশ্রয় থেকে বহিষ্কৃত ব্যক্তি (outlaw) হিসেবে ঘোষণা করতে, তার বিরুদ্ধে সামরিক জোট গঠনের শর্তাবলি তৈরি করার প্রয়োজনে আরো এক পক্ষ কাল সময় লেগে যায়। কোনো প্রকার আঘাত হানার আগেই নেপোলিয়নের হাত থেকে সকল কূটনৈতিক কার্ড কেড়ে নেয়া হয়। ওয়াটারলুর প্রান্তরে যে ঘটনা ঘটে, তার অন্যথা হলেও নেপোলিয়ন ঐক্যবদ্ধ ইউরোপীয় শক্তির কাছে পরাস্ত হতেন।

তার অন্যান্য বেপরোয়া অভিযানের কথা বাদ দিয়ে এটুকু বলা যায় যে, ব্রাসেলসের বিরুদ্ধে তিনি যে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন তার সমর্থনে সমগ্র ফ্রান্সের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চমৎকার সুযোগ ছিলো। কারণ, ব্রাসেলস দখলের অর্থ রাইন নদীর মোহনার উপর অধিকার স্থাপন। ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফরাসি জনগণের বিবেচনায় বেলজিয়ামের প্রতীকী, এমনকি অতীন্দ্রিয় মূল্য রয়েছে। বার বার এই ক্ষুদ্র দেশটির মাটি ফরাসি রক্তে সিক্ত হয়েছে, প্রতিটি ফরাসি রাষ্ট্রবিদ এই দেশটির উপর অধিকার কায়েমের উচ্চাভিলাষ পোষণ করেছেন। যেহেতু বেলজিয়াম বিজয় ছিলো নতুন ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান গৌরব, আর বেলজিয়াম হাত-ছাড়া হওয়া ছিলো সাম্রাজ্যের জন্য অতিশয় ক্ষতিকর, এখন এই বেলজিয়াম পুরস্কার হিসেবে ফ্রান্সকে যে এনে দিতে পারবে তার স্থান হবে দেশের হৃদপিণ্ডে। অতএব, ন্যায়সংগতকারণেই, নেপোলিয়ন বেলজিয়াম পুনরুদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালান, পক্ষান্তরে, এবং ন্যায়সংগত কারণেই, ওয়াটারলুর রণপ্রান্তরে ওয়েলিংটন তার পথ রোধ করে দাঁড়ান।

মানবতার দিনপঞ্জির জন্য অত্যন্ত স্মরণীয়, জুন মাসের এক দীর্ঘ দিবস বিপ্লবপন্থি এবং রাজবংশের মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্বের সুরাহা করে। এই দ্বন্দ্ব শুরু হয় ভালমির রণপ্রান্তরে কামানের অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণের ভেতর, তেইশ বছর আগে। ওয়েলিংটনের সরু সৈন্য সজ্জা, অংশত বৃটিশ, অংশত জার্মান, দিনেমার ও ওলন্দাজ, উপরন্তু ব্রুখারের প্রুসিয় বাহিনীর সহায়তায় নেপোলিয়নের সবশেষ বাহিনীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। আধুনিক যুদ্ধের আলোকে বিচার করলে এটি ছিলো অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনা।[১] এই বিজয়াত্মক যুদ্ধের কারণে চারদিকে অপার্থিব আনন্দের বন্যা বয়ে যায়, তাতে মনে করতে হয় যে ইতিপূর্বে এত বড়ো বিজয় কমই ঘটতে দেখা গেছে। কারণ ওয়াটারলু ছিলো একটি ট্র্যাজিক নাটকের শেষ অঙ্ক, একটি যুগের অবসান এবং নতুন একটি যুগের সূচনা করে।

বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির প্রশংসা করে এখানে অন্তত এটুকু বলা যায় যে, 'একশো দিন' পর ফ্রান্সের সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা নির্ণয়ের সময় পরাস্ত দেশের সঙ্গে যে আচরণ করা হয় তাকে অবশ্যই নমনীয় বলতে হয়। যদি প্রুসিয়ার প্রত্যাশা পূরণ করা হতো তাহলে পুনর্বাসিত অষ্টাদশ লুই-র সরকারকে বিসর্জন দিতে হতো আলসেস ও লরেন। ওয়েলিংটন ও কাসলরির অভিমত পোষণ করেন যে, ফ্রান্সকে ভূ-খণ্ড হারাতে হলে বুরবঁ রাজবংশের কর্তৃত্ব সবচেয়ে বেশি খাটো করা হবে। অন্য কোনো কঠোর ব্যবস্থায় ততোটা ক্ষতি করা হবে না। এটা ইংল্যান্ড-এর স্বার্থের অনুকূল ছিলো, ইউরোপের জন্যও সুবিধাজনক ছিলো

---

১. ওয়েলিংটনের বাহিনী 'ছিলো অত্যন্ত বাজে মানুষ সজ্জিত, কাহিনীও ছিলো অত্যন্ত কিছু মানের', এই অভিমত উক্ত বাহিনীর অধিনায়কের। বাহিনী গঠিত হয় ২০,৯০০ জন বৃটিশ, ১৭,০০০ জন দিনেমার ও ওলন্দাজ, ১১,০০০ জন হ্যানোভারিয়ান, ৯,৯০০ জন ব্রুশউইয়ারের এবং ২,৮০০ জন এমুরের সৈনিক দ্বারা।

যে, পুরাতন রাজবংশ নেপোলিয়নের বিজয়াত্মক যুদ্ধ এবং গৌরবজনক সময় থেকে বিযুক্ত থাকলেও, এই রাজবংশকে ফরাসি জনগণের আনুগত্য পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করার জন্য সাহায্য করতে হবে। এই কাজটি করা কিছুতেই সম্ভব হতো না যদি ফ্রান্সিসদের লুণ্ঠনের পুরো সুযোগ দেয়া হতো। তবে ফ্রান্সকে বুইলোঁ ডাচি হারাতে হয়, আড্রেনেসের অংশবিশেষ তুলে দিতে হয় নেদারল্যান্ডের হাতে, সারলুই ও লান্ডু দুর্গ দখল করার সুযোগ পায় জার্মানি, তাছাড়া ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করতে হয় সাত শত মিলিয়ন ফ্রাঁ, দখলদার বাহিনীর অধীনে থাকতে হয় পাঁচ কিংবা তিন বছর উপরন্তু শিল্প সংগ্রহ ফিরিয়ে দিতে হয়। পূর্বেকার ব্যবস্থায় ফ্রান্স ও গুলি দখলে রাখার অনুমতি লাভ করেছিলো। এই শর্তগুলিতে ফরাসিদের গর্ব আহত হওয়ার মতো কিছু ছিলো না, তবে রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডারের আশঙ্কা ঘটনাক্রমে ন্যায়সংগত বলে প্রমাণিত। রুশ জার বলেছিলেন, বুরবঁ রাজবংশকে পুনর্বাসিত করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক হবে না। আগ্নেয় বিপ্লবের আবহ বিরাজিত অবস্থায় বৈধতার বৃক্ষ ঠিক স্বাভাবিক ডালপালা মেলতে পারে না। ইউরোপের শক্তিসমষ্টি ফ্রান্সকে একদিকে সহিংস আলোড়ন থেকে রক্ষা করতে পারেনি, অপরদিকে প্রতিরোধ করতে পারেনি বোনাপার্টবাদের প্রত্যাবর্তন কিংবা ঠেকাতে পারেনি দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। তথাপি নানা ত্রুটিবিচ্যুতি ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইউরোপে পরবর্তী ত্রিশ বছর তুলনামূলক শান্তি বিরাজ করে।

মেটারনিক, কাসলরিয় এবং ক্যানিং

মিত্রদের লক্ষ্য: ইউরোপীয় ঐকাসমবায়। পবিত্র মৈত্রী। জার্মানি। মেটারনিকের ব্যবস্থা। **অস্ট্রিয়া এবং ইংলান্ড:** গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধ। মহম্মদ আলি এবং মিশরের হস্তক্ষেপ। **জর্জ ক্যানিং:** স্পেন এবং দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃটিশ নৌবাহিনীর ভূমিকা।

ফরাসি বিপ্লব এবং নেপোলিয়ন ইউরোপের সরকারগুলিকে এতটা যন্ত্রণা দেয় যে ঐ 'করসিক্যান মানুষখেকো'কে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত এবং রাজা অষ্টাদশ লুইকে প্যারিসের রাজদরবারে পুনরায় নিরাপদে বসানোর পর মহামৈত্রীর (Great Alliance) নৃপতিবর্গ এবং মন্ত্রীদের মাথায় শুধু একটি চিন্তাই কাজ করেছে। তা হলো, ইউরোপে কোনো অবস্থাতেই ফরাসি বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের পুনরাবৃত্তি হতে দেয়া যাবে না। ১৯১৮ সালের বিজয়ী আঁতাতের অবশ্য জনরুশ যেমন সমস্বরে বলেন "প্রুসীয় সমরবাদ আর নয়", তেমনি ১৮১৫ সালের যুদ্ধের বিজয়ীরা একটা অভিন্ন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন যে, আর কোনো প্রকার ফরাসি বিপ্লব নয়, শুধু তাই নয়, উদারনৈতিক অভিমতের প্রতিটি জীবাণুকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে যাতে তা থেকে মারাত্মক বৈপ্লবিক জ্বরভাবের সৃষ্টি হতে না পারে। পরবর্তী তেইশ বছরের মহাদেশীয় কর্মপন্থায় সাধারণ সুর হিসেবে যে বিষণ্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তার পেছনে সর্বদা কাজ করেছে সাম্প্রতিক বিপ্লবের স্মৃতি, এই বিপ্লব বস্তুটা কি ছিলো, ভবিষ্যতে এটি কোন রূপে আবির্ভূত হতে পারে, সেই ভয়।

এটি খুব স্বাভাবিক ছিলো যে এইসব বিক্ষোভবোধ এবং আতংক খুব বেশি অনুভূত হবে তিনটি স্বেচ্ছাচারতন্ত্রী দেশে। কারণ এই তিনটি দেশে আক্রমণ পরিচালনা এবং সমস্ত অহংকার ধূলিসাৎ করে নেপোলিয়নের বাহিনী। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়ার নৃপতিরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইউরোপ এবং ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি তাদের কর্তব্য হলো বৈপ্লবিক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং যেখানে বিপ্লবের কুৎসিত মাথা উঁকি দেয় সেখানেই আঘাত করা। তাদের এ উদ্যোগে তারা বৃটিশ সরকারের নিরবচ্ছিন্ন সহানুভূতি ও সমর্থন প্রত্যাশা করে। কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি।

নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের ভেতর থেকে বৃটেন নতুন শিল্প ব্যবস্থা এবং নতুন সাম্রাজ্য হিসেবে বেরিয়ে আসে। সে কুক্ষীগত করে মাল্টা, ইওনিয়ান আইলস, মৌরিশাস, এবং সিংহল। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কানাডার প্রতিরক্ষায় সফল হয়। এই যুদ্ধের সূচনা হয় ১৮২২ সালে গভীর সমুদ্রে ভারসির অধিকারকে কেন্দ্র করে। বৃটেন দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিশ এবং পর্তুগিজ কলনিগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ শুরু করে। এই কলনিগুলি আবার উপসাগরীয় যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে মূল দেশ দুটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বৃটেনের আমন্ত্রণ মহাদেশীয় মিত্রদের থেকে পৃথক ছিলো। কারণ তার ছিলো বিরাট ও সম্প্রসারণশীল অ-ইউরোপীয় স্বার্থ, তাছাড়া বৃটেন কখনো নেপোলিয়ন কর্তৃক

সরাসরি আক্রান্ত হয়নি। উপরন্তু, অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের অধীনেও ইংলান্ড পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা বজায় রেখেছে, এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার কখনো খর্ব করেনি। কাসলরিয়, যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের শেষ দিনগুলিতে বিজয়ের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান, তাকে নিজের দেশবাসীরা নিন্দা করে প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং পশ্চাৎমুখীনতার প্রতিমূর্তি হিসেবে। অথচ রাশিয়ার আলেকজান্ডার কিংবা অস্ট্রিয়ার মেটারনিকের তুলনায় তিনি ছিলেন উদারনৈতিক ও জ্ঞানদীপ্ত সংস্কারের দেবদূত।

তবু ইংল্যান্ড নানা ব্যাপারে ইউরোপীয় মহাদেশ থেকে ভিন্ন হলেও গত যুদ্ধে বিরাট ভূমিকা পালন করে। তথাপি ইউরোপীয় পুনর্গঠনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে অস্বীকৃতির কথা জ্ঞাপন করে। যুদ্ধের কারণে দেশটি দ্বীপমণ্ডুকতা পরিহারে বাধ্য হয়, দেশের রাষ্ট্রবিদদের অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ সৃষ্টি এবং বহৎ মৈত্রীর মধ্যে কূটনৈতিক আত্মত্যাগের মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করে। মেটারনিক ও কাসলরিয় পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এজন্য দু'জনের মধ্যে গভীর নৈকট্যের সৃষ্টি হয়। বৃটেন জারের আধ্যাত্মিক পবিত্র আঁতাতে যোগ দেয়নি (খ্রিষ্টান নীতির ভিত্তিতে গঠিত, এর কোনো বৈধমূল্য ছিলো না), তবে সে সমধিক বাস্তবসম্মত ইউরোপীয় ঐক্যে যোগদান করে (২০ নবেম্বর, ১৮১৫)। এই চুক্তির ফলে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলি (রাশিয়া, প্রুসিয়া, অস্ট্রিয়া এবং বৃটেন) প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে কোনো অবস্থাতেই বোনাপার্ট রাজবংশকে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়া যাবে না। উপস্থিত রাষ্ট্রবিদরা জাতিপুঞ্জ গঠনের কথা ভাবেন নি, কারণ তারা জাতীয়তার নীতি প্রত্যাখ্যান করেন। তবে চতুঃশক্তি মৈত্রীচুক্তিতে ব্যবস্থা রাখা হয় যে চুক্তিকারী পক্ষগুলি অভিন্নস্বার্থ এবং ইউরোপের শান্তি ও নিরপেক্ষ বিষয়ে আলোচনার জন্য মাঝে মাঝে সম্মত সময়ে মিলিত হবে।

ইউরোপের শান্তি রক্ষার জন্য চতুঃশক্তির ঐক্য গঠনই ছিলো উত্তম পন্থা। এর চেয়ে উন্নত কোনো পন্থার কথা তখন তাদের মনে আসেনি। যাহোক, অবিলম্বে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে শক্তিগুলোর জোট যতটা বাহ্যিক ব্যাপার, ততোটা বাস্তব নয়। মেটারনিক মনে করতেন যে চতুঃশক্তির মৈত্রী হবে সমগ্র ইউরোপে উদারবাদী আন্দোলন দমনের সক্রিয় হাতিয়ার, কাসলরিয় মনে করতেন, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চতুঃশক্তির দায়িত্ব নয়। কাসলরিয় ছিলেন টোরি, বিরোধী হুইগরা তাকে টোরি স্বৈরশাসনের অবতার, জার সরকারের পবিত্র মৈত্রীর হাতিয়ার (অথচ এই জোটে যোগ দিতে তিনি অস্বীকার করেন) এবং সমগ্র বিশ্বে উদারবাদী আন্দোলনের শত্রু বলে মনে করতেন। কিন্তু কাসলরিয় যদিও চাইতেন যে রাশিয়া এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হিসেবে জার্মানির শক্তিবৃদ্ধি হোক, ইউরোপীয় রক্ষণশীলতার উপাদান হিসেবে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রীকে মূল্যবান মনে করতেন, তবে মহাদেশীয় রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ বিবাদে ইংল্যান্ড জড়িত হয়, এটা তার কাম্য ছিলো না। কাসলরিয় টোরি হলেও, তার এতটুকু জানা ছিলো যে তার দেশবাসীরা মেটারনিকের পুলিশী জুলুমের সহযোগী হতে অস্বীকার করবে। এ বিষয়ে ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো মূলত উদারনৈতিক, অস্ট্রীয়দের নীতি ছিলো কঠোর রক্ষণশীল। এই যে ব্যবধান, এই ব্যবধান আরো বিস্তৃত হয় কাসলরিয়র মৃত্যুতে এবং ক্যানিং-এর ক্ষমতা গ্রহণে। এবার ব্যবধান নয়, সম্পর্কে রীতিমতো ফাটল ধরে খোলাখুলিভাবে।

ইতারসরে মহাদেশের তিনটি স্বেচ্ছাচারতন্ত্র ১৮২০ সালে একটি মৈত্রী জোট গঠন করে, উক্ত মৈত্রী ১৮২৬ সাল পর্যন্ত সচল ছিলো। লক্ষ্য ছিলো উদারবাদ এবং বিপ্লববিরোধী কর্মপন্থা অধিকতর কার্যকর করা। এটিই সেই 'পবিত্র মৈত্রী', যা জার্মানির মননব্রতী জীবনের শ্বাসরোধ করে, ইতালি থেকে নিয়মতান্ত্রিকতার নামগন্ধ মুছে ফেলে, স্পেনে পুনরায় কায়েম করে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র, দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহী গণতন্ত্রগুলিকে অনুমোদন প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। উপরন্তু ট্রপ্পৌ, লাইবাখ এবং ভেরোনার সম্মেলনগুলিতে ইংল্যান্ডের উদারনৈতিক দর্শনের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পবিত্র মৈত্রী সম্পর্কে গ্যেটে বলেছেন, "ইতিপূর্বে এতোটা মহৎ এবং প্রয়োজনীয় মন্ত্র মানবতার জন্য উদ্ভাবিত হয়নি"; আর গ্যেটের মন্তব্যকে আমরা শ্রদ্ধা করতে বাধ্য। নেপোলনীয় যুদ্ধের ভয়াবহ আতংক এবং কঠিন যন্ত্রণার পর মানবতা বিজয়ী পক্ষের রাষ্ট্রবিদদের কাছে দাবি করতে পারে যে আর্ন্তাতিক সম্পর্ক আরো সুন্দরভাবে সংগঠনের জন্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা তারা করবেন। এই অভিমত পোষণ করতেন মি. পিট; প্রায় অনুরূপ স্বপ্ন দেখতেন রাশিয়ার আলেকজান্ডার। এই আলেকজান্ডার একবার হয়তো খ্রিষ্টানদের মহান ঐক্যের আধ্যাত্মিক পরিকল্পনার কথা বলেন, আবার হয়তো ভিয়েনা সন্ধির স্বাক্ষরদাতাদের আবছায়া সংগঠনের পরিকল্পনার কথা বলেন। সত্যি বলতে কি, বরফশীতল এবং বাস্তববুদ্ধির কাসলরিয়ও অনুরূপ অভিলাষ পোষণ করতেন। স্বেচ্ছাচারতন্ত্রীদের ত্রয়ী শক্তির মৈত্রী জার সরকারের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি, কাসলরিয়-র উদার মনোভাবাপন্ন সতর্কতার দাবিও ছুতে পারেনি, যে শর্তাধীনে কার্যকরভাবে ইউরোপ শাসিত হওয়া উচিত তাও পূরণ করা যায় নি। ত্রয়ী শক্তির এই মৈত্রী চুক্তির ভিত্তি জনগণ নয়, এটি বিরোধিতা করে যুগের প্রবলতম আশা-আকাঙ্ক্ষার, এবং যেহেতু এই মৈত্রীর মূল নায়ক রুশ বাহিনীর পরম প্রভু, এবং এই বাহিনী ইউরোপীয় মঞ্চের বৃহত্তম, ফলে এটি পশ্চিম জগতে নিদারুণ সন্দেহের উদ্রেক করে। তবু ইউরোপীয় সমাজে কিছুটা শান্তি, কিছুটা শৃঙ্খলা এবং ভদ্রতা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে, মেটারনিকের দাওয়াই, পবিত্র মৈত্রী, মহান গ্যেটের নিঃস্বার্থ বুদ্ধিমত্তার কাছে গভীর আবেদন রাখতে সমর্থ হয়।

এই যে একটা ধারণা, যে ধারণা ইউরোপের তখন অনেকেই পোষণ করতেন, যে নঞর্থক রক্ষণশীলতার নীতির ভিত্তিতে ইউরোপ শাসন করা যাবে, তার চেয়ে অবাস্তব আর কিছু হতে পারে না। স্কট ও বায়রন, শেলি, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর যুগ, Froebel-এর শিশু শিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রবার্ট ওয়েনের সমাজতন্ত্র বিষয়ে দুঃসাহসিক পরীক্ষা, বৃদ্ধিবৃত্তিক জাড্যের পরিচয় বহন করে না, বরং কল্পনাপ্রধান ক্ষেত্রে কৃতিত্বের অবিস্মরণীয় দিগদর্শন সৃষ্টি করে।

এমন যদি কেউ ভাবেন যে নানাবিধ স্বপ্ন এবং পরিকল্পনায় উদ্দীপিত ইউরোপ, তার প্রসিদ্ধ কবি এবং রোমাঞ্চ সন্ধানীদের নিয়ে, পূর্বতন সৈনিক এবং নাবিকদের নিয়ে (যারা নব নব উদ্যোগের জন্য ভেতরে ভেতরে তোলপাড় অনুভব করছে) বিনা বাক্যে, শুধু মাত্র ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বলে ভিয়েনার শান্তির বন্দোবস্ত মেনে নেবে, তাহলে সেটা নিতান্ত অলস চিন্তা বলে গণ্য হতে বাধ্য। বিগত যুদ্ধের পর জাতীয়তার নীতি এবং সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির সম্ভাব্য ইচ্ছার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করায় শান্তি নির্মাতারা প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হন। আবার সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে সার্বিক অস্থিরতা দেখা দেয় মেটারনিকের যুগে। এটিও ছিলো ভিয়েনা শান্তি বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া। ইতালীয় এবং চেকরা অস্ট্রিয়ার অধীনে, বেলজীয়রা

ওলন্দাজদের অধীনে, পোলরা রুশ ও প্রুসিয়দের অধীনে, সার্ব ও গ্রিকরা তুর্কিদের অধীনে নিদারুণ যন্ত্রণার ভেতর জীবনযাপন করছিলো। মহৎ প্রকৃতির জার্মানরা আশা পোষণ করতেন যে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশাল শক্তি থেকে জন্ম লাভ করবে জাতীয় ঐক্য এবং নিয়মতান্ত্রিক সরকার। কিন্তু তাদের নির্দয়ভাবে হতাশ হতে হয়। ঐক্যের লক্ষণ নেই, শুধু গঠন করা হয় উনচল্লিশটি রাষ্ট্রের একটি ডায়েট, প্রতিটি অঙ্গ রাষ্ট্রের বিদেশ নীতি প্রণয়ন এবং পরিচালনার অধিকার রয়েছে, উপরন্তু যে কোনো অঙ্গ একক ভোটের ক্ষমতা দ্বারা ফেডারেল সংসদের (Bund) প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভণ্ডুল করে দিতে পারে। জার্মান সংহতি বলতে কিছু নেই, কারণ ডেনমার্ক এবং লুক্সেমবার্গের মতো বিদেশী শক্তির ডায়েটে আসন রয়েছে; ব্যাভারিয়া এবং বাডেন রাজ্য বাদে কোথাও শক্তিশালী সংসদীয় কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায় না। সর্বত্র অভিন্ন দৃশ্য, জ্ঞানালোকহীন, প্রচ্ছন্ন স্বেচ্ছাচারতন্ত্র। সংসদীয় স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সত্ত্বেও প্রুসিয় সামন্ত প্রভুরা এটি সব সময় নিশ্চিত করতেন যে পার্লামেন্ট জাতীয় কিছু যেন বার্লিনে বসতে না পারে। জার্মান উদারবাদীরা সর্ব কালেই ছিলেন সংখ্যালঘু। স্বীয় দেশের রাজনৈতিক অথর্বতা এবং উষরতা লক্ষ্য করে যৎপরোনাস্তি হতাশ বোধ করতেন। এদিকে প্যারিস এবং ওয়েস্টমিনস্টারে প্রাণচঞ্চল বিতর্কের খবরে ঈর্ষা বোধ না করে পারতেন না। এই জার্মান উদারনীতিকরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করতেন নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে এই যে প্রভূত সম্পদের ক্ষয় হলো, রক্তপাত হলো, এতে তাদের পিতৃভূমি মূল্যবান কি লাভ করলো।

সমস্ত সমস্যার মূল কারণ এখানে নিহিত যে, জার্মানরা নিজেরাই তাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গঠনমূলক কোনো পরিকল্পনা বিষয়ে এক মত হতে পারতেন না। অনেকে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন যে জার্মানি প্রুসিয়ার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হোক, আবার অনেকে চাইতেন অস্ট্রীয় সম্রাটের প্রতি আনুগত্যশীল জার্মানি, অনেকে ফেডারেশন (যুক্তরাষ্ট্র) গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে অস্ট্রিয়া, প্রুসিয়া এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রতর দেশ অন্তর্ভুক্ত হবে। সদস্য দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা এবং ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করবে। বাইরের জগতের কাছে অনুভূত হতো যে জার্মানি অধিতত্ত্বের কুয়াসার ভিতর ঘুরাফিরা করছে। মিশেলে পরবর্তী কালে জার্মানিকে বর্ণনা করেন "ইউরোপের এসিয়া হিসেবে"।

জাতীয় অধিকার অস্বীকার করার জন্য শুধু ইউরোপের শান্তি বিঘ্নিত হয়নি। অত্র অঞ্চলের তিনটি স্বেচ্ছাচারতন্ত্র জনগণের কণ্ঠরোধ করেছে নির্দয়ভাবে। পোপীয় নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় পদ্ধতি, জেসুইট সম্প্রদায়, নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা আরো একবার কার্যকর করা হয়। ইতালিতে যাজকের দল অস্ট্রীয় বেয়নেটের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি বিদ্যালয় এবং খবরের কাগজ। ক্যাথলিক গোড়ামীচ্যুত লেখা যাতে কোথাও প্রকাশিত হতে না পারে সেদিকেও কঠোর নজর রাখা হয়। স্পেনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের অধীনে গির্জাসঙ্ঘ তাদের বিশাল অনুদান (endowments), উপার্জন কর থেকে অব্যাহতি, এবং বিপুল সংখ্যক অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের সমর্থনে রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করে। সুখের বিষয় এই যে, আধা প্রটেস্ট্যান্ট জার্মানিতে বুদ্ধিজীবীদের ধ্বংসসাধনের কাজটা সম্পূর্ণ করা যায় নি। দ্বিতীয় জর্জ প্রতিষ্ঠিত গটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ অপেক্ষাকৃত কম ছিলো। এই প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা কম-বেশি ভোগ করেছে। কারণ এটি

ইংরেজদের ইলেক্টোরেটে বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত ছিলো। অন্যত্র ১৮২০ সালের ভিয়েনার নির্দেশে বিদ্যমান নিপেক্ষণ ছিলো সে যুগের সাধারণ নিয়ম।

এই প্রতিক্রিয়াশীল এবং অ-জাতীয় ইউরোপের বিপরীতে আমেরিকার দৃশ্যপট ইংরেজদের উদারনীতিকদের মনোবল অনেকাংশে চাঙা করে। উত্তর আমেরিকায় স্বাধীনতা লাভ করে একটি শক্তিশালী প্রজাতন্ত্র। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় বেশ কয়েকটি সম্প্রদায় ক্যারাকাসের সাইমন বলিভারের প্রেরণাদায়ক নেতৃত্ব এবং ইংরেজ নাবিক ও বণিকদের ব্যক্তিগত সহায়তায় (বিশেষত লর্ড কোচরেনের সাহায্যে) ইউরোপীয় প্রভুদের থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম শুরু করে। ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অপেক্ষাকৃত অবিকশিত ছিলো বলে দুই আমেরিকার সঙ্গে বিশেষ সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়। কটন জিন উদ্ভাবনের (১৭৯৩ সালে উদ্ভাবিত) ফলে দুই ক্যারোলাইনায় তুলা চাষের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উদ্দীপনার সঞ্চার হয় ইংরেজরা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। লাতিন দক্ষিণের বিদ্রোহী দেশগুলির সঙ্গে ইউরোপের যে বাণিজ্য চলে আসছিলো তার পুরোটাই ইংরেজদের দখলে যায়। বাস্তবিক পক্ষে একটার পর একটা ক্রিওল রাষ্ট্র ইউরোপীয় প্রভুদের থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে, যেমন লর্ড কোচরেন প্রথমে মুক্ত করেন পেরু, অতঃপর ব্রাজিল, বলিভার কলম্বিয়ার পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং মেক্সিকোর পক্ষে ইটুরবাইড স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, অপর দিকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে নতুন বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য ভাগ্যবান ও দুঃসাহসী ইংরেজদের জন্য উন্মুক্ত। এই সময় লন্ডন নগরীর বণিক সম্প্রদায় সরকারের কাছে আবেদন জানায় যে অত্র অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের স্বার্থে বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত।

যে ইংরেজ ভদ্রলোককে দক্ষিণ আমেরিকা সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে তার নাম জর্জ ক্যানিং। ইনি ছিলেন বাগ্মী এবং বুদ্ধিদীপ্ত। টোরি সরকারের সদস্য হলেও, পার্লামেন্টারি সংস্কারের ঘোরতর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও, বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে সে যুগের জন্য নব। জনপ্রিয় এবং উদারনীতিক কর্মপন্থার পক্ষপাতী ছিলেন। দেখা যায়, অনেক কাল পরও তার এই কর্মপন্থা লর্ড পামারস্টোন অনুসরণ করেন। জর্জ ক্যানিং-এর নীতি মোটামুটিভাবে পঞ্চাশ বছর টিকে থাকে ইউরোপীয় মহাদেশের স্বৈরশাসকদের পথে কাঁটা হিসেবে। পররাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যৌথভাবে কাজ করা ক্যানিং পছন্দ করতেন না। অস্ট্রিয়া যদি রাশিয়া এবং প্রুসিয়ার সম্মতিক্রমে নেপলস এবং পিডমন্টের বিপ্লব দমন করে তবে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। ফ্রান্স যদি স্পেনে একটি বাহিনী প্রেরণ করে সামরিক বিদ্রোহ দমন করার জন্য (সামরিক যাজকীয় এবং স্বৈরাচারী রাজার উপর একটি শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছে বলে), তাহলে সেটার জন্যও ইংরেজদের অনুমতি কিংবা সমর্থনের দরকার করবে না।

অপর দিকে, ফ্রান্স কর্তৃক স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা লন্ডনে অত্যন্ত গভীর উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হয়। যদি স্পেনের সামরিক বিদ্রোহ দমনের পর ফরাসিরা সে দেশে থেকে যায়, যদি তারা ইংল্যান্ডের মিত্র দেশ পর্তুগাল আক্রমণ করে বসে, কিংবা ইন্ডিজ পুনরুদ্ধারে তারা স্পেনীয়দের সাহায্য করে? এ ধরনের সম্ভাবনা ঠেকানোর জন্য ক্যানিং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্বৈরশাসকদের আতঙ্কে এবং ক্রোধের সৃষ্টি করে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহীদের স্বীকৃতি প্রদান করেন।

ক্যানিং-এর উক্ত ঘোষণার ফলে ইউরোপে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতিক্রিয়া প্রবলতর হতো যদি ক্যানিং-এর প্রস্তাব অনুসারে লন্ডন ও ওয়াশিংটন থেকে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির অবস্থান নিয়ন্ত্রিত করা যেত। জন কুইন্সি এডামসের পরামর্শ অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একতরফে ঘোষণা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কংগ্রেসের কাছে প্রেরিত একটি প্রসিদ্ধ বাণীতে প্রেসিডেন্ট মনরো আমেরিকা মহাদেশের জন্য নামক মতবাদ প্রকাশ করেন। একই বাণীতে তিনি ইউরোপীয়দের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, ইউরোপীয়রা আমেরিকা মহাদেশে নতুন কোনো উপনিবেশ গড়তে গেলে সেটা সহ্য করা হবে না। মনরো মতবাদে ক্যানিং-এর ঘোষণার সারাংশ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে উনবিংশ শতাব্দীর সিংহ ভাগ সময়ে আমেরিক্যান মহাদেশ ইউরোপীয় আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় মনরোর চমৎকার ঘোষণার জন্য নয়, বরং বৃটিশ রাজের সুদক্ষ নৌবাহিনীর জন্য।

বৃটিশ নৌবহর দক্ষিণ আমেরিকার কলনিগুলির স্বাধীনতা ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করে। অতঃপর অবদান রাখে গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রামে।

গ্রিকরা তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ায় আন্তর্জাতিক কনসার্টের ক্ষেত্রে দুটি পরস্পর বিরোধী ঝোঁক সুস্পষ্ট হয়। অস্ট্রিয়ার জেসুইট-প্রশিক্ষিত অভিজাতবর্গের কাছে গ্রিক জাতীয়তাবাদ একটি ব্যাধি মাত্র। এই ব্যাধি যদি সংক্রামক রূপ ধারণ করে দানিয়ুব উপত্যকা পর্যন্ত ছড়ায় তাহলে তাদের রাষ্ট্র অক্ষা পাবে। আশংকাটি একেবারে অমূলক ছিলো না। আবার, ইংল্যান্ডের অভিজাতবর্গ এধরনের কোনো আশংকাকে আমল দিতেন না। এই অভিজাতবর্গের কাছে ইংরেজ জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত উপভোগ্য বস্তু, আইরিশ জাতীয়তাবাদকে তারা দমন করেছে, আর ভারতে এখনো জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া করেনি। শিক্ষা-দীক্ষা তাদের গ্রিকদের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছে, রাজনৈতিক জীবনে তারা সংসদীয় আদর্শে বিশ্বাসী, আর তাদের ক্রীড়াবিদসুলভ সহানুভূতি আছড়ে পড়ে একটি ক্ষুদ্র জাতির উপর, যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। কবি বাইরন যখন মিসোলংঘিতে গ্রিসের (Hellenic) স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হন, তখন ইংরেজদের গ্রিকদের প্রতি রোমান্টিক উৎসাহ সদর রাস্তা থেকে শুরু করে তুচ্ছ গলির পানশালা এবং সরাইখানায় ছড়িয়ে পড়ে। কেউ জানতে চান নি, অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজের হলগুলিতে যে সুপ্রাচীন হেলাসের (Hellas) প্রতি অনুরাগী হতে বলা হয় তরুণদের, তার কতোটা বর্তমান গ্রিস এবং সংলগ্ন দ্বীপগুলির রাখাল, দস্যু এবং জলদস্যুর মধ্যে বেঁচে আছে। গ্রিস নামটাই সৌভাগ্যের বাতাবাহক। এদিকে তুরস্ককে যদিও নিকট বন্ধু এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়, তবু ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ জর্জ ক্যানিং-এর সমর্থনে দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর ফ্রান্স এবং রাশিয়ার সঙ্গে হাত মেলায় গ্রিকদের জাতিসত্তা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

যে গ্রিকরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাদের সঙ্গে প্লেতো এবং এরিস্টটলের দেশবাসীর সাংস্কৃতিক কিংবা রক্তের সম্পর্ক নামমাত্রও নেই (কিছুটা আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, এই যা)। আজকের গ্রিকরা প্রধানত নিরক্ষর স্লাভ ও আলবানীয় জাতিগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত। তারা এটুকুতে সন্তুষ্ট ছিলেন যে তাদের মন-মানস বাইজান্টাইন গির্জার সন্ন্যাসী এবং যাজকদের অনুরূপ হবে। এদের ভাষা রোমাইক (Romaic)। এই গ্রাম-

এক সময় উৎপাত মেষপালক ও নাবিকদের ঠোঁট থেকে, তুর্কি, লাতিন এবং স্লাভ ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করা হয় অবাধে। তারা গ্রিক বর্ণমালা ব্যবহার করে। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ডানা হোমারের মহাকাব্য এবং ইসকিলাসের ট্র্যাজেডিগুলি চৈনিক ভাষায় বাঁচতে হলেও কোনো ক্ষতি ছিলো না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অনুপ্রেরণা লাভ করেছে পুরাকাল থেকে। সার্বরা চৌদ্দ শতকের স্টিফেন দুসানের দিকে ফিরে তাকায়, ইতালীয়রা প্রেরণা খোঁজ করে এবং ভার্জিলে, বোহেমিয়ানরা স্মরণ করে প্রসিদ্ধ পুরাকালের চেক গাথাকাব্য এবং উপাখ্যানে। আইরিশরা প্রেরণা সন্ধান করে তাদের সুপ্রাচীন লোকগাথায়। কোরাইস নামের জনৈক কনস্টাণ্টিনোপল স্কুল শিক্ষক একটা চমৎকার ধারণার জন্ম দেন। তিনি অনুভব করেন প্রাচীন গ্রিসের সাহিত্য বিশুদ্ধ গ্রিক এবং আজকের দিনের মৌখিক ভাষার মাঝামাঝি একটা ভাষায় তর্জমা করলে মন্দ হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই কঠোর পরিশ্রমী পণ্ডিত উদ্ভাবন করেন একটি নতুন ভাষার। ফলে একটি নতুন জাতির আবির্ভাব সম্ভব হয়।

গ্রিকদের উত্থানের পথ প্রস্তুত করে কয়েকটি মারণাঘাত, যার ফলে তুর্কি সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে, হয়তো তুর্কি সাম্রাজ্য বিগঠনের পথও পরিষ্কার হয়ে যায়। কারা জর্জের অধীনে সার্বিয়া ১৮০৪ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, স্বাধীনতার দাবি জানায়। এই কারা জর্জ ছিলেন শূকরপালক। আড্রিয়াটিক উপকূলে আলি অব জেনাইনা নিজেকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আলবানিয়ার এক দুঃসাহসিক সৈনিক, মেহমেত আলি, মিশরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে যাওয়া (ডিসপার্সন) বিত্তশালী গ্রিকরা, যারা ১৮১৫ সালে Philike Hetairia নামক বিদ্রোহী সুপ্ত সমাজ গঠন করে ওডেসায়, তারা তাদের নতুন জাতির জন্য আশা-ভরসার ইশারা খুঁজে পায়।

১৮২১ সালে প্রিন্স আলেকজান্ডার ইপসিল্যান্টির নেতৃত্বে প্রথম বিদ্রোহ মাথা চাড়া দেয়। এই প্রিন্স ছিলেন জারের এইড দ্য কাং। কিন্তু উক্ত বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিলো দুর্বল, ঘাটতি ছিলো যথাযথ কৌশল অবলম্বনে, তাছাড়া রাশিয়া এবং রুমানিয়ার সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয় (অথচ এই দুটি দেশের সমর্থনের উপর তারা খুব বেশি নির্ভর করেছিলো), ফলে তুর্কি বাহিনী ওয়ালাচিয়াতে বিদ্রোহ দমনে অনায়াসে সমর্থ হয়। যাহোক, গ্রিকরা একটা সুবিধা ভোগ করেছে, যা সাধারণত সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে ভোগ করার সুযোগ হয় না। যতদিন গ্রিক নৌবাহিনীর জলভাগে তুর্কিদের ছাড়া অন্য কোনো শক্তির মোকাবেলা করতে হয়নি, ততদিন গ্রিক ধনাঢ্য দ্বীপবাসীরা তাদের নৌযানের সাহায্যে শত্রু সেনাদের তফাতে রাখতে সমর্থ হয়েছে, মূল স্থলভাগে অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণেও বাধা থাকেনি। গ্রিকরা তিন বছর পশ্চিমী স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে সমান শক্তির পরিচয় দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে ভয়ানক শত্রুর বিরুদ্ধে। উভয় পক্ষ ছিলো ঘোরতর নৃশংস। অতঃপর আকস্মিকভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। মিশরের অমিত শক্তিধর পাশা সুলতানের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়।

মেহমেত আলি ছিলেন কাভাল্লার একজন আলবেনীয় মুসলমান, মিশরের স্বাধীনতার স্থপতি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৭৬৯ সালে, অতএব বোনাপার্ত এবং ওয়েলিংটনের সমকালীন। সুযোগ বোঝার ক্ষেত্রে তার কোনো জুড়ি ছিলো না, পরিস্থিতি অনুযায়ী অসাধারণ কৌশলের পরিচয় দিতে পারতেন। ফলে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, তা যতোই পিচ্ছিল এবং উচ্চও হোক না কেন, নিজের জন্য সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারতেন। কর

আদায়কারী হিসেবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন, তামাক ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করেন সমধিক, কিন্তু সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দেন বিশাল অটোম্যান সেনাবাহিনীর আলবানীয় শাখার অধিনায়ক হিসেবে। শুধু আলবানীয় শাখার সাহায্যেই তিনি মিশরের সার্বভৌম নৃপতির আসন লাভ করেন। তুর্কিদের তাড়িয়ে দেন, ইংরেজদের করেন পরাস্ত, মামলুকদের পাইকারী হারে জবাই করেন, তার তরবারির দৌরাত্ম্য প্রসারিত করেন মক্কা ও খার্তুম পর্যন্ত। পশ্চিম থেকে ক্রয় করা একটি নতুন রণতরী বহর, সুদান থেকে সংগৃহীত সৈনিক (এদের জনৈক ফরাসি অফিসার প্রশিক্ষণ দেয়) দ্বারা বাহিনী গঠন করে মেহমেত আলি সূচনা করেন একটি বিশাল এবং উচ্চাভিলাষী কর্মপন্থা। উপরন্তু, যদিও কথিত কর্মপন্থা শুরুতে গ্রহণ করা হয় গ্রিকদের দমনে তুর্কিদের সাহায্য করার জন্য, যার দরুন পুরস্কার হিসেবে সুলতানের কাছ থেকে লাভ করা যাবে ক্রিট দ্বীপ এবং সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন প্রদেশদ্বয়। তবে তার গোপন ও চূড়ান্ত অভিলাষ ছিলো তুর্কি সাম্রাজ্য সমূলে উৎখাত।

প্রথমে মনে হয় মিশরের পাশার হস্তক্ষেপের ফলে গ্রিকদের সকল আশা-ভরসা ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। মিশরীয় বাহিনী অনায়াসে দখল করে মোরিয়া, মিশরীয় নৌবাহিনী একক প্রাধান্য কায়েম করে ঈজিয়ান সাগরে। অবিলম্বে পশ্চিম জগতে খবর রটে যায় যে, গ্রিকদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মিশরে এবং তাদের ক্রিতদাস হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে কায়রোর হাটে, তাছাড়া গ্রিসের মূল ভূমিতে গোটা গ্রিক জাতি বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর জর্জ ক্যানিং হস্তক্ষেপ করেন। যদিও তিনি ছিলেন টোরি ঐতিহ্যের অধিকারী এবং টোরি সরকারের সদস্য, যে সরকার যে কোনো বিদ্রোহকে সুনজরে দেখতে অভ্যস্ত নয়, তবু তিনি চান না যে ইউরোপের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অঞ্চল এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সূতিকাগার আরব্য কৃষক এবং নিগ্রোদের আবাসভূমিতে পরিণত হয়। গ্রিকদের সমূলে বিনাশ মেনে নেয়ার চেয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তিকে নিমন্ত্রণ জানানোকে তিনি উচিত কাজ বলে বিবেচনা করেন। অস্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়া অভিযানে শরিক হতে অস্বীকার করে। কারণ তারা তাদের স্বাধীনতার প্রতি সহজাত ঘৃণা পরিত্যাগ করতে রাজি নয়। রাশিয়ার তুর্কি সাম্রাজ্যের সঙ্গে নানা বিষয়ে বিবাদ রয়েছে। অতএব তারা ক্যানিং-এর প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। ফ্রান্স আবেগের বশবর্তী হয়ে অংশগ্রহণ করে।

অতঃপর ক্যানিং রাশিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে লন্ডন সন্ধি সম্পাদন করেন (৬ জুলাই, ১৮২৭)। লন্ডন সন্ধিতে পরিকল্পনা গৃহীত হয় যে গ্রিস হবে তুর্কি সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বের অধীনে স্ব-শাসিত রাষ্ট্র। যেহেতু এই লক্ষ্য হাসিল করা হবে 'শান্তিপূর্ণ' নৌঅবরোধ করে, ফলে এটি গ্রিসের স্বাধীনতার প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

যদিও ক্যানিং পরবর্তী মাসে (৮ আগস্ট) লোকান্তরে গমন করেন, এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন এমন কয়েকজন টোরি মন্ত্রী যারা তুর্কি সাম্রাজ্য দুর্বলকারী কোনো কর্মপন্থার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না, কিংবা জারের সাম্রাজ্য শক্তিশালী করার বিরোধী ছিলেন, তবু ক্যানিং-এর অর্জন সম্পূর্ণ বৃথা যায় নি। শান্তিপূর্ণ নৌঅবরোধ সত্ত্বেও নাভারিনো উপসাগরে নৌযুদ্ধ বেঁধে যায় (২০ অক্টোবর, ১৮২৭), উক্ত যুদ্ধে তুর্কি ও মিশরীয় বাহিনী ত্রয়ী শক্তির কাছে নিশ্চিত পরাজয় বরণ করে এবং তাদের নৌশক্তি বলতে আর কিছু থাকে না। এই ঘটনার পর যে ধরনের প্রতিবাদই উত্থাপন করা হোক না কেন, এতে তুর্কিরা যে ক্ষুব্ধ হবে তাতে সন্দেহ করা চলে না। অতঃপর বৃটিশ রণতরী আলেকজান্দ্রিয়ায় উঁকি দেয়, একটি

কল সেনাদল আড্রিয়ানোপলে ঢুকে পড়ে, একটি শক্তিশালী ফরাসি বাহিনী মোরিয়াতে হাজির হয়। ১৮২৭ সালে ইংলান্ডে টোরি সরকারের পতন ঘটলে, এবং উদারনীতিক পামারস্টোন বৈদেশ দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করলে, গ্রীক সাম্রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন নতুন গ্রিক রাষ্ট্র অনুমোদনের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। কূটনৈতিক প্রয়োজনে অনিয়মিত সৈনিক, নাবিক ও স্বেচ্ছাসেবকদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং শিশু রাষ্ট্রকে আচ্ছাদিত করে রাজকীয় মহিমায় বাভারিয়ার জনৈক প্রিন্সকে আহ্বান জানানো হয় নবগঠিত রাজ্য শাসনের জন্য। ক্রীট, থেসালি এবং ক্রিট এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এটিকে আত্মনির্ভর হওয়ার উপযোগী বিবেচনা করা হয় না। গ্রিক ভাষী জাতির একটি অংশ মাত্র এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ওটোর খুদে রাজতন্ত্র কারো ভীতির কারণ হতো না। যদিও গ্রিসের পুনরুজ্জীবনে ইউরোপের শক্তির ভারসাম্যের কিছুমাত্র হেরফের হয় নি, তবু এটি ছিলো একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এখানে ইউরোপের স্বৈরতন্ত্রী সরকারকে শক্তি সমবায় প্রথম সফল আঘাত হানে ; এখানে অটোম্যান সাম্রাজ্য প্রথম জখম হয় ; এখানে জাতীয়তাবাদের শক্তি প্রথম রোমান্টিক এবং পূর্ণ বিজয় অর্জন করে। অতঃপর এই জাতীয়তাবাদ বিজয় অর্জন করবে ইতালি এবং পোলান্ডে, বোহেমিয়া এবং আয়ারল্যান্ডে। এই জাতীয়তাবাদের শক্তিই অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে করবে ভূপাতিত। আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বশেষ পর্বের মতো গ্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাম্প্রতিক পর্বে নানা ধরনের মানুষের আবির্ভাব ঘটে : কোলোকোট্রোনেস এবং মাইকেল কলিন্স, কোরাইস এবং আর্থার গ্রিফিথ, ক্যানিং এবং লয়েড জর্জ, ধোঁকা ষড়যন্ত্রী, সাহিত্যিক গোঁড়া ব্যক্তি, উদারনীতিক রাষ্ট্রবিদ।

আমরা যখন ভাবতে বসি গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে কি ভয়ানক ঘটনাই না ঘটে, মোরিয়াতে তুর্কিদের উপর গ্রিকরা কি নির্দয় হত্যাকাণ্ড চালায়, শত্রুপক্ষ কিওস-এর গোটা গ্রিক সম্প্রদায়কে যমালয়ে প্রেরণ করে এবং কন্সট্যান্টিনোপলের গ্রিক অধ্যুষিত এলাকার অধিকাংশ গ্রিকদের হত্যা করা হয়, তার পর আরো যখন ভাবি কি বর্বরোচিত প্রক্রিয়ার ভেতর, আমাদের কালে, বলক্যান অঞ্চলে জাতীয়তার নীতি প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই জিগ্যেশ করতে সাধ হয় এতটা মূল্য দিয়ে বলক্যান জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিলো কি-না।

যদি এটুকু স্মরণ করা হয় যে তুর্কি শাসনের অধীনে গ্রিক জনগোষ্ঠীর অবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোটেই অসহনীয় ছিলো না, গ্রিক চার্চ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে, পূর্ব ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের (Levant) বাণিজ্য ছিলো গ্রিক বণিকদের হাতে, কিছু কিছু শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গ্রিকদের ছিলো একচেটিয়া অধিকার, রাষ্ট্রের চার বড় দপ্তর ছিলো তাদের হাতে, তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, জাতীয়তাবাদের ধারণা পুষ্টি লাভ না করলে, বলক্যান অঞ্চলের ঐক্য ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতো, এবং তা হতো তুর্কি সাম্রাজ্যের খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। তবে তুর্কিদের চঞ্চলচিত্ত ও পরিবর্তনশীল স্বৈরশাসনের অধীনে বড় বেশি বশে থাকার জন্য মূল্যও দিতে হতো অনেক বেশি। তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন পশ্চিমের প্রগতিশীল ভাবধারা থেকে, তাদের মানসিকতা দাঁড়াতো চিরস্থায়ী দাসের, তা আত্ম-সম্মানবোধের সঙ্গে মোটেই সংগতিপূর্ণ হতো না, আত্ম-উন্নতির শেকড়ও গোড়া থেকে কেটে ফেলা হতো।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলি

১. সি. এ. ফাইফি : আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, ১৯১৪।
২. সি. কে. ওয়েবস্টার : কাসলরিয়-র বিদেশনীতি।
৩. এইচ. টেম্পারলি : জর্জ ক্যানিং, ১৯২৮।
৪. আলগারনন সিসিল : বৃটিশ বিদেশ সচিবগণ, ১৯২৭।
৫. ডব্লিউ. এ. ফিলিপস : গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ১৮৯৭।
৬. জি. ইয়াং : মেটারনিক, ১৯২৭।
৭. ডব্লিউ. এ. ফিলিপস : মেহমেত আলি, ১৯০৭।
৮. এ. টয়েনবি : ইতিহাসচর্চা, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৩৪।
৯. স্যার হ্যারল্ড নিকলসন : ভিয়েনা কংগ্রেস, ১৯৪৬।
১০. ই. এল. উডওয়ার্ড : ইউরোপীয় রক্ষণশীলতা বিষয়ে তিনটি বিবেচনা, ১৯২৯।
১১. সি. কে. ওয়েবস্টার : ভিয়েনা কংগ্রেস, ১৯৩৭।
১২. আর. ডব্লিউ. সেটন-ওয়াটসন : ইউরোপে বৃটেনের অবস্থান, ১৯৩৭।

১৮৩০ সালের বিপ্লব

বৃটেন ও বিশ্ব বাণিজ্য। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের দ্রুত প্রসার। জার্মান ভারি শিল্পের তুলনামূলক পশ্চাদপদতা। ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক সমাজের আত্মরক্ষা। ফরাসি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অসুবিধাসমূহ। অষ্টাদশ লুই। ফ্রান্সে দলীয় বিবাদ। উদারবাদের জোয়ার শুরু। দশম শার্ল। জুলাই বিপ্লব। লুই ফিলিপ। বিপ্লবী তন্ত্রগুণের প্রসার। বেলজিয়ামের অভ্যুদয়। পোল্যান্ডের যন্ত্রণা। পোল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে সংযোগ।

ওয়াটারলু-র যুদ্ধের পাঁচ বছর পর দক্ষিণ জার্মানির দার্শনিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম হেগেল ইংরেজদের সম্পর্কে এ রকম লেখেন : "ইংরেজদের বস্তুগত অস্তিত্ব শিল্প ও বাণিজ্যভিত্তিক এবং ইংরেজরা জগতে সভ্যতা বিস্তারের মহতী দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিয়েছে ; কারণ বাণিজ্যিক নীতির জন্য তাদের জল ও স্থলভাগের প্রতিটি অঞ্চল চষে বেড়াতে হয়, সংযোগ স্থাপন করতে হয় বর্বর জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে, সৃষ্টি করতে হয় প্রয়োজন, জাগ্রত করতে হয় উদ্দীপনা, উপরন্তু তাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হয় বণিক বৃত্তির উপযোগী পরিস্থিতি। অর্থাৎ তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হয় বিশৃঙ্খলা পরিত্যাগে, সম্পত্তির প্রতি মর্যাদা প্রদান এবং বিদেশীদের প্রতি মার্জিত আচরণ শিখতে।" তাহলে দেখা যায় ইংরেজরা একটা সাম্রাজ্যের প্রভু হিসেবে কখনো বিদেশীদের সামনে উপস্থিত হয়নি, তারা নিজেদের সে রকম ভাবেওনি কখনো, তারা নিজেদের দেখেছে বিশ্ব বণিক হিসেবে। তারা চেয়েছে যান্ত্রিক উদ্ভাবন এবং খনিজ সম্পদের দরুন তাদের দেশে যে নতুন প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়েছে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে, তারা আরো চেয়েছে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে পণ্যসামগ্রী নিজের দেশে আমদানি করতে। ইতিমধ্যে যদিও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ আবিষ্কৃত হয় এবং ইংরেজরা উক্ত মহাদেশের উপর তাদের দাবি বিজ্ঞাপিত করে, যদিও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মাধ্যমে কানাডা মহাদেশকে নিজেদের কব্জায় রাখে, উপরন্তু সিলোন*, দ্য কেপ এবং মাল্টা রাজা জর্জের বৈদেশিক সম্পত্তি হিসেবে যুক্ত হয়, এবং যদিও আমেরিকান কলনিগুলির সফল উত্থান সত্ত্বেও মাতৃদেশ ও দুহিতা দেশের মধ্যে পুরাতন ঔপনিবেশিক পক্ষপাতমূলক বাণিজ্য প্রথা টিকে থাকে, তবু ইংরেজরা কখনো চায়নি যে তাদের বাণিজ্য সাম্রাজ্যের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ইউরোপীয় মহাদেশের সমৃদ্ধ বাজারগুলি তো হাতের কাছেই রয়েছে। স্পেন ও পর্তুগালের শাসন থেকে মুক্ত হবার পর দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে ইংরেজদের বাণিজ্যের বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ইংল্যান্ডের কয়লা, আকরিক লোহা, বস্ত্র ইত্যাদির বিরাট চাহিদা রয়েছে ইউরোপীয় মহাদেশে। ইংরেজদের পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে দূরাঞ্চলের খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামালের বিনিময়ের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে বিকাশ ঘটে ইতিহাসে তার পূর্ব নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।

---

* বর্তমানে শ্রীলঙ্কা। অনু

উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে এ সময় ইউরোপ ও বাইরের জগতে যে ধরনের বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও শিল্প সভ্যতার প্রসার ঘটে তা অ্যাংলো-স্যাকসন জাতি গোষ্ঠীসমূহের মস্তিষ্কনিসৃত। ১৮১৯ সালে বাষ্পচালিত তরীর সাহায্যে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেয়া হয়। পরবর্তী যুগেই বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং জার্মানিতে উদ্বোধন করা হয় রেলপথ। চল্লিশের দশকে আমেরিকান উদ্ভাবক মোর্সের কল্যাণে গোটা ইউরোপ টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার অধীনে আসে। পঞ্চাশের দশকে স্থাপন করা হয় অবসামুদ্রিক ক্যাবল, ষাটের দশকে শুরু হয় আটলান্টিক অতিক্রমী ক্যাবল। সত্তরের দশকে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক পোস্টাল ইউনিয়ন, আটলান্টিকের দুই পারের ভেতর শস্য বাণিজ্য। এতে নতুন বিশ্বের ফসল পুরাতন বিশ্বে সহজ লভ্য হয়। কথিত শতাব্দীর শেষ দশক গোটা পশ্চিম ইউরোপে নগরের বিকাশের জন্য বিখ্যাত, তাছাড়া নগর ও পল্লীর মধ্যে লোকসংখ্যার প্রচলিত ভারসাম্যে পরিবর্তন আসে। এই ব্যাপারটা সবিশেষ লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে জার্মানিতে। ১৮৭১ সালে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় দেশটিতে প্রধানত ছিলো ভূমির মালিক কৃষক শ্রেণী এবং কৃষি কার্যের সঙ্গে যুক্ত শক্তিশালী ভূম্যাধিকারী গোষ্ঠী, বড়ো শহর বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না, শহরে জনসংখ্যা ছিলো অনুল্লেখ্য। অথচ রেলপথ, বহির্বিশ্বে সম্প্রসারণ, ইস্পাত ও বিদ্যুতের নব নব উদ্ভাবন এবং ফ্রান্সের সঙ্গে উৎফুল্লকর যুদ্ধে জয়ের ফলশ্রুতিতে ১৮৪৯ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে মাত্র ষাট বছরে দেশটির শহরে জনসংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পায়।

বৃটেনে শিল্পায়ন ব্যাপারটা সম্পন্ন হয় অতি দ্রুত। ইউরোপীয় মহাদেশে শিল্পায়নের গতি ছিলো অতি মন্থর। ব্যতিক্রম হয়তো ছিলো একমাত্র বেলজিয়াম। এই অঞ্চলটি ত্রয়োদশ শতক থেকেই শহরে জনসংখ্যার ব্যস্ততা এবং অতি স্ফীতির জন্য চিহ্নিত। ১৮২০, ১৮৩০ এবং ১৮৪৪ সালে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয় তা কারখানাগুলিতে বিদ্যমান অসন্তোষের ফলশ্রুতি ছিলো না। কথিত সময় কালে, ফ্রান্স কিংবা জার্মানি, কোথাও কারখানার সংখ্যা বেশি ছিলো না। ড. ক্লাফাম উল্লেখ করেছেন যে ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে সে ইতিয়েন এবং রুবা (Roubaix) নামক দুটি শহর দ্রুত গড়ে ওঠে। তাছাড়া দেশে উৎপাদিত মোট লৌহপিণ্ডের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ আসে বনাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে স্থাপিত খুদে কয়লা চুল্লি থেকে। জার্মানির পরিস্থিতিও এর থেকে ভিন্ন ছিলো না। জার্মানরা তাদের ইংরেজ প্রতিযোগীদের থেকে নানা ব্যাপারে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলো। তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার মান ছিলো উন্নততর, প্রকৌশল নকশা অংকনে তারা ছিলো অধিকতর দক্ষ, রসায়নশাস্ত্র বিষয়ে তাদের জ্ঞান ছিলো অন্যদের চেয়ে বেশি, সলিনগেনের কাটলারি শিল্প ছিলো ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে সুখ্যাত, ইউরোপে এর বাজারও ছিলো অন্যদের চেয়ে বিস্তৃততর। তথাপি জার্মানদের মানসিকতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন গতি-প্রকৃতির উপযোগী ছিলো না, দেশের খনিজ সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পুঁজি এবং উদ্যোগের অভাবে অনেক পেছনে পড়ে থাকে। এমন কি ১৮৪০ সালের আগে সাইলেসিয়ার কয়লাখনি কাজে লাগাতে পারেনি। সাইলেসিয়ার এই কয়লাখনিই সম্প্রতিকালে পোল্যান্ড এবং জার্মানির মধ্যে বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দরুন যদিও আরো একবার রাজা ও দরবারের দৃশ্য উন্মোচিত হয়েছে, কিন্তু তাতে জনগণের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। পূর্বতন ব্যবস্থা চির বিদায় গ্রহণ করেছে। বিপ্লব ও সাম্রাজ্যের বিপুল আলোড়নের ফলে সমাজ থেকে যে

বিরাট পরিবর্তন ঘটে তাতে অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলা আর পুনর্বাসিত হতে পারে না। এই অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার জন্যই পুরাতন রাজতন্ত্রের সরকার অনিয়মের পাহাড়ে পরিণত হয়। অভিভাবকরণ তাদের প্রাচীন ক্ষমতা হারায়। বিশপদের মহীয়ান স্মৃতি অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হয়। এই স্মৃতি কেবলি ক্ষীণ হয়ে আসছে। বিপ্লবের প্রধান বিজয়গুলি, যেমন, আইনের কাছে সার্বজনীন সাম্য, প্রজাকুলের স্বাধীনতা, জাতীয় রক্ষী বাহিনী, রাজ্যের ঐক্য, নতুন বিচার ব্যবস্থা পূর্ববর্তীদের প্রত্যাবর্তনে কিছুমাত্র প্রভাবিত হয়নি। নেপোলনীয় কোডস, লিজিয়ন অব অনার ইত্যাদি বাতিল করার ক্ষমতা কারো ছিলো না। নেপোলিনীয় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়াও কারো ক্ষমতায় কুলায়নি। কঁকরদাত ছিলো যাজক শ্রেণীর কাছে অত্যন্ত আপত্তিজনক। অথচ এটি নস্যাৎ করা যায়নি। কারণ ইতিমধ্যে এর শিকড় মাটির গভীরে চলে যায়। পুনঃ সংস্থাপিত রাজতন্ত্র তার স্বৈরাচার এবং যাজকীয় ঐতিহ্যের কারণে চক্ষু সমাজের জন্য অনুপযোগী বিবেচিত হয়। এই সমাজ এখন সাম্যভিত্তিক। শুধু তাই নয়, রাজ্যের মধ্যভাগে এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী অঞ্চলে রীতিমতো ইহজাগতিক (secular)।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় ঘোরতর দুঃসময়ে, অসুবিধার ভেতর। এই রাজতন্ত্রকে অনেকে ঘৃণা করেছে, এটি জনগণের অধিকাংশের কাছে খুব পরিচিতও ছিলো না। শুধু তাই নয়, এই ব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক সদ্‌গুণগুলি লক্ষ্য করা যায় তা টিকতে পারে যদি জনগণ নিজেদের মধ্যেকার বিভেদ ব্যাপারে বড় বেশি তিক্ত না হয়, বিভেদ সংকোচনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জেদ না করে। ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্র অনুকরণ করা যায়। তবে তাদের রসজ্ঞান, নমনীয়তা, আদান-প্রদানের সুখকর নিয়ম ধাপযুক্ত আনুগত্য (যা উক্ত শাসনতন্ত্র কার্যকর করতে সহায়তা করে) ইত্যাদির অনুকরণ করা কিন্তু খুব সহজ নয়। যেখানে সে যুগের ইংল্যান্ডের খবরের কাগজগুলি ছিলো ক্রীড়াকৌতুক এবং বিজ্ঞাপনের ব্যাপার, সেখানে ফ্রান্সের ব্যাপার ছিলো হিংস্র রাজনৈতিক নিন্দা জ্ঞাপনের ক্ষেত্র। এর অন্যতম কারণ মানুষের মন থেকে তখনও 'একশো দিন' এবং শ্বেত সন্ত্রাস সৃষ্ট উৎপীড়নের স্মৃতি মুছে যায়নি। ফরাসি বিধায়করা 'শৃগালশিকার' করেন নি। এদের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার তীব্রতা কোনো এপসম বা নিউ মার্কেট সহনীয় করতে পারেনি, কিংবা তাদের যুক্তিশীলতা করতে পারেনি নমনীয়। তাদের চিহ্নিত ভাবনায় ছিলো কঠোর স্বচ্ছতা, তাদের কথাবার্তায় ছিলো কঠোর উচ্চণ্ডতা। সে যদি কট্টর রাজতন্ত্রী হয়ে থাকে তাহলে সে চার্টার এবং কঁকরদাতকে আক্রমণ করবেই, এবং বিপ্লব কালে বাজেয়াপ্তকৃত ইস্টেটস পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে। বিরুদ্ধ পক্ষ অভিজাত বর্গ এবং যাজকদের ঘৃণা করবে, পক্ষান্তরে রাজতন্ত্রের নিন্দা করবে এজন্য যে এটি বিদেশী শক্তির তাঁবেদার। উপরন্তু রাজতন্ত্র তিন রঙা পতাকা বর্জন করেছে, তাছাড়া এমন শান্তি মেনে নিয়েছে যা একটি সামরিক জাতির জন্য অবমাননাকর।

অষ্টাদশ লুই-র অবস্থান ছিলো অত্যন্ত অসুবিধাজনক। তিনি দুই জাতি, দুটি দর্শন এবং দুটি ঐতিহ্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছেন। লুই সিংহাসনে বসতে পারেন ওয়াটারলুর জাতীয় গ্লানির কারণে। তাকে মিত্রবাহিনী বস্তাবন্দী করে এনে ক্ষমতায় বসায়। তিনি গৌরবহীন, রোমান্টিকতাবিবর্জিত একজন ব্যক্তি। অথচ তাকে শাসন করতে হবে গৌরবের জন্য তৃষ্ণার্ত, রোমাঞ্চসন্ধানী একটি জনগোষ্ঠীকে। পরিস্থিতির চাপে তিনি অর্থনীতির রাশ

টেনে ধরেন। তিনি উগ্র রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যেতে পারেন নি, কারণ তারা পূর্বের ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার মিথ্যে স্বপ্ন লালন করে। (তাঁর প্রথম সংসদে এদেরই প্রাধান্য ছিলো বেশি)। সমান ভয় করতেন উদারতন্ত্রবাদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে। পরস্পরবিরোধী দুটি দলের মধ্যবর্তী পথ পাওয়া কঠিন, এবং তা টিকিয়ে রাখা কঠিনতর। কিন্তু লুই মধ্যবর্তী পথ খুঁজে পান এবং তা টিকিয়ে রাখেন। ১৮১৭ সালের নির্বাচনী আইন ভোটাধিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকীর্ণ চক্রের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখে। আর এই আইনের মূল সূত্রগুলি ফরাসি দেশ শাসন করে দীর্ঘ তিরিশ বছর।

এই বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিদীপ্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সুনাম করে বলতে হয় যে তিনি অসম্ভব ও অবাস্তব প্রথম সংসদ (যা ছিলো রাজার চেয়ে অধিক রাজতন্ত্রী) থেকে মুক্ত হবার পর কিছু নতুন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, যাদের সুপরামর্শ এবং সমর্থনে চরমপন্থি দুটি দলের নিরেট নির্বুদ্ধিতা এড়িয়ে চলতে সমর্থ হন, ফ্রান্সে সূচনা করেন শান্তি এবং সমৃদ্ধির যুগ, সর্বোপরি ইউরোপীয় কাউন্সিলে আরো একবার আসন গ্রহণ করেন সমান মর্যাদা সহকারে। বিশেল্যা, দেসেরে, দেকাজে প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। পার্লামেন্টারি রাজনীতিবিদ হিসেবে এরা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ভিলেলের নামও আমরা স্মরণ করতে পারি। ইনি ছিলেন বাস্তববাদী অর্থনীতিবিদ, কোনো প্রকার হঠকারিতাকে তিনি আমল দিতেন না।

আশি হাজার নির্বাচকের মায়াজালের বাইরে দুটি পরস্পরবিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত তৎপর হয়। প্রথম দল রোমান ক্যাথলিক গির্জার হারানো শক্তির পুনরুজ্জীবন অভিলাষী। তাদের আরো লক্ষ হলো ফরাসিদের যে অংশ প্যাগানধর্মে হারিয়ে গেছে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে আনা। এটি করতে হবে জোর প্রচারকার্য চালিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ বিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে আক্রমণ পরিচালনা করে। দ্বিতীয় দল যাজকতন্ত্রের জঙ্গী বিরোধী, তারা কার্বোনারিজমের মধ্যে একটি নতুন ও গুপ্ত সমিতি খুঁজে পায় (এই সমিতির উৎস নেপলস)। তারা সকল ধরনের স্বৈরশাসনের বিরোধী। তাহলে দেখা যায় ইউরোপের উদারবাদ ওয়াটারলুর আঘাতে শেষ হয়ে যায়নি, যদিও নেপোলিয়ন সে রকমই মনে করতেন। পাঁচ বছর যেতে না যেতেই পশ্চিমের রক্ষণশীল সরকারগুলিকে কঠোরভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে বিপ্লবের শক্তি একেবারে নিঃশেষিত হয়নি। তখনও জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে, নেপলস, পিডমন্ট এবং স্পেনে চলছে বিদ্রোহ, সিসিলিতে দাবি উঠেছে স্বাধীনতার, পর্তুগালে শাসনতন্ত্র দাবির লক্ষণ সুস্পষ্ট, গ্রিসে শোনা যায় জাতীয়তাবাদের পদধ্বনি, ফ্রান্সে আভাস পাওয়া যায় কার্বোনারিপন্থি বিপ্লবের ইশারা। ১৮২০ সালে ঘটে ডুক দ্য বেরির (বেরির ডিউক) চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। এই ডিউক রাজার ভাইপো, এবং পরবর্তী রাজার পর সিংহাসনের অবশ্যম্ভাবী উত্তরাধিকারী। লুভা নামক জনৈক ফ্যানাটিকের ছুরিকাঘাতে তার মৃত্যু হয়। এই আন্দোলনগুলি তখনও পরিপুষ্টি লাভ করেনি। নেপলস ও স্পেনে গুরুতর আকার ধারণ করলেও স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অনুগত হাতিয়ার অর্থাৎ অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সের রাজকীয় বাহিনীদ্বয় তা সহজে দমন করে। তবে ভাবাবেগ একবার ভুঙ্গে উঠলে বিজ্ঞতার সঙ্গে সরকার পরিচালনা সম্ভব হয় না। বেরির ডিউকের হত্যাকাণ্ডের পর প্যারিসে রাজকীয় অনুভূতি তীব্র আকার ধারণ করে, এবং মন্ত্রিসভায় উদারমনাদের গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। রাজা অতীব দুঃখের সঙ্গে তার প্রিয় মন্ত্রী ডেকাজকে বরখাস্ত করেন, মন্ত্রিসভায় নিমন্ত্রণ জানাতে হয় ডান শিবিরের প্রধান ব্যক্ত

ডিলেলকে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা করা হয় খর্ব। স্পেনের সহজ এবং রক্তপাতহীন প্রক্রিয়ায় উৎসাহিত হয়ে পুরাতন রাজকীয় পতাকার তলে জমায়েত হয়ে ফরাসি বাহিনী সেখানকার উদারবাদীদের শক্তিকে দমন করে, ফার্দিনান্দকে পুনরায় ক্ষমতায় বসায়, উপরন্তু এই বিজয়ের ক্ষীণ আলোকে রাজার মনে একটা ভ্রান্তি জন্মায় যে, ইউরোপে লেজিটিমিস্ট পক্ষের অবস্থান ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কিন্তু জর্জ ক্যানিং ইতিমধ্যেই উদারনৈতিক ধারায় বৃটিশ কর্মপন্থা শুরু করে দিয়েছেন। ব্রাজিল, পেরু, গ্রিস ইতিমধ্যেই তাদের দেশের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে। অর্থাৎ কোনো চতুর পর্যবেক্ষকই অস্বীকার করতে পারেন না যে জগতে উদারবাদের ভরা জোয়ার শুরু হয়েছে।

১৮২৪ সালে ফরাসি সিংহাসনে আরোহণ করেন বয়োবৃদ্ধ এবং সংকীর্ণচিত্ত দশম শার্ল। এর না ছিলো বুদ্ধিসুদ্ধি, না ছিলো চারপাশের পরিস্থিতির উত্তাপ অনুভব করার ক্ষমতা। প্রফুল্লচিত্ত, মারপ্যাচহীন, তার ভাই থেকে ভিন্ন। দশম শার্ল ছিলেন কঠোর, স্বেচ্ছাচারী এবং রাজকীয় নীতির অনুসারী। তিনি বলতেন, "আমি বরং কাঠচেরাই করে জীবিকা নির্বাহ করবো, তবু ইংল্যান্ডের রাজার কায়দায় রাজ্য শাসন করতে পারবো না।" ভবিষ্যতের আভাস অনুভবের ইচ্ছা তার মধ্যে কখনো কাজ করেনি, তার আনুগত্য অতীতের নিয়মকানুনের প্রতি। একটি জীবন্ত ও সংশয়বাদী প্রজন্ম, এখনো প্রধানত প্যাগান, এবং ক্রমান্বয়ে উদারনীতিক বোনাপার্টপন্থী হয়ে উঠছে, তারা অত্যন্ত কৌতুক ও ঘৃণার সঙ্গে জ্ঞাত হন, নতুন রাজা কিভাবে রেইসের প্রাচীন রীতি অনুসারে রাজপদে অভিষিক্ত হন, কিভাবে মখমলের কেদারায় লুটিয়ে পড়েন, নিজের দেহের সাতটি জায়গা সূচবিদ্ধ হতে দেন, যাতে তিনি পবিত্র তেলে'র আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। এই মধ্যযুগীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পর তিনি রাজনৈতিক কারণে দেশত্যাগকারীদের (emigres) ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন করেন, অপর একটি আইন দ্বারা ধর্মের বিরোধিতার জন্য কঠোর জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়, উপরন্তু রাজকীয় নির্দেশে জাতীয় রক্ষীদল ভেঙে দেয়া হয়, কারণ রক্ষীদল শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি করে। ফলে সহজ জীবনের পরিবর্তে কায়েম হয় অধৈর্য, উৎপীড়ন এবং ত্রাস। অতঃপর এরকম ধারণা প্রচার লাভ করে, ধারণাটা উগ্র রাজতন্ত্রী পত্রিকায় প্রচারণার জন্য মানুষের মনে গেঁথেও যায় যে, রাজা শাসনতন্ত্র বাতিল করার জন্য কুদেতার কথা ভাবছেন, পূর্বতন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনাও তার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবেও এগুলি যে রাজার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত তা পরিষ্কার হয়ে যায় যখন তিনি দক্ষ ও উদার রাজনীতিজ্ঞ মার্টিনাককে বরখাস্ত করে (ইনি হয়তো দশম শার্লকে রক্ষা করতে পারতেন) যুল দ্য পলিনাককে পক্ষে টানেন।

পলিনাক ছিলেন স্বপ্নচারী, খোদ ভার্জিনের কাছ থেকে নির্দেশ লাভ করেন বলে দাবি করতেন। প্রথম দিকে যারা দেশত্যাগ করে তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম, সাম্রাজ্যের যুগে তিনি কারাবরণ করেন এবং ১৮১৫ সালের সনদ (Charter) অনুসারে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এই পলিনাকের নামটাই ছিলো একটা চ্যালেঞ্জের মতো, এবং যখন জানা গেল যে বুরমঁ নামক এক জেনারেল যিনি লিজনির রণাঙ্গনে নেপোলিয়নের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাকে পলিনাক মন্ত্রীসভার সদর মন্ত্রী করা হচ্ছে, তখন উক্ত

১. এটি জনপ্রিয় ধারণা মাত্র।

মন্ত্রিসভা সম্পর্কে সার্বিক অবিশ্বাসের সঙ্গে উপযুপরি কলঙ্ক যুক্ত হয়। তথাপি এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে সর্বশেষ এবং দুর্বলতম মন্ত্রিসভার অধীনে তার সর্বশেষ এবং দুর্বলতম বৈধ রাজার শাসনকালে ফ্রান্স আলজিয়ার্স দখল করতে সমর্থ হয়, শক্তির জোরে লাতিন জাতিসমূহের জন্য উত্তর আফ্রিকার উপকূল এলাকা, এবং বিস্তৃত আফ্রিকান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন, এটি এখন জার্মান জনশক্তির বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম। আলজিয়ার্স ব্যাপারে প্যারিসের আগ্রহ অবশ্য খুব বেশি ছিল না। তবে পূর্বোহিত বনাম সাধারণ মানুষ, রাজশক্তি বনাম জনগণের বিবাদে এটি তীব্র উত্তেজনায় ইন্ধন যোগায়। ১৮৩০ সালের ২৫ জুলাই সেঁকুর রাজকীয় প্রাসাদ থেকে অধ্যাদেশ জারি করা হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে, সংসদ ভেঙে দিয়ে এবং নির্বাচনী আইন পরিবর্তন করে। রাজা ও তার প্রিয় পাত্র তাদের লম্বা হাত দেখান। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা শুধু ভোটাধিকার সম্প্রসারণে অস্বীকৃত নন (এই দাবি বছর জুড়ে জোরদার হচ্ছিলো), তারা শাসনতন্ত্র ছুড়ে ফেলে দিতে চান, এবং নিয়ন্ত্রণ করতে চান সকল ধরনের স্বাধীনতা। রাজকীয় কর্মসূচির সার কথা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে একে অসহনীয় অবমাননা হিসেবে গণ্য করা হয়। রাজকীয় কুদেতার প্রতিক্রিয়ায় প্যারিস নগরীতে শুরু হয় হিংস্র সংঘর্ষ, ফলশ্রুতিতে রাজা হন সিংহাসন থেকে বিতাড়িত, ফ্রান্সের সুপ্রাচীন রাজতন্ত্রের পতন ঘটে চিরদিনের জন্য। জুলাই বিপ্লব উল্লেখযোগ্য শুধু একটি নগরীর কার্যক্রমের জন্য। প্যারিস নির্ধারণ করে ফ্রান্সের ভাগ্য। প্রদেশগুলির রাজতন্ত্রীদের চোখ খোলার আগেই প্যারিসের প্রতিবন্ধকগুলিতে 'শ্বেত পতাকা'র বিরুদ্ধে সমস্যার নিষ্পত্তি হয়। ঝড়-ঝঞ্ঝার ভেতর যে সরকার ভূমিষ্ঠ হয় তাও কম চমকে যাবার মতো ঘটনা ছিলো না জনগণের কাছে। প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় যে সংঘর্ষ হয় তাতে বড়ো রকমে অংশগ্রহণ করে ক্যাভেনাকের মতো লোকেরা। এই ক্যাভেনাক ছিলেন প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী। আরো অংশগ্রহণ করে, বড়ো রকমে, বোনাপার্টের সমর্থকরা। তারা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন। তথাপি বিপ্লবের ফসল দাঁড়ায় না প্রজাতন্ত্র, না সাম্রাজ্য। প্রতিষ্ঠিত হয় লুই ফিলিপের বুর্জোয়া রাজতন্ত্র। এই লুই ফিলিপ ছিলেন অর্লিয় বংশের প্রধান, ফিলিপ ইগালিতের পুত্র, যিনি রাজহত্যার পক্ষে ভোট দেন, অতঃপর নিজেই বরণ করেন প্রাণদণ্ড। উদারনীতিকদের অনেকেই, বিশেষ করে থিয়ের (দক্ষিণাঞ্চলের একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি, ইতিহাস, রাজনীতি এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দ্রুত খ্যাতি অর্জন করছিলেন) আশা করছিলেন যে অর্লিয়ঁর লুই, যিনি তরুণ বয়সে বিপ্লবী বাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করেন এবং পরবর্তী কালে দারিদ্র্যের যাতাকলে পিষ্ট হন, ফ্রান্সকে একটা সন্তোষজনক গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র উপহার দেবেন। দশম শার্ল যে অযোগ্যতাগুলির জন্য কাজ করতে পারেন নি, তার কোনোটি লুই ফিলিপের ছিলো না। তিনি ছিলেন নতুন জগতের মানুষ, সাদাসিধে প্রকৃতির, চালচলনে অনাড়ম্বর, তিনি তিন রঙা পতাকা গ্রহণ করবেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানাদির পক্ষে কাজ করবেন, এবং যেহেতু যারা জুলাই রাজতন্ত্রকে সম্ভব করে তোলে (ক্ষুদ্র একটি রাজনীতিবিদ গোষ্ঠী) তাদের মনে ১৬৮৮ সালের ইংরেজ বিপ্লবের স্মৃতি খুব বেশি জীবন্ত, অতএব তাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে যে লুই ফিলিপ হলেন ফরাসি উইলিয়াম অব অরেঞ্জ, যিনি দেশ থেকে বিশৃঙ্খলা দূর করবেন, দেশে দীর্ঘ ও সমৃদ্ধশালী নিয়মতান্ত্রিক শাসনের সূচনা হবে। এই দেশ এতকাল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কি ঘটতে যাচ্ছে তা প্যারিসের জনগণ কিছু মাত্র টের পাবার আগেই ফিল লুই ফিলিপকে তার অনুসারীরা অটেল

[illegible] নিয়ে আসে। সেখানে জনগণের সামনে তিন রঙা পতাকা গ্রহণ করে 'দুই জগতের বীর' এবং 'জনগণের বন্ধু নেতা' লাফায়েৎকে আলিঙ্গন করে লুই ফিলিপ তার নতুন এবং অনিশ্চিত সরকারের জন্য জনতার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

প্যারিসের চুল্লি থেকে ছিটকে পড়া স্ফুলিঙ্গ দ্রুত এবং অতি দূরের "সমবায় ইউরোপের" চৌদ্দ ভেঙে আছড়ে পড়ে। বেলজিয়ানরা ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, পোলাণ্ডের অধিবাসীরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জানায়, কার্বোনারি সমিতির সদস্যরা ইতালীয় রাজ্যগুলিতে পুরোহিতদের শাসনের বিরুদ্ধে হিংস্র প্রতিবাদ জানায়। অতি দুরাভিসন্ধিমূলক কায়দায় স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বন্য দাবি ওঠে, প্যারিসের ছুটপাথগুলিতে সাধারণ মানুষের চরম দুর্ভোগ লাঘব তাদের লক্ষ্য। হিংস্র দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। প্রায় এক বছরের অধিক কাল নতুন ফরাসি সরকার অস্তিত্বের জন্য স্থির বোধ করতে পারেনি। অবশেষে ঝড়-ঝঞ্ঝা সহনীয় হয়ে ওঠে। যে সব বিকারগ্রস্ত লোক চায় যে, ফ্রান্স যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক—বেলজিয়াম প্রশ্নে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, পোল্যান্ড প্রশ্নে রাশিয়ার বিরুদ্ধে, এবং অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইতালীয়দের জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে—তাদের লুই ফিলিপের জন্য কিছু নেই। তার প্রধান কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে তার দেশকে দীর্ঘ আঠারো বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে সমৃদ্ধি এবং প্রাগ্রসর অর্থনৈতিক জীবনের সুযোগ দেন।

নিখিল বিন্যস্ত নেদারল্যান্ড রাজ্যে যে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে তা সূচনা হয় ২৫ আগস্ট, ১৮৩০ সালে, ব্রাসেলস নগরীতে দাঙ্গার মাধ্যমে। বেলজিয়ানরা অনেককাল যাবৎ ওলন্দাজ প্রভুদের অধীনে নিষ্পেষিত হয়ে আসছিলো। তারা প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম এবং ওলন্দাজদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং জাতিগত একাত্মতাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। বেলজিয়ানরা জানে যে তারা সংখ্যায় অনেক বেশি এবং অধিক বাঙময়। তারা আরো বিশ্বাস করে যে তারা অধিক সংস্কৃতিবান এবং অনুভূতিশীল। ফলে তারা এটা সহ্য করতে পারে না যে ওলন্দাজ ভাষা হবে একমাত্র সরকারি ভাষা, ওয়ালুন[২] জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে, সামরিক এবং বেসামরিক সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে ওলন্দাজদের নিয়োগ করা হবে। ব্রুসেলের দেশের লোকদের কাছে ওলন্দাজদের শ্রেষ্ঠতার অভিভাব একেবারে অসহ্য। প্যারিসের দৃষ্টান্তে জ্বলে ওঠে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় যে বিদেশী শাসনের জোয়াল ছুড়ে ফেলে দিতে হবে।

ব্রাসেলসের প্রে দ্য মার্তার-এ চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন ছয় হাজার বেলজিয়ান স্বেচ্ছাসেবক। ১৮৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওলন্দাজ নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করে এরা শহীদ হন। তাদের আত্মত্যাগের দরুন সে সময় সবার মধ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়, তবে স্বাধীনতা নিশ্চিত হয় নি। আধুনিক বেলজিয়াম রাজ্য বেলজিয়ানদের সামরিক শক্তির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় অ্যাংলো-ফরাসি কূটনীতির জোরে, কিছুটা ফরাসি বাহিনীর সহায়তায়। এই রাজ্যের মূল স্থপতি ছিলেন পামারস্টোন, লর্ড গ্রে-র হুইগ মন্ত্রিসভার নতুন বিদেশ মন্ত্রী, এবং তালেরা, লন্ডনে ফ্রান্সের সুযোগ্য রাষ্ট্রদূত।

---

২ ফরাসভাষী বেলজিয়ান।

পামারস্টোনের স্বাধীনতাপ্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত হয় লুই ফিলিপ এবং তালেরা-র এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে কোনো অবস্থায় ইংল্যান্ডের সঙ্গে পুরানো বিবাদের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। ফলে সমস্যা বেলজিয়ান স্বাধীনতার অনুকূলে নিষ্পত্তি হয়, এবং কোনো প্রকার সামরিক যুদ্ধ ছাড়াই। পামারস্টোন যদি ওলন্দাজ এবং স্বৈরতন্ত্রের পক্ষাবলম্বন করতেন, কিংবা লুই ফিলিপ তার পুত্রের জন্য বেলজীয় রাজমুকুট গ্রহণের প্রস্তাব মেনে নিতেন, তাহলে ইংলান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে পুরোনো বিবাদ পুনরুদ্যমে শুরু হতো, ফলশ্রুতিতে বেলজিয়ানদের স্বাধীনতার সম্ভাবনা হয়তো চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যেত। দুটি দেশের মধ্যে সহযোগিতার ফলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। স্যাক্স-কোবুর্গের লিওপোল্ডকে বেলজিয়ামের সিংহাসনে আরোহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইনি ছিলেন বিচক্ষণ এবং তথ্যাভিজ্ঞ এবং কুইন ভিক্টোরিয়ার শিক্ষক। ইনি প্রথমে বিয়ে করেন ইংরেজ রাজকীয় পরিবারে, বর্তমানে নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের জন্য ফরাসি রাজকুমারী বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত। একে নির্বাচন করে সর্বাধিক বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়া হয়। লিওপোল্ড সকল বাধা-অতিক্রম করেন, ওলন্দাজদের বিপজ্জনক আক্রমণ ঠেকান, ফরাসিদের উদ্ধার অভিযানও কম বিপজ্জনক ছিলো না। লুক্সেমবুর্গ ও লিমবুর্গ হারানোর ফলে বেলজীয় জনগণ অসন্তুষ্ট হয়, এই অসুবিধাও তিনি অতিক্রম করেন (এখানে উল্লেখ্য যে, লন্ডন সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিবর্গ লুক্সেমবুর্গ এবং লিমবুর্গ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে)। প্রকৃত বিজয় অর্জিত হয় পামারস্টোনের কর্মপন্থার জন্য। বেলজিয়াম হল্যান্ড থেকে মুক্ত, কিন্তু সমানভাবে মুক্ত ফ্রান্সের সামরিক এবং বাণিজ্যিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে। একটা নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা দেশটির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। ১৮৩৯ সালের সন্ধি অনুসারে (যা পচাত্তর বছর পর শুধুমাত্র 'এক টুকরো কাগজ' হিসেবে গণ্য হয়) বেলজিয়ামের নিরপেক্ষ অবস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করে তিনটি বৃহৎশক্তি, ইংল্যান্ড ছাড়াও এই শক্তিগুলির অন্তর্ভুক্ত হলো ফ্রান্স এবং প্রুসিয়া। ইংল্যান্ড তখন মনে করে এই নিরপেক্ষতার দরুন তার প্রধান রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হয়েছে। কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিস্তর রক্তের বিনিময়ে সে এই স্বার্থ রক্ষা করেছে।

ইউরোপের পশ্চিম ভূ-ভাগের উদারনৈতিক কূটনীতির ছত্রছায়া থেকে বহু দূরে অবস্থিত ১৮৩০ সালের পোলিশ বিদ্রোহ ছিলো একেবারে আলাদা প্রকৃতির। জার নিকোলাস অত্যন্ত ক্রোধ এবং আতংকের সঙ্গে প্যারিসের জুলাই বিপ্লবের ঘটনাবলি বিচার করেন। তিনি ফ্রান্সের বেয়াল্লা গণতন্ত্রকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, তাকে আকস্মিকভাবে থেমে যেতে হয় ওয়ার্স নগরীর গণজাগরণের জন্য। ওয়ার্স-র একদল অফিসার এবং ভূ-স্বামী আশা করেন যে, বিপ্লবের শিক্ষা বিস্তার লাভ করলে পোল্যান্ডের সুবিধা হতে পারে। এই আশায় তারা সরকারযন্ত্র দখল করেন ; এবং একটি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজকোষ ও সেনা বাহিনী হাতের মুঠোয় এসে যাওয়ায় রুশ সাম্রাজ্যের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহস করে। এক বছরের মতো সময় পোলরা মহাশক্তিধর শত্রুর বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে, উভয় পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি হয়, কিন্তু সবশেষে অসম প্রতিযোগিতায় তাদের পরাজয় মেনে নিতে হয় (সেপ্টেম্বর, ১৮৩১)। একই সঙ্গে মুছে যায় পোলিশ জাতির স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন। কংগ্রেস সৃষ্ট পোল্যান্ডের স্থান মানচিত্রে আর দেখা যায় না, রুশ সাম্রাজ্যের স্বৈরতন্ত্রে পোল জাতির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। এতে তাদের

সম্পর্ক কত উন্নতি হয়। কিন্তু তাদের হারাতে হয় উদ্দীপনা ও আত্মার আধ্যাত্মিক গুণাবলী। পোলিশ ইতিহাসকারদের মতে স্বাধীনতাহীন অবস্থায় এ সবের প্রত্যাশা করা চলে না।

এই ব্যর্থ আন্দোলনের একটি ফলশ্রুতি এই ছিলো যে, পোলিশ শিল্পী ও লেখকরা প্যারিস নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮৩১ সালের পর এই নগরী কয়েক প্রজন্মের জন্য ছিলো পোলিশ জাতির বুদ্ধিচর্চার রাজধানী। সবার আগে দেশত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকরা, অতঃপর তাদের দল ভারি করে প্রফেসর, কবি এবং সংগীতকারগণ। তারা ইউরোপের সবচেয়ে মার্জিত রাজধানীতে স্লাভ প্রতিভার দাবি বিজ্ঞাপিত করেন।

অতএব ১৮৩০ সালের পোলিশ বিপ্লব বিপর্যয়কর ব্যর্থতা বরণ করলেও একেবারে বৃথা যায়নি। এই বিপ্লব ইউরোপকে জানিয়ে দেয় যে জাতীয় অনুভূতিসম্পন্ন একটি সত্তা বিদ্যমান, এই অনুভূতি এখনো অত্যন্ত শক্তিশালী, তাদের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার এখনো কোনো সুরাহা হয়নি, তাদের জাতীয় মেজাজ এতটা বলিষ্ঠ যে, তা প্রায় হঠকারিতার পর্যায়ে যেকে। করাসিরা ভুলতে পারেনি যে পোলিশ বিদ্রোহ তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ গণজাগরণের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। অরা এটাও জানে যে এই বিদ্রোহে প্রসিদ্ধ ফরাসিরাই ইন্ধন যোগায়, উপরন্তু ভয়ানক আক্রমণ থেকে ফরাসিরাই তাদের রক্ষা করে। ফলে পোল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে একটা বন্ধন গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় রাজনীতিতে এখনও এই বন্ধন বিরাট উপাদান হিসেবে কাজ করে।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলি

১. ক্যামব্রিজ মডার্ন হিস্টোরি, দশম খণ্ড। ১৯০৭
২. জে. এইচ. ক্লাকাম : ফ্রান্স ও জার্মানির অর্থনৈতিক বিকাশ। ১৯২১।
৩. লোয়েস ডিকিনসন : আধুনিক ফ্রান্সে বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়া। ১৮৯২।
৪. শাতুব্রিয়ে : Bonaporte of les Bourbons। ১৮১৪।
৫. পি. থুরু দাঁজি : Histore de la reonarehie de juiket। ১৮৮৪-৯২।
৬. বিউনো, শাতুব্রিয়ে এবং গিজো-র স্মৃতিকথা।
৭. ই. ফাগু : Politiques at moralistes du XIX Siecle। অনু. ১৯২৮।
৮. এইচ. পিরেন : Historie de Belgique। ১৯০৩-৩৩।
৯. পি. গুয়েদাল্লা : লর্ড পামারস্টোন। ১৯২৬
১০. ডাফ কুপার : তালেরাঁ। ১৯৩২
১১. রোমান ডিবোস্কি : পোল্যান্ড (Nations of the Modern World Series)। ১৯৩৩
১২. জে. পি.টি. বেরি : ফ্রান্স ১৮১৪-১৯৪০। ১৯৪৯।
১৩. এফ.বি. আরৎস : প্রতিক্রিয়া ও বিপ্লব, ১৮১৪-৩২। ১৯৩৪।
১৪. জে. গ্লামেনাটজ : ফ্রান্সে বৈপ্লবিক আন্দোলন, ১৮১৫-৭১। ১৯৫২।

পিল পর্ব

পুরাতন পার্লামেন্ট এবং নতুন সমাজ। সমালোচনার স্বাধীনতা। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি। হুইগ ও টোরি দল। ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন। স্যার রবার্ট পিল এবং রক্ষণশীল দলের গোড়াপত্তন। প্রত্যাহারপন্থি (Repealers), সমাজতন্ত্রী, চার্টিস্ট, অবাধ ব্যাণিজ্যের সমর্থকদল। সমাজ সেবার দ্রুত উন্নতি।

ইতঃমধ্যে ইংল্যান্ড একটি নতুন এবং ভয়ানক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে এই সমস্যাটি উদ্ভূত হয় কল-কারখানা জীবনের বিকাশের দরুন। এটি ছিলো একটি নিদারুণ দুর্ভাগ্য, যার ফলশ্রুতি আমাদের এখনো ভোগ করতে হচ্ছে। বিষয়টা দুর্ভাগ্যজনক এজন্য যে বিশ বছর পরিধির মূল্যবান সময়ে যখন শাসক শ্রেণীর উচিত ছিলো কারখানা জনসংখ্যার জন্য নতুন বিদ্যালয়, জনস্বাস্থ্য, আবাসযোগ্য গৃহ, সুপরিকল্পিত নগর, যাদুঘর, গ্রন্থাগার, বেড়ানোর জন্য পার্ক এবং খেলাধুলার জন্য ময়দানের ব্যবস্থা করা সেখানে দেশটি ফ্রান্সের সঙ্গে তিক্ত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকে, উপরন্তু এক সময় যুদ্ধের অবসান এবং নেপোলিয়ন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হবার পরও জনগণ যুদ্ধংদেহী মনোভাব বজায় রাখে। বেশ কয়েক বছর তারা যুদ্ধের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ভয়ের কথা বলেছে, বিস্তার ঘটিয়েছে অবিশ্বাসের, তাছাড়া 'সাধারণ জনগণের অবস্থার' পূর্ণ ও নিরাসক্তভাবে বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। উক্ত যুদ্ধংদেহী মানসিকতার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা ১৮১৯ সালের লর্ড সিডমাউথের "ষড় আইনে"র উল্লেখ করতে পারি।

আরো একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উল্লেখ করতে হয়। উইলিয়াম পিটের দীর্ঘ টোরি প্রশাসনের অধীনে হাউস অব লর্ডস প্রায় সম্পূর্ণ টোরি চেহারা ধারণ করে, যা আজ পর্যন্ত বজায় আছে। ফলে পার্লামেন্ট সংস্কারে বিলম্ব হয়, বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ বছর বিনষ্ট হয় অযথা। শেষ পর্যন্ত যে সংস্কার সাধিত হয় ১৮৩২ সালে, সেটাও সম্ভব হয় লর্ড সভায় কয়েকটি হুটগ সদস্য সৃষ্টির হুমকি থাকার জন্য। তাছাড়া তখন ইংল্যান্ডে চলছে প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনা, যা গৃহ যুদ্ধের পর আর লক্ষ্য করা যায়নি। দেশ তখন পুরোনো কায়দায় শাসিত হচ্ছে। কোয়ার্টার সেসন এবং ওয়েস্টমিনস্টারে জমিদার শ্রেণীর একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিপত্তি। (এরা গ্রামীণ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাতে পারতেন)। তথাপি, বাস্তবিকপক্ষে উপার্জিত বিত্তের অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য সংসদীয় মায়াবী জীবনের দ্বার একেবারে রুদ্ধ ছিলো না। তারা কিভাবে বিপুল বিত্তের মালিক হলেন সেটাও দেখা হতো না। অভিজাত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকৃত প্রতিভাবান ব্যক্তিরাও ওয়েস্টমিনস্টারে জায়গা করে নিতে পারতেন। ভারতে উপার্জিত বিত্তের বদৌলতে পিটরা ওয়েস্টমিনস্টারে আসন লাভ করেন। স্যার রবার্ট পিলের পিতা ও পিতামহ ছিলেন লিপ্পায়িত ল্যাংকাশায়ারের নির্মাতাদের অন্যতম। কিন্তু ওল্ড সেরাম যেখানে পার্লামেন্টে দুজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে, সেখানে মানচেস্টার এবং বার্মিংহ্যামের পার্লামেন্টে কোনো প্রতিনিধি ছিলো না।

এর ফল যা দাঁড়ায় তা অপ্রত্যাশিত কিছু ছিলো না। একটি অভিজাত বিতর্কচক্র থেকে চলতি অর্থনৈতিক যুগের সমস্যা সমাধানের জন্য আহ্বান জানানো হয়। অথচ এ বিষয়ে কোনো দেশের কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা ছিলো না। কারখানার শৃঙ্খলা, বৃহৎশিল্প নগরীর আকাশচুম্বী, জনসংখ্যার দ্রুত বর্ধন, সুতার কারবারে রাতারাতি বিপুল বিত্তের পাহাড় সৃষ্টি, এই লক্ষণগুলো প্রকৃত প্রস্তাবে একটি নতুন যুগ সূচনার আভাস দেয়, যার ফলশ্রুতি সংস্কারের ছোঁয়া বর্জিত পার্লামেন্ট পুরোটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। অতএব আশ্চর্য হওয়া চলে না যে এর ফলে পার্লামেন্ট রসাতলে যায়, এই পার্লামেন্ট ভুল সময়ে কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করে, হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনের সময় চুপচাপ বসে থাকে। উদাহরণত এই পার্লামেন্ট সস্তা শ্রমের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করে, অথচ যত্রতত্র সস্তা বস্তি গজিয়ে ওঠা ঠেকানোর জন্য কিছুই করেনি।

যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত কয়েক বছর ইংল্যান্ডে মানুষের জীবন চরম দুর্দশার মধ্যে কাটে। অথচ এর কোনো প্রয়োজন ছিলো না। ইউরোপীয় মহাদেশ তখন ধ্বংসস্তূপের উপর বসে আছে। ইংল্যান্ড যে ধরনের পণ্য সামগ্রী রপ্তানি করার জন্য আগ্রহী তা ক্রয়ের সামর্থ মহাদেশের নেই। একদিকে করের বোঝা এবং পণ্যের মূল্য ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অপর দিকে শ্রমিকের মজুরি নামমাত্র। তাছাড়া যুদ্ধের পরে কিংবা বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে, বেকারির সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। অথচ এই সমস্যাটা বিচক্ষণতার সঙ্গে মোকাবেলা করার চেষ্টা করা হয়নি। দরিদ্র আইন নামক একটা বস্তু ছিলো। এতে গ্রামের অলস ব্যক্তিদের খুব সুবিধা হয়। কারণ এই আইনের আওতায় অফিস খুলে সাহায্য বিতরণ করা হতো, দুঃস্থ পরিবারগুলো পেত নিয়মিত ভাতা। হয়রানিমূলক সংরক্ষণ প্রথা আরোপ করে ক্ষুধার্ত জনগণের রুটির দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়, পক্ষান্তরে শুল্ক আরোপে জটিলতার সৃষ্টি করে বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্বাসরোধ করা হয়। সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করা হলে চোরাকারবার রাতারাতি প্রসার লাভ করবে, তা ঠেকানোর কোনো উপায় থাকবে না, আর চোরাকারবারের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আসবে বিশৃঙ্খলা, আইন প্রয়োগে শৈথিল্য। এসব রাতের পর দিন আসার মতো স্বাভাবিক ঘটনা। দাঙ্গাবাজ অভ্যাস হয়তো মানবিক আইন দ্বারা প্রশমিত করা যায়, কিন্তু সেকালে দণ্ডনীতি যে অবস্থায় ছিলো, অন্তত রোমিলি এবং পিল কর্তৃক সংশোধনের আগ পর্যন্ত, তা জনগণকে বেপরোয়া হওয়া এবং আইন অমান্য করা শেখানোর জন্য ছিলো যথেষ্ট উপযোগী। কর্তৃপক্ষ বোধ হয় এ দিকটা খেয়াল করেই দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন। একজন গ্রামবাসী অনাহারে বেপরোয়া হয়ে হয়তো একটা গরু চুরি করে বসলো, কিংবা ফাঁদ পেতে কয়েদ করলো একটি ফিঙে পাখি, এর জন্য তার শাস্তি হবে যাবজ্জীবন কারাবাস কিংবা মৃত্যুদণ্ড।

এই ১৮৩৪ সালেও, যখন পার্লামেন্টের বিধিবিধান সংস্কার করা হয়, একটা হুইগ সরকার ক্ষমতা লাভ করে, ডরসেট জেলার টলপুডলের ছয় জন কৃষি শ্রমিককে সাত বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড প্রদান করা হয়। তাদের অপরাধ, তারা ফ্রেন্ডলি সোসাইটির একটি অংশকে অবৈধ শপথ বাক্য পাঠ করান।

পণ্য সামগ্রী তৈরির কারখানার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক বা লোকদের সম্পর্কে বলতে হয় তারা যে নতুন ও জটিল ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে তা যদি অসংগঠিত পার্লামেন্ট দ্রুততার সঙ্গে এবং সঠিকভাবে সমাধান করতে পারতো তাহলে সেটা সত্যিই একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলে

গণ্য হতো। অমঙ্গলের পঙ্কবহ বিশাল বস্তি গড়ে উঠতে দেয়া হয়। এখানে বসবাস করে অপুষ্টিতে কাবু, নাম মাত্র মজুরির শ্রমিকরা। এই শ্রমিকরা এসেছে দূর দরান্তের গ্রামাঞ্চল থেকে। তবে যুদ্ধোত্তর কালের গোড়ার দিকের ইংলান্ডের কারখানা জীবনের সবচেয়ে ঘৃণ্য শোচনীয় দিক এই ছিলো যে, খুদে বালকদের শোষণ করা হতো নির্মম ভাবে। এমন কি শেষ পর্যন্ত ১৮১৯ সালের পার্লামেন্ট যখন শিশু শ্রম ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং একটি আইন তৈরি করে (এটি প্রথম কারখানা আইন হিসেবে খ্যাত, তখনো ছেলেদের দিনের কার্যকাল সাড়ে বারো ঘণ্টা ধার্য করে, তবে বলা হয় যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর কারখানায় নয় বছরের কম বয়স্কদের নিয়োগ করা চলবে না। জনগণের বিবেকের শিক্ষার ঘটতি এতোটি বেশি ছিলো যে, এই অপর্যাপ্ত আইনও কার্যকর করা সম্ভব হতো না যথেষ্ট সংখ্যক পরিদর্শকের অভাবে। ছয় বছর পর পার্লামেন্টে শিশুদের রক্ষার জন্য যখন আরো একটি বিল উত্থাপন করা হয় তখন বলা হয় যে, "উৎকৃষ্ট কল-কারখানাগুলোতে শিশুদের সাড়ে বারো ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য করা হয়, অন্যান্য কারখানায় তাদের পনেরো থেকে ষোল ঘণ্টা কাজ করতে হয়।"

তথাপি আতংকের কারণে নিবোধসুলভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলেও কিংবা নিয়োপকর্তা এবং পিতামাতাদের অতি লোভের জন্য শিল্পাঞ্চলে অসহনীয় অবস্থা বিরাজ করলেও, ইংলান্ড একটা মূল্যবান সুবিধা ভোগ করেছে। জনসাধারণের এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করার অবাধ অধিকার ছিলো, পার্লামেন্টে প্রসঙ্গটা বার বার উঠতো। সংবাদপত্রগুলো মন্ত্রিসভা এবং রাজশক্তির সমালোচনা করেছে। বিচারকগণ একাধিক বার রাজশক্তির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। এমনকি ১৮১৯ সালে যখন জনগণের প্রতিক্রিয়া তুঙ্গে ওঠে তখন পার্লামেন্ট সিডমাউথের ষড় আইনের তীব্র বিরোধিতা করেছে।

ধীরে ধীরে বহির্বিশ্বে একটা ধারণা ব্যাপক প্রচার পায় যে জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারটা জাতীয় দায়িত্ব, এই গুরু দায়িত্ব কোনো অবস্থাতেই প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়গুলোর হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়া যায় না। তার অর্থ এই নয় যে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার কোনো মূল্য নেই। এ ক্ষেত্রে প্রথম কাজে হাত দেয় শিক্ষা ও ধর্মীয় খুদে সম্প্রদায়গুলো। যে কালে কোনো সেকুলার সম্প্রদায় ছিলো না এবং সন্দেহ করার মতো কারণ ছিলো যে ধর্মীয় উদ্দীপনার চেয়ে কম শক্তিশালী কোনো লক্ষ্য দরিদ্রের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে, তখন ধর্মীয় সম্প্রদায়-বহির্ভূত বৃটিশ অ্যান্ড ফরেন সোসাইটি এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সোসাইটি অ্যাংলিক্যান ন্যাশনাল সোসাইটি শিক্ষাক্ষেত্র পুরো দখলে রাখে। তাদের পদ্ধতি নিখুঁত ছিলো না, তাদের সম্পদ ছিলো সীমিত, তাদের শিক্ষকদের অধিকাংশ ছিলো তরুণ (কারণ উভয় সম্প্রদায় ছাত্রনায়ক বা মনিটরিয়াল পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেছে)। তারা যে মাঝে মাঝে বিবাদে কিংবা ঈর্ষাপ্রসূত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে তার বিবরণ পাঠ করতে শুরু করলে লজ্জা রোধ না করে পারা যায় না। তথাপি এটুকু আমাদের মানতে হবে যে, তারাই সর্বপ্রথম সমাজ সেবার মহোত্তম একটি ক্ষেত্রে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র কখনো সেবাকর্ম তদারক করার কথা ভাবেনি। নিয়মতান্ত্রিক জাতীয় শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে সম্পূর্ণাঙ্গ একটা পরিকল্পনা তৈরি করার জন্যও সরকার কখনো এগিয়ে আসেনি। বরং তারা চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর, যেমন অ্যাংলিক্যান, ব্রিটিশ চার্চ, ইত্যাদি, ক্যাথলিক স্কুলগুলোকে যে অবস্থায় পেয়েছে সেই অবস্থায় গ্রহণ করেছে। ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় খাত থেকে আর্থিক সাহায্য করেছে, তত্ত্বাবধান

করেছে এবং অক্ষাংক্ষত্রে উচ্চতর মান আরোপ এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। অর্থসংস্থানের দক্ষতা তুলনামূলকভাবে উন্নত করেছে। এই প্রক্রিয়া প্রথম শুরু হয় ১৮৩৩ সালে ; আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারিভাবে বরাদ্দ করা হয় বিশ হাজার পাউন্ড। এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় দুটি সোসাইটিকে। অতঃপর এই প্রক্রিয়া বহুদূর এগিয়ে যায়। পরবর্তী ধাপে ১৮৩৯ সালে শিক্ষা বিষয়ে প্রিভি কাউন্সিলে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের তরফ থেকে কোনো ব্যবস্থা ছিলো না।

অজ্ঞতার দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনটি বৃহৎ প্রতিবন্ধক প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। ইস্টাবলিশ্ড চার্চের সুরক্ষিত একচেটিয়া অধিকার, কল-কারখানাগুলোর কালোপাহাড়ী দৈত্য, তাছাড়া মনে করা হতো যে দরিদ্র ছেলের জন্য এক রকম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেই চলে, এর জন্য মানের দিকটা বিবেচনা করার কোনো দরকার নেই। ১৮৪৮ সালে প্রথম এই সমস্যাগুলো দূর করার চেষ্টা করা হয়। ১৮২৫ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, ফলে নন-অ্যাংলিকান ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ১৮১৯ সাল থেকে একের পর এক সংবিধি প্রণয়ন শুরু হয়। শেষ হয় বিরাট রাজনৈতিক বিক্ষোভ অন্তে ১৮৪৭ সালে দশ ঘণ্টা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। এই আইন বলে আঠারো বছরের কম শিশু-কিশোরদের কল-কারখানায় কাজের সময় বেঁধে দেয়া হয় (দশ ঘণ্টা), উপরন্তু বলা হয় যে কল-কারখানাগুলো শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য অবকাশরঞ্জনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবে। এগুলোকে মূল্যবান অর্জন বলে গণ্য করতে হয়। উন্নত কারিগরদের জন্য মেকানিক্স ইন্সটিটিউটও স্থাপন করা হয়। লক্ষ্য হলো, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার। তবে উনবিংশ শতাব্দীর বিশের ও তিরিশের দশক থেকে এই বোধটা জাগ্রত হতে থাকে যে শিক্ষা জাতীয় শক্তির অনন্য উৎস, এবং সুস্থ জাতীয় জীবনের জন্য আবশ্যিক ভিত্তি।

তবু অনেক কাজ করবার বাকি আছে। সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ১৮৯১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় অবৈতনিক শিক্ষার জন্য। ১৯০২ সালের আগে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার জন্য সরকারি আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু এতোটুকু তাৎপর্যপূর্ণ যে সেই ১৮২৫ সালে হেনরি ব্রুহ্যাম (প্রথিতযশা আইন সংস্কারক এবং বলিষ্ঠ ও উদ্ভাবনী মেজাজের জন্য সেকালের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সুখ্যাতির অধিকারী হন) প্রকাশ করেন তার 'জনগণের শিক্ষা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ' নামক পুস্তক। এই বইটির বিশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে। উক্ত পুস্তকের সাক্ষাৎ প্রভাবে গঠিত হয় 'কেজো জ্ঞান প্রসারের জন্য সমাজ।'

হুইগ দলকে দীর্ঘকাল ক্ষমতার বাইরে থাকতে হয়। অবশ্য মাঝখানে গ্রেনভিল-ফক্স সংক্ষিপ্তকাল শাসন করেন। এই শাসনামল দাস ব্যবসা বিলোপের জন্য গৌরব অর্জন করে। তাছাড়া টোরি দল ১৭৮৪ সালে উইলিয়াম পিটের ক্ষমতারোহণ থেকে লর্ড গ্রে পর্যন্ত ইংল্যান্ড শাসন করে। এই লর্ড গ্রে নর্দাম্বারল্যান্ডের পল্লী কুটির পরিত্যাগ করে লন্ডন শহরে ফিরে আসেন তার সারা জীবনের লালিত স্বপ্ন রিফর্ম বিলের পক্ষে কাজ করার জন্য। তবে টোরি নীতি অস্ট্রীয়দের থেকে একেবারে আলাদা প্রকৃতির ছিলো। ইংরেজদের রাজনীতিতে কাজ করেছে সদয় বিচক্ষণতা। টোরি নেতারা ছিলেন নমনীয় এবং শুভ বুদ্ধির অধিকারী। অন্যথায় উনিশ শতকে শিল্প কারখানা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যে অভাবিত পরিবর্তন হয় তা ইংল্যান্ড

কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হতো না। কিংবা সম্ভব হতো রাষ্ট্র বিপ্লবের মাসুল গুণে। উইলিয়াম পিট দীর্ঘকাল ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তার প্রশাসন টোরি দলের ঐতিহ্য নিরূপণ করে। এই উইলিয়াম পিটের সঙ্গে মেট্টারনিকের কোনো মনের মিল ছিলো না। এই দুজনের মন-মানসিকতা ছিলো একেবারে ভিন্ন। তিনি শ্রমিকদের আসন-সংক্রান্ত নীতি পুরোপুরি গ্রহণ করেন। এবং, আমরা দেখেছি যে, ফরাসি যুদ্ধের চাপে যদিও তিনি ভোটাধিকার সম্প্রসারণের কর্মসূচি স্থগিত করেন, তবে সংকীর্ণচিত্ত কিংবা স্বার্থান্ধ টোরি প্রকৃতির ছিলেন না। পরবর্তীকালের ডিজরেলির মতো তিনি কারখানার দরিদ্র শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা ঠিক উপলব্ধি করেন। রাজা বাধ না সাধলে তিনি ক্যাথলিক আইরিশদের ওয়েস্টমিনস্টারের পার্লামেন্টে বসাতেন। তার এই মৌলিক উদার দৃষ্টিকোণ তার শ্রেষ্ঠ উত্তরসূরিগণ গ্রহণ করেন। বিশেষ করে জর্জ ক্যানিং, সার রবার্ট পিল এবং হার্সকিসন এমনকি কট্টর টোরি ডিউক অব ওয়েলিংটন শেষ পর্যায়ে এসে পার্লামেন্টারি সংস্কার মেনে নিতে প্রস্তুত হন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মেটারনিকের যুগে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ইতিহাসে স্থবিরতার কোনো সুযোগ ছিলো না। বরং কথিত সময়ে নতুন নতুন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, বড়ো বড়ো পরিবর্তন অনুমোদন লাভ করে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংরেজদের রাজনৈতিক মনের উদারনৈতিক ঝোঁক ক্রমান্বয়ে স্পষ্টতর হয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ১৮২৪ সালে বৈধ করা হয়, শুল্কনীতি জটিলতামুক্ত করা হয় ১৮২৬ সালে। প্রথমে প্রটেস্টান্ট ভিন্নমতাবলম্বীদের রাজকার্যে নিয়োগের উপর বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয়, অতঃপর ক্যাথলিকদের প্রদান করা হয় ভোট দানের অধিকার। পরিশেষে, দেশের বিরাট জনসংখ্যার দাবির অনুকূলে সাড়া দিয়ে পাস করা হয় রিফর্ম বিল ১৮৩২ সালে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা হয় হাউস অব কমন্স, এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে নগর সরকারগুলোর গণতন্ত্রায়ন ঘটে। সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর জন্য প্রণীত আইনের ব্যাপক সংস্কার করা হয়, দাসপ্রথা করা হয় বিলুপ্ত, উপরন্তু জনগণের খাদ্যের উপর আরোপিত শুল্ক সংক্রান্ত বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয় (১৮৪৬)। এখানে এটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, হুইগরা যদি পার্লামেন্টারি রিফর্ম সুসম্পন্ন করে থাকে, তাহলে স্যার রবার্ট পিলের অবদান হলো 'ক্যাথলিকদের মুক্তি' এবং অবাধ বাণিজ্য। এই স্যার পিল ছিলেন মহান টোরি মন্ত্রী। তিনি ঘটনাবলির পাঠ থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং সামঞ্জস্য বিধান করতে জানতেন।

এই যে শিল্পযুগের গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়া একটি প্রধান্যশীল অভিজাততন্ত্র শান্তিপূর্ণভাবে মেনে নেয় তার সকল কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন এই ক্ষমতাধর পার্লামেন্টারি রাষ্ট্রবিদ। ইনি টোরি যুক্তের সম্মুখ সারিতে ছিলেন দীর্ঘ চল্লিশ বছর (১৮০০—৫০)। নিজ গৃহ, বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বিত শক্তি তাকে টোরি সমর্থকে পরিণত করে, এবং যখন তিনি ১৮০৯ সালে প্রথম পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন, তখন সুখ্যাত টোরি নেতা লিভারপুর এবং ওয়েলিংটনের পেছনে দাঁড়িয়ে যান। কিন্তু তার মন ছিলো শক্ত, সৎ এবং সাহসী, আর প্রতিদিন যে গণমত নিশ্চেতনভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তা গ্রহণ করার মতো মনের ঝোঁক তার ছিলো। তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন ধীর গতিতে, কারণ "তার মধ্যে পরিবর্তন আসতো সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।" আবার সবশেষে তিনি ঠিকই পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, এবং তা করতেন যথাসময়ে, আর একবার বিবেকের তাড়নায় বিশ্বাস পরিবর্তন করলে, মন খুলে কথা বলতেন দৃঢ়তার সঙ্গে। এর জন্য তাকে ধীর দলের

[illegible] এটি একজন জাত সাংসদের [illegible] দিন যে বয়সে যে সব বৃহৎ কর্মপন্থা অনুমোদন করেন [illegible] প্রথম যৌবনে সংসদের বিরোধিতা করেছেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে। এক [illegible] এবং অন্য বক্তৃতায় বিরোধিতা করেন। আবার পরবর্তীকালে [illegible] সঙ্গে লড়াই করেন অত্যন্তিক তার সঙ্গে। বিয়ম বিলের ক্ষেত্রেও তিনি একই কাজ করেন একবারে করেন বিরোধিতা, পরবর্তীকালে করেন আনুগত্যের সঙ্গে অনুমোদন। [illegible] বক্তৃতা দেন তার দল বড়ো হবার পরবর্তী পর্যায়ে তিনি দা টাইমস [illegible] সম্পাদক যে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিমওয়ার্থ ইসতেহার প্রকাশ করেন। এতে তিনি [illegible] তার দলের নতুন জীবন শুরু হলো। এই দল এখন থেকে টোরি নয়, কনজারভেটিভ নামে পরিচিত। ১৮৩৯ সালের মে মাসে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন "গত কয়েক বছর যাবৎ আমার লক্ষ্য হলো একটি বড়ো মাপের দলের গোড়াপত্তন করা। এই দল কাজ করবে হুইগ নীতি অনুসরণে, তাদের ইচ্ছা হবে এই দলের শক্তির প্রধান উৎস, লক্ষ্য হবে আইন সভার পরস্পরবিরোধী দুটি শাখার মধ্যেকার উত্তেজনা হ্রাস করা।" এটিই ছিলো স্যার রবার্ট পিলের সবচেয়ে বড়ো অবদান। ১৮৪১ সালে তিনি অসাধারণ দক্ষ একটি মন্ত্রিসভার প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি কয়েকটি সামাজিক অনুসন্ধান এবং সংস্কারকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংল্যান্ড যদি সন্তায় বসবাসের উপযোগী জায়গা হয়ে থাকে, সে সময় তার বাণিজ্য যদি বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে থাকে, গোটা বিশ্ব যদি তার জন্য খোলা চারণভূমি হয়ে থাকে, আমদানি শুল্ক হ্রাসের ফলে ঘাটতি উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত হয়ে থাকে, যদি ব্যাংকিং এবং মুদ্রা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়ে থাকে, সারা জগতের বিজ্ঞানভিত্তিক মহান ইতিহাসবিদ জেরেমি বেন্থাম নির্দেশিত ত্রুটিগুলো দেশের আইন কাঠামো থেকে দূর করা হয়ে থাকে, তার জন্য স্যার রবার্ট পিলের অসাধারণ দক্ষতা এবং সাধারণ মতামতগুলোর কাছে বড়ো আকারে ঋণী।

সময়টা প্রচলিতভাবে অশান্ত এবং বিক্ষোভপূর্ণ। আয়ারল্যান্ড দাঁড়িয়ে আছে বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। ড্যানিয়েল ও'কনেল প্রথমে ক্যাথলিকদের মুক্তির দাবি উত্থাপন করেন, অতঃপর দাবি উত্থাপন করেন হোম রুলের। ইংল্যান্ডে রবার্ট আউয়েন তাত্ত্বিকভাবে এবং বাস্তব উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ দিচ্ছেন সমাজতন্ত্রের সৌন্দর্যের, এর পরই চার্টিস্টরা ছয় দফা চার্টার প্রকাশ করবে (সার্বজনীন ভোটাধিকার, সদস্যদের পারিশ্রমিক, সংসদের বার্ষিক অধিবেশন এবং সমজনভিত্তিক নির্বাচনী এলাকা) এই আশায় যে এতে কঠোর সংখ্যাভিত্তিক গণতন্ত্র সকল অসমতা দূর করবে। সব শেষে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে উদয় ঘটে সবার চেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব কবডেনের। ইনি ছিলেন উদ্যমশীল ক্যালিকোর কারবারি, শস্য আইনের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে। ফলে ইংল্যান্ডে রুটির দাম কমে যায় এবং অবাধ বাণিজ্য হয় চালু। স্যার রবার্ট পিলের কৃতিত্ব এখানে যে একদিকে তিনি চরমপন্থী তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে চলেন, অপরদিকে ভূস্বামী এবং রেইরদের ক্রোধ সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করেন এবং দেশকে পরিচালনা করেন উদারনৈতিক সংস্কারের মধ্য পথে।

অতএব, প্রথমে ১৮৩০ সালে, আবার ১৮৪৮ সালে ইউরোপীয় মহাদেশ যখন বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তখন ইংল্যান্ডের দিন কেটেছে নিরবে স্বাধীনতা সম্প্রসারণ এবং জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির ভেতর। ইংরেজরা দূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি।

কায়েমি স্বার্থের প্রতি সম্ভ্রম এবং বাধাবন্ধহীন অর্থনৈতিক ক্ষুধার জন্য সব সময় বিরাট ঝুঁকি নেয়া হয়েছে, জনগণকে পোহাতে হয়েছে নিদারুণ দুর্ভোগ। কিন্তু প্রকৃত জরুরি অবস্থার সময় সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। বিপ্লবের হুমকি আসন্ন মনে হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ক্ষমতার ভাগ দেয়া হয়। কলেরা মহামারী আকার ধারণ করলে প্রথম জনস্বাস্থ্য আইন পাস করা হয়, আলুর অভাব দেখা দিলে (দুর্ভিক্ষতুল্য) শষ্য আইন বিলোপ করার জন্য পিল সর্ব প্রকার সহায়তা করেন। অস্ট্রিয়ায় মেটারনিকের যখন পতন ঘটে, তখন ইংল্যান্ড ফৌজদারি আইনের সংস্কার করেছে, সূচনা করেছে রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তায় শিক্ষা, জনস্বাস্থ্যের কথা ভেবে প্রণয়ন করা হয়েছে সংবিধি, শিশু শ্রমের মেয়াদ করা হয়েছে সংকোচন, উপরন্তু যে রাজস্ব নীতি গ্রহণ করা হয় তাতে দরিদ্রের উপর আরোপিত করের বোঝা লাঘব হয়। পার্লামেন্টারি রাজনীতিবিদগণ যদিও শিক্ষার মান নিরূপণে ব্যর্থ হন, যা প্রিন্স কনসর্টের মতো বুদ্ধিমান একজন জার্মান অনুমোদন করতে পারতেন, তথাপি সমাজ সেবার ব্যাপক কাঠামোর গোড়াপত্তন করা হয়। আর এ জন্যই দেশে বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারেনি।

ইংল্যান্ডে অবাধ বাণিজ্যের অনুমোদন ছিলো পল্লীর উপর নগরের বিজয়, জমিদার শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থের উপর নব্য পণ্য উৎপাদক শ্রেণীর বিজয়। সর্বোপরি বিজয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। আবার তারা নিজেদের বাস্তব অবস্থার উন্নতি করতে গিয়ে কাকতালীয়ভাবে দরিদ্র শ্রেণীরও উন্নতির কারণ হয়। অবাধ বাণিজ্যের যুগের সূচনার পেছনে শুধু মিল মালিকদের লম্বা তহবিল কাজ করেনি। ইংল্যান্ডের পল্লী অঞ্চলগুলো যদি রাজস্ব ক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হতো, তাহলে ফলাফল হয়তো অন্য রকম হতে পারতো। কিন্তু গ্রামীণ ইংল্যান্ড একতাবদ্ধ হয়নি। গ্রামীণ ইংল্যান্ড দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক পক্ষে দেখা যায় জমিদার ও ভূ-স্বামীদের, অপর পক্ষে খামারকর্মী এবং কুটীর শিল্পীদের। শষ্য আইন বিরোধী লিগ যে বিতর্কিত সুবিধাগুলো ভোগ করে তার মধ্যে এটির মূল্য কম ছিলো না যে "ক্ষুধার্ত চল্লিশের দশকে" কবডেন ও তার অনুসারিগণ ভূ-স্বামীদের প্রতিনিধিত্ব করতে সমর্থ হননি বরং দরিদ্রের নিপীড়নকারী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেন।

অনিবার্য কারণে সস্তা রুটির নীতি দাবি করে এমন নৌবাহিনী যা সাত সমুদ্দুর শাসন করতে পারবে। এর জন্য যদি গ্রামগুলো শূন্য হয়ে যায় তাহলে শহরে ভিড় বাড়বে, শহরে জনসংখ্যাধিক্যের জন্য খাদ্যের প্রয়োজনও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকবে, আর খাদ্য ও কাঁচামাল অধিক পরিমাণে বিদেশী বাজার থেকে আমদানি করতে হবে। একই সঙ্গে বাড়াতে হবে রপ্তানির পরিমাণ। আর আমদানি ও রপ্তানি উভয় প্রয়োজনে দরকার করবে অধিক সংখ্যায় বাণিজ্য জাহাজ। একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য, একটা বৃহৎ বাণিজ্যিক নৌবহর, একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীর পক্ষেই শুধু সম্ভব একটি জাতির খাদ্যের যোগান সুনিশ্চিত করা। যে জাতির জনসংখ্যা কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনভাবে ছড়িয়ে আছে, এবং এই জাতি এতোটা জনবহুল যে এটা মনে করা নিরেট নির্বুদ্ধিতা যে শুধু কৃষিকার্য এবং চারণভূমির সাহায্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান বজায় রাখা সম্ভব হবে।

সংরক্ষণ নীতির বিলোপ সাধনের পরই বাস্তব অবস্থার উন্নতির জন্য প্রবল আশাবাদের সৃষ্টি হয় গোটা দেশ জুড়ে। অসচ্চরিত্র জর্জ, জড়বুদ্ধি উইলিয়াম এখন আর সিংহাসনের জন্য লজ্জার কারণ নন। এখন রাজ্যের রানী ভিক্টোরিয়া, তিনি সূচনা করেছেন তারুণ্যের, শোভনতার। শাসনকার্যে স্বাক্ষর রাখেন শুভবুদ্ধির। এবং তিনি স্ত্রীলোক বিধায়

ইনোভাবিয়ান ইলেক্টোরেটের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সম্পর্ক ছেদে সমর্থ হন। ১৮৫১ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় লন্ডন শহরে। সর্বত্র আনন্দ এবং আশাবাদের জোয়ার। একজন তরুণ কবি কি নয় বছর আগে স্বপ্ন দেখেন নি—

The heavens fill with commerce, argosies of magic sails
Pilots of the purple twilight, dropping down with costly bales!

তিনি এমন একটা সময়েরও স্বপ্ন দেখেন—

The war-drum throbbed no longer and the battle flags were furled
In the Parliament of man, the Federation of the World[৩]

কিন্তু ইউরোপ আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্য প্রস্তুত নয়। অ্যাডাম স্মিথের অবাধ বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি খাড়া করেন জার্মান অর্থনীতিবিদ ফ্রেডারিক লিস্ট। তার অভিমত সংরক্ষণবাদের অনুকূলে। ইংল্যান্ড তার দেশের বাজারগুলোর দরজা বহির্বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। তবে এই দৃষ্টান্ত কেউ অনুসরণ করেনি। বরং পরবর্তী দু'দশকে জঙ্গী জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দেয় ইউরোপীয় মহাদেশে। ফলে ভিয়েনা কংগ্রেসের সুফল ভেস্তে যায়। একই সঙ্গে নিহত হয় উন্নততর এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক কাঠামো সম্পর্কে সুসভ্য আশা-ভরসা, যার স্বপ্ন অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তা এবং কবিরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লালন করেছেন।

---

৩. Poems by Alfred Tennyson, in two volumes. London, 1842. 12 mo.

জুলাই রাজতন্ত্র

রাজতন্ত্রের শক্তি ও দুর্বলতা। বোনাপার্ট নীতির পুনরুজ্জীবন। লুই বোনাপার্ট। সমাজতন্ত্র সাঁ্যা সিমে, ফুরিয়ে, প্রুধোঁ, লুই ব্লাঁ। ফেবরুয়ারি বিপ্লব। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র। জুন মাসের দিনগুলি। ডিসেম্বর মাসের কুদেতা। জাতীয়তার যুগের সূচনা।

লুই ফিলিপের রাজতন্ত্র আঠারো বছর স্থায়ী হয়। তার পর প্যারিসে বিপ্লবের ফলে যে ভাবে সৃষ্টি হয়েছিলো সেভাবেই শেষ হয়। এই সরকার ছিলো নানাগুণসমন্বিত। এটি পরিচালনা করতেন একজন বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ এবং কঠোর পরিশ্রমী রাজা। এ সরকার সেবা পেয়েছে মেধাবী, দৃঢ়চরিত্র এবং বলিষ্ঠ রাষ্ট্রবিদদের। কাসিমির পেরিয়ার এবং থিয়ের, মোল এবং গিজো প্রমুখ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এদের স্বদেশানুরাগ ও যোগ্যতা নিয়ে কোনো সময় প্রশ্ন ওঠেনি। যদিও ভোট দানের ক্ষমতা রাখতেন মাত্র দুই শত পঞ্চাশ হাজার নির্বাচকের একটি সংকীর্ণ চক্র, তবে সংসদীয় বাগ্মিতার আকার ও চমৎকারিত্ব যে শীর্ষ ছোঁয়, ইতিপূর্বে তা ছুঁতে পারেনি। বাণিজ্যে ব্যাপক সমৃদ্ধি আসে। রেল যোগাযোগ উন্নয়নের সূচনা হয়, আলজেরিয়ার বিজয় সংহত এবং সম্প্রসারণের কাজ চালু থাকে। ফরাসিরা সর্বদাই দুটি প্ররোচনার ফাঁদে পা দিতে অনুরাগ বোধ করে। অভ্যন্তরীণ বিপ্লব এবং বিদেশে দুঃসাহসী সামরিক অভিযানের প্ররোচনা তারা কখনো এড়াতে পারে না। এবার এসব প্ররোচনা সাফল্যের সঙ্গে দমন করা হয়। গিজো ছিলেন পণ্ডিত রাষ্ট্রবিদ। তিনি সঠিকভাবে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে রাষ্ট্রীয় সহায়তাপুষ্ট জনপ্রিয় শিক্ষার জন্য একটা সাধারণ ব্যবস্থা তৈরির কাজে হাত দেন। তবু এই সরকারের অসাধারণ অনেক গুণ থাকলেও, রাষ্ট্রের সেবার জন্য অনেক কিছু করলেও, এই সরকারের পতনে কোথাও অনুশোচনা লক্ষ্য করা যায়নি। এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা।

সিংহাসনের জনপ্রিয় উত্তরাধিকারী ডিউক অব অর্লিয়ঁ ১৮৪২ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। এটিই যে বিপর্যয়ের মূল কারণ কিংবা একমাত্র কারণ তা নয়। ফরাসিদের মতো যুক্তিশীল জাতির কাছে উক্ত শাসন ব্যবস্থায় কিছু মৌলিক ত্রুটি ছিলো বলে মনে হয়েছে। এই ব্যবস্থা না ছিলো রাজতন্ত্রী, না ছিলো প্রকৃত প্রজাতন্ত্রী। এটিকে প্রকৃত সাম্রাজ্য বলেও গণ্য করা চলে না। এই শাসন ব্যবস্থা ছিলো বর্ণসঙ্করা। একদিকে না ছিলো বৈধ রাজমুকুটের ঐতিহাসিক গৌরব, কিংবা একটি প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিক আবেদন, না ছিলো বোনাপার্ট বংশের সামরিক সুখ্যাতি। সরকারের গুণগুলিই মনে হয়েছে আপত্তিজনক। এই সরকারের সমঝোতার নীতি, ইংল্যান্ডের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার অদম্য বাসনা, বিদেশে দুঃসাহসিক অভিযান এড়ানোর নীতি, কোনো অবস্থাতেই জনপ্রিয় হতে পারেনি। সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের নেতা লামার্তিন একটি সাড়াজাগানো শব্দবন্ধে তখনকার জাতীয়

মনোভাবের বর্ণনা দিয়েছেন : La France s'ennuie।[১] দয়ালু বুর্জোয়া রাজা তার বৃহৎ ভাবপ্রবণ ছাতা এবং অন্যায়ভাবে সূচিত ঘরোয়া উৎকর্ষের জন্য সাধারণ নাগরিক কর্তৃক [illegible] হন [illegible] বিরক্তিকর ব্যক্তি হিসেবে।

এসবের চেয়ে গুরুতর এবং অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য কারণগুলি ছিলো নেপথ্যে। একদিকে এই সরকার অযাজকীয় শিক্ষা চালু করে পুরোহিতদের দূরে সরিয়ে দেয়, আবার বুদ্ধিজীবীদের তুষ্ট করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ভোট দাতার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যেমন কিছু করেনি, তেমনি জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্য কোনো পরিকল্পনা হাতে নেয়নি। ইংল্যান্ড যেখানে ১৮৩২ সালের রিফর্ম অ্যাক্টের বলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণ করে, দাস ব্যবসা বন্ধ করে দেয়, টাউন প্রশাসনের সংস্কার সাধন করে, দরিদ্র আইন নতুন ভাবে ঢেলে সাজায়, অথচ লুই ফিলিপের রাজত্বকালের শেষ বছর যিনি রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থা পরিচালনা করেন সেই গিজো এমনকি ভোটাধিকার সার্বজনীন করার সামান্য দাবিও অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করেন। গণদাবির প্রবল জোয়ার এভাবে সরাসরি নাকচ করার নীতি চূড়ান্ত পর্যায়ে বিপর্যয় ডেকে আনতে বাধ্য।

শেষ পর্যন্ত দুটি স্রোতোধারা, নীরস, অতি সতর্ক এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতাহীন, প্রশাসনের কাঠামোয় মারাত্মক আঘাত হানে। এ সম্পর্কে জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, এই প্রশাসনের "উন্নতি করার মনোবল একেবারে ছিলো না, এটি চলে মানবতার নীচ ও স্বার্থান্ধ ভাবাবেগ দ্বারা।" দুটি স্রোতের প্রথমটি ছিলো বোনাপার্টপন্থী। বছরের পর বছর যতই গড়াতে থাকে উক্ত মহান সম্রাটের কর্মপন্থার যন্ত্রণাকর এবং ধ্বংসাত্মক দিকগুলি ততই মানুষের মন থেকে মুছে যেতে থাকে। বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে ভর্তির দুঃস্বপ্ন, বিদেশে দুঃসাহসিক অভিযান, সমাজের পুরুষ শ্রেণীর পাইকারি ধ্বংসসাধন, পররাজ্য কর্তৃক স্বদেশের ভূ-খণ্ড গ্রাস, এখন আর মানুষ মনে করতে চায় না। কবি, প্যাম্ফলেট রচয়িতা এবং ঐতিহাসিকরা এখন সেই মহান সম্রাটের নাম স্মরণে এলে যে আশ্চর্যজনক বিজয়গুলির দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে সে বিজয়গুলিকে অমরতা দানের কাজে অতিশয় ব্যস্ত। এমন কি সেই 'একশো দিনে'র কথা স্মরণ করা হয় যখন নেপোলিয়ন প্রদেশগুলির জ্যাকোবাঁ মনোবল এবং প্যারিসের বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে আবেদন জানান। এক্ষেত্রেও নেপোলিয়নের মধ্যে তারা ন্যায়পরায়ণতা খুঁজে পান। বেরেঞ্জার উক্ত সম্রাটের নামে রচনা করেন সংগীত, ভিক্তর যুগো তার বিজয়গুলিকে অমর করে তোলেন Ode a la Colonne-তে। তার স্যাঁ হেলেনার স্মৃতিকথা এবং সাধারণ কথাবার্তা থেকে উপস্থাপন করা হয় যে, তার সাম্রাজ্য ছিলো সাময়িক কাঠামো মাত্র, তিনি ছিলেন উদারতন্ত্রী এবং জাতীয়তার উন্নতি ছিলো তার লক্ষ্য, কিন্তু তার প্রশাসনের সমতাভিত্তিক হিতকর গুণাবলি প্রকাশিত হবার আগেই বিদ্বেষপরায়ণ নৃপতিরা সামগ্রিক সর্বনাশ সাধন করে (এসবই লেখা হয় বোনাপার্ট রাজবংশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে)। সাম্রাজ্য সম্পর্কে এই ধারণা, স্বেচ্ছাচারী হিসেবে নয়, পুরো গণতান্ত্রিক এবং উদারনৈতিক বস্তু হিসেবে, দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই খুদে করপোরাল সম্পর্কিত অতিকথা জনগণের মনে স্থায়ী আসন লাভ করে অনেক আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং বেদনাদায়ক পরিস্থিতির ভেতর। নেপোলিয়ন নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করেছিলেন, একের

---

১. [illegible]

পর এক সিংহাসন উৎখাত করেন, অবশেষে অতলান্তিকের একটি বাত্যা-বিক্ষুব্ধ দ্বীপে বৃটিশ স্বৈরতন্ত্রের হাতে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। ১৮৪০ সালে তার ছাই-ভস্ম যখন প্যারিসে আনা হয় Invalides-এ সমাহিত করার জন্য তখন দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

(১৮০৮-৭৩)। সিংহাসনের দাবিদার একজন হাতের কাছেই ছিলো : লুই বোনাপার্ট হল্যান্ডের রাজার পুত্র, তার স্ত্রী হরটেনস বুহারনেইস, তিনি সম্রাটের ভাইপো। ১৮৩২ সালে ডুক দ্য রাইখস্টাডের মৃত্যুর পর থেকে নেপোলিয়ন বংশের প্রধান। লুই নেপোলিয়ন ছিলেন অদ্ভুত চরিত্রের, চিন্তাশীল, ধ্যানী প্রকৃতির। সর্বদা স্বপ্ন দেখেন এবং সুযোগের সন্ধান করেন উপরন্তু আন্তরিকভাবে বিশ্বাস পোষণ করেন যে এক দিন না একদিন ফ্রান্সে তার কীর্তিখ্যাত পিতৃব্যের কর্মপন্থার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে সক্ষম হবেন। ইতিমধ্যে অন্তত দু'বার, প্রথম বার ১৮৩৬ সালে, দ্বিতীয় বার ১৮৪০ সালে, ফরাসি সিংহাসন দখলের জন্য সাহসী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। দুবারই তার অবমাননাকর ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা হয়। ১৮৪৮ সালে প্রয়োজনে ইংল্যান্ডে নির্বাসিত জীবন কাটান। জীবনের বৈচিত্র সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার ঘাটতি ছিলো না। ইতালিতে এক সময় ছিলেন কার্বোনারোদের সংস্থার সদস্য। যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছেন পলাতক জীবন। হ্যামে ছিলেন করাবন্দী। সাংবাদিক এবং প্যাম্ফলেট লেখক হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এতো সব কর্মকাণ্ডের মধ্যে সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখায় কখনো ক্ষান্তি দেননি। Idees Napoleniennes নামে একটি ক্ষুদ্র কেতাবও লেখেন, তাতে উদারবাদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেন এবং তাঁর স্বপ্নের সাম্রাজ্যের সমগ্র কর্মসূচি সম্পর্কে ঘোষণা দেন।

দ্বিতীয় স্রোতোধারা ছিলো প্রজাতান্ত্রিক এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। ১৭৮৯ সালের দর্শন ছিলো রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত অধিকার বিষয়ে সমতার পক্ষপাতি। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের বিষয়টি ভাবা হয়নি। কারিগর, মিস্ত্রী, ইত্যাদি শ্রেণীর আরামের দিকটাও মনোযোগ পায়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে শোষণ চলে, তাতে হস্তক্ষেপ করারও কোনো প্রস্তাব ছিলো না। করপোরেশনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরোধিতা করা হয়, এবং যেহেতু সকল ধরনের সমিতির নিন্দা করা হয়, অতএব শ্রমিকরা ধর্মঘট করে যে সুবিধা আদায় করতে পারে কিংবা মালিকের সঙ্গে পারস্পরিক দরকষাকষির মাধ্যমে সুবিধাজনক শর্ত লাভ করে তার সুবিধা থাকবে না। এসব ছিলো বিভিন্ন জনের ব্যক্তিগত অভিমত। অবশ্য অতি দ্রুত সমাজ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়। বৈপ্লবিক গণপরিষদ জনগণকে বিশেষ সুবিধার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে। কিন্তু দারিদ্র্য সমস্যার কোনো সমাধান খুঁজে বের করতে পারেনি, এই সমস্যা যে ভয়ানক অবস্থানে ছিলো সেখানেই থেকে যায়। অতএব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে দারিদ্র্যের প্রয়োজন সত্যিই আছে কি-না ; সমাজটাকে কি এমন ভাবে পুনর্গঠিত করা যায় যেখানে সবাই সমান সুযোগ না পেলেও, জগতের সম্পদের একটা ন্যায়সংগত ভাগ পাবে। এই চিরায়ত সমস্যা বিষয়ে বিস্তর লেখালেখি শুরু হয় ফলে গোটা ইউরোপ প্রবল আলোড়ন বোধ করে। স্যাঁ সিমোঁর চেলারা সার্বজনীন শান্তির পক্ষে জোর প্রচার শুরু করেন, উত্তরাধিকার নীতি বিলোপের কথা বলেন, প্রস্তাব করেন শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের, এবং প্রত্যেককে সমর্থতা অনুসারে বণ্টনের পদ্ধতির দাবি জানান। ফুরিয়ে রাষ্ট্রসত্তা বিলোপের অনুকূলে অভিমত জ্ঞাপন করেন, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে Phalanasteries বা নির্বাহী

প্রকোষ্ঠ গঠনের প্রস্তাব করেন। প্রুধোর সম্পত্তি সম্পর্কে সুখ্যাত ও বিপজ্জনক শ্লেষোক্তি আলোচনার ঝড় তোলে। তিনি ঘোষণা দেন যে 'সম্পত্তি হলো চৌর্যবৃত্তির ফসল।' লুই ব্লঁ জাতীয় কর্মশালার পক্ষে ওকালতি করেন। সমাজতন্ত্রবাদ (শব্দটা তৈরি করেন পিয়ের লেরু ১৮৩৮ সালে) এবং সাম্যবাদ কথা দুটি তৈরি হয় এবং অতি দ্রুত সব সাধারণে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।[২] প্যারিসের সমাজের নীচের স্তরে ব্যাপক প্রচার লাভ করে যে অনতিকাল পর দেশে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হতে যাচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে গৃহভৃত্য পান করতে পারবে প্রচুর দামি মদ, আর গৃহপরিচারিকারা ব্যবহার করবে প্রভুপত্নীর পোষাক-আশাক এবং অলঙ্কার। এসব অদ্ভুত এবং সহিংস তত্ত্বের মধ্যেও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের একটি ব্যবহারিক ধারণা গড়ে ওঠে। লুই ব্লঁ ১৮৩৭ সালে লিখিত অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পুস্তকে কথিত ধারণা ব্যক্ত করেন। পুস্তকের নামটি হলো, শিল্প সংগঠন : উদারতন্ত্রবাদের অবাধ বাণিজ্য নীতির স্থলে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের স্যাভ-ওয়ার-ফের বা অবস্থানুযায়ী বিচারবুদ্ধি।

সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা দারিদ্র্যের সমান পুরাতন। এই তন্ত্রের ধারণা বিভিন্ন মনে বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। কেউ কেউ মনে করেন, শিল্প-কারখানার জীবনকে মানবিক এবং খ্রিষ্টান নীতি দ্বারা রঞ্জিত করার প্রচেষ্টা, আবার অনেকের ধারণা সম্পদ ও সুযোগের সাম্য, একটি গোষ্ঠীর কাছে ভূমি ও উৎপাদনের উপায় সমূহের সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ। কার্ল মার্ক্সের অনুসারীরা ওকালতি করেছেন সর্বহারার একনায়কত্বের পক্ষে ; এটি অর্জন করতে হবে শ্রেণী বিবাদের ফসল হিসেবে। কথা শোনা যায় গিল্ড সমাজতন্ত্র, মিউনিসিপাল সমাজতন্ত্র, জাতীয় সমাজতন্ত্র, ইত্যাদি সম্পর্কে। কেউ কেউ মনে করেন,—এরা সমধিক যুক্তিশীল, জাতীয় সমাজতন্ত্র পর্যাপ্ত নয়। এই চিন্তাবিদগণ লক্ষ্য করেন যে সমগ্র দুনিয়ার প্রাকৃতিক শক্তির ভৌগোলিক বন্টন অসম। ইউরোপে, ইংল্যান্ডে, লরেনে, রুর-এ, সাইলেসিয়া, আমেরিকা ও পিটসবার্গে সম্পদের উৎস সমান নয়। উদাহরণত তারা প্রশ্ন করেন, এটা কি ন্যায়সংগত হতে পারে যে একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গঠনের জন্য জাপানে কাঁচামাল পাওয়া যাবে কিন্তু চিনে পাওয়া যাবেনা, কিংবা রুমানিয়াতে তেলের খনি থাকবে, ইতালিতে নয়। তারা বিস্ময় মানেন, যদি জগতের সম্পদের উৎসসমূহের পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক বন্টনের ব্যবস্থা করা না যায় তা হলে বিশ্ব শান্তির নিশ্চয়তা থাকে কি-না। এক কথায় এদের আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করা যায়। মহাযুদ্ধের অবসানের পর ইতালিতে যখন আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের কয়লা দুর্ভিক্ষকালীন মূল্যে বিক্রি শুরু হয় তখন জাতিপুঞ্জে ইতালির প্রতিনিধি সুপারিশ করেন যে, শিল্প-কারখানায় ব্যবহার্য কয়লা এবং অন্যান্য কাঁচামালের আন্তর্জাতিক মালিকানা সৃষ্টি করতে হবে।

যে ধরনের সমাজতন্ত্রের পক্ষেই কথা বলা হোকনা কেন মানবিক এবং বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে শিল্পকারখানার পুনর্গঠন স্পষ্টতই এমন দুরূহ উদ্যোগ যার জন্য দরকার করবে ধৈর্যশীল ও মেধাবী লোকদের দীর্ঘকালের সমন্বিত প্রচেষ্টার। ফরাসি সমাজতন্ত্রীরা কিছু ধারণা বাতাসে ছুড়ে মারেন। তারা যা করেন নি, কিংবা করার জন্য তাদের যথেষ্ট সময় দেয়া হয়নি,

---

২ ইংল্যান্ডে সমাজতন্ত্রী বলতে রবার্ট আউয়েন-এর অনুসারীদের বোঝাতো, কথাটা প্রথম দেখা দেয় কো-অপারেটিভ ম্যাগাজিনে ১৯২৭ সালে।

তা হলো : তারা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনীতিক শ্রেণীর মন বাস্তব পরিকল্পনা তৈরির উপযোগী করতে পারেন নি। এক প্রজন্মের শিষ্যদের প্রস্তুত ও শিক্ষিত করে তোলার আগেই বৈপ্লবিক অবস্থা তাদের আঘাত করে। হাইনে[৩] ১৮৪২ সালের প্যারিসের প্রস্তুতিপর্ব আবেগের বর্ণনা দিয়েছেন। একটি জার্মান পত্রিকায় তিনি লেখেন, "আজ একটি কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম ফবুর্গ সাঁ মারসুতে, শ্রমিকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হলো (কর্মজীবীদের মধ্যে এই শ্রেণীই তো সবচেয়ে শক্তিশালী), এখানকার কর্মজীবী লোকেরা কোন ধরনের পুস্তক প্রধানত পাঠ করে তা নিয়ে বিস্তর কথার মাঝখানে আমার মনে পড়ে গেল সক্রেটিসের এই প্রবাদটি, "তুমি আমাকে বলো আজ কি বীজ বপন করেছো, আমি ঠিক বলে দেব, কাল তুমি কি ফসল ঘরে তুলতে পারবে।' কারণ এখানকার বিভিন্ন কর্মশালায় দেখতে পেলাম রোবসপিয়ারের বক্তৃতার বেশ কিছু নতুন সংস্করণ, মারার প্যাম্ফলেটগুলির সস্তা সংস্করণ, ক্যাবেটের হিস্টরি অব দ্য রিভলিউশন, করমেনিনের বিষাক্ত ক্ষুদে পুস্তকগুলি, বুনারত্তির 'বেবুফের মতবাদ ও ষড়যন্ত্র।' এই সবগুলি গ্রন্থই হিংসার গন্ধে ভরপুর। তাদের যে গান করতে শুনেছি সে গানগুলি নরকে বসে রচনা করা হয়েছে। এর চেয়ে অধিক বন্য উত্তেজনা আমি অন্য কোথাও দেখিনি। বাস্তবিকপক্ষে যারা মৃদু, ভদ্রস্বভাব জীবনে অভ্যস্ত তারা ভাবতেও পারবে না যে ঐ গানগুলি কি দানবীয় বাণী বহন করছে। এসব জানার ব্যাপার নয়। একজনের উচিত প্যারিসের কর্মশালাগুলিতে গানগুলি স্বকর্ণে শোনা। ধাতু নিয়ে তাদের কারবার। বিরাট হাতুড়ির ঘা পড়ছে ধাতুতে, অনবরত। হাজারটা হাতুড়ি উঠছে, নামছে! এর মধ্যে চলছে গান, ব্যতিক্রমহীনভাবে। ... ফ্রান্সে যে-বীজ বপন করা হচ্ছে, আজ হোক কাল হোক তা প্রজাতন্ত্রী আন্দোলনের হুমকির জন্ম দেবে।" হাইনের কথাগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্যারিসের কর্মজীবী শ্রেণীর মনে যে পরিকল্পনা কাজ করছে তা ফেবিয়ান কিংবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাজের রূপান্তরের ভাবনা নয়। তারা সহিংস, রক্তলিপ্সু রাজনৈতিক বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত।

১৮৪৭ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে লিবার‍্যাল নেতা অডিলন ব্যারট চেম্বারে (পার্লামেন্ট বা সংসদ) সরকারের কাছ থেকে কোনো প্রকার সুবিধা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে সারা দেশে প্রচারাভিযান শুরু করেন সংসদীয় সংস্কারকর্মের পক্ষে। ভোজনোৎসবের একাধিক আয়োজন সম্পন্ন হয়। বক্তৃতা প্রদান করা হয় একাধিক, একে অপরের সুভেচ্ছা কামনা করে (ব্যতিক্রমহীন ভাবে আন্তরিক ছিলো না) প্রচুর মদ্য পান চলে। চড়া সুরে অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে দাবি জানানো হয় যে গিজোকে বরখাস্ত করতে হবে, পার্লামেন্ট থেকে সরকারি আমলাদের বিদায় জানাতে হবে, সর্বোপরি, নির্বাচকমণ্ডলীর সম্প্রসারণ অবশ্যই করতে হবে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যারা অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করবেন, বক্তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বিবেচিত হন, তিনি হলেন লামারতিন, অদম্য রোমান্টিক, কবি হিসেবে সবার প্রিয়, ইতিহাসকার, ফ্রান্সের পয়লা নম্বর বাগ্মী, সর্বদা সাজগোজে থাকেন, প্যারি নগরীর প্রতিটি সৌখিন আড্ডার মধ্যমণি। তদুপরি তাকে গণ্য করা হতো প্রজাতন্ত্রী আদর্শবাদের পয়গম্বর হিসেবে। সরকার আবেদন বা দাবিগুলি প্রতিহত করে। ভোজনোৎসবের উপর জারি করা হয় নিষেধাজ্ঞা এবং আকস্মিকভাবে প্যারিস নগরীতে সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে

---

৩. প্রধানত জার্মান ভাষার কবি। সামাজিক সমস্যা বিষয়ে বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছেন। —অনুবাদক

মরকোর দাবি রেখে যায়। আবার আকস্মিকভাবেই তীব্র আকার ধারণ করে, এবং বলিভিয়ার অন্তর্ভাগও পালাবদল ঘটে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গড়ায় প্রজাতন্ত্রী উত্থানে।

১৮৮৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাস্তিল ধ্বংসের দ্বিতীয় দিন কর্মজীবীদের বসন্ত বাজার সংকলনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়। Viva la Reforma জায়গা ছেড়ে দেয় Viva la Republique-এর জন্য। বাজা বয়সের ভাবে একেবারে নত, ক্লান্ত এবং মানবিক। তিনি ভেবেছেন পুরো মন্ত্রিসভা বা জাতীয় রক্ষীবাহিনী তার বিরুদ্ধে, উপরন্তু মিথ্যা অনুমান করেছেন যে ঘোড় সওয়ার রক্ষীবাহিনীর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে সেছে, এতে তার স্নায়ুর উপর চাপ সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে, অতঃপর স্বীয় নীতির অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন, এবং ইংলন্ডের মাটিতে খোঁজেন নিরাপদ আশ্রয়। শুরু হয় স্ব-নির্বাচিত অন্তরীণ জীবন। ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশ থেকে লুই ফিলিপ অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুই বোনাপার্টের মধ্যে নড়চড়া শুরু হয়ে যায়। তার বয়স এখন চল্লিশ। একই সঙ্গে রহস্যবাদী এবং একজন লোকাবেণ্ড[১], দেখলে মনে হবে ঘোর অহিফেনসেবী, আর ফরাসি ভাষায় কথা বলেন বিদেশীদের মতো উচ্চারণ করে। কিন্তু সময়টা ঠিক অনুকূল ছিলো না। ফলে সুকৌশলে স্বীয় অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করার পর নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। দেশের ডাকে সাড়া দেবার জন্য তিনি অপেক্ষা করবেন।

পারিসে সূচিত বিপ্লব দ্বিতীয় বারের মতো ফ্রান্সের ভাগ্য নির্ধারণ করে। তবে এবার যে বিপ্লব শুরু হয় তা উদারতন্ত্রের সামর্থ নেই করায়ত্ত করা কিংবা পরিচালনা করা। অরাজক জনসাধারণের প্রচণ্ড চাপে প্রজাতন্ত্রের অনুকূলে ঘোষণা দেয়া হয়, এবং শাসনতান্ত্রিক পরিষদ আহবান অপেক্ষত স্থগিত রেখে দুটি খবরের কাগজের অফিসে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। একটি সমাজতন্ত্রী, অপরটি আমূল সংস্কারপন্থি (Radical)। এরা দেশের প্রশাসন পরিচালনা করবেন। শুরুতেই এদের নানাবিধ ভয়ানক অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ প্রশাসন পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা এদের কারো ছিলো না। উপরন্তু যারা প্রশাসনের দায়িত্ব পেলেন তারা সবাই সব ব্যাপারে নিজস্ব অভিমতকে গুরুত্ব দিতেন। এদিকে গোটা নগরীতে চলছে বিকারগ্রস্ত উত্তেজনা। কেউ কেউ দাবি করছেন সমাজ সংগঠনের জন্য বিশাল পরিকল্পনা, আবার অনেকে ঘৃণনীয় উন্মত্ততা এবং জেদের সঙ্গে দাবি করছেন ইউরোপের স্বেচ্ছাচারতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার জন্য। তবে লামার্তিনের (যিনি তখন বিদেশ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন) সুনাম করে বলতে হয় যে তিনি ছিলেন শান্তিবাদী। তিনি ত্রিবর্ণ পতাকার পরিবর্তে এক বর্ণের (লাল বর্ণের) পতাকা চালু করতে অস্বীকার করেন, তাছাড়া বিপজ্জনক সামরিক হুংকার সৃষ্টি করার চেয়ে উদারনৈতিক ইঙ্গিতের প্রকাশ করে তাদেরকে মতো সন্তুষ্ট রাখেন। সামরিক বিপ্লবের সম্ভাবনাও ঘুরে সরিয়ে রাখা হয়। তবে জাল ক্ষেত্রে একই সঙ্গে সাহসী এবং বিপজ্জনক প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে হয়। বলতে হয় সবার জন্য চাকুরির আবশ্যিক সুযোগ তৈরি এবং জাতীয় কর্মশালা গঠন করে বেকারি সমস্যার মোকাবেলা করা হবে।

---

১. ফ্রেঞ্চ ম্যা ফেয়ার শেলিটেট বাবদের একটি নাটকের চরিত্র। একই সঙ্গে রহস্যবাদীর এবং অলসচারীর।—অনুবাদক

নতুন সংসদ নির্বাচন করা হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। এই সময় একটি সত্য উদঘাটিত হয়। লুই ফিলিপ এবং তাঁর মন্ত্রীরা যদি এটি অনুমান করতে পারতেন তাহলে হয়তো রাজতন্ত্র রক্ষা পেত। একটা কৃষক-মালিকদের দেশে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ফলশ্রুতি আমূল সংস্কারপন্থি না হয়ে রক্ষণশীল কিছু হলে বিস্ময় মানা চলবে না। মুষ্টিমেয় হাজার বিত্তবান বুর্জোয়াদের দ্বারা গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী চেম্বারের প্রতি আনুগত্যের কিংবা দেশের প্রতি আস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করেনি। বরং উৎসাহিত করেছে, ইন্ধন যুগিয়েছে প্রবল ঈর্ষায়, ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে জনগণের উন্মাদনায়। তবে সার্বজনীন ভোটাধিকার হয়তো রাজতন্ত্রের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ বিনিয়োগ হতো না। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রেকর্ড সংখ্যক লোক ভোটের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল বুর্জোয়ারা চেম্বারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। প্রজাতন্ত্রী এবং বুর্জোয়াদের অনুপাত হলো ১:৮। এই পদ্ধতিতে যারা প্রথম সংসদের সদস্য হলেন তাদের এখন গ্রামীণ ফ্রান্সের সুপ্রাচীন কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে। তবে হাতের কাছে একটা জীবন-মরণ সমস্যা রয়েছে: মোকাবেলা করতে হবে প্যারিসের লাল বিপদের। প্রাদেশিক ভোটের গুরুত্ব এবং কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও তাদের অবস্থান যে কি নাজুক ছিলো তা বোঝা গেল মে মাসের পনেরো তারিখে। উচ্ছৃঙ্খল জনতা চেম্বারে হামলা চালায়, ঘোষণা করে সংসদের বিগঠন, এবং ইউরোপের রাজতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। একটা বেপরোয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু জাতীয় রক্ষীবাহিনী যথাসময়ে উপস্থিত হয় এবং ন্যায্য আচরণ দ্বারা পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন। তবে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে ফল কি দাঁড়াতো? অতঃপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে উচ্ছৃঙ্খলতার উৎস দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করা হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় কর্মশালাগুলি বন্ধ করে দেয়া হয়। এই কর্মশালাগুলি চালু রাখতে হয়েছিলো সরকারি রাজস্বের বিরাট ক্ষতি করে। আর এগুলির আকর্ষণেই দেশের নানা অঞ্চলের বেকারের দল প্যারিসে ভিড় জমাতে শুরু করে। এই কঠোর ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। জনমনে গভীর আতংক ছড়ায়। এর থেকে পরবর্তী কয়েক মাসের অদ্ভুত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা অনুমান করা সম্ভব। জুন মাসের যৎপরোনাস্তি গরমের মধ্যে এক নাগাড়ে চার দিন জেনারেল ক্যাভেইন্যাকের নিয়মিত সেনাদল এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনী বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করে। বিদ্রোহীদের কোনো নেতা না থাকলেও এবং তাদের বিদ্রোহ পূর্ব-পরিকল্পিত না হলেও, তারা ভয়ানক ও বেপরোয়া মনোভাবের পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়। আর এজন্যই জেনারেল ক্যাভেইন্যাকের নেতৃত্ব সফল হয়, কিন্তু সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজার। ফরাসি জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তাদের সম্পত্তি বলতে জমিজমা কিংবা গচ্ছিত টাকা-পয়সা বিধায়, সেনাবাহিনীর বিজয়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করে, বিপদের মাত্রা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, এবং তারা দাবি জানায় যে ভবিষ্যতের শাসকেরা যেন এমন কঠোরতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করে যাতে লাল সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

এই সব ভীতিকর উত্তেজনার ভেতর সংসদ একটা আজগুবি শাসনতন্ত্র উৎপাদন করে। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য হলো প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং এটা দেখা যে অতঃপর যেন পরিবর্তনের সুযোগ না থাকে। নতুন প্রজাতন্ত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের

ব্যবস্থা করা হয় : এক কক্ষ বিশিষ্ট চেম্বার ও প্রেসিডেন্ট। এদের নির্বাচন করা হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। এটুকু পরিষ্কার বোঝা যায় যে আমেরিকার উদারহরণ থেকে প্রেরণা লাভ করা হয়েছে, কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ বেমালুম ভুলে যান যে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যসমূহের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। এদিকে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের নতুন প্রেসিডেন্ট চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন এবং অতঃপর তিনি আর প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে পারবেন না। এই প্রেসিডেন্ট হবেন একটা আমলাতন্ত্রের প্রভু, যে আমলাতন্ত্র দেশের প্রতিটি নগর ও পল্লীর কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করে।

১৮৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর গণভোট গ্রহণ করা হয়। লুই বোনাপার্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। ফরাসি সমাজের স্বীকৃত ত্রাণকর্তা ক্যাভাইনাকের চেয়ে তিনি চার মিলিয়ন ভোট বেশি পান। লামার্টিনকেও সমান সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। অথচ তিনি দীর্ঘ উনচল্লিশ বছর নোংরা ও লজ্জাকর নির্বাসিত জীবন-যাপন করেন। এখানে ঘটনা হলো, বোনাপার্ট নামটাই যথেষ্ট ছিলো। গোটা দেশের প্রতিটি কুটিরে ঐ নামের অর্থ হলো শৃঙ্খলা, ক্ষমতা, এবং প্রসিদ্ধি।

কিন্তু তিনি একেবারে স্বাধীন ছিলেন না। তাকে বোঝাপড়া করতে হবে সংসদের। এই সংসদ সদ্য নির্বাচিত। রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন, এবং লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়পন্থিরা যদি তাদের ব্যবধানগুলি ঘোচাতে পারে তাহলে রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। উপরন্তু যে সংসদ নতুন গঠিত হলো তাতে তার কোনো অনুসারী ছিলো না। এই সংসদ তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে না, তাকে সমর্থনও করবে না। মেজাজের দিক থেকে উদারতন্ত্রী এবং জাতীয়তাবাদী হলেও যাজকীয় এবং রক্ষণশীল স্রোতোধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে বাধ্য হন, এবং অতীতের কার্বোনারো জীবন বর্জন করে রোমান প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে পোপদের সাহায্য করেন। ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর যে কুদেতা অনুষ্ঠিত হয় সেটা ছিলো তার স্বকীয়তা এবং ক্ষমতা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা। বল প্রয়োগ ও প্রতারণার সমন্বিত শক্তি দ্বারা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, শাসনতন্ত্র লংঘন করে, নেতৃস্থানীয় অনেক সৈনিক এবং রাজনীতিবিদকে কারাগারে প্রেরণ করে, প্যারিসের রাস্তায় এক হাজার দুই শত নিরীহ নাগরিককে বন্দুকের সাহায্যে যমালয়ে প্রেরণ করে লুই বোনাপার্ট ফ্রান্সের নিরঙ্কুশ প্রভুপদ লাভ করেন। সংসদ ভেঙে দেয়া হয়। সদস্যদের কারাগারে প্রেরণ করা হয় কিংবা বিতাড়িত, নিজের ক্ষমতার আয়ুষ্কাল করা হয় দীর্ঘতর। এই কুদেতার নিন্দা করেন ভিকতর উগো এবং টেনিসন। তবু বলা হয়, "এই মুহূর্তে মনে হয় লুই বোনাপার্ট স্বেচ্ছাচারী শাসক নন, বরং স্বেচ্ছাচারতন্ত্র হন্তা।" সংসদের বিরুদ্ধে, যে সংসদ বেতন ভাতা নেয়া শুরু করেছিলো, তিন মিলিয়ন নির্বাচককে নির্বাচনী আইনের মাধ্যমে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেন, যার পুরো ফলশ্রুতি হয়তো উপলব্ধি করা যায়নি। তিনি এই পদক্ষেপ পুনর্বিবেচনা করতেও অস্বীকার করেন। মনে হয় তিনি ন্যায্য কাজই করেন। ব্রলি (Broglie) বলেন, "জনগণ তাদের পছন্দ করা সরকার পায়। আর বুর্জোয়ারা পায় যে ধরনের সরকারের জন্য তারা যোগ্য। সার্দিনীয় মন্ত্রিকে এই প্রিন্স প্রেসিডেন্ট (লুই বোনাপার্ট। তিনি এখন নামে না হলেও কার্যত দেশের সম্রাট) বলেন, "এখন আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আমি ইতালির জন্য কিছু করবো।"

ইউরোপীয় ইতিহাসের নতুন কিছু পাতা ওল্টানোর সময় সমাসন্ন। এই পাতাগুলির বিশেষ পরিচয় হলো জাতীয়তাবাদের বিজয় এবং জ্যোতির্ময় আদর্শবাদ, রাজনীতির প্রতি

গভীর আগ্রহ, নাগরিকরা সুশৃঙ্খল। আবার প্রবল অন্ধ ভাবাবেগ, বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদান নীতির ভিত্তিতে বিরাট সেনাবাহিনী গঠন, ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের সূচনা, বিশ্ব শান্তির চলমান হুমকি হিসেবে আত্মপ্রকাশ। ঐ মহান মানবিক প্রাণোজ্জ্বলনের গোড়ার দিকে ইউরোপের জন্য নতুন নতুন বিপদ সৃষ্টি হয় এবং তাতে লুই নেপোলিয়নই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ইউরোপে জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীলতার উৎস ছিলো রাশিয়া। লুই নেপোলিয়ন উক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার দুর্গে আঘাত হানেন। অতঃপর ডিসেম্বর অপবাদের প্রণেতা ইতালিকে প্রায় ঐক্যবদ্ধ করতে এবং মুক্ত করতে সমর্থ হন।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলি

১. এইচ. এ. এল. ফিসার : বোনাপার্টবাদ, ১৯০৯।
২. গিজো : স্মৃতিকথা, ১৮৬৪।
৩. ই.এল. উডওয়ার্ড : ইউরোপে রক্ষণশীলতার স্বরূপ, ১৯২৯।
৪. লোয়েস ডিকিনসন : আধুনিক ফ্রান্সে বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়া, ১৮৯২।
৫. লুই ব্লঁ : Ateliers Nationaux, স. ম্যারিয়ট, ১৯১৩।
৬. এইচ. হাইনে : Letters to the Augsburger Allgerneine Zeitung 1840-3.
৭. ওডিলো বারো : স্মৃতিকথা, ১৮৭৫-৭৬।
৮. এফ. এ. সিম্পসন : লুই নেপোলিয়েনের উত্থান।
৯. পি ওরেডান্না : দ্বিতীয় সাম্রাজ্য, ১৯৩২।
১০. এ. দ্য তকবিল : Souveuirs, অনু, ১৮৯৬।
১১. এল. ব্লঁ : Histoire de Dix Ans. ১৮৪০—৫।
১২. পি. দুক্ত ড্যানসিন : Historire de la Monarchiede Juillet, ১৮৮৪—৯।
১৩. ডি. ডব্লিউ. ব্রোগা : নেপোলিয়ন থেকে পেতাঁ পর্যন্ত ফরাসি জাতি, ১৮১৪-১৯৪০ (১৯৫৭)।
১৪. এ. এল. গুয়েয়ার : তৃতীয় নেপোলিয়ন, ১৯৪৩।

রিসর্জিমেন্টো

ইতালিতে প্রবল উত্তেজনা। নিও নেপো প্রজাতন্ত্রী ঐতিহ্য। ম্যাৎসিনি। সার্দিনিয়ার অবদান। রোমান প্রজাতন্ত্র। ভেনিস ও ম্যানিন।

ফরাসি রাজতন্ত্রের পতনের আগেই বিপ্লবের আগুনে সিসিলি ও নেপলসের ঘুণে-ধরা সরকারব্যবস্থা সজোরে কেঁপে উঠেছিলো। ১৮১৮ সাল বিপ্লবের জন্য ইতালির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কোপারো যেন ছিলো নিয়তি নির্দিষ্ট। সেই স্মরণীয় বসন্তে বিপ্লবের আগুন যতই উত্তর অভিমুখে প্রবাহিত হতে থাকে, ততই অনুতপ্ত কিংবা কপট রাজাদের কম্পমান হাত থেকে শাসনতন্ত্র প্রবল বর্ষণের বেগে ঝরে পড়ে। বিপ্লব স্পর্শ করে রোম ও তুরিন, লেগহর্ন ও পিসা, ফ্লোরেন্স ও মিলান। এর মধ্যে যখন খবর পৌঁছে যে ভিয়েনা নগরী উত্তেজিত জনতার হাতে চলে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত মেটোরনিক–কে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তখন স্মরণমুখর ভেনিসও ম্যানিনের নেতৃত্বে প্রবল উৎসাহ বোধ করতে শুরু করে, অস্ত্র ভাণ্ডারের উপর অধিকার কায়েম করে এবং ভেনিসকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দেয়।

বিকৃত অবস্থার বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হয় তাতে প্রাথমিক এবং সার্বজনীন আবেগ হিসেবে কাজ করে মৌলিক রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা লাভের বাসনা। ইংল্যান্ড এই স্বাধীনতাগুলি ভোগ করে। ফ্রান্সেও এগুলি নিরাপদ, তাছাড়া নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থা স্বেচ্ছাচারী হলেও তা ছিলো উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন এবং আলোকদীপ্ত। এসব ইতালীয়দের নজরে পড়ে। পুলিশের গোয়েন্দাগিরি, অন্যায়ভাবে কারাগারে প্রেরণ, খবরের কাগজ এবং পুস্তকাদি অজ্ঞাত কারণে সেন্সর করা, বিদেশ ভ্রমণের উপর হয়রানিমূলক বিধিনিষেধ আরোপ, প্রভৃতি থেকে তারা মুক্তি কামনা করে। তাছাড়া যে এলাকাগুলিতে অস্ট্রিয়ার শাসন বলবৎ সেখানকার গ্রামগুলি থেকে কৃষকদের (Contadino) জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশী সেনা বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। তাদের যুদ্ধ করতে হয় দূর-দূরান্তরে। ইতালীয়রা এসব থেকে মুক্তি কামনা করে। যদিও এমনিতে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। তবে মুক্তি আদায়ের প্রশ্নে তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ইতালির ঐক্য একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গ। কারণ এটি করতে হলে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে লোম্বার্ডি এবং ভেনিসিয়া থেকে বল প্রয়োগ করে অস্ট্রীয়দের বিতাড়িত করতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর প্রশ্ন ওঠে এভাবে মুক্ত হবার পর ইতালি রাষ্ট্র কিভাবে সংগঠিত করা হবে। যেহেতু ১৮৪৮ সালে এই প্রশ্নের জন্য শুধুমাত্র একটি উত্তর এবং নিশ্চিত উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি, কারণ কেউ পোপের অধীনে ফেডারেশন গঠন করতে চান, কেউ বলেন সার্দিনীয় রাজবংশের অধীনে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হোক, অনেকে চান এককেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্র, ফলে প্রচণ্ড আলোড়ন এবং সুযোগের মধ্যেও ইতালীয় বিপ্লব ব্যর্থতা বরণ করে।

অধিকাংশ ইতালিবাসী প্রথমে মনে করেন ইতালির মুক্তি প্রধানত নির্ভর করে একজন বিরল ও আকর্ষণীয় পূর্বলক্ষণযুক্ত উদার পোপের উপর। সোলহ গ্রেগরির কঠোর স্বেচ্ছাসনের পর ১৮৪৬ সালের গ্রীষ্মে একজন পোপ আসেন, যিনি ছিলেন খাঁটি ইতালীয় এবং সংস্কারপন্থি। ইনি প্রথমেই পূর্বসূরীর চেয়ে যুক্তিশীলতার পরিচয় দেন। সে সময়কার ক্যাথলিক মতবাদের মেজাজ ছিলো সম্ভ্রান্ত এবং উদার। এই পোপও ব্যাপক প্রতিষ্ঠাবান উক্ত মেজাজের অধিকারী ছিলেন। সমগ্র ইতালি অবিলম্বে জেনে যায় যে, পিও নোনো (নবম পিয়ুস) রাজনৈতিক অপরাধের জন্য কারাকদ্ধী সকল দেশপ্রেমিক ইতালীয়কে ক্ষমা করে দিয়েছেন, অস্ট্রিয়া কর্তৃক ফেরারা (তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলের একটি শহর) দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, তিনি গঠন করেছেন একটি সিভিক রক্ষীবাহিনী, সর্বোপরি, পোপীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সংস্কারকর্মে হাত দিয়েছেন। ধর্মপ্রাণ কৃষক এবং ভূস্বামীরা যখন জানতে পেরেছেন যে বর্তমান পোপ সংস্কারপন্থি, তখনই তাদের মধ্যে আস্থা জন্মেছে যে সংস্কারকর্ম মঙ্গলজনক। যদিও পোপের সংস্কারকামী উৎসাহ সম্পর্কে অনেক বাড়িয়ে প্রচার করা হয়, পরবর্তীকালীন ঘটনাবলির কারণে সংস্কারকর্ম নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়, তবু ইতালির উন্নতির জন্য তিনি যে সংস্কারপন্থি আন্দোলনের সঙ্গে গোড়ার দিকে জড়িত থাকেন, তার একটা মূল্য আছে এবং সে সম্পর্কে বাড়িয়ে বলার কিছু নেই। অনেক রক্ষণশীল ব্যক্তি পোপের কারণে জাতীয় আন্দোলনে শরিক হন। অন্যথায় তাদের জাতীয় আন্দোলনের ধারে কাছে দেখা যেত না। পোপ এক পর্যায়ে আন্দোলন বর্জন করেন, কিন্তু এদের কেউ সরে দাঁড়াননি। এমনও সংশয় পোষণ করা চলে যে, শুরুতে আন্দোলনের প্রতি পোপের আশীর্বাদ না থাকলে ইতালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এতটা বড়ো আকার পেত কি-না এবং ইতালির সমস্যা ইউরোপের সর্বাগ্রগণ্য রাজনৈতিক প্রশ্নে পরিণত হতো কি-না।

ইতালির মুক্তির জন্য উৎসাহীর দল একটা ব্যাপার ঠাহর করতে ব্যর্থ হন, এবং সেটা ছিলো অনিবার্য। এই উৎসাহীর দল বুঝতে পারেন নি যে ক্যাথলিক গির্জার ধর্মীয় প্রধান কোনো মতেই ইউরোপের প্রধান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহ প্রদান করতে পারেন না। পিও নোনো অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে অস্বীকার (১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসের পোপীয় আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা Allocution) করেন বলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। তিনি যদি এই কাজটি করতেন তাহলে জার্মান ক্যাথলিকদের পক্ষত্যাগের ঝুঁকি বহন করতে হতো, ক্যাথলিক চার্চের যে সংহতি তাও হয়তো রক্ষা করা সম্ভব হতো না। তথাপি অস্ট্রীয় যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করায় কিংবা এতে স্বীয় ভাগ্য জড়িত না করায় সঠিকভাবেই মনে করা হয় যে এতে ইতালির মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে গুরুতর আঘাত হানা হলো। কারণ তখন ইতালির মুক্তির জন্য যতগুলি পরিকল্পনা প্রস্তাবিত করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে কম অবাস্তব ছিলো পোপীয় রোমের অধীনে ফেডারেশন গঠন। বাস্তবিকপক্ষে, যেহেতু ১৮৪৮ সালে ইতালিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব ছিলো না, অতএব দেশপ্রেমিক ইতালিবাসী এবং ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিকরা একই সঙ্গে খুশি হতে পারেন যে, তখনকার ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টাগুলি সফল হয় নি। ইতালির মাটিতে প্রজাতন্ত্রবাদের ঐতিহ্য ছিলো বদ্ধমূল। তবে এই প্রজাতন্ত্রবাদ ছিলো নগরকেন্দ্রিক, এটি কোনো অর্থেই জাতীয় ব্যাপার ছিলো না। ফলে প্রজাতন্ত্রবাদের স্মৃতি রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি না করে বরং রাজনৈতিক মতবিরোধের আরতন সম্প্রসারণ করে। জেনোয়ার জনৈক ডাক্তারের রাজকতন্ত্র

ইংরেজী সূত্র ম্যাৎসিনি জাতির ধ্যান ধারণার রূপ ও নির্দেশনা পরিবর্তন করেন। তিনি প্রচার করেন একটি মতবাদ। তাহলো : প্রজাতন্ত্র এক এবং অবিভাজ্য। এই মতবাদ ব্যাপারে তিনি অবিচল ও অনন্যচিত্ত ভক্তির নাজির উপস্থাপন করেন। ম্যাৎসিনিকে অভিহিত করা চলে ইতালির প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলনের সন্তপুরুষ হিসেবে। তার দেশ কোনো দিন একজন রাজার শাসন কবুল করবে, তা সে রাজা হোক নিওপলিটান (পড়ুন : নেপলসের) কিংবা সার্দিনিয়ার, তার কাছে একেবারে আজগুবি ব্যাপার বলে বোধ হয়। কারণ নেপলসের অধিবাসীদের তার কাছে মনে হয় নিদারুণ দুর্নীতিপরায়ণ, সার্দিনিয়ানরা তার বিচারে যথেষ্ট অগ্রবর্তী নয়, বরং অধঃপতনশীল এবং প্রতীপগতি। ইতালির জন্য যোগ্য পুরস্কার হলো একটি প্রজাতন্ত্র, শুধুমাত্র একটি প্রজাতন্ত্র, যে প্রজাতন্ত্র জগতের সবগুলি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে স্থায়ী এবং শান্তিপূর্ণ বন্ধনে। বলা বাহুল্য, এটি কোনো স্বপ্ন নয়, এটি ছিলো নিছক অসার কল্পনা। এই স্বপ্ন একজন ষড়যন্ত্রকারীর বৈশিষ্ট্যসূচক। যিনি প্রতিটি সরকারের বিরোধিতা করেন, এবং যিনি, ১৮৪৮ সালের প্রতিটি উদারনীতিবিদের মতো, রণক্ষেত্রের উপর বিন্দুমাত্র ভরসা রাখেন না, আস্থাশীল থাকেন মানুষের উদ্দীপনা এবং যুক্তিশীলতার উপর। তবু একথা জোর দিয়ে বলা যায়, অস্ট্রীয় শ্বেতাম্বরদের ইতালি থেকে বিতাড়নের জন্য যদি দরকার ছিলো তীব্রতর এবং অধিক বাস্তবিক কিছু, তাহলে এই উপসংহার টানা চলবে না যে ম্যাৎসিনির জীবনটা বিফলে গেছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে নৈতিক উদ্দীপনা বোধ করে তার জন্য প্রধানত স্বীকার করতে হয় ম্যাৎসিনির আদর্শকে। এই প্রফুল্লচিত্ত স্বপ্নবিলাসীর শিক্ষা এবং ১৮৩১ সালে তিনি যে ইতালীয় যুবকদের সংঘ গঠন করেন মার্সাইর একটি ক্ষুদ্র চিলেকোঠায়, তা ইতালির আন্দোলনের জন্য স্থায়ী নৈতিক প্রেরণার কাজ করে।

ইতালির মূল সমস্যা একটিই। লোম্বার্ডি এবং ভেনিসিয়ায় অস্ট্রীয় বাহিনীর অবস্থান। ইতালির ঐক্য প্রসঙ্গে কথা বলার কোনো মানেই হয় না যদি অনির্দিষ্টকাল বৃদ্ধ মার্শাল রেডেটৎস্কিকি পচাত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে মানটুয়া, ভেরোনা, পেসখিয়ারা এবং লেগনাগার চার দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থান করেন এবং উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। এত বড়ো একটা বাহিনী এবং রেডটৎস্কিকির মতো ঝানু সেনাপতিকে প্রশিক্ষণহীন অনিয়মিত একটা বাহিনী পরাস্ত করতে পারবে কল্পনা করা বাস্তবতার থেকে বহুদূরে অবস্থান করার মতো ব্যাপার। সম্ভাব্য সংস্থান কেবল একটিই ছিলো যাকে ঘিরে বিদেশী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে কার্যকর এবং সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেত, আর সেটি হলো সার্দিনিয়া রাজ্যের সেনাবাহিনী। নেপলস ও পোপ ছেঁড়া তার হিসেবে প্রমাণিত। ভেনিসিয়া প্রদেশের সামরিক প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় ছিলো। কিন্তু এই প্রতিভাকে বিকশিত করার কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। এদিকে এমনকি লোম্বার্ডরা, সুপ্রসিদ্ধ মে মাসের দিনগুলির পর যখন জনসাধারণ অস্ট্রীয় সেনা ছাউনিগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, এবং তাদের বিতাড়িত করে, তাদের প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, এই সামরিক অভিযানে নামমাত্র ভূমিকা পালন করে। চার্লস আলবার্টের বাহিনী বিলম্বে সশস্ত্র বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে এবং সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগাতেও দ্রুততার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়। তবে তার বাহিনী সবচেয়ে কার্যকর চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম হয়। অতঃপর সব শেষ হয়ে গেলে, তার বাহিনী কাস্টোজা এবং নোভারায় পরাজিত হলে ভগ্নহৃদয় রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে পর্তুগিজে নির্বাসিত জীবন শুরু করেন। এই ঘটনাগুলি থেকে যে কোনো অনুভবী ব্যক্তি সহজে অনুমান করতে পারবেন যে, ইতালির

মুক্তি সংগ্রাম যদি শুরু হয়, তবে তা পিডমন্টেই প্রথম শুরু হবে। যদি সাব- আলপাইন ক্ষুদ্র একটি রাজ্যের বাহিনী দুর্বল, রুগ্ন এবং আত্ম-যাতনাকারী রাজার অধিনায়কত্বে লড়াই করে থাকেন, তবু এই বাহিনী শেষ পর্যন্ত লড়াই করে, তাদের স্বীকার করতে হয় অসমানুপাতিক আত্মত্যাগ। উপরন্তু তারা লড়াই করেন সমগ্র ইতালির স্বার্থের অনুকূলে। এতেই সব কথা বলা হলো না। চার্লস আলবার্ট সিংহাসন ত্যাগ করার সময় উত্তরাধিকারী রেখে যান ভিক্টর ইমানুয়েলকে, তুরিনে এসে শাসন কার্য পরিচালনা করার জন্য। ভিক্টর ইমানুয়েল যে রাজ্য শাসন করবেন সেটি বিগত সংঘর্ষে পরাস্ত হলেও উদারবাদী শাসনতন্ত্রের আশীর্বাদ লাভ করে। এই শাসনতন্ত্র এতটা দীর্ঘায়ু লাভ করে যে মুসোলিনির দিনগুলি পর্যন্ত টিকে থাকে। এটি এমন কৌশলে রূপায়ণ করা হয় যে, এতে পাওয়া যায় একটি কাঠামো যার ফলে ক্যাভুরের ওস্তাদি নির্দেশনায় পিডমন্ট পরিণত হয় ইতালির সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং আধুনিক রাজ্য হিসেবে।

ইত্যবসরে রিসরজিমেন্টো প্রসিদ্ধ নগরী রোম ও ভেনিসে একই সঙ্গে নাটকীয় এবং স্মরণীয় পন্থা অবলম্বন করে। পিও ননোর এপ্রিল মাসের অনুষ্ঠানিক বিবৃতির নিহিতার্থ হলো জগতের জানা উচিত ইতালির ঐক্য প্রচেষ্টায় পোপ আর অংশগ্রহণ করবে না। এই বিবৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি দাঁড়ায় এই যে, জাতীয়তাবাদী শক্তি এখন দাবি করবে যে পোপীয় ভূ-খণ্ডগুলি অবশ্যই অযাজকীয় কর্তৃপক্ষ শাসন করবে নতুন ইতালীয় রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে। কারণ যদি দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের মাঝখানে হস্তক্ষেপকারী কোনো পার্থিব নৃপতির রাজ্য থাকে এবং তিনি যদি ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করতে অস্বীকার করেন এমনকি অস্ট্রীয় শত্রুদের সমর্থন করার স্বাধীনতা রয়েছে বলে মনে করেন, তাহলে ঐক্যবদ্ধ ইতালির বিষয়ে কথা বলার কোনো অর্থ হয় না। যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তার বন্য যুক্তিশীলতা বন্য রোমান জনতা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। জ্ঞানদীপ্ত মিনিস্টার রোসিকে পিও ননো তলব করেন পরামর্শের জন্য। তাকে দিবা ভাগে খুন করা হয়, ১৮৪৮ সালের ৫ নভেম্বর, আর পোপ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে উপলব্ধি করে গেইটাতে পালিয়ে যান। ইতালীয় বিপ্লব এখন স্বীয় নির্দেশনা অনুসারে চলতে পারে।

এর পর যেসব ঘটনা ঘটে তা ইতালির কল্পনায় গভীর রেখাপাত করে। শাসনতান্ত্রিক সভা আহ্বান করা হয়, এই সভা পোপকে পার্থিব ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করে, রোমান প্রজাতন্ত্রের নামে ঘোষণা প্রদান করা হয় এবং রোমান রাষ্ট্র শাসনের জন্য ম্যাৎসিনিকে প্রধান করে তিন জনের শাসন ব্যবস্থা গঠিত হয়। ক্যাথলিক গির্জা কর্তৃপক্ষ এবং কয়েকটি ইহজাগতিক রাষ্ট্রকে পরিষ্কার অগ্রাহ্য করে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কারণ ইহজাগতিক রাষ্ট্রগুলির গির্জা কর্তৃপক্ষকে সশস্ত্র সমর্থন জানানোর সম্ভাবনা রয়েছে। রোমান প্রজাতন্ত্র প্রতিরক্ষার জন্য দক্ষতার পরিচয় দিলে কি হবে, ক্যাথলিক ভোটের জন্য লালায়িত ফরাসি প্রিন্স প্রেসিডেন্ট-এর বিরোধিতার মুখে টিকে থাকার প্রত্যাশা করতে পারে না। এদিকে অস্ট্রীয় সম্রাট ইতালিতে তার প্রাধান্য পুনরুদ্ধারের জন্য তৎপর। বস্তুত, ফরাসিরা উক্ত প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসসাধন করে (৩০ জুন, ১৮৪৯)। তবু রোমান প্রজাতন্ত্রের আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হলেও, দুটি কারণে এই প্রজাতন্ত্র স্মরণযোগ্য উপাখ্যান হয়ে আছে। ম্যাৎসিনি পরবর্তীকালে লেখেন, "রোম পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজন

ছিলো। দরকার ছিলো তাকে আর একবার শীর্ষে স্থাপন, যাতে ইতালীয়রা পুনরায় ঐ নগরীকে তাদের অভিন্ন দেশের মন্দির হিসেবে গণ্য করতে শেখে।" এটি ছিলো সঠিক রাজনৈতিক উপলব্ধির ঝলকানি। রোমান প্রজাতন্ত্রকে প্রতিরক্ষার চেষ্টা করা হয় চমৎকার অথচ হালকা হৃদয় ইতালিয় বীরত্ব দ্বারা, এই বীরদের লড়তে হয় Oudinot-এর সুশৃঙ্খল ফরাসি বাহিনীর বিরুদ্ধে। এই প্রজাতন্ত্র ইতালীয় জনগণের মধ্যে ধারণা জাগায় যে রোম নগরী আবার তাদের রাজনৈতিক রাজধানী হতে পারে, তবে এই ধারণা ১৮৭০ সালের আগে বাস্তবায়িত হয়নি, কিন্তু ১৮৪৮ সাল থেকে জনসংখ্যার সেই অংশের রাজনৈতিক চেতনা থেকে কখনো মুছে যায়নি, যে অংশ জাতীয়তাবাদী উচ্চাভিলাষ পোষণ করে। আরো একটি রোমান প্রজাতন্ত্র বিসরজিমেন্টোর বর্ষপঞ্জিতে স্মরণযোগ্য হয়ে আছে। প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টায় অধিনায়কত্ব করেন গ্যারিবল্ডি (১৮০৭-৮২)। অনিয়মিত বাহিনীর গৌরবর্ণ এই মহান নেতা পুরোহিতদের প্রতি ঘৃণা বোধ করতেন, ছিলেন মুক্তির পূজারি, দক্ষিণ আমেরিকায় বন্য জীবন যাপনের পর দেশে ফিরেই তার প্রিয় ইতালিকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার জন্য তৎপর হন। এবার তিনি তার উস্কুখুস্কু লাল কোর্তা অনুসারীদের নিয়ে ইতালীয় নাটকের হৃদপিণ্ড তথা প্রাণকেন্দ্রে সশব্দ উপস্থিতি ঘোষণা করেন। গ্যারিবল্ডির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বলতে কিছু ছিলো না। ইতালীয় বিদ্বান সভার তিনি কেউ নন, যেমন ম্যাৎসিনি ছিলেন কিংবা ছিলেন ক্যাভুরের মতো গভীরতাসম্পন্ন রাষ্ট্রবিদ, কিন্তু অনিয়মিত বাহিনীর নির্ভয় অধিনায়ক হিসেবে, কাঁচা অনুসারীদের মধ্যে সরল ও আবেগদীপ্ত রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রাণিত করায় সমর্থ নেতা হিসেবে তার মধ্যে নিশ্চিতরূপ হোমারীয় বিশালতা বা মহিমা লক্ষ্য করা যায়। চার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ইতালির পবিত্র মাটিতে শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে প্রিয় নেতা গ্যারিবল্ডির সঙ্গে রোম নগরী ত্যাগ করা শ্রেয় মনে করে। ইতালি ভেদ করে গ্যারিবল্ডির পাশ্চাদপসরণ, পথি মধ্যে অনেক রোমান্টিক এবং ট্র্যাজিক উপাখ্যানের জন্ম হওয়া, ইতালির দেশপ্রেমিকদের তার প্রতি আস্থা ও ভক্তি নিশ্চিত করে।

ভেনিস প্রজাতন্ত্র যদিও অবরোধকারীদের সঙ্গে লড়াই করে ১৮৪৯ সালের ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত টিকে থাকে, তবে ২৩ মার্চ সার্দিনীয় বাহিনী নোভারায় পরাস্ত হলে তার আর কোনো ভরসা থাকে না। এই সমরাভিযান থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তা ম্যানিনের বুঝতে বাকি থাকে না। এই ইহুদি বংশোদ্ভূত মেধাবী আইনবিশারদ ছিলেন ভেনিস প্রজাতন্ত্র প্রতিরক্ষা ও পরিচালনার প্রধান পুরুষ। রোম ও ভেনিসে আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার দরুন তিনি পরিষ্কার উপলব্ধি করেন যে, ম্যাৎসিনির পরিকল্পনা অনুসরণ করে ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। ইতালিকে একমাত্র ফ্রান্সের সমর্থনে সার্দিনীয় রাজ্যের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। চার্লস আলবার্ট প্রচার করতেন যে ইতালি একা চলতে সক্ষম। তার এই মতবাদ দুটি রণাঙ্গনে অসার প্রমাণিত হয়। একলা চলার নীতি মৃত কিংবা পরিত্যক্ত। আরো একটি ধারণা দাঁড়াতে পারেনি। সেটি হলো, প্রজাতন্ত্রী গেরিলা বাহিনীর সাহায্যে কোনো শক্তিশালী নিয়মিত বাহিনীকে পরাস্ত করার তত্ত্ব। এবার জাতীয় দলে প্রবেশ করে দেশপ্রেম ও সুযোগ সন্ধানী নীতির সমন্বিত নতুন শক্তি। এটি স্থলাভিষিক্ত হয় অপরিণামদর্শী উদ্দীপনার, যা ১৮৪৮

সালের চরম ব্যর্থতার জন্য দায়ী। পঞ্চাশের দশকে প্রজাতন্ত্রী উদ্দীপনা অপসারণের সব চেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত ম্যানিনের রূপান্তর (অথচ ইনি ছিলেন ভেনিস প্রজাতন্ত্রের স্রষ্টা)। তিনি অতঃপর ভিক্তর ইমানুয়েল এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের মধ্যে মৈত্রীর পক্ষপাতী।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলি

১. বল্টন কিং : ইতালীয় ঐক্যের ইতিহাস। ১৯২৪।
২. জি. এম. ট্রিভেলিয়ান : ম্যানিন ও ১৮৪৮ সালের ভেনিসিয়ান বিপ্লব। ১৯২০।
৩. জি. এম. ট্রিভেলিয়ান : গ্যারিবল্ডি। ১৯০৩।
৪. ডব্লিউ. আর থেয়ার : ইতালীয় স্বাধীনতার উষাকাল। ১৮৯০।
৫. ম্যাৎসিনি : প্রবন্ধাবলি। ইং অনু. টি ওকি। ১৮৯৪।
৬. ই. এল. উডওয়ার্ড : ইউরোপীয় রক্ষণশীলতা চর্চার তিনটি ধারা। ১৯২৯।
৭. জে. এ. যুবনার : Une année de ma vie। ১৮৪৮–৯১।
৮. ডি. ম্যাক স্মিথ : ক্যাভুর ও গ্যারিবল্ডি, ১৮৬০। ১৯৫৪।
৯. ই. ই. হেলেস : ম্যাৎসিনি ও গোপন সংঘসমূহ
১০. জি. স্যালভেমিনি : ম্যাৎসিনি। ইং. অনু. আই. এম রসন। ১৯৫৬।

অস্ট্রিয়া এবং জার্মানিতে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি

মেটারনিকের অস্ট্রিয়া। গণতান্ত্রিক বিপ্লব। স্লাভ ও ম্যাগিয়ার জাতিগোষ্ঠীর আশা-ভরসা। বোহেমিয়া এবং হাঙ্গেরিতে প্রতিক্রিয়া। Windischgratz এবং জেলাসিয়ার বিজয়। শ্বার্জেনবার্গের রাষ্ট্রকৌশল। জার্মান বিপ্লব। উদারতন্ত্রবাদের বিপর্যয়। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্ট কর্তৃক অস্ট্রিয়াকে বাইরে রাখা এবং প্রজাতন্ত্রবাদ বাতিল ঘোষণার সিদ্ধান্ত। চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম। বার্লিনে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরাট বিজয়। প্রুসিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা; ওলমুৎসের যুদ্ধে অস্ট্রীয়দের বিজয়। ওটো ফন বিসমার্ক। রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রুসীয়দের দর্শন।

অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের সরকার যদিও অমনোযোগিতা এবং লঘুচিত্ততার কারণে কিছুটা নমনীয় ছিলো, তবে এটি ছিলো মন্থরগতি, গোপন, আবেগনির্ভর এবং বিভ্রান্ত। এই সরকার বিভিন্ন স্তরে আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা এতটা কঠিনভাবে আবৃত, এবং এতটা কার্যকরভাবে উন্নতি বা সংশোধনের সম্ভাবনা থেকে আড়ালে ছিলো যে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজের অনিয়ম এবং অপব্যয় বহুকাল আগে দূরীভূত করা সম্ভব হলেও এই সাম্রাজ্যে সেসব চলেছে দৌর্দন্ড প্রতাপের সঙ্গে। অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরির রাজন্যবর্গ সব রকমের সমাজবিরোধী সুবিধা ভোগ করেছে, তাদের সেনা বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিলো না, তাদের কর প্রদান করতে হতো না, তাদের অবস্থান ছিলো সাধারণ আইন আদালতের বাইরে। অথচ কৃষক কুলের জীবন ছিলো মধ্যযুগীয় কঠিন-কঠোর শৃঙ্খলার নিগড়ে আবদ্ধ। একের পর এক সম্রাট আসে আর যায়। বুদ্ধিবিবর্জিত ফ্রান্সিসের পর ক্ষমতা লাভ করেন অর্ধোন্মাদ ফার্দিনান্দ, ১৮৩৫ সালে। কৃষককুলের সমস্যার প্রশ্নটা সাম্রাজ্যের স্থানীয় সরকারগুলি আমূল পুনর্গঠনের সঙ্গে জড়িত। অথচ এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়নি। বস্তুত মেটারনিকের অধীনে অস্ট্রীয় রাষ্ট্রবিদদের কাছে সাধারণ সত্য এই ছিলো যে কোনো নড়া-চড়া নয় (Qieta non movere)। অস্ট্রিয়ার পুলিশ বাহিনী ছিলো ইউরোপের সবচেয়ে দমনমূলক এবং অনুসন্ধানী। এই বাহিনী সকল ক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরি করে এবং পশ্চিমী চিন্তা-ভাবনার অনিষ্টকর প্রভাব থেকে প্রাণোচ্ছল ভিয়েনাবাসীদের রক্ষা করতে চায়।

এ ধরনের শাসন ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে না। সেই তিরিশের দশকের শুরু থেকেই সন্দেহাত্মক এবং অবজ্ঞাপূর্ণ, উদারনৈতিক এবং গঠনমূলক, জাতিভেদপন্থি এবং যুদ্ধংদেহী মতামতের নতুন নতুন বিন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। ভিয়েনায় সরকারকে বিদ্রুপ করা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ফ্যাশনে পরিণত হয়। জাতিভেদনীতি পোল্যান্ড থেকে বেগে ধেয়ে আসে; উদারতন্ত্রবাদের স্নিগ্ধ বৃষ্টি আসে প্যারিস ও লন্ডন থেকে। প্রেসবুর্গে হাঙ্গেরীয় ডায়েট জোর দাবি জানায় যে বিতর্কে লাতিন ভাষার পরিবর্তে ম্যাগিয়ার ভাষা ব্যবহার করতে দিতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে তারা সামাজিক সংস্কারের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা উত্থাপন করে। এদিকে হাঙ্গেরিতে জাতিগত উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গেরি

রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে নন-ম্যাগিয়ার জাতিসমূহ বাস করে সেখানে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। উত্তাপ লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণের ক্রোট ও সার্ব জাতির মধ্যে, পূর্বাঞ্চলে ট্রানসিলভানিয়ার রোমান কৃষককুল বিক্ষুব্ধ, উত্তরাঞ্চলের রুথেন এবং পশ্চিমাঞ্চলের শ্লোভাকরা দরুণ উত্তেজিত। এই জাতিগোষ্ঠীগুলির ধৈর্যহীনতা এবং আশা-ভরসা নতুন স্তরে উন্নীত। বোহেমিয়ায় চেকদের মধ্যে ভাষা ও পুরাকাল ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ইতিমধ্যে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছে। এই নতুন ধরনের ধর্মযুদ্ধের প্রধান পুরোহিত হলেন লুই কোসুথ। ইনি বক্তা এবং সাংবাদিক হিসেবে অনন্যসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। তিনি প্রথমে আন্দোলন পরিচালনা করেন ম্যাগিয়ার ভাষার পক্ষে। তিনি লাতিন ভাষার পরিবর্তে ম্যাগিয়ার ভাষার ব্যবহার আগে নিশ্চিত করতে চান। অতঃপর হাঙ্গেরির মুক্তির জন্য আবেগশাসিত অভিযানে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই প্রক্রিয়ার ভেতর তিনি সাম্রাজ্যের প্রতিটি কোণে উন্মত্ত এবং সংহতি বিনষ্টিকারী জাতিবিদ্বেষের ছাই-চাপা আগুন উসকে দেন। ১৮৪৮ সালের বসন্তকালের মধ্যে এই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় বক্তা আট বছর যাবৎ তার আমূল সংস্কারপন্থি এবং জাতীয়তাবাদী মতবাদ প্রচার করেছেন। তার শ্রোতৃমণ্ডলী হলেন গর্বোদ্ধত ও বিক্ষুব্ধ স্বদেশবাসী।

এই ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং আক্রান্ত সরকারের কাছে প্যারিসের ফেব্রুয়ারি মাসের বিপ্লবের আঘাত প্রলয়ঙ্কারী বলে বোধ হয়। অধ্যাপক ও ছাত্রদের নেতৃত্বে এবং সাধারণ মানুষের সমর্থনে এক দিনের দাঙ্গায় (১৩ মার্চ, ১৮৪৮) মেটারনিকের শাসনের অবসান ঘটে, ভিয়েনা নগরী জনসাধারণের দখলে চলে যায়, এবং কিছু কালের জন্য সাম্রাজ্যিক শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে।

এরপর অস্ট্রিয়ার মতো বহুবর্ণ রাষ্ট্রের বিশেষ সমস্যাগুলি প্রকটিত হতে থাকে। স্বেচ্ছাচারতন্ত্র আত্মসমর্পণ করেছে। জনগণের জনপ্রিয় অধিকারগুলি রক্ষার জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে ভিয়েনার প্রশাসন চলে গেছে। পুরাতন মন্ত্রীরা পথ ছেড়ে দিয়েছেন। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত একটি সংসদ হাঙ্গেরি বাদে সমগ্র অস্ট্রিয়ার জন্য শাসনতন্ত্র রচনায় ব্যস্ত। সেনা বাহিনীর মূল অংশ ইতালিতে নিয়োজিত। জঞ্জাল সাফকারী উদারতন্ত্রবাদের যে তরঙ্গমালা জার্মানিতে কাজ করেছে তা অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের সবক'টি রাজধানীতে আঘাত করে। এতে শিক্ষিত লোকদের মনে শাসনতান্ত্রিক কিংবা সংসদীয় সরকার, নাগরিক অধিকার, কৃষকদের দুর্দশার প্রতিকার, এবং স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অবসানের আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ করে। এমতাবস্থায় উদারতন্ত্রী এবং শাসনতান্ত্রিক উপায়ে অস্ট্রীয় রাজ্যের আগাগোড়া রূপান্তর যোগ্য কাজ বলে বোধ হয়। কাজ করার শক্তি আশানুরূপ, সদিচ্ছা পর্যাপ্ত, লগ্নও সুপ্রসন্ন বলতে হবে।

প্রাগ, প্রেসবুর্গ, এমনকি ভিয়েনায় আগ্রহী এবং আস্থাশীল প্রত্যাশা জাগে যে সাম্রাজ্যিক শক্তির অবর্তমানে বিরাট প্রশংসনীয় সংস্কারকর্ম সম্পাদন করা যাবে ; উক্ত প্রত্যাশা একেবারে ভ্রমাত্মকও ছিলো না। ১৮৪৮ সালের রাষ্ট্রবিদদের সুখ্যাতি করে বলতে হয় যে তারা অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরির আইনসভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, তারা পল্লীর সমস্যার মোকাবেলা করে সাহসিকতার সঙ্গে, কৃষকদের দাসত্বের তারা অবসান ঘটান, একই সঙ্গে অভিজাতবর্গ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেকার আইনি প্রভেদ মোচান। শুধু তাই নয়, মারিয়া

ধ্বংসের সময় থেকে পল্লীর লোকদের অবস্থার উন্নতির জন্য যা কিছু করা হয়েছে তারা এক মাস সময়ের মধ্যে তার চেয়ে বেশি করেন।

কিন্তু শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির সুস্পষ্ট সম্ভাবনার মধ্যে একটি ভয়ানক ছায়া অতিদ্রুত দীর্ঘতর হয়। অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুক্তি এই ছিলো যে, ব্যক্তি ও শ্রেণীর ক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত হতো জাতিগত বিবাদ। অতএব, অস্ট্রিয়ায় শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি জাতি নতুন অস্ট্রীয় রাজ্যের পরিকল্পনায় নিজেদের নিরাপদ অবস্থানের দাবি উত্থাপন করে। এই ঘটনাগুলি প্রতিরোধ কিংবা প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাজদরবারের ছিলো না। সেনাবাহিনী এবং বৈদেশিক দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ হাঙ্গেরিকে বরাদ্দ করা হয়। বোহেমীয়দের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয় যে তারা স্বাধীন আইনসভা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানাদির নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে।

সঙ্গে সঙ্গে সুদূরপ্রসারী গুরুত্বের এক গুচ্ছ নতুন সমস্যা উঁকি দেয়। অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যে অনেক জার্মান বাস করতেন। সাম্রাজ্যের মন্ত্রীদের গুপ্তসভার হাত থেকে সকল ক্ষমতা বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলির ভোটে নির্বাচিত সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি সংসদের হাতে চলে যাবে, এতে তাদের আপত্তি করার কিছু নেই। তবে রাজ্যের কর্মপন্থা নির্দেশনায় জার্মানদের প্রাধান্য অবশ্যই থাকতে হবে। আবার অনেকে সমান দৃঢ়তার সঙ্গে হাঙ্গেরির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের বিষয় চিন্তা করেন, অথবা এমনকি একটি শাসনতন্ত্র চান যার অধীনে স্লাভরা তাদের সংখ্যাগত প্রাধান্য অনুসারে কর্তৃত্ব খাটাতে পারবে। বোহেমীয়দের শাসনতান্ত্রিক দাবি ঠিক আছে। কিন্তু সকল স্লাভজাতিগোষ্ঠীগুলির ইউনিয়ন গঠনের সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনার জন্য জুন মাসের ২ তারিখে প্রাগে যে নিখিল স্লাভ সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে তাতে জার্মানরা স্বীয় স্বার্থের অনুকূলে কি আশা করতে পারে? এ ধরনের ইউনিয়ন, যদি সত্যিই বাস্তবে গঠন করা যায়, তাহলে সাম্রাজ্যের বিগঠন অবিলম্বে কার্যকরী হবে। সেই সপ্তদশ শতক থেকে বোহেমিয়ার চেকদের অধীনতা হলো অস্ট্রীয় কর্মপন্থার মূল স্তম্ভ, অভ্যন্তরীণ শান্তির আবশ্যিক শর্তও বটে। এই কৃষক প্রধান জাতি, তাদের বিপ্রবণ ঐতিহ্যসহ, কতিপয় কবি, ভাষাবিদ এবং রোমাঞ্চসন্ধানীর নেতৃত্বে, শুধু হোম রুল উপভোগ নয়, সমগ্র সাম্রাজ্যের স্লাভ প্রভাব ও প্রচারণার অধিষ্ঠানে পরিণত হবে, এটা জার্মান অস্ট্রীয়দের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। যে করে হোক, এটা তারা ঠেকাবে। এদিকে তাদের পুরাতন সাম্রাজ্যিক গর্ব একেবারে মুছে যায় নি। হাঙ্গেরীয় হোম রুলের বাস্তবিক অবস্থান একটু ভিন্ন। কারণ তারা জাতি হিসেবে সব সময়ই শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো, অধীন জাতি কিংবা প্রজা হিসেবে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু হাঙ্গেরীয়দের স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী পুষতে দেয়া হবে, তারা চালু করতে পারবে কাগজী মুদ্রা, তাদের স্বাধীন বৈদেশিক নীতি থাকবে একে সঠিকভাবে সাম্রাজ্যের ঐক্যের জন্য মারাত্মক আঘাত হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এতে সাম্রাজ্যের শক্তি পরিষ্কার হ্রাস পাবে। গোড়াতেই এই কর্মপন্থাগুলি বিবেচনায় আসে বলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়।

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিক্রিয়া খোলস থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসে। ১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্রিন্স ভিনডিসগ্রাৎসে তার বন্দুকগুলি প্রাগনগরীর দিকে তাক করেন। চেকদের স্বাধীনতা দীর্ঘ সত্তর বছরের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। বোহেমীয়দের বিদ্রোহ হয় ধূলিস্যাৎ। এই বিজয় থেকে সাহস সঞ্চার করে। এদিকে নেপলস ও রোম থেকেও সুখবর আসছে।

কার্স্টোজার রণক্ষেত্রের খবরও উৎসাহব্যঞ্জক। এবার বাজদরবার হাঙ্গেরীয়দের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য তৈরি। স্পষ্টতই হাঙ্গেরীয় সমস্যা অধিকতর গুরুতর। এই উদ্যোগ গ্রহণে স্বাভাবিক কিছু অসুবিধা ছিলো। অসুবিধাগুলি জটিলতর হয় ভিয়েনার প্রতিক্রিয়াশীল পরিস্থিতির দরুন। তবে ইম্পিরিয়াল সরকারের একটি স্বাভাবিক সুবিধার দিক ছিলো। মাগিয়ারদের ছিলো স্লাভ ও রুমানীয়দের মধ্যে অত্যন্ত অজনপ্রিয়। ক্রোয়েসিয়ায় তাদের অবস্থা ছিলো সবিশেষ খারাপ। হাঙ্গেরীয় রাজ্যের এই অঞ্চলে স্লাভরা ছিলো সর্বাধিক সুসংহত, তাদের সভ্যতাও ছিলো অধিকতর অগ্রসর, জাতি হিসেবেও অত্যন্ত যুদ্ধানুরাগী। ক্রোট এবং ম্যাগিয়ার জাতির মধ্যে কোনো কালে সদ্ভাব ছিলো না। অগ্রামের ডায়েট বা ক্রোয়েসীয় পার্লামেন্টে ম্যাগিয়ারদের ভাষা জোর করে চালু করার চেষ্টা হলে প্রায়ই সহিংস প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ক্রোটদের ম্যাগিয়ারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা, প্রধান জাতির কাছ থেকে প্রাপ্ত আঘাতের ঋণ সুদসহ পরিশোধের জন্য স্লাভ ও রুমানীয় অধিবাসীদের আহ্বান করা অবশ্যই ঘৃণ্য পলিসি ছিলো। কিন্তু এই কর্মপন্থা গ্রহণ করতে অস্ট্রীয় সরকার বাধ্য হন, আর এই কর্মপন্থার জোরেই অস্ট্রীয় সরকার অনেক কাল টিকে থাকে। ক্রোয়েসীয়দের ম্যাগিয়ার বিরোধী মনোভাবের প্রতিমূর্তি ছিলেন জোসেফ জেলাসিক। ইনি ছিলেন অস্ট্রীয় বাহিনীর কর্নেল পদমর্যাদাসম্পন্ন অফিসার। এর একমাত্র লক্ষ ছিলো ম্যাগিয়ারদের যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা, তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে সমূলে ধ্বংস করা এবং সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা। ইম্পিরিয়াল সরকারের এই জনপ্রিয় ক্রোট সৈনিকের মূল্য বোঝার মতো অনুভূতি ছিলো। সরকার সঠিক বুঝতে পারেন এই ব্যক্তি মুখ খুললেই ইতালিতে নিয়োজিত ক্রোট বাহিনীর আনুগত্য নিশ্চিত হবে, শুধু এই ব্যক্তির কথাতেই ক্রোটরা হাঙ্গেরীয় শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে যাবে। এতটুক অনায়াসে বিশ্বাস করা চলে। ম্যাগিয়ার নেতৃবৃন্দের দৃঢ় প্রতিবাদ সত্ত্বেও জেলাসিককে ব্যান অব ক্রোয়েসিয়া হিসেবে নিযুক্তি প্রদান করা হয়। তিনি চল্লিশ হাজার সিপাইর অগ্রভাগে থেকে পেস্থ্ অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। এখন যুদ্ধ ঠেকানো সম্ভব নয়।

এদিকে যুদ্ধের উন্মাদনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোসুথ তার গণতান্ত্রিক অনুসারীদের নিয়ে হাঙ্গেরি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কেড়ে নেন। এই ঘটনায় ভিয়েনার উদারনীতিকরা সহানুভূতির প্রবল কম্পন অনুভব করে। উদারনীতিকরা দেখতে পান যে হাঙ্গেরি আমূল সংস্কারপন্থিদের কব্জায় নিরাপদে আছে। ফলে তারা ভাবতে শুরু করেন যে যদি এই দুই গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে মৈত্রী গড়ে তোলা যায় তাহলে স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার শেষ সুযোগ পাওয়া গেছে বলে মনে করা যাবে। কিন্তু অস্ট্রীয় বাহিনী বিরুদ্ধ পক্ষের চেয়ে অনেক গুণ শক্তিশালী। ভিনডিসগ্রাৎসে অনায়াসে ভিয়েনার বিদ্রোহীদের পরাস্ত করেন, সভেখাটের সমতল ভূমিতে হাঙ্গেরিয় বাহিনী জেলাসিকের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। হাঙ্গেরির বাহিনী এগিয়ে আসছিলো ভিয়েনার বিদ্রোহীদের সহায়তা করার জন্য।

দুটি বিজয়ের ফলে পাল্টা প্রতিক্রিয়ার প্রবল জোয়ার শুরু হয়। ভিয়েনায় গণতন্ত্রের অবসান ঘটে, শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া রুদ্ধ হয়; উপরন্তু ফ্রাংকফুর্টের প্রতিনিধি রবার্ট ব্লুমকে বধ করায় জার্মানদের কঠিন উপলব্ধি হয় যে অস্ট্রিয়া পেছন ফিরে তাকাতে শুরু করেছে। সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যের ভাঙন ঠেকায়, আর সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসেন একজন প্রাতঃস্মরণীয় রাষ্ট্রবিদ। এর দুঃসাহসী উদ্যোগের ফলে সাম্রাজ্য বিগঠন থেকে রক্ষা

পায়, কাউন্ট ফেলিক্স সোয়ারজেনবার্গ দৃশ্যপটে হাজির হন ১৮৪৯ সালে, তিনি লোকান্তরে যাত্রা করেন ১৮৫২ সালে। শুধু মাত্র এই তিন বছরে এই গর্বিত এবং আভিজাত্যকামী সৈনিক অধোন্মাদ ফার্দিনান্দের পদত্যাগ আদায় করেন, ফার্দিনান্দের তরুণ ও তেজোদীপ্ত ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রান্সিস জোসেফকে সিংহাসনে আরোহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়, রুশ বাহিনীর সহায়তায় হাঙ্গেরিয়দের বিদ্রোহ দমন করেন, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেন, প্রুসীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ১৮১৫ সালের সন্ধি অনুসারে জার্মান ফেডারেশনে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের পুরাতন প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

হাঙ্গেরীয়দের ট্র্যাজেডি বা মর্মান্তিক দুর্দশায় পশ্চিম ইউরোপের ভাবাবেগ গভীরভাবে আন্দোলিত হয়; কারণ হাঙ্গেরীয়রা অধীনস্ত জাতিগোষ্ঠগুলির প্রতি নির্যাতনমূলক আচরণ করে থাকলেও, তাদের ঐতিহ্যবাহী উন্মুক্ত আলোচনার রীতি এবং তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠনের লক্ষ্যে দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য তারা প্রগতি ও মুক্তি অন্বেষীদের সগোত্র হিসেবে গণ্য। জর্জি এবং বেমের দুঃসাহসিক সমরাভিযান এবং কোসুথের উৎসাহব্যঞ্জক আমূল সংস্কারবাদ (এর নির্দেশনায় হাঙ্গেরীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো) যেমন ভক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি ভিলাগোসের আত্মসমর্পণের খবর এবং পরাজিত সৈনিকদের কাছ থেকে যে ভয়ানক জরিমানা আদায় করা হয় তা নিদারুণ ক্রোধ এবং আতংকের সঙ্গে দেখা হয়। বিজয়-উত্তরকালে অস্ট্রীয় সরকার যে বাড়াবাড়ি করে তাতে ভবিষ্যৎ বিবাদের বীজ বপন করা হয়ে যায়। এদিকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যে ইংল্যান্ডের জনমত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যায় তার কারণ ঐ দেশটি হাঙ্গেরীয়দের স্বাধীনতা মুছে ফেলার জন্য অনুষ্ঠিত জঘন্য অপরাধে সহায়তা করে। ইতালীয় এবং জার্মান জনগণের পায়ে পুরাতন অস্ট্রীয় বেড়ি পড়িয়ে দেয়ার জন্যও ইংরেজরা ক্ষুব্ধ হয়।

জার্মানিতে জাতিগত সমস্যা কিংবা বৈদেশিক স্বৈরশাসন বিতাড়নের সমস্যা ছিলো না। কিন্তু অস্ট্রিয়া এবং ইতালির মতো বৈপ্লবিক ভাবাবেগ ছিলো প্রচণ্ড। এই বৈপ্লবিক ভাবাবেগ এক কেন্দ্রিক এবং লিবার‍্যাল আকার ধারণ করে। যদিও অনেক প্রজাতন্ত্রী ছিলেন, বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে, তবে এই হঠকারী এবং যুদ্ধংদেহী প্রজাতন্ত্রীরা সংখ্যায় ছিলেন নগণ্য। ১৮৪৮ সালের গোড়ার দিকে অধিকাংশ জার্মান ছিলেন সংস্কারপন্থি, অধিকাংশ সংস্কারপন্থি ছিলেন উদারনৈতিক এবং অধিকাংশ উদারনীতিক ছিলেন জার্মানির ঐক্যে বিশ্বাসী। জার্মান প্রিন্সরা শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কর্মে অসমর্থ কিংবা অনিচ্ছুক, এই অবিশ্বাস থেকে এবং ডায়েট সম্পর্কে হতাশ হয়ে, তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, জার্মানিকে উদারনৈতিক পথে একত্রিত করা যায় একমাত্র স্বাধীনভাবে নির্বাচিত গোটা জার্মান জাতির পার্লামেন্টের মাধ্যমে। এই পার্লামেন্টকে হতে হবে ভিয়েনা সম্মেলন আরোপিত ভারবাহী এবং অকার্যকর প্রতিনিধিদের পরিষদ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। লুই ফিলিপ উৎখাত হওয়াতে উৎসাহিত হয়ে এবং প্রিন্সরা কোনো প্রকার সাহায্য করবে না, এই নিশ্চয়তা লাভ করে, জার্মান উদারনীতিবাদের নেতৃবৃন্দ ফ্রাংকফুর্টে একটি প্রাথমিক সংসদের সভা আহ্বান করেন। লক্ষ্য হলো, জাতীয় পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচনের প্রস্তুতি। তারা আশা করেন, নির্বাচিত এই জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে আলাপ আলোচনার প্রক্রিয়ার ভেতর নতুন জার্মানির আত্মপ্রকাশ ঘটবে। পরিষদের প্রথম সভা বসে ১৮৪৮ সালের ১৮ মে। সভায় উপস্থিত দেখা যায় জার্মানির শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ কয়েকজন ব্যক্তিকে। এই পরিষদ ছিলো দেশপ্রেমিক,

উচ্চাভিলাষী, কঠোর পরিশ্রমী (বৈদেশিক শক্তির আঘাতে অবিলম্বে ক্ষুব্ধ হয়), জার্মানির ক্ষমতা সম্প্রসারণকামী এবং জার্মান নৌবাহিনী গঠনে প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের জন্য খুবই উল্লেখযোগ্য। বিস্তারিত এবং গুরুতর আলাপ-আলোচনার পর পরিষদ ঐক্যবদ্ধ জার্মানির জন্য একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে। এই শাসনতন্ত্রের সবচেয়ে মূল্যবান বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ব্যক্তির স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য অনেকগুলি বিবেকবান এবং যুক্তিশীল ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু পরিষদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম ট্র্যাজেডি এই যে, প্রবল জাতীয় উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ারের ভেতর এই পরিষদ যাত্রা শুরু করলেও স্ব-নির্বাচিত দায়িত্ব পালনে সমর্থ হয়নি, শুধু তাই নয়, জার্মানি এক সময় ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তা সংসদীয় যুক্তি-তর্কের দেয়া-নেয়ার পথে অর্জিত হয়নি, অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক যুদ্ধের মাধ্যমে এটি অর্জন করতে হয়।

এবার জার্মান উদারতন্ত্রবাদের বিপর্যয়ের কারণগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হবে। এই পরিষদে সরকারি এবং পেশাজীবী শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করলেও অভিজাত শ্রেণী, শ্রমজীবী শ্রেণী, শিল্পপতি শ্রেণী এবং মহাজন পুঁজিপতি শ্রেণী থেকে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি পরিষদে অংশগ্রহণ করেনি। তাছাড়া দলীয় ঐতিহ্য এবং শৃঙ্খলা না থাকায়, সংসদ তাৎক্ষণিকভাবে দুটি অত্যন্ত জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সমস্যাগুলি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান খোঁজা যায়নি। নতুন জার্মানির আকৃতি কি হবে? সমগ্র অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য কি এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে, নাকি শুধু জার্মান অংশ অন্তর্ভুক্ত হবে, কিংবা জার্মান অস্ট্রিয়াকে নতুন জার্মান রাষ্ট্র কাঠামোর বাইরে রাখা হবে? প্রথম প্রশ্নের তাৎক্ষণিকভাবে নেতিবাচক জবাব পাওয়া যায়। এই যে জার্মান বিধায়কগণ তাদের পরিবারে চেক, ম্যাগিয়ার এবং রুমানীয়দের গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন তাতে নিতান্ত কম আত্মত্যাগ স্বীকার করা হলো না। এই জাতিগোষ্ঠীগুলি ছিলেন অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের প্রজা। কিন্তু জার্মান অস্ট্রিয়াকে নতুন জার্মান রাষ্ট্র কাঠামোর বাইরে রাখার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সহিংস এবং গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করা হয়। যুক্তি দেখিয়ে বলা হয় যে, আট মিলিয়ন জার্মান ভাষী এবং জার্মান জাতিভুক্ত নর-নারীকে কিভাবে জার্মান রাইখ থেকে বাদ দেয়া যায়? আদর্শবাদীরা নিখিল জার্মান রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে, রোমান ক্যাথলিকরা তাদের অবস্থান আরো মজবুত করতে চায়, ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির সরকার কুখ্যাত প্রুসীয়দের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে ঢাল মনে করে। এরা সবাই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই সমস্যাকে এতটা ভয়ানক গণ্য করা হয় যে পার্লামেন্ট ভবিষ্যৎ জার্মান রাষ্ট্রকাঠামো বিষয়ে কোনো আলোচনাই করেনি। দরকার ছিলো অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কার্য সম্পাদন, অথচ ফ্রাংকফুর্টের বিধায়করা ইচ্ছে করে ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করে। দ্বিতীয় আর একটি সমস্যা ছিলো, এবং এই সমস্যাটিও কম জটিল ছিলো না। জার্মানী ছিলো বেশ কয়েকটি রাজ্যের ফেডারেশন। প্রত্যেকটি রাজ্য নিজস্ব অধিকার এবং সুবিধাদি ব্যাপারে অত্যন্ত অনুভূতিশীল। একটি নতুন, এবং হয়তো কঠোরতর, জার্মান ইউনিয়ন গঠন করা যায় যদি সদস্য রাজ্যগুলি তাদের সার্বভৌমত্ব কিছুটা কাটছাট করতে রাজি থাকে। কিন্তু এ ধরনের প্রয়োজনীয় আত্মোৎসর্গের মনোভাব কি দেখা দেবে? ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি আত্মোৎসর্গে সম্মত হলেও রাজতন্ত্রগুলি কি অনুকূল মনোভাব দেখাবে? ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্ট পরিষ্কার দেখতে পায় যে, জার্মান ইউনিয়নের আটত্রিশটি সরকারের সঙ্গে আলাদা ভাবে মতবিনিময় করে কোনো কাজ হবে না। বিলম্ব হবে সীমাহীন, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা হবে

মূলধারা। এতদ্ব্যতীত, তাদের অবস্থানের মৌলিক সত্য এই যে, যথা নিয়মে নির্বাচিত প্রশাসন জনমতের প্রতিনিধি হিসেবে, তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হলো গোটা রাজ্যের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। যাহোক, যদি বিভিন্ন রাজ্যের সরকারগুলি সমান তালে চলতে রাজি না হয়? বাস্তবিকই, এটি একটি অনিশ্চিত ব্যাপার। বিজ্ঞতার সঙ্গে অবশ্য মাত্র চারটি রাজ্যের সার্বভৌম পার্লামেন্টে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে অস্ট্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না, এবং জার্মান একটি সাম্রাজ্য হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সাব্যস্ত হয় যে তাদের কাজ টিকিয়ে রাখার জন্য জার্মানির সবচেয়ে শক্তিশালী তরবারির নাম তালিকাভুক্ত করা হবে; সে অনুসারে প্রুসিয়ার রাজাকে সমগ্র জার্মান রাষ্ট্রের সম্রাট হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

প্রুসিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম ছিলেন অহংকারী, নানা বিষয়ে আগ্রহী, রোমান্টিক বা ভাবাবাদী নেতা। তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা খুব গভীর ছিলো না, এ ব্যাপারে তার কোনো স্থিরতাও ছিলো না। এই রাজা অল্প বয়সে কিছুটা উদারবাদী নীতির প্রতি অনুরাগী ছিলেন বটে, তবে পরবর্তীকালে রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতার নীতি দ্বারা আচ্ছন্ন হন। তিনি বাগী প্রধান বক্তৃতায় বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। এই অভ্যাস একজন আত্মপ্রচারক, আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির ক্ষতি করতে বাধ্য। ফ্রেডারিক উইলিয়াম সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৮৪০ সালে, তিনি কিছুকাল উদারনৈতিক চিন্তাধারা এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বিষয়ে খেলাচ্ছলে ভাবেন। তিনি একাধিক পরিকল্পনা প্রস্তাবিত করেন, কিন্তু দীর্ঘ সাত বছরে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কিছুই করেন নি। অতঃপর জনমতের চাপে বার্লিনে পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন। প্রবল উত্তেজনার ভেতর অধিবেশন চলে। সংসদ আইন তৈরি, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণ নাকচের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এ ধরনের নতুন অভিভাব ফ্রেডারিক উইলিয়ামের একেবারে পছন্দ নয়। ডায়েট ভেঙে দেয়া হয়, সংসদীয় শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন, অবশেষে, ১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে, প্রুসীয় রাজাকে প্রকৃত বৈপ্লবিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।

কথিত মাসে, রাজা কর্তৃক সংস্কার কর্মে সম্মতি প্রদান বিলম্ব করায়, সর্বত্র অরাজক অবস্থা বিরাজ করে, বার্লিনের সড়কগুলিতে হিংস্র দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়, মৃতের সংখ্যা কম দাঁড়ায় না। টেউয়ের তালে চলার পক্ষপাতী রাজা বিবাদের অবসান ঘটান, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করেন, পার্লামেন্ট গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন; সর্বত্র যখন শান্ত অবস্থা বিরাজ করছে (২১ মার্চ) তখন রাজা মহাড়ম্বরে পুরাতন জার্মানির ত্রিবর্ণ প্রতীক পরিধান করে রাজধানীতে প্রবেশ করেন এবং ঘোষণা দেন যে এখন থেকে প্রুসিয়া বৃহত্তর জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হলো। ফ্রাংকফুর্টের সাধু পলের গির্জায় জার্মানির ঐক্যের জন্য যে মহান উদারবাদী আন্দোলন এগিয়ে চলছিলো তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে হলে বাগাড়ম্বরের অধিক কিছুর দরকার করে। রাজা এখনো আন্তরিক স্বেচ্ছাচারতন্ত্রী; তাঁর বাহিনী এখনো প্রুসিয়ার রাজমুকুটের প্রতি ভক্তি ব্যাপারে অটল; অভিজাতবর্গ এখনো বিশ্বাস করেন না যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রুসিয়ার কোনো উপকারে লাগতে পারে। অপরদিকে ফ্রেডারিক উইলিয়াম এবং জার্মান উদারবাদের মধ্যে বিরোধ তিক্ততা ও অবিশ্বাসের নিয়মিত উৎস, যার জন্য বার্লিন পথরোধে অনেক রক্ত ঝরেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রুসিয়ার রাজধানীর অপরিপক্ব গণতন্ত্রে এমন কিছু ছিলো না যা দুপক্ষের ব্যবধান সংক্ষেপ করতে পারে। পটসডামের বিশ্রাম নিবাস থেকে

রাজা রাস্তাঘাটে বিরামহীন অরাজকতা অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছেন; মাথা গরম, অনভিজ্ঞ পার্লামেন্টের ভাবোচ্ছ্বাসী অবিজ্ঞতার জন্যও তিনি কম ক্ষুব্ধ নন। অবশেষে, ভিয়েনার বিদ্রোহ দমনের দৃষ্টান্ত থেকে তিনি সাহস সঞ্চার করতে সক্ষম হন এবার তিনি আঘাত করার জন্য প্রস্তুত। ১৮৪৮ সালের ২ নভেম্বর তিনি কিছু পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের বরখাস্ত করেন। সিভিক রক্ষীবাহিনী ভেঙে দেন, সংসদ করেন ছত্রভঙ্গ। আর এসব তিনি করেন একটিও গুলি খরচ না করে, এর জন্য কাউকে প্রাণ দিতে হয়নি। শুধু সেনাবাহিনী তার পেছনে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছে, এবং ইউরোপের সবচেয়ে দুর্বলচিত্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এসব মেনে নিয়েছে। এই অসামান্য কৃতিত্ব অর্জনের পর যখন হাবে এক ব'ধ তিনি নিরঙ্কুশ প্রভুতে পরিণত হন, তখন ফ্রেডারিক উইলিয়াম ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের তরফ থেকে জার্মান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ লাভ করেন।

এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়নি। যে রাজমুকুট প্রিন্স সভা প্রস্তাবিত করেনি, যে শাসনতন্ত্র জার্মানির সরকারগুলি অনুমোদন করেনি, তা রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়াম গ্রহণ করতে পারেন না। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের প্রস্তাবগুলিতে তিনি গণতন্ত্রের নাশকতামূলক নীতির আভাস লক্ষ করেন। উপরন্তু এর ফলে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা, রাশিয়ার সঙ্গেও যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে, জার্মান রাইখের অভ্যন্তরেও গুরুতর টানাপোড়েন সৃষ্টির ঝুঁকি থেকে যাবে। যে পরিষদকে তিনি অবজ্ঞা এবং অবিশ্বাস করেন, এবং যে পরিষদ সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং গোপনে ভোটদানের অনুকূলে আইন করেছে, তার নিমন্ত্রণে জার্মানির সম্রাট খেতাব ধারণ করার চেয়ে বরং অনুগত প্রুসীয়দের অবিসম্বাদী প্রভু থাকতে পছন্দ করেন, তিনি আরো চান ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্ট যা কিছু করেছে তা নস্যাৎ করতে। অথচ বহু সম্ভ্রান্ত এবং দেশপ্রেমিক জার্মানবাসী উদারনৈতিক এবং ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সম্ভাবনায় প্রবল উদ্দীপনা বোধ করেছেন। কিন্তু তিনি এ ধরনের জার্মানীর নীল নকশায় আকস্মিক অবসান ঘটাতেও ইচ্ছুক। ভাগ্যের চাকার ঘূর্ণন এখন সম্পূর্ণ। প্রুসীয় বাহিনী স্যাক্সনি, বাডেন, হ্যানোভার প্রভৃতি প্রদেশ থেকে বিপ্লবের চিহ্ন মুছে দিয়ে জার্মান প্রিন্সদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই প্রিন্সরা সিংহাসন হাত-ছাড়া হওয়ার ভয়ে কাঁপছিলেন।

বিপ্লবের ঝড়-ঝঞ্ঝা কেটে যাবার পরই প্রুসীয় রাজা দেখতে পান যে হৃতবল ফিরে পাওয়া অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্বব্যঞ্জক শোয়ারজেনবের্গ কঠিন মূর্তি ধারণ করে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দুটি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ কর্মপন্থার মধ্যে সূচিত হয় স্মরণীয় সংঘর্ষ। এতে অস্ট্রিয়াকে প্রচণ্ড কূটনৈতিক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাইখের বহির্ভূত শক্তি হিসেবে গণ্য করে, পুরাতন জার্মান ডায়েট পটল তুলেছে এবং এর সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকে গেছে ধরে নিয়ে এবং এখন জার্মান সরকারগুলির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমাবেশের মাধ্যমে প্রুসিয়ার নেতৃত্বে একটা ইউনিয়ন গঠনের পথ তার সামনে খুলে গেছে মনে করে, ফ্রেডারিক উইলিয়াম ইরফুর্টে ফেডারেল পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, ফেডারেল শাসনতন্ত্রের সম্ভাব্য কাঠামো সম্পর্কে তার অভিমতের ব্যাখ্যা দেন। ইরফুর্টে তার আহ্বানে বৃহৎ রাজ্যের একটিও অংশ গ্রহণ না করলেও খুদে জার্মান রাষ্ট্রগুলির অন্তত আটাশটি পিতৃসম প্রুসীয় নেতৃত্বের অধীনে যোগদান করে। সকল কর্মপন্থার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন শোয়ারজেনবের্গ। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও অস্ট্রিয়ার জার্মান রাইখের বাইরে থাকার বিষয় ভেবে দেখতে রাজী নন। তার জোর দাবি হলো অস্ট্রিয়ার পৌরহিত্যে ডায়েটের (সংসদের) পুনরুজ্জীবন ঘটাতে

হবে। প্রুসিয়ার অস্বীকার করতে হবে নতুন ফ্রেঞ্চ সভা গঠনের পরিকল্পনা। প্রয়োজনে তরবারির উদার বারহারের জন্য তিনি প্রস্তুত। হেস-ক্যাসেলে এক সময় প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধার উপক্রম হয়। অবশ্য সে যাত্রা সংঘর্ষ এড়ানো কোনো মতে সম্ভব হয়েছিলো। এই হেস-ক্যাসেলে একবার অস্ট্রিয়া ডায়েটের এজেন্ট হিসেবে জনৈক স্বৈরতন্ত্রী ফ্রেঞ্চের পক্ষাবলম্বন করেছিলো। এখানেই একবার প্রুসিয়া তার নির্যাতিত প্রজাবৃন্দের পেছনে দাঁড়িয়েছিলো। যাহোক, যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়। কারণ প্রুসীয় বাহিনী এই চ্যালেঞ্জের সমকক্ষ ছিলো না। ওলমুৎসে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের বিনিময়ে প্রুসিয়া শান্তি ক্রয় করে (২৯ নবেম্বর, ১৮৫০)।

এই সব কারবারের দর্শকদের মধ্যে একজন ছিলেন জনৈক তরুণ পমেরানিয়ান স্কোয়ার, বার্লিন পার্লামেন্টের সদস্য। এই সংকটকালে তিনি যে সাহসিকতা, বাগ্মিতা এবং আত্মবিশ্বাসের স্বাক্ষর রাখেন তাতে তিনি এতটা কর্তৃত্বের অধিকারী হন যে অনেক সময় রাজার জাঁকালো মন্ত্রীদের ছাড়িয়ে যান। এই তরুণ বীরের নাম ওটো ফন বিসমার্ক। তার ললাটে লিখিত ছিলো যে তিনি ভবিষ্যতে প্রুসিয়ার ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে গণ্য হবেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী, অনলবর্ষী বক্তা, লঘুচিত্ত সঙ্গী, মেধাবী ভাষাতত্ত্ববিদ, এবং কূটনৈতিক আচরণের প্রতিটি সূক্ষ্ম রীতিনীতি তার তালুবন্দী। একজন ঝানু রাজনীতিবিদের সকল গুণের সমাবেশ তার মধ্যে ঘটেছিলো, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা। উচ্চমার্গীয় রাষ্ট্রপরিচালনায় এসব গুণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। বিসমার্কও জার্মানির ঐক্যের অভিলাষী ছিলেন। তবে তা প্রুসীয় রাজতন্ত্রের মূল্যে অর্জন করা চলবে না। প্রুসীয় বাহিনী, প্রুসীয় ঐতিহ্যও এই কারণে বিকিয়ে দেয়া যাবে না। "আমরা সবাই চাই", তিনি বলেন, "প্রুসিয়ার ঈগল অভিভাবক এবং শাসক হিসেবে তার পক্ষ বিস্তার করবে মিউনিক থেকে ডনার্সবের্গ পর্যন্ত, তবে এই ঈগল সর্বদাই স্বাধীন থাকবে, নতুন কোনো রেগেনবার্গ দ্বারা তাঁকে বাঁধা যাবে না। আমরা প্রুসীয়, এবং আমরা চিরকাল প্রুসীয় থাকবো।" কঠিন-ভিত্ ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রক্ষণশীল নীতি থেকে এই প্রুসীয় বীর শিক্ষাগ্রহণ করেন যে তার দেশের ভবিষ্যৎ রূপ নির্ধারণ করা হবে ইংরেজদের প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির অনুকরণকারী, উদারনৈতিক রাজনীতিবিদদের বক্তৃতার মাধ্যমে নয়, এই কাজটি করতে হবে শিবিরের কঠোর শৃঙ্খলার মাধ্যমে। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের ব্যর্থতা, স্বয়ং তার রাজার পরিকল্পনা ইরাকফুর্টে বাস্তবায়নে হতাশা সঞ্চয়, তার মধ্যে আদিম আনন্দ সঞ্চার করে। প্রুসীয় রাজার মাথার উপরে কোনো পার্লামেন্ট বসিয়ে দেয়া হবে, এটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না। প্রুসীয় সৈনিক ও বন্দুকও পার্লামেন্টের আয়ত্তের বাইরে থাকবে। প্রধান মন্ত্রী র‍্যাডোভিৎসের বিরোধিতা করে তিনি অস্ট্রীয় শান্তির পক্ষে ওকালতি করেন। তার বিবেচনায়, এই শান্তি যতোই অগৌরবের হোক না কেন, এতে জার্মান রাষ্ট্রসংঘের খাঁচায় প্রুসীয় ঈগলের অকালে পালক ঝরার সম্ভাবনা নিরাকরণ করা হবে। এই যে খাঁচাবন্দী হবার সম্ভাবনা থেকে মুক্তি, একে তিনি বিরাট অভিনন্দনযোগ্য ব্যাপার বলে মনে করেন।

মেটারনিকের বিদায় এবং বিসমার্কের অভ্যুদয়ের ফলে অস্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়ার মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্রুততার সঙ্গে এবং প্রতিটি স্তরে হিসাব কষে সহিংসে উত্তেজনার চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। এই দুটি রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা সেই ১৭৪০ সালে, যখন দ্বিতীয় ফ্রেডারিক মারিয়া থেরেসার কাছ থেকে সাইলেসিয়া কেড়ে নেন। স্যাডোয়ার রণাঙ্গনে অস্ট্রীয়

বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে প্রুসীয় বাহিনীর কাছে। সেটা পুরাতন বিশ্বের পরাজয় নতুন বিশ্বের কাছে। এক প্রচণ্ড মোচড়ে জার্মান রাইখ প্রাচীন অস্ট্রীয় দায় থেকে মুক্তি অর্জন করে অথচ নেপোলিয়নের শক্তিশালী হাতুড়িও এই শক্তিকে চূর্ণ করতে পারেনি। ভিয়েনার বিপ্লবের চেয়ে অধিকতর কার্যকারিতার সঙ্গে এবং চূড়ান্তভাবে জার্মানির দৃশ্যপট থেকে প্রুসীয় সিভিল বন্দুক মেটারনিকের ভূত বিদায় করে।

মেটারনিকের তত্ত্ব বা মেটারনিকের ব্যবস্থা দীর্ঘ চল্লিশ বছর ইউরোপে শান্তি বজায় রাখে। ফলে তিনি একটি প্রজন্মের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা কুড়ান। সাম্প্রতিক যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট নিদারুণ দুর্দশা এই প্রজন্মের স্মৃতিতে এখনো অম্লান। মেটারনিকের মধ্যে একজন মহান রাজনীতিকের অনেকগুলি গুণের সমাবেশ ঘটেছিলো। তিনি ছিলেন মেধাবী, তার উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো ব্যাপার, মাথা একেবারে ঠাণ্ডা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুগভীর উপলব্ধির অধিকারী, দৃঢ়চিত্ত এবং দেশপ্রেমে ঋদ্ধ। স্বদেশের মুক্তিদাতা নতুন ইউরোপের প্রধান রূপকার হিসেবে তার মর্যাদা ছিলো অপরিসীম। গোটা জার্মান-ভাষী ভূখণ্ডে তার প্রতি যে আস্থা জন্মেছিলো তার সীমা নির্ণয় করা প্রায় দুষ্কর। স্বেচ্ছাচারী শাসকদের পরামর্শ সভায় তার ভূমিকা এক হিসেবে ছিলো নির্দেশকের। অতএব ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত সময় পরিধিকে যে মেটারনিকের কাল বলে অভিহিত করা হয় সেটা অন্যায্য কোনো ব্যাপার ছিলো না। তবু এই সার্থকাম অভিজাত ব্যক্তিটি, যার নৈতিকতা বলতে কিছু ছিলো না, যার আদর্শ ছিলো অত্যন্ত কঠোর, যিনি ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করেন, তিনি একটি বিরাট বুদ্ধিবৃত্তিক অযোগ্যতার ভেতর কাজ করেন। এধরনের অযোগ্যতা একজন রাষ্ট্রবিদের বিচারবুদ্ধি কলুষিত করতে সক্ষম। তিনি বিপ্লব এবং স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের মাঝখানে কোনো মধ্য পন্থা খুঁজে পাননি, এবং যেহেতু বিপ্লব হলো ঘৃণ্য, অতএব তিনি সেই শক্তিকে দমনের জন্য সচেষ্ট হন যে শক্তি সমাজে মানব জীবনের আত্মার সগোত্র, মুক্তি নামক শক্তির আধার।

অপর একটি ক্ষেত্রে মেটারনিকের মতবাদ একটা মূল্যবান এবং বর্ধনশীল চিন্তার বিরোধী ছিলো। অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের ভিত্ গড়ে উঠেছিলো জাতীয়তার দাবি অগ্রাহ্য কিংবা নাকচ করে দিয়ে। অনেকে বলেন, এই নীতির কার্যকারিতা এখানে যে, এটি একাধিক জাতিগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং আর্থিক বন্ধনে রাখতে সমর্থ হয়। এই জাতিগোষ্ঠীগুলির ভারসাম্যমূলক পারস্পরিক বিদ্বেষ কাজ করেছে তাই বন্ধন টিকিয়ে রাখতে নিশ্চিত সহায়তা প্রদান করে। এই বন্ধন বা সম্মিলন কখনো অনায়াস ছিলো না। উপরন্তু ফরাসি বিপ্লব যে জাতীয়তাবাদের নতুন জোয়ার সমগ্র ইউরোপে সৃষ্টি করে তাতে এই সম্মিলন রক্ষা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস বলেন, "আমার জাতি কীট-দষ্ট গ্রন্থের মতো; যদি এর কোনো অংশ নড়াচড়া করে তাহলে কেউ বলতে পারবেন না যে এর কতোটা অংশ হুরমুর করে ভেঙে পড়বে।" মেটারনিক একটা ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তিনি কোনো ঝুঁকি নেবেন না। যত দিন অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব তার হাতে ছিলো, ততদিন মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইতালি কিংবা হাঙ্গেরিতে নয়, নয় বোহেমিয়ায়, কিংবা অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ স্লাভ ও জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে। অভিনব কিছুর আক্রমণ ঠেকানোর জন্য সতর্কতা অবলম্বনেও কোনো খুঁত রাখা হয়নি। ক্যাথলিক পুরোহিত ছিলেন বিবেক ও মনের রূপকার; ক্যাথলিক

[illegible] রাজনৈতিক সাহিত্যের অনুপ্রবেশ ঠেকিয়েছে। ক্যাথলিক সৈনিক বেয়নেটের সাহায্যে এই রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য সবদা প্রস্তুত থেকেছে, যে রাষ্ট্র গঠিত হয় প্রিন্সদের বোঝাপড়ার মাধ্যমে। তাদের কোনো রাজনৈতিক আদর্শ ছিলো না, তারা শুধু বুঝতেন রাজসিংহাসনের প্রতি আনুগত্যের তাৎপর্য। স্বাধীন পার্লামেন্ট ছিলো না, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিলো অনুপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বাধীনভাবে চলতে বারণ। আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্র বলতেও কিছু ছিলো না। অতএব অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের জনগণের ন্যূনতম রাজনৈতিক অধিকারলাভের পথও ছিলো রুদ্ধ।

তুলনায় প্রুসিয়া ছিলো অধিকতর সংহত, প্রগতিশীল এবং সুদক্ষ। তবে শিল্পকারখানার অবস্থা ছিলো পুরাতন স্থানীয় পদ্ধতিভিত্তিক, কয়লা, পুঁজি এবং সংগঠন শক্তিতে নিতান্ত দরিদ্র। অর্থাৎ এতটা পশ্চাদপদ ছিলো যে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত দেশের সুতাকলগুলির চল্লিশ শতাংশেরও কম বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা চালিত হয়েছে। তবে শিল্পকারখানা এবং বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়। ১৮১৮ সালে মাসেন (Maassen) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জোলফেরাইন বা শুল্ক সম্মিলনের লক্ষ্য ছিলো ছড়ানো-ছিটানো প্রুসীয় অধিরাজ্যগুলিকে নামমাত্র শুল্ক দেয়ালের আওতার মধ্যে আনয়ন। এই নীতি এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, এর সঙ্গে প্রুসীয় সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নানাবিধ প্রতিবন্ধক শুল্কের আওতা থেকে মুক্ত হয়ে মাত্র তিরিশ বছরের মধ্যে জার্মানির রাজ্যগুলি শুল্ক সম্মিলনের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়। এই যে বিরাট ব্যবসায়িক সাফল্য এতে প্রুসীয় নিয়ন্ত্রণে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির জন্য নিরাপদ ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভবপর হয়।

জার্মান জনগণের নেতৃবৃন্দের অন্যান্য সাফল্যের কথা সময় এগোতে থাকলে জানা যায়। অস্ট্রিয়া ছিলো বহুজাতিক, বহুভাষিক রাষ্ট্রের সমাবেশ। অভ্যন্তরীণ নানাবিধ সমস্যাপীড়িত। বিভিন্ন জাতিকে সন্তুষ্ট করতে গেলে নানাবিধ সমস্যা মাথা উঁচু করবেই। অপরদিকে, প্রুসিয়া ছিলো প্রায় সম্পূর্ণ জার্মান ভাষাভাষী-অঞ্চল। এক দিকে অস্ট্রিয়া যেমন পূর্বাঞ্চল অভিমুখে টান বোধ করছিলো, সেক্ষেত্রে প্রুসিয়ার স্বার্থ ছিলো জার্মান রাইখের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ। আবার, মেটারনিকের অধীনে যেমন অস্ট্রিয়ার নীতি ছিলো জাতীয় এবং উদারনৈতিক ঝোঁকগুলি কঠোরতার সঙ্গে দমন করা, এবং কঠোর পুলিসী নিষ্পেষণের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র এবং নিরঙ্কুশ গির্জার ঐতিহ্যবাহী প্রাধান্য বজায় রাখা, সেখানে প্রুসিয়ার কর্মপন্থা অনুপ্রেরণা লাভ করেছে বিদ্যোৎসাহ, বাস্তবধর্মী ও প্রগতিশীল বণিকসুলভ মনোবৃত্তি থেকে। দু'টি সরকারের মধ্যে তুলনা করতে গেলে বলতে হয় যে, একটি সরকারের মৌলিক নীতি ছিলো নিষ্প্রশ্ন আনুগত্য, অপরটির লক্ষ্য ছিলো তৌত সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জনগণের মননশক্তি উন্নয়নে সাহায্য করা। অতএব এই দুটি সরকারের মধ্যে ভারসাম্যের কল্পনা করা চলে না। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ঝাকখানের অপসৃত সময়কালের দীপ্তিতে সুস্পষ্ট ঘটতি ছিলো। আবার এই সময় কালটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এজন্য যে এই সময়ে প্রুসীয় রাজার অধীনে সমগ্র জার্মানির একত্রীকরণের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়।

এই সময় কালে প্রুসিয়ার অনেক মহান দার্শনিক রাষ্ট্র সম্পর্কিত একটি মতবাদ প্রকাশ করেন। মতবাদটি যেহেতু প্রুসীয় জনগণের নীতিবোধ ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় সাযুজ্যশীল ছিলো, ফলে উক্ত জনগণের মধ্যে মতবাদটি দ্রুত প্রচার লাভ করে।

পরবর্তীকালে দূর-দূরান্তেও ছড়ায় দার্শনিক ভাববাদের ব্যাপকভিত্তিক পন্থার মৌলিক উপাদান হিসেবে। হেগেল তার বুদ্ধিবৃত্তিক কর্তৃত্বের সকল শক্তি দ্বারা যে মতবাদের পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা হলো রাষ্ট্র হচ্ছে "পৃথিবীতে পরিভ্রমণরত পরম প্রভু". মানুষের অঙ্গীকারাদির চেয়ে রাষ্ট্র অনেক বড়ো, অধিকারের পেছনে শক্তির জোর থাকতে হবে, এবং শক্তিই অধিকার। যেখানে বেন্থামের মতো ইংরেজ আমূল সংস্কারবাদী মনে করেন, রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হলো সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সুখের ব্যবস্থা করা, সেখানে হেগেল ভজান যে ব্যক্তির মঙ্গল বা সুখ কোনো মূল্য বহন করে না যদি তা রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। তাহলে বলপ্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত, এবং যেহেতু রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে শক্তির জোরে, অতএব রাষ্ট্রের মঙ্গলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো যুদ্ধ, বিশ্বের যে রূপ তা স্বাভাবিক, এবং যেহেতু আত্মশক্তি বিশ্ব শাসন করে, অতএব যা কিছু জারী হয় তা মঙ্গলজনক। বিশ্বজনীন পরহিতব্রত রাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে পারে না, রাষ্ট্রের লক্ষ্য নিজের বিশেষ মঙ্গল বা উন্নতি। রাষ্ট্রের উপরে স্থান পায় একমাত্র বিশ্ব শক্তি, এই শক্তি রাষ্ট্রের বিচার করে তার সাফল্যের মাপকাঠি অনুসারে।

খুব সহজে ঠাহর করা যায়, ঐশ্বরিক রাষ্ট্র এবং রুসোর রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিন্তাধারার মধ্যে কি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে পারে। রুসো রাষ্ট্রকে স্বাধীন পছন্দ এবং সর্বসম্মত সামাজিক চুক্তি দ্বারা গঠিত বলে মনে করেন। হেগেলের ভাবনাধারা অনুসারে সৃষ্টিকর্তা নিজেকে প্রকাশিত করেছেন অভিজাতবর্গ কিংবা শাসক শ্রেণীর মাধ্যমে। এই শ্রেণীর ক্ষমতা বিনষ্ট করার একমাত্র পথ হলো জনপ্রিয় নির্বাচন।

যেখানে ফরাসি গণতন্ত্র গ্রহণ করা হয়েছে রুসোর মতবাদ থেকে, সেখানে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের মতবাদ, যা প্রুসীয়দের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে, তা হেগেলের শিক্ষায় পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করে। স্বৈরতন্ত্রের যুক্তিকে অলংকৃত করা হয় আত্মত্যাগের নৈতিক সৌন্দর্য দ্বারা। রাষ্ট্রই ভগবান। এই বিমূর্ত ভাবের নামে কোটি-কোটি লোককে কাজ করার জন্য, দুর্ভোগ স্বীকার করার জন্য, এবং গঙ্গাপ্রাপ্তির জন্য তৈরি থাকতে হবে।

এটিই ছিলো একটি জনগোষ্ঠীর স্পার্টান দর্শন। যে জনগোষ্ঠীর জন্য অদৃষ্ট জার্মানির নেতৃত্ব নির্দিষ্ট করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলি

১. মেটারনিক : স্মৃতিকথা, ১৮৮০।
২. জে মরিস : ১৮৪৮ সালের বিপ্লব, ১৮৫৭।
৩. বিসমার্ক : Thoughts and Recollections, ১৯৩৩।
৪. জে. ডব্লিউ হেডল্যাম-মরলি : চিসমার্ক, ১৮৯৯।

আইবেরিয়ান সাম্রাজ্যগুলির অবসান

স্পেন ও পর্তুগালের আমেরিকান উপনিবেশগুলিতে বিদ্রোহ। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনীয় শাসনের স্বরূপ। জেসুইট মিশনারিদের গুরুত্ব। দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংল্যান্ডের ভূমিকা। স্পেনে বুরবঁ শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। গণমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। স্থানিকতাবাদের শক্তি উপলব্ধি করতে স্পেনের উদারনৈতিক রাজনীতিবিদরা ব্যর্থ। স্পেনের ইতিহাসের প্রতিতুলনা। স্পেনের সার্বিক প্রভাব হ্রাস।

বৈপ্লবিক এবং নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি এই যে, স্পেন ও পর্তুগালের উপনিবেশগুলির সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিলো তাতে মারাত্মক চিড় ধরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন যেমন অষ্টাদশ শতকের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক ঘটনা তেমনি কাসলরে এবং ক্যানিং-এর যুগে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে দক্ষিণ ও মধ্য-আমেরিকার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে উপরন্তু বিরাট বিজয় হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু ইতিহাসের কখনো পুনরাবৃত্তি হয় না। স্পেনীয় ইন্ডিসের সটকে পড়ার উপাখ্যানের সঙ্গে যে পরিস্থিতিতে ম্যাসাচুসেটস ও ভার্জিনিয়া বিদ্রোহের ঘোষণা দেয় তার সাদৃশ্য খুঁজতে গেলে খুব বেশি কিছু নজরে পড়ে না। বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা যেখানে যে দেশের জোয়াল ছুড়ে ফেলে দেয় সে দেশ মাত্র কয়েক বছর আগে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে বিজয়ী শক্তি হিসেবে বেরিয়ে আসে, অথচ দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য প্রথম আঘাত হানা হয় এমন একটি সময়ে যখন নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহের কারণে স্পেন ও পর্তুগালের রাজনৈতিক মর্যাদা প্রায় শূন্যের কোঠায় ঠেকেছে। উত্তর আমেরিকাবাসীরা নিজেদের পক্ষে বলেন যে একটা স্বেচ্ছাচারী রাজা অন্যায্য এবং শাসনতন্ত্রবিরোধী উপায়ে কর আরোপ করেছে। ইন্ডিসের স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলার মতো কিছু ছিলো না। স্পেনের বৈধ রাজার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার ব্যাপারে তারা কিছুমাত্র আপত্তি করেনি। যে কাউন্সিল অব কাস্তিল স্পেনীয় ইন্ডিস শাসন করেছে সেটি ছিলো প্রকৃত প্রস্তাবে একটি অনধিকার হস্তক্ষেপকারী পরিষদ। মেক্সিকো এবং পেরুর ভাইস রয়ালটির আর্কাইভগুলি রাজকীয় অনুশাসনের অতিকায় স্তূপে পরিণত হয়। এসব উক্ত কাউন্সিলের খুটিনাটি ব্যাপারে মনোযোগ এবং পিতৃসুলভ উৎকণ্ঠার পরিচয় বহন করে। তবু ঔপনিবেশিকরা একটি হস্তক্ষেপকারী স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের তরফ থেকে তেমন অসহনীয় জ্বালাতন বা যন্ত্রণা বোধ করেনি। এই স্বেচ্ছাচারী শাসক অতি দূরে বাস করার কারণে ছিলো শিথিল, দুর্নীতির কারণে হয়ে পড়ে নমনীয়, আর আলস্যের কারণে কামেলা এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। দলিল দস্তাবেজ অনুসারে ঔপনিবেশিক স্পেনীয়রা ছিলো অতিরিক্ত শাসনের অধীনে, বাস্তবে তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলতে পেরেছে। কোনো গবর্নর হয়তো ব্যক্তিগতভাবে অত্যাচারী ছিলেন। তবে দূর ঘোল স্পেন থেকে নির্যাতনের প্রশ্নই ওঠে না।

স্পেনীয় সাম্রাজ্যের কলঙ্ককজনক কিছু ব্যাপার ছিলো। পেরুর খনিগুলিতে শ্রমিকদের শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়েছে। মেক্সিকোর গণপূর্ত বিভাগের কাজেও শ্রমিকদের বলপূর্বক নিয়োগ করা হয়। উদারনীতিকরা এমন প্রথা পছন্দ করেন নি যেখানে শ্রমিকদের উপর বলপ্রয়োগ করা হয় কিংবা মননশীলতাকে করা হয় অত্যাচারী যাজকতন্ত্রের নজরবন্দী। তথাপি যে শান্তি অন্যতম প্রধান আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য তা স্পেনীয়রা তাদের বিশাল শাসনাধীন এলাকাগুলিতে বজায় রাখে। অংশত স্পেনীয়, অংশত ক্রিওল, অংশত ইন্ডিয়ান, অংশত নিগ্রো জনগোষ্ঠীকে পাশাপাশি বাস করা সম্ভব করে তোলার জন্য অভিন্ন কর্মপন্থা ও বিশ্বাস উদ্ভাবন করা হয়। গত শতাব্দীতে ইউরোপীয় শাসনের আগে দক্ষিণ আমেরিকা অনেক বেশি অসুবিধা ও অসন্তুষ্টি বোধ করেছে। বাস্তবিক পক্ষে, স্পেনীয় উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ করায় এই দাঁড়ায় যে প্যাক্স হিসপানিকা ফঅয ইসপঅনইচঅ)-র পরিবর্তে সূচিত হয় আন্তঃরাষ্ট্র যুদ্ধবিগ্রহ এবং ঘরোয়া বিপ্লবের।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে খাঁটি ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা। এরা ছিলো স্বাধীনতা ঐতিহ্যে পুষ্ট, অনেকের পূর্ব পুরুষেরা জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন প্রচণ্ড ক্রোধ ও হতাশার কারণে। পশ্চিম গোলার্ধের স্পেনীয় এবং ক্রিওলদের মধ্যে তেমন কোনো বিদ্রোহের ঐতিহ্য ছিলোনা। শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতার স্বাদও তারা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেনি। স্পেনীয় ইন্ডিসকে এমন ঔপনিবেশসমষ্টি ভাবা হয়নি যেখানে মূল দেশের লোকেরা গিয়ে অবাধে বসবাস করতে পারে। এগুলিকে গণ্য করা হয়েছে রাজকীয় অঞ্চল হিসেবে, এখানে বসবাসের সুযোগ লাভ করতে হলে স্পেনের রাজার অনুমতির প্রয়োজন করবে। ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা, কিংবা দক্ষিণ আমেরিকাকে স্পেনে পরিণত করা, যেখানে শুধু শত ভাগ আমেরিক্যান স্পেনীয়রা বাস করবে, এই চিন্তাধারা ক্যাথলিক রাজশক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলোনা। ইন্ডিসে স্পেনীয়রা চুপিসারে ঢুকে পড়ে, আজকের দিনে ইহুদিরা যেমন প্যালেস্টাইনে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তখনকার নীতি এই ছিলো যে, জনসংখ্যার প্রধান অংশ হবে ইন্ডিয়ান কিংবা বর্ণশঙ্কর। এদের স্পেনের রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দেবে ধর্মীয় সঙ্ঘগুলি। এদের প্রচার-প্রচারণার জোরেই শুধু এই নীতির সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব। এই কাজে জেসুইটরা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। ১৭৬৮ সালে জেসুইট সঙ্ঘের সদস্যদের বিতাড়িত করলে স্পেনীয় ইন্ডিস একটি শক্তিশালী শিক্ষামুখীন প্রতিষ্ঠানের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ এরা স্পেনীয় রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দিতেন কোনো প্রকার বিরাম না মেনে। এই ক্ষতি ভবিষ্যতে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ফরাসি কানাডা বৃটেন কর্তৃক বিজিত হবার পর আমেরিকার উপনিবেশগুলির মূল দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ইচ্ছা যেমন হ্রাস পায়, তেমনি চার বছর পর জেসুইট সঙ্ঘ বিলুপ্ত করার ফলে স্পেনের প্রতি ইন্ডিসের আনুগত্য নিঃশেষ হয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকান উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করলে স্পেন বিদ্রোহীদের সহায়তা করে। ইংল্যান্ড এর হিংসাত্মক প্রত্যুত্তর দেয় যথাসময়ে। আইবেরিয়ান রাজ্যগুলির অধীনতা থেকে দক্ষিণ গোলার্ধের স্বাধীনতা অর্জনে বৃটেন বিরাট ভূমিকা পালন করে। ট্রাফালগারে ইংরেজ নৌবহর স্পেনীয় নৌবাহিনীর মূল অংশকে ধ্বংস করে এবং জুনো পর্তুগাল আক্রমণ করলে পর্তুগালের রাজকীয় পরিবারকে ব্রাজিলে নির্বাসনে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। ১৮০৬ সালে বৃটিশ বাহিনী বুয়েনস আয়ার্সে অবতরণ করলে আর্জেন্টিনা প্রবর্তনারের

মতো বিদ্রোহ করার জন্য সাহসী হয়। জনৈক ইংরেজ এডমিরাল, প্রতিভাবান কোখ্রেন (চতুর্দশ আর্ল) প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা থেকে স্পেনীয় নৌবহর বিতাড়িত করেন, উপরন্তু চিলি ও পেরুর স্বাধীনতা অর্জনে সক্রিয় সহায়তা করেন। মুক্তিদাতা বলিভার যে বাহিনীর সাহায্যে কোলম্বিয়ান এবং ভেনেজুয়েলান প্রজাতন্ত্র গঠন করেন সেই বাহিনীর মূল শক্তি ছিলো ছয় হাজার দুঃসাহসী ইংরেজ সৈনিক। জনৈক ইংরেজ, জর্জ ক্যানিং, লন্ডনের সকল উদারনৈতিক বৈঠকখানার জন্য আনন্দের খোরাক যুগিয়ে স্বভাবসুলভ দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা দেন যে (মুক্ত প্রজাতন্ত্রগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করতে গিয়ে) তিনি "নতুন বিশ্বের অস্তিত্ব সম্ভব করেছেন পুরাতন বিশ্বের অবসাদের ঘাটতি দূর করার জন্য।" বলিভার যখন ১৮৩০ সালে মারা যান তখন আমেরিকান গোলার্ধের দক্ষিণ ভাগে কয়েকটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র দাঁড়িয়ে গেছে। প্রধানত অ্যাংলো স্যাক্সন জনগোষ্ঠীগুলির সক্রিয় সহযোগিতা এবং সমর্থনে।

তাহলে দেখা যায় রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে অ্যাংলো-স্যাক্সন এবং আইবেরীয় জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে যে বিবাদের সূচনা হয় তা বর্তমান পর্যায়ে এসে নতুন পথ ধরে। এই কারণে ইংরেজরা এক সময় ক্ষান্তি দেয়, তখন আমেরিক্যান ইউনিয়নের নাগরিকরা উক্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। তারা ১৮৪৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউ মেক্সিকো কুক্ষীগত করে, কিউবা এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দখল করে পঞ্চাশ বছর পর। স্পেনীয় লেখকরা আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে স্পেনের সকল শত্রুর মধ্যে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির ধর্মদ্রোহীরা সবচেয়ে দুধর্ষ এবং ভাগ্যবান।

সাম্রাজ্য হারানোর ফলে স্পেনীয়দের গর্ব আহত হয় বটে, তবে স্পেনীয় জাতির সমৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। যে কোনো অর্থনৈতিক বিচারে স্পেন বর্তমানে বেশি সমৃদ্ধ ও সুখী। অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। উপদ্বীপের যুদ্ধের মধ্যযুগীয় স্পেন চোখের সামনে থেকে দ্রুত সরিয়ে যাচ্ছে।

ইন্ডিসের স্বাধীনতা প্রাপ্তির একটি ফলশ্রুতি অবশ্য ছিলো আপাতস্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ। ইন্ডিয়ান রাজস্ব সংগ্রহ বন্ধ হওয়ার ফলে (এটিই ছিলো রাজকীয় বাজেটের বড়ো একটি উৎস) ফার্দিনান্দ ও তার উত্তরসূরিগণ দুর্বৃত্তের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হন। যদি সেনা বাহিনীকে বেতন দিতে হয় তাহলে গির্জাগুলির উপর কর আরোপ করতে হবে, আর গির্জাগুলির উপর কর আরোপ করলে জনগণ হবে নাখোস। কারণ ইতালির মতো স্পেনের গির্জা সব্ব জাতীয় শক্তির বিরোধী ছিলোনা, বরং এই শক্তি ছিলো স্পেনীয় জাতীয়তাবাদের আত্মাস্বরূপ। যেখানে স্পেনের উদারবাদীরা কখনো স্বাধীন সত্তা নিয়ে চলতে পারেননি, সর্বদা অনুকরণ করেছেন ফরাসি আমূল সংস্কারবাদীদের, ধর্ম ব্যাপারে ছিলেন নিরীশ্বরবাদী, রাজনীতি ব্যাপারে মহাবৈশ্বিক, সেখানে যাজকতন্ত্রকে গণ্য করা হয়েছে, কেন্দ্রীভূত ও স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে। আরো মনে করা হয়েছে যে গির্জাগুলির উপর স্পেনের প্রকৃত শক্তি ও ঐক্য নির্ভর করে। তবু প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির অবস্থা যাই হোক না কেন গির্জার প্রাধান্য সর্বাবস্থায় সমানভাবে চলেনি। নিয়মিত বিরতি দিয়ে রাজশক্তির দরিদ্রতার কারণে উদারনীতিকরা ক্ষমতা লাভ করেছে। আর সেনাবাহিনীর প্রধান প্রায়ই হস্তক্ষেপ করতেন এবং হুমকি প্রদর্শন করে সৈনিকদের বেতন আদায় করতেন যাজকদের তহবিল থেকে।

কাজেই ১৮২৪ সালে ফার্দিনান্দ পুনরায় সিংহাসনে আসীন হবার পর স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস যা দাঁড়ায় তা থেকে বোঝা যায় যে একটা বোমান ক্যাথলিক রাজ স্বাধীন সরকার গঠন কতোটা অসুবিধাজনক। অবশ্য স্বাধীনতার বীজ ইতিমধ্যেই বপন করা হয়েছিলো। উপদ্বীপের যুদ্ধের নিদারুণ সংকটের সময় ক্যাডিজে কর্টেসের (সংসদের) অধিবেশন বসে। একটা শাসনতন্ত্র তৈরি করা হয়। সমুদ্র বন্দর শহরগুলি এবং সেনাবাহিনীর একটা সক্রিয় মনের অধিকারী সংখ্যালঘু শ্রেণী কিছু উদার নীতি সমর্থন করেন, তখন থেকে স্পেনে, প্রতিক্রিয়া শীলতার অতিশয় বাজে সময়েও, শাসনতান্ত্রিক সরকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কিংবা ধর্মীয় সহনশীলতার জন্য ঝুঁকি নেয়ার লোকের অভাব হয়নি। তবু যতদিন গির্জা শিক্ষা বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করবে, উপরন্তু বিশাল সামাজিক ও সম্পদ শক্তির জোরে গণমতের উপর প্রাধান্য বজায় রাখবে, ততদিন স্পেনে প্রকৃত রাজনৈতিক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন সম্ভব হবেনা। দ্বিতীয় ইসাবেলার (১৮৩৩-৬৮) সুদীর্ঘ রাজত্বকালে যদিও এক ধরনের শাসনতন্ত্র কার্যকর ছিলো, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা ছিলো সামরিক একনায়কতন্ত্র। একের পর এক সমর নেতারা এসে ক্ষমতায় ভাগ বসিয়েছেন। প্রথম প্রজাতন্ত্র (১৮৭৩-৪) যদিও এমিলিও কাস্তেলার-এর জ্বালাময়ী বাগ্মিতার সহায়তা পেয়েছে, তবু প্রজাতন্ত্র সমর্থকের অভাবের জন্যই উক্ত প্রজাতন্ত্র বেশিদিন টেকেনি।

রাজনৈতিক কাঠামো নামমাত্র পরিবর্তন করে স্পেনীয় জনগণের মধ্যে জাতীয় রাজনীতির প্রতি সক্রিয় ও দীর্ঘস্থায়ী উৎসাহ জাগ্রত করা সম্ভব বলে মনে হয় না। আর তা যদি না হয় তাহলে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানাদি কাজ করতে পারবে না। ১৮৭৪ সালে বুরবঁ রাজবংশকে পুনর্বাসিত করা হয় বটে, তবে প্রায় প্রতারক শাসনতন্ত্র দ্বারা রাজার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় লাগামহীন নিয়ন্ত্রণ। ১৯১০ সালে সূচনা করা হয় সার্বজনীন ভোটাধিকার। এই পরিবর্তনগুলির কোনোটাই সংসদীয় জীবনকে বাস্তব রূপ দিতে পারেনি। কারণ শিক্ষার উপর যাজকদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকার ফলে জনসংখ্যার বাট ভাগ ছিলো নিরক্ষর। ত্রয়োদশ আলফনসোর আনুমানিক হিসাব অনুসারে, দেশের জনসংখ্যা বিশ মিলিয়নের কম হবে না, অথচ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলো মাত্র ছয় হাজার লোক।

এমতাবস্থায় স্পেনের সংসদীয় জীবন ছিলো আদবকায়দা দোরস্ত তামাসা মাত্র। আর যেহেতু ক্ষমতাসীন সরকার 'নির্বাচন তৈরি করতেন', অতএব রাজার কাছে প্রত্যাশা করা হতো যে তিনি পর্যায়ক্রমে প্রতিটি দলকে কর্টেস ভেঙে দেয়ার অধিকার অনুমোদন করবেন, ফলে আসন্ন সংসদের রাজনৈতিক চরিত্র নির্মিত হয়ে যাবে। একের পর এক মন্ত্রীসভার পরিবর্তন হয়েছে, বলতে গেলে, বিদ্যুতের গতিতে। রাজনীতিবিদদের সুবিধার জন্য নির্জীব আবর্তক প্রথা চালু করা হয়। এই প্রথার ফলে দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য বিশাল ও সাহসী নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা থেকে সরকার বঞ্চিত হয়, তাছাড়া প্রকৃত সংকটের সময় সংসদ হয়ে যায় অথর্ব বা পঙ্গু। এই অব্যবস্থা বা অকল্যাণের প্রতিকার একনায়কতন্ত্র করতে পারবে না, ত্রয়োদশ আলফনসো সে চেষ্টাও করেছেন ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত, যখন শাসনতন্ত্র স্থগিত করা হয় এবং জেনারেল প্রাইমো দ্য রিভেরাকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয় স্পেন রাজ্য শাসনের জন্য। প্রতিকার নিহিত ছিলো নানা বিদ্যা ও রাজনৈতিক জ্ঞানে স্পেনীয় জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার মধ্যে। এ বিষয়ে বুরবঁ রাজতন্ত্র কখনো কোনো উদ্যোগ

করেনি, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে (১৯৩১) এক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো মনোযোগ দেয়া হয়, অন্তত কাগজে কলমে

স্পেনীয় জনগণকে জয় করা কিংবা তাদের শাসন করা কোনোকালে সহজ কম ছিলো না। তাদের অস্থির ও বিপ্লবী মেজাজ (যা ইতিহাসকার লিভি অনেককাল আগেই লক্ষ করেছেন) একালেও বজায় আছে। এত দিনে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে। এই যা। সূর্যের প্রখর কিরণ, শুষ্ক, তিক্ত ধুলো বালি মিশ্রিত প্রবল বায়ুঝড় সম্ভবত স্পেনীয়দের আত্মাকে বিক্ষত কিংবা বিকৃত করে। ফলে দেখা যায় কি কমুনিজম, কি সমাজতন্ত্র, কিংবা যাজকতন্ত্র এবং শ্রমিকতন্ত্র স্পেনের আবহাওয়ায় হিংস্র রূপ ধারণ করে। আর আবহাওয়ার মতো, জনগণের মেজাজেও মৃদু বিকাশের ধাপের ব্যাপারটা অনুপস্থিত। কোনো কিছুই ধারাবাহিকভাবে ঘটেনা। দাঙ্গাবাজির অবসান হলে শুরু হয় দিবানিদ্রা ; আর দিবানিদ্রা অনুসরণ করে আসে দাঙ্গাবাজি। দীর্ঘকাল রাজনৈতিক নিশ্চয়তা চলার পর সূচনা হয় আকস্মিকভাবে হিংসাত্মক বিশৃঙ্খলার বিস্ফোরণ। জাতির কল্যাণের ধারণা পুরো বিকশিত না হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুভূতি উচ্চাসন লাভ করে, আর স্থানীয় স্বাধীনতার প্রতি আসক্তি প্রায় বর্বরোচিত জেদের পর্যায়ে ঠেকে। উনিশ শতকের স্পেনীয় উদারনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম দুর্ভাগ্য এই যে, তারা ফরাসি আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়, এজন্য তারা আঞ্চলিকতাবাদের শক্তিকে অনুধাবন করে নি, অথচ এটি স্পেনীয়দের জাতীয় চরিত্রের একটা অন্যতম শক্তিশালী দিক। উপরন্তু অতিরিক্ত শক্তিশালী বাস্ক ও ক্যাটালানদের মধ্যে। বাস্করা যাজকীয়, স্বৈরতন্ত্রী, মধ্যযুগীয়, অপরদিকে ক্যাটালানরা উগ্র আমূল সংস্কারবাদী এবং ঈশ্বরদ্রোহী। ১৮২৮-৩৩ সালে কয়েকটি ডিক্রি জারি করে সপ্তম ফার্দিনান্দ বৃথাই চেষ্টা করেন ক্যাটালানদের স্বায়ত্তশাসন দমনের জন্য। ক্যাটালান সমস্যা অত সহজে সুরাহা করা যায় না। বার বার, ১৮৪৪ সালে, ১৮৬৩ সালে, ১৮৭০ সালে এবং ১৮৭৪ সালে ক্যাটালানদের বিদ্রোহ মাদ্রিদ সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে এই অনমনীয়, দুধর্ষ প্রতিপক্ষরা, যারা উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাস করে, তারা কাস্তিলিয়ান প্রভুদের থেকে একেবারে ভিন্নভাবে মানুষ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করে। ক্যাথলিক আয়ারল্যাণ্ডকে যতটুকু দমিয়ে রাখা যায় ক্যাটালোনিয়ায় তার বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। অষ্টম আলফনসোর রাজতন্ত্র যেমন, তেমনি দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ক্যাটালানদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

পিরেনিজ পর্বতমালার ঢালু দুই পাশে বসবাসকারী স্বকীয়তার অধিকারী বাস্করা একটা ক্ষুদ্র জাতি, তাদের দুঃসাহসিকতাও বড় একটা নজরে পড়ার মতো নয়। বুরবঁ রাজবংশের বৈধ শাখার প্রতিনিধিত্ব দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার পর তারা দুধর্ষ জাতিতে পরিণত হন। এই দাবি প্রথম উত্থাপন করেন ডন কার্লোস, অতঃপর তার উত্তরসূরীরা। যে দুটি কার্লিস্ট যুদ্ধ হয় (১৮৩৪-৯,১৮৭২-৬) তার কারণ বাস্কদের কাস্তিলদের প্রতি নিদারুণ শত্রুতা। ইংল্যান্ডে যেমন জ্যাকবপন্থিদের সমর্থন করে পাহাড়ী (Highland) গোত্রগুলি, তেমনি যাজকতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারতন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতিভূ কার্লিস্টরা প্রধানত সমর্থন লাভ করেন এই আদিম ও সাহসী জাতির। মনে করা হয় যে এই জাতির ভাষা আইবেরীয় জাতির মূল ভাষা থেকে উদ্ভূত।

ইউট্রেখটে স্থাপিত শান্তি চুক্তির পর থেকে স্পেন ইউরোপের রাজনীতিতে দ্বিতীয় স্তরের ভূমিকা পালন করেছে। তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ ছিলো না বললেই চলে। অথচ এই স্পেন এক সময় ইউরোপের রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। এটি ছিলো সমুদ্রপারের রাষ্ট্রনায়ক ও বিদ্বান ব্যক্তিদের লালন ক্ষেত্র, বলতে গেলে মৌলবাদের আঁতুরঘর, ইসলাম, আরব সভ্যতা বিকাশের রাজপথ, এবং পরবর্তীকালে একটি বিরাট ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের চমৎকার মহাস্থান। এই দেশে জন্মগ্রহণ করেন ট্রাজান এবং হাড্রিয়ান, মার্কাস অরেলিয়াস ও থিওডোসিয়াস, এরা হন রোমক জগতের নিয়ন্তা। আরো জন্মগ্রহণ করেন কুইনটীলিয়ান ও সেনেকা, মার্টিয়াল, লুকান এবং জুভেনাল, রোমান জ্ঞান চর্চায় এদের অবদান অপরিসীম। কাজেই বোঝা যায় স্পেন রোমান রাষ্ট্রদেহের অতিরিক্ত অঙ্গ ছিলো না, বরং বাস করেছে রোমক রাজ্যের বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি। ধর্মানুরাগের যুগে স্পেনের গুরুত্ব ছিলো আরো অনেক বেশি, লাতিন গির্জার ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে, উক্ত ধর্মতত্ত্ব একটা রূপও পরিগ্রহ করেছে, খ্রিষ্টান জগতের মধ্যে কমপোসটেলার সেইন্ট জেমসের সমাধিকে মনে করা হয় অতি পবিত্র স্থান হিসেবে। সেকালে লাতিন ও আরব সভ্যতার মধ্যে ভাবের বিনিময় হয় বিস্তর। খ্রিষ্টানদের দ্বারা গ্রানাডা বিজিত হবার পর এই মূল্যবান বিনিময় বন্ধ হয়ে যায়। এই শতাব্দীগুলিতে স্পেন রাজ্য ছিলো বিরাট ক্ষমতাধর। ক্যাথলিক ধর্মের মূল স্তম্ভ হিসেবে কিংবা এমন একটা মাধ্যম হিসেবে যার সাহায্যে এরিস্টটল ও আরবীয়দের চিন্তাধারা পশ্চিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। স্পেন থেকে আমরা পাই ডমিনিককে (যিনি আলবিজেনসিয়ান ধর্মদ্রোহীদের জন্য হাতুড়ি হিসেবে প্রসিদ্ধ), আর পাই আভেরোসকে (আবু রুশদ), ইনি ছিলেন দার্শনিক সর্বেশ্বরবাদের মূল উৎস। আর যখন প্রটেস্টান্ট মতবাদের জোয়ারে ক্যাথলিক চার্চ ভেসে যাবার জোগাড় হয় তখন মস্তক উত্তোলন করেন ইগনাটিয়াস লয়োলা, যিনি উক্ত জোয়ারে লাগাম টেনে ধরেন। যে বৃহৎ আন্দোলন কাউন্টার রিফরমেশন নামে প্রসিদ্ধ তার পুরো ভাগে থেকে কাজ করেছে স্পেন রাজ্য। সমগ্র ইউরোপের কোনো অংশ এই আন্দোলনের ছোঁয়া এড়াতে পারেনি। সার্ভেন্টিস ও ক্যালডেরনের কলম এবং ভালেসকুয়েজ এবং মুরিলোর তুলি একটা জাতির উপর দীপ্তি ছড়ায়, যে জাতি এক শতাব্দীরও অধিককাল সময় তার সম্পদ, ক্ষমতা এবং সুদূর প্রসারী উচ্চাভিলাষের জন্য সবার ভীতি ও ভক্তি কুড়িয়েছে।

সাম্রাজ্যিক এই জাঁক এখন সুদূর অতীতের ব্যাপার। বুরবঁ রাজবংশের অধীনে স্পেন অবিলম্বে ফ্রান্সের উপগ্রহে পরিণত হয়, আর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দীর্ঘ উপনিবেশিক দ্বন্দ্বে হয় তার সক্রিয় সহযোগী। এর জন্য দেশটিকে ফ্রান্সের সমান চরম মূল্য দিতে হয়। বৈপ্লবিক যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে এদেশটি এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্য আর পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। পুরাতন ও নতুন ভাবধারার দ্বন্দ্বেও দেশটি হয় ক্ষত-বিক্ষত। একের পর এক নালায়েক নৃপতি এসে (ফার্দিনান্দ, ক্রিস্টিনা এবং ইসাবেল) ইউরোপে দেশটির অগ্রগণ্যতা শূন্যের কোঠায় ঠেকায়।

বেশ অনেককাল যাবৎ স্পেনের অবক্ষয় একটা সুপরিচিত বিষয়। স্পেনীয় পণ্ডিত এবং ইতিহাসকারগণও এ ব্যাপারে নিদারুণ কৌতূহল বোধ করেন। যখন ভাবতে বসেন স্পেনের রাজশক্তির অধীনে কি বিশাল বড়ো সাম্রাজ্য ছিলো, বর্তমানে উক্ত সাম্রাজ্য লুপ্ত, তা ক্ষতিকর আলস্যের কারণে হোক কিংবা অহংকারী হয়ে ওঠায়, কিংবা অযোগ্যতা তথা হতোদ্যম

উদাসীনভাবে বলেন, যেন এই জগতের কোনো কিছুরই তেমন কোনো মূল্য নেই (এটা স্পেনীয়দের ধর্মীয় চরিত্রের সঙ্গেই সংগতি রাখত), অথবা ফরাসিদের আফ্রিকান সাম্রাজ্যের কথা ভাবে, কিংবা আংলো স্যাকসন জনগোষ্ঠীর সুবিস্তৃত আধিপত্যাধীন এলাকা বিবেচনায় আসে, তখন তারা অনুমান করতে প্রলুব্ধ হন যে স্পেনীয়দের বলবীর্য এবং দক্ষতায় রহস্যময় কারণে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই অনুমানের পক্ষে বাস্তব সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে না। প্রকৃত প্রস্তাবে স্পেনীয়দের জাতীয় চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, বরং তারা ভিন্নমুখী হয়ে পড়েছে। স্পেনের ইতিহাস যারা ভালো জানেন তারা দেখতে পান যে স্পেনীয় বিশেষ কোনো গুণই স্বকীয়তা হারায় নি। স্পেনীয় আমেরিকার চলতি ঘটনাবলি বিবেচনা করে জনৈক আধুনিক লেখক মন্তব্য করেছেন যে এ ব্যাপারে হতাশাবাদী হবার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

"কোনো অবক্ষয় ঘটেনি", লিখেছেন আজোরিন। "একটা নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করা হয়েছে। সৃষ্টি করা হয়েছে বিশটি নতুন জাতি। মাত্র একটা ভাষা এক গুচ্ছ দেশীয় ভাষাকে মুছে দিয়েছে। তৈরি করা হয়েছে বিরাট সেচ ব্যবস্থা। রাস্তাঘাট তৈরির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বন সাফ করে জমি তৈরি করা হয়েছে কৃষিকর্মের জন্য। উঁচু পর্বতমালা হয়েছে বিজিত। অতি প্রশস্ত নদীপথও লাগানো হয়েছে কাজে। পৌরসভার সূচনা করা হয়েছে হাজার হাজার শহর ও নগরে। শিল্প, বাণিজ্য, নৌচালনা, কৃষিকর্ম, পশুপালন শুরু হয়েছে এই গ্রহের নবাবিষ্কৃত একটি অংশে। এতে জনগণ ও জাতিসমূহের জীবনের মান হচ্ছে উন্নত। এই বিরাট কার্য কে সম্পাদন করেছে? ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালি, জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার সমবেত উদ্যোগ? না। মাত্র একটি দেশ এই কাজটি করেছে, আর সেই দেশটি হলো স্পেন। পৃথিবীর বৃহত্তম আধুনিক দেশগুলির গোড়াপত্তন করার পর স্পেনের অধিবাসীর সংখ্যা কতো ছিলো? এবার আমাদের দৃষ্টি শুধু উপদ্বীপ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। স্পেন হলো একটি উপদ্বীপ এবং আরো বিশটি আমেরিকান জাতিগোষ্ঠী"।[১]

গত মহাযুদ্ধের পর থেকে স্পেন তার দুহিতা স্থানীয় দেশগুলির অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। তবে সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবনের কথা ওঠেনি। স্পেনীয় আমেরিকান জনগোষ্ঠীগুলি তাদের স্বাধীনতা পরিত্যাগ করবে না। তবু প্রতি বছর শরৎকালে জাতিপুঞ্জ যখন জেনেভায় মিলিত হয় তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্পেনীয় জনগণের মধ্যে অতিলৌকিক অন্তরঙ্গতা লক্ষ করা যায়। ইউরোপের অদ্ভুত ও জটিল আপনি সঙ্কেতের মুখোমুখি হয়ে স্পেন ও তার আমেরিকান দুহিতারা পাশাপাশি দাঁড়ায়।

---

১. Azorin : An Hour of Spain. Tr. Alice Raleigh এই প্রতিভাবান লেখক লক্ষ করেন নি যে ইংরেজ পুঁজি এবং অতিবাণী আর্জেন্টিনের অবদান কম নয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

ইংরেজদের রাশিয়াভীতি। রুশদের পরাজয়ে ইতালীয় জাতীয়তাবাদের বিজয়ের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত। পবিত্র স্থানগুলির প্রসঙ্গ। লর্ড স্ট্রাটফোর্ড দা রেডক্লিফ। যুদ্ধের সূচনা। তৃতীয় নেপোলিয়নের কূটনীতি। যুদ্ধাভিযান পরিচালনা। ফরাসি সম্রাটের শান্তির অনুকূলে সিদ্ধান্ত প্যারিস চুক্তি। কাভুর ও ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জাতীয়তার দাবি ভাগ্যে জোটে চূড়ান্ত উৎখাত। অথচ ১৯২০ সালের শান্তি চুক্তিতে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। কোন পয়গম্বর সেদিন গণনা বা অনুমান করতে পেরেছিলেন যে মাত্র দুই দশকের মধ্যে উপন্যাসকার থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ারে'র জার্মানি রাশিয়ার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হবে, এদিকে পিও ননো-র ইতালি ঐক্যবদ্ধ হবে সার্দিনিয়ান রাজতন্ত্রের অধীনে। কিংবা হাঙ্গেরি গুরুতর গ্লানির ভেতর থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্রের অধীনে জার্মানদের সমপর্যায়ভুক্ত হবে? এই ধরনের সম্ভাব্য ঘটনার বিপরীতে ঘৃণা, ঈর্ষা, ভীতি এবং উচ্চাভিলাষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেই যথেষ্ট হবার কথা। এসব বেশ কয়েক বছর জার্মান এবং ইতালীয়দের জীবন বিষময় করে রাখে। এর সঙ্গে যোগ করা চলে সাম্প্রতিক সার্বজনীন বিপ্লবের গন্তব্য-বিভ্রাট, প্রতিবন্ধকতার প্রকৃতি (এখন বোঝা যায় কতোটা ভয়ানক ছিলো), এই প্রতিবন্ধকতা ভবিষ্যতে অনুরূপ সাফল্যের পথেও কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলির মধ্যে বৃহত্তম হলো রাশিয়া নামক দেশ। রুশ সাম্রাজ্যের বিশাল আকৃতি, তার বিপুল সমরসম্ভার, রুশদের মন্থর কিন্তু অদম্য সম্প্রসারণ এসীয় মালভূমির দিকে, কন্সট্যান্টিনোপল ঘিরে তার সুপরিচিত মতলব, অনেক দেশে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে (প্রাচ্যে তার বিরাট স্বার্থ জড়িত বলে) একটা অস্পষ্ট অথচ স্থায়ী আতংক বোধ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি তীব্র ঘৃণা, আর ইউরোপে এই ব্যবস্থার প্রধান সমর্থক ও স্তম্ভ হলো রাশিয়া। পামারস্টোন (ইংল্যান্ডের এক কালীন প্রধানমন্ত্রী) এবং থ্যাকারের সমকালীনদের কাছে কোনো ভক্তি বা শ্রদ্ধার অনুভূতি রাশিয়ার ক্ষতিকর নাম যে ঘৃণার মনোভাবের সৃষ্টি করে তা কিছুমাত্র প্রশমিত করতে পারে না। রুশ জনগণের সাহিত্য ও শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সংগীত ও নৃত্যকলার ক্ষেত্রে যে মেধাবী অবদান তা এখনো ইউরোপীয় সভ্যতার অভিন্ন সম্পদের মধ্যে গণ্য হয়নি। রুশ কৃষককুলের কর্মকুশলতা সম্পর্কে কোনো অনুমান ছিলো না। শুধু জানা ছিলো যে কবি লর্ড টেনিসনের বর্ণনায় প্রথম নিকোলাস ছিলেন 'বরফশীতল মস্কোবাসী' এবং 'অতি বর্বর।' প্রথম নিকোলাস সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৮২৫ সালে। পূর্ববর্তী সম্রাট প্রথম আলেকজান্ডারের উদারবাদী মনোভাব তাকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি; তিনি স্বীয় প্রজাদের পুলিশের নজরের বাইরে যেতে দিতেন না, তিনি কঠোর নির্দয়তার সঙ্গে পোলদের জাতীয় অধিকার ধ্বংস করেন, তিনি প্রথমে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করেন জার্মান খবরের

কাগজগুলির কণ্ঠ রোধ করার জন্য, অতঃপর সাহায্য করেন হাঙ্গেরির উপর দাসত্ব শৃঙ্খল আরোপ করার জন্য, পরিশেষে ওলমৎসে প্রাসীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে গ্লানির ভেতর নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সাহায্য করেন। দ্য তকভিলের ভাষায় এই সরকার ছিলো জগতে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের মধ্যমণি, তুর্কিসমূহের সংশোধনের ক্ষেত্রে, জাতিসমূহের মুক্তির ক্ষেত্রে, এবং ১৮৪৮ সালে যে উদার আশাবাদ নির্বাপিত হয়, তা পুনরুজ্জীবনের জন্য মারাত্মক প্রতিবন্ধক। যখন তুরস্ক, যে দেশ বেশ কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কার্যকর করে, রুশ কিংবা অস্ট্রীয় প্রতিহিংসার কাছে কসুথ ও অন্যান্য হাঙ্গেরীয় পলাতক নেতাদের সমর্পণ করতে অস্বীকার করে তখন সেইন্ট জেমসের দরবারের তুর্কি প্রতিনিধি মন্ত্রী লন্ডনের জনগণের কাছে আদর্শ পুরুষ হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন। বৃটিশ জনগণের এই মানসিক অবস্থার মধ্যে প্রাচ্যে আকস্মিকভাবে যুদ্ধ বেঁধে যায়। এই যুদ্ধের জন্য কোনো পক্ষ তৈরি ছিলো না। অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধে তার রুশ হিতসাধককে অবর্ণনীয় আঘাত দিয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। এবং তার দেশের জনৈক রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের ভাষায়, "গোটা বিশ্বকে অকৃতজ্ঞতা দ্বারা অবাক করে দিয়ে," স্বয়ং বিপজ্জনক ও নিবান্ধব অবস্থান গ্রহণ করে। তার এখন এক ঘরে অবস্থা। রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে যে সুদৃঢ় বন্ধন ছিলো তা শত ছিন্ন করে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ যে আবহের সৃষ্টি করে তাতে জার্মান ও ইতালীয় জাতির মুক্তির পথ খুলে যায়। বিনা প্রয়োজনে একটা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হওয়ার এটিই ছিলো প্রধান তাৎপর্য। এই যুদ্ধের সূচনা যেমন করা হয় বিনা প্রয়োজনে, পরিচালনাও করা হয় অদূরদর্শীর মতো। যুদ্ধের রূপটা আধুনিক নয়, মধ্যযুগীয় ছিলো। ব্যবস্থাপনা ছিলো বলতে গেলে পুরাকালীন, অব্যবস্থাপনা ট্রাজিক।

ঘটনার উদ্ভব ঘটে গ্রিক ও রোমান সন্ন্যাসীদের মধ্যে জেরুজালেমের খ্রিষ্টান পুণ্যস্থানের ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে বিরোধের ফলে। এই বিরোধ এমনিতে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু গ্রিকদের দাবি পোর্টের উপর রুশ সম্রাট চাপিয়ে দেন, লাতিনদের দাবি সমর্থন করেন ফরাসি সম্রাট। ফলে ঘটনার গুরুত্ব সবার নজরে পড়ে। একটি দুরূহ বিরক্তিকর দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের মীমাংসা অবশেষে যা দাঁড়ায় তাতে সম্রাট নিকোলাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি প্রুথ বরাবর সৈন্য সমাবেশ করেন এবং প্রিন্স মেনশিকফের নেতৃত্বে একটি আস্ফালনকারী মিশন প্রেরণ করেন কন্সট্যান্টিনোপলে। এরা শুধু জেরুজালেম ব্যাপারে সন্তুষ্টি অর্জন করবে না, পূর্বেকার সকল দাবি অতিক্রম করে একটি সন্ধি প্রণয়ন করবে। চুক্তির শর্তানুসারে পোর্টের অর্থডক্স প্রজারা যেন রুশ নিয়ন্ত্রিত আশ্রিত রাজ্যের অধিবাসী হয়। এই প্রস্তাবগুলি বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্ট্র্যাটফোর্ড দ্য রেডক্লিফের উপদেশ সত্ত্বেও পোর্ট বাতিল করে দেয়।

আজকের অবস্থা এমন যে একজন রাষ্ট্রদূতের পক্ষে তার দেশকে যুদ্ধে জড়িত করা সম্ভব নয়। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রদূতরা মন্ত্রিসভার অনুগত হাতিয়ারে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু ১৮৫৩ সালে টেলিগ্রাফ এতটা উন্নত হয়নি। অতএব একজন ব্যক্তিত্বশালী রাষ্ট্রদূত দূরাঞ্চলে কর্তব্যরত থাকলে, আর থাকলে ঘটনাবলী সম্পর্কে স্বকীয় ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, উপরন্তু তার উপরে যদি থাকেন দুর্বল প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশ মন্ত্রী, তাহলে তিনি, যদি তার মধ্যে বিশ্বাস করার মতো যুক্তি থাকে যে, তার মতামতের সঙ্গে দেশের গণমতের সাযুজ্য রয়েছে, স্বীয় পথে চলতে পারেন এবং দেশের পক্ষে এককভাবে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। স্ট্রাটফোর্ড দ্য রেডক্লিফ মনে করেন তিনি এমন একটা অবস্থানে রয়েছেন। প্রাচ্যের রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার

ভিত্তিতে গঠিত এবং অত্যন্ত স্বচ্ছ। তিনি তুর্কিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, রুশদের একদম বিশ্বাস করতে পারতেন না। তিনি হয়তো ভাবেন যে ইংরেজদের ভয়ানক শত্রু রুশদের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে কিংবা রণাঙ্গনে পরাস্ত করার সময় এবার এসেছে। যদিও তিনি জানেন যে তার প্রধানমন্ত্রী এবারডিন এবং বিদেশমন্ত্রী ক্লারেন্ডনের লক্ষ্য শান্তি, তবে তিনি এটাও জানতেন যে মন্ত্রীসভার সবচেয়ে জনপ্রিয় সদস্য পামারস্টোন রাজনীতিতে রুশবিদ্বেষে পক্ষপাতী। তাছাড়া সাধারণ মানুষ রুশ বিদ্বেষে অন্ধ। এই সব কারণে দীর্ঘকাল বিশ্বাস করা হয় যে স্ট্র্যাটফোর্ড ছিলেন ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রকৃত সূচনাকারী। অথচ এই সুবাদে রাষ্ট্রদূত দেশের মন্ত্রিসভার সঙ্গে যে পত্র বিনিময় করেন তা পড়ে প্রচলিত ধারণা পোষণ করা যায় না। স্ট্র্যাটফোর্ড পক্ষগুলিকে নমনীয় হবার জন্য আহবান জানান। তবে তার ডেসপ্যাচগুলিতে কখনো ঘটনাবলির পূর্ণ বিবরণ থাকেনা। বিচক্ষণ তুর্কিরা জানতেন যে 'মহান এলচি'র মধ্যে তারা একজন বন্ধু পেয়েছেন। উপরন্তু বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজগুলির অবস্থান খুব দূরে নয়। এই সমর্থ, ব্যক্তিত্বশালী এবং মেজাজি কূটনীতিকের কন্সট্যান্টিনোপলে শুধু অবস্থিতির দরুনই (তার আনুষ্ঠানিক পত্রবিনিময়গুলি সত্ত্বেও) বিবাদ নিষ্পত্তির একাধিক প্রস্তাব মাঠে মারা যায়। এতে তুর্কি প্রতিরোধ হয় আরো শক্ত। ভিয়েনার প্রস্তাব হয় ভণ্ডুল। অথচ ভিয়েনার প্রস্তাবের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হলে সকল বিরোধের নিষ্পত্তি হতো। ইংরেজ ও ফরাসি উভয় সরকার হতেন সন্তুষ্ট। জার, এমনকি অস্ট্রীয় রাজদরবারের তুর্কি প্রতিনিধি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা প্রস্তাবের শর্তাবলিতে খুশি।

যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে যায় রাশিয়া এবং তুরস্কের মধ্যে তখন রাশিয়া প্রথমেই আক্রমণ চালায় প্রিন্সিপালিটিগুলিতে, তুর্কিরা প্রথমেই গোলা বর্ষণ শুরু করে ওলটেনিৎসারে (মোলডাভিয়ায়), জবাবে রুশরা সিনোপ-এর অদূরে তুর্কি নৌ বহর ডুবিয়ে দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় বৃটেনে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে। বৃটিশ ক্যাবিনেটের অধিকতর বিজ্ঞ সদস্যরাও জারের কর্মপন্থা নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলে। কারণ সেই ১৮৪৪ সালে জার এবারডিনের কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে তুরস্ক হলো 'রুগ্ন ব্যক্তি।' এই সম্প্রতিকালেও তিনি সেইন্ট পিটার্সবুর্গে বৃটিশ রাষ্ট্রদূতকে বলেন রাশিয়া এবং ইংল্যান্ডের উচিত একত্রিত হয়ে ঐ দেশটির সর্বস্ব হরণ করা। অতএব বিস্তর ইতস্তত করার পর (ভিয়েনায় এখনো শান্তি অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া চলছে) ইংল্যান্ড যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তুর্কিদের সহায়তার এই উদ্যোগে ফ্রান্স ইংল্যান্ডের পাশে দাঁড়ায়। সম্ভবত এটা মনে করা অন্যায্য হবে যে তৃতীয় নেপোলিয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিলো সামরিক গৌরব অর্জন। তার প্রজারা শান্তি চায়, তিনি শান্তির প্রতিশ্রুতিও দেন। তাদের বলা হয় 'সাম্রাজ্য হলো শান্তি।' "আমাদের অনেক পতিত জমি রয়েছে, সেগুলিতে চাষাবাদ করতে হবে। তৈরি করতে হবে অনেক সড়ক, প্রোতাশ্রয়গুলি করতে হবে গভীরতার খাল কাটা সম্পূর্ণ করতে হবে। নদীগুলিকে করতে হবে নৌ চলাচলের উপযোগী, বাড়াতে হবে রেলপথের দৈর্ঘ্য। মার্সাই-র বিপরীতে বিরাট ভূ-খণ্ড পড়ে রয়েছে, ফ্রান্সের সঙ্গে এর আত্মীকরণ খুবই জরুরি।" এর জন্য দরকার অবিভাজ্য শান্তি। কিন্তু নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি অস্থির এবং শ্বেত-শুভ্র মনে হলেও তার কয়েকটি নীতি পরিবর্তন সাপেক্ষ নয়। তার একটি লক্ষ্য হলো ১৮১৫ সালের সন্ধি সংশোধন করতে হবে ; সম্ভব হলে ইউরোপীয় সম্মেলন আহবান করে। আর একটি হলো ইতালিকে কিছুটা সহায়তা প্রদান। তৃতীয় লক্ষ্য হলো বিশেষ কতকগুলি ভুলের

পুনরাবৃত্তি করা যাবে না, যে ভুলগুলির জন্য ফ্রান্সের তৃতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। যেহেতু তুর্কি সেনাবাহিনী ইংল্যান্ডের নৌশক্তির কারণে উৎখাত হন, অতএব ডাইপোর লক্ষ্য হলো ইংল্যান্ডের সঙ্গে সুদৃঢ় মৈত্রী গঠন। এর জন্য যদি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়, তাতেও তিনি রাজি। রুশরা অন্য যে কোনো শত্রুর মতোই ঘৃণ্য, তাদের ফরাসি যাজকরা অপছন্দ করেন বিচ্ছেদপন্থী বলে, তারা স্বৈরাচারী বলে ফরাসি প্রজাতন্ত্রীদের কাছে অকাঙ্ক্ষিত। সম্রাটও ব্যক্তিগতভাবে জারের ঔদ্ধত্যকে বাঁকা চোখে দেখেন। জার তৃতীয় নেপোলিয়নকে সম্রাট বলে স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক। এটা কম অস্বস্তির কারণ নয়। এই যুদ্ধের জন্য ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স চারটি লক্ষ্য স্থির করে। দেখা যায়, এতে ইংরেজরা লাভবান হবে সবচেয়ে বেশি। কারণ, রুশদের বলকান অঞ্চলে কোনো প্রকার প্রভাব খাটাতে দেয়া হবেনা। তাদের কোনো যুদ্ধ জাহাজ কৃষ্ণ সাগরে ঢুকতে পারবে না। অস্ট্রীয়রাও কম লাভবান হবে না যেহেতু প্রিন্সিপালিটিগুলি এবং দানিউব অঞ্চল মস্কোর প্রভাবমুক্ত করা হবে। ফ্রান্সের লাভ হবে নামমাত্র। অথচ এক্সপিডিশনারি ফোর্সে ফ্রান্সের অবদান থাকবে বৃহত্তর। তবু বৃটেনদের সঙ্গে যুগ্ম উদ্যোগের ফলে দুঃসাহসী, নব্য এবং অনিশ্চিত সিংহাসন স্থায়িত্ব লাভ করবে বলে হিসেব করা হয়।

যেহেতু কৃষ্ণ সাগরে অবস্থিত সেবাস্টপল রুশ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান নৌ ঘাটি, অতএব এটিকে যুদ্ধাভিযানের মূল সামরিক লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই অভিযানের প্রধান লক্ষ্য হলো রুশদের নৌশক্তি সমূলে ধ্বংস করা। অথচ রুশরা প্রিন্সিপালিটিগুলি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফলে দানিউব উপত্যকায় কোনো সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা নেই। অথচ ফরাসি, ইংরেজ এবং তুর্কি নৌবহরগুলি (ইংরেজরা সংখ্যায় ২৬,০০০। ফরাসিরা কিছুটা বেশি) বুলগেরিয়ার ভার্না বন্দর থেকে ১৮৫৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় ঐ অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করে (যে অঞ্চল থেকে রুশরা নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে)।

এই উদ্যোগকে পাগলামি ছাড়া আর কি বলা যায়। যেহেতু তুর্কিরা মিত্রদের কোনো প্রকার সহায়তা ব্যতিরেকে দানিউব উপত্যকা থেকে রুশদের বিতাড়িত করেছে এবং যেহেতু রাশিয়া কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে অভিযানের সকল ঝুঁকি অপসারিত হয়েছে, তাহলে মিত্র বাহিনী কেন অবরোধ আরোপের উদ্যোগ গ্রহণ করবে, কেন একজন লোক ক্ষয় কিম্বা একটা শিলিং অপচয়ের আয়োজন করবে তার কারণ বোঝা যায়না। উপরন্তু এই উদ্যোগ সফল হলেও শত্রুপক্ষের উৎসের উপর এতে কিছুমাত্র টান পড়বে না। আর মিত্রপক্ষের লক্ষ্যটা যদি হয়ে থাকে উন্মাদ রোগগ্রস্ত, তাহলে বলতে হয় এদের পদ্ধতিটা ছিলো ট্র্যাজিক। ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে নেই কোনো অ্যাম্বুলেন্স, কিম্বা উপযুক্ত পরিবহনের ব্যবস্থা, তাদের গায়ে যে উর্দি চাপানো হয়েছে তা দিয়ে শুধু লন্ডন প্যারেড গ্রাউন্ডে কুচকাওয়াজ করা চলে। সবচেয়ে অবাক হবার মতো ব্যাপার এই যে, গ্রেট বৃটেন হলো প্রকৌশল বিদ্যায় জগতের সবচেয়ে উন্নত দেশ। অথচ তাদের এ কথা মনে হয়নি যে বালাক্লাভা বন্দর থেকে শিবিরগুলিতে সরবরাহ প্রেরণ সহজ করা জরুরি। আর এটি করতে হলে মাত্র পাঁচ মাইল দীর্ঘ হালকা রেললাইন বসালেই চলতো।

লক্ষ্যস্থলে অবরতন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্ভব হয়। আলমার শত্রুবাহিনীর সঙ্গে প্রথম মোকাবেলা হয়, সেখানে জয় আসে সহজে। ইংরেজ অধিনায়ক লর্ড র‍্যাগলান আক্রমণ চালিয়ে যেতে বলেন, কিন্তু তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়নি। এটি করা হলে হয়তো নগরীর

পূর্বাঞ্চলীয় ভূভাগ মিত্র পক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতো। বাহিনীগুলি স্নায়ুকেন্দ্রে পরিচালিত করা হয়। পাল তোলা হয় দক্ষিণ অভিমুখী, কারণ সেখানে নোঙরের ব্যবস্থা উন্নততর। আর সাব্যস্ত হয় যে সেখানে আক্রমণ পুনরায় শুরু করা হবে। আক্রমণ করতে গিয়ে যে মূল্যবান সময় বিনষ্ট করা হয় তা আক্রান্ত বাহিনী পুরো কাজে লাগায়। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এতটা উন্নত করা হয় যে এখন জায়গাটা প্রায় চেনাই যায়না, সেবাস্টপল এর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন প্রতিভাবান টডলবেন, তাছাড়া ঘন তুষার ও ঝড়ের মতো ক্রিমিয়ান শীতে অপ উপসর্গগুলি তো রয়েছেই। তাছাড়া উক্ত নগরী যেহেতু পুরোপুরি সুরক্ষার ব্যবস্থা কখনো করা হয়নি, ফলে নিয়মিত বোঝা লাঘবকারী বাহিনী পাঠিয়ে কাজটা সহজ করা হয়। শেষ পর্যন্ত অবস্থার পরিবর্তন অবশ্য হয় (যদিও কলেরা এবং তুষার প্রদাহে পক্ষগুলির লোকবল ব্যাপক হারে হ্রাস পাওয়ার আগে নয়)। ফরাসি বাহিনী মালকফ দুর্গে প্রচণ্ড আঘাত হানে (সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫), সৈন্যরা অনুপ্রবেশ করে নির্জন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া এলাকায়। এই এলাকা এক সময় সম্পন্ন নগরী ছিলো, ভবিষ্যতে ফের সম্পন্ন নগরীতে পরিণত হয়।

বিশাল বিজয় অর্জন করার পর নেপোলিয়ন এখন শান্তির বুলি আওড়ানোর যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু এখন যথার্থ তেজস্বী ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী পামারস্টোন এবং তার স্বদেশবাসীদের যুদ্ধের মনোভাব পুরোপুরি জাগ্রত হয়েছে। তাছাড়া বালাক্লাভা ইংকারম্যান এবং রেডানের সামান্য বিজয়ে তারা যথেষ্ট সন্তুষ্ট নয়। এবার তারা প্রচণ্ডতর যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে চান। কিন্তু সম্রাটের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে যুদ্ধংদেহী নির্বুদ্ধিতার অবসান ঘটে এবং শান্তি পর্ব আসন্ন বলে মনে হয়। নেপোলিয়ন তার অভিমত ব্যাখ্যা করে বলেন, যদি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হয় তাহলে বৃহত্তর লক্ষ্যের মধ্যে পোলদের মুক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই ভয়ংকর প্রস্তাব ইংরেজ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, বার্লিন উক্ত প্রস্তাবে ঘৃণাবোধ করে। আর সেন্ট পিটার্সবুর্গের কাছে এটা ঘোরতর অমঙ্গলসূচক। ফলে ইউরোপ চরম নির্বুদ্ধিতা থেকে কাণ্ডজ্ঞানের পথে পা বাড়াতে সমর্থ হয়।

প্যারিস সন্ধিতে (মার্চ, ১৮৫৬) মিত্রপক্ষের প্রায় সকল দাবি পূরণ হয়। দুটি প্রিন্সিপালালিটি (মোলাডাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া) পূর্বতন অবস্থানে ফিরে যায়। দানিউব নৌ চলাচলের জন্য মুক্ত করা হয়। কৃষ্ণ সাগরে যুদ্ধ জাহাজের প্রবেশের উপর জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। সুলতান প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি খ্রিষ্টান প্রজাদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে দেবেন। তবে কথা থাকে যে বৃহৎ শক্তিগুলি তার অভ্যন্তরীণ সরকার পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। খ্রিষ্টান অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের রুশ আশ্রিত রাজ্যের বিলোপ সাধন করা হয়। নিরপেক্ষতা রাখার পুরস্কার হিসেবে সার্বদের অধিকার ও সুবিধাদির নিশ্চয়তা প্রদান করে বৃহৎ শক্তিবর্গ। তবে দেশটি তুর্কি সার্বভৌমত্বের অধীনে থাকবে। মিত্রপক্ষের বিজয়ের এখানেই শেষ নয়। রাশিয়া এশিয়ার কর্স অঞ্চল তুর্কিদের কাছ থেকে সাম্প্রতিক যুদ্ধে ছিনিয়ে নিয়েছিলো, সেটা ফেরৎ দিতে হলো। মোলডাভিয়ার কাছে প্রত্যর্পণ করতে হলো বেসারাবিয়ার অংশবিশেষ।

এই রকম কয়েকটি সুযোগ মিত্র পক্ষগুলি নতুন আর দ্বিতীয় আলোজাগারের কাছ থেকে আদায় করতে সক্ষম হয়। এর কতোকগুলি ছিলো অস্থায়ী সুযোগ মাত্র। যদিও পোর্ট একটা নতুন জীবন লাভ করে, তবে বলকান এলাকায় খ্রিষ্টানদের স্বাধীনতার প্রক্রিয়া

ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, কিম্বা কৃষ্ণ সাগরে রুশদের নৌবাহিনীর পুনরুত্থান। বাস্তবিকপক্ষে, নেপোলিয়ন কমার্শিয়া বাজ্য গঠনে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেন। এদিকে ইংল্যান্ড ভারতীয়দের বিদ্রোহ দমনে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকায় ব্যাপারটা নিয়ে আপত্তি তোলার ফুরসৎ পায়নি। সাগর কৃষ্ণ সাগর সংক্রান্ত ধারা ব্যাপারে বলেত হয় যে, রুশরা এই ধারা ১৮৭০ সালে অস্বীকার করে। গোটা ইউরোপ এই আইন বিরোধী কাজে সম্মতি জানায়, কারণ বাধা দেবার মতো তাদের ক্ষমতা ছিলো না। আর রুশদের পক্ষে কাজটা অস্বাভাবিকও নয়। যাহোক এই মুহূর্তের জন্য এবং ভবিষ্যতের কয়েক বছরের জন্য রাশিয়া অথর্ব দানবে পরিণত হয়। রাশিয়া প্রধানত পঙ্গু হয় সেবাস্টপল বন্দর বিপদ-মুক্ত করার জন্য শীতকালের মহাভাগে অভিযানের আয়োজন করে। তুষারের পুরো আস্তরের মধ্যে গরুর গাড়ি চলতে পারেনি, আটকে যায়, তাছাড়া অভিযান চলাকালে কয়েক লক্ষ নিরীহ কৃষক মৃত্যুবরণ করে।

প্যারিসের সম্মেলন কক্ষে একজন বলিষ্ঠ, চশমাপরিহিত, গোঁফযুক্ত, অমায়িক এবং হাবভাবে ভদ্রলোককে দেখা যায়-- ইনি সকল ব্যাপারের খুঁটিনাটি বিষয়ে অবগত-- ইনি কাউন্ট ক্যাভুর, ১৮৫২ সাল থেকে পিয়েডমন্টে প্রধানমন্ত্রী। প্রচণ্ডতম সংসদীয় বাদ-বিতণ্ডার পর এই দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ (লাভালাভের ব্যাপারটা বড় হলে রাজনীতিকদের আচরণও জুয়াড়ির মতো হয়), তুরিন পার্লামেন্টকে সাফল্যের সঙ্গে বোঝান যে (জানুয়ারি, ১৮৫৫) ক্রিমিয়ায় সার্দিনীয় বাহিনী প্রেরণ করা উচিত। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। আটাশটি জীবনের বিনিময়ে (চেরনায়াতে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করে), কয়েক হাজার কলেরার প্রকোপে প্রাণবলি দিয়ে ক্যাভুর যুদ্ধের শেষে ইতালির প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে ইউরোপীয় সম্মেলনে উত্থাপনের অধিকার অর্জন করেন।

ভিন্ন ক্ষেত্রে, সমান সাহসিকতা এবং নিশ্চিত তৎপরতার পরিচয় দেন একজন ভিক্টোরীয় যুগের মহিলা। ইনি রণাঙ্গনে দুর্ভোগের খবরে বিহ্বল হয়ে স্কুটারিতে চলে যান সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষা করার জন্য। তার ব্যক্তিগতভাবে সেবার উদাহরণ এবং নিরলস কর্মযোগিতা নার্সিং পেশার মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করে, জন স্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতি ঘটায়, এবং তার উদাহরণ সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে অন্য একটা ব্যাপারে। অতঃপর নারী জাতির মর্যাদা প্রভূত বৃদ্ধি পায়, অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্যও নারীদের ডাকা হয়। সে কালের নিয়ম অমান্য করে দুর্ভোগপীড়িত মানবতার কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে কাজের মাধ্যমে ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল যে অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন তা ছিলো ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ এবং আতংকের মধ্যে অন্যতম প্রধান ক্ষতিপূরণ বিশেষ।

ইতালির একত্রীকরণ

নিকট প্রাচ্য সম্পর্কে ইংল্যান্ডের হিসাবের ভুল। ইংল্যান্ড ও রিসোর্জিমেন্টো (পুনরুজ্জীবন)। ইংরেজ উদারবাদের কাছে ক্যাভুর এর ঋণ। পিয়েডমন্টের আধুনিকীকরণ ইতালিতে অস্ট্রিয়া। প্লমবিয়েরে (Plomboieres) সাক্ষাৎ। ১৮৫৯ সালের ইতালীয় যুদ্ধাভিযান। ভিলা ফ্রাংকার যুদ্ধবিরতি। মধ্য ইতালিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তুসকানিতে রিকাসলি। স্যাভয় ও নিস ফ্রান্সের হস্তে অর্পণ। ক্যাভুর ও ম্যাৎসিনি; সিসিলি ও নেপলসে গ্যারিবল্ডি। ক্যাভুর ও ভিক্টর ইমানুয়েলের দক্ষিণ অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা। গ্যারিবল্ডির অবসর গ্রহণ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শেষ পর্যায়। রোমান প্রশ্ন। ইতালি ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন।

ইংল্যান্ডেব কিমিয়ার যুদ্ধের উদ্যোগের ভিত্তি ছিলো তিনটি ভুল হিসাব। রুশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল থেকে অতি দূরের রণক্ষেত্রে জার সরকারের আঘাত করার ক্ষমতার বিষয়ে অহেতুক উচ্চ ধারণা, বলক্যান অঞ্চলের কৃষ্ণ খ্রিষ্টান জনগণের স্বাধীন অবস্থা বজায় রাখার সমর্থতা সঠিক অনুমানে ব্যর্থতা এবং সবশেষে, অতীতের অনেক নজির চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও, তারা বিশ্বাস বজায় রেখেছেন যে, পশ্চিমী শক্তিগুলির যথাযথ নির্দেশনায়, তুর্কি সরকার তার খ্রিষ্টান প্রজাদের ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রবুদ্ধ শাসনের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা রাখে। এই মতবাদগুলি বলক্যান অঞ্চলের বৃটিশ কর্মপন্থার মূলনীতিতে চালু থাকে। তবে আশি ও নব্বই এর দশকের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতিগুলি বাতিল করতে হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই ক্রিমিয়ায় পঁচিশ হাজার জীবনের অবসান ঘটে। পরবর্তীতে আতংক ছড়ায়, উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং সৎ প্রচেষ্টার অপচয় হয়।

ইউরোপীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তর রোমাঞ্চকর উপাখ্যান হলো স্যাভয় রাজবংশের অধীনে ইতালিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এখানে ইংল্যান্ডের প্রভাব অধিকতর সৌভাগ্যের রূপে আসে, এবং ব্যয়ের ভাগটা কমই থাকে। একটা সময়ে, ইতালি যখন তার অস্তিত্ব ব্যাপারে সংকটে নিমজ্জিত এবং ইতালীয় জাতীয়তাবাদ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং বহিঃস্থ বিপদের জন্য হুমকির সম্মুখীন, তখন ইতালীর রাজদরবারের প্রতিটি ইংরেজ দূত ইতালির স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছেন। ইতালির তখন প্রয়োজনও ছিলো এ ধরনের স্বাধীনতার। লিবার‍্যাল দলের সদস্যরা ইংল্যান্ডের যেখানেই জমায়েত হয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ক্লাবগুলিতে, গ্রামীণ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের বাড়িতে, এবং পার্লামেন্টে, সবার মধ্যে একটা আশাবাদী মনোভাব লক্ষ করা গেছে। তারা বিশ্বাস করেছেন যে যাজকবৃত্তি এবং একপেশে নীতি সমূলে উৎখাত হবে। এগুলি প্রটেস্ট্যান্ট এবং নিয়মতান্ত্রিক জনগণের কাছে ছিলো অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু। নেপলসে বিচার ব্যবস্থায় অন্যায় অবিচারের চিত্র গ্লাডস্টোন তুলে ধরলে জনগণের রুষ্ট মনোভাব আরো কঠোর হয়। পামারস্টোন এবং রাসেল যেমন ছিলেন ইতালীয় স্বাধীনতার আগ্রহী সমর্থক, কুইন এবং ক্লিন কনসর্ট ছিলেন তেমনি এর বিরোধী। গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাপার হলো, উপরোক্ত দুজন রাজনীতিক ১৮৬০ সালে রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছেন। তখন ইংল্যান্ডের কিছুমাত্র উৎসাহ পাওয়া গেলে ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়া হয়তো মধ্য ও দক্ষিণ ইতালির সঙ্গে উত্তর ইতালির সংযোগে বাধা প্রদান করতেন। কিন্তু পামারস্টোন এবং রাসেল জোর দিয়ে এবং খোলাখুলি ইতালির স্বাধীনতার পক্ষে ঘোষণা দেন। তাছাড়া, বাইরে থেকে ভিয়েনার ও রোমের উপগ্রহদের মদদ দেয়া হলে বৃটিশ নৌবাহিনীকে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হবে, সে ব্যাপারে বাইরের দেশগুলি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। এসব ইতালির সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

আরো একটি ক্ষেত্রে ইতালির আন্দোলন ইংল্যান্ডের কাছে ঋণী। ক্যাভুর ছিলেন ইংরেজদের উদারনীতিবাদের আগ্রহী অনুসারী। তার সৎ অভিলাষ ছিলো যে, প্রথমে ক্ষুদ্র রাজ্য পিয়েডমন্ট, এবং সবার শেষে ঐক্যবদ্ধ ইতালির বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তিনি ইংল্যান্ডে যে শাসন ব্যবস্থা দেখেছেন তা কায়েম করবেন। এটা হবে শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সহনশীলতার ব্যাপক অনুমোদন থাকবে, গির্জার জন্য উপযুক্ত অবস্থান নিশ্চিত করা হবে, অনুসরণ করা হবে অবাধ বাণিজ্যনীতি, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে, আর কাজে লাগানো হবে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে যুগের সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান। যে ব্যক্তি সুখ্যাত রাষ্ট্রবিদ হওয়ার আগে ছিলেন ব্যাংকার, কারখানার কর্মী এবং কৃষক, তার ব্যবহারিক বুদ্ধিমত্তার কাছে ফরাসিদের বিমূর্ত চিন্তা কোনো আবেদন রাখতে পারার কথা নয়। কিন্তু ব্যবসা যদি হয়ে থাকে প্রশিক্ষণের অঙ্গ, তাহলে পার্লামেন্ট ছিলো তার বৃহত্তর ক্ষমতা প্রদর্শনের উপযোগী স্থান। তিনি বিতর্কে প্রদর্শন করেন চরমোৎকর্ষ, অপরকে বোঝানোর ক্ষমতা ছিলো অপরিসীম, বাদানুবাদ আহবান এবং অংশগ্রহণ করে ভালো বোধ করতেন। তাঁর সুদীর্ঘ শাসনামলে (১৮৫১-৪৯, ১৮৬০-৬২) দায়িত্বশীল সরকারের আদর্শ ইতালিতে হয় সুপ্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া ইংরেজ উদারবাদ বিদেশে যতগুলি বিজয় অর্জন করে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় পুরস্কার কাউন্ট ক্যাভুরের মন।

দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল যে রাষ্ট্র শাসন করতেন তা গঠিত হয়েছিলো চার সংগতিহীন অঙ্গ দ্বারা, এর মধ্যে শুধু একটি অঙ্গে (সম্প্রতি সংযুক্ত জেনোয়া প্রজাতন্ত্র) ঐতিহাসিক ইতালির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতো। ফরাসি আলপস পার্বত্য অঞ্চলের স্যাভয় রাজবংশের আদি নিবাস হলেও এটি ভাষা ও ভাবাবেগে ফরাসি বলে গণ্য করতে হয়। ইতালির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নয়। পিয়েডমন্ট ছিলো আধা-পার্বত্য, দরিদ্র, পশ্চাদপদ এলাকা, অতীত কার্যকলাপের জন্য ইতালির ভক্তি দাবি করতে পারেনা, যে সাহিত্য ও শিল্পের চরমোৎকর্ষের জন্য ইতালি গর্ববোধ করে তাতেও এর কোনো অবদান নেই। সার্দিনিয়া সম্পর্কে বলতে হয় এটি ম্যালেরিয়া প্রবণ এবং বর্বর জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দ্বীপ। জেনোয়া একেবারে ভিন্ন। এই নগরী শুধু ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেনি, গোটা বিশ্বের সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিরাট অবদান রাখে। অবশ্য জেনোয়া ছিলো জরাজীর্ণ, এবং যেহেতু পিয়েডমন্টিজ রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সদস্য, এখনও অপরিচিত শাসন ব্যবস্থার অধীনে অস্বস্তিবোধ করে, অতএব সে তুরিন সরকারের জন্য শক্তি নয়, দুশ্চিন্তার কারণ। নিতান্ত সম্ভাবনাহীন এবং বিভিন্ন বর্ণের উপাদান দিয়ে ক্যাভুর একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান, এই রাষ্ট্র, যেমন হবে শক্তিশালী, তেমনি হবে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত। পার্লামেন্টারি নিয়ম পালন করা হবে বলিষ্ঠতার সঙ্গে। আর এসব করা হবে ইতালীয়

আন্দোলনে নির্দেশনা অর্জন এবং সংরক্ষণের জন্য। এ ক্ষেত্রে তিনি সহায়তা পান পার্লামেন্টারি শাসনতন্ত্রের, পুরুষোচিত জনগণের, কঙ্ক, তেজোদীপ্ত, কিন্তু অশ্লাগোড়া দেশপ্রেমিক নৃপতির এবং এমন একটি বাহিনীর, যা ইতালি সরকারের জন্য শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। পিয়েডমন্টিজ রিসরজিমেন্টো ব্যাপারটাকে ক্যাভুর এবং তার মতো সে কালের অন্যরা অনেকে দেখেন যেভাবে তাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে গির্জার সঙ্গে তীব্র বিবাদ অনিবার্য হবে। রাজার বিচলিত বিবেক সত্ত্বেও উক্ত বিবাদ সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করা হয়। যাজকীয় অধিক্ষেত্র আক্রান্ত হয় সিক্কারডি আইন দ্বারা। যাজকদের বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থান বিষয়েও আইনের আওতায় আক্রমণ পরিচালিত হয়। রটাজ্জি আইন যাজকতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক আড়ম্বর কাট-ছাট করে, উচ্চ বর্গীয় পুরোহিতদের আয় কমিয়ে দেয়। তাছাড়া তিন শতাধিক মঠ বন্ধ করে দেয়া হয়।

ভ্যাটিক্যানের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সিভিল বিবাহ অনুমোদন লাভ করে। এই সব আইনের কারণে পিয়েডমন্ট মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে গণ্য হয়, আগের মতো ইতালির সবচেয়ে পশ্চাদপদ রাষ্ট্র হিসেবে নয়, অপচয়িত শক্তি হিসেবে নয়, মননচর্চার ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা দ্বারা শৃঙ্খলিত এবং পুরোহিততন্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন সত্তা হিসেবে নয়। বরং আধুনিক সংস্কারমুক্ত এবং বাস্তবানুগ সম্প্রদায় হিসেবে। এতসব উৎকর্ষ সুনিশ্চিত করা হয় অত্যন্ত সমভার বাজেট, একাধিক বাণিজ্যিক চুক্তি, রেল পথ সম্প্রসারণে সরকারি প্রচেষ্টা সংযোজন, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে। সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হতে পারে অস্ট্রীয়দের আলপস অতিক্রম করে বিতাড়িত করা জন্য।

তুসকানি এবং পিয়েডমন্টের বাইরে সবচেয়ে কম অপশাসিত ইতালির অংশ ছিলো সম্ভবত লোম্বার্ডি এবং ভেনেশিয়া। প্রদেশ দুটি আবার অস্ট্রিয়া কর্তৃক শাসিত। যাহোক, অস্ট্রীয় সরকার তার ইতালীয় প্রজাকুলের বাস্তব অবস্থা উন্নয়নের জন্য যা কিছু করে থাকুন না কেন তা কোনো কাজে লাগেনি। কারণ অস্ট্রীয়দের কোনো কাজ এই রূঢ় বাস্তবতার হেরফের করতে পারেনি যে এই বহিরাগত শক্তি গোটা উপদ্বীপের প্রতিক্রিয়ার মূল লক্ষ্য। উপরন্তু এই সরকারের সমর্থনে দুষ্ট পোপীয় সরকার রোমাগনায় টিকে থাকে এবং রাজা বোম্বা নেপলসের ঘোরতর অনিয়মগুলি করতে পারেন। ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতা ম্যাৎসিনি এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হতে দেন না যে অস্ট্রিয়া এমন একটি শত্রু যাকে সৎ কিংবা অসৎ যে কোনো উপায়ে উৎখাত করতে হবে। একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল বুনে (প্রতিটি জাল পূর্ববর্তীটির চেয়ে বেপরোয়া) এই অদম্য দেশানুরাগী ব্যক্তিটি ইতালির মাটি শহীদের রক্তে প্লাবিত করেন।

কাউন্ট ক্যাভুরও মনে করেন অস্ট্রিয়া তাদের শত্রু। কিন্তু ম্যাৎসিনি যে ক্ষেত্রে উপায় হিসেবে ছুরি-চাকু এবং বিচিত্র প্রকৃতির ষড়যন্ত্রের কথা ভাবেন, সেখানে ক্যাভুরের পরিকল্পনার উপাদান হলো, ফ্রান্স ও পিয়েডমন্টের যৌথ বাহিনী প্রকাশ্য যুদ্ধের মাধ্যমে ইতালিকে মুক্ত করবে। এজন্যই তুরিনে যখন শুধু চলে সামরিক প্রস্তুতি, প্যারিসে তখন চলছে বিরামহীন প্রত্যাশা ও গুপ্ত চক্রান্ত।

অবশেষে ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে নেপোলিয়ন, যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মানসিকভাবে কার্বোনারো,* কিন্তু দীর্ঘদিন তিনি পরস্পরবিরোধী চাপের মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা

---

* মুক্তিকামী ইতালীয়দের গোপন দলের লোক।

করেছেন, এবার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সুনিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গোপনে এবং মন্ত্রিসভার সঙ্গে কোনো সলাপরামর্শ না করে তিনি ক্যাভুরকে তলব করেন ভসজেসের প্লমবিয়েরে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। এখানে দু'জনে দু'বার আলোচনায় বসেন। নেপোলিয়ন তার পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দেন। অস্ট্রীয়দের বাদ দিয়ে ইতালি গঠন তার লক্ষ। আলপস থেকে আড্রিয়াটিক পর্যন্ত এলাকায় গঠন করা হবে উত্তর ইতালীয় সাম্রাজ্য, জোড়াতালি দিয়ে গঠন করতে হবে একটা রাজতন্ত্র, যাতে কেন্দ্রে একজনকে বসানো যায়, একটি হবে পোপীয় রাষ্ট্র (যেহেতু যাজকরা রোমে পোপের অবস্থান দাবি করবেন), নেপলস হবে পুনর্গঠিত, আর এই সবগুলি অঙ্গ হয়তো অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত করা যাবে ফেডারেশন আকারে, হয়তো পোপকে নিযুক্ত করা যাবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে। এর জন্য যুদ্ধের সম্ভাবনা স্বীকার করা হয়, তবে এই যুদ্ধ এমন একটি অজুহাত অবলম্বন করে সূচনা করতে হবে যাতে সম্রাটের প্রজারা তা সহজে গ্রহণ করেন। এর জন্য অস্ট্রিয়াকে আগ্রাসী শক্তি হিসেবে চিত্রিত করতে হবে এবং দেখাতে হবে যে পিয়েডমন্ট একটি দুর্বল, নিরীহ এবং নিরপরাধ রাজ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এবং সব সময় যদি ফরাসি আত্মত্যাগের জন্য ক্ষতিপূরণ করা হয় তাহলে ফ্রান্সের সহায়তা প্রত্যাশা করা চলবে। সম্মানী হিসেবে দাবি করবে স্যাভয় এবং নিস। স্যাভয় সার্দিনিয়ান রাজবংশের আদি উৎসভূমি। আর, দুর্ভাগ্যবশত, নিস হলো গ্যারিবল্ডির জন্ম স্থান। এই রাজনৈতিক সন্ধিটি দৃঢ় ভিত্তি লাভ করবে একটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে। মাত্র পনেরো বছর বয়সী রাজকুমারী ক্লোথিল্ড বিয়ে করতে সম্মত হবে প্রিন্স জেরোম নেপোলিয়নকে। এই জেরোম সাইত্রিশ বৎসর বয়সী, কুখ্যাত লম্পট, যিনি, রণক্ষেত্রে নিদারুণ কাপুরুষের পরিচয় দিলেও, সবার প্রশংসা কুড়ান তার উপপত্নী, এবং প্রায় উপপত্নীদের প্রতি বিশ্বস্ততার জন্য। হয়তো এই বিষম যুগল কোনোদিন যুগ্মভাবে ফ্লোরেন্সের শাসনভার গ্রহণ করবেন। তুসকানিতে একজন বোনাপার্ট, একজন মুরা নেপলসে। এই ধরনের সম্ভাবনার কথা সম্রাটের মনে খুব ঘুর-পাক খাচ্ছে। এই সিদ্ধান্তগুলি সঙ্গে নিয়ে ক্যাভুর দেশে ফেরেন, এবং যদিও এসব তার রাজকীয় প্রভুকে গেলানো খুব কঠিন হবে, তবু অন্তত এটুকু জেনে তো আরাম বোধ করা গেল যে এখন থেকে ফরাসি সম্রাট তার সহযোগী। তুরিনে ফিরেই ক্যাভুর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

পরবর্তী বছরের রাজকীয় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে নেপোলিয়ন কথা প্রসঙ্গে জানিয়ে দেন যে (অতীব দুঃখের সঙ্গে) অস্ট্রিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক আগের মতো ভালো নয়। সম্রাটের এই অস্পষ্ট কথাগুলি ইউরোপের আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াতে থাকে, এবং আসন্ন যুদ্ধের অমঙ্গলজনক ইংগীত বলে ধরে নেয়া হয়। তবে সম্রাটের ভারসাম্য বজায় রেখে চলার ক্ষমতা ছিলো অসামান্য, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিও তিনি অপরিসীম আস্থা রাখতেন। ফলে মনে হতে থাকে যে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের বিভীষিকা নাও চেপে বসতে পারে। অতঃপর যখন মনে হয়েছে যে ক্যাভুরের আশা-ভরসা নির্বাপিত, তখন অস্ট্রীয়রা যারা সব সময়ই শত্রুর খেলার পুতুলে পরিণত হয়ে থাকেন, একটা চরমপত্র বিলি করে, তাতে তুরিনের নিরস্ত্রীকরণ দাবি করা হয়। প্লমবিয়ারে কথা হয়েছিলো যে যুদ্ধ বাঁধানোর উপযুক্ত অজুহাত থাকতে হবে। সম্রাট ও ক্যাভুর তা এবার নিশ্চিতরূপে পেয়ে গেলেন। অস্ট্রিয়া আগ্রাসী শক্তি, আর ফ্রান্সের বীরব্রতীরা অত্যন্ত হালকা মেজাজে, অথচ অতিরিক্ত দাম্ভিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আবার একজন বোনাপার্টের অধীনে ইতালির মাটিতে পদার্পণ করে।

সামরিক ইতিহাসের ছাত্রদের ১৮৫৯ সালের ইতালীয় সামরিক অভিযানকে প্রধানত ভুলের তালিকা হিসেবে মনে রাখতে হবে। মনে করা যায় যে, দীর্ঘদিন যাবৎ যুদ্ধের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অতএব অস্ট্রীয়রা রেলপথের উন্নয়নে মনোনিবেশ করবে। সমর নেতারা অবশ্য বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকে কাজে লাগাতে খুব সময় নেন। ওয়াট এবং স্টিফেনসন হয়তো বৃথাই জন্মেছিলেন। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি সরকার ও তাদের সর্বাধিনায়করা রেলপথের অসীম সম্ভাবনা আঁচ করতে পারেন নি। শুধুমাত্র একটা রেল সড়ক ভিয়েনার সঙ্গে ত্রিয়েস্তের সংযোগ স্থাপন করেছিলো। ত্রিয়েস্ত থেকে ভেনিসের দূরত্ব মাত্র সত্তর মাইল, অথচ কোনো রেল যোগাযোগ স্থাপন করা হয়নি। আগের জমানার মতো এতটা আরাম-আয়েসের সঙ্গে অভিযান পরিচালিত হয় যে, যদিও তারা যুদ্ধের সূচনা করেন এবং পিয়েডমন্ট সীমান্তে ষাটান সৈন্য সমাবেশ, তবু পিয়েডমন্টিজদের সঙ্গে বোঝাপড়া সাঙ্গ না করেই ফরাসিদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে এগিয়ে যান। নিদারুণ অযোগ্যতার সঙ্গে গিইউলি (Giulay) পিয়েডমন্টের দিকে এগিয়ে যান, অতঃপর হাত গুটিয়ে বসেন, তার নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ শত্রুপক্ষ পুরোপুরি গ্রহণ করে।

তার নাম মহিমামণ্ডিত হলেও ফরাসি সম্রাট কোনো সমরনায়ক ছিলেন না। রেলপথের তোয়াক্কা না করে, সহজাত ধারণা অগ্রাহ্য করে সমরাভিযানের জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কারণ এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন নেপোলিয়নের সামরিক অভিযানের যুগের একজন ঝানু সেনাপতি। ফলে জোমিনির অনুগত ছাত্র শত্রুব্যূহের ভেতর দিয়ে উত্তর দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন, এতে তাদের সদা সতর্ক প্রতিদ্বন্দ্বীদের একাধিক আক্রমণের সম্মুখীন হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু অস্ট্রিয়রা যেহেতু ফরাসিদের চেয়েও অযোগ্য, ফলে আক্রমণকারী বাহিনী প্রতিটি প্রচেষ্টায় সফল হয়, উত্তর অভিমুখে সামরিক অভিযান, পূব দিকে মিলান নগরের উপর আক্রমণ, দুটি হিংস্র সংঘর্ষ, মেজেন্টায়, এবং পুনরায় সলফেরিনোতে। জুলাই মাসের মধ্যে, নিম্নস্তরের সৈনিকদের ধন্যবাদ, মিত্র পক্ষের নৃপতিরা লোম্বার্ডি কুক্ষীগত করতে সমর্থ হন।

সামরিক অভিযানের এই পর্যায়ে এসে (১১ জুলাই, ১৮৫৯) সলফেরিনোর যুদ্ধে আহত সৈনিকদের আর্তনাদের শব্দ এখনো তার কানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনি হচ্ছে, এই অবস্থায় নেপোলিয়ন জোসেফ ফ্রান্সিসের খোঁজ করেন (ইনি অল্প বয়সী, অস্ট্রিয়ার সম্রাট), ভিলাফ্রাংকায় তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই পদক্ষেপের জন্য তিনি সে সময় এবং পরবর্তীকালে ইতালীয়দের স্বাধীনতার প্রতি জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অভিযুক্ত হন। কারণ ভিক্টর ইমানুয়েলের সম্মতি ব্যতিরেকে এবং সুনিশ্চিত সামরিক বিজয়ের মুহূর্তে তিনি আকস্মিকভাবে যুদ্ধের আয়োজন ভঙ্গ করেন, পিয়েডমন্টের জন্য গ্রহণ করেন লোম্বার্ডি, কিন্তু অস্ট্রীয়দের ভিনশিয়ায় স্থায়ী হতে দেন। নেপোলিয়ন তখনকার মতো সন্তুষ্ট। তিনি দেখতে পান যে ক্যাভুরের সঙ্গে তার যে কথা হয় সে অনুসারে তিনি অঙ্গীকার পালন করেননি। অতএব ক্ষতিপূরণের দাবি প্রত্যাহার করতে হবে। ভিক্টর ইমানুয়েলকে বলেন, "তুমি আমাকে শুধু যুদ্ধের খরচটা দেবে, আমরা নিস ও স্যাভয় নিয়ে আর কোনো কথা বলবো না।"

রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল কর্তৃক সম্রাটের শর্তাদি মেনে নেয়ার খবর শুনে কাউন্ট ক্যাভুর প্রস্তাব দেন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় পদে ইস্তফা দেন। তার হতাশার পরিমাপ করতে

মন্ত্রীদের কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। তাকে এমনএকটি ইতালি রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিলো যেখানে অস্ট্রিয়ার চিহ্ন মাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না, এই ইতালি আলপস পর্বতমালা অঞ্চল থেকে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত মুক্ত হবে। কিন্তু এখন যখন পিয়েডমন্ট যুদ্ধ প্রস্তুতির সূচনা করেছে, যখন সমগ্র ইতালি উত্তেজনায় কাঁপছে, যখন দুটি বিজয় ইতিমধ্যেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, মিলান নগরী হয়েছে পুনরুদ্ধার, যখন বিরাট ফরাসি বাহিনী ইতালির মাটিতে অবস্থান করছে, তখন স্থাপন করা হলো শান্তি, অস্ট্রিয়া আগের মতোই একটি সুখ্যাত ইতালীয় প্রদেশে বহাল রইলো। উপরন্তু রইলো একটা অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে, তারা আগের মতোই ইতালির স্বার্থবিরোধী ব্যবস্থাগুলি টিকিয়ে রাখতে পারবে। রাজক ও স্বৈরাচারীদের অবস্থা পূর্ববৎ। অথচ গোড়া থেকেই পিয়েডমন্টের কর্মপন্থা এসবের ঘোর বিরোধী। যে মুহূর্তে নেপোলিয়ন ভিলাফ্রাংকায় শান্তি সুনিশ্চিত করেন সে মুহূর্তে তার প্রতি ইতালীয়দের মনোভাব বদলে যায়। ইতালির স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য ফরাসিদের প্রতি তারা দারুণ বিমুখ হয়। মিলানের মাটিতে যারা পদার্পণ করে মুক্তিদাতা হিসেবে তাদের তখন প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিলো। সেই আদিম উৎসাহ এবার রাতারাতি রূপান্তরিত হয়। তবু বলতে হয়, জীবনে তিনি যতো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন তার মধ্যে বোধ করি সলফেরিনোর পর ইতালীয় সামরিক অভিযানের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত ছিলো সবচেয়ে সুবিচারপূর্ণ। ফরাসি পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিলো খুব বেশি, তার উপর সেনা ছাউনিগুলিতে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। দীর্ঘ সামরিক অভিযান সফল পরিচালনার জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি তার কিছুই করা হয়নি। পরিবহন ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত, সরবরাহে ঘাটতি, চিকিৎসা সরঞ্জামের গুরুতর অনটন। সংগত কারণে তার বাহিনীর সদস্যরা সমস্যা জর্জরিত। তার মানবতা, এবং মানবতা সব সময়ই সুবিচারপূর্ণ, জাগ্রত হয়েছিলো প্রকৃত রণক্ষেত্রের বাস্তব ও ভয়ানক দৃশ্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে। তিনি ভেবে দেখেন যে শত্রুপক্ষ প্রবল ঝাকুনি খেয়ে নড়বড়ে অবস্থায় আছে, কিন্তু তাদের বাঁধুনির দৃঢ়তায় আচড় লাগেনি, এবং ভেনিসের চারটি প্রসিদ্ধ দুর্গের[১] ছত্রছায়ায় তার দুর্দমনীয় অভিযান সফলতার সঙ্গে প্রতিরোধ করতে পারে। তাছাড়া জার্মানদের পক্ষ থেকে কোনো বিপদের ঝুঁকি না থাকলেও সন্দেহ থেকে যায় যে মিত্রপক্ষ ভিনিসিয়া জয় করতে সমর্থ হবে কিনা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জার্মানির দিক থেকে গুরুতর বিপদের কারণ ছিলো। সম্রাটের কাছে থেকে জরুরি বার্তা এসেছে যে রাইন নদী বরাবর প্রাসীয় সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি যদি অবিলম্বে অস্ট্রিয়দের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছতে না পারেন তাহলে ঐ বাহিনী কিছুমাত্র বিলম্ব না করে ফ্রান্সের শ্বাস রোধ করতে অগ্রসর হবে। অতএব বলা যায়, সম্রাট যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা যুক্তিসংগত ছিলো। কিন্তু ক্যাভুর ও তার বন্ধুদের কাছে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য বলে বোধ হওয়া স্বাভাবিক। যাহোক, জুরিখ নগরীতে একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলন ইতালির ভবিষ্যৎ রচনা করবে।

এবার যে উপাখ্যানের সূচনা হয় তা ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভের ব্যাপার। এ ধরনের উত্তেজনার প্রাদুর্ভাব ঘটলে রাষ্ট্রবিদদের সকল হিসাব ভণ্ডুল হয়ে যায়। মধ্য ইতালির জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পিয়েডমন্টের পক্ষে ঘোষণা দেয়। স্কুদে প্রিন্সিপালিটিগুলি, যেমন, মডেনা,

---

১. পেস্কেরা, মানটুয়া, পেসিয়েরা, লেগনাগো।

পারমা, তুসকানি রাজকীয় শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রোমাগনায়, উমব্রিয়ায়, মার্চেসে এক ধরনের প্রবল উৎসাহ দ্রুত ছড়ায় নতুন ইতালি রাজ্যের জন্য। উত্তরাঞ্চলে যার সাড়া পড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। এই পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনার দাবি না হলেও ফরাসি সরকারের পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধকতা লক্ষণীয়। সম্রাটের পরিকল্পনায় রয়েছে তুসকান রাজ্য, শাসন করবেন প্রিন্স নেপোলিয়ন। এটা পোপের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এতে তার ভূ-খণ্ডের আংশিক বিগঠন এড়ানো যাবেনা। অস্ট্রিয়দের কাছেও অবাঞ্ছিত, কারণ এতে তার রাজকীয় মক্কেল ক্ষমতা হারাবে এবং সবকিছু পাল্টে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। এটা করবে অতি উৎসাহী প্রজাতন্ত্রীরা। এদের কাছে পিয়েডমন্টের শাসন সার্বিকভাবে গ্রহণের অযোগ্য। কিংবা এখানে ঘটবে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ। অবশ্য তিনটি ঘটনার দরুন পরিস্থিতি সামলে নেয়া সম্ভব হয়। ইতালির মধ্যাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং প্রভাবশালী হলো গ্রান্ডডিউক শাসিত রাজ্য (Duchy) তুসকানি। এই রাজ্য বা ডুচি একশত একুশ বছর শাসন করে লরেনের রাজবংশ। এই রাজবংশের নৃপতিরা শাসনকার্যে কঠোরতা পরিহার করে এবং সবিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। একজন ভাবতে পারেন যে এখানে স্বতন্ত্রতার (Particularism) জোর হবে সবচেয়ে বেশি, তুসকান রাষ্ট্রে বিবর্তনের মধ্যে লভ্য মর্যাদাপূর্ণ স্বাধীনতার দীর্ঘ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তৈরি বক্তব্য মনোযোগ পাবে সমধিক। স্যাভেয়দের শাসন মেনে নেয়ায় যে মান গেল, তাও গুরুত্ব লাভ করবে। এখানে একটা অদ্বিতীয় সৌভাগ্যের কারণে, জাতীয় ভাবাবেগের চাপে সর্বশেষ লরেন ডিউক দ্বিতীয় লিওপোল্ড সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হলে তুসকানদের নেতৃত্ব কোনো মাথা গরম এবং বক্তৃতাবাগিশ ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া হয় না, বরং দেয়া হয় নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, আগ্রহী দেশপ্রেমিকতা এবং অত্যন্ত কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন একজন মহৎ ব্যক্তিকে। বোঝাই যায় একটা সংকটকাল চলছে। ফ্লোরেন্সের সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবার জোগাড়। আর ফ্লোরেন্সে অঘটনের একবার সূচনা হলে মডেনা, পার্মা এবং মধ্য ইতালির কোনো অংশ বাদ থাকবে না। বেনিটো রিকাসলির আন্তরিক প্রচেষ্টায় তুসকানরা দৃঢ়তার সঙ্গে এবং নিশ্চিতভাবে সমস্যার সমাধান হিসেবে পৃথক রাজ্যের ধারণা বাতিল করে দেয় এবং স্যাভয় রাজবংশকে গ্রহণ করে। ইতালির ঐক্যের স্থপতিদের মধ্যে অবিচলিত তুসকান ব্যারনের নাম অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।

যাহোক, এইসব স্থানীয় আন্দোলন যদিও গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদন লাভ করে, তবু বৈদেশিক হস্তক্ষেপ কার্যকর হলে সব নস্যাৎ হয়ে যেত ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইতালি ইংরেজ সরকারের প্রগাঢ় সহানুভূতি লাভ করে। তাছাড়া পমবিয়ারে কথাবার্তার বদৌলতে নেপোলিয়ন ইতিমধ্যেই কাউন্ট ক্যাভুরের সহযোগিতে পরিণত। ঐ সুচতুর পিয়েডমন্ট রাষ্ট্রবিদ সংক্ষিপ্ত অবসর জীবন যাপনের পর পুনরায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের হাল ধরেছেন। (২০ জানুয়ারি, ১৮৬০)। তিনি জানতেন নেপোলিয়নের মনে কোন ধরনের চিন্তা ভাবনা আনাগোনা করছে, কিভাবে তার জ্ঞাতি ভ্রাতাকে ফ্লোরেন্সের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন, প্রিন্স মুরাকে করবেন নেপলসের শাসনকর্তা, উপরন্তু পোপের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। কিন্তু কাউন্ট ক্যাভুর এটাও স্মরণ করতে পারেন যে, সম্রাট একবার প্রস্তাব করেছিলেন, আবার ভিলাফ্রাংকার পর নাকচ করে দিয়েছিলেন, ক্ষতিপূরণের দাবি। উক্ত দাবি পূরণ করার জন্য ক্যাভুর এখন খুবই ইচ্ছুক। তবে ইতালির রাজ্যগুলির তার রাজকীয় প্রভুর রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্তি নেপোলিয়নকে

মেনে নিতে হবে। উভয়ের মধ্যে চূড়ান্ত বোঝাপড়া হয়ে যায়। গণতন্ত্রের মহান নিয়ম পালন করা হয়। গণভোটে তুসকানি এবং মডেনা ইত্যালির পক্ষে যায়। এবং অনুরূপ জনপ্রিয় ভোটের মাধ্যমে স্যাভয় ও নিস ফ্রান্স লাভ করে।

এই লেন দেনের ব্যাপারটাকে দেশপ্রেমিক ইতালীয়দের আপত্তির ভাষায় ব্যাখ্যা করলে চলবে না। ভিক্টর ইমানুয়েলের নতুন রাজ্য পশ্চাতমুখী এবং যাজক অধ্যুষিত একটি প্রদেশ থেকে মুক্ত হলো। এই প্রদেশে শিক্ষা সম্প্রসারণ হতো কঠিন, প্রদেশটির প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও হতো ব্যয়বহুল এবং অকার্যকর। কিন্তু স্যাভয় প্রদেশের হস্তান্তর যদিও এসব কারণে ইতালি রাজ্যের প্রকৃত শক্তি হ্রাস করেনি, এবং মধ্য ইতালির রাজ্যগুলি যুক্ত হওয়াতে ক্ষতি পুষিয়ে গেছে, তবে তা নেপোলিয়নের জন্য নির্ভেজাল আশীর্বাদ বহন করেনি। লন্ডনে এবং ইউরোপের অন্যান্য রাজধানীতে বলাবলি হয় যে, এখানে এমন একটি পন্থার সূচনা করা হলো যার বদৌলতে ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্ত বর্ধিত হবে, এবং নেপোলিনীয় যুদ্ধের পর ফ্রান্সের উচ্চাভিলাষ সীমিত করার জন্য যেসব সন্ধিপত্র প্রণীত হয় এবং বিজয়ী পক্ষগুলি তাতে স্বাক্ষর করে সেগুলির সংশোধন করা হবে। কুইন ভিক্টোরিয়া অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে আপত্তি করেন যে ইংল্যান্ডকে প্রতারণা করা হয়েছে; কবডেনের সঙ্গে নেপোলিয়নের অবাধ বাণিজ্য নীতি বিষয়ে চুক্তি হওয়ায় স্বদেশে তার (নেপোলিয়নের) জনপ্রিয়তা বহুলাংশে হ্রাস পায়, তবু স্যাভয় কুক্ষীগত করায় ইংরেজদের মনে যে প্রতিকূল চাপের সৃষ্টি হয় তা দূর হয়নি। এই সময় থেকে ফরাসি সাম্রাজ্যের প্রতি ইউরোপীয়দের সদিচ্ছায় সংগত কারণে ধস নামতে শুরু করে। তখন নেপোলিয়নকে সবাই গণ্য করেন শান্তি বিঘ্নকারী, প্রচলিত রাষ্ট্র কাঠামোর ঘোরতর শত্রু, যিনি এমনকি বিকট ও ভাবাবেগতাড়িত ধর্মযুদ্ধের আচ্ছাদনে সব সময় চেষ্টা করেছেন ইউরোপীয় মহাদেশে ফ্রান্সের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য।

ইতালির সামগ্রিক মুক্তির ব্যাপারে যে অসুবিধাগুলি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিলো তার মধ্যে বৃহত্তম সমস্যা হলো ম্যাৎসিনি এবং তার প্রজাতন্ত্রী ষড়যন্ত্রের সংঘ। কাউন্ট ক্যাভুরের মতো রাষ্ট্রবিদের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে সমঝোতা কিংবা তাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কোনো প্রকার সহায়তা করার চেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন নিয়মিত সরকারের কর্মকাণ্ডে, নিয়মিত সেনাবাহিনীতে, কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের প্রচলিত নিয়মে এবং পক্ষগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য কিছু করায়। তবে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে এটুকু বলা যায় যে, ষড়যন্ত্র যতোই ঘৃণ্য, যতই অপরাধমূলক এবং নীতি হিসেবে বেপরোয়া হোকনা কেন, এতে ইতালির অসন্তোষের কথা দেশের বাইরে ব্যাপক প্রচার লাভ করতে পারে, দেশের অভ্যন্তরেও রাজনৈতিক উত্তাপ অন্তত প্রয়োজনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি করা যায়। ষড়যন্ত্র সমূলে উৎখাত কিংবা নিরুৎসাহিত করা হলে ইতালির আন্দোলনের প্রধান গতিশীল প্রভাবের উপর চরম আঘাত হানার সামিল হতো। ক্যাভুর এত বড় একটা হাতিয়ার অবহেলায় দু'পায়ে ঠেলে দিতে পারেন না। কঠোরতা অবলম্বন করে ষড়যন্ত্রকারীদের দূরে সরিয়ে রাখার তিনি পক্ষপতী ছিলেন। তাছাড়া প্রকাশ্যে আন্দোলনের অনুকূল কোনো পদক্ষেপ অস্বীকার করতে চান নি। কারণ এতে প্যারিস ও লন্ডনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। ক্যাভুর বরং ষড়যন্ত্রকারীদের প্রলুব্ধ করে দলে ভিড়াতে চেয়েছেন। ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা হয় ষড়যন্ত্র দিয়ে। লা ফারিনা'র ন্যাশনাল সোসাইটিতে ক্যাভুরের প্রভাবাধীন একটা প্রতিষ্ঠান ছিলো। এই প্রতিষ্ঠান তার মূল লক্ষ্যের

সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। কারণ এরা রাজতন্ত্রের অধীনে ক্ষমতা গ্রহণে রাজি। সর্বোপরি তিনি গ্যারিবল্ডিকে স্বীয় মতের অনুকূলে মত পরিবর্তন করতে সমর্থ হন। এই গ্যারিবল্ডি ১৮৫৯ সালের সমরাভিযানে একটি অনিয়মিত বাহিনীর (আলপসের শিকারী) অধিনায়ক হিসেবে সার্দিনিয়ার রাজার আনুষ্ঠানিক পোষাক পরিধান করেন। এই বাহিনী প্রধানত গঠিত হয়েছিলো ঐ মহান গেরিলা নেতাকে উত্তরাঞ্চলের রাজকীয় বাহিনীর কাজের জন্য। এই যে তার মধ্যে রূপান্তর ঘটলো তার গুরুত্ব অবিলম্বে টের পাওয়া যাবে।

উত্তরাঞ্চলে যখন এ ধরনের কাজ কারবার এগিয়ে চলেছে, তখন কুটিল ও সূক্ষ্ম প্রজাতন্ত্রী ষড়যন্ত্রকারী ক্রিসপি সিসিলির জনগণকে উত্তেজিত করছেন বুরবঁ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য। এই লোকটি ছিলেন ভয়ানক প্রকৃতির, ষড়যন্ত্র সুদূর বিস্তৃত, বহুকাল যাবৎ বিদ্রোহের সঙ্গে একাত্ম বিধায় দ্বীপটির মেজাজ থেকে অনুমান করতে হয় যে, প্রজাতন্ত্রীরা সফল হবে। ক্রিসপির দরকার একটা তরবারি। দরকার একজন সৈনিকের যে ষড়যন্ত্রে উস্কানি দিয়ে তা বিদ্রোহে পরিণত করতে পারবে, বিদ্রোহকে সংহত করতে পারবে যুদ্ধাবস্থায়, আর যুদ্ধ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারবে বিজয়। এদিকে ক্রিসপি লক্ষ্য করেন যে রোমান প্রজাতন্ত্রের রক্ষাকর্তা গ্যাবিবল্ডির তরবারি অলস পড়ে আছে, তাহলে তার দিকে তিনি আগ্রহের সঙ্গে দৃষ্টিপাত করতে পারেন? একবার সূচনা করা হলে ধারণাটা সকলের জন্য গোপন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়; সিসিলি এবং দক্ষিণাঞ্চলের মুক্তির জন্য গ্যারিবল্ডি।

বিজ্ঞ ক্যাভুরের হিসেবি মনে একটা ব্যাপার কাজ করছে। নতুন রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলের সংযুক্তি, সম্ভব হলে, একাধিক সারগর্ভ কারণে স্থগিত করা চলে। কারণ এই রাজ্য অতি সম্প্রতিকালে গঠিত হয়েছে এবং এখনো পুরো সুবিন্যস্ত হয়নি। নানা বিষয়ে দেশের দক্ষিণ ভূ-ভাগ উত্তরাঞ্চলের চেয়ে ভিন্ন। জাতিগত গঠন, সামাজিক বিন্যাস, শিক্ষার হার, এবং আধুনিক জীবনের প্রতি মনোভাবের ব্যাপারে এরা বিভিন্ন। দক্ষিণাঞ্চল দীর্ঘকালের কুশাসনের প্রভাব বর্বরসুলভ হয়েছে, অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির কুসংস্কারও তাদের কম ক্ষতি করেনি। রাহাজানির প্রকোপ ছিলো সীমাহীন, অপরাধ সংঘটনের জন্য গোপনে যে সঙ্ঘ গঠন করা হতো তা জাতীয় আত্মশক্তি বিনষ্ট করে দুরারোগ্য ক্যান্সারের মতো। এই পুঞ্জভূত নৈতিক ও রাজনৈতিক অমঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হয় চরম দারিদ্র্যজনিত দুর্দশা। জনগণের অলস স্বভাব এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জটিল পূর্ব-নজির তো রয়েছেই। দক্ষিণের অপরিচিত এইসব সমস্যা এখনি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করলে রাজধানী তুরিনের নতুন ইতালীয় সরকারের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যেতে পারে। তাই বলে সংযুক্তি স্থগিত রাখা সম্ভব নয়। সিসিলিতে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়েছে তার গতি রুদ্ধ করা ক্যাভুরের ক্ষমতায় কুলাবে না। আন্দোলনের জন্য সঠিক নির্দেশনা যোগানো যায়। তবে স্তব্ধ করা সম্ভব নয়। এই আন্দোলন বিপজ্জনক প্রজাতন্ত্রী আকার ধারণ করতে পারে কিংবা এক সময় সমঝোতা করতে পারে রাজতন্ত্রের সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে যা-কিছু আশা-ভরসা অবশিষ্ট রয়েছে, তার সবই নির্ভর করে গ্যারিবল্ডির উপর। ১৮৬০ সালের ৫ মার্চ ক্যাভুরের গোপন সমর্থনে সেই মহান অধিনায়ক সিসিলি অভিমুখে নৌপথে যাত্রা শুরু করেন। তার সঙ্গে রয়েছে পিয়েডমন্টিজ জেনারেলের আনুষ্ঠানিক পোষাক, আর তিনি রণধ্বনি বা জিগির হিসেবে ব্যবহার করেন "ইতালি ও ভিক্টর ইমানুয়েল।"

গ্যারিবল্ডির বিস্ময়কর সিসিলি অভিযানের কাহিনী, কিভাবে তিনি দুই ও বহুজাতিক স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা গঠিত দল নিয়ে শূন্য হাতে এবং প্রয়োজনীয় সমর সম্ভার ছাড়াই অবতরণ করেন মারসালায়, প্রচণ্ড আঘাত হানেন ক্যালাটাফিমিতে, যুদ্ধ করতে করতে ঢুকে পড়েন পালেরমোতে, এবং তিন মাস পর দ্বীপ থেকে বিতাড়িত করেন রাজকীয় বাহিনী, তা সত্যই যুদ্ধ নৈতিক নেতৃত্বের এক বিরাট দৃষ্টান্ত। তার প্রতিপক্ষ ছিল কাপুরুষোচিত এবং অদক্ষ অক্ষম, তাছাড়া সিসিলিবাসীদের সার্বিক সহানুভূতি ছিলো তার। এসব জানার পরও গ্যারিবল্ডি সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করতে আমরা বাধিত বোধ করেছি। সিসিলি জয় করার পর তিনি প্রণালী (straits) অতিক্রম করেন। বৃহৎ নৌ শক্তিগুলি তাকে বাধা প্রদান করতে পারতেন যে কোনো কারণে হোক, কোনো শক্তি তার গতি রোধ করেনি। অতঃপর নেপলসের মূল ভূ খণ্ডের ক্যালিব্রিয়ার এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ী অঞ্চলে এবং ক্যাম্পাগনার রৌদ্রকরোজ্জ্বল সমভূমিতে অভিন্ন বিস্ময়কর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। শত্রুরা কাপুরুষের অধম, বাহিনীগুলি বিগঠনের সম্মুখীন, আর সর্বত্র উৎফুল্ল জনতার অভিনন্দন। রাজা রাজধানী রক্ষার জন্যও কোনো চেষ্টা করেন নি, দ্রুত পলায়ন করেন গেইটায় (Gaeta)। নেপলস ছেড়ে দিয়ে যান শত্রুদের হাতে।

গ্যারিবল্ডির বিজয় ছিলো প্রায় সম্পূর্ণ। তবে এটা হয়তো ভাগ্যের ব্যাপার যে তিনি রোম ও ভেনিসে দস্যুতা করার স্বপ্ন দেখলেও টের পান যে গেইটা এবং ক্যাপুয়ায় বুরবঁ সেনা ছাউনির জন্য অস্ত্রযাত্রা সহজ হবে না। তবু ভলটারনোর তীরে তীব্র সংঘর্ষ হয়। গ্যারিবল্ডির লোকেরা বুঝতে পারেন নেপলসের বাহিনী ক্যাপুয়া থেকে আকস্মিক এবং প্রচণ্ড আক্রমণ করতে সক্ষম।

লাল কোর্তাদের যাদুকরী বিজয় তুরিনে শুরু থেকেই উদ্বেগও ভক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করা হয়েছে। একটা ঝুঁকি রয়েছে যে সিসিলি এবং নেপলসের স্বাধীনতার গোটা আন্দোলন ভেঙ্গে যেতে পারে শুধুমাত্র বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলে। আরো একটা বিপদ হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। গ্যারিবল্ডি পোপশাসিত রাজ্য আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাকে এ ব্যাপারে নিরস্ত্র করতে অনেক বেগ পেতে হয়। এবার তিনি রোম অভিমুখে অভিযান শুরু করবেন। যদি ফরাসিদের সঙ্গে কোনো প্রকার সংঘাত হয় তাহলে নেপোলিয়নের সঙ্গে সবচেয়ে কূটনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হবে। ঘটনা যে দিকেই গড়াক না কেন তা ইতালির স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুতর ক্ষতি করবে। নতুন ইতালি রাজ্যকে যদি শুরুতেই নেপলস ও সিসিলির জাতীয়তাবাদী উত্থান দমন করতে হয় তাহলে সেটা কোনো মঙ্গল বয়ে আনবে না। এটা কিছুমাত্র কম বিপর্যয়কর হবেনা যদি নেপোলিয়ন গ্যারিবল্ডিপন্থি ফুদেতার কবল থেকে পোপকে রক্ষা করার জন্য মধ্য ইতালিতে কঠিন সমরাভিযান শুরু করেন।

এই বিপদগুলি যে সাফল্যের সঙ্গে এড়ানো যায় তা শুধু গুরুতর সংকটকালে ক্যাভুর, গ্যারিবল্ডি এবং রাজা স্বয়ং অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন বলে নয়, নেপলসের জনগণ প্লেবেডমন্টের রাজতন্ত্রের প্রতি বিস্ময়কর পক্ষপাত প্রদর্শন করেন বলেও এটা সম্ভব হয়। অনন্যসাধারণ বিজ্ঞতার সঙ্গে ক্যাভুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের উচিত মধ্য ও দক্ষিণ ইত্যালিতে আত্মপ্রকাশ এবং লাল কোর্তাদের পোপীয় ভূ খণ্ডে পদার্পণ ও বাফেলা সৃষ্টির আগেই (একবার বাফেলার সৃষ্টি হলে আর সংশোধন করা যাবে না) গ্যারিবল্ডির সঙ্গে মোকাবিলায় উপনীত হওয়া। নেপোলিয়নের সামনে উপস্থাপিত কর্মসূচি

কার্যকর করা হয় যথাসময়ে এবং দ্রুততার সঙ্গে। দুঃসাহসী সের্নাকে ল্যামোর্রিসিয়ে এর অধিনায়কত্বে পোপপন্থির একটি বহুজাতিক বাহিনীকে ক্যাস্টেলফিডার্ডোতে (সেপ্টেম্বর, ১৮) ছত্রভঙ্গ করেন চিয়ালডিনি, এই জোড়াতালি দেয়া বাহিনীর স্বাত্মসমর্পণের পর মধ্য ইতালিতে প্রতিরোধের সকল ক্ষমতা চুরমার হয়ে যায়। একমাত্র এই ভূ ভাগটিই এখনও বিদেশী দখলদার শক্তির অনুকূলে এবং যাজকীয় নিয়ন্ত্রণের ধ্বজাধারী ছিলো। এবার তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা যেভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হলো তা যাদুবলেও জোড়া লাগানো যাবে না। অতঃপর তুরিনে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা হয় সরকারের কর্মপন্থা অনুমোদন এবং নেপলস ও সিসিলির সংযুক্তি বিষয়ে চাপ প্রয়োগের জন্য। ভোট গ্রহণ করা হলে দেখা যায় যে বিপুল ভোটাধিক্যে (২১ অক্টোবর) ক্যাভুর জয়ী হয়েছেন, পরাজয় বরণ করতে হয়েছে ম্যাৎসিনিকে। দক্ষিণাঞ্চলের প্রজাতন্ত্রকে সমভার এবং উত্তরাঞ্চলের রাজতন্ত্রকে উপেক্ষা করার বিপদ ইতিমধ্যে অতিবাহিত। যে ব্যক্তি ইতালির সমন্বয়সাধক প্রচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে নস্যাৎ করতে পারতেন, তিনি, যখন মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে এলো, সকল ব্যক্তিগত বেদনা, পূর্ব-সংস্কার এবং আত্মশ্লাঘা নীরবে হজম করলেন। গ্যারিবল্ডি যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে আন্তরিক প্রজাতন্ত্রী ছিলেন, তবু রাজার স্বার্থে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন, তার নামে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়েছেন, পরিধান করেছেন রাজার দরবারি পোষাক। উভয়ে বিজয়ীর বেশে নেপলসে প্রবেশ করেন। এই দু'জনের যৌথ, তথা সামগ্রিক প্রচেষ্টায় ইতালি একটি জাতিতে পরিণত হয়।

ঠিক এই সময়ে গ্যারিবল্ডি সুখ্যাতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছেন। তিনি জয় করেন এবং বিসর্জন দেন দক্ষিণ অঞ্চলকে। তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ একনায়ক, বর্জন করেন নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব। তাকে খেতাব, সম্পদ এবং পদকাদি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়, তিনি বিনয়ের সঙ্গে কোনো কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। প্যাম্পাসের* এই সন্তানের কাছে সভ্য শ্রদ্ধাঞ্জলির কোনো মূল্য নেই। তিনি জানতেন, বনের পাখিদের খাঁচার ভেতর কষ্টের সীমা থাকে না। মহীয়ান আড়ম্বরহীনতার সঙ্গে, কিছু শষ্যবীজ, কিছু শাক-শব্জী, কিছু লবণ, আর সামান্য ঋণ করা অর্থ নিয়ে তিনি প্রশংসামুখর ও অহংকারী নেপলসের দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়ান, জলপথে পাড়ি জমান ক্যাপরেরা নামক দ্বীপে, কঠোর পরিশ্রম এবং দৈন্যদশার মধ্যে জীবন যাপনের জন্য। সেখানে মেষপালক এবং ছাগলপালকদের মধ্যে ধ্যান করে সময় কাটান কি উপায়ে ইতালির সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জন করা যায়।

কারণ ভেনিসিয়া এবং রোম এখনো ইতালি রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। ভেনিসিয়া লাভ করতে হবে রণাঙ্গনে অস্ট্রিয়াকে পরাস্ত করে। রোম প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে ফ্রান্স। যদি ফরাসিদের কর্মপন্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন না ঘটে, কিংবা আকস্মিকভাবে ফরাসি শক্তির বিপর্যয় না ঘটে, তাহলে পোপের শাসন থেকে রোমের ফসকে যাওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না। ফলে ইতালির ঐক্যসাধনের চূড়ান্ত পর্যায় ইতালীয়দের প্রচেষ্টার উপর খুব বেশি নির্ভর করে না। ইউরোপীয় শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন এলে শুধু এই ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু ইতালির একার পক্ষে এই পরিবর্তন কার্যকর করা সম্ভব নয়। ভেনিস অধিকার করা কোনো অর্থেই ইতালীয় বিজয়ের ফসল ছিলো না, এটি অর্জন করা সম্ভব হয় ১৮৬৬ সালের এপ্রিল

---

* বৃক্ষবিরল অঞ্চল।

মাসে অতীব ঘনিষ্ঠভাব পরিচয় দিয়ে প্রাসিযাব সঙ্গে আক্রমণাত্মক এবং রক্ষণাত্মক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন কবা হয বলে। বাস্তবিক পক্ষে ইতালীযবা যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে উক্ত মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন ভাব সাজানো মুখবন্ধ। এই যুদ্ধে ইতালীয়রা কোনো বিজয় অর্জন করতে পারেনি। বরং তাবা পবাজয বরণ কবে জলে ও স্থলে। ভেনিসিযা জয় করা হয় সাডোয়ার যুদ্ধে বিজয়ের পুবস্কাব হিসেবে। জয় করে প্রাসীয় বাহিনী, যাব সংগঠক ছিলেন ফন রুন, অধিনায়কের দাযিত্ব পালন করেন মল্টকে। সবোপরি, এটি ছিলো বিসমার্কের সুদূর প্রসারী কর্মপন্থার স্থতিস্তাব।

চাব বছব পর সেই একই ভয়ানক প্রাসীয় বাহিনী যে বিজয় অর্জন করে তাতে রোম নগরী থেকে ফবাসি বাহিনী ফিরিয়ে নিতে হয়, ফলে রাজকীয় নতুন সরকার (ইতালির) কুইরিনালে প্রতিষ্ঠার পথ খুলে যায়। সেই সময় থেকে এখনো বহাল তবিয়তে আছে। এই সবকাব ইতালীয় জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিমূর্তি। কখনো স্বরগ্রাম উঁচু করে কখনো স্বর নিচু করে, চার্চকে জানাচ্ছে যাজকীয় দরবার এবং পোপের বিশ্বস্তর শাসন ব্যবস্থার প্রতি।

ভাবতে গেলে বিস্ময় বোধ হয় বৈকি, রোমান প্রশ্নের সমাধানে কেন এতটা সময় ব্যয় হলো। কিন্তু যদি আমরা ভেবে দেখি যে একাধিক অদম্য ব্যক্তি রাজনীতিতে তখন বিরাট ভূমিকা পালন করেন, তাহলে আমাদের বিস্ময়বোধ তাৎক্ষণিকভাবে কেটে যায়। এই ব্যক্তিরা রাজনীতিতে চূড়ান্ত অনমনীয় অভিমত পোষণ করতেন। নবম পিয়াসের উপদেষ্টা আন্তনেলির কাছে মনে হয়েছে যে কোনো পক্ষকে স্বেচ্ছায় কণামাত্র ছাড় দেয়া যাবে না যারা পোপীয় রাজ্যের 'সূচ্যগ্র মেদিনী' বিচ্ছিন্ন করতে চায়। অপরদিকে, মহান গ্যারিবল্ডির পক্ষে এটা সহ্য করা সম্ভব নয় যে, একজন পুরোহিতকে স্বীয় বহুজাতিক এবং পশ্চাদমুখীন কর্মপন্থা পরিচালনার জন্য ইতালির জনগণের মিলিমিটার পবিত্র ভূমি প্রদান করা হবে।

এই দুই চরমপন্থি নীতির মাঝখানে মধ্যমপন্থি মতামতও ছিলো। তৃতীয় নেপোলিয়নের একটি গুণ এই ছিলো যে উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী কোনো সমস্যাকে তিনি ঠাণ্ডা মাথায় এবং নিরাসক্ত দৃষ্টির সাহায্যে বিচার করতে পারতেন। তিনি একটা আপাত গ্রাহ্য যুক্তি উপস্থাপন করেন। তার অভিমত হলো পোপের রাজ্য অতিশয় অব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত বিধায় এর আয়তন হ্রাস করা দরকার। কিন্তু পোপীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করা উচিত। উপরন্তু পোপ রোমেই থাকবেন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তার সম্পদ ও অধিকারও টিকে থাকবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যেমন কট্টর যাজক সম্প্রদায়ের মনঃপূত ছিলো না, ইতালির দেশ প্রেমিকরাও তেমনি এটি পছন্দ করেন নি। তথাপি বলতে হয়, নেপোলিয়ন এতে ইউরোপের শক্তির ভারসাম্যের সঠিক বিচার উপস্থাপন করেন। ফলে দেখা যায়, ফরাসি সম্রাট উক্ত অভিমত থেকে বিচ্যুত হবার দরকার বোধ করেন নি।

ক্যাভুরও রোমান প্রশ্নের একটা সমাধানের কথা ভাবেন। ইহজাগতিক ক্ষমতার বিনিময়ে তিনি গির্জার জন্য পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ক্যাভুর ১৮৬১ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। এদিকে রোমান প্রশ্ন ইতালির সরকার এবং ইউরোপের বিবেককে যন্ত্রণা দিতে থাকে। অদম্য গ্যারিবল্ডি দুবার রোমের তার শত্রু পক্ষকে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়ার চেষ্টা করেন। দুবারই তার চেষ্টা ব্যর্থ করা হয়। অ্যাসপ্রোমন্টে (২৮ আগস্ট, ১৮৬২) তাকে পিয়েডমন্টের

• ইতালীর রাজবাসাদ।

অধিবাসীরা ফিরিয়ে দেয়, মেন্টানায় তাকে পরাস্ত করে ফরাসি বাহিনী (নভেম্বর ৩, ১৮৬৭) কিন্তু ইতালির রাজকীয় বাহিনী নিঃসহায় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চুপ করে বসে থাকে অথচ যে কোনো আক্রমণ থেকে পোপের রাজ্য রক্ষা করার দায়িত্ব এরা গ্রহণ করেছিলো।

এই দুর্ভাগা রণাঙ্গনে ইতালির রক্তপাতের বিনিময়ে নেপোলিয়নের বড় একটা লাভ হয়নি। নতুন ফরাসি রাইফেল বাহিনীর জেনারেল দ্য ফেইলি লিখেছেন, "Les fusils chassepot ont fait merveille। এই কথাগুলি একটি ভাবপ্রবণ জাতি সহজে ক্ষমা করতে পারেনি। কারণ তারা দেখেছে এবং সহ্য করেছে যে তাদের জীবিত সর্বশ্রেষ্ঠ বীর পরাজয় বরণ করেন অদ্ভুত ও গ্লানিকর পরিস্থিতির ভেতর। দেশের যাজক শ্রেণীর প্রতি সম্ভ্রমবশত নেপোলিয়ন একটা রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রীর সম্ভাবনা নাকচ করে দেন। অথচ উক্ত রাজ্য সৃষ্টিতে তার সহায়তা ছিলো, উক্ত রাজ্য তার কাছে গভীরভাবে ঋণী। এর ফলশ্রুতি দাঁড়ায় গুরুতর। কারণ ১৮৭০ সালে একটা সময় আসে যখন তার ইতালির সাহায্যের দরকার করে, এবং তাকে কোনো প্রকার সাহায্য করা হয়না। ফলে তাকে নিঃসঙ্গ নির্বান্ধবভাবে সশস্ত্র জার্মানির মোকাবেলা করতে হয়।

ইতালির বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী যদিও একই ভাষায় কথা বলে, তারা অভিন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, বাস করে একই সমতলে, অথচ তারা একে অপরকে শত্রু ভাবতে অভ্যস্ত ছিলো, কারো মধ্যে বিশ্বাস বা আস্থা বলতে কোনো বস্তু ছিলো না। এরা এক সময় পিয়েডমন্টের রাজতন্ত্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারপর প্রায় একশো বছর কেটে গেছে। শুরুর দশকগুলিতে ঐক্যবদ্ধ ইতালিকে মনে হয়েছে সর্বোচ্চ অনিশ্চিত তার অস্তিত্ব, তারপর সামলে নিতে হয়েছে কালপ্রবাহের অনেক ঝড়-ঝাপটা। দক্ষিণ এবং উত্তর অঞ্চলের মধ্যে যে বিশেষ প্রভেদ তার অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। রাজতন্ত্রের শেকড় এখন মাটির গভীরে প্রোথিত। শক্তিশালী, এমনকি প্রচণ্ড ইতালীয় জাতীয়তাবাদ অতীতকালের স্থানীয় পূর্ব-সংস্কারগুলি জ্বলন্ত চিতায় উঠিয়ে দিয়েছে। কোনো ইতালিবাসী এখন আর দেখতে চায় না যে তাদের দেশ প্রত্যাবর্তন করেছে সেই সময়ে যখন ইতালি ছিলো শতধা-বিভক্ত এবং অশক্ত।

ইতালির ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টার সাফল্য একটি কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইত্যালির রাজতন্ত্র একাধিক ক্ষেত্রে কিছুমাত্র সহায়তা পায়নি। অন্যান্য দেশে রাজতন্ত্র সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করা হয়। ইতালির রাজতন্ত্রের চারপাশে কোনো সুপ্রাচীন অভিজাততন্ত্রের ভদ্রলোকদের দেখা যায় নি, দীর্ঘকালীন কোনো সুখ্যাতি ইতালির রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করেনি, চোখ ধাঁধানো কোনো বিজয়ে এই রাজতন্ত্রের প্রজাদের বিশেষভাবে উল্লসিত হবার কোনো সুযোগ ঘটেনি। ইতালীয়রা যখন ভাবতে বসে তাদের দেশের ঐক্যসাধন বিষয়ে, তখন তাকে অবশ্যই মানতে হয় যে ফ্রান্স এবং প্রাশিয়া সাহায্য না করলে তা অখণ্ড ইতালি গঠন করতে পারতো না। ইতালির নৌবাহিনী বিরাট পরাজয় বরণ করে লিসা-য়, তাদের স্থল বাহিনী পরাস্ত হয় কাস্টোজ্জায়। অন্যান্য দেশে, দেখা গেছে, গির্জাসম্প্রদায় ব্যতিক্রমহীনভাবে তাদের যাবতীয় প্রভাব নিয়োজিত করে রাজতন্ত্রের অনুকূলে। অথচ ইতালিতে তারা ছিলো রাজতন্ত্রের প্রতিকূলে, কারণ এই রাজতন্ত্র তাদের পরম্পরাগত অধিকার খর্ব করে, হলিসি-কে (Holy see)* বঞ্চিত করে রাজনৈতিক স্বপ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রাধান্য থেকে। যাজকীয় অনুশাসন Non Expedit দ্বারা (১৮৬৪-১৯০৩)

---

* যাজকীয় আসন বা পরিষদ

রাজ্যের রাজনীতিতে ক্যাথলিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। খোদ রোমে বিচ্ছেদনীতির (schism) প্রবণতা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। পোপ নিজেকে ভ্যাটিকানে কয়েদি হিসেবে গণ্য করতেন। দু'টি দরবার সর্বদা মারমুখী বিবদমান অবস্থায়, কালো ও সাদারা একই শহরে বাস করলেও, অত্যন্ত দূরত্ব বজায় রেখে ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায়তলে বাস করেছে।

তথাপি এই রাজতন্ত্র টিকে যায়। রাজ্যের প্রারম্ভিক দশকে একদল সুখ্যাত ও বিবেকবান রাজনীতিজ্ঞ দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুলকে নানাভাবে সাহায্য করেন। রিসরজিমেন্টো আন্দোলনে সৃষ্ট প্রবল উৎসাহ কাজে লাগিয়ে এই রাষ্ট্রনীতজ্ঞরা ক্যাভুর কর্তৃক সূচিত মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিয়োজিত হন। ইতালি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে কয়েকটি মহৎ মানুষের নাম : বিকাসলি, লা মারমোরা, লাঞ্জা, সেল্লা, মিনেটি, স্পাভেন্টা। ইতালি রাষ্ট্র গঠন পরে এদের অবদান ছিলো সবচেয়ে বেশি। রাজ্য গঠনের জটিল ও কঠিন দায়িত্বগুলি তারাই পালন করেন। ১৮৭৬ সালে যখন ক্ষমতা 'দক্ষিণ' থেকে 'বামে' হস্তান্তরিত হয় তখন রাজ্যের ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত। ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যনীতির দৃষ্টান্ত এবং রেল যোগাযোগের সূচনা রাজনৈতিক ইউনিয়নের অনুকূলে অনস্বীকার্য অর্থনৈতিক যুক্তির কাজ করে। বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁক যতটুকু দেখা গেছে, যদি তার চেয়েও প্রবল হতো, তবু বাষ্প এবং জলশক্তি পুরাতন শুল্ক নীতির প্রতিবন্ধকতায় প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করা যেত না। তুসকানরা পিয়েডমন্টিজদের থেকে কিংবা ভেনিসবাসীদের থেকে, অথবা নেপলসের লোকেরা উত্তরাঞ্চলের লোকদের থেকে যতই ভিন্ন হোন না কেন, সাদাসিধা ও নির্ভুল অর্থনৈতিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে তারা বাধ্য হন একতাবদ্ধ থাকতে, বাস করতেও বাধ্য হন অভিন্ন শাসন ব্যবস্থার অধীনে।

ঐক্যের পথে জার্মানি

জার্মানির জাতীয় ঐক্যের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। অটো ফন বিসমার্ক, যে পরিস্থিতিতে তিনি ক্ষমতা লাভ করেন। প্রুসীয় পার্লামেন্টের কবল থেকে প্রুসীয় বাহিনীর মুক্তি। ফরাসি উদারতন্ত্রের পরাজয়। জার্মান সাম্রাজ্য সংস্কারে অস্ট্রীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা। ১৮৬৩ সালে পোলদের বিদ্রোহ। রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী বিসমার্কের কব্জায়। দিনেমারদের ডিউক শাসিত রাজ্যসমষ্টি। ১৮৬৪ সালের যুদ্ধ এবং ভিয়েনা সন্ধি। ১৮৬৫ সালে ডিউক শাসিত রাজ্যগুলিতে অস্ট্রো-প্রুসীয় যুগ্ম শাসনের অবসান। তৃতীয় নেপোলিয়ন। তার স্বীকৃতি। তার উদারনীতি। তার মেক্সিকোয় সমরাভিযান। সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান। ফরাসিদের আত্মশ্লাঘার অবক্ষয়। বিয়ারিৎসে বিসমার্ক কর্তৃক নেপোলিয়নকে পুনরায় আশ্বাস প্রদান। জার্মানিতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রস্তাব। সাত সপ্তাহের যুদ্ধ। বিসমার্ক কর্তৃক বিজয়ের নমনীয় ব্যবহার। প্রাগ সন্ধি। ফ্রান্সে ক্রোধ। নতুন জার্মান শাসনতন্ত্র। জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে ইতালি ও ফ্রান্সের তুলনা।

এটা ভাবাই যায় না যে ইতালীয় জাতীয়তাবাদের বিজয় জার্মানির ঐক্য সাধনের আশার পুনরুজ্জীবন ঘটাবে না। জার্মানির ঐক্য নির্মমভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছিলো উদারনৈতিক বিপ্লবের ধ্বংসাবশেষে। পিডমন্টের ক্ষুদ্র সামরিক রাজতন্ত্র ইতালির জন্য যা করে, ব্যাপক ও বৃহত্তর এবং অধিকতর শক্তিশালী প্রুসীয় রাজ্য নিশ্চয় তা অতি সহজে জার্মানির জন্য করতে পারে। এই চেতনা অত্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এবং যদিও একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইতালীয় এবং জার্মান সমস্যার মধ্যে প্রভেদ ছিলো তবে উভয় ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়া ছিলো শত্রুদেশ। ইতালিতে অস্টিয়রা ছিলো বৈদেশিক। কিন্তু জার্মানদের মধ্যে তারা কখনো বহিরাগত বলে গণ্য হবে না। বরং অস্ট্রীয়রা তাদের অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস, তাদের যৌথ ঐতিহাসিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উপরন্তু অনেকের কাছে, অন্তত দক্ষিণ অঞ্চলে যারা বাস করেন তাদের কাছে, প্রুসীয়দের চেয়ে অস্ট্রীয়রা নিকটতর। অনেক জার্মান ভদ্রলোক, যারা অস্পষ্টভাবে জার্মানির ঐক্য কামনা করেন, তারা অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের কথা উঠলে আতংকে শিউরে ওঠেন, অনেকে জার্মানিকে একটি জাতিতে পরিণত করার দাবি করেন, তবে এর জন্য যে বিরক্তিকর কিন্তু প্রয়োজনীয় মূল্য দিতে হবে তার থেকে চোখ সরিয়ে রাখতে চান। ষাটের দশকে গণভোটের ব্যবস্থা করা হলে দেখা যেত যে, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পড়তো না, জার্মানির প্রুসিয়ার গোড়ালির নিচে যাওয়ার পক্ষেও জনগণের রায় পাওয়া যেত না। একমাত্র নির্দয়ভাবে গণমত অগ্রাহ্য করার জন্য প্রস্তুত, প্রস্তুত জার্মানিকে বিভক্ত করার জন্যও, ভ্রাতৃ হত্যার আতংক মোকাবেলা করার জন্যও প্রস্তুত কোনো সরকার এ ধরনের কাজে হাত লাগাতে পারেন। আবার বিস্তারিত সামরিক এবং কূটনৈতিক প্রস্তুতির দরকার এ ধরনের কাজে সাফল্য অর্জনের জন্য।

মহাপরাক্রমশালী, প্রায় টাইটানিক ব্যক্তিত্ব বিসমার্ক বলতেন কোনো ব্যক্তির একশো হাজার টাকার এবং পাঁচ হাজার বোতল শ্যাম্পেন পান করার আগে মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়। তাহলে দেখা যায় বিসমার্ক ছিলেন এইসব আবশ্যিক দ্রব্যাদির জন্য প্রকৃতির উদার জবাব। এই অসাধারণ ব্যক্তিটির বিশেষ গুণ এই ছিলো যে তিনি খুটিনাটি ব্যাপারে একেবারে নমনীয় হলেও তিনি গোড়াতেই জার্মান সমস্যার ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে সমর্থ হন, এবং স্বীয় পন্থা কার্যকর করার জন্য বিবেকের ব্যাপারটা মোটেই আমল দেননি। ১৮৬২ সালে ক্যাডুরের মৃত্যুর এক বছর পর তিনি ডিজরেলিকে বলেন যে, প্রথম সুযোগেই তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন। "ঐ ব্যক্তিটি সম্পর্কে সাবধান", বলেছেন ঐ বিজ্ঞ ইহুদি, "তিনি যা বলবেন তাই করবেন।" বিসমার্ক পুরো চার বছর পর যুদ্ধের সূচনা করেন। প্রথম থেকেই তিনি এই যুদ্ধকে বিবেচনা করেছেন স্বীয় বৃহৎ মতলব হাসিলের জন্য আবশ্যিক।

তার অসাধারণ প্রশাসন টিকে থাকে ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮৯০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। এই প্রশাসন চলাকালে যে শাসনতান্ত্রিক বিবাদের সূচনা হয় তার গুরুত্ব জাতিসমূহের ইতিহাসে বহুকাল অনুভূত হবে। প্রথম উইলিয়াম তার সহোদরের শারীরিক অযোগ্যতার কারণে ১৮৫৮ সালে রিজেন্ট হিসেবে প্রুশিয়ার শাসন কার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রথম উইলিয়াম ছিলেন সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ, কর্তব্যপরায়ণ প্রুসীয় সৈনিক। যিনি বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জনপ্রিয় আন্দোলন সম্পর্কে বদ্ধমূল বিরূপতা পোষণ করতেন। এই বয়োঃবৃদ্ধ সার্বভৌম নৃপতির মধ্যে জার্মান ভাববাদের বাষ্পও ছিলো না। তিনি শুধু চাইতেন যে প্রুসিয়া শক্তিশালী রাষ্ট্র হবে এবং ভবিষ্যতে আর কখনো সামরিক শক্তির ঘাটতির জন্য গ্লানি হজম করতে বাধ্য হবে না। আলবার্ট ফন রুনের মধ্যে রাজা একজন মনের মতো সমরমন্ত্রী খুঁজে পান। দু'জনে মিলে একটা পরিকল্পনা তৈরি করেন প্রুসীয় বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠনের জন্য। তারা রেজিমেন্টের সংখ্যা বাড়াতে বলেন, আর আদেশ দেন যে সৈনিকদের এখন থেকে দু'বছর নয়, তিন বছর বাহিনীতে কর্তব্য পালন করতে হবে। প্রুসীয় পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদ এই বিল ছুড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু কোনো পক্ষ রণে ভঙ্গ দিতে রাজি নয়। অচলাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়, পার্লামেন্ট সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, ফন রুন এবং তার প্রভু শেষ পর্যন্ত নতুন নতুন রেজিমেন্ট গঠনের কাজে হাত দেন, যেন সরবরাহের পক্ষে পার্লামেন্ট ভোট দিয়েছে। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত কম রক্ষণশীল এবং সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের জন্য অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংসদ ক্ষমতায় আসে। এখন আর বিরোধটা দু'বছর না তিন বছর, তা নিয়ে নয়। দাবি ওঠে যে ইংল্যান্ডের মতো প্রুসিয়াতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকবে সংসদের হাতে। সেনাবাহিনী, অর্থব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতি সবই জনগণের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হবে। জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা তাদের ইচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। সংসদের এই দাবি যদি মেনে নেয়া হতো তাহলে জার্মানি এবং ইউরোপের ইতিহাস একেবারে ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতো।

এই দাবি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় বিসমার্ক হস্তক্ষেপ করেন বলে। নতুন মিনিস্টার ফন রুন কর্তৃক আহূত হয়ে প্রেসিডেন্ট রাজার বুকে সাহসের সঞ্চার করেন (তিনি সিংহাসন ত্যাগের জন্য প্রায় তৈরি হয়েছিলেন), মোকাবেলা করেন রাজনীতিবিদদের কড়া-কাপটার এবং নিন্দার ঝড় সত্ত্বেও দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, প্রুসীয় বাহিনী এতটা পবিত্র যে তা কিছুতেই আইনসভার নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়া যায় না। ১৮৬৬ সালে

সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ সাঙ্গ করা হলে পার্লামেন্টের কাছ থেকে ইনডেমনিটি আদায় করেন, কারণ উপযুক্ত কর্তৃত্ব ছাড়াই অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছিলো। তখন এবং পরবর্তীকালে কোনো সময়ে বিসমার্ক ইংরেজদের রীতিনীতি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অস্ট্রীয় যুদ্ধে বিরাট বিজয় অর্জনের পর তিনি কোনো প্রকার ঝুঁকি ব্যতিরেকে পরামর্শদাতাদের সুপারিশ করেন। তাছাড়া তিনি জার্মানির শাসনতন্ত্রে এই নীতি অন্তর্ভুক্ত করেন যে, যদিও পার্লামেন্ট নতুন কর আরোপ করার জন্য ভোট দিতে পারবে, আইন বিষয়ে আলোচনা করতে পারবে, তবে তিনটি বিষয় তাদের অধিকারের বাইরে থাকবে। তারা সেনাবাহিনীর আকার নিয়ে কথা বলতে পারবে না, কর্মপন্থাও প্রণয়ন করতে পারবে না, এবং ইংল্যান্ডের মতো, মন্ত্রীসভা যেমন গড়তে পারবে না, তেমনি বিগঠনও করতে পারবে না। এই নীতিগুলি হোহেনজোলার্ন সাম্রাজ্যের শেষ দিনগুলি পর্যন্ত জার্মানির শাসনতান্ত্রিক আচরণের আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

এরকম অনুমান করলে ভুল করা হবে যে প্রুসিয়ায় দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি অক্ষমতার জন্য। অধিকাংশ জার্মান উদারবাদীরা ছিলেন খুবই শিক্ষিত এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। তারা জাতির শক্তি বৃদ্ধি আবশ্যিক মনে করতেন ঠিকই, আবার সমান গুরুত্বের সঙ্গে জাতীয় মুক্তির কথা ভাবতেন। ক্রাউন প্রিন্স তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তার বুদ্ধিমান, উদ্যমী কিন্তু অভিজ্ঞ ইংরেজ স্ত্রীও ছিলেন তাদের অনুকূলে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এদের সমর্থন করে। যারা স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের ধ্বজাধারী তাদের প্রতি ইংরেজদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে আহরিত মিসাইল ছুড়ে মারার যোগ্যতাও মিত্রদের ছিলো। তবে প্রুসিয়া ইংল্যান্ড নয়। প্রুসিয়ার সামন্ততান্ত্রিক প্রথা অধিকতর শক্তিশালী, অধিকতর সমরপ্রিয় এবং কারখানা প্রায় বলতে গেলে চালুই হয়নি, ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক পেছনে পড়ে আছে।

এইসব পৃথক পৃথক কারণে বিসমার্কের বিচারে জার্মানিতে উদারতন্ত্রবাদ শক্তিহীন, এদের নিরাপদে গভীর গ্লানিতে নিমজ্জিত করা যায়, অধিকারচ্যুত করা যায় আরো সহজে। ইংরেজদের তিনি পছন্দ করতেন, তাদের প্রতি সম্ভ্রমবোধও কাজ করেছে তার মধ্যে। কিন্তু ইংরেজদের সরকার যদি প্রুশিয়ার মাটিতে প্রতিস্থাপন করা হয় তাহলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে অস্ট্রীয় যুদ্ধ সূচনা করার আগে দেশ থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে ইংরেজদের প্রথার প্রতি অনুরাগীদের, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা করতে হবে তাদের যারা জার্মানিতে স্বাধীনতার জিগির তোলে। এ ক্ষেত্রে বিসমার্ক পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন এবং তাঁর সাফল্য বহুকাল টেকে। জগতের ইতিহাসে তার সাফল্য চিহ্নিত হয়ে আছে। তিনি দেশকে সামরিক এবং নৌ শক্তিভিত্তিক উন্নতির পক্ষে পরিচালনার জন্য সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রই শক্তি। আর ক্লজভিৎসের মতে যুদ্ধ হলো ভিন্ন উপায়ে রাজনৈতিক পরিকল্পনা চালু রাখা। লক্ষ্য ও উপায় এককভাবে এবং পরস্পরের উপর ক্রিয়া করেছে। কর্মপন্থা যতোই উচ্চাভিলাষী হয়েছে সমর সম্ভার তত বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার সমর সম্ভার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মপন্থার ঘটেছে সম্প্রসারণ। ইউরোপ যে সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হয়েছে তা দেখতে হবে ১৮৬২ সালের উদারতন্ত্রবাদের পরাজয়ের ফলশ্রুতি হিসেবে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যতদিন বিসমার্কের নিয়ন্ত্রণে ছিলো ততদিন শান্তি ছিলো নিরাপদ। এরপর বিপজ্জনক রূপ নেয়। পুরস্কার স্ফীত হয়, ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, শেষ পর্যন্ত একটা ভাঙনরোধ জাতির পক্ষে বিনাশ করা

সম্ভব হয় যে অদৃষ্টের অধম্য শক্তি, কিংবা মূল্যবান কোনো লক্ষ তাদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে বিশ্ব শক্তি হবার জন্য কিংবা সমূহ পতনের জন্য।

বিসমার্কের প্রশাসনের শুরুতেই একটা প্রতিবন্ধক তার গোটা পরিকল্পনার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু হুমকিটা ভয়ানক বলেই বোধ হয়, কারণ ব্যাপারটা ছিলো প্রচ্ছন্ন। অস্ট্রিয়া সার্বভৌম নৃপতিদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে ফ্রাংকফোর্টে, জার্মান ফেডারেল শাসনতন্ত্র সংস্কারের জন্য একটি পরিকল্পনা বিবেচনা করে দেখতে। প্রথম নজরে মনে হয় এর চেয়ে সুন্দর প্রস্তাবের কথা ভাবা যায় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে জার্মান শাসনতন্ত্র ছিলো জগতের জঘন্যতম বস্তু। এই শাসনতন্ত্র আগাগোড়া মেরামত করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে আবার কেউ বিসমার্কের অধিক সচেতন ছিলেন না ; কিন্তু মেরামতের কাজটা যদি অস্ট্রিয়ার নির্দেশনায় এবং প্রুসিয়ার সহযোগিতায় সম্পাদিত হয় তাহলে তার একটিমাত্র ফলই দাঁড়াতে পারে। জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব হবে সুরক্ষিত। অতএব বিসমার্কের সুচিন্তিত অভিমত হলো ফ্রাংকফোর্টে প্রুসিয়ার কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ ঠিক হবেনা। তাছাড়া অস্ট্রিয়ার পরিকল্পনা শুরুতেই ব্যর্থ করে দিতে হবে এবং প্রুশিয়ার প্রভাবে জার্মানির শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পথ নিষ্কন্টক করতে হবে। প্রুসিয়ার বৃদ্ধ রাজা এসবের তাৎপর্য তৎক্ষণিকভাবে ধরতে পারেন না। দীর্ঘ সংঘর্ষের পর বিসমার্ক এই মর্মে রাজার সম্মতি আদায় করেন যে অস্ট্রিয়ার সরকারের নিমন্ত্রণ তিনি সৌজন্যের অপেক্ষা না করে খারিজ করে দেবেন। কারণ নিমন্ত্রণ বিলি করেছেন একজন রাজা সম্রাটের নির্দেশক্রমে। লক্ষ্য জার্মান জনগণের সার্বিক উন্নতির জন্য একটা উপায় অনুসন্ধান।

যে বছর অস্ট্রিয়াকে চোখ রাঙানি সহ্য করতে হয় সেই বছর রুশ পোল্যান্ডে গণজাগরণ ঘটে। এটি আন্তর্জাতিক রাজনীতি যেভাবে প্রভাবিত করে তার গভীরতা ও বিস্তার সামান্য নয়। অবশ্য বিদ্রোহ অত্যন্ত দ্রুততা ও নির্দয়তার সঙ্গে দমন করা হয়। যাহোক, পোলদের বিক্ষোভের ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপ কখনো নিরুত্তাপ ছিলো না। কোনো মানবিক এবং সভ্য সরকার মনে করেন নি যে এ ব্যাপারে হিমশীতল ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা যায়। ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে এমনকি অস্ট্রিয়ায় জনগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কারণ তারা দেখতে পায় যে একটা সাহসী জনগোষ্ঠী নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের জাতীয় জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বৈদেশিক এবং দানবীয় শাসনের অধীনে টিকিয়ে রাখার জন্য। এই তিনটি দেশের সরকার সম্মত হয় যে রাশিয়াকে আহ্বান জানাতে হবে বিদ্রোহীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন এবং পোলিশ হোম রুল প্রতিষ্ঠার জন্য। পোলিশ প্রশ্নে প্রুসিয়ার কাছে অতিরিক্ত আশাবাদী কিছু দাবি করা হয়নি। কিন্তু বিসমার্কের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে উক্ত তিন সরকারের আহ্বান অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নাকচ করে দিতে হবে। কারণ তার অস্ট্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা এগিয়ে নেয়ার এই তো বিরল সুযোগ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রুসিয়া জার সরকারকে বিপদে ফেলার যে কোনো প্রচেষ্টা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। জার সরকার পোলিশ সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনার সুযোগ পাবে। এটা এমন একটা সময় যখন সর্বত্র প্রবল উত্তেজনার জোয়ার চলছে, সম্ভাব্য সকল পক্ষ রুশ সরকারের নিন্দায় মুখর হচ্ছে নজিরবিহীন ক্রোধের প্রকোপে, তখন মাত্র একটি শক্তি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়, এই শক্তি তিন সরকারের সঙ্গে সুর মেলাতে শুধু অস্বীকার করেনা, রুশদের সঙ্গে একটা সমঝোতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে। উক্ত চুক্তির সারাংশ এই যে হাঙ্গামাপ্রবণ গোষ্ঠীকে

শায়েস্তা করা উভয় দেশের স্বার্থের অনুকূল। এই সময় থেকে বিসমার্ক রাশিয়াকে মিত্র হিসেবে পান। এটি ছিলো তার কর্মপন্থার প্রধান স্তম্ভ। আর তার কর্মপন্থা সাফল্যের জন্য উক্ত স্তম্ভের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এখন তিনি নিশ্চিত বোধ করেন যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে, এমনকি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (তার বৃহত্তর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তা করতেই হবে), প্রুসিয়া পূর্ব সীমান্তে নিরাপদ বোধ করতে পারবে।

তাদের বন্ধুত্ব একটি কারণে অতিরিক্ত দৃঢ়তা লাভ করে। যেহেতু তাদের এই বন্ধুত্বের ভিত্তি ছিলো নির্যাতনের জন্য সমমনোভাবাপন্ন ভ্রাতৃসঙ্ঘ বিশেষ। সেন্ট পিটার্সবুর্গের মতো বৃটেনেরও পোল সমস্যা ছিলো। আইরিশ সমস্যা যেমন ইংরেজ উদারপন্থিদের বিবেক দংশন করেছে, জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলে, এবং যেখানে জার্মান উদারপন্থিরা মিলিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে পোলদের বিক্ষোভের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার মনোভাব লক্ষ করা গেছে। তারা ভেবেছেন কিভাবে পোলদের যন্ত্রণা লাঘব করা যায়। কিন্তু পোল জনগণের প্রতি অনুরাগ পোমেনারিয়ান ভদ্রলোকদের কাছে ছিলো অত্যন্ত বাজে ব্যাপার। এদের কাছে পোলিশ সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো পোলদের প্রুসীয়তে রূপান্তরিত করা, এবং তা করতে হবে অনতিবিলম্বে, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি মুছে ফেলতে হবে। তাদের ঐতিহ্য হতে হবে বিস্মৃত উপরন্তু যে উদারবাদ তাদের পোলিশ বৈশিষ্ট্য কিছুটা টিকিয়ে রাখার জন্য তৎপর তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পোলদের আত্মীকরণ করতে হবে। এসব কাজে বিসমার্ক রুশদের মতোই বাইরের হস্তক্ষেপ বিন্দুমাত্র সহ্য করতে চাইতেন না। ১৮৬৩ সালে তিনি জেনারেল ফ্লিউরিকে বলেন, "আমি জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি, তবু আমাদের অবস্থান নিয়ে আলোচনার জন্য ইউরোপীয় সম্মেলন হবে সেটা আমি সহ্য করবো না। প্রয়োজনে আমরা রাইন অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করবো।" বাস্তবিকই, রাশিয়া এবং প্রুসিয়া যতদিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকেছে, পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে, ততদিন পোলরা মুক্তিলাভ করেনি, তাদের মুক্তির বিন্দুমাত্র আশা থাকেনি।

ইত্যবসরে দিনেমার উপদ্বীপে একটি বিবাদ ঘনীভূত হতে থাকে। এই বিবাদ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুযোগ এনে দেবে বিসমার্ককে, প্রুসিয়া সুযোগ পাবে কিয়েল ক্যানাল তৈরির, ঐক্যবদ্ধ জার্মানির বৃহৎ নৌ শক্তি হবার সুযোগ সৃষ্টি করবে। স্লেসভিগ-হোলস্টেন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে স্মৃতি শক্তির উপর অযথা বোঝা চাপানো সংগত মনে করি না। তবে ব্যাপারটার সারাংশ হলো, দু'টি ডিউক শাসিত রাজ্য, জার্মান সাম্রাজ্যের ভেতরে হোলস্টেন এবং বাইরে স্লেসভিগ, ১৪৯০ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ডেনমার্কের রাজা শাসন করে আসছেন। বর্তমানে এই দুটি ডুচি নিয়ে বিসংবাদের সূত্রপাত। ডেনমার্ক আগের মতোই ডুচি দু'টির উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়। এদিকে জার্মানি চায় কেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত করতে। প্রুসিয়াও চায় ডুচি দুটি কব্জা করতে। তবে তাদের হাতে দলিল জাতীয় কোনো চিরকুটও নেই। ঐতিহাসিক কিংবা আইনি দাবিও তারা করতে পারেনা। কিন্তু তারা অঞ্চল দুটি দখল করে। যে প্রক্রিয়ার ভেতর এই কাজটি করা হয় তা বিসমার্ক নিজেই তার রাজনৈতিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে দাবি করেছেন। এই দাবি ন্যায়সংগত বলে মনে করা যায়। বাস্তবিকপক্ষে, তার কৌশলের বৈশিষ্ট্যসূচক এর চেয়ে বড় কোনো উদাহরণ উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

তাই বলে এটি কোনো নতুন বিবাদ নয়। ১৮৪৮ সালে গোটা জার্মানি ক্রোধে ফেটে পড়ে যখন খবর পায় যে উত্তরাঞ্চলের শেষ প্রান্তের স্কেন্ডিনেভিয়ান ডুচি স্লেসভিগ দিনেমাররা তাদের রাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছে এবং চূড়ান্তভাবে সংযোগ ছিন্ন করছে জার্মান ডুচি হোলস্টেনের সঙ্গে (দেশের আইনবিদ ও ঐতিহাসিকদের মতে এটি করা হলে তা আর পাল্টানো যাবে না)। সেই বিপ্লবের বছরে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, সে বছরও সবার জানা ছিল এ ব্যাপারে মত কি হবে। ডুচি দুটিই মাত্র একজন শাসকের অধিকারে থাকবে, এবং ডেনমার্কের সপ্তম ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর (এর কোনো পুত্র সন্তান ছিলো না) একজন জার্মান প্রিন্স শাসন করবেন। জার্মান ডায়েট সহজেই এ ধরনের একজন প্রিন্সের খোঁজ পায়। এর নাম ডিউক অব অগস্টেনবার্গ। একে আমরা পুরাতন দাবিদার বলতে পারি।

কিছুকাল বিভ্রান্তিকর এবং নিষ্পত্তিহীন সংঘর্ষ চলে। অতঃপর বৃহৎ শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের দরুন সংঘর্ষ বন্ধ হয়। ১৮৫২ সালে 'লন্ডন চুক্তি' অনুসারে সাব্যস্ত হয় যে সপ্তম ফ্রেডারিকের উত্তরাধিকারী হবেন গ্লুকস্‌বার্গের ক্রিশ্চিয়ান, তিনি এক যোগে ডেনমার্ক এবং ডুচি দুটি শাসন করবেন। মনে হলো এই বাজে সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেছে, যেহেতু প্রুসিয়া এবং অস্ট্রিয়া চুক্তির বিধানগুলি মেনে নিয়েছে। পুরাতন দাবিদার সম্পর্কে বলতে হয় তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে দাবি প্রত্যাহার করেন।

বিবাদের কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। কোপেনহেগেনে জনপ্রিয় অনুভূতির প্রবল জোয়ার শুরু হয়ে যায় দিনেমার সীমান্ত এইডার নদী পর্যন্ত সম্প্রসারণের অনুকূলে, এবং জার্মানিতে প্রবল ক্ষোভের মুখে, ডুচিগুলিতে স্থানীয় সুবিধা ব্যাপারে হস্তক্ষেপের দাবি ওঠে। ডেনমার্ক এবং জার্মানি যখন পরস্পরের প্রতি অমার্জিত অঙ্গভঙ্গি করছে, এবং যে আগুন নিভে গিয়েছে বলে বোধ হয়েছিল, দেখা গেল তা গনগনে শিখা ছড়াচ্ছে, তখন সপ্তম ফ্রেডারিক (৩০ মার্চ, ১৮৬৩) একটা শাসনতন্ত্র জারি করেন, এতে স্লেসভিগকে রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, হোলস্টেনকে প্রদান করা হয় স্বায়ত্তশাসন। এই সমাধানকে অত্যন্ত বিবেচনাপূর্ণ মনে করা চলে। শেষ পর্যন্ত ভার্সাই সন্ধি নীতিগতভাবে এই সমাধানই আরোপ করেছিলো। এতে দিনেমার ভাষী ডুচিকে বরাদ্দ করা হয় ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন। জার্মানিতে এই সমাধান গভীর আর্তনাদ ধ্বনির সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। উক্ত সমাধানে পৌঁছার জন্য যেহেতু হোলস্টেনের মতামতের তোয়াক্কা করা হয়নি, অতএব সে জার্মান ডায়েটের (Diet) কাছে আবেদন করে। এবং যেহেতু ডায়েট লন্ডন সন্ধির কোনো পক্ষ নয়, অতএব সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে বিগঠনের অযোগ্য ডুচিগুলিকে ডেনমার্ক রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে একজন জার্মান প্রিন্সের জন্য প্রিন্সিপালিটিতে রূপান্তরিত করতে হবে। এবারও প্রার্থীর ঘাটতি দেখা গেল না। পুরাতন দাবিদারের পুত্র (যেহেতু তিনি পিতার প্রত্যাহারের জন্য কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতার মধ্যে নেই) পুনরায় তার রাজবংশের দাবি পেশ করেন।

১৮৬৩ সালের ১৫ নবেম্বর ডেনমার্কের সপ্তম ফ্রেডারিক মৃত্যুবরণ করেন। লন্ডন সন্ধির শর্তানুসারে নিয়ম মাফিক নবম ক্রিশ্চিয়ান সিংহাসনে বসেন। ইনি জনপ্রিয় দাবির চাপে রাজা ফ্রেডারিকের শাসনতন্ত্র কার্যকর করেন।

ঠিক এই সময়ে বিসমার্ক পর পর কয়েকটি কূটনৈতিক অভিযান পরিচালনা করেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, ফলে ডুচি দুটি লাভ করতে সক্ষম হন। ডায়েটের সঙ্গে চলার কোনো

ইচ্ছে তার ছিলো না। লন্ডন সন্ধির স্বাক্ষরদাতা হিসেবে তার স্থলে ক্রিশ্চিয়ানকে স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত। নতুবা ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ জন্মাতে পারে। এক তরুণ দাবিদার, উদারবাদী এবং ক্রাউন প্রিন্সের বন্ধু, একটা জার্মান রাষ্ট্র শাসন করবে, তাঁদের এ ধরনের পরিণাম তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। তাছাড়া এ ধরনের রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবে প্রুশিয়ার অনুকূলে যাবে না। তিনি ডুচি দুটি চান তার প্রভুর জন্য। অতএব তিনি সাবাস্ত করেন যে, ডায়েটের সঙ্গে নয়, লন্ডন সন্ধির অপর স্বাক্ষরদাতা অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। তারা লন্ডন সন্ধির শর্তানুসারে ক্রিশ্চিয়ানকে স্বীকৃতি প্রদান করবে, তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করবে একটি চরমপত্র, তাতে দাবি করা হবে যে নবেম্বর শাসনতন্ত্র অবিলম্বে বাতিল করা হোক, উপরন্তু চরমপত্র প্রণয়ন করা হবে এমন আকারে যাতে কোনো অবস্থায় তা গ্রহণের যোগ্য বিবেচিত না হয়। সবকিছু পরিকল্পনা মোতাবেক এগিয়ে চলে। দিনেমারগণ ইংরেজদের তরফ থেকে যে আশ্বাসের বাণী শুনেছেন তাকে অলস বকুনি মনে করে অবহেলা করতে পারেন না। অতএব তারা চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করেন। অস্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়ার বাহিনীদ্বয় ডুচি দুটিতে আক্রমণ চালায় (জানুয়ারি, ১৮৬৪), ডেনমার্ক পরাস্ত হয়, রাজা ক্রিশ্চিয়ান শান্তির প্রস্তাব করতে বাধ্য হন। ভিয়েনা সন্ধির শর্তানুসারে (অক্টোবর, ১৮৬৪) দিনেমার শাসক শ্লেসভিগ-হোলস্টেনের উপর থেকে স্বীয় অধিকার প্রত্যাহার করেন। উপরন্তু অপর একটি ক্ষুদ্র ডুচি লৌয়েনবার্গও বিজয়ী দুই জার্মান শক্তির হাতে তুলে দিতে হয়।

এবার যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো তাকে কোনো অবস্থায় উৎসাহব্যঞ্জক বলা চলে না। যৌথ শাসনব্যবস্থা কোনোকালে স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে পরিচালনা করা যায় নি। আর অস্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়া যদি যৌথ শাসনে শরিক হয় তাহলে সংঘর্ষ এড়ানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আজ হোক, কাল হোক, এই দুটি শক্তিকে অবশ্যই স্থির করতে হবে কাকে যুদ্ধে জয় করে ডুচি খণ্ড শাসন করার জন্য আহ্বান জানানো যায়। জার্মান জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অস্ট্রিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল। অতএব সে তরুণ দাবিদারের প্রতি সমর্থন জানায়। বিসমার্ক এই পদক্ষেপ যে কোনো উপায়ে প্রতিরোধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশ্য ডুচি দুটি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রুসিয়ার প্রদেশে পরিণত করা হয় তাহলে ব্যতিক্রম করা যায়। সেক্ষেত্রে নামে ডুচি হলে ক্ষতি নেই। এদিকে তরুণ প্রিন্স কিয়েলে স্থায়ী হয়েছেন। তিনি কিছু বিবেচনাহীন কাজ করে বসেন। সেখানে একটা ক্ষুদ্র রাজদরবার খোলেন এবং অস্ট্রীয় প্রশাসনের সুস্পষ্ট সমর্থনে নিজেকে স্থানীয়ভাবে রাজার মর্যাদায় উন্নীত করার চেষ্টা করেন। এতে বার্লিনে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৫ সালের গ্রীষ্মকালে দুটি দেশ প্রায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য অস্ট্রিয়ার তখন প্রুশিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মতো অবস্থা ছিলো না। প্রুশিয়ারও কূটনৈতিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নি। এর মধ্যে গোস্টেনে একটা চুক্তি হয়। যে জটিল সৃষ্টি হয়েছে তাতে সাময়িক পলেস্তারা লাগানো যায়। ইতোমধ্যে দুটি দেশ যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করার সুযোগ পায়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে যৌথ শাসনের অবসান ঘটবে, হোলস্টেন শাসন করবে অস্ট্রিয়া, শ্লেসভিগ শাসন করবে প্রুশিয়া। তবে ডুচি অব লৌয়েনবার্গ প্রুশিয়ার রাজার হাতে স্থায়ীভাবে তুলে দেয়া হবে।

এ পর্যন্ত বিসমার্ক অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। জার্মান জনগণের আবেগময় অভিমত উপেক্ষা করে এবং প্রুশীয় রাজদরবারের এবং পার্লামেন্টের প্রতিরোধ সত্ত্বেও

অগাস্টেনবার্গের দাবি তিনি ব্যর্থ করে দেন। ফ্রান্স কিংবা ইংল্যান্ডের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে তিনি দিনেমার যুদ্ধে জয়ী হন। আর এখন যেহেতু নবগঠিত প্রুসীয় বাহিনীর প্রথম প্রচেষ্টা বিজয়মাল্যভূষিত হয়েছে এবং লৌয়েনবার্গ রাজ্যভুক্ত হবার ফলে বৃদ্ধ রাজার দিগ্বিজয়ের খিদে চাঙা হয়েছে, অতএব ভবিষ্যতের দিকে তিনি এখন আস্থার সঙ্গে দৃষ্টিপাত করতে পারেন। ডুচিগুলিতে রয়েছে শত ছিদ্র ; হাজার কারণে গোলমালের সূচনা হতে পারে যে কোনো সময়। অতএব সুযোগ বুঝে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বিবাদ শুরু করা কঠিন হবে না। ইতোমধ্যে দেশটিকে করতে হবে নিঃসঙ্গে। পূর্ব সীমান্তে বিসমার্ক পূর্ণ নিরাপদ। বিশ্বাস করা যায় যে রাশিয়া বন্ধুত্বসুলভ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। কিন্তু ফ্রান্সের নিরপেক্ষতাও নিশ্চিত করা দরকার। সম্ভব হলে তাও করতে হবে। ইতালির সক্রিয় সহযোগিতার সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখতে হবে।

তালেরাঁ এবং ব্রিয়াঁর মতো তৃতীয় নেপোলিয়নও ছিলেন সৎ ইউরোপীয় ভদ্রলোক। যদিও তিনি জনগণের সামরিক আগ্রহকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন মনে করতেন, তবে তিনি বিশ্বাস করতেন শান্তি ; জাতীয়তা এবং কংগ্রেস নির্দেশিত সরকারে। তার সুখ্যাত পিতৃব্য সেন্ট হেলেনায় যে মতবাদ প্রচার করেন তিনি ছিলেন তার আগ্রহী উত্তরাধিকারী। জাতিসমূহের বিরাট সমষ্টি গঠন ইউরোপীয় স্থায়িত্বের স্বার্থে কাজ করবে। এতে কোনো সন্দেহ করা চলে না যে ইতালিয়ান এবং পোলদের প্রতি তিনি যে সহানুভূতি পোষণ করতেন তা ছিলো আন্তরিক ও নিরাসক্ত। ইউরোপের শক্তির ভারসাম্য তার দেশের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে পরিবর্তন করা না হলে ইউরোপের মানচিত্রের বড় রকমের পরিবর্তনে তিনি আগ্রহী এবং এ প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে ইচ্ছুক। তবে রাজনৈতিক সীমান্ত নির্ধারণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট জনগণের অনুভূতির কথা মনে রেখে। প্রুসিয়ার সম্প্রাসরণে তিনি আতংক বোধ করেন না। শুধু তাই নয়, তিনি মনে করেন দিনেমার ডুচিগুলি প্রুসিয়ার সংগত কারণেই পাওয়া উচিত, তাছাড়া প্রুসিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান ফেডারেশন গঠনকে তিনি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করেন, এর জন্য তিনি কোনো প্রকার উদ্বেগ বোধ করেন না। দক্ষিণাঞ্চলের জার্মানরা কি ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকে পড়বে না? অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রুশিয়ার যুদ্ধে তিনি কি একটা খেলা দেখাতে পারবেন না, যে খেলা দেখিয়ে পিডমন্টের কাছ থেকে আদায় করেন স্যাভয় ও নিস? এ ধরনের যুদ্ধে কি ভেনিস ইতালির দখলে চলে যাবে না? বিসমার্ক অবিলম্বে টের পেয়ে যান নেপোলিয়নের মাথার চেয়ে হৃদয়টা অনেক বড়?

-১৮৬০ সালের পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত। ইতোমধ্যে ফরাসি সাম্রাজ্যের শক্তি কিছুটা শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই সাম্রাজ্যের প্রধান এখন আর কুদেতা এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধের নায়ক নন।

রাতদিন বিরামহীন কাজ করে, সর্বদা উদ্বেগের মধ্যে বাস করে, তার দৈহিক কাঠামো প্রায় নড়বড়ে। উপরন্তু অতিরিক্ত প্রমোদে মত্ত থাকার দরুনও হয়তো তার দেহের ক্ষতি হয়েছে বিস্তর। প্রায়ই দুঃসহ যন্ত্রণার প্রবল বেগ অনুভব করেন। অন্তর্গত দৈহিক অব্যবস্থার জন্য মনে জোর খুঁজে পান না। তার উদ্যমের সকল উৎসও একই কারণে নষ্ট হয়ে গেছে।

ইত্যবসরে, অংশত স্বীয় শারীরিক অবনতির কারণে অংশত যাতে পিতৃব্যের মতবাদ কার্যকর করতে পারেন, সেই জন্য সাম্রাজ্যে উদারনীতির সূচনা করেন, সম্রাটের বক্তৃতার উপর সিনেট এবং আইন সভায় ভোট গ্রহণ এবং বিতর্কের অনুমতি দেন (২২ নভেম্বর,

১৮৬০)। দপ্তরবিহীন কয়েক জন মন্ত্রীকে সরকারের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করার জন্য সুযোগ দেয়া হয়। পার্লামেন্টে যে বিতর্ক হয় নানা দিনে তার সারাংশও প্রকাশ করা যায় এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণের পর থেকে। কারণ তার পিতৃব্য মনে করতেন, এক সাম্রাজ্যের বাঁধ শিথিল করতে হবে, সংসদকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। অতঃপর যে পার্লামেন্টারি জীবনের পুনরুজ্জীবন ঘটে তাতে ফরাসি জনগণের দীর্ঘদিনের শঙ্কাভার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিরাট ও ভয়াবহ আকারে। যাজকরা সম্রাটকে অভিযুক্ত করেন এজন্য যে কেন তিনি ইতালীয়দের সাহায্য করলেন, উদারপন্থিরা তাকে অভিযুক্ত করেন এজন্য যে কেন তিনি শেষ পর্যন্ত তাদের পরিত্যাগ করেন। কারখানার মালিকরা তাকে অভিযুক্ত করেন অবাধ বাণিজ্যনীতি চালু করার জন্য, অর্লিয়ঁরা তাকে আক্রমণ করেন বাজেয়াপ্তকরণ নীতির জন্য, একটি পক্ষ (লেজিটিসমট শাখা) তার উপর ক্ষিপ্ত, কেন তিনি বুরবঁ রাজবংশকে নেপলস থেকে উৎখাত করেন। ক্রিমিয়া এবং ইতালীয় বিজয়স্মারক লাভের পর চেয়েছিলেন কিছুকাল সম্মানজনক অবসর উপভোগ করতে, হয়তো সময়টা তিনি কাজে লাগাতেন জুলিয়াস সিজারের অমর জীবনী রচনা করে, অতঃপর দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতেন রেলপথ, টেলিগ্রাফ, ব্যাংক ইত্যাদি স্থাপন করে। অথচ এখন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং বিরক্তিকর চাপের সম্মুখীন। এই চাপগুলি মোকাবেলা করাও দুষ্কর। অবশেষে এক চরম দুঃসময়ে পুরোহিতরা তাকে প্ররোচিত করেন সুদূর মেক্সিকো অভিমুখে অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জন্য। এই অভিযানের লক্ষ্য হবে দুটি : ধর্মীয় এবং আর্থিক।

বিরামহীন এবং ভাবাবেগপূর্ণ মতবিরোধের এই দেশে সমাজ দুটি দলে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত। একদল যাজকীয় এবং রক্ষণশীল। এদের নেতৃত্ব দেন মিরামোঁ। অপর দল প্রগতিশীল এবং পুরোহিততন্ত্র বিরোধী। এরা সমবেত বেনিটো জুয়ারেজের অধীনে। বেনিটো জুয়ারেজ ইন্ডিয়ান, চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য সুখ্যাত। তার দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ। কিন্তু তাকে গোটা ক্যাথলিক জগৎ প্রচণ্ডতার সঙ্গে প্রত্যাখান করে। কারণ তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে গির্জার প্রভাব ও সম্পদ হ্রাসের পক্ষপাতী। উভয় পক্ষ সশস্ত্র রূপ ধারণ করে, উভয় পক্ষ ইউরোপ থেকে ঋণ সংগ্রহ করে বিপুল পরিমাণে। আবার উভয় পক্ষ উদারভাবে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যুদ্ধের রায় তাদের পক্ষে গেলে সমুদয় ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করা হবে। সুইজারল্যান্ডের এক মহাজন, জেক্কার (অবস্থান করেন প্যারিসে) প্রচুর পরিমাণ ধার দেন মিয়ামোঁকে ; এদিকে সম্রাটের জনৈক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দুক দ্য মর্নিকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে সামগ্রিক মুনাফার পঞ্চাশ শতাংশ তাকে প্রদান করা হবে। অবশ্য এই যুদ্ধে মিরামোঁ নয়, জয়ী হন বেনিটো জুয়ারেজ (১৮৬১)।

ফ্রান্সের পুরোহিত সমাজের কাছে, বিশেষ করে সম্রাজ্ঞীর কাছে ধর্ম অপবিত্রকারী ইন্ডিয়ানদের উৎখাত এবং ফরাসি অভিভাবকত্বে মেক্সিকোতে ক্যাথলিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এমনিতেই একটি আকর্ষণীয় লক্ষ হিসেবে গণ্য হতে বাধ্য, তদুপরি রয়েছে আর্থিক মুনাফা লাভের বিস্তর সম্ভাবনা। বাস্তবিক পক্ষে মেক্সিকো সুদূরে অবস্থিত একটি দেশ, এবং দেশটির আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক বিবরণ সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার খুব সমৃদ্ধ নয়। তবে এতটুকু পরিষ্কার ও নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, দেশটি সুবিশাল, অকল্পনীয় সম্পদশালী, এবং যেহেতু দেশটি স্পেনীয়দের দ্বারা বিজিত হয়েছে, অতএব, জাত লক্ষণগুলি অনুকূল না হলেও, মনে হয় দেশটি ক্যাথলিক চার্চের প্রতি অনুরাগী। আরো মনে হয় তারা রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির জন্য তাগিদ বোধ করে। ধর্ম, অর্থ ও রাজনীতি সমন্বিত হয় মেক্সিক্যান উদ্যোগ

চূড়ান্ত প্রেরণা যোগানোর জন্য। এই উদ্যোগে খুশি হবে ভ্যাটিকান, চরিতার্থ হবে বৈদেশিক মুদ্রার আকাঙ্ক্ষা, আর ফরাসি সাম্রাজ্য উদ্ভাসিত হবে পরম গৌরবে। উপরন্তু এর চেয়ে সুযোগ সহজ আর হয় না। যেহেতু উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ ও গৃহযুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা নাজুক। আগলো স্যাক্সন প্রটেস্ট্যান্টরা দাসব্যবসা এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার নিয়ে বিবাদে লিপ্ত। অতএব নেপোলিয়ন মার্কিন মহাদেশে লাতিন ও ক্যাথলিক সভ্যতা স্থাপনের জন্য অবশ্যই দেখতে পাবেন। এটি হবে দূরবর্তী অঞ্চলে ফ্রান্সের একটি স্থায়ী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের বিরাট প্রতিশ্রুতি।

ফ্রান্স যখন এই সব লম্বা চওড়া ধারণা আকার দান করছে তখন সম্রাট ইংল্যান্ড এবং স্পেনের সঙ্গে হাত মেলান কম সংস্থহের মতো সীমিত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। ঋতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দেবার জন্য বাণিজ্য জাহাজ প্রেরণ করা হয়, সুদূর এবং ম্যালেরিয়াপ্রবণ উপকূলে জাহাজ নোঙর করে, এদিকে জুয়ারেজের নতুন প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে কৌশলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে ইউরোপীয় ঋণদাতারা বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হলে তারা মানবে না। একে তারা প্রতারণার সামিল বলে মনে করবে : এই প্রক্রিয়া নিশ্চয় বেয়াদবিপূর্ণ। কিন্তু ব্রিটেন প্রত্যাহার করে নেবার পর নেপোলিয়ন যে মেক্সিকো সরকারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (এই জন্য ও ভ্রমাত্মক বিশ্বাস থেকে যে উচ্চ দেশের জনগণ জুয়ারেজের আধুনিক প্রজাতন্ত্রের বিনিময়ে ক্যাথলিক এবং পুরোহিত শাসিত রাজতন্ত্র চায়) তার চেয়ে কম আপত্তিজনক।

খুব বেশি সময় লাগলো না, অনতিকাল পর এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, মেক্সিকোর জনগণের মাথার উপর একজন সার্বভৌম নৃপতি বসিয়ে দিতে গেলে যে সৈন্যবল ও আর্থিক খরচ বহন করতে হয় তা স্বপ্নে ভাসা ভাসাও কল্পনা করা হয়নি। ফ্রান্স মেক্সিকোর সিংহাসনে আরোহণের জন্য যে ব্যক্তিকে মনোনীত করে এবং আমন্ত্রণ জানায় (১০ জুলাই, ১৮৬৩) তার বিরুদ্ধে আপত্তির কোনো কথা উঠতে পারে না। ম্যাক্সিমিলিয়ান ছিলেন অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফের ভ্রাতা এবং বেলজিয়ামের রাজার কন্যা শার্লোটের স্বামী। এই ভদ্রলোক ছিলেন দীর্ঘাঙ্গ, সুদর্শন, হিতবাদী। মিলানের শাসন কর্তা হিসেবে তিনি সুনাম কুড়ান, তাকে উদার প্রশাসক হিসেবে সবাই জানে। যারা উদার ও সম্মানজনক প্রশাসনের আকাঙ্ক্ষা করেন তারা ম্যাক্সিমিলিয়ানের প্রতি অনুগত হতে বাধ্য। দুর্ভাগ্যবশত মেক্সিকোবাসীরা তাকে পছন্দ করেন নি। তারা ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত সাদাসিধে প্রজাতন্ত্রী নেতাকে মেনে নিতে রাজি, কিন্তু তারা ইউরোপের সুবিখ্যাত রাজবংশের সার্থকাম একজন রাজপুরুষকে মেনে নেবে না। এটা তাদের এক ধরনের পাগলামিও হতে পারে। মোদ্দাতেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে একমাত্র ফরাসিদের বেয়নেট এবং অর্থ ভান্ডার সেখানকার বৈদেশিক সিংহাসন টিকিয়ে রাখতে পারে। তবে অবশ্য ঘুণাক্ষরে মনে হয় এ ধরনের সমর্থন যোগানোর পরও অনির্দিষ্টকাল উক্ত সিংহাসন টিকিয়ে রাখা যাবে না। বাস্তবিকপক্ষে, ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে আকস্মিকভাবে এবং ফরাসিরা গভীর গ্লানিতে নিমজ্জিত হয়। কারণ ওয়াশিংটন সরকার গৃহযুদ্ধে দক্ষিণ অঞ্চলকে পরাস্ত করার পর ফরাসিদের মেক্সিকো থেকে প্রত্যাহারের জন্য চরম নির্দেশ জারি করে এবং জানিয়ে দেয় যে, যে সার্বভৌম নৃপতিকে মেক্সিকোর জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে তারা কিছুতেই স্বীকৃতি দেবে না। দুর্ভাগ্যপীড়িত ম্যাক্সিমিলিয়ানকে তার ফরাসি পৃষ্ঠপোষকরা পরিত্যাগ করে। তিনি অনতিবিলম্বে

শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়েন। কুয়েরেটারোতে তাকে একদল বন্দুকধারীর সামনে দাঁড়ানো বাধ্য করা হয়।

মেক্সিকান উদ্যোগের হতাশাব্যঞ্জক ব্যর্থতার দরুন ফরাসি সাম্রাজ্যের মর্যাদার যে ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে অত্যুক্তি করবার কিছু নেই। এই উদ্যোগ গৃহযুদ্ধের প্রতিটি পাপ হিসেবে দেখা হয়। তারা মেক্সিকোর জনগণের মেজাজ ও সাহসিকতা সম্পর্কে কোনো খোঁজ খবর রাখেনি, দেশটিকে বশে আনার জন্য বাহিনীর আকার কেমন হতে হবে, স্থানীয় স্বার্থগুলো কেমন, কোনো বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় ধারণা ছিলো না। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের বিজয়ের সম্ভাবনাও তারা হিসেবে ধরেননি। এমন কি ফরাসিরা সেখানে যখন বেশ শক্তিশালী ছিলেন তখনও উক্ত দেশের সামান্য অংশ বশে রাখার ক্ষমতা রাখতেন। সুতরাং তাদের কতোবার বিপদগ্রস্ত হতে হয়। বিভিন্ন রোগে তাদের জনবল আশংকাজনক হারে হ্রাস পায়। প্রথম থেকেই দেশের মেক্সিকো নীতির সমালোচনা করেন উদারবাদীরা। তারা নিজেদের প্রশ্ন করতেন উন্নতিসাধক ফরাসি বিপ্লব উপেক্ষা করে মেক্সিকোয় পুরোহিত ও সন্ন্যাসীর স্বার্থ চরিতার্থ করে দেশের কি উপকার হবে। তারা আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যেখানে ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করলে দেশের অনেক লাভ হতো, সেখানে পাঁচ হাজার মাইল দূরে পুরোহিত এবং মহাজনদের উসকানিতে বিপদে লিপ্ত হয়ে লোকবল এবং সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কি হলো। এটা অবশ্যই পরিতাপের ব্যাপার যে উদ্যোগ ব্যর্থ হলো, তবে একে যে 'ডিউক জেকারের যুদ্ধ' বলে অভিহিত করে বিদ্রুপ করা হলো, একে যে প্রভাবশালী ফাটকাবাজদের জুয়া খেলার ক্ষতি পূরণের জন্য অর্থগৃধ্নু অভিযান বলে ধিক্কার উঠলো, তা অধিকতর নিন্দনীয় ব্যাপার বৈকি !

১৮৬৫ সালের শরৎ কালের মধ্যে মেক্সিকো যুদ্ধে ব্যর্থতা একটি প্রতিষ্ঠিত ঘটনা। সর্বত্র হতাশা তীব্র, অসহনীয় গ্লানি অনাবৃত। এখন দরকার রাজনীতির ভিন্ন কোনো ক্ষেত্রে সফলতা দ্বারা ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া। এতে জাতির ক্ষত শুকানোর সুযোগ ঘটবে, তাদের মনোযোগও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হবে। বিসমার্ক এবার এগিয়ে এলেন নেপোলিয়নের হাতে একটা কিছু ধরিয়ে দেয়ার জন্য। এই প্রুসীয় রাজনীতিবিদ খোলামেলা কথা বলার জন্য কূটনীতিবিদ হিসেবে ইউরোপের সমীহ আদায় করতে সমর্থ হন। নেপোলিয়নের সঙ্গেও তিনি খোলামেলা পরিবেশে কথা বললেন। তিনি চান অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, জার্মান শাসনতন্ত্রের সংশোধন, সিলেসিয়ার ডাচিগুলি দখল, ইতালির সঙ্গে মৈত্রী, আর ফ্রান্স যদি নিরপেক্ষ থাকে তাহলে ফরাসি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করা হবে। কোনো প্রস্তাবই কিন্তু স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো না ; কাগজ-কলমের ব্যবহারও হলো না। বিসমার্কের লক্ষ্যের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে ক্ষতিপূরণের আপাত ইঙ্গিত দিয়ে, বিনিময়ে নেপোলিয়নকে, প্রুসিয়ার পরিকল্পনার অনুকূলে আনা এবং যদি যুদ্ধ বাঁধে তাহলে ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা আদায় করা। নেপোলিয়ন বিসমার্কের প্রস্তাবের অনুকূলে।

এই মূল্যবান, এবং যদিও কিছুটা অবাস্তব বা অলৌকিক, নিশ্চয়তার মূর্তির সাহসী হয়ে বিসমার্ক এবার যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন। এই যুদ্ধের পরিকল্পনা তিনি দীর্ঘ কাল যাবৎ রচনা করছেন, প্রকৃত যুদ্ধে কাঁপিয়ে পড়তে বিলম্ব করেছেন কৌশলগত কারণে। ইতালির সামরিক সাহায্য তিনি লাভ করেছেন ভেনেসিয়া প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। এর জন্য শত্রু পক্ষকে দুই সীমান্তে লড়াই করতে হবে। প্রুসিয়ার রেলপথ তৈরী

হয়ে গেছে, ফ্রান্সিফর্ট বাহিনী বিভিন্ন কোরে বিভক্ত, প্রতিটি কোরের জন্য স্থানীয়ভাবে সৈন্য সংগৃহীত হয়েছে, কোরগুলি সম্পূর্ণ সজ্জিত। রয়েছে অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ বাহিনী এবং প্রকৌশলগত। ফলে শত্রু পক্ষের চেয়ে অন্তত পনেরো দিন আগে প্রুসিয়া সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে পারবে। সম্পত কারণে সে সাফল্যের প্রত্যাশা করতে পারে। যাহোক আক্রমণ শুরু করার আগে আরো একটা ব্যাপারে নজর দিতে হবে। বিসমার্কের বিরাটত্বের প্রমাণিক অঙ্ক এই ছিলো যে তিনি যুদ্ধে নৈতিক উপাদানের মূল্য সঠিক অনুধাবন করতে পারতেন: তিনি জানতেন, তিনি যে যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছেন তা জার্মান জনগণের প্রধান অংশের কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। দিনেমার ডাচির মতো নোংরা ও স্থানীয় বিবাদ অজুহাত হিসেবে কাজ করবে সামান্য। তাছাড়া স্থায়ী সাফল্য অর্জনের জন্য উদ্ভাবন করতে হবে বৃহত্তর এবং কল্পনা অধিক সতেজকারী অজুহাত। প্রুসিয়া যুদ্ধে জয়ী হলেই মিশন সম্পূর্ণ হলো মনে করা চলবে না। জার্মান জনগণের সামনে তাকে বড়ো একটা কিছু তুলে ধরতে হবে। তিনি যা তুলে ধরেন তাতে যে কেউ অবাক মানতে বাধ্য হবেন। ইতালির সঙ্গে মৈত্রী পাকা হওয়ার পর দিন জার্মান কনফেডারেশনের সার্বিক সংস্কার এবং জনগণের ভোটে জার্মান পার্লামেন্ট গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে আর্চ-টোরি এগিয়ে আসেন। মনে করা হয় যে সমাজতন্ত্রী লাসালের প্রভাব এখানে কাজ করেছে। আরো সম্ভাব্য যে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী লিবারাল হলেও, গণতন্ত্র টোরিপন্থি।

বার্লিনে যদিও ভান করা হয় যে চূড়ান্ত উসকানি এসেছে অষ্ট্রিয়ার তরফ থেকে, তবে এতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না যে, এই যুদ্ধের প্রণেতা বিসমার্ক। প্রুসিয়ার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মল্‌টকে পরবর্তীকালে নগ্ন সত্য কথাটা বলে ফেলেছেন। "১৮৬৬ সালের যুদ্ধ এ জন্য সংঘটিত হয়নি যে প্রুসিয়ার অস্তিত্ব হুমকির মুখে দাঁড়িয়েছিলো, জনমতের অনুগত হয়ে কিংবা জনগণের ইচ্ছা পূরণের জন্য ঐ যুদ্ধ হয়নি। এই যুদ্ধের আভাস অনেক কাল আগে পাওয়া যায়, প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় সবিশেষ বিবেচনার পর এবং মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে। আবার এই যুদ্ধের লক্ষ্য পররাজ্য দখল ছিলো না, লক্ষ্য ছিলো ক্ষমতা, যা দিয়ে জার্মানিতে প্রুসিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে।" এটি কোনো পরিচ্ছন্ন ঘটনা নয়। অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বিসমার্ক টেইটসেক-কে বলেন, "স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের জামা-কাপড়গুলি খুব পরিষ্কার ছিলো না।"

এই যুদ্ধ মাত্র ছয় মাস স্থায়ী হয়। সমগ্র ইউরোপ এবার উপলব্ধি করে যে প্রুসীয় বিজ্ঞান এবং প্রুসীয় পদ্ধতি সমরবিদ্যায় প্রয়োগ করা হলে কি ফল দাঁড়াতে পারে। প্রুসীয় বাহিনী যোতায়েনে দ্রুততা, বাহিনীর নিখুঁত বিচলন (movement), প্রুসীয় নিডল বন্দুকের অসাধারণ দক্ষতা, প্রথম বারের মতো রেলপথের চতুর ব্যবহার, ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় একটা নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটেছে। এখন যে কেউ কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবে, যুদ্ধ পরিচালনা করবে বৃহৎ শিল্পকারখানার ব্যবস্থাপনার কৌশল ও নীতি অনুসরণ করে, সেই দেশই শাসন করবে ইতিহাসের মূল্যবান সিদ্ধান্তগুলি। ১৮৬৬ সালের ১৫ জুন চরমপত্র প্রদান করা হয়। এই যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহেই উত্তর-পশ্চিম জার্মানি প্রুসিয়ার থোড়ালির নিচে চলে যায়। তৃতীয় সপ্তাহে (৩ জুলাই) মূল অষ্ট্রীয় বাহিনী চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে সাডোয়ার (কনিগগ্রেৎস ও বলা হয়) যুদ্ধে, বোহেমিয়ায়। এখানে ভোরতর সংঘর্ষ হয়। দীর্ঘ সময় অনিশ্চিত অবস্থা চলে। ফ্রান্টস জোসেফ শত্রু বাহিনীর বাম রেখা

বরাবর আক্রমণ পরিচালনায় সমর্থ হলে জয় আসে; অষ্ট্রিয়া যে হারে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে, সেই প্রতিরোধ চূর্ণ করা হলে, তাদের বিপর্যয়ও ঘটে সেই অনুপাতে। অতঃপর ভিয়েনা যাওয়ার পথ খুলে যায়। সেখানে আনন্দের উচ্ছ্বাসে ডিক্রি জারি করেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা জানান।

প্রকৃত রাষ্ট্রবিদসুলভ আচরণের পরীক্ষা হলো বিজয়ের পর রাজনৈতিক প্রমত্ততা প্রতিরোধের সমর্থতা। প্রথম নেপোলিয়ন প্রতিটি সামরিক সাফল্যের পর কূটনৈতিক দাবি উত্থাপন করতেন। কিন্তু বিসমার্ক ছিলেন অন্য রকম। তিনি জানতেন তিনি কি চান এবং তিনি কি চান না। অস্ট্রীয়দের অযথা খাটো করা কিংবা গ্লানির মধ্যে নিক্ষেপ করা তার পরিকল্পনায় ছিলো না। পরবর্তী কালে অস্ট্রীয়দের মৈত্রী কিংবা নিরপেক্ষতার প্রয়োজন হতে পারে রাজার কিংবা দেশের। অস্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের প্রতি তার কখনো লোলুপ দৃষ্টি ছিলো না নতুন নতুন বিজয়ও তার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয়। পরাজিত শত্রুদেশের রাজধানীতে বিজয়ীর বেশে প্রবেশেও তার রুচি হতো না। তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন যদি অস্ট্রিয়া জার্মানি থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়, দিনেমার ডাচিগুলি প্রুসিয়ার অধিকারে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানায়, এবং প্রুসিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান কনফেডারেশন গঠন ব্যাপারে আপত্তি না জানায়। দক্ষিণ জার্মান সরকারগুলির সংবেদনশীলতার কথা বিবেচনা করে তিনি উত্তর জার্মান কনফেডারেশনে যোগ দেয়ার জন্য তাদের উপর কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করবেন না। বরং দক্ষিণ অঞ্চল যদি ফেডারেশন গঠন করতে চায় তাহলে সে ক্ষেত্রে তার কোনো আপত্তি থাকবে না। তার দেশবাসীদের একটা বিরাট অংশ যদিও ঐক্যবদ্ধ জার্মানির দাবি তুলেছে, কিন্তু এতটা উচ্চাভিলাষী হতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তখন তার হিশেব এই ছিলো যে, উত্তর জার্মান কনফেডারেশন ততটুকই হবে, যতটুকু প্রুসিয়া হজম করতে পারবে, কিংবা ফ্রান্স মেনে নিতে রাজি থাকবে। যুদ্ধের আগেই তিনি মনস্থির করেছিলেন যে মেইন হবে তার সীমান্ত, এই বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্ত থেকে তিনি কখনো পশ্চাদপসরণ করতে রাজি হন নি। নিখিল জার্মান আন্দোলনকে তিনি মনে করতেন বেপরোয়া নীতি, এই নীতি উগ্র। এর থেকে সুবিধা লাভের সম্ভাবনাও সংশয়ের উর্ধ্বে নয়। তবে ভবিষ্যতে হয়তো ফ্রাংকো-অস্ট্রীয়ান মৈত্রীর বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যেতে পারে। বিসমার্কের সুচিন্তিত অভিমত এই যে দক্ষিণাঞ্চল প্রশ্নে কোনো প্রকার চাপের সৃষ্টি করা ঠিক হবে না, বরং তারা যখন খুশি যেভাবে খুশি প্রুসীয় ফেডারেশনে যোগ দিতে পারে। তিনি তাদের তরফ থেকে অনুকূল বায়ু প্রবাহের অপেক্ষা করবেন। যদিও তারা প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তবু তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করেন না। এমন কি স্বীয় প্রভুর অভিলাষের বিরুদ্ধে তিনি অন্য রাজ্যের ভূমি গ্রাস করার ইচ্ছা করেন না। তিনি ক্ষমাশীল মনোভাব প্রদর্শন করেন, এর জন্য পুরস্কৃতও হন সঙ্গে সঙ্গে। আগস্ট মাসের অবসান না ঘটতেই বার্টেসবার্গ, ব্যাভারিয়া এবং বাডেন প্রুসিয়ার সরকারের সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে।

সুবিজ্ঞ ও উদার শর্তগুলি অস্ট্রিয়া বিবেচনা করতে প্রস্তুত, এদিকে গোটা ইউরোপ স্যাডোয়ার যুদ্ধের ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই, তাকে মোকাবেলা (২৩ আগস্ট) করতে হবে প্রাগ চুক্তির বাস্তবতা। স্বয়ং রাজা এবং সেনা প্রধানদের বিরোধিতা সত্ত্বেও যে তিনি যুদ্ধের অবসান ঘটান এবং শান্তি স্থাপন করেন, তার কারণ ছিলো। বিসমার্ক আশঙ্কা করেন যে এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করলে সশস্ত্র ফরাসিদের মোকাবেলা করার মতো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

তার উদ্বিগ্ন হবার কারণ, স্যাডোয়ার যুদ্ধের দু'দিন পর নেপোলিয়ন মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দেন। উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে হয়েছিলো। প্রধান ভয়ের কারণ এখানে যে প্রুসীয় বাহিনীর মূল অংশ যখন বোহেমিয়ায়, নেপোলিয়ন তখন রাইন অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করবে, এবং সার্বিক সন্ধি নিষ্পত্তির অংশ হিসেবে তরবারির ভয় দেখিয়ে ফ্রান্সের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করবে।

প্রুসিয়ার ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধে কিংবা অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নেপোলিয়ন যে ফ্রান্সের জন্য কোনো সুবিধাই আদায় করতে পারেন নি তার জন্য ফরাসি চেম্বারে তার বিরুদ্ধে ধিক্কার ওঠে। ক্রোধ, ঈর্ষা এবং আশংকার সঙ্গে ফ্রান্সকে সাক্ষী হওয়ার শাস্তি ভোগ করতে হয় যে, কি অসাধারণ বিজয়ের ফলে প্রুসিয়া সমর্থ হয় হ্যানভার, হেস-কাসেল এবং দুটি দিনেমার ডাচি গ্রাস করতে। সে এখন মেইন পর্যন্ত সমগ্র জার্মানিতে প্রাধান্য বিস্তার করবে, তার মোট জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত আরো সোয়া চার মিলিয়ন জার্মান, সে এখন মধ্য ইউরোপের শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট করবে। অথচ ফরাসি সম্রাট একটা বন্দুক কিংবা একজন সৈনিককে নড়াচড়া করালেন না দেশের স্বার্থে ক্ষতিপূরণমূলক সুবিধা আদায়ের জন্য। "অন্য কোন দেশ নয়, স্যাডোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে ফ্রান্স," বলেছেন মার্শাল র‍্যাঁদো (Randon), অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে, এবং এই পরাজয় কূটনীতির সাহায্যে মেরামত করা যাবে না। বিসমার্ক আঘাত হানেন ঝড়ের বেগে। আর ফ্রান্স ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য নড়াচড়া শুরু করে অনেক বিলম্বে। স্যাডোয়ার যুদ্ধের সমাপ্তি এবং ফ্রাংকো-প্রুসীয় যুদ্ধের সূচনার মাঝখানের সময়ে ফরাসি সম্রাট সম্ভাব্য সব ধরনের খেসারতের দাবি উত্থাপন শুরু করেন। তিনি এখন খেসারত চান রাইন অঞ্চলের প্যালাটিনেট ও হেস, মেইনজ ও সার, বেলজিয়াম এবং লুক্সেমবার্গের জন্য। এ ধরনের আবেদনের পেছনে যদি বলপ্রয়োগের ইংগীত না থাকে তাহলে কিছুমাত্র ঝুঁকি না নিয়ে তা বাতিল করে দেয়া যায়। তবে ফ্রান্স যে উক্ত দাবিগুলি করে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ সযত্নে সংরক্ষণ করা হয় এবং তা সুযোগ বুঝে প্রকাশ করা হয়, যাতে ফরাসিদের কূটনীতি ব্যাভারিয়া এবং ইংল্যান্ডের কাছে নোংরা বলে বোধ হয়।

ইত্যবসরে নতুন উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়। উক্ত শাসনতন্ত্রে ইংরেজ উদারবাদের বৈশিষ্ট্য কমই লক্ষ্য করা যায়। তবে তা আগামী পঞ্চাশ বছর টিকে থাকার যোগ্য এবং শক্তিশালী। রাইখষ্ট্যাগ বা ফেডারেল পার্লামেন্ট গঠিত হয় সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। এর ভিত্তি ছিলো ব্যাপক গণতান্ত্রিক সমর্থন, ১৯১৮ সালের আগে ইংরেজ পার্লামেন্টও এতটা গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করেনি। তবে বিসমার্কের বৈশিষ্ট্য সূচক নীতি অনুসারে এই পার্লামেন্ট সরকার ভাঙতেও পারবে না, গড়তেও পারবে না। সরকারি কর্মপন্থার জন্য অর্থ বরাদ্দও তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিংবা বার্ষিক আর্মি অ্যাক্ট দ্বারা সোনাবাহিনীর আকার নিয়ন্ত্রণও তার অধিকার বহির্ভূত। অর্থাৎ এই গণতান্ত্রিক পরিষদ সার্বভৌম শক্তির আধার নয়। ফেডারেশনের প্রকৃত পরিচালক অঙ্গ হলো ফেডারেল সংসদ (Bundesrat)। এটি গঠিত হয় ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যের বিয়াল্লিশ জন প্রতিনিধি দ্বারা। কাজ করে চ্যান্সেলরের পৌরহিত্যে গোপনে। এই চ্যান্সেলর আবার মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট বা প্রুসিয়ার প্রধান মন্ত্রী। এই ধরনের সংসদকে অনেকে সমালোচনা করে বলেন অযথা ভারবাহী বা কিম্ভূতকিমাকার। জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রুসিয়া কেন বিশটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে নতুন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পরিচালনা সভায় পৃথক ভাবে প্রতিনিধিত্ব দেবে? সম্পূর্ণ

কেন্দ্রীকরণ কি অধিকতর সহজ এবং কার্যকর পরিকল্পনা হতো না? প্রুসিয়ার ক্ষমতা ছিলো অতীতের এইসব অকেজো ধ্বংসাবশেষ ধুয়ে মুছে ছাপ করে দেবার। প্রুসিয়া হ্যানোভারের রাজাকে করে সিংহাসনচ্যুত, তার রাজবংশের ঘটায় অবসান। তাহলে কয়েকটি পৃথক রাজনৈতিক কেন্দ্র কেন টিকিয়ে রাখা হলো, এরাতো কাজে কর্মে প্রতিবন্ধক ভাব সৃষ্টি করতে পারে। শুধু তাই নয়, স্যাকসনি উত্তরাঞ্চলের কনফেডারেশনের কোনো রাজ্য বৈদেশিক দরবারে মন্ত্রী দ্বারা পৃথকভাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুমতি দিতে পারে। এতে কোনো সন্দেহ করা চলে না যে বিসমার্ক ছিলেন বিজ্ঞ এবং দূরদর্শী। তিনি আধুনিক জার্মানিকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রলোভন বিজ্ঞতার সঙ্গে প্রতিরোধ করেন। জার্মানির রাজবংশগুলির শেকড় দেশের ইতিহাসের মাটির গভীরে প্রোথিত, সরকারের কাজ কর্মে তাদের অবদানও সামান্য নয়। তাদের পাইকারি হারে ধ্বংস করলে কোনো অনিষ্ট হওয়ার আশংকা করতে হবে না, একথা ঠিক। তবে উত্তরাঞ্চলে অযথা অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে, তাছাড়া দক্ষিণের জার্মান জনগণের মধ্যে ঐক্য চিন্তায় ক্ষুব্ধ অনীহা সৃষ্টির আশংকা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। উপরন্তু ফেডারেল পরিকল্পনার সরকার শক্তিশালী এবং অত্যন্ত কার্যক্ষম হবে। এতে কোনো ঝুঁকি থাকবে না। ফেডারেল সংসদে প্রুসিয়ার নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাছাড়া প্রুসিয়া এবং বিসমার্ক সমার্থক। এই নজিরবিহীন শাসনতন্ত্রে প্রথমে ব্যবস্থা রাখা হয়েছিলো যে, জার্মান চ্যান্সেলর শুধু রাজার কাছে জবাবদিহি করবেন, জার্মান মন্ত্রিসভা তার কর্মপন্থায় কোনো প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। চ্যান্সেলর হবেন সরকারের প্রতিটি শাখার কার্যকরী প্রধান। ফেডারেল ডায়েট বা পার্লামেন্ট তাকে পদচ্যুত করতে পারবে না, কিংবা পারবে না তার লক্ষ পরিবর্তন করতে। বছরের পর বছর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই চ্যান্সেলর রাজনৈতিক পরিমন্ডলে প্রভুত্ব করেছেন, তার বজ্রকণ্ঠ বক্তৃতা দ্বারা ইউরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলি করেছেন প্রকম্পিত, আর বিমূঢ়, হতভম্ব স্বদেশবাসীকে শুনিয়েছেন লোক শাসনবিদ্যার নতুন পাঠ।

তাহলে দেখা যায় দুটি জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিন্যাসে বিরাট প্রভেদ ছিলো ; অস্তিত্বের জন্য এর একটি ঋণী ক্যাভুরের কাছে, অপরটি ঋণী বিসমার্কের কাছে। ইতালিতে জাতীয়তাবাদের বিজয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় ইংরেজ ধরনে সংসদীয় সরকার গঠন ; জার্মানিতে যুক্ত হয় নিশ্চিত পরাজয়ের সঙ্গে। জার্মান রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদিও আকার দেয়া হয় প্রুসীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রের আধিপত্য সুনিশ্চিত করার জন্য, তবু এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংসদীয় দেশগুলির রাষ্ট্রবিদদের প্রদত্ত নগণ্য সংখ্যক শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। নিয়মিত বিরতি দিয়ে সার্বজনীন ভোটাধিকারের জঞ্জাল সাফকারী তরঙ্গ রাইখস্ট্যাগে আঘাত হানে এবং নতুন অভিমত গঠনে সমর্থ করে যাতে দেশের রাজনৈতিক জীবনে জনগণের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। এসব প্রতি ক্ষেত্রে বিসমার্কের অনুকূলে যায়নি। যেখানে জাতীয় লিবারালরা জনপ্রিয় প্রচারণার প্রতিটি মাধ্যম ব্যবহার করে জার্মানির ঐক্যের পক্ষে কথা বলা এবং দেশের নবগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সমর্থন যোগানোর জন্য, সেখানে ক্যাথলিক এবং সমাজতন্ত্রীরা তার বিরুদ্ধাচারণ করে।

জার্মান সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ

প্রুসিয়ার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি। ফ্রান্সের অনিশ্চিত নীতি। ফরাসি পুরোহিতদের মেজাজ-মর্জি। উদারবাদী, প্রজাতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রিগণ। এমিল অলিভার। হোয়েনযোলার্ন প্রার্থী। এমস টেলিগ্রাম। যুদ্ধঘোষণা। জার্মানির সুস্পষ্ট প্রাধান্য। ফরাসি সর্বোচ্চ অধিনায়কদের দুর্বলতা। প্রাশিয়াপ্রাপ্ত বিজয়ী সৈন্যের ঘাটতি। যুদ্ধাভিযান। জাতীয় উত্থান। লিও গেমবেটা। প্যারিস অবরোধ। বোদ্যু পরিষদ। ফ্রাংকফুট শান্তি এবং থিয়ের-এর অবদান। আলসেস-লরেন। জার্মান সাম্রাজ্য। প্রুসিয়ার গগনচুম্বী উচ্চাভিলাষ।

আমরা এবার সর্বশেষ এবং সর্বাত্মক একটি যুদ্ধের বিবরণ দেব। এই যুদ্ধের ফলে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। প্রথমে প্রুসিয়া দিনেমারদের উপর একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। অতঃপর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিসমার্ক এবং তার উচ্চাভিলাষের মাঝখানে সর্বশেষ প্রতিবন্ধকতা যে দেশটি সৃষ্টি করে তার নাম ফ্রান্স।

অনুমান করলে চলবে না যে প্যারিস স্যাডোয়ায় প্রুসীয় বিজয়ের ফলে বিচলিত বোধ করার পর, প্রুসীয় শক্তি যদি মেইন অতিক্রম করে তাহলে সে ক্ষুব্ধ হবে না, এবং স্বীয় ক্ষমতা অনুসারে বিরোধিতা করবে না। একজন দার্শনিক সুচিন্তিত অভিমত দিতে পারতেন যে, যেহেতু জার্মানরা একদিন না একদিন ঐক্যবদ্ধ হবে, অতএব ফ্রান্সের পক্ষে বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়া হবে যদি সে আসন্ন পরিবর্তনকে আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনন্দন জানায়। উপরন্তু এই যে আসন্ন পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে তা ঠেকানো তার ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যাপার। কিন্তু তেজোদীপ্ত, গর্বিত এবং চতুর একটি জাতির শাসক কোনো কালে দার্শনিক হতে পারেন না। দেশের জনগণের মেজাজ, সন্ত্রস্তবোধ, এবং দুর্বলতার দরুন তার নড়াচড়ার স্বাধীনতা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এবং প্যারিসের বুলভারের প্রতিটি ব্যক্তি (boulevardier) যখন সাব্যস্ত করে যে এখন থেকে প্রুশিয়া তাদের শত্রু তখন নেপোলিয়ন এমন আচরণ করতে পারেন না যে জার্মানি তার বন্ধু। প্যারিস নগরীর কি মনোভাব তা বার্লিনে খুব ভালো জানা আছে। বিসমার্ক এবং তার সামরিক বন্ধুদের কাছে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে জার্মান অর্ধ সমাপ্ত ঐক্য সম্পূর্ণ করতে গেলে ফ্রান্সের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হতেই হবে। অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে, গুরুত্বের সঙ্গে এবং প্রণালিমাফিক উপায়ে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে অগ্রসর হন।

ফরাসি সম্রাটের মন্ত্রণা পরিষদে এ ধরনের লক্ষ্যে স্বচ্ছতা এবং অনমনীয়তা নজরে পড়েনি। এই রাজদরবারের সব কিছুই রহস্যাবৃত, মৃদু এবং অনিশ্চিত। এখানে দরবারিরা মনে করেন যুদ্ধ জাতীয় কর্মসূচির অনিবার্য স্তর নয়, বরং একটা অমঙ্গলজনক ব্যাপার যা কূটনীতির সাহায্যে রোধ করা যাবে। ফ্রান্স অস্ট্রিয়া এবং ইতালির সঙ্গে মৈত্রীর সম্ভাবনা বিচার শুরু করে। বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে ভাব বিনিময় চলে, সফর, পাল্টা সফর বিনিময় হয়, কিন্তু বাস্তব ফলশ্রুতির কোঠা শূন্য থাকে। একটা অস্পষ্ট প্রত্যাশা কাজ করে যে যুদ্ধ বেঁধে

গেলে ডেনমার্ক, হ্যানোভার এবং ব্যাভারিয়া প্রুসিয়ার ঔদ্ধত্য দমন করার সুযোগ লুফে নিতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও কিছুটা করা হয় না। বাহিনী সংস্কারের জন্য স্বতীব গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তবে অতি মিতব্যয়ী চেম্বারে (সংসদে) উক্ত পরিকল্পনা পরাভব স্বীকার করে। চেম্বার অবশ্য অনুমোদন করে যে প্রুসিয়া তাদের শত্রু, তবে এক মুহূর্তের জন্যও ডেপুটিরা (সদস্যরা) কল্পনা করে না যে ফ্রান্সের পেশাদার বাহিনীর সামনে প্রুসীয় বাহিনী দাঁড়াতে পারবে। হয়তো যুদ্ধের কোনো দরকারই হবে না : ফ্রান্সের বন্ধুত্ব খুবই মূল্যবান, অন্যদের অন্যান্য মূল্যবান বস্তুর মতো এটিও ক্রয় করতে হবে মূল্যের বিনিময়ে। স্যাডোয়ার যুদ্ধ এবং ফ্রাংকো-প্রুসীয় যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ফরাসি কূটনীতি ব্যস্ত থাকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষে, যাতে দেশের জনমত শান্ত রাখা যায়, শান্তিও বজায় থাকে। রয়েছে রাইন এলাকার প্যালাটিনেট, রয়েছে লুক্সেমবার্গ, রয়েছে বেলজিয়াম। এগুলো বোকামিপূর্ণ এবং বিপজ্জনক লক্ষ্য। এসব থেকে ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু আসবে না। যখন একটি ফরাসি পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাভারিয়াবাসীরা জানতে পারে যে (এই খবরের গোপনীয়তা স্বয়ং বিসমার্ক ফাঁস করেন) ফ্রান্স দক্ষিণ জার্মানির একটি অংশ চায়, তখন তাদের যুদ্ধে প্রুসীয়দের পক্ষে যোগ দিতে কোনো দ্বিধা থাকে না। লুক্সেমবার্গ ক্রয়ের পরিকল্পনা প্রুসীয়দের হিংস্র ও উন্মুক্ত শত্রুতার মুখে প্রত্যাহার করা হয়। তবে সবচেয়ে ক্ষতিকর ছিলো বেলজিয়াম দাবি করা ; প্রুসিয়ার রাজদরবারের ফরাসি প্রতিনিধি বেনেদিতিকে এই দাবি জানাতে নির্দেশ দেয়া হয় ১৮৬৬ সালে। কারণ ফ্রাংকো-প্রুসীয় যুদ্ধ সূচনা লগ্নে বিসমার্ক একটি সন্ধির খসড়া প্রকাশ করে, যেখানে উক্ত দাবির কথা উল্লেখ করা হয়। ফলে বৃটেন জার্মানির পক্ষে সরাসরি যোগ দেয়। যেহেতু বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা তাদের কাছে পবিত্র বস্তুসমূহের মধ্যে পবিত্রতম।

যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় নেপোলিয়নের রাজদরবার আগের মতোই চকচকে এবং অমিতব্যয়ী, তবু সার্বিক উদ্বেগের চিহ্ন সর্বত্র লক্ষণীয়। সম্রাট এখন আর দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নাবালক মাত্র। রাজবংশ প্রতিটি তরফ থেকে কোণঠাসা এবং বিদ্রুপাত্মক বিরোধিতার সম্মুখীন। তুইলারির সকল মহলে নিদারুণ উদ্বেগের ছাপ। বৃথাই একের পর এক পুরোহিতসভার অভিমতের জন্য আত্মত্যাগ স্বীকার করা হয়। এই পুরোহিতসভা ছিলো সাম্রাজ্যের শক্তির মূল স্তম্ভ। এই পুরোহিতদের জন্যই রোমের ফরাসি সেনা শিবির পোপকে রক্ষা করে, চল্লিশ হাজার সরস ফরাসি সৈনিক সুদূর মেক্সিকোতে প্রেরণ করা হয় ক্যাথলিক জেহাদে অংশ গ্রহণ করার জন্য, এবং উক্ত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষামন্ত্রী ডুরুই (Duruy) কে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হয়। পুরোহিতরা তবু সন্তুষ্ট নয়। কারণ তারা সম্রাটকে ক্ষমা করতে পারেননি এজন্য যে তার প্রাথমিক হস্তক্ষেপের দরুন ধর্মদ্রোহী ইতালীয়রা প্রাচীন এবং অর্থডক্স হ্যাবসবার্গ ও বুরবঁ রাজবংশকে ইতালির মাটি থেকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়, তাছাড়া পোপ তার রাজ্যের বৃহৎ অংশের উপর থেকে হন অধিকারচ্যুত। প্রভাবশালী ক্যাথলিক বিশপগণ এবং পোপের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের সমর্থক পত্রিকাগুলো (লুই ভিউইলোর নেতৃত্বে। ইনি ছিলেন সাংবাদিক হিসেবে অগ্নিশর্মা মেজাজের) মনে করেন যে ফরাসি সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো সারা জগতের ক্যাথলিক স্বার্থের পক্ষে কাজ করা। উপরন্তু তারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শৈথিল্যকে চরম ভর্ৎসনা করেন। গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের মধ্যে তারা গির্জার ঘোরতর শত্রু খুঁজে পান।

পক্ষান্তরে তারা ১৮৬৪ সালের পাঠ্যসূচিকে প্রফুল্লচিত্তে অভ্যর্থনা জানান। কারণ উক্ত পাঠ্যসূচিতে পোপ সমকালীন সভ্যতার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সার্বজনীন ভোটাধিকারকে কোরো ভাষায় নিন্দা করেন। তাহলে প্রকারান্তরে যে সাম্রাজ্য গণভোটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে নিন্দা করা হলো।

এটিই যদি পূর্বোহিত তত্ত্বের মনোভাব হয় তাহলে আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি যে, নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থায় অধিকতর প্রগতিশীল শক্তি প্রশংসা করার মতো সদগুণ সামান্যই খুঁজে পাবে। ইহুদি মহাজন Fould-এর কোনো চমক নেই, কিংবা আইনবিশারদ Rouher-এর কিংবা দক্ষ অথচ অজনপ্রিয় হৌসম্যানের। অথচ এরা বুলভারগুলোতে চলাফেরা করে প্যারিসকে আজকের আধুনিক নগরীতে পরিণত করেছেন। সম্রাটের পরবর্তীকালীন বিদেশ নীতি ছিলো গৌরবহীন, কেবল একের পর এক গ্লানিকর অবজ্ঞা কুড়িয়েছে। তরুণরা মনে করে সরকার পরিচালনা করার জন্য নতুন লোক নিযুক্ত করা দরকার। চেম্বারে উদারবাদীদের প্রভাব বর্ধমান। এদের নেতৃত্ব দেন জনৈক এমিল অলিভিয়ার, একে ফরাসি গ্লাডস্টোন মনে করা হয়, তবে কথিত ইংরেজ ভদ্রলোকের মতো সাহসিকতার পরিচয় তিনি দিতে পারেননি, কিন্তু ছিলেন উচ্চমনস্ক, সংস্কৃতিবান এবং বাকপটু। এই এমিল অলিভিয়ার দাবি করেন যে, ১৮৬০ সালের মুক্তি সনদ পরিবর্ধন করতে হবে, তাছাড়া কায়েম করতে হবে দায়িত্বশীল সরকার। দীর্ঘকাল নিরবতার পর প্রজাতন্ত্রবাদ লিও মেমবেটার মধ্যে তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। এই লিও মেমবেটা দক্ষিণাঞ্চলের একজন তরুণ ব্যবহারজীবী। তিনি খোলাখুলি সাম্রাজ্য নিপাতের পক্ষে প্রচার শুরু করেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে ১৮৫২ সালের নির্বাসন থেকে সমাজতন্ত্রীরা মুক্তি পায়। আবার একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বরাতে তাদের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এই সমাজতন্ত্রীরাও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানে। সবচেয়ে বড় বিপদের কথা হলো গত দুই বছর যাবৎ সম্রাটকে শুধু অবজ্ঞা করা হয় না, তাকে রীতিমতো বিদ্রুপের বস্তুতে পরিণত করা হয়। এটা কোনো কাজের কথা নয় যে রাস্তার লোক তাকে খুনি বলে নিন্দা করবে। সবচেয়ে মারাত্মক ছিলো রসফর্টের মুখপত্র La Lanterne-এর অবিরাম ও বুদ্ধিমান গালিগালাজ। সে সময়ের সকল ফরাসি সাংবাদিকের মধ্যে তার লেখনি ছিলো সবচেয়ে নির্দয় এবং দায়িত্বহীন ব্যঙ্গাত্মক রচনায় পারঙ্গম।

পরিস্থিতি প্রকৃতই বিপজ্জনক। ১৮৬৯ সালের নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর উপর সরকারি চাপ থাকা সত্ত্বেও বিরোধী পক্ষ পঞ্চাশ শতাংশ ভোট পায়। অতঃপর অনেকে অনুমান করেন যে এবার অভ্যন্তরীণ বিপ্লব এবং বৈদেশিক যুদ্ধের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। পরিণামে, অভ্যন্তরীণ খুনিদের আঘাতে নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের অবসান ঘটবে, অথবা দেশের বাইরে ফ্রান্সের মর্যাদা সাফল্যের সঙ্গে বৃদ্ধি করে সম্রাট নতুন জীবন লাভ করবেন। তৃতীয় একটি পথ ছিলো, এটি গ্রহণ করার জন্য অলিভিয়ার সম্রাটের উপর চাপ প্রয়োগ করেন। সবশেষে, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ইতস্তত করার পর সম্রাট অলিভিয়ার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন। যে ধরনের উদারনীতি ইংল্যান্ড ও ইতালির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে তা ফ্রান্সের জন্যও অবলম্বন করা যায়। নির্বাচিত চেম্বারের কাছে দায়িত্বশীল একটি সমন্বয়াতিক মন্ত্রিসভা হয়তো সম্রাটের দায়িত্বের বোঝা লাঘব করতে পারে, সন্তুষ্ট করতে পারে কারিগর শ্রেণীকে, এবং বিপ্লবের উদ্দেশ্য ফাঁকা করে দিয়ে তার রাজবংশকেও হয়তো টিকিয়ে রাখা

যায়। এই লক্ষ্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। ১৮৭০ সালের ৫ জানুয়ারি একটি লিবারাল প্রশাসনের প্রধান হিসেবে অলিভিয়ার নিযুক্ত হন। উদারনৈতিক ধারায় শাসনতন্ত্র সংস্কার করা হয়, সংস্কারের পক্ষে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। দেখা যায় ছয় মিলিয়ন ভোটের সংখ্যা গরিষ্ঠতা সংস্কারের অনুকূলে। মনে হয় পরিস্থিতি শান্তি ও সমৃদ্ধির সহায়ক। সম্রাটের ক্ষমতাও বুঝি নতুন জীবন লাভ করলো। অলিভিয়ারের ইংগিতে লর্ড ক্লারেন্ডন বিসমার্কের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে। নতুন ফরাসি প্রধান মন্ত্রী সাড়ম্বরে ঘোষণা দিলেন, "আমরা যে দিকে তাকাই না কেন, সর্বত্র পীড়াদায়ক প্রশ্নের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করি ; এর আগে ইউরোপে শান্তি কখনো এতোটা নিরাপদ ছিলো না।" এক মাস পরই অপ্রত্যাশিত একটি অঞ্চলে আকস্মিকভাবে বিপ্লবের সূচনা হয়। দেশটি স্পেন। মাদ্রিদের সিংহাসন শূন্য হয়ে যায়। শুরু হয় যুদ্ধ। নেপোলিয়ন, অলিভিয়ার এবং তাদের উদার নৈতিক সাম্রাজ্য কোথায় ভেসে যায়। একই সময়ে জার্মানদের ঐক্যের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ আসে। বস্তুত জার্মান ঐক্য প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়।

১৮৭০ সালের ৩ জুলাই প্যারিসে খবর পৌঁছে যে প্রিন্স লিওপোল্ড অব হোয়েনযোলান সিগমারিনগেন, প্রুসীয় রাজার দূর কুটুম্ব, প্রিন্স এন্থনির পুত্র, যিনি প্রুসিয়ার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, এবং রুমানিয়ার রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কর্টেসের অনুমোদন সাপেক্ষে স্পেনের শূন্য সিংহাসনে আরোহণের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে গুরুতর কূটনৈতিক পরিস্থিতির অবতারণা হয়। হোয়েনযোলার্ন বংশের প্রার্থিতা বিষয়ে গোপনে আলোচনা হয় বার্লিনে ১৮৬৯ সালে, যখন প্রুসীয়রা জানতে পারে যে ফরাসিদের একটি পরিকল্পনা ব্যাপারে আপত্তি আছে, যে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ইউরোপের ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট হবে ফ্রান্সের ক্ষতি করে। উক্ত পরিকল্পনায় পঞ্চম চার্লসকে নিমন্ত্রণ জানানোর হুমকি রয়েছে। তাহলে কিভাবে এই ঘৃণ্য প্রার্থীর নাম পুনরায় ওঠে। ফরাসি সরকার তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে বিসমার্ক আরো একটি ষড়যন্ত্রে মদদ দিচ্ছে ফরাসি জনগণকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। তারা একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ২০ জুলাই কর্টেসের সভা শুরু হওয়ার আগেই যদি উক্ত প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে নেয়া না হয় তাহলে ফ্রান্স অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হবে। ৬ জুলাই বিদেশ মন্ত্রী গ্রামো চেম্বারকে জানান যে এই ঘটনায় দেশের মর্যাদা ও স্বার্থ জড়িত হয়ে পড়েছে। এমনকি অলিভিয়ার, উদারনীতিক, শান্তিবাদী, যথার্থ রাষ্ট্রবিদ, যিনি খোলাখুলি ঘোষণা দিয়েছিলেন (জার্মান মুদ্রণে) যে, দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্মানির স্বেচ্ছামূলক সম্মিলনে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিরোধ করবে না, প্রবল ক্রোধের উত্তাপ অনুভব করেন প্রুসীয়দের প্রতারণা এবং অসৎ মতলবে।

জনগণের মনের অবস্থা যখন সত্যিই উত্তেজনাপূর্ণ, তখন আকস্মিকভাবে স্বর্গ থেকে তৃপ্তিদায়ক কিছু পতনের মতো বেসরকারি খবর রটে (১১ জুলাই, সন্ধ্যায়) যে হোয়েনযোলার্ন বংশের প্রিন্স এন্থনি তার পুত্রের নামে স্পেনের সিংহাসনের দাবি প্রত্যাখান করতে সম্মত হয়েছেন। বিস্ময়টা বৃহৎ, স্বস্তিটা বৃহত্তর। মনে হয় বিপদ অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে, এবং ফ্রান্সের প্রতিবাদ কাজে লেগেছে। সম্রাট ও অলিভিয়ার ঘোষণা দেন যে তারা সন্তুষ্ট। নিশ্চিতভাবে এটি শুধু শান্তি নয়, মর্যাদার সঙ্গে শান্তি। তাই কি ? বয়োবৃদ্ধ গিজো (Guizot) জোর দিয়ে বলেন যে, তার মনে পড়ে না যে ফ্রান্স এর চেয়ে বড়ো কূটনৈতিক বিজয় কোনো দিন অর্জন করেছে।

শান্তি নামক পুরস্কার হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা তৃতীয় শ্রেণীর বোকামি করা হয়, ফলে পুরস্কার বিসর্জন দিতে হয়। গ্রামোঁ ছিলেন পেশাদার কূটনীতিক, যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রধান মন্ত্রীর চেয়ে তার মধ্যে অনেক বেশি কাজ করেছে। তিনি 'ফাদার এন্থনি'র সাদামাটা দাবি অস্বীকারের ঘোষণায় সন্তুষ্ট নন। তিনি প্রুসীয় রাজার কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা চান যে উক্ত দাবি প্রত্যাহারে তার সম্মতি আছে এবং উক্ত প্রার্থীর নাম আর কখনোই উত্থাপন করা হবে না। গ্রামোঁ আরো কিছু দূর অগ্রসর হন। প্যারিসের প্রুসীয় রাজদূতকে তিনি ইংগিত দেন যে এই ঘটনার জন্য তার প্রভুকে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই নিরেট বোকামির সঙ্গে গ্রামোঁ এককভাবে জড়িত ছিলেন না। চেম্বারকে ইতিমধ্যে উত্তেজনায় উন্মাদপ্রায় করে তোলা হয়েছিলো গত কয়েক দিনের ঘটনার সুযোগে। চেম্বারে জনৈক নির্বোধ সদস্য নিশ্চয়তার দাবি উত্থাপন করেন, আর নিশ্চিয়তার দাবির চিৎকার চেম্বার অতিক্রম করে সে কু-তে আছড়ে পড়ে। সম্রাট ভীত হয়ে পড়েন। অলিভিয়ার এবং তার মন্ত্রিসভাকে না জানিয়ে তিনি জুলাই মাসের তেরো তারিখে বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং প্রুসীয় রাজ দরবারের ফরাসি দূতকে নির্দেশ প্রদান করা হয় যে তিনি এমসে রাজা উইলিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং তার কাছ থেকে এই মর্মে নিশ্চয়তা আদায় করবেন যে তিনি প্রিন্স এন্থনির দাবি প্রত্যাহারের সঙ্গে জড়িত। তাছাড়া ভবিষ্যতে স্পেনের সিংহাসনে হোয়েনযোলার্ন বংশের কাউকে বসানোর নতুন কোনো প্রক্রিয়া অনুমোদন করবেন না।

যদিও স্পেনের ব্যাপারটা কখনো প্রুসীয় মন্ত্রিসভায় উত্থাপিত হয়নি, তবু ফরাসিরা সঠিক অনুমান করেন যে গোটা ষড়যন্ত্রের গভীরতর স্তরে বিসমার্কের হাত ক্রিয়াশীল। ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে যে কথাবার্তা চলছে তার পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি কোনো প্রচেষ্টাই বাদ রাখেননি। তিনি এখন এমন একটি মিত্র চান যাতে করে প্রুসীয় পণ্য সামগ্রী অবাধে স্পেনীয় বাজারে প্রবেশ করতে পারে, তাছাড়া ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে গেলে যেন পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে একটি মিত্র শক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি হোয়েনযোলার্ন বংশকে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য চাপ দেন, স্পেনীয়দের চাপ দেন প্রস্তাব নতুন করে উত্থাপন করার জন্য, আর রাজকীয় প্রভুকে চাপ দেন ব্যাপারটার অনুকূলে অবস্থান নিতে, ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যও বলা হয়। উপরন্তু একদিকে সযত্নে অস্বীকার করেন এ ব্যাপারে সরকারি হাত থাকার কথা, অপর দিকে রাজা, প্রিন্স এবং সমরনায়কদের পরিষদে বিষয়টা নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করেন।

সর্বাধিক গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়, কারণ আশা করা হয় যে কোনো প্রস্তাব করা হয়েছে এটা ফরাসিরা জানার আগেই জার্মান প্রিন্সকে মাদ্রিদে আনুষ্ঠানিকভাবে বসানো যেতে পারে। এখন দুটি ফলশ্রুতি দেখা দিতে পারে। দুটোর জন্যই বিসমার্কের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে। একটি হলো ফ্রান্স ও প্রুসীয়ার মধ্যে যুদ্ধ। দ্বিতীয়টি তেমন কাঙ্ক্ষণীয় নয়। ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ। কিন্তু বিসমার্ক তিক্ত হতাশার মধ্যে অবগত হন যে (১২ জুলাই), "ফাদার এন্থনি" মোটের উপর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, ফরাসি কূটনীতি বিজয়ী, আর ফরাসি খবরের কাগজগুলোর ঔদ্ধত্য ঠাণ্ডা করা গেলো না। তার Thoughts and Recollections গ্রন্থে তিনি এই ঘটনাকে তার দেশের জন্য ওলমুৎসের ঘটনার পর সবচেয়ে কলঙ্কজনক ব্যাপার হিসেবে দেখেন।

বিসমার্ককে গভীর হতাশা থেকে উদ্ধার করেন গ্রামোঁ। বেনেদিতি যখন এমসে জার্মান রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন বৃদ্ধ রাজা ভদ্রতা ও দৃঢ়তা, উভয়ের পরাকাষ্ঠা দেখান তিনি কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করবেন না। সাক্ষাৎকারের ইতি ঘোষণা করেন। ফরাসি দূত এরপরও রাজা উইলিয়ামের সঙ্গে দু'বার দেখা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজা আর কোনো সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হননি। তবে লোক মারফত জানিয়ে দেন যে প্রিন্স লিওপোল্ডের কাছ থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার সংক্রান্ত সরকারি বার্তা পেয়েছেন। এবং এ ব্যাপারে তাঁর নিজের সম্মতি রয়েছে। রাজা মনে করেন এখানেই ব্যাপারটা নিষ্পত্তি বা শেষ হবার কথা। রাজা এবং ফরাসি রাজদূতের সঙ্গে সম্পর্ক নিখুঁত সৌজন্যমূলক। একে অপরের শুভ কামনা করতেন। তাছাড়া যুদ্ধ এড়ানো উভয়ের লক্ষ্য ছিলো।

এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ রাজকীয় টেলিগ্রামের মাধ্যমে বার্লিনে বিসমার্ককে জানানো হয়। এই সময় বিসমার্ক রাতের আহার গ্রহণ করছিলেন মল্টকি এবং জেনারেল রুনের সঙ্গে। তাৎক্ষণিকভাবে এই কূটকৌশলী দেখতে পান যে শত্রু তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। একটু সতর্ক নজর দিয়ে যে কোনো বিবৃতিকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যায়, এবং টেলিগ্রামের সারাংশ বহন করেও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো যায় যে, বানানো বিবৃতি অনুসারে মনে হবে ফরাসি দূত প্রুসীয় রাজার সঙ্গে যথাযথ আচরণ করেন নি, এবং রাজা বাধ্য হয়ে তাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। "এটি একটি চ্যালেঞ্জ," বললেন মল্টকি। "চমৎকার,' বললেন ফন রুন। বিসমার্ক এবং সমরনায়ক দু'জন সঠিক ছিলেন, কারণ এমস টেলিগ্রামের কারণেই জার্মানি এবং ফ্রান্সে আগুন জ্বলে ওঠে।

জুলাই মাসের ১৪ তারিখে সকাল বেলা গ্রামোঁ হুড়মুড় করে অলিভিয়ারের কামড়ায় ঢুকে পড়লেন। তার হাতে নর্থ জার্মান গেজেটের একটি কপি, তাতে এমস টেলিগ্রামের বিসমার্ককৃত পাঠ রয়েছে। অলিভিয়ার চিৎকার করে উঠলেন, "তারা আমাদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করতে চায়।" দিনটি গেল উদ্বেগাকুল সিদ্ধান্তহীনতার ভেতর। সম্রাটের পরামর্শ সভায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিতর্ক চলে, একবার শান্তির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, আবার দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধের অনুকূলে ঝুকে পড়া হয়। বিকেল চারটার সময় রিজার্ভ সৈনিকদের তলব করার জন্য সিদ্ধান্ত নেবার পরই সাড়ে ছ'টার দিকে সাব্যস্ত হয় যে একটা সম্মেলন ডেকে সমস্যাটা তোলা হবে। কিন্তু রাতের আহার গ্রহণ করার পরই শান্তির বিপক্ষে মন শক্ত হয়ে যায়। গভীর রাতে সিদ্ধান্ত পাকা করা হয় যে ভোরবেলা যুদ্ধের ঘোষণা জারি করতে হবে। সন্ধেবেলা কাউন্সিলের সভায় সম্রাজ্ঞী উপস্থিত ছিলেন। তিনি যুদ্ধের নিরব অনুরাগী। প্যারিস নগরীর জনতার মন ভ্রান্ত হতে পারে না। সভায় সম্রাট বললেন, "আমাদের যুদ্ধ করার মতলব না থাকলেও জনগণের প্রতি আনুগত্যবশত আমাদের যুদ্ধের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।" এ ব্যাপারে জনগণ যে কতোটা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ছিলেন তা প্যারিসের সড়কগুলোর রণধ্বনি শুনলেই বোঝা যায় : "বার্লিন!" এবং "যুদ্ধ দীর্ঘজীবী হোক!"

প্যারিসে যুদ্ধটা জনপ্রিয় হয়ে থাকলেও, ৮৭টি বিভাগের মধ্যে ৭১টি বিভাগে "ব্যাপারটি ইতস্তত কিংবা দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়।" এটি ছিলো অবরকারি, হৃদয়হীন যুদ্ধ, এর জন্য প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে বিসমার্ক এবং গ্রামোঁ-কে। বিসমার্ক দায়ী এজন্য যে তিনি গোপনে প্রার্থীর ব্যাপারটা নিয়ে কৌশল খাটান এবং এমস টেলিগ্রাম পরিবর্তন করেন, গ্রামোঁ

এজন্য দায়ী যে তিনি সরাসরি আবেগের বশবর্তী হয়ে শান্তির সেতু ভেঙে দেন। এই যুদ্ধের জন্য দোষের অংশীদার রাজা উইলহাম এবং সম্রাটকেও হতে হবে। রাজা ছিলেন অত্যন্ত মতলববাজ, অথচ তাঁর বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে স্পেনীয় অভিযান অনুমোদন করতে সম্মত হন ফ্রান্সের সঙ্গে কোনো প্রকার পরামর্শ না করে। অথচ তিনি ভালো করেই জানতেন যে ফ্রান্সের স্বার্থ জড়িত। সম্রাটও সমান দায়ী, কেন তিনি গ্রামোঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে নিশ্চয়তার ভয়ানক দাম করে বসলেন। তার অবস্থান চেম্বারে রক্ষণশীলদের ছালাময়ী বক্তৃতা এবং পার্লামেন্ট ঘরের কাগজগুলোর অগ্নিগর্ভ লেখনির দরুন বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এটুকু ঠিক। কিন্তু একজন দৃঢ়চিত্ত শাসক শেষ পর্যন্ত মাথা গরম হতে দিতেন না, উপরন্তু দরবারের বাইরের শ্রেণী রাজনীতিক দ্বিয়ের যুদ্ধের বিরুদ্ধে জোর গলায় কথা বলতে এতোটুকু ভয় পাননি।

সব কিছু ঘটতে থাকে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে। এক পক্ষ কালের মধ্যে গভীর শান্তি থেকে ঘোরতর ঘোষিত যুদ্ধে ইউরোপ পা রাখে। ঘোর গ্রীষ্মের অবকাশ কালে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ এবং সংবাদপত্রের মুদ্রণ যন্ত্র অভাবিত বিবাদকে চূড়ান্ত উত্তেজনায় পর্যবসিত করে, এবং যুক্তিশীলতা কিংবা ভদ্রতা সুযোগ গ্রহণের আগেই জগতের দুটি সভ্যতম দেশ পরস্পরের প্রতি চরম ঘৃণায় প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। উভয় পক্ষে সৈনিকরা হিংস্র মনোভাব সহকারে যুদ্ধের পক্ষে অভিমত দেয়।

সকল ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাকে বিভ্রান্ত করে ফ্রান্সের সুখ্যাত নিয়মিত বাহিনী পনেরো দিনের মধ্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। দক্ষিণ জার্মানির মাটিতে যুদ্ধ ঠেলে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তাদের হয় না। এটি ঘটে ফরাসি সৈনিকদের যুদ্ধ করার সমর্থতার ঘাটতির জন্য নয়। ফরাসিদের সামরিক বিন্যাসের অদক্ষতাই এর জন্য দায়ী। অথচ জার্মান বাহিনী ছিলো অত্যন্ত নিখুঁত একটি প্রতিষ্ঠান। জার্মান জনগোষ্ঠীও ছিলো জগতের সবচেয়ে সংগঠিত।

প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি জাতির সৈন্য সমাবেশের কায়দা ছিলো খুবই শিক্ষণীয় ব্যাপার। কারণ যুদ্ধে সৈন্য সমাবেশের কায়দা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে একজন জার্মান গ্রামবাসী পতাকাতলে হাজির হওয়ার জন্য ডাক পেলেই হাতের কাছে পেয়ে যেতেন যুদ্ধাস্ত্র এবং উর্দি, সেখানে একজন ফরাসি সেনাকে হয়তো সমগ্র ফ্রান্স অতিক্রম করতে হতো, কিংবা সাগর পাড়ি দিয়ে যেতে হতো আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে রেজিমেন্ট ডিপোতে হাজিরা দেয়ার জন্য। এর ফলাফল দাঁড়ায় এই যে, যেখানে জার্মান সৈন্য রণাঙ্গনে প্রেরণ করা সম্ভব হতো অতি সহজে এবং নিয়মমাফিক, সেখানে বন্যতম হতবুদ্ধিকর অবস্থা বিরাজ করতো ফরাসি রেলপথগুলোতে। ফলে দেখা যেতো ফরাসিরা প্রস্তুত হবার আগেই জার্মানরা উন্নততর বাহিনী নিয়ে সীমান্তে হাজির। নেপোলিয়নের অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে জড়িত করার একমাত্র সুযোগ যেমন ছিলো প্রারম্ভিক বিরাট সুযোগ, তেমনি ফরাসিদের সৈন্য সমাবেশে শোচনীয় অদক্ষতা এই যুদ্ধের জন্য সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি জন্ম দেয়।

আক্রমণকারীদের দ্বিতীয় সুযোগটি এই ছিলো যে তারা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে, এবং কিন্তু টেলিগ্রাফ এবং শানারি বিদ্যার সাম্প্রতিক বিকাশের আলোকে, প্রস্তাবিত যুদ্ধের সমগ্র বিষয়টি বিজ্ঞতার সঙ্গে আগেই বিচার করে দেখে। যেখানে ফরাসিরা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি যে তাদের বীর মূল ভূ-খণ্ড প্রতিরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময়সীমা হতে পারে, সেখানে তিন বছর আগেই ফরাসি দেশ আক্রমণ প্রতীত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই লক্ষ

সামনে রেখেই প্রধান সড়কগুলোর মানচিত্র আঁকা, রেলপথগুলোর পরিবহণ ক্ষমতার রূপরেখা সম্পন্ন করে। এদিকে ফরাসি বাহিনীর সংগঠনের স্বরূপ, অস্ত্রসম্ভার, ইউনিটগুলোর বণ্টনব্যবস্থা সম্পর্কে বার্লিনের জেনারেল স্টাফের তথ্য-ভাণ্ডার ছিলো প্রায় সম্পূর্ণ। প্রতিটি জার্মান বাহিনী ফরাসি ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করার সময় উক্ত তথ্য ভাণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত হয় চলন্ত ও সদাসতর্ক অশ্বারোহী বাহিনী। নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং বিরতি দিয়ে এদের সাহায্য মেলে

হয়তো প্রত্যাশা করা হয়েছে যে জার্মান সামরিক ব্যবস্থার বিস্তারিত প্রস্তুতি ব্যক্তি উদ্যোগের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। কিন্তু তা হয়নি। জার্মান জেনারেল স্টাফের নীতি এই ছিলো যে অধীনস্ত অধিনায়কদের ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। বরং ফরাসি বাহিনীগুলোর গতিবিধি প্রায়ই ব্যাহত হতো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতি অতিরিক্ত আস্থার জন্য। কোনো জার্মান জেনারেল কামানের আওয়াজ অনুসরণ করে চলতে দ্বিধা করেননি, এবং প্রয়োজন যেখানে খুব বেশি সেখানে সৈনিকদের ঠেলে দিতে তাদের দু'বার ভাবতে হয়নি। অধীনস্ত জার্মান অধিনায়করা যে চমৎকার উদ্যমের পরিচয় দেন তা এই যুদ্ধের ছিলো সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

একটি যুদ্ধে সব কিছু নির্ভর করে বেসামরিক এবং সামরিক উচ্চ পর্যায়ের কর্তাদের পাশাপাশি কাজ করার যৌথ সমর্থতার উপর। উপরন্তু তাদের যৌথভাবে কাজ করতে হয় আস্থা জাগিয়ে তোলার জন্য, জাতিকে এবং বাহিনীগুলোকে দিতে হয় সুদৃঢ় এবং অনুপ্রাণিত হবার মতো নির্দেশনা। এই সব বিশেষ ব্যাপারগুলোর ক্ষেত্রে ফরাসিরা সেই ১৮৭০ সালের গ্রীষ্মকালে বাস করতেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক বৈকি। তাদের উচ্চপর্যায়ের সামরিক কিংবা বেসামরিক অধিনায়কত্বে আকর্ষণ কিংবা নিয়মনিষ্ঠ কোনো পদ্ধতি ছিলো না। নেপোলিয়ন পঙ্গু, নিদারুণ যন্ত্রণায় সর্বদা কাতর, তার সমরমন্ত্রী, লে বুউফ (Le Boeuf), সুপ্রিম কমান্ডে তার উত্তরাধিকারী বাজেইন। এরা সবাই ছিলেন যুদ্ধ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের জ্ঞানরহিত, চূড়ান্ত অযোগ্য। এদের পশ্চাতে, প্যারিসে রয়েছে ভীত-সন্ত্রস্ত বেসামরিক সরকার। এদের প্রধান হলেন সম্রাজ্ঞী, তিনি সুন্দরী বটে, তবে সবার অপছন্দ। এদিকে গণ বিপ্লবের হুমকি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামরিক ক্ষেত্রে প্রায় অযোগ্য, এবং বেসামরিক হতবুদ্ধিকর অবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির অবস্থান। এই জার্মানির রাজবংশের শেকড় গভীরে প্রোথিত, এদের খেদমতে নিয়োজিত বিসমার্ক, রুন এবং মল্টকির মতো প্রতিভা। এই ত্রয়ীর সহায়ক সামরিক ও বেসামরিক যোগ্য অফিসার বাহিনী। এরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তদানিন্তন ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ পাবলিক সার্ভিস স্কুলগুলোতে।

সব শেষে আর একটি ক্ষেত্রে দুটি পক্ষের তুলনা করে এই প্রসঙ্গের ইতি টানা যায়। জার্মানদের নিয়ম হলো শর্ট সার্ভিস। ফরাসিরা লং সার্ভিসের পক্ষপাতী। প্রুশীয় নিয়ম অনুসারে দুই বৎসর থাকতে হবে নিয়মিত বাহিনীতে, চার বৎসর রিজার্ভ বাহিনীতে, পাঁচ বৎসর ছয় মাস যুক্ত থাকতে হবে আধা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে। জার্মানরা এই নিয়ম পালন করে পাঁচ শো হাজার সৈনিকের বাহিনী গঠনের জন্য। এদের সাহায্য করার জন্য সংগৃহীত সৈনিকের বিরাট মজুদ বাহিনী তো থাকবেই। ফরাসিদের নিয়মে নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে পাঁচ বছর। এই নিয়ম দেশের বাইরে দূর-দূরান্তে ঔপনিবেশিক যুদ্ধাভিযানের উপযোগী হতে পারে, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে কোনো কাজে লাগেনি। জার্মানির নিয়মিত বাহিনী যদি যুদ্ধাভিযানের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তদস্থলে মোতায়েন করা যাবে মূল

বাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকদের। কিন্তু ফ্রান্সের নিয়মিত বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবার পর তাদের নির্ভর করতে হয় সংগৃহীত সৈনিকদের (levies) উপর, এদের প্রশিক্ষণ বলতে কিছু নেই। ফ্রাংকো-প্রুসীয় যুদ্ধের শেষ পর্বে এই অসুবিধাটা খুব বেশি অনুভূত হয়।

কিন্তু গ্রীষ্মের শেষ ভাগে ফ্রান্সের করুণ ও মর্মান্তিক দিন কেটেছে। জার্মানরা অদম্য গতিতে সম্মুখের সব বাধা অতিক্রম করে। ভের্থে তারা পরাজিত করে ম্যাকমোহনকে, স্পিশেরেনে ফুসাডকে, এবং এই দুটি বিজয়ের বদৌলতে, একটি আলসেসে, অপরটি লরেনে, দুটি যুদ্ধই ৬ আগস্ট সংঘটিত হয় এবং আক্রমণকারী বাহিনী সীমান্তে পৌছার মাত্র দুদিন পরই। এতে গোটা দেশে এতোটা হতাশা, ক্ষোভ এবং আতংক ছড়ায় যে সম্রাট তার সর্বাধিনায়কের পদ পরিত্যাগ করে বাজেইনকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। এদিকে সৎ বাকপটু, দুর্বলচিত্ত অলিভিয়ার রাজনীতির মঞ্চ থেকে বাকি জীবনের জন্য বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তার স্থলাভিষিক্ত হন আগস্ট মাসের দশ তারিখে জনৈক অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, কাউন্ট দ্য পলিকাও, বিহ্বল সম্রাজ্ঞী এর উপর শেষ ভরসা স্থাপন করেন।

এই সব পরিবর্তন কোনো কাজে লাগেনি। আক্রমণের প্রচণ্ডতা রোধ করা বাজেইনের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তিনি ধীর গতিতে পশ্চাদপসারণ করেন, এতোটা ধীর গতিতে যে জার্মানরা তাকে ঘিরে ফেলতে সমর্থ হয়, মারস লা তুরে তিনি আটকা পড়েন, এবং ১৮ আগস্ট গ্রেভলটের রক্তাক্ত যুদ্ধের বিজয়ের পর বাজেইনকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পূর্বাঞ্চল অভিমুখে, তিনি মেস-এর দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে এক শত সত্তর হাজার শ্রেষ্ঠ ফরাসি বাহিনীসহ তিনি অবরুদ্ধ হন। অবরোধ নস্যাৎ করার জন্য তিনি কোনো চেষ্টাই করেননি। অবশেষে অক্টোবর মাসের সাতাশ তারিখে তিনি আত্মসমর্পণ করেন, উপরন্তু ভীরুতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে দুই শত হাজার অবরোধকারী বাহিনীর সৈনিকদের মুক্ত করে দেন। এরা এখন তার দেশকে পদানত করার জন্য সহায়তা করবে। ইত্যবসরে সেই আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে নিয়মিত বাহিনীর একটি অংশ Chalons-এ জমায়েত হয় ম্যাকমোহনের নেতৃত্বে। এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই সর্বশেষ মুক্ত এবং মূল শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন এই বাহিনী কি অভিযান পরিচালনায় কাজের কাজ কিছু করতে পারবে বা এদের সঠিকভাবে কাজে লাগানো যাবে। মনে হয় ম্যাকমোহন বিজ্ঞতার সঙ্গেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে শ্যালোঁর (Chalons) বাহিনী ঠিক এই মুহূর্তে শত্রুর মোকাবেলা করবে না। বরং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে বাহিনীগুলো রয়েছে সেগুলো শ্যালোঁর বাহিনীকে ঘিরে প্যারিসের সুরক্ষিত দুর্গগুলোর সামনে সংহত হবে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী এবং তার পরামর্শদাতারা পশ্চাদপসরণের কথা শুনতে রাজি নন। তারা চান যে প্যারিসের জন্য বাজেইনের দরকার, আর দরকার পূর্বাঞ্চলে একটি বিজয়। তাছাড়া শ্যালোঁর বাহিনী যদি পশ্চাদপসরণ করে তাহলে জনগণ বিদ্রোহী হবে, সম্রাটকে করবে উৎখাত। অনিচ্ছুকভাবে, এবং বাজেইনের সুপরামর্শের বিরুদ্ধে সাধারণ সৈনিকরা উক্ত দাবি মেনে নেয়। অতঃপর যখন শোনে যে বাজেইন উত্তর অভিমুখে যাত্রার প্রস্তাব করেছেন তখন তারা উত্তর-পূর্ব অভিমুখে, বেলজিয়াম সীমান্তের দিকে যাত্রা শুরু করে। মল্টকি তাকে অনুসরণ করছেন। সেডান নামক ছোট্ট শহরে ফরাসি বাহিনীকে ঘিরে ফেলা হয়, প্রচণ্ড গোলার আঘাতে বাহিনী হয় ছিন্নভিন্ন, অতঃপর আত্মসমর্পণ করে। এই যুদ্ধের লুণ্ঠিত মালের মধ্যে স্বয়ং নেপোলিয়ন অন্তর্ভুক্ত।

তারিখ ২ সেপ্টেম্বর ; দুই দিন পর প্যারিসে প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা জারি হয়, এদিকে যুল ফাভর যখন ঘোষণা দেন যে ফ্রান্স তার দুর্গগুলোর একটি ইঁট কিংবা এক টুকরো ভূ-খণ্ডও শত্রুর হস্তগত হতে দেবে না, তখন সম্রাজ্ঞী জনৈক আমেরিকান দন্ত চিকিৎসকের সাহায্যে রাজনৈতিক নির্বাসনের 'ক্লাসিক হোমে'র দিকে গোপনে যাত্রা শুরু করেন। বোনাপার্টতন্ত্রের এখানেই ইতি। এই বিশেষ বানাপার্টতন্ত্রী রাজতন্ত্রের ভিত্তি ছিলো গণভোট। এই রাজতন্ত্র প্রথম নেপোলিয়নের অপচ্ছায় প্রায় সমগ্র ইউরোপকে একতাবদ্ধ করার পর বিদায় গ্রহণ করে ফ্রান্সের ভূ-ভাগের বিরাট অংশ হারিয়ে এবং মর্যাদার অনেকটা বিলীন করে দিয়ে। উপরন্তু ফ্রান্সকে মুখোমুখি দাঁড় করায় একটি নতুন ও ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বীর।

সম্রাটের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবসান ঘটে। ফরাসি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখন শুরু হবে। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করলে সাব্যস্ত করতে হয় যে শান্তি আদায় করা যায় যদি মেৎস অধিকার করা না হয় এবং বাজেইনের বাহিনী অক্ষত অবস্থায় থাকে। কিন্তু ভাবাবেগ ঠাণ্ডা হিসেবের তোয়াক্কা করে না। তাছাড়া প্রতিটি জাতির ইতিহাসে কিছু লগ্ন আসে যখন জনগণের মানসিক শক্তির প্রকাশ যতোই অন্ধ হোক না কেন তার মূল্য সাদামাটা লাভ ও ক্ষতির হিসেবের চেয়ে অনেক বেশি। জাতীয় যুদ্ধের তাৎপর্য কঠিনতম শান্তি হলেও এই যুদ্ধ ফরাসিদের আত্মমর্যাদার কিছুটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, উপরন্তু আগামী হতাশাব্যঞ্জক দিনগুলোতে সাহস যোগায়। এই যুদ্ধ বাস্তবিক পক্ষে বেপরোয়া যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু শত্রু পক্ষের শান্তি কেড়ে নেয়। এই যুদ্ধের গোড়ার দিকে, পেশাদার পর্যায়ও আক্রমণকারী বাহিনী এতোটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। যুদ্ধাভিযানের পরিধি এখন আরো বিস্তৃত, যোগাযোগের ক্ষেত্র দীর্ঘায়িত ; অপিচ franc-tireures-এর হুমকির সম্মুখীন প্রায়ই হতে হয় ; যে নতুন ফরাসি বাহিনী দেশের প্রতিটি অঞ্চলে মাথা উঁচু করছে তার শক্তি জরিপ করা কিংবা তাদের অবস্থান নির্ণয় করা আগের মতো সহজ নয়। প্রশিক্ষিত রির্জাভ বাহিনী পাওয়া গেলে ফরাসিরা হয়তো গুরুতর দুর্দশাকে গুরুতর হুমকিতে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হতো।

এই যুদ্ধকে জনগণের ইচ্ছামাফিক দীর্ঘায়িত করার কাজটি করেন লিও গেমবেটা। এই গেমবেতা দক্ষিণ অঞ্চলের। অসাধারণ বাগ্মী, ইনি প্রথম সবার নজর কাড়েন সম্রাটকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে সুবিখ্যাত বিচারের সম্মুখীন হয়ে। কোনো প্রতিবন্ধকই গেমবেটার কাছে পাত্তা পায় না। জার্মানরা যখন প্যারিস নগরী ঘিরে ফেলে তখন তিনি ৭ অক্টোবর, ব্যালুনে করে রুয়েনে পালিয়ে যান। তার ব্যাপক ও প্রাণোচ্ছল শক্তি দ্বারা তিনি মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে এক শত আশি হাজার সৈন্যের বাহিনী খাড়া করেন। অর্লিয়-র সন্নিকটে, কুলমিয়েরে জার্মানরা প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পায় গেমবেটার বাহিনীর কাছে। বাজাইন যদি মেৎসে যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে সমর্থ হতেন তাহলে হয়তো কুলমিয়েরের বিজেতা D'Aurelles প্যারিসের সেনা ছাউনির সহায়তায় অবরোধ ভাঙতে পারতেন। কিন্তু মেৎসের আত্মসমর্পণ এই যুদ্ধাভিযান নিশ্চিতভাবে প্রভাবান্বিত করে। জার্মানি তার ঘোর দুঃসময়ে একটি বিরাট ও শক্তিশালী বাহিনীর সহায়তা লাভ করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে গেমবেটার আধা-প্রশিক্ষিত অনভিজ্ঞ বাহিনী সংখ্যা, প্রশিক্ষণ, যুদ্ধ উপযোগী সজ্জায় উন্নততর বাহিনীর মুখোমুখি হয়। দয়রেলেস অর্লিয়ঁর কাছে কম করে তিন বার পরাজিত হন, তিন দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর লোঁয়া-য় (১০ জানুয়ারি, ১৮৭১) শানজি হন পরাস্ত। কয়েদার্ব উত্তরাঞ্চলে প্রারম্ভিক সাফল্য অর্জনের পর

সেইন্ট কুইন্টিনে পরাজয় বরণ করেন (১৯ জানুয়ারি)। সাফল্য অর্জনের জন্য অতিরিক্ত পরিকল্পিত একটি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলকে উজ্জীবিত করার জন্য, এবং সেখান থেকে বাভেনে আক্রমণ চালিয়ে একটা শক্তিশালী বিকল্প পথ অনুসন্ধান করা সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা বৃহত্তর বিপর্যয় বরণ করে, কারণ বুরবাকির পঁচাশি হাজার সৈন্যের বাহিনী, সমরসজ্জার অপর্যাপ্ততার দরুন সুইজারল্যান্ডের হয় পরাস্ত, তাড়িয়ে নিয়ে সুইজারল্যান্ডের নিরপেক্ষ ভূ-খণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখানে তাদের চূড়ান্ত অমর্যাদাকর উপায়ে নিরস্ত্র করা হয় (১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১)।

ইতিমধ্যে প্যারিস অবরোধজনিত অপ্রত্যাশিত দুর্ভোগের শিকারে পরিণত হয়েছে। সদা পরিবর্তনশীল এই নগরীর অধিবাসীদের একই সঙ্গে ক্রোধ এবং গ্লানিবোধ অধিকার করে। অথচ এই নগরী যুদ্ধের সূচনার পূর্বক্ষণে হালকা চালে রণধ্বনি তুলেছিলো "বার্লিন।" আর এখন পরাজয়ের তিক্ততম স্বাদ ভোগ করছে। সর্বত্র খাদ্যের অভাব, যুদ্ধচক্র ভেদ করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ, ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ, আর আতংকের ছাপ সর্বত্র লক্ষ করা যায়, প্রুসীয় কামনাগুলো দুর্গে তো বটেই, বেসামরিক লোকদেরকেও তাক করে। এতে জনমনের 'অবরুদ্ধ জ্বরভাব' প্রকাশ পায় (ফরাসিদের ভাষায়)।

সবশেষে, অবরোধকারীদের অবরুদ্ধ করার জন্য প্রতিকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পর, শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়ায় উপনীতি হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। যুদ্ধ বিরতি বৃদ্ধি করা হয়, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, বর্দুতে একটি সমাবেশ থিয়েরকে প্রধান নির্বাহী হিসেবে নির্বাচন করে তাকে শত্রুপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়। প্রধান প্রধান বিষয়ে বিসমার্ক খুব ভেদ ধরেন। তিনি দাবি করেন আলসেস এবং মেৎসসহ লরেনের বৃহত্তর অংশ, এবং ক্ষতিপূরণ। দুইশো মিলিয়ন পাউন্ডে তিনি সন্তুষ্ট হবেন বলে জানান। প্রুসীয়ানদের এখন যে অবস্থা তাতে যে কোনো রাষ্ট্র ঈর্ষা বোধ করতে পারে। কোনো দিক থেকে দেশটিকে আক্রমণের কোনো সুযোগ নেই। যখন থিয়ের নমনীয় হতে অস্বীকার করেন তখন বিসমার্ক হুমকি দেন যে সে ক্ষেত্রে তিনি নেপোলিয়নের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন। কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি থিয়েরকে ছাড় দিতে রাজি। সেটি হলো জার্মান বাহিনীকে যদি প্যারিস নগরী দখলে রাখতে দেয়া হয় তাহলে ফরাসিরা বেলফোর্টের উপর দখল কায়েম রাখতে পারে। ১৮৭১ সালের ১০ মে তারিখে ফ্রাংকফুর্ট শান্তি চুক্তিতে এই শর্তগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং জার্মানরা তা ফরাসিদের উপর চাপিয়ে দেয়। যেমন পরবর্তী কালে ভার্সাই-র শান্তি চুক্তি মিত্রপক্ষ জার্মানির উপর চাপিয়ে দেয়। ক্ষতিপূরণ ছিলো অকিঞ্চিৎকর অংক, এর মীমাংসা হতেও কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি। তবে ফ্রান্সের কেউ শব্দসমূহ কিংবা মেৎস-এর হস্তান্তর মেনে নিতে পারেনি। ব্যাপারটা তারা বাধ্য হয়ে মেনে নেয় কিংবা নামমাত্র মেনে নেয়।

থিয়ের ছিলেন অগ্নিগর্ভ, দেশানুরাগী রাষ্ট্রবিদ। তিনি তার পরাস্ত দেশের হয়ে শান্তি স্থাপনের প্রাথমিক খুঁটিনাটি কাজগুলো সম্পন্ন করেন। এই থিয়ের গোড়াতেই তার দেশবাসীকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি এবার বিদেশের দরবারগুলোতে ব্যর্থকাম মিশনে ইতি টেনে দেশে ফিরেছেন। কোনো রাজদরবারে সাহায্যের হাত বাড়তে কিংবা মধ্যস্থতা করতে রাজি নয়। এই খুদে ব্যক্তিটি, তার খুদে শয়তানের অবয়ব, চিন্তাকৃষ্ট মাথা, স্বাভাবিকের চেয়ে বৃহদাকৃতি চশমা চিত্র আঁকিয়েদের জন্য ছিলো

মজার খোরাক, তিনি ছিলেন ফ্রান্সের সর্বকালের ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সিভিলিয়ান। তিনি জার্মানির সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন, দমন করেন কমুনের বিদ্রোহ, এবং তার পক্ষেই সম্ভব হয় ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, যদিও বিশ্বাসের দিক থেকে ছিলেন অর্লিয়পন্থি। এই প্রজাতন্ত্র বেশ কয়েকটি বিপদ গোড়ার দিকে কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়। উপরন্তু, এই শাসন ব্যবস্থাই ফ্রান্সকে সব চেয়ে কম বিভক্তির দিকে নিয়ে যায়। এই প্রজাতন্ত্র হয় সবচেয়ে শক্তিশালী, টিকে থাকে দীর্ঘকাল এবং চল্লিশ বছর পর ফ্রাংকো-প্রুসীয় যুদ্ধের রায় পাল্টে দিতে সমর্থ হয়।

বিসমার্ক আলসেস ও লরেন এবং বড় বড় দুর্গগুলোর অন্যতম মেৎস দাবি করে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে বিবাদকে স্থায়ী রূপ দেন এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজ বপন করেন। বিসমার্ক তার বিজয় গৌরব দীপ্ত জীবনে এই যে ভুলটি করেন তা ছিলো সবচেয়ে বড় ভুল, এবং যার পরিণাম দাঁড়ায় অত্যন্ত গুরুতর সুদূরপ্রসারী। আলসেস অবশ্যই একটি জার্মান প্রদেশ ছিলো, এতে কোনো সন্দেহ নেই ; লরেন ছিলো প্রধানত ফরাসি। আলসেস জার্মানদের কাছ থেকে কেড়ে নেন ম্যাজারিন, দ্বিতীয়টি পঞ্চদশ লুই লাভ করেন সাধারণ ইউরোপীয় বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে। দুটি প্রদেশের উপর, অন্তত আলসেসের উপর, জার্মান সাম্রাজ্য ঐতিহাসিক দাবি জানাতে পারে ন্যায়সংগতভাবে। অথচ যে জনসমষ্টি ফরাসিদের সামাজিক বিধানের জন্য উপকৃত হন তাদের মতামত জ্ঞাপনের কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি। স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কিছুমাত্র কথা না বলে তাদের এমন একটি জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় যাদের সঙ্গে তাদের জীবন জড়িয়ে পড়েছিলো। পক্ষান্তরে তাদের ন্যস্ত করা হয় বিজেতাদের জোয়ালের নিচে।

প্যারিস নগরী পতনের কয়েক দিন আগে ভার্সাই-র হল অব মিররে (Hall of Mirrors) জার্মান সাম্রাজ্যের পক্ষে ঘোষণা জারি করা হয়। ভের্থে যে বিজয় অর্জিত হয় তার খবর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় দূর-দূরান্তরে। এই বিজয় অর্জন করে ব্যাভারিয়া এবং উর্টেমবার্গের বাহিনী, প্রুসিয়ার ক্রাউন প্রিন্সের অধিনায়কত্বে। এদিকে সেডানে নেপোলিয়ন কর্তৃক আত্মসমর্পণের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলো ইউনিয়নে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। এই আগ্রহকে তৎক্ষণাৎ অভিনন্দন জানানো হয়। এ সময় অনেকেই ভাবতেন যে স্বর্ণ সুযোগ এসেছে, এখন শক্তিশালী কেন্দ্রশাসিত জার্মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। বিসমার্ক এদের দলে ছিলেন না। তিনি বললেন, "অনিচ্ছুক ব্যাভারিয়াকে আমরা চাই না, আমরা তাদের চাই যারা ইউনিয়নে স্বেচ্ছায় যোগ দেবে।" ব্যাভারিয়া যদি রাইখে যোগ দিয়ে সন্তুষ্ট বোধ করে তাহলে তাদের অনেক বিষয়ে ছাড় দেয়া যেতে পারে। শান্তির সময়ে সেনা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে থাকবে, পররাষ্ট্র নীতিতে তাদের মতামতের মূল্য দেয়া হবে, অন্যথা ব্যাভারিয়ার থাকবে স্বতন্ত্র ডাক ও তার ব্যবস্থা। বিসমার্কের বিজ্ঞতার পরিচয় প্রমাণ এখানে পাই যে, হোয়েনযোলার্নের উইলিয়াম কর্তৃক সম্রাটের মুকুট ধারণের সময় ব্যাভারিয়ার সম্মতি চাওয়া হয়, এমনকি তাকে এ বিষয়ে প্রস্তাব করতে আহবান জানানো হয়।

এই সাড়া জাগানো ঘটনাগুলো জার্মান জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আত্মবিশ্বাসের যে জাগরণ ঘটায় সে বিষয়ে অত্যুক্তি করার কোনো অবকাশ নেই। যদিও রাজা এবং ফল জনের মতো, সেকেলে মনোভাবের প্রুসীয়রা, সম্রাট খেতাব নিয়ে খুব উচ্ছ্বাস

বোধ করেন নি। কিন্তু এই যে বাস্তব ঘটনা, শতাব্দীর পর শতাব্দী বিভক্ত থাকার পর, বিদেশী আক্রমণের ধাক্কার ভেতর থাকার পর, যুদ্ধে জয়ী হবার পর, ঐক্যবদ্ধ হলো, প্রমাণিত হলো যে জার্মান সেনা বাহিনী অপরাজেয়, সে তার ইচ্ছা সাফল্যের সঙ্গে অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সের উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে, দীর্ঘকাল পর হারানো দুটি প্রদেশ পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে, ভবিষ্যতে পাশ্চিমী আক্রমণের বিরুদ্ধে এ দুটি প্রদেশ শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে, তা প্রতিটি জার্মানবাসীর হৃদয় অহংকার ও সন্তুষ্টির উষ্ণ আবেগে পূর্ণ করে। সংস্কৃতি ও বিদ্যাবত্তা, সংখ্যায় ও প্রভাবে, তাদের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দক্ষতায় ইউরোপে নেতৃত্ব দিয়েছে অনেক কাল। তারা এখন অবিসম্বাদিতভাবে ইউরোপ মহাদেশের সবচেয়ে বড়ো সামরিক শক্তি। এটা কি নিতান্তই অস্বাভাবিক যে প্রুসীয় দেশপ্রেমিকরা পেছন ফিরে তাকায় তাদের রাজ্যের অখ্যাত উৎসের দিকে। যখন জার্মান ভাষাভাষীরা বন্য স্লাভদের বিরুদ্ধে একটা খুদে সামরিক ফাঁড়ি ছিলো মাত্র, অতঃপর তারা পর্যায়ক্রমিক উন্নতির হিসেব কষতে সমর্থ, তাহলে এসবের মধ্যে কি তারা সৃষ্টিকর্তার অদ্ভুৎ এবং শ্লাঘা উদ্রেককারী হাত খুঁজে পাবে না? আরো, এটা অস্বাভাবিক ছিলো কি যে তারা এখন বিশ্বাস করবে প্রুসীয় জাতি, অদের মিতব্যয়িতা, কঠোর পরিশ্রম, কঠোর বাস্তববাদিতা, ভয়ানক ও সুশৃঙ্খল প্রচণ্ডতার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলো ঐতিহাসিক দায়িত্ব বাস্তায়নের লক্ষ্যে, প্রথমে বাল্টিক স্লাভদের মধ্যে সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে, অতঃপর প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রবক্তা হিসেবে, পরবর্তীকালে অনিষ্টকারী অস্ট্রীয় সংযোগ থেকে জার্মান জনগণের মুক্তিদাতা হিসেবে, সবশেষে ইউরোপ মহাদেশে জার্মানদের মাতব্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য। এই চিন্তা-ভাবনাগুলো অধ্যাপকীয় আসন থেকে বপন করা হয়। কদর্য নয়, বলিষ্ঠ কিছু ব্যক্তিত্ব ছিলেন যারা সরাসরি সম্মুখপানে দৃষ্টিপাত করেন, এবং নিজেদের কাছে প্রশ্ন রাখেন হোয়েনযোলার্ন রাজবংশের জন্য বৃহত্তর ভাগ্য অপেক্ষা করছে কিনা। জগৎ সুবিস্তৃত, লবণাক্ত সমুদ্রগুলো নতুন নতুন অভিযানের আহ্বান জানায়। জার্মান বীরত্বের কাছে অসম্ভব কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, সে হতে পারে বৃহৎ নৌশক্তি, দূর-দূরান্তে স্থাপন করতে পারে উপনিবেশ, এমনকি স্বীয় শাসনাধীনে আনতে পারে সমগ্র জগৎটাকে। যে দেশ একের পর এক পরাস্ত করেছে দিনেমারদের, অস্ট্রীয়দের, ফরাসিদের তাদের সামনে আরো একটা লক্ষ্য আছে, সেটি অদের জন্য অগ্নি পরীক্ষা। বেসামরিক লোকদের দ্বারা গঠিত অ্যাংলো-স্যাকসন সাম্রাজ্য, সর্বত্র জয়ী হয়েছে হাতে কিছুমাত্র ধূলি না মেখে, তারা অমর হতে পারে না। সৌভাগ্যের এই অসার সন্তানেররা দীর্ঘকাল রৌদ্রে ক্রীড়া করার সুযোগ পেয়েছে। এখন সময় এসেছে, বিধাতা এখন পুরস্কৃত করবেন পরিশ্রমী নভিসদের। সৌভাগ্যের বরপুত্ররা নয়, পুরস্কার এবার লুফে নেবে প্রকৃত যোগ্য একটা জাতি। কার্থেজের কবল থেকে রোম এবার কেড়ে নেবে জলদেবতা নেপচুনের ত্রিশূল। হেনরিখ ফন ট্রেইটশেক এ ধরনের শিক্ষাই জার্মানদের দিয়ে গেছেন, তার বার্লিনের অধ্যাপকীয় আসন থেকে। এই ট্রেইটশেক ছিলেন তদানিন্তন জার্মানির সবচেয়ে প্রভাবশালী ইতিহাসের অধ্যাপক এবং প্রচারবিদ।

তৃতীয় প্রজাতন্ত্র

প্রদেশগুলোতে প্রজাতন্ত্রবাদের জনপ্রিয়তায় ঘাটতি। প্যারিস কমিউন। প্যারিস এবং ভার্সাই-র মধ্যে বিবাদ। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের বুনিয়াদ। ফরাসি সংসদীয় সরকার। ফ্রান্স ও জার্মানি জুল ফেরি। যাজকতন্ত্রের সমস্যা। প্রজাতন্ত্রের স্থিতির অভাব। বুলাঞ্জার। ড্রেইফুস ঘটনা। ফরাসি কূটনীতি।

সার্বিক পরাজয়ের অব্যবহিত পরের বছরগুলোতে ফ্রান্স ক্রমান্বয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। গণভোট, একনায়কতন্ত্র, বিদেশে দুঃসাহসিক অভিযান ব্যাপারে দেশটি এখন নিদারুণ বিমুখ এবং ক্লান্ত। তাছাড়া প্রজাতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে যেহেতু যুদ্ধ ও বিপ্লব জড়িত, অতএব জনসমষ্টির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখন এমন শাসনতন্ত্রের নাম শুনলেই আৎকে ওঠে যে শাসনতন্ত্র প্রজাতান্ত্রিক নাম বহন করে। বর্দুর সংসদে সাড়ে ছয় শত ডেপুটি নির্বাচিত হন, এর মধ্যে (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১) চার শত জন রাজতন্ত্রের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

তথাপি এই সুদৃঢ় রাজতান্ত্রিক এবং প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ থেকে, সবশেষে, বেরিয়ে আসে রাজতন্ত্র নয়, প্রজাতন্ত্র। অত্যন্ত ধীরে ধীরে ফ্রান্স উপলব্ধি করে যে ফ্রান্সে নানা কারণে রাজতন্ত্র অসম্ভব হয়ে পড়েছে। লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়পন্থিদের মধ্যে বিভক্তি, পুরাতন শাখার প্রধান কাউন্ট দ্য শ্যাবর-এর তিন রঙা পতাকার প্রতি স্বীকৃতি প্রদানে অস্বীকৃতি (তিন রঙা পতাকা ছিলো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির প্রতীক), উপরন্তু প্যারিসের জনগণ রাজাকে ফিরিয়ে আনার যে কোনা প্রচেষ্টার ঘোর বিরোধী ছিলো।

প্যারিস নগরী পুরোপুরি প্রজাতান্ত্রিক। তারা দাতোঁ এবং কার্নো-র পুরানা জাঁকের পন্থায় জার্মানির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক যুদ্ধের পক্ষপাতী। তারা লক্ষ্য করেন যে রাজকীয় যুদ্ধাভিযান ছিলো একটা বিশৃঙ্খল ব্যাপার, তারা বিশ্বাস করেন যে সাহসী নেতৃত্বের অধীনে প্যারিসের অবরোধ ভাঙা কঠিন ছিলো না, গ্রামীণ রক্ষণশীলদের দুর্বল একটি পরিষদ সম্প্রতি বর্দু থেকে ভার্সাই-এ স্থানান্তরিত হয়ে দেশের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার শত্রুপক্ষের কাছে বিক্রি করে দেয় (১০ মার্চ), এবং পূর্বতন সমাজব্যবস্থার অমঙ্গল ও অসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। রাজানুগত্য এবং শান্তিবাদ নামক ভার্সাই-র শ্বেত কদর্য নীতির কাছে নতি স্বীকার না করে প্যারিস সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই নগরী এখন ক্ষুধার্ত, বিরক্ত, সাম এলিসিতে জার্মান বিজয়ী সেনাদের কুচকাওয়াজে আহত, আবার বৈপ্লবিক ভাবাবেগে দারুণ অপ্লুত, উপরন্তু নানা রকমের স্বপ্নে ভরপুর : জ্যাকোবাঁ, ফেডারাল, সমাজবাদী, কমুনিস্ট ও নৈরাজ্যবাদী। জাতীয় রক্ষীবাহিনী অবরোধের জন্য প্রস্তুত, ফলে ভার্সাই-র সরকার যখন কামান গুলি প্রত্যাহার করে নেয়ার চেষ্টা করে তখন এই বাহিনী তা ঠেকায়। নিহত দুই জেনারেলের রক্তে স্নাত প্যারিস কমিউন লাগামহীন ও ধ্বংসোন্মুক পথে পা বাড়ায়।

প্যারিস কমিউন এখন আর কথার অংশবিশেষ। এই কমিউনই ছিলো বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রথম আত্মপ্রকাশ, যা রাশিয়া থেকে গোটা দুনিয়ার পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানায়। অবশ্য এটি তার প্রকৃত বা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো না। প্যারিস কমিউনের প্রতিভা লেনিন নয়, দান্তো-র, এই আন্দোলনের উৎস প্রজাতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকতার আকস্মিক তুফান, চালু সমাজব্যবস্থা উৎখাতের জন্য সুগভীর কোনো ষড়যন্ত্র নয়। অসন্তোষ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যে আন্দোলনে গোড়ার দিকে নেতৃত্ব দেন শহরের বিশেষাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকরা, তা নব রূপ পরিগ্রহ করে। ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক ফেডারেশন বা সংঘে রূপান্তর কিম্বা গোটা দুনিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন শ্রমজীবী শ্রেণীর কম্যুনার্ডদের (কমিউন সমর্থকদের) নির্দিষ্ট কিছু অংশের কাছে ভবিষ্যতের শ্লোগানে পরিণত হয়। তবে এই সামগ্রিক জটিল আন্দোলনের পেছনে কোনো একটি নির্দিষ্ট নীতি কাজ করেনি। এমন কি প্যারিস কমিউন রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের স্বর্ণের মওজুদ বাজেয়াপ্ত করেনি।

ঘটনাচক্রে বৃদ্ধ থিয়ের, তার আটসাট ফ্রক-কোটে, ভার্সাই সরকারের প্রধান হিসেবে কাজ করেন। যদিও তখনও ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র কি হবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি, কারণ রাজতন্ত্রীরা এখনি রাষ্ট্রের হাল ধরতে প্রস্তুত নন, তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে তড়াহুড়ো করার কোনো লক্ষণও দেখা যায় না, তবে অস্থায়ী সরকার বাস্তবিক পক্ষে ছিলো রাজতন্ত্রী। কিন্তু এই প্রতিভাবান, কঠিন-হৃদয় ভদ্রলোক কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন করেননি। একশো তিরিশ হাজার নিয়মিত সৈনিকের একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে প্যারিস নগরী পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত এবং অনুকম্পাহীন। সে সময় এবং পরবর্তীকালে তিনি প্রচণ্ড কঠোরতা প্রদর্শন করেন। অরাজক সন্ত্রাসীর দল, যারা প্যারিস নগরীকে আস্তাকুঁড়ে পরিণত করে, অগ্নিসংযোগ করে টুইলারি এবং অটেল দ্য ভিলেতে, তাদের প্রতি তিনি কোনো প্রকার দয়ামায়া প্রদর্শন করেননি। সরকার যে শত্রুর সঙ্গে শান্তি স্থাপনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করে এবং 'রক্তপাতের সপ্তাহে' (২১-৮ মে) নির্দয়ভাবে প্যারিস কমিউন পিষে মারে তাকে সঠিক পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হয়। তাহলে, প্রজাতন্ত্র মোটের উপর রক্ষণশীল এবং বিপ্লবীদের ভয়াবহ সংস্রব থেকে মুক্ত হতে পারে, যুদ্ধও এড়াতে পারে, ফলে দেখা যায় যে ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিবর্তনে প্যারিস কমিউনের একটা ভূমিকা ছিলো, কারণ এটি যেমন প্রদর্শন করে যে প্যারিসের শ্রমজীবীরা যেখানে সর্বাবস্থায় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সেখানে বুর্জোয়ারা স্বচ্ছন্দে প্রজাতান্ত্রিক সরকার মেনে নিতে পারে।

অতএব ফরাসি অস্থায়ী সরকার ছিলো 'প্রজাতন্ত্রীহীন একটি প্রজাতন্ত্র।' এই সরকার লিও গেমবেতাকে ঘিরে শক্তি সঞ্চয় করে। গেমবেতা ছিলেন বড়ো মাপের মানুষ, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন। শেষ পর্যায়ে ১৮৭৫ সালে যখন শাসনতান্ত্রিক সংবিধি বিষয়ে আলোচনা চলছে তখন অস্থায়ী সরকার এক ভোটের গরিষ্ঠতায় শাসনতন্ত্রে একটি ভয়ানক শব্দ যুক্ত করে। বলা বাহুল্য, কথিত শব্দটির নাম : প্রজাতন্ত্র। রাজতন্ত্রীরা জোয়ারের সঙ্গে তাল রক্ষা করে চলতে পারেনি। রক্ষণশীল প্রজাতন্ত্রিদের যে কার্য বিজয় মাল্যে ভূষিত হয়, তা রাজতন্ত্রীরা সাহস এবং একতার অভাবে করতে পারেনি। তারা যথাসময়ে ভয়ে কুকড়ে গেছে। রাজতন্ত্রীরা এই ব্যর্থতা ভবিষ্যতেও কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়নি। দুই বছর পর (১৮৭৭), যখন মার্শাল ম্যাকমোহন (ফরাসি উচ্চারণে হয়তো হবে মাকমাহ), রাজকীয় এবং

রাজতন্ত্রী প্রেসিডেন্ট, নব নির্বাচিত চেম্বার ভেঙে দিয়ে রাজতন্ত্রী মন্ত্রিসভা গঠনের লক্ষ্যে কর্তৃত্ব আদায়ের প্রচেষ্টা চালান (কারণ চেম্বার ছিলো অতিরিক্ত প্রজাতন্ত্রী, অতএব তার রুচি বিরোধী) তখন তাকে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছ থেকে এমন শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় যে অতঃপর কোনো প্রসিডেন্ট চেম্বার ভেঙে দেয়ার অধিকার প্রয়োগের সাহস করেননি। সেই শরৎকালে রক্ষণশীলদের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ এই ছিলো যে, তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, সামরিক এবং যাজকীয় প্রধানের নেতৃত্বে ডানপন্থিরা ফ্রান্সকে আর একটি যুদ্ধের বিপদের মুখে ঠেলে দেবে।

১৮৭৫ সালের প্রজাতন্ত্রী শাসনতন্ত্র মূলত এখনো দেশটিকে শাসন করছে। এই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে অমঙ্গলের জীবন্ত আতংক। গণভোটের বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত স্বৈরতন্ত্র ফ্রান্সের জন্য এই অমঙ্গল বয়ে আনে। বর্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে দুটি চেম্বার কাজ করে। একটি সিনেট, অপরটি ডেপুটিসভা বা হাউস অব ডেপুটিজ। দুই চেম্বারের যৌথ অধিবেশনের ভোটে, ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সমগ্র ফ্রান্সের জনগণের গরিষ্ঠ ভোটে নয়। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা দুঃসাহসিক অভিযানের বিপজ্জনক আকর্ষণ থেকে দেশ ও জনগণকে রক্ষা করতে সক্ষম। চেম্বার দুটি কোনো মর্দে মোমিনকে নির্বাচিত করে না। তারা নির্বাচিত করেন একজন যথার্থ আইনজীবীকে কিংবা অনুরূপ কোনো ব্যক্তিকে (Man of business), যার মানসিক গঠন ও সমন্বয়তা পার্লামেন্টারি কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রমাণিত। তারা বলিষ্ঠ কোনো লোকের খোঁজ করেন না, তারা চান এমন একজন ব্যক্তিকে যিনি শুধু নামমাত্র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন। সেই যে ম্যাকমোহন প্রেসিডেন্টের পদকে পুনরায় রাজতন্ত্রের অনুকূলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, তারপর একজন ফরাসি প্রেসিডেন্টের জন্য ক্ষতিকর ছিলো একটিই ব্যাপার। সবার মধ্যে সন্দেহ কাজ করেছে যে প্রেসিডেন্ট কি স্বীয় কর্মপন্থা নির্ণয়ের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন নাকি কথায় কিংবা কাজে দেশের মনোভাবের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ ও স্বতন্ত্র সংযোগ রচনায় নিয়োজিত।

তাহলে, ১৮৭৫ সালের শাসনতন্ত্র ফ্রান্সকে ইংরেজদের আদর্শে গঠিত সংসদীয় সরকার উপহার দেয়। তবে কর্তৃত্বের চাবিকাঠি সাত বৎসরের জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত নয়, জনপ্রিয় চেম্বারের কাছে দায়িত্বশীল, মন্ত্রিসভার হাতে। এই প্রথম বারের মতো ফ্রান্স যে রাজনৈতিক কিংবা শাসনতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করলো তা ইংল্যান্ড আত্মস্থ করে গৌরবজনক বিপ্লবের পর থেকে। ফ্রান্স এখন কঠোর সংসদীয় গণতন্ত্রের পথানুসারী এবং তাদের দাবি অনুসারে, খোদ ইংল্যান্ডের চেয়েও অধিক সংসদ অনুরাগী। কারণ যেখানে ওয়েস্টমিনস্টারে মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রণ করে পার্লামেন্ট, সেখানে প্যারিসের আচরিত নিয়ম তার একেবারে উল্টো। যে আইনসভা (হয়তো) মেয়াদ পূর্ণ না হলে ভেঙে দেয়া যাবে না, সেখানে দলীয় নিয়ন্ত্রণ একেবারে দুর্বল হয়ে থাকে। সেখানে খুদে গোষ্ঠী বা চক্রগুলো আজ একদলীয় জোটে যোগ দেয়, দুদিন পর অপর একটি দলীয় জোটের সঙ্গে কাজ করে, অতঃপর অত্যন্ত সংঘটিত রাজনৈতিক জোটের স্থান দখল করে। এখন শুধু একটাই কাজ, হাউস অব কমন্সের অভ্যন্তরে ক্ষমতা দখলের জন্য রশি টানাটানি। তাহলে দেখা যায়, ফরাসি মন্ত্রিসভা ক্ষণস্থায়ী, এবং যেহেতু যে কোনো সময় যে কোনো মন্ত্রিসভা নতুন ও অদৃষ্টপূর্ব সমন্বিত ক্ষমতা দ্বারা ভণ্ডুল করা যায়, ফলে তারা তাদের সকল শক্তি নিয়োগ করে চলমান সংসদীয় কৌশল

নিশ্চয়তার জন্য। অথচ এই শক্তি নিয়োগ করা যেত দীর্ঘমেয়াদি বিধান প্রণয়নকারী নানাবিধ পরিকল্পনায়। এক পক্ষান্তর থেকে উদ্ভূত এই সব মনোযোগ নষ্টকারী ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার বিরাট বোঝা। একজন ইংরেজ ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে দায়িত্বের বিরাট বোঝা বহন করতে হয়, কিন্তু তাকে অন্তত সংসদের প্রতিটি অধিবেশনে দুশো সদস্যের ভৎসনা কুড়াতে হয় না, গ্রামে ডাকঘর প্রতিষ্ঠার দাবি মেটানোর জন্য সমর্থন খুঁজে বেড়ানোর দরকার করে না।

ফরাসি জনগণ প্রত্যাশা করেন না যে তারা দ্রুত পরিবর্তনশীল কিংবা লঘু বিষয়ে গভীর মনোযোগ প্রদান করবেন। তাদের কাছে অধিক আরামদায়ক এবং আগ্রহের বিষয় হলো বন্ধালয়, সালোঁ-র আড্ডা, ফরাসি একাডেমি, বাকপটুতা, সমকালীন সাহিত্যের আলোচনা এবং মূল্যায়ন। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের পার্লামেন্টগুলোর তেজ, চিত্তহারী বাগ্মিতা, তাদের বিতর্কে অংশগ্রহণে ঈর্ষণীয় দক্ষতা, ইত্যাদি অসাধারণ গুণাবলি সত্ত্বেও ফরাসি জনগণের সম্ভ্রম ও ভক্তি কুড়াতে সমর্থ হয়নি। নির্দিষ্ট কিছু কলঙ্কজনক ঘটনা, যেমন পানামা খাল ব্যাপারে অর্থের যোগান, দুর্নীতির দুর্ভাগ্যজনক ধারণার সৃষ্টি করে। পুরাকালীন মর্যাদা অনুপস্থিত ; বড় বড় মন্ত্রীদের সুখ্যাতির জন্যও ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়নি। অথচ অনেক মন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠের সহায়তায় এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারতেন যা জনগণের কল্পনাশক্তিকে সদর্থে উস্কে দিতো।

১৮৭০ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মাঝখানে যে বছরগুলো কেটেছে, সে সময় পশ্চিমী সভ্যতার জন্য সবচেয়ে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই ছিলো যে জার্মানি এবং ফ্রান্সের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে কি না। আলসেস ও লরেন বন্ধুত্ব স্থাপনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। প্যালাস দ্যা লা কনকর্ডে স্ট্রাসবুর্গের মূর্তি আচ্ছাদিত থাকা অবস্থায় প্রতিটি ফরাসি নাগরিক হারানো প্রদেশগুলো পুনরুদ্ধারের স্বপ্নকে অবাস্তব জ্ঞান করে এসেছে। কারণ জার্মান রাষ্ট্রের বিশাল ক্ষমতা সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির এখন আর কোনো অবকাশ নেই। তবু প্রতিটি ফরাসিবাসীর কাছে এটি একটি সর্বপ্রযত্নে লালিত স্বপ্ন। এ বিষয়টা নিয়ে কোনো প্রকার আলোচনা নয়। গেমবেতার পরামর্শ : "N'en Parlez jamais, y pensez toujours." কিন্তু সর্ব সাধারণের চিন্তা-ভাবনায় এটি নিয়ত উপস্থিত ; দুটি দেশের মধ্যে সত্যিকার বন্ধুত্ব স্থাপনে স্থায়ী প্রতিবন্ধক। দুটি দেশের নীতি নির্ধারণে এই সমস্যার প্রাধান্য দুর্নিবার, এটি ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের মতো ভবিষ্যতের জন্য হুমকি স্বরূপ।

জার্মানরা যদি দু'টি প্রদেশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে ইচ্ছুক হতেন, তাহলে উভয় পক্ষে উত্তেজনা হয়তো বহুলাংশে হ্রাস পেত। কোনো কোনো ফরাসি রাজনীতিজ্ঞ ইংগীতও দেন যে এ ধরনের ছাড় দিলে দুদেশের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পথে বাধাগুলো দূর হতে পারে। কিন্তু বিসমার্ক তার কর্তব্য স্থির করেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি মনে করেন আলসেস ও লরেন একটি জাতির উচ্চাভিলাষে রাশ টানতে সক্ষম ; উপরন্তু কথিত জাতি পরাজয়ের গ্লানি কখনো ভুলবে না, ক্ষমাশীল দৃষ্টিতেও দেখবে না। বিসমার্ক তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের শান্তিবাদী সদিচ্ছায় আস্থা স্থাপনে রাজি ছিলেন না। তিনি ফ্রান্সের স্থিতিস্থাপক ক্ষমতায় আতংকবোধ করতেন, রুশ নীতিভিত্তিক দ্রুত ও দৃঢ়সংকল্প সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণও তার মধ্যে সন্ত্রাস জাগাতো। উপরন্তু হিসেব করা হয় যে ফরাসিরা ছয় মিলিয়ন সাত শত পঞ্চাশ হাজার নিয়মিত সৈনিক এবং অর্ধ মিলিয়ন রিজার্ভ সৈনিক মাঠে নামাতে

সক্ষম। এদিকে কোনো কোনো ফরাসি রাজনীতিকের যুদ্ধংদেহী ভাষা এবং মনোভাবেও বিসমার্ক সুস্থির বোধ করতে পারতেন না। কুইন ভিক্টোরিয়া এবং জার সময় মতো হস্তক্ষেপ না করলে তিনি হয়তো তার দেশকে নিবারক যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতেন। পরবর্তীকালে তার অস্থির প্রতিবেশীকে শান্ত করার জন্য একটা সস্তা উপার উদ্ভাবন করেন। তিনি ইংগীত দেন যে ফরাসিরা তিউনিস দখল করুক। বিসমার্ক তার বাগ্‌ধারাসম্মত ইংরেজিতে বলেন, "ফরাসি উচ্চাভিলাষের ঘোড়াকে তিউনিসের বালু-সমুদ্রে পেছনের পা তুলে তিড়িং করে লাফানোর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার তারা ঠেলা বুঝবে।" তার প্রত্যাশা ছিলো যে ফরাসিরা একবার ঔপনিবেশিক বিজয় অভিযান শুরু করলে ইউরোপে তার হারানো প্রদেশগুলো বিষয়ে কম চিন্তা করবে। ফরাসি পার্লামেন্টারি দৃশ্যপটের অন্যতম বিরল গৌরব ছিলেন ভস্ত পার্বত্য অঞ্চলের আন্তরিক এবং অপরাজেয় ডেপুটি জুল ফেরি। ইনি যদিও দেশের ঔপনিবেশিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছেন, তবু গোটা জীবনে তিনি কেবল কুড়িয়েছেন প্রচণ্ড ঘৃণা এবং সর্বদাই হয়েছেন কোণঠাসা। সাম্রাজ্যিক ফ্রান্সে তার অবস্থান ছিলো নিশ্চিন্ত শান্তিকামী এবং আমূল সংস্কারবাদী। পরবর্তীকালে তিনি স্বীয় জীবনের আদর্শের পালাবদল ঘটান এবং পরিচিতি লাভ করেন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী, রক্ষণশীল প্রজাতন্ত্রী এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক যাজকতন্ত্র বিরোধী হিসেবে। তার বলিষ্ঠ এবং মারমুখী ব্যক্তিত্বকে ঘিরে ক্ষুব্ধ মতবিরোধের ঝড় ওঠে, একদিকে তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির জন্য র‍্যাডিক্যালরা যেমন ক্ষিপ্ত হয়, তেমনি তার শিক্ষানীতির জন্য পুরোহিতরা তার সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। জনগণ বলাবলি শুরু করে যে ফ্রান্সের নতুন কোনো কলনির দরকার নেই। রাজতন্ত্র ফ্রান্সকে ব্যয়বহুল অভিযানে জড়িয়ে ফেলে, সাম্রাজ্য অতি দূর ইন্দোচিনে ঔপনিবেশিক যোগসূত্র স্থাপন করে। এ দিকে দেশের জন্মহার অধোগামী ; তার রপ্তানী করার মতো উদ্বৃত্ত জনসমষ্টি নেই ; তার সকল সম্পদ এখন নিয়োগ করতে হবে পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তের সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য। এটি ফরাসিদের জন্য এখন মূল সমস্যা। মেক্সিকোর শিক্ষা কি যথেষ্ট ছিলো না? তিউনিস কিংবা তংকিন একটা দেশের জন্য কি মূল্য বহন করে, যে দেশের প্রধান দায়িত্ব হলো হারানো দুটি প্রদেশ, আলসেস ও লরেনের অধিবাসীদের জন্য কিছু করা? এরকম অভিমতই পোষণ করতেন 'টাইগার' অভিধাখ্যাত জর্জ ক্লিমেসু, যিনি ১৮৭০ সালের পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করার পর শুরু করেছেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার পথ অনুসন্ধান। তিউনিসের শষ্য ক্ষেত্রের বিনিময়ে ইতালি জার্মানির হাতের মুঠোয় চলে যাবে এটা দেখতে তিনি রাজি নন।

এধরনের সমালোচনায় স্বাভাবিক বা শুভবুদ্ধির সারাংশে খুঁজে পাওয়া যায়। জুল ফেরির নেতৃত্বে পরিচালিত আগ্রাসী ঔপনিবেশিক আন্দোলনের ফলে ফ্রান্সের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়তে বাধ্য। তার জন্য বিপদ ঘনিয়ে আসাও বিচিত্র নয়। এ ধরনের সফল আন্দোলনের ফলশ্রুতি খুব ভিন্ন হতে পারে না। তিউনিস প্রশ্নে ইতালির বন্ধুত্ব হারাতে হয়, কাসোদা প্রশ্নে ইংল্যান্ডের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ঝুঁকি বহন করে, জার্মানি এবং স্পেনের সঙ্গে সম্পর্ক সংশয়যুক্ত রূপ পরিগ্রহ করে মরক্কো প্রশ্নে। তবু ১৯১৪ সালের সংঘর্ষের সময় ফরাসিরা তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের জন্য অনুতাপবোধ করেনি, ইউরোপীয় রণক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্য আফ্রিকান জনশক্তি অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হয়। এক সময় উচ্চপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিলো লে টনকুইনস, ফেরি-কে ঐ নামে ব্যঙ্গ করা হয়েছে প্যারিসের বুলভারগুলোতে। কিন্তু

যখন আলজেরিয়া এবং সেনেগাল থেকে সংগৃহীত সৈনিকরা পরিখাগুলোতে ফরাসি নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করে, তখন ওসব ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা নিঃশব্দে বা যথানিয়মে চুপ মেরে যায়।

প্রধানত দুটি কারণে প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের ফরাসি বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে জুল ফেরি বিশিষ্ট। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে বৈধতা দেন এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সংঘর্ষে জয়ী হন। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শুরুই এধরনের সংঘর্ষে পুরোহিততন্ত্রের কাছে পরাজিত হন। জুল ফেরির কারণেই ফ্রান্সে সার্বজনীন, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি গৃহীত হয়। দা ফ্রেসিনেট মন্ত্রিসভায় জনশিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে তিনি (১৮৮২) জেসুইটদের তাদের বিদ্যালয়গুলো থেকে উচ্ছেদ করেন এবং অন্যান্য শিক্ষা মজলিসগুলোকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বেঁধে ফেলেন। যদিও ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক স্বার্থের খাতিরে, এবং সেনাবাহিনীর বিশেষ অনুভূতির জন্য তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে মৃদু ও ভদ্র আচরণ করেন, তবু তার অভিমত এই ছিলো যে রাজকীয় শিক্ষার লক্ষ্য হলো প্রজাতন্ত্রের প্রতি আস্থা বিনষ্ট করা। আর গির্জা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো যুগের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই দুটি ক্ষেত্রেই জুল ফেরি সঠিক ছিলেন। ১৮৭০ সালে ফ্রান্সের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশে যদি নিরক্ষর হয়ে থাকে, যদি শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি সংকীর্ণ এবং সেকেলে হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য যাজকতন্ত্র এককভাবে দায়ী। এই যাজকতন্ত্রই রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলোর অস্তিত্ব এখনো লক্ষ্য করা যায়। সিনেট শিক্ষা সংক্রান্ত মজলিসগুলোর উপর আক্রমণের বিরোধিতা করে, সরকার ডিক্রি জারির মাধ্যমে সিনেটসভায় এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমে বাধা দেয়। জেসুইট সংঘকে করে ছত্রভঙ্গ। কার্যত শিক্ষার প্রতিটি শাখার বিকাশের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। এটিকেই তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের দেশের অভ্যন্তরে সব চেয়ে বড়ো সাফল্য বা অর্জন বলে গণ্য করা চলে।

ফ্রাংকো-প্রুসীয়ান যুদ্ধের সূচনার কয়েক দশক আগে পানামা কেলেঙ্কারির মতো আপতিক দুর্ঘটনার কারণে ফ্রান্সের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিবাদ নানা আকার ধারণ করে। তবে যাজকতন্ত্রের সঙ্গে আধুনিক জগতের যে পুরানা বিবাদ, সেটি ছিলো সব চেয়ে বড় ঘটনা। এই বিবাদে প্রতিটি দল হস্তক্ষেপ করে। গেমবেত্তার রণধ্বনি এই ছিলো যে, "যাজকতন্ত্র হলো শত্রু" (৪ মে, ১৮৭৭)। বামপন্থী রাজনীতিকরা গৃহে, বিদ্যালয়ে পুরোহিতদের রাজনীতিকে ভয় করে চলতেন। শিল্পকারখানার বিশাল শ্রমজীবী শ্রেণী যদিও বাপ্তিস্ম, বিবাহ, এবং মৃতের সৎকার ব্যাপারে গির্জার ধর্মাচার মেনে চলতেন, তবে ভোট দেবার বেলায় তারা যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধেই ভোট দিতেন বলে বিশ্বাস করা চলে। পরম্পরাগত বিশ্বাস তাদের কাছে অতীব মূল্যবান। পুরোহিতদের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করার ক্ষেত্রে তারা বিশ্বাস করতেন যে তারা পূর্বতন শাসন-ব্যবস্থার বিপক্ষে ভোট দিচ্ছেন, না সূচক সম্মতি জ্ঞাপন করছেন সামন্ততন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে, সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে। এগুলোকে তারা অমঙ্গল বলে জানে। এই অমঙ্গলগুলোকে তারা ঘৃণা করতে শিখেছে পিতৃ-পিতামহদের কাছ থেকে, তারা আরো শিখছে যে, এই অমঙ্গলগুলোর সঙ্গে যুক্ত ক্যাথলিক চার্চের পুরোহিতরা। বিপ্লবী সন্ত্রাসের একশো বছর পর যে নির্বাচন কেন্দ্রগুলো

এক সময় রাজতন্ত্রী ছিলো, তারা যাজকদের পক্ষে ভোট দেয়। পক্ষান্তরে যারা জ্যাকোবাপন্থি ছিলো তারা কোনো না কোনো বাম দলকে নির্বাচনে মদদ যোগায়।

মধ্যপন্থি অনুভূতি এবং অভিমত পোষণের জন্য কোনো শক্তিশালী প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ না থাকার দরুন ফ্রান্সের দুটি পক্ষের মধ্যে ব্যবধান ছিলো সুগভীর এবং বিস্তৃত। এক পক্ষ ধর্মানুরাগী, যাজকীয়, রক্ষণশীল এবং সমরপ্রিয়, অপর পক্ষ প্যাগান, যাজকতন্ত্রবিরোধী, আমূল সংস্কারবাদী এবং জাগতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপারে যুক্তিশীলতার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগী। উপরন্তু এই সমস্যাটা আন্তর্জাতিক উত্তেজনার কারণে তপ্ত আবহের সঙ্গে যুক্ত হলে অনুমান করা হয় যে ফ্রান্স গৃহযুদ্ধের আগুনে দগ্ধ হবে। ১৮৯২ সাল পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চের বিরোধিতা, রাজতন্ত্রী এবং সাম্রাজ্যবাদী দলগুলোর উপস্থিতি, কমিউনগুলোর নির্দয় নিষ্পেষণ গভীর ক্ষত রেখে যায়। উপরন্তু সমাজবাদী এবং সিন্ডিক্যালিস্ট দলের নিশ্চিত জনপ্রিয়তা বর্ধন প্রজাতন্ত্রীদের অবস্থা নিতান্ত নাজুক করে ফেলে। বার বার মনে হয় প্রজাতন্ত্র বিপদগ্রস্ত। যদিও গণতান্ত্রিক অনুভূতির প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়, যদিও চেম্বারে শক্তিকেন্দ্র অতি দ্রুত বাম আন্দোলনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, অগ্রগণ্য দলটি প্রথমে রক্ষণশীল হলেও পরবর্তী সময়ে সুবিধাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আবার আমূল সংস্কারবাদী রূপ ধারণ করে, পরিশেষে ব্রিয়ার ক্ষমতারোহণের পর সমাজতন্ত্রবাদের দীক্ষা গ্রহণ করে। তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। বুর্জোয়া রাজনীতিকদের একটি পার্লামেন্ট, দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রধানত ইহজাগতিক, এবং বিভিন্ন শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত, তেজস্বী ফরাসি জনগণকে কি সাফল্যের সঙ্গে শাসন করতে পারবে, জগতে ফ্রান্সের জন্য একটি সম্মানজনক আসন কি নিরাপদ করতে সক্ষম হবে।

প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে দুটি অদ্ভুত ঘটনায় ভীষণ নাড়া (অভ্যন্তরীণ ধৈর্যের অভাবে ইতিমধ্যেই কাবু) খায়। ১৮৮৬ সালে যখন গ্রেভির নিরস কিন্তু সম্ভ্রান্ত রাষ্ট্রপতির শাসন দুঃখজনক অবসানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, তখন জনগণের স্বপ্ন-কল্পনা উস্কে দেন সুন্দর কালো ঘোড়ায় আরোহী জনৈক সুদর্শন জেনারেল। এর নাম বুলাঞ্জার, তিউনিসের সামরিক গবর্নর। আফ্রিকান যুদ্ধের এই বিজয়ী বীরকে আবালবৃদ্ধবনিতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করে। তিনি কি ত্রাণকর্তা, মাহদি নন, তিনি কি জনগণপতি নন, যার জন্য ফ্রান্স দীর্ঘকাল যাবৎ পথ চেয়ে বসে আছে। সর্বোপরি, তিনি কি নির্বাচনী লড়াই-র জন্য সর্বাগ্রগণ্য সৈনিক নন? 'দেশপ্রেমিকদের সংঘ' তাদের প্রিয়পাত্রের সদগুণাবলি প্রচার নিমিত্তে ঢোল বাজাতে শুরু করে। ইহুদি নাকেট (Naquet) তার নির্বাচন ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রতিটি নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে জিতেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ১৮৮৫ সাল থেকে ১৮৮৭ সালের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি, সমরমন্ত্রী হিসেবে কিংবা জঙ্গী জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র হিসেবে, কিংবা শাসনতন্ত্র পাইকারী সংশোধনের মুখ্য প্রবক্তা হিসেবে।

নির্বাচকমণ্ডলীর তার প্রতি সমর্থন ছিলো নির্দ্বন্দ্ব। এই সমর্থনের উপর ভর করে তিনি তিনবার রাষ্ট্রপতি হবার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস বলতে কিছু ছিলো না, স্নায়ুর চাপও সহ্য করতে পারতেন না। তিনি যেমন একটির পর একটি সুযোগ হাতছাড়া করেন, তেমনি ফ্রান্সের বেসামরিক শাসকদের সাহস সঞ্চয় হতে থাকে। তাকে বিচারাধীনে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু ঐ হুমকিতেই কাজ হয়ে যায়। মাথার উপর

[illegible] অভিযোগ নিয়ে তিনি ব্রাসেলসে পলায়ন করেন। অতঃপর করেন উদ্‌বন্ধনে [illegible] প্রজাতন্ত্র একটি মূর্তমান উপদ্রব থেকে রক্ষা পায়।

এর পাঁচ বছর পর কাপ্তান ড্রেইফুসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা ছিল সমধিক হিংস্র। ১৮৯৪ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত জ্বরাক্রান্ত বছরগুলোর যিনি প্রত্যক্ষদর্শী নন তার পক্ষে উপলব্ধি করা একটু কঠিনই হবে ড্রেইফুসের দুর্ভাগ্যকে ঘিরে কি প্রচণ্ড ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়েছিলো। এই কাপ্তানকে একটি সামরিক আদালত অভিযুক্ত করে নির্বাসনে প্রেরণ করে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে তিনি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে গোপনীয় সামরিক কাগজপত্র জার্মানদের কাছে পাচার করে দিয়েছেন। গোটা ফ্রান্সের অধেক বিশ্বাস করে যে ড্রেইফুস অপরাধী, অপরার্ধ সমতুল জোরের সঙ্গে ঘোষণা দেয় যে তার প্রতি অন্যায়ভাবে নির্দয় আচরণ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় অনেকের আজীবন বন্ধুত্বের অবসান ঘটে, প্রতিটি সংসারে শান্তি বিনষ্ট হয়, ব্যক্তির বিবেক হয় ক্ষত-বিক্ষত। সারা দেশের ক্যাথলিক খবরের কাগজগুলোতে ইহুদি বিদ্বেষের বিষ ছড়ানো শুরু হয়। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে যেমন এধরনের ঘটনায় হিংস্র দাঙ্গা শুরু হয়, ইহুদিদের প্রতি অন্যায়ের কোনো লাগাম থাকে না, সৌভাগ্যক্রমে এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেনি। প্রশ্ন ওঠে, এই ইহুদি ব্যক্তিটি কিভাবে নিরপরাধ হতে পারেন? সৈনিকদের ভুল হবে কি করে? এই ঘটনায় নানা জনে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তবে শেষ পর্যন্ত নৈতিকতা জয়ী হয়। হাতের লেখা বিশেষজ্ঞ পল মেয়ারের প্রামাণিক সাক্ষ্য, জালিয়াত অঁারি-র স্বীকারোক্তি এবং আত্মহত্যা, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এমিল জোলার তীব্র নিন্দাজ্ঞাপন, কর্নেল পিকার্টের অসমসাহসিকতা (এই সামরিক অফিসার চাকুরি হারানোর ঝুঁকি গ্রহণ করেন সত্যের খাতিরে), এসব ড্রেইফুসের নিরপরাধ প্রমাণ করে, এবং তার সামরিক ও যাজক শত্রুরা নাস্তানাবুদ হয়। বেসামরিক জনগণের বিবেকের এই বিজয়ে সুরক্ষিত হয়ে, দেশে সংস্কারপন্থি, বিদেশে যুদ্ধংদেহী, ওয়ালডেক-রুসোর মন্ত্রিসভা প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সকে দীর্ঘস্থায়ী এবং দৃঢ়ভিত্তিক সরকার উপহার দেন।

শত্রুর চোখ দিয়ে বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে, তৃতীয় ফরাসি প্রজাতন্ত্রে সুস্থতা, স্থায়িত্ব এবং সুখ্যাতির দারুণ ঘাটতি ছিলো। ফ্রাংকো-প্রুসীয় যুদ্ধে তাদের অযোগ্যতা, কমিউনের আতংকজনক তাণ্ডব, দুর্বল মন্ত্রিসভার একের পর আগমন ও বিদায়, দলীয় বিভিন্নগোষ্ঠীর উচ্চগুতা, মাঝে মাঝে বিরাম দিয়ে জঘন্য আর্থিক কেলেঙ্কারি, ইত্যাদি কারণে একজন সমধিক অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের কাছেও প্রতিভাত হয়েছে যে ফরাসি জনগণের রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল জানা নেই। ফ্রেসিনেট কর্তৃক সেনাবাহিনী পুনর্গঠন, সৈনিক, প্রশাসক এবং অনুসন্ধানী দলের আফ্রিকায় অসাধারণ সাফল্য, স্বদেশে সিভিল সার্ভিসের সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন, সমাজ বিন্যাসে ন্যায় ধর্ম প্রতিষ্ঠা, বড়ো একটা কারো নজরে পড়েনি। বরং অনুভব করা হয়েছে যে ইংরেজ, জার্মান এবং আমেরিকানরা ফরাসিদের অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৮৮৮ সালে দেরুলেদ (Deroulede) যখন রেঁনা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে 'দেশপ্রেমিকদের সঙ্ঘে' যোগ দিতে বলেন, তখন উক্ত পণ্ডিত ব্যক্তিটি জবাবে শুধু বলেন, "ইয়াংম্যান, ফ্রান্স মরতে বসেছে, তার মৃত্যু যন্ত্রণায় কষ্ট বাড়িয়ে লাভ নেই।" উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রায় প্রতিটি লোক একটি জাতির অভিমত পোষণ করতেন। তা হলো : লাতিন জাতিসমূহ তাদের গৌরবের যুগ গুলিকে অনেক পেছনে

ফেলে এসেছে। কিন্তু এই গালমন্দ ছিলো অকালীয়। প্যারিসের Quai d' Orsay থেকে দক্ষতা, উদ্যমে ক্লান্তিহীনতা এবং সার্থকতা অর্জনে অদ্বিতীয় একটি কূটনৈতিক বাহিনী দ্রুত ফরাসি প্রভাব সমগ্র বিশ্বে বিস্তার শুরু করে। শুধু তাই নয়, একাধিক মৈত্রীবন্ধন অর্জনে সমর্থ হয়, যা অবশ্যই আমাদের রিশেল্যু এবং ম্যাজারিনের যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রত্যক্ষ এবং সাবালকদের ভোটে নির্বাচিত প্রজাতন্ত্র একাধিক উৎখাত প্রচেষ্টা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। ভোটাধিকার বঞ্চিত কোনো শ্রেণী শাসনতন্ত্রের দরজায় লাথি মারতে সাহস করেনি। কোনো বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণী দরিদ্র জনগণের বিরুদ্ধে কর্তৃত্বের দুর্গ আঁকড়ে থাকতে সমর্থ হয়নি। পূর্বতন শাসনামলে যেমন বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণী এই অধিকার অনায়াসে ভোগ করতো। চেম্বার (সংসদ) প্রকৃত সম্ভ্রম আদায়ে ব্যর্থ হলেও, বাক্‌স্বাধীনতা ছিলো শতাংশ, স্থানীয় সরকার গণতান্ত্রিক। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ১৮৮৪ সাল থেকে আইনসিদ্ধ, শুধু তাই নয়, সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। রুশদেশ এবং জার্মানিতে সমাজতন্ত্র ছিলো নিষিদ্ধ, এবং অতএব বিপজ্জনক, কিন্তু তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের চেম্বারে, মন্ত্রিসভায়, এমনকি রাষ্ট্রপতি ভবনে (Elysee) সমাজতন্ত্রের জায়গা হতো। মিলেরাঁ (Millarand) ছিলেন ফরাসি মন্ত্রিসভার প্রথম সমাজতান্ত্রিক সদস্য (১৮৯৯)। এই ভদ্রলোক তার সশ্রদ্ধ রাজনৈতিক জীবনের ইতি টানেন ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে। ব্রিয়াঁ তার দেশের উচ্চতম অনেক পদ লাভ করেন তার কেলটিক বাগ্মিতার গুণে বা আশীর্বাদে। তিনি দেখিয়েছেন যে কি ভাবে একজন সমাজতন্ত্রী প্রধান মন্ত্রী ধর্মঘট বাঞ্চাল করে দিতে পারে। এই ব্যক্তিটিই পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র দপ্তরে নিজেকে অপরিহার্য বলে প্রমাণ করেন। বেশ ক'বছর ব্রিয়াঁ ছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। অগ্নিগর্ভ ভিভিয়ানি ছিলেন স্বীয় যুগের কিংবা যে কোনো যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। যুদ্ধের সূচনাকালে এই ভিভিয়ানিই ছিলেন মন্ত্রিসভার পয়লা নম্বর ব্যক্তি। প্রজাতন্ত্রের সুস্থিত অবস্থা নড়বড়ে করা তো দূরের কথা, সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ভোটাধিকার কার্যকর হবার পর সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রজাতন্ত্রের সামান্যতম ক্ষতি করার ক্ষমতাও চলে যায়। শুধু তাই নয়, অতঃপর ফ্রান্সের পার্লামেন্টারি জীবনে মূল্যবান অবদান রাখে।

অধিকতর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ডান পক্ষ। ফরাসি জনগণের বার-বার নিজেদের কাছে জিজ্ঞাসা উত্থাপন করতে হয় যে, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিকরা কি দেশের নিরাপত্তা এবং মর্যাদার জন্য কাজ করছেন? তারা কি হারানো প্রদেশগুলো পুনরুদ্ধার করবে? অযাজকীয়, কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত গোটা শিক্ষাব্যবস্থা প্রাদেশিক ধার্মিকতা বিকাশের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে না? ধার্মিকতাই তো একটি জাতির স্বাভাবিক বল বৃদ্ধি করে। ক্যাথলিক মতবাদ, রাজতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, এসব শক্তিই তো যে মুক্তচিন্তা এবং ইহজাগতিক পরিবেশের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তার বিরুদ্ধে জোট গঠন করে। ইহুদি, প্রটেস্ট্যান্ট এবং বিশ্বজনীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিরা সন্দেহভাজন গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এই নিয়ম অনুসারে যে জাতীয়তাবাদী ভাবের বন্যার সময় সংখ্যালঘুদের আদর্শ বেকায়দায় পড়ে। তবু এই প্রজাতন্ত্র জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়। বুলান্জারের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়, ড্রেইফুসবিরোধীদের করে পরাস্ত, সামরিকতন্ত্রের উপর বেসামরিক ক্ষমতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে গির্জার প্রভাব খর্ব করে অনেকাংশে। যুদ্ধের নান্দীরোল ঘোষিত হবার সময়ও ফ্রান্স বেসামরিক স্বাধীনতার অধিষ্ঠান থেকে যায়।

আন্তর্জাতিক ভাবস্রোতধারা

ভ্যাটিক্যান এবং উদারতন্ত্রবাদ। উচ্চ মার্গীয় সমালোচনা। লাইয়েল এবং ডারইউন। হার্বার্ট স্পেন্সার। কার্ল মার্ক্স। ফেবিয়ান সম্প্রদায়।

উনবিংশ শতাব্দী যতোই অগ্রসর হতে থাকে ততোই ধ্যান-ধারণা, চিরাচরিত অভ্যাস এবং বিশ্বাসের সংকলনে গভীর পরিবর্তন সাধিত হয়। অথচ ইউরোপীয় জনগণ এসব উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে দূর কালের সংগ্রহ থেকে। ইতিহাস ও পাণ্ডিত্য, অর্থশাস্ত্র ও ভৌতবিজ্ঞান, সংস্কারপন্থি প্রবক্তাদের উদ্দীপনা এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তাদের পর্যাপ্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতা, ইউরোপীয় মহাদেশকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্য নতুন সমাজে পরিণত করে। শুধু একটি প্রতিষ্ঠানকে হিসেবে না ধরলে বলা যায় যে সবকিছু নিয়ত পরিবর্তনের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

রিসোরজিমেন্টো বা পুনরুজ্জীবনের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে কঠিন শিলারমতো ভ্যাটিক্যান অঞ্চল স্বীয় অবস্থান বজায় রাখতে সমর্থ হয়। বৃহৎ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি, বিশাল বিদ্যাবত্তা, ঘটনাবলির দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অগ্রসর হওয়া, ইত্যাদি ছিলো জার্মানি এবং ফ্রান্সের উদারতন্ত্রী ক্যাথলিক মতবাদের নেতৃবৃন্দের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইতালির প্রিলেটগণ ওসবের ধার ধারতেন না। বস্তুত ইতালির যাজকশ্রেণী পোপীয় সিংহাসনকে ঘিরে বিশ্বাসে অটল থাকে এবং, ইহজাগতিক শক্তির দ্রুত অনধিকার সীমালঙ্ঘনের মধ্যেও, কিউরিয়ার (পোপীয় বিচারসভা) কর্মপন্থা নির্ণয়ে সাহায্য করে। বেশ কয়েকটি ঘোষণার মাধ্যমে যেমন ১৮৩২ সালের মিরারি ভস (Mirari Vos), ১৮৬৪ সালের সিলেবাস, ১৮৭০ সালের ইনফ্যালিবিলিটি ডিক্রি, এবং ত্রয়োদশ লিও লিখিত অসংখ্য এনসাইক্লিক্যাল বা আদেশমূলক পত্রে (১৮৭৮, ১৮৮১, ১৮৮৮ ইত্যাদি) ভ্যাটিক্যান কর্তৃপক্ষ তৎকালীন চলতি বুদ্ধিবৃত্তিক অভিনবত্বকে কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মে আস্থা শিথিল করতে পারে এমন যে কোনো স্বাধীন আন্দোলনকেও তারা সুনজরে দেখেনি। সমাজতন্ত্র, উদারতন্ত্র, সাম্যবাদ, নানাবিধ বাইবেল সঙ্ঘ, বিবেকের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ভ্রমাত্মক বলে রায় প্রদান করা হয়। ১৮৬৪ সালের সিলেবাসে একটি লাগামহীন বাক্যে বলা হয় যে, এটি একটি "প্রমাদযুক্ত ধারণা যে রোমক পন্টিফ প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন কিংবা তার চলা উচিত। উদারতন্ত্রবাদ কিংবা আধুনিক সভ্যতার সঙ্গেও তার তাল মিলিয়ে চলা উচিত নয়।" এই ঘোষণায় উদারবাদী ক্যাথলিক নেতাদের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। পোপ তার স্বীয় কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে নানা মহলের আক্রমণের ফলে যুগের দাবিগুলোকে অসাবধানী বিবেচনা করে সরাসরি অগ্রাহ্য করেন।

ইউরোপের প্রটেস্ট্যান্ট অঞ্চলগুলোতে ধর্মীয় বিশ্বাসের ধরন বিকাশমান গির্জা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে খুব একটা প্রভাবিত হয়নি, যতোটা হয়েছে ইহুদি এবং খ্রিষ্টান প্রাচীন কেতাবাদির অনুসরণে। প্রাচীনকালের সুবিশাল ধর্মীয় রচনা-ভাণ্ডার সূক্ষ্ম বিচারের সম্মুখীন হয়। বাইবেল নামক পুস্তককেও আলাদাভাবে বিচার না করে আর দশটি পুস্তকের মতো দেখা শুরু হয়। এই পুস্তককে যে মানদণ্ডে পরীক্ষা ও বিচার আরম্ভ হয় তা ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতরা সাধারণত প্রয়োগ করে থাকেন প্রাচীন কালের চিরায়ত সাহিত্য কিংবা মধ্যযুগের ক্রনিকল বিচারে। বাইবেলের সচেতন সমালোচনা নতুন কোনো বস্তু নয়। আমস্টারডামের ইহুদি দার্শনিক স্পিনোজা তার ট্রাকটেটাস থিওলজিকো-পলিটিকাস (১৬৭০) গ্রন্থে অনেক নীতি ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন, টুবিঙ্গেনের পণ্ডিতদের অনেকে একশো ষাট বছর পর যার জোর সমর্থন করেন। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে বাইবেল পুস্তকের নতুন বিচারের রীতি প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মবেত্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত করা শুরু করেনি। এমনকি রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রাগ্রসর চিন্তায় অভ্যস্ত লোকদেরকেও দলে টানা যায়নি। ১৮৬০ সালে এসেস অ্যান্ড রিভিউস এবং ১৮৮৮ সালে লাক্স মুন্ডি (Lux Mundi) যে সাড়া জাগায় তাতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে ইংল্যান্ডে প্রথমে ব্রড চার্চ এবং পরে হাই চার্চ ইতিহাস বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণের জন্য তৈরি হতে পারে। ফ্রান্সের সর্বাগ্রগণ্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন জনৈক ধর্মীয় ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। তিনি রোমান চার্চের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। বেশ কয়েকটি খণ্ডে আর্নস্ট রেঁনা খ্রিষ্টান গির্জার উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করেন। তার লেখনিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায়। রেঁনার রচনারীতি ছিলো অত্যন্ত প্রসাদগুণসম্পন্ন এবং প্রাঞ্জল। ফলে তার রচনাবলি ব্যাপক পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করে। "কে এই মঁসিয়ে রেঁনা, যার সম্পর্কে সবাই বলাবলি করছে?" প্যারিসের ব্যালের (Balle) জনৈক মহিলা প্রশ্ন করেন (১৮৬৩)। "তিনি কি জোকি ক্লাবের সদস্য?" এই প্রশ্নের না-বাচক উত্তরে Vie de Jesus পুস্তকের ভাবপ্রবণ লেখকের বিষয়ে কৌতূহলের অবসান ঘটে।

বাইবেল চর্চার ক্ষেত্রে নতুন বাস্তবতা সংযোজন করা হয় সাধারণভাবে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে। অবশ্য ডেভিড স্ট্রউস (১৮৩৫) এবং এফ.সি. কনিবিয়ারের (১৯০৯) মতো কম পণ্ডিতই খ্রিস্টের ঐতিহাসিকতা বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। প্রথিতযশা ইংরেজ কবি সমালোচক ম্যাথিউ আর্নল্ড যে সাহিত্য ও মতবাদের মধ্যে মূলবান তুলনাগুলো তুলে ধরেন তা পর্যবেক্ষণ করার মতো মনের অবস্থা সাধারণভাবে বিরাজ করে। এতদ্ব্যতিত তখন বাইবেল পুস্তকের অনন্য বৈশিষ্ট্য খোঁজার চেষ্টা করা হয়, তবে ধর্মীয় মতবাদগুলোর মধ্যে সে অনুসন্ধান চলেনি, বরং খোঁজা হয়েছে ধর্মীয় কল্পনাশক্তিপূর্ণ ও উন্নয়নে সক্ষম সকল মহৎ সাহিত্যের মধ্যে।

যাহোক, সাধারণ মানুষ কিন্তু মূল পাঠের গবেষণায় ক্বচিৎ আকৃষ্ট বোধ করে। বাইবেলের জেনেসিস খণ্ডের যৌক্তিক চরিত্র আবিষ্কার হবার পর মানুষ কিন্তু বড়ো একটা বদলে যায়নি, কিংবা ব্যাবিলনের উপাখ্যানে মহাপ্লাবনের গল্পের খোঁজ মেলে, এই খবর রটে যাবার পরও প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েনি। জগতের প্রাচীনতা এবং মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কিত পুরাতন ধারণা বর্জন বাইবেলের মূল পাঠ পরীক্ষার ফলশ্রুতি নয়, এটি ঘটে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের বদৌলতে। বিশেষত চালর্স লাইয়েল এবং চালর্স ডারউইনের রচনাদি প্রকাশের

করেন। প্রথমোক্তের প্রিন্সিপলস্ অব জিওলজি প্রকাশিত হয় ১৮৩০ থেকে ১৮৩৪ সালের মধ্যে। দ্বিতীয়োক্তের অরিজিন অব স্পেসিস বাই মিনস অব নেচারাল সিলেকসন প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে, এবং এর বারো বছর পর প্রকাশিত হয় তার যুগান্তকারী গ্রন্থ ডিসেন্ট অব ম্যান।

এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ সামনে রেখে জেনেসিসের ঘটনাবলিকে ধর্মীয় এবং কাব্যিক রূপক ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা আর সম্ভব ছিলো না। স্কুলরুম এবং রেক্টরিগুলোতে দুই যুগ ধরে বিশ্বাস করা হয় যে জগৎ সৃষ্টি হয় ৪০০৪ সালে। ভূ-তত্ত্ব এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হানে। ডারউইন এবং অন্যান্য জীববিজ্ঞানীর জন্য আদম ও ইভের দ্রুত পশ্চাদপসরণ ঘটে। হিউম উদ্ভিদ এবং জ্ঞান বৃক্ষের জায়গা দখল করে রক্তাক্ত দাঁত ও নখরযুক্ত প্রকৃতি, বেঁচে থাকার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম, কোটি কোটি বছরের জৈবিক বিবর্তনের মাধ্যমে অযোগ্যের অপসারণ। সর্বশেষে এনথ্রপয়েড বানর থেকে মানব জাতির অভ্যুদয়, সূক্ষ্ম, আকস্মিক এবং অচেতন পরিবর্তনের মাধ্যমে। এই আবিষ্কার এবং তত্ত্বগুলোর ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের ষাটের ও সত্তরের দশকে বুদ্ধিজীবীরা ব্যাপক হারে গির্জার আদর্শ ও নীতিমালা থেকে সরে দাঁড়ায়।

রাজনীতিও ডারউইনের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। জীববিজ্ঞান যদি অতীত সম্পর্কে জানার ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে তাহলে ভবিষ্যতের রূপ দিতে সহায়ক হবে না কেন? রাষ্ট্রবিদরা কি জৈবিক উপাদান অবহেলা করতে পারেন? তার কাজ কি শক্তিমানের প্রজননে উৎসাহ প্রদান এবং দুর্বলের প্রজনন নিরুৎসাহিত করা নয়? কোনো সমাজ কি টিকে থাকতে পারে যে সমাজ বিধান প্রণয়ন করে কিংবা প্রথা অনুসারে প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করে অযোগ্যের অপসারণ কার্যকর করে না? ডারউইনীয় নীতিমালার আবশ্যিক ফলশ্রুতি তাহলে কি এই দাঁড়ায় না যে সরকার সঠিক পরিচালনার সঠিক পন্থা হলো অভিজাততন্ত্র, আর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা হলো উন্নতির একমাত্র নিশ্চিত শর্ত? অনেক চিন্তাবিদ ভুলে যান যে মেধাবী লোকেরা সকল সময় সজীব কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। ফলে তারা মনে করেন, উপর্যুক্ত ফলশ্রুতি জৈবিক বিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ডারউইনের অন্যতম প্রধান শিষ্য হাকসলি কোনো ভুল করেননি। তবে মহাজাগতিক প্রক্রিয়ার করুণাহীনতা এবং সামাজিক জীবনের আবশ্যিক দানশীলতার মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য আবিষ্কার করেছেন।

নবা জৈবিক দৃষ্টিকোণ ইংরেজদের দ্রুত প্রভাবিত করে এবং ব্যাপকভাবে। কারণ এই দৃষ্টিকোণ স্থানীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ধারার সঙ্গে অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ। এটি সুস্পষ্ট হয় উইলিয়াম পিট কর্তৃক 'জাতিসমূহের সম্পদ' পাঠ এবং উক্ত পাঠের ফলে তার মধ্যে যে রূপান্তর ঘটে তা থেকে। বলিষ্ঠতা, সংহতি এবং সঠিক নির্দেশনার জন্য সুখ্যাত একদল চিন্তাবিদ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতাকামী জাতিকে একটি দর্শন উপহার দেন (উক্ত জাতির প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে)। সমাজ যখন ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ তখন নীতি হিসেবে আত্মনির্ভরতা অত্যন্ত সুন্দর, আর ইংল্যান্ড উনিশ শতকের মধ্য ভাগের দশকগুলোতে ছিলো অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী, তখন সর্বত্র উন্নতি করার সুযোগ চোখে পড়েছে, সর্বত্র নতুন মানুষ, উচ্চাভিলাষী শিল্পের জন্য পুরস্কারের প্রাচুর্য অপেক্ষমান। প্রধান অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মতবাদ নব প্রতিষ্ঠ ধনিকতন্ত্রী এবং নির্মিয়মান

ধনিকতন্ত্রীদের আহলাদিত করেছে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো বিশ্বাস করেছে মুক্ত বাণিজ্যে, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসেবে দেখেছে সর্বাধিক সংখ্যার সর্বাধিক সুখ, এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। উপর্যুক্ত আদর্শগুলোর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থক অ্যাডাম স্মিথ ; ইংলিশ ল'র সংস্কারক এবং ইংরেজ স্বার্থের সংস্কারপন্থি জেরোমি বেন্থাম ; তার শিষ্য জেমস এবং জন স্টুয়ার্ট মিল, এবং ডেভিড রিকার্ডো, মুদ্রা এবং সরকারি আয়-ব্যয় বিশেষজ্ঞ। প্রতিটি গালিচা নির্মাতা এবং তাঁত শিল্পী, প্রতিটি কারখানা মালিক এবং ফটকা বিল্ডার, প্রতিটি সওদাগর এবং জাহাজের কারিগরী একটি বিষয়ে উদ্বেগবোধ করতেন, তা হলো সরকার না আবার ব্যবসা-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে। তারা চায় নিজেদের উদ্ভাবিত পন্থায় অবাধে ধনী হতে। ননকনফর্মিস্টরা সর্বদাই সরকারের সমালোচনামুখর ছিলেন। স্বভাবতই তারা অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসীদের দল ভারি করেন।

আবার, ইউরোপের প্রায় সকলেই বুদ্ধিবৃত্তিক পথনির্দেশনা লাভ করে ইংরেজ ননকনফর্মিস্ট পরিবারের জনৈক সদস্যের কাছ থেকে। উনিশ শতকের শেষার্ধে। এই সদস্যের নাম হার্বার্ট স্পেন্সর। ইনি যদিও নিজের দেশেই একাডেমিক দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন না, কারণ তিনি ছিলেন স্ব-শিক্ষিত, স্বমতপরতন্ত্রী এবং সূক্ষ্মতায় ঘাটতিসম্পন্ন। তবু তিনি জীবিতকালে ইউরোপের একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। আশির এবং নব্বই'র দশকে প্যারিস নগরীতে তার প্রাধান্য ছিলো অবিসম্বাদিত, লাতিন এবং স্লাভনিক জগতের প্রতিটি বিদ্যাকেন্দ্রে তার কদর ছিলো সব চেয়ে বেশি। সে সময় অন্য কোনো ইংরেজ দার্শনিক তার মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। তিনি এই যে ব্যাপক সুখ্যাতির অধিকারী হন এর জন্য তার রচনাশৈলী কোনো অবদান রাখেনি, কারণ, স্পেন্সরের বক্তব্য পরিষ্কার হলেও তিনি লেখক হিসেবে কোনো বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারেননি। তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন এ জন্য যে, তিনি যে সময় বেঁচে ছিলেন তখন কেউ জীবনের পথনির্দেশনার জন্য গির্জার দরজায় ধর্না দেয় না। আর স্পেন্সর সে সময় যে দর্শন প্রস্তাবিত করেন তার ভিত্তি হলো প্রাকৃতিক জ্ঞান। বাবুস্বভাবের লোকেরা এই ধনি প্রকৌশলীকে বাঁকা চোখে দেখতেন। অথচ ডার্বিশায়ারের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই র‍্যাডিক্যাল অজ্ঞেয়তাবাদী ইংরেজি গদ্য লিখতেন শিল্পী নয়, অভ্যাসের জড়নায়। উক্ত ভাষার সাংগীতিক সূক্ষ্মতাকে তিনি পাত্তাই দিতেন না। লাতিন ও গ্রিক ভাষাকে তিনি অবজ্ঞা করতেন, ধর্মতত্ত্ব এবং ইতিহাসও তার অবজ্ঞা কুড়াতো, তিনি রাসকিনকে মনে করতেন বর্বরোচিত, দান্তেকে মনে করতেন অযথা অলঙ্কারবহুল। তিনি গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে স্পেন্সর ছিলেন পয়গম্বর বিশেষ। জগৎ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো প্রকৃতিবাদী। তার দর্শন ছিলো সমন্বয়সাধক। প্রচলিত কোনো অভিমতের পোষণীয়তা ছিলো তার স্বভাববিরুদ্ধ, তার বিশাল এবং বিচিত্র বিষয়ে কৌতূহল, তার অভিজ্ঞতার আওতাভুক্ত যে কোনো ঘটনাকে সামান্যীকরণের তার অসাধারণ ক্ষমতা, এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য হলেও, তাকে স্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। তিনি মানবের বিবর্তনের কথা লেখেন। পরিবারের বিবর্তনের কথা লেখেন, সামাজিক এবং আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানাদির কথাও তার রচনাদিতে পাওয়া যায়। তিনি উন্নয়নের একটি সাধারণ নীতি প্রস্তাবিত করেন, যা সমরূপতা থেকে পৃথগ্‌বিধতার দিকে অগ্রসরমান। তার

কাছে মনে হয়েছে যে সমাজ সামরিক এবং স্বেচ্ছাচারতন্ত্র অতিক্রম করে শিল্পযুগ ও গণতান্ত্রিক পর্বে প্রবেশ করছে। নীতিশাস্ত্র এবং রাজনীতি জীবন বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, দুর্জ্ঞেয় শাশ্বতত্ত্বের একটি রূপ। তার এইসব মতবাদের মধ্যে খুঁজলে বলিষ্ঠ আশাবাদের অনুসন্ধান মেলে, অতীন্দ্রিয়বাদী জটিলতার অনুপস্থিতি সহজেই নজরে পড়ে। ফলে অতি সাধারণ পাঠক এতে সহজেই আমোদিত বোধ করতে পারেন। সমাজ শিল্পযুগে উত্তীর্ণ হবার পর যুদ্ধের যুক্তিহীনতা এবং বর্বরতাকে নিকুচি করতে পারবে। প্রচলিত সরকারগুলোও বার বার খোলস বদলায়, তাছাড়া সরকার শিকার যুগের অবশেষ তো বটেই । সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দায়িত্বও সীমিত হতে থাকবে। একটা সময়ে দেখা যাবে যে এতোকাল যে শিক্ষা চালু আছে তাতে সুষমতা বলতে কিছু নেই, "দুটি স্থানীয় ঘটনা ও সংঘাত্রে দল (অর্থাৎ গ্রিক ও রোমান ইতিহাসের) জগতের উৎপত্তির অতি ক্ষুদ্র একটি স্থান পূর্ণ করে, (যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র)" মানুষের দৃষ্টিপথ শাসনের অধিকার লাভ করেছে। ভৌত প্রকৃতির অপরিহার্য সত্যের এখানে পাত্তা মেলেনি।

জনগণ হার্বার্ট স্পেনসরের এসব কথা শুনতে পছন্দ করতেন। তারা মনে করতেন যে এই কথাগুলো নতুন, গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈপ্লবিক। উপরন্তু তারা এই স্পষ্টভাষী দার্শনিকের বক্তব্য বুঝতে পারতেন, অন্তত বিশ্বাস করতেন যে বুঝতে পারতেন, এই দার্শনিক সমাজে প্রচলিত অভিমতগুলো অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতেন, তাছাড়া জ্ঞানের প্রতিটি শাখা বিষয়ে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করতেন বলিষ্ঠ আস্থার সঙ্গে। বিশেষ করে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই দার্শনিকের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি পোষণ করতেন বলে মনে করা যায়। কারণ ইনি সমাজতন্ত্রের অনুকূলে একটিও ভালো কথা বলা তো দূরের কথা, যে কোনো প্রকার বিরক্তিকর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করতেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে।

আবার, সুখ্যাতির এতোটা প্রসার সত্ত্বেও হার্বার্ট স্পেন্সারের কণ্ঠস্বর ছিলো অরণ্যেরোদন। তার প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাষ্ট্র শিল্পকারখানা ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করে, ছোটদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে, একটি গির্জাসঙ্ঘকে সমর্থন যোগায়, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে। তার দর্শনের যে অংশ মহাবিশ্বের প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা প্রস্তাবিত করে তা জনসংখ্যার বিরাট অংশের কাছে অবলম্বনীয় মতবাদ হিসেবে সমাদর কুড়ায়। তবে রাজনীতিতে তিনি যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কথা বলেন তা কারো মনঃপূত হয়নি। বরং তখনকার সামগ্রিক ঝোঁক বিপরীতমুখী ছিলো।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পয়গম্বর ছিলেন হযরত মুহম্মদের মতোই ধৈর্যশীল এবং গোঁড়ামীমুক্ত। এই পুস্তকে কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮–৪৩) নাম ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন রাইনল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত ইহুদি পরিবারের সন্তান। ইনি আকস্মিকভাবে অপযশের ভাগী হন ১৮৪৮ সালে বৈপ্লবিক হাঙ্গামার ভেতর কমিউনিস্ট ইসতেহার প্রকাশ করে।[১] এই জ্বালাময়ী দলিলে মার্ক্স উত্থাপন করেন ইতিহাসের নব্য দর্শন, বৈপ্লবিক সংস্কার সাধনের জন্য নতুন কর্মসূচি, এবং আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ধ্বনিত করেন নতুন আহ্বান। তিনি যুক্তি দেখান যে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে সৃষ্টি করেছে সর্বহারা শ্রেণী, আধুনিক ইতিহাসের চাবিকাঠি হলো এই দুই শ্রেণীর মধ্যে নিরন্তর

---

১ পরিশিষ্ট 'ক' দেখুন।

সংগ্রাম, সর্বহারার শ্রেণীসচেতন অংশ কমিউনিস্ট আদর্শের অনুসারী, আর কমিউনিস্টরা "চালু সমাজ ব্যবস্থা বলপূর্বক উৎখাত না করে সন্তুষ্ট কিংবা শান্ত হবে না।" দশটি প্রসঙ্গ গুরুত্বের সমাজ সংস্কার বিষয়ে অতঃপর তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। দেখা গেছে যে, তিনি যে প্রস্তাবগুলোর পক্ষে বাকজাল বিস্তার করেন তার অধিকাংশই হিতকর, এবং মার্ক্স যাদের প্রবল ঘৃণা করেন, সেই বুর্জোয়া পার্লামেন্ট কর্তৃক ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত করার জন্য গৃহীত হয়েছে। কিন্তু একজন বিপ্লবী কি করে মানতে পারেন যে জাতীয় সরকারগুলো এবং মধ্য শ্রেণী প্রভাবিত বিধানসভাগুলো আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের অনুকূলে কাজ করবে? মার্ক্স জাতীয়তাকে ঘৃণা করতেন একজন ব্রাত্য বা জাতিচ্যুত ব্যক্তির প্রচণ্ড তিক্ততার সঙ্গে। তার স্বাধীনতার বিরোধিতা ছিলো স্বৈরশাসকসুলভ নিরাপোষ। উপরন্তু, তিনি সারা জীবন সমাজের সেই শ্রেণীকে আক্রমণ করার সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতেন না, যে শ্রেণী থেকে তিনি নিজে উদ্ভূত। এই প্রচণ্ড বিশ্বজনীনতা অনুসারী নিরীশ্বরবাদীর অভিমত অনুসারে মানব সমাজ ধর্ম কিংবা জাতীয়তার ভিত্তিতে বিভক্ত নয়, শ্রেণীভিত্তিক নিয়ম অনুসারে বিভক্ত। জার্মান নিয়োগ কর্তা এবং জার্মান কর্মজীবী শ্রেণীর মধ্যে কখনো অভিন্ন স্বার্থ কাজ করে না। বরং জগতের সকল কর্মজীবী শ্রেণী পুঁজিবাদী শ্রেণীর অবসানের লক্ষ্যে অভিন্ন স্বার্থ দ্বারা তাড়িত হয়। আর এই পুঁজিবাদী শ্রেণী তো তাদের নির্মমভাবে শোষণ করে থাকে। কমিউনিস্ট ইসতেহারের উপসংহার কার্ল মার্ক্স এই ঘোষণা দিয়ে টানেন যে, "সাম্যবাদী বিপ্লবের হাওয়ায় শাসক শ্রেণীর মধ্যে কম্পন শুরু হোক। বিপ্লবের ফলে সর্বহারাদের কিছুই হারাতে হবে না, তাদের পায়ের বেড়ি ব্যতিরেকে, জগতের সকল সহায়সম্বলহীন ব্যক্তি এক হও।'

ইউরোপীয় মহাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর মার্ক্স লন্ডনের বাসিন্দা হন। এই নগরীতে তার জীবনের শেষ চৌত্রিশ বছর কাটে নিদারুণ আর্থিক দৈন্যদশার ভেতর। তবে প্রতিবার আর্থিক সংকটের সময় ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের উদার তহবিলের সাহায্য লাভ করেন। এই এঙ্গেলসও ছিলেন জার্মানির আদি অধিবাসী। মার্ক্সের পরম বন্ধু, এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। এঙ্গেলসের পিতা ছিলেন মাঞ্চেস্টারে সুতাকলের মালিক, ধনাঢ্য ব্যক্তি। মার্ক্সের ছিলো মোহিনী উপস্থিতি, স্বচ্ছ, দৃঢ়প্রতিষ্ঠ এবং শক্তিশালী বুদ্ধিমত্তা, প্রচণ্ড প্রাধান্যকামী মেজাজ, কথাবার্তা শাণিত ও বুদ্ধিদীপ্ত। ইনি যে কোনো সমাজে, পছন্দনীয় না হলেও বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য ছিলেন। এইচ.এম. হিন্ডম্যান তাঁর সম্পর্কে লেখেন : "তার ছিলো প্রশস্ত কপাল, ঝুলন্ত ভ্রু, তার প্রচণ্ড জ্বলজ্বলে চোখ, প্রশস্ত সংবেদী নাসিকা, সচল মুখ, আর এসবকে ঘিরে রয়েছে তার এলোমেলো একগাছি চুল ও প্রযত্নহীন দাড়ি, তার জাতির শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টাদের ক্রোধ, তৎসঙ্গে ছিলো দার্শনিক স্পিনোজা এবং ইহুদি ধর্মবেত্তাদের মতো ঠাণ্ডা মাথায় চুল-চেরা বিচারের অসাধরণ ক্ষমতা। বৃটিশ মিউজিয়ামের পাঠ কক্ষে ইংরেজ কারখানা শ্রমিকদের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাশূন্য হয়ে, ইংল্যান্ডে বাস করে তিনি 'পুঁজি' নামধেয় এক সুবিশাল কেতাব রচনা করেন। এই বইটিকে সারা বিশ্বে সর্বহারার বাইবেল হিসেবে বরণ করা হয়েছে।"

আজকের ইউরোপ মহাদেশে কয়েক মিলিয়ন মার্ক্সবাদী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন। তবে এদের মধ্যে নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি 'পুঁজি' নামক পুস্তকের পাতা উল্টিয়ে দেখেছেন, এটুকু জোর দিয়ে বলা চলে। অথচ 'পুঁজি' পুস্তকের তিনটি খণ্ডকে কমিউনিস্ট ধর্মের পবিত্রতম গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

যে মতবাদ এবং অগ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক যুক্তির সাহায্যে মার্ক্স প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে মূল্য শ্রমের সঙ্গে যুক্ত, অথবা তিনি যে বলেন নিধারিত পুঁজির উপর শ্রম দ্বারা যে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করা হয় তা পুঁজিবাদীরা মুনাফা হিসেবে কুক্ষীগত করে, কিংবা ধনীরা যতো বেশি ধনী হয় গরিবরা ততো বেশি গরিব হয়—এ সব তত্ত্বের উপর তার খ্যাতি বা প্রভাব নির্ভর করে না। মার্ক্স অত্যন্ত প্রতিভাশালী হলেও দার্শনিক কিংবা অর্থনীতিক হিসেবে খুব মনোযোগী ছিলেন না, আর লেখক হিসেবে ইংরেজি ভাষার উপর তার দখল খুব নিখুঁত ছিলো বলা চলে না। এই অভাবী, ভাবপ্রবণ নির্বাসিত ব্যক্তিটি ক্ষমতাবান হন এ জন্য যে তিনি সবসময়ই বিপ্লবের প্রবক্তা ছিলেন। তার সকল ক্রোধ বর্ষণ করেছেন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তিনি আপোষহীন আস্থার সঙ্গে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মানুষের সমগ্র ইতিহাসে ধনীরা সকল যুগে নির্ধনদের লুণ্ঠন করেছে, এবং এখন মানব প্রগতির অপরিহার্য সূত্র অনুসারে নির্ধন কর্তৃক ধনীদের লুণ্ঠিত হবার পালা শুরু হবে।

মানুষের সামগ্রিক গঠনেই এমন একটি ব্যাপার রয়েছে যে তারা কোনো কিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করবেই যদি সে নিশ্চিত হতে পারে যে উক্ত 'কোনো কিছু'র জয় হবেই। এই ইহুদি স্বপ্নদ্রষ্টার কৃতিত্ব এখানে যে তিনি বিভিন্ন দেশের সর্বহারা শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশকে বোঝাতে সক্ষম হন যে তাদের বিজয় অর্জনের আর বেশি দেরি নেই। হেগেলের দর্শন থেকে ইংগিত লাভ করে তিনি মানবতার প্রগতির একটি সূত্র প্রস্তাবিত করেন (যদিও তার প্রস্তাব নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হেগেল থেকে ভিন্ন)। তিনি মানবতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অভিন্ন যুক্তি এবং পরম্পরা সূত্রে বেঁধেছেন। আদিম সাম্যবাদ সামন্ত সমাজের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়। সামন্ত সমাজ পিছু হটে পুঁজিবাদী বুর্জোয়াদের জন্য, সর্বহারা শ্রেণী এবার বুর্জোয়াদের দখলচ্যুত করবে। ইতিহাস হলো বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থিব সম্পদের লড়াই। শ্রেণীতে শ্রেণীতে ঘৃণা, শ্রেণী যুদ্ধ হলো পরিবর্তনের মূল কারণ। পুঁজিপতিদের একনায়কতন্ত্র অনুসরণ করে আসবে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র, এরপর প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহীন সমাজ। এটি হবে পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য দীর্ঘ ও বর্বর কাড়াকাড়ির চূড়ান্ত অবসান। পুঁজিবাদ সম্পর্কে বলতে হয়, এটি স্বীয় ধ্বংসের বীজ বহন করে। একটি বহুল উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে মার্ক্স বর্ণনা করেছেন কিভাবে পুঁজিবাদ ধ্বংস হবে, এই ধ্বংসের ব্যাপারটা পূর্ব-নির্দিষ্ট। সময় যতো এগিয়ে চলে ব্যবসার আকার ততো স্ফীত হয়, পুঁজিপতির সংখ্যা কমতে থাকে, দারিদ্রের ও নিষ্পেষণের জ্বালা, অধঃপতন ও শোষণ সমানুপাতে বাড়তে থাকে। সবশেষে, গোটা ব্যবস্থা বাড়াবাড়ির কারণে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে খেটে খাওয়া মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঝোঁক দেখা দেয়, এবং তারা সংগঠিত হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনার বিশেষ নিয়মেই। যখন তারা পুঁজিবাদী একচেটিয়া কারবারে নিয়ত বর্ধমান ক্ষমতা সম্পর্কে ভাবতে বসে, ভাগ্যবানদের প্রাচুর্যের সঙ্গে নিজেদের দুর্দশা এবং অভাবের তুলনা করে তখন তারা চূড়ান্ত ক্রোধে ফেটে পড়ে। অতঃপর যা ঘটা উচিত তাই ঘটে। "উৎপাদনের উপায় অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূতকরণ এবং শ্রমের সামাজিকীকরণ এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হয় যখন তা আর পুঁজিবাদী খোলসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না। ফলে গোটা যোগসূত্র হয় লণ্ডভণ্ড। শোনা যায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি অবসানের ঘণ্টাধ্বনি। তখন দখলদারদের করা হয় দখলচ্যুত।"

ইউরোপীয় ঘটনাবলির যে ধারা তাতে যারা দুনিয়াব্যাপী শ্রেণী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতায় আস্থাশীল তারা খুব আরাম বোধ করতে পারেন না। প্রথম আন্তর্জাতিক গঠন করা হয় ১৮৬৪ সালে দুনিয়ার মজদুর শ্রেণীকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য। এই প্রথম আন্তর্জাতিক আন্তরিক সমর্থন লাভ করতে পারেনি, অভ্যন্তরীণ কোন্দল লেগেই থাকে, এবং ব্যাপারটা নিতান্তই স্বল্পায়ু হয়। ফ্রাংকো-প্রুসীয় যুদ্ধের ফলে হয় চূর্ণবিচূর্ণ কিংবা নাস্তানাবুদ। অতঃপর ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যায় দীর্ঘ তিরিশ বছরের কলঙ্কজনক ঝগড়া-ফ্যাসাদের দরুন, নিষ্ট ইয়র্কে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের জন্য মহাযুদ্ধ ছিলো মহা অনিষ্টকর। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে প্রতিভাবান রাজনীতিকের ঘাটতি ছিলো না।[২] তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ক্ষতিসাধন করে মস্কোর অপকারী প্রভাব। আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত শ্রমশক্তি জাতিগত যুদ্ধ রোধ করতে পারে, কিংবা শ্রমজীবী শ্রেণীর ভাগ্যের উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে, ঘটনাধারায় সে রকম আশাবাদ নস্যাৎ হয়ে যায়। শ্রেণী স্বার্থের চেয়ে জাতিগত বৈরিতা অনেক বেশি শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়, অর্থনৈতিক গোষ্ঠী বিন্যাসের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে দেশানুরাগ এবং আঞ্চলিক অনুভূতিও অনেক উপরে স্থান দখল করে। আন্তর্জাতিক শ্রমশক্তির প্রস্তাবনা নয়, প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

কার্ল মার্ক্সের পরিশ্রমের দিনগুলো প্রধানত কাটে ইংল্যান্ডে। অথচ এই ইংল্যান্ডে স্বীয় জীবৎকালে তাকে সাইফারের অধিক কি ভাবা যায়। এখানে সমাজতন্ত্র কোনো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মাথা থেকে নির্গত হয়নি। শাহুরিক জীবনের অবস্থা থেকে মানুষের মধ্যে যে সমবেদনা জাগে তাতেই সমাজতন্ত্রের সূচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সংসদে শ্রমিকের সুরক্ষার জন্য বিধান প্রণয়ন করে, শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের সংগঠিত করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে, সমবায় সমিতি গঠন করা হয় জীবনের মান রক্ষার জন্য, এবং বার্মিংহ্যামের জোসেফ চেম্বারলেনের মতো বুদ্ধিমান পুরসভা সংস্কারক বস্তি জীবনের নোংরা অবস্থা দূর করেন, শিশু মৃত্যুর হার ব্যাপক হারে হ্রাস করেন, তাছাড়া শিক্ষা এবং অন্যান্য সুবিধাদি দরিদ্র জনগণের আয়ত্তের ভেতর নিয়ে আসেন। মার্ক্স যখন তার সুবিখ্যাত ইংরেজ পুঁজিবাদের নিন্দাবাদ রচনায় ব্যস্ত তখন রক্ষণশীল এবং উদারবাদী নেতারা এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার ফলে পুঁজিবাদের একাধিক অমঙ্গলসূচক বৈশিষ্ট্য আর থাকে না। টমাস কার্লাইল এবং উইলিয়াম মরিসের কারণে সমাজের বিবেক জাগ্রত হয়। অর্থনীতির অনাড়ম্বর পরিমণ্ডলে সমাজের সমস্যা বিষয়ে এক দল সুযোগ্য ভাবুক নিজেদের ফেবিয়ান[৩] পরিচয় দিয়ে জোর দিয়ে বলেন যে, শ্রমজীবীদের সরকারি ব্যায়ে ন্যূনতম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, অবকাশযাপন এবং মজুরি লাভের অধিকার রয়েছে। যুগধর্ম (Zeitgest) পত্রিকার দপ্তরে এই উদার মতবাদের দরুন মৃদু হাসির সঞ্চার হয়। ইংরেজ ভূমের ঘন কুয়াসার ভেতর যখন মাঙ্গের রক্তবর্ণ নক্ষত্র অস্পষ্ট এবং দূরবর্তী মনে হয়েছে, পরিশ্রমী ফেবিয়ানরা তখন বুর্জোয়াশোভন আরাম-আয়েসে

---

২ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন লেনিন, মুসোলিনি, হিটলার, রাম্জে ম্যাকডোনাল্ড, সিডনেস্ট, লাভাল, ভ্যাণ্ডারভেল্ড, পিলসুদস্কি, বার্নার্ড শ।

৩. প্রধানত বার্নার্ড শ, সিডনি ও বিয়েট্রিস ওয়েব, গ্রাহাম ওয়ালাস, ইত্যাদি।

বাস করে, এবং 'ক্রমান্বয় উন্নতির অনিবার্যতা' প্রচার করে নিজেদের চিন্তা-ভাবনার ছাপ ইংলিশ স্টাডি বুকে বারবার অঙ্কিত করেছেন।

এমনকি দারিদ্রের কষাঘাত যখন খুব বেশি অনুভব করা গেছে তখন মার্ক্সের বিশ্বব্যাপী ক্রান্তি বিবাদ এবং প্রণালীবদ্ধ নিরীশ্বরবাদ তেমন পাত্তা পায়নি। হিন্ডম্যান, ধাপ্পাবাজ, ইটনের ড্রিকেটার, পরবর্তীকালে মার্ক্সবাদী, প্রতিষ্ঠা করেন সামাজিক গণতান্ত্রিক ফেডারেশন। ইনি ডক শ্রমিক ধর্মঘটের অ-তাত্ত্বিক নেতা জন বার্নস কিংবা স্কটল্যান্ডের খনির মালিক ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদী নেতা, স্বাধীন শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠাতা কেইর হার্ডি-র মতো নামযাদা ব্যক্তি ছিলেন না। বৃটিশ সমাজতন্ত্র ছিলো বৈশিষ্ট্যসূক এবং একান্তই স্থানীয় বস্তু। এই সমাজতন্ত্রে ইভানজেলিক্যাল অনুভূতির প্রাধান্য যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি একে ক্যামেরোনীয়া, মেথডিস্ট, রিভাইভালিস্ট ধর্মীয় আন্দোলনের সগোত্র মনে হয়। এই আন্দোলনগুলো বিভিন্ন সময়ে বৃটিশ জনগণের ধর্মীয় বিবেক জাগ্রত করে এবং তারা নব-নব আশা-ভরসায় উদ্দীপিত হতে পারে। ইউরোপে শ্রেণী বিদ্বেষের প্রাবল্য আন্দোলনে যে অনুপ্রেরণার কাজ করে ইংল্যান্ডে তা একেবারে অনুপস্থিত। বার্নার্ড শ লক্ষ্য করেন, "কর্মজীবীরা বুর্জোয়াদের সম্ভ্রম করে এবং নিজেরা বুর্জোয়া হতে চায় : মার্ক্স এক মুহূর্তের জন্যও এদের নাগাল পাননি।"

ইত্যবসরে মার্ক্সের বাণী মহাদেশের শ্রমজীবী শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিলো। ইতালিতে, ফ্রান্সে, এবং সর্বোপরি রাশিয়ায় মার্ক্সীয় মতবাদ গত শতকের নব্বই-এর দশক থেকে তরুণ প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের কল্পনায় দ্রুত প্রাধান্য বিস্তার শুরু করে। কবি ও অধ্যাপক, শিক্ষক ও কারিগর শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব বরণ করে, আরো বরণ করে মজুরি সংক্রান্ত লৌহকঠিন তত্ত্ব এবং সর্বহারার আসন্ন বিজয়ের অবশ্যম্ভাবিতা। লোম্বার্ডির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক নগণ্য শিক্ষিকা আদা নেগ্রি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ জনপ্রিয় গীতিকবিতায় রূপান্তর ঘটান। অপর একজন লোম্বার্ড কবি, ফিলিপ্পো তুরাতি একটি সমাজতান্ত্রিক জার্নাল প্রকাশ শুরু করেন। মাত্র এক দশকের মধ্যে ইতালিতে সিংহাসচ্যুত করেন হার্বার্ট স্পেন্সারকে। এখানে তিনি রাজনীতিক ও অর্থনীতিক প্রজ্ঞার পয়গম্বর হিসেবে গণ্য ছিলেন। মার্ক্সের সুনাম রটে অলিতে-গতিতে এবং কারখানাগুলোতে ; ১৯০৪ সালের ধর্মঘট আর মরণোত্তর কর্তৃত্বের পরিচয় বহন করে। যেখানে পণ্ডিতরা অনুপ্রেরণা লাভ করেন প্রজাতন্ত্রী কার্দুচ্চির ক্লাসিক্যাল কবিতা থেকে, রোমাঞ্চসন্ধানীরা মন্ত্রমুগ্ধ হয় (কাব্যিক অবক্ষয় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের থ্রিল) দ'আনুনজিও-র অনর্গল বাগ্মিতায়, সেখানে রেশমী বস্ত্রের কারখানার শ্রমিকরা মুক্তি খোঁজে কার্ল মার্ক্সে। বাস্তবিক পক্ষে, দেশ যতো পশ্চাদপদ, বিপ্লবী ভাবুকদের প্রভাব ততো বেশি শক্তিশালী হবার সম্ভাবনা। রাশিয়ার জীবনের মান কখনো ট্রেড ইউনিয়নের আশ্রয় লাভ করেনি। ফলে একবার মার্ক্সের রাজনীতির সাধারণ রূপরেখা মোটমুটি উপলব্ধি হলে, দ্রুততার সঙ্গে উর্ধ্বারোহণ শুরু করে।

ভারতে বৃটিশ শাসন

ইউরোপীয় ইতিহাসের ধারাবাহিক বর্ণনা দিতে গিয়ে এবার আমাদের এমন দুটি ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হচ্ছে যা আমাদের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। তবু এখানে সংক্ষেপে হলেও আলোচনা করতে হবে। কারণ বিষয় দুটি ইউরোপীয় অন্যতম প্রধান একটি জাতির বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ আলোকপাত করতে সক্ষম। এর প্রথমটি হলো বৃটিশদের ভারত বিজয় এবং ভারত শাসন ; দ্বিতীয়টি হলো দাসপ্রথা এবং দাসব্যবসার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানে ইংরেজদের অবস্থান। ভারত বিজয় কোনো পরিকল্পনা মোতাবেক সম্পাদিত হয়নি। এটি ঘটে কারণ সে দেশে ইংরেজ বণিকরা অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেন যে, কিছুটা শৃঙ্খলা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না করা গেলে বাণিজ্যে উন্নতি সম্ভব হবে না। মুঘল সাম্রাজ্যের বিগঠনের পর ভারতের অরাজক অবস্থার জন্য ইংরেজ বণিকদের সামনে একটা সুযোগ এসে যায়। এই সুযোগ তারা অনুসন্ধান করেননি, তবে এটিকে কাজে লাগাতে তারা সমর্থ হন। জনৈক মহান আমেরিক্যান নীতিবিশারদ[৪] বলেছেন যে, "বৃটিশ চরিত্রের কাছে ভারতের পতন ঘটে।" বৃটিশরা ভারত জয় করতে সমর্থ হন এজন্য যে তারা বিজিত রাষ্ট্রে শান্তি এবং নিষ্পেষণ থেকে অব্যাহতি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। তারা যে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়, তা ছিলো অসাধরণ। তারা দেশটিকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, তারা দেশটিতে প্রতিষ্ঠিত করে নিরবচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং বাণিজ্যের সুবিধা। ভারতে এক একর ভূমিও নেই যার স্বত্ব সম্পর্কে বৃটিশ প্রশাসনের কেতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়নি এবং বৃটিশ আইনের বলে তার স্বত্ব সংরক্ষণ করা হয় না। বৃটিশ সেচ প্রকৌশলীরা প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন একর মরুপ্রধান ভূখণ্ড উদ্ধার করে চাষাবাদের উপযোগী করেন। যদিও ভারতের প্রশাসনে ইংরেজেদের সংখ্যা কখনো পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে যায়নি তবু এই বহিরাগত লোকেরা দেশটি এমনভাবে শাসন করেছেন যে শুধু জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে অন্তত দুইশত তিরিশ মিলিয়ন। আজকের দিনে ভারতে যে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক ঐক্য লক্ষ্য করা যায় তা বৃটিশদের বিজয় এবং প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি অভিন্ন ভাষা চলে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও অভিন্ন ভাষার ব্যবহার হচ্ছে। এটি খুব ভালো কথা নয়। তবে প্রয়োজনই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। মনে রাখতে হবে ভারতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। আমরা যে অভিন্ন ভাষার কথা বলছি তার নাম ইংরেজি, ইংল্যান্ডের ভাষা। ভারতীয়দের প্রতিটি রাজনৈতিক সমাবেশে বিতর্কে বহুদূরবর্তী ইউরোপীয় দ্বীপের বুলি ব্যবহার করা হয়। ভারতে বৃটিশ প্রশাসনের

---

৪. আর. ডব্লু. এমারসন, মারকুইস অব জেটল্যান্ড কর্তৃক Steps towards Indian Home Rule গ্রন্থে উদ্ধৃত।

একজন অভিযোগ করে বলা হয় যে দেশের জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ এখনো নিরক্ষর (১৯২১ সালে ছিলো তিন শত পঞ্চাশ মিলিয়ন)। যারা এই অভিযোগ উত্থাপন করেন তারা ভুলে যান যে এদেশে শিক্ষা বিস্তারে তিনটি অনিবার্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, যে অসুবিধাগুলি ইউরোপীয় কোনো রাষ্ট্রে মোকাবেলা করতে হয় না। প্রথম এবং ন্যূনতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি হলো ভাষা এবং ধর্মের অতি সাধারণ বৈচিত্র। দ্বিতীয় সমস্যাটি বাল্য বিবাহের বহুল প্রচলন: এতে দেশের নারীর সংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাস পায়; বস্তুত বর্তমানে উদ্বৃত্ত পুরুষের সংখ্যা বারো মিলিয়ন। তৃতীয় সমস্যা হলো ভারতীয় সমাজের রীতিনীতি। এই রীতিনীতির কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে অবিবাহিত মেয়েদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা যায় না। ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা জরিপ করার সুযোগ যাদের ঘটেছে তারা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে এই সর্বশেষ কারণই ভারতীয় জনগণের সংখ্যা ব্যাপক নিরক্ষরতার জন্য প্রধানত দায়ী।

তবে সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এটি নয় যে (ইংরেজদের চরিত্রের) তারা ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৮৭০ সালে ইংরেজরা তাদের দেশেই এই ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ইংরেজদের চরিত্রের লক্ষণীয় দিক এই যে তারা পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবিধা ভারতীয়দের মধ্যে প্রচারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। মেকলের আন্তরিক নির্দেশনায় (মেকলে ছিলেন গবর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের প্রথম আইন সদস্য) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে ভারতীয় জনগণকে তাদের ইউরোপীয় বিজেতাদের ভাষা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে শিক্ষিত করতে তুলতে হবে। এই নীতির ভিত্তি যদিও ছিলো প্রাচ্যের শিক্ষাদীক্ষার ঐতিহ্যের প্রতি ত্রুটিপূর্ণ সহানুভূতি, তবু ইংরেজরা আন্তরিকভাবে চাইতেন যে বিজেতাদের সভ্যতার যা-কিছু সুন্দর ও মূল্যবান তাতে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণ করা উচিত। এই সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি ছিলো অতীব বিস্ময়কর। মেধাবী উকিল, প্রশাসক, কর্মচারী, শিক্ষক এবং রাজনীতিকদের দ্বারা গঠিত বিরাট একটা শ্রেণী রহস্যময় স্বচ্ছন্দের সঙ্গে বৃটেনের ভাষা এবং ভাবনাধারা আত্মস্থ করতে সমর্থ হয়। ভারতীয়রা ইংরেজি ভাষায় লেখা পুস্তক পাঠ করে, ইংরেজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, ইংরেজি নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে, ইংলিশ ল থেকে নজির উপস্থাপন করে, উপরন্তু উকিল এবং সাংসদ হিসেবে অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখে। ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ে মেকলের প্রসিদ্ধ মিনিট যে সুফল বয়ে আনে তাতে শুধু ভারতে একটি চমৎকার অফিসার শ্রেণী গড়ে ওঠেনি (এদের সংখ্যা দুই মিলিয়নের কম নয়), একটি শিক্ষিত রাজনীতিক শ্রেণীও গড়ে উঠেছে। এরা ইংরেজি বই পড়ে স্বাধীনতার মূল্য বুঝেছে। এখন তারা জোর দিয়ে বলতে পারেন যে যা কিছু ইংরেজদের জন্য কল্যাণকর তা ভারতীয়দের জন্যও কল্যাণকর প্রমাণিত হতে বাধ্য। এখন তারা স্বাধীনতা এবং প্রগতি সম্পর্কিত নিজস্ব মতবাদের উপর ভিত্তি করে শাসক শ্রেণীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।

পলাশীর যুদ্ধ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবসানের মাঝখানে এক শো বছর কেটে গেছে। ১৮৫৮ সালের ইন্ডিয়া অ্যাক্টের দরুন ভারত সাম্রাজ্য বৃটিশ রাজশক্তির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। রাজশক্তি এই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে একজন রাষ্ট্র সচিবের মাধ্যমে। অতঃপর রাজ্য জয়ের যুগের অবসান হয়। সূচিত হয় সংহতি এবং শান্তির যুগের। তবু, যে শতাব্দীতে ইংরেজরা শক্তি প্রয়োগ করে তাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে

মধ্যাঞ্চল এবং পশ্চিম ভারতে, উপরন্তু পাঞ্জাবে, তখন এদেশে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা মনে করেছে যে ভারতীয় অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য কাজ করার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি হেস্টিংস এবং ওয়েলেসলি, বেন্টিঙ্ক, ডালহৌসি এবং লরেন্সরা আন্তরিকভাবে পোষণ করতেন। হুইগ দল ১৮৩২ সালে রিফর্ম অ্যাক্ট পাস করে তাদের মতবাদ এই ছিলো যে উদারনীতিবাদ শুধু বিলেতি জনগণের জন্য প্রযোজ্য নয়। এটি গোটা দুনিয়ার প্রতিটি সফল সরকারের নীতি হওয়া উচিত। ১৮৩৩ সালের ইন্ডিয়ান চার্টার অ্যাক্টে দুটি মূল্যবান নীতি বিষয়ে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়। একটিতে বলা হয় যে, "ভারতীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে দেশীয় লোকদের দাবি অগ্রে বিবেচনা করতে হবে।" অপরটিতে বলা হয়, "ভারতের কোনো অধিবাসী কিংবা জন্মসূত্রে হিজ ম্যাজেস্টির কোনো প্রজা কোনো জায়গায় বসতি গড়ার ক্ষেত্রে, চাকুরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে তার ধর্ম, জন্মস্থান, বংশ এবং গাত্রবর্ণের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবেন না।" ভারতীয় বিদ্রোহের পর হয়তো প্রত্যাশা করা হয়েছিলো যে জাতিগত উত্তেজনার কারণে সরকার এবার স্বীয় পথ থেকে বিচ্যুত হবে। কিন্তু তা হয়নি। সরকার একই পিতৃসুলভ ভাবমূর্তি বজায় রেখেছে। একটি রাজকীয় ঘোষণায় জ্ঞাপন করা হয় যে, ভারতের দেশীয় রাজাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে, সকল ধর্মের অধিকার সমান সংরক্ষণ করা হবে, এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে ইংল্যান্ডেশ্বরের প্রজা যে কোনো সরকারি পদের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এই সব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারের মধ্যে প্রথম দুটি অত্যন্ত বিবেকিতার সঙ্গে পালন করা হয়। শেষোক্ত অঙ্গীকার পালন করা হয় ধীরে ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে স্তরের পর স্তর অতিক্রমণের মাধ্যমে।

ভারতে বৃটিশ সরকার যে বিপুল ও বস্তুগত সাফল্য অর্জন করে তার প্রমাণ এখানে মেলে যে এই সরকারের রথ উল্টিয়ে দেবার জন্য ব্যাপকভিত্তিক কোনো প্রচেষ্টা কখনো গ্রহণ করা হয়নি। ১৮৫৭ সালে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তাকে সার্বজনীন বা জনপ্রিয় উত্থান বলা চলেনা। এটি ছিলো সেনা ছাউনিগুলির বিদ্রোহ, তার আকার ছিলো আংশিক। এই বিদ্রোহ দমন করা হয় পাঞ্জাব থেকে ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে। যদিও এই বিদ্রোহের প্রাদুর্ভাবের ফলে দুঃখজনক এবং নৃশংস নিপীড়ন চলে, উভয় পক্ষই নিপীড়ন চালায়, এতে প্রচণ্ড তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তবে ঘটনার পর সূচিত হয় মানবিক ও বিজ্ঞ প্রশাসনের। আবার এই প্রশাসন জনগণের ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা শান্ত করতে গিয়ে কিছুটা ভুল করে, তবে সে ভুল সংঘটিত হয় ভীরুতার কারণে। মহাযুদ্ধ চলাকালে বৃটিশ সাম্রাজ্য যখন নানাবিধ ঘাটতির জন্য বেকায়দায় পড়ে তখন ভারতীয় রাজন্যবর্গ এবং জনগণ বৃটিশদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে কার্পণ্য করেনি। বৃটিশরাজ যদি অন্যায়ভাবে কঠোর এবং নিপীড়নমূলক হতেন, সরকার পরিচালনায় শিক্ষিত ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের দাবি প্রতিরোধের ব্যাপারে জেদ বজায় রাখতেন, তাহলে বৃটিশরা যে বিপদে পড়তেন তা ভারতীয়রা সুবর্ণ সুযোগ গণ্য করে কাজে লাগাতেন।

বিদ্রোহের পর বৃটিশ ভারত শাসিত হয় একটি আমলাতন্ত্র দ্বারা, এই আমলাদের নির্বাচন করা হয় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। ভারতীয়রা অনিয়ম, খেয়ালিপনা এবং দুর্নীতিমুক্ত একটি প্রশাসনের অধীনে শাসিত হবার সুযোগ পায়। এই সত্য এখন আর কেউ অস্বীকার করেন না। ভারতীয়রা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সুবিচার পাবার সুযোগও

ভোগ করেছে। ভারতীয় পাবলিক সার্ভিসসমূহের বৃটিশ সদস্যরা সম্ভবত অন্য যে কোনো শাসক শ্রেণীর চেয়ে অধিক উপলব্ধি করেন নিরাসক্ত সরকারের আদর্শ, যে নিরাসক্ত সরকারের আদর্শ সম্পর্কে পূর্বাকালীন গ্রিক দার্শনিক প্লেতো জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, নিরাসক্ত সরকার কায়েম করতে হলে রাষ্ট্রের অভিভাবক শ্রেণীকে সম্পত্তির মালিকানা এবং পরিবারের মোহ থেকে নিরাপদ দূরত্বে আড়াল করে রাখতে হবে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের বৃটিশ সদস্যদের বিরাট বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হয় : অপরাধ দমন, প্রাচ্যের দরিদ্র একটি সমাজের অপর্যাপ্ত রাজস্ব থেকে একটা আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটাতে হয়েছে, শিক্ষার মতো অনভিপ্রেত অভিনবত্বের উন্নয়নে পরিশ্রম করতে হয়, পশ্চাদপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষকদের স্বাস্থ্যের পরিচর্যা ছিলো অত্যন্ত কঠিন কাজ, সর্বোপরি শত্রুভাবাপন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন ছিলো জটিল ও কঠিনতম দায়িত্ব।

গত যুদ্ধের কয়েক দশক আগে ভারত সাম্রাজ্যের প্রায় অনুরূপ রাজনৈতিক দৃশ্যপট ইউরোপেও দেখা যেত যদি আমরা ভাবতে পারতাম যে এটি প্রধানত পার্বত্য টাইরলের কৃষকদের মানসিকতা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। উপরন্তু শাসিত হয় মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান এবং হিতবাদী চিনেদের দ্বারা, সুরক্ষার ব্যবস্থা করে চিনেরা সমুদ্রে দেশী নৌকোর সাহায্যে, স্থলভাগে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হয় একটি বাহিনী দ্বারা, যে বাহিনী স্থায়ী তাবু ফেলেছে উরালের পার্বত্য অঞ্চলে, বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত এক শো পঞ্চাশ হাজার ইউরোপীয় এবং পচাত্তর হাজার চিনে সৈনিক। তিন শত পঞ্চাশ মিলিয়ন লোকসংখ্যার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে এমন একটা বাহিনী, যার ক্ষমতা বেলজিয়াম রাষ্ট্র প্রতিরক্ষার জন্য যে ক্ষমতার প্রয়োজন করে তার অধিক নয়, এতেই প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় জনগণের বৃহত্তম অংশের কাছে ইংরেজরা অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বৃটিশ কর্মপন্থার বিজ্ঞতাপ্রসূত লক্ষসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হলো, ক্রমবর্ধমান হারে দেশপ্রেমিক এবং শিক্ষিত ভারতীয়দের সরকারি কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত করা। প্রথমে ভারতীয়দের শুধু সরকারি গৌণ পদগুলিতে নিয়োগ করা হতো। যুদ্ধের আগে তাদের হাইকোর্টের বিচারক পদে নিযুক্ত করা হয়েছে, তারা দাবি তুলেছে ইম্পিরিয়াল সিভিল সার্ভিসের অন্তত অর্ধেক পদ ভারতীয়দের দ্বারা পূরণ করতে হবে। সংসদীয় জীবনের বীজ ১৮৬১ সালেই বপন করা হয়। বর্তমানে তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ১৮৬১ সালে গবর্নর-জেনারেলের আইনসভায় জনৈক ভারতীয়কে প্রথম মনোনীত সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সেটিই ছিলো ভারতীয়দের সংসদীয় জীবনের সূচনা।

এখন সর্বত্র জাতীয়তাবাদের উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। লর্ড ক্লাইভ কিংবা ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় এসব জানা ছিলো না। বিদ্রোহের সময়কার প্রজন্মও জাতীয়তাবাদের মর্ম উপলব্ধি করতে পারতেন না, ফলে ভারতে ইংরেজদের কাজ সে কালের চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। গাত্রবর্ণ শাদা হলে বৃটিশ শাসনের সূচনার শতাব্দীতে সেটা সম্ভ্রম আদায়ের পাসপোর্ট হিসেবে গণ্য হয়েছে, বর্তমানে বহু ভারতীয় শিক্ষিত কিংবা অর্ধ শিক্ষিতের কাছে তা অমর্যাদার ব্যাপার। বর্ণভেদ এখন খুবই তীব্র। সরকারি কর্মকাণ্ড থেকে বিদেশী উপাদান অপসারণ এখন আর কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। জনসংখ্যার যে অতি ক্ষুদ্র অংশ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তাদের কাছে এটি সাধারণ দাবি মাত্র। ছাত্ররা কলেজে স্বরাজের স্বপ্ন

দেখে। খবরের কাগজের লোকেরা এবং রাজনীতিকরা সর্বদা এর পেছনে ছুটছে। রুশদের সঙ্গে যুদ্ধে জাপানীদের স্মরণীয় বিজয়ের পর থেকে এটা ধরে নেয়া হয় যে, প্রতীচীর সামনে প্রাচ্যের এখন আর হেয় ভাবার কোনো কারণ নেই।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একটি কাঠামো। এটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত। শেষ পর্যন্ত দু'টি প্রধান আকৃতির একটি ধারণ করে। প্রথমটি হলো পাশ্চাত্য এবং নিয়মতান্ত্রিক, দ্বিতীয়টি এসীয় এবং বৈপ্লবিক। মেধাবী ভারতীয়দের একটা সংঘ দেখা যায়। এরা ভিক্টোরিয় উদারবাদী দর্শনে আপ্লুত, পশ্চিম জগতের জাতীয়তাবাদী এবং মুক্তিপ্রয়াসী আন্দোলন গুলির বিভিন্ন পর্যায় তারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। আমেরিকান উপনিবেশগুলির মুক্তিকামী আন্দোলন তাদের মনে দাগ কেটেছে; তারা লক্ষ্য করেছেন বৃটিশ ডমিনিয়নগুলিকে দায়িত্বশীল সরকার প্রদান করা হয়, আয়ারল্যান্ড হোম রুলের দাবি তোলে, আদায় করতেও সমর্থ হয়। ফলে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে যা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য কল্যাণকর তা ভারতীয় জনগণের জন্যও কল্যাণকর হতে বাধ্য। তাদের কল্পনার ভবিষ্যৎ-ভারত, অস্ট্রেলিয়া কিংবা কানাডার মতো। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্ব-শাসিত ডমিনিয়ন হবে, গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট থাকবে, জগতের আধুনিক জাতিসমূহের মধ্যে দাঁড়াবে। এদের কোনো বৈপ্লবিক কর্মপন্থা নেই। জাতীয় স্বাধীনতা আসন্ন এই বিশ্বাসে ভর করে তারা শাসনতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে স্বাধীনতার লগ্ন এগিয়ে আনতে চায়। সার্ভেন্টস অব ইন্ডিয়া সংঘের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল কৃষ্ণ গোখেল (তিনি নিজেও একজন সুদক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান, নিয়মতান্ত্রিক) ছিলেন আন্দোলনকারীদের অগ্রদূত এবং অধিবক্তা।

আরো অনেকে আছেন যারা পশ্চিম বিশ্বের অভিনবত্বের সদর্থক মূল্যায়ন করেন না। তারা মনে করেন ভারতীয় জীবনের জন্য যা কিছু মূল্যবান তার সবই বেদগ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গোষ্ঠীর নেতারা বিশ্বাস করেন যে ভারত একটি জাতি, তবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ভারতের প্রতি তাদের কোনো আস্থা নেই। এ ধরনের দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন দয়ানন্দ, আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। এই সংঘের লক্ষ্য হলো প্রাচীন হিন্দুর আত্মশক্তির পুনরুজ্জীবন। পি.জে. তিলকের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিলো উক্ত সংঘের অনুরূপ। এই দুধর্ষ ব্রাহ্মণ নেতা বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন দাক্ষিণাত্যে, গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে। এই শক্তিশালী বিপ্লবী এবং বক্তৃতাবাগিশ নেতার চূড়ান্ত রক্ষণশীলতার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে তিনি এজ অব কনসেন্ট বিলের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। এই বিলের লক্ষ্য ছিলো বাল্য বিবাহ রোধ করা। এই প্রথাকে সাধারণভাবে ভারতের জঘন্য কলঙ্ক বলে গণ্য করা হয়।

এটা সম্ভাব্য যে, ভারতে বৃটিশ প্রশাসকগণ এধরনের মনোভাব প্রতিরোধের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে। বিরূপ জলবায়ুর মধ্যে কাজ করে, কাজের চাপে পিষ্ট হবার পর বৃটিশ অফিসারগণ তাদের প্রশাসনের কার্যকারিতার জন্য ক্ষতিকর ধ্যান-ধারণাকে হৃষ্টচিত্তে অভিনন্দন জানাবে, এতটা নিশ্চয় প্রত্যাশা করা যায় না। ভারতের সিভিল সার্ভিস কংগ্রেসের নেতাদের প্রতি অত্যন্ত শীতল। জাতীয় কংগ্রেস সেই ১৮৮৫ সাল থেকে দেশব্যাপী একটা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট। এদের কেউ দেশীয় ভাষার পত্রিকাগুলির নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণকে তেমন একটা পাত্তা দেয় না। একটা হিতবাদী শক্তির এজেন্টদের মধ্যে

[illegible] ঔদাসীন্য জন্ম নেয়া খুবই স্বাভাবিক। এই শক্তি বহুকাল যাবৎ বিধাতার ভূমিকা [illegible] রেখেছে। এখন সরকারি বিভাগের সঙ্গে তরুণদের উচ্ছ্বাসপ্রবণ জাতীয়তাবাদের [illegible] ক্ষেত্রে উক্ত এজেন্টদের মনোভাব একটা ব্যাপার বৈকি। তথাপি, সিভিল সার্ভিস [illegible] বিভিন্ন মন্ত্রিসভা, একাধিক রাষ্ট্রসচিব এবং রাজদূতদের ভারতের জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য তৈরি নানাবিধ পরিকল্পনা বৈশিষ্ট্যসূচক আনুগত্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছে। লর্ড রিপনের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল, মর্লি-মিন্টোর ১৯০৯ সালের দায়িত্বরহিত আইনসভা, ১৯১৭ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ডের পরিকল্পনার ডাইয়ার্কি বা দ্বিস্তর শাসনব্যবস্থা, যার অধীনে দেশগঠনমূলক দায়িত্বগুলি, যেমন স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, ইত্যাদি, নির্বাচিত ভারতীয় আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল ভারতীয় মন্ত্রিসভার দায়িত্বে হস্তান্তরিত করা হয়। অপর নিরাপত্তামূলক দায়িত্বগুলি (সেনা বাহিনী, পুলিশ ইত্যাদি) সরকারি কর্মকর্তাদের হাতে থেকে যায়। বিভিন্ন কিস্তিতে এই যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করা হলো তাতে আমলারা যতোই বিরূপ হোন না কেন, এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা ছিলো অনিবার্য, এই স্বীকৃতি সর্বত্র পাওয়া গেছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যে ভারতের বৃটিশ কর্মপন্থা প্রভাবিত করবে, এই বাস্তবতা এখন বৃটিশ সমাজের প্রতিটি স্তরে স্বীকৃত। ইতিমধ্যেই দিল্লির পার্লামেন্ট ভারতীয় শুল্কনীতি তৈরি এবং ভারতীয় উৎপাদকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বৃটিশ পণ্য-সামগ্রী আমদানির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করছে। ১৯১৭ সালে ভারতীয়দের বিশেষ সুবিধা প্রদানের অংশ হিসেবে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, কিন্তু এই ব্যবস্থা এখন আর ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারছে না। একটি স্ব-শাসিত, নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন (দেশীয়[৫] রাজাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে) গঠন এখন উভয় দেশের প্রথম কাতারের নেতাদের মূল লক্ষ্য। এটি একটি সংবিধিতে অন্তর্ভুক্তও করা হয়েছে। তবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযোগের জন্য রক্ষাকবচ থাকবে। বৃটেন এই বিপজ্জনক পথে বহুদূর ও দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত। এক্ষেত্রে তারা অ্যাংলো-সাক্সন জাতির দু'টি নীতি দ্বারা পরিচালিত। একটি হলো সকল সরকারকে নির্ভর করতে হবে জনগণের সম্মতির উপর। অপরটি হলো রাষ্ট্রবিদদের দায়িত্ব হলো সংস্কারের পথে গিয়ে বিপ্লব ঠেকানো।

"প্রাচ্য প্রাচ্যই, প্রতীচ্যও প্রতীচ্য।" ভারতীয়দের চরিত্র, ভারতের জীবনের আদর্শ, সর্বশেষ বিশ্লেষণে, পশ্চিমী পর্যবেক্ষকদের কাছে নিদারুণ হতবুদ্ধিকর ব্যাপার। ভারতীয় ধর্মীয় জগতে, যেখানে ইহজাগতিক সকল বস্তুকে ধূলিসম গণ্য করা হয়, জীবনের মূল্যবোধগুলির সেখানে অভিজ্ঞতা হয় ব্যস্তক্রিয়া। সেখানে পারলৌকিকতার মূল্য দক্ষতার চেয়ে অনেক বেশি, শারীরিক কিংবা মানসিক শক্তিকে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক খাটো করে দেখা হয়। কোনো সাধুপুরুষ যদি ঘণ্টা বাজিয়ে অনশনব্রত পালন করেন তাহলে তিনি সার্বজনীন সম্ভ্রম কুড়ান; কোনো সমাজকর্মী যদি বস্তির জঞ্জাল সাফ করেন, মহাজনী ব্যবসায় লাগাম টানতে যান, কিংবা কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাহলে তিনি প্রশংসা কুড়ানোর চেয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন বেশি। লর্ড কার্জন ভারত থেকে বিদায় গ্রহণ করেন বিস্তর অখ্যাতি কুড়িয়ে। অথচ তিনি ভারতের কৃষি, শিক্ষা, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ

---

৫. ভারতে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা মোটামুটি ৭০০টি, এদের নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় ভূ-ভাগের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ।

করেন। ভারতীয় জনগণের সার্বিক উন্নতির জন্যও তার অবদান অসামান্য বিবেচিত হয়। গত দুই দশকে যে বীরকে নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে মাতামাতি চলছে সবচেয়ে বেশি দীপ্তিময় ইংরেজ প্রশাসকদের থেকে তার যে ব্যবধান সেটা কল্পনা করা একটু কঠিন বৈকি। মি. গাঁধির অনেক গুণ ছিলো, যদি তিনি ভাগ্যচক্রে পশ্চিমী জগতের মানুষ হতেন তাহলে তিনি হতেন পয়লা সারির রাজনৈতিক নেতা : তার ব্যক্তি চরিত্রের বিরাট আকর্ষণ, গভীর দেশানুরাগ, কথাবার্তায় অতুলনীয় সামর্থ, আত্মপ্রচারে তীক্ষ্ণ মনোযোগী, আঘাত দান এবং আত্মরক্ষায় সূক্ষ্ম কায়দার অধিকারী, সর্বোপরি ছিলো ইংরেজি ভাষার উপর অনন্য সাধারণ দখল। পশ্চিমী রাজনৈতিক জগতে এই গুণগুলির খুবই কদর করা হয়। ইংরেজরাও সহজে এ সবের গুণগ্রাহী হন। তবে এই খর্বাকৃতি হিন্দু ব্যবহারজীবী বৃটিশ পণ্য বর্জন এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সংগঠন করে বৃটিশ রাজের জন্য যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন, তাতে তার ভিন্ন জটিল ও হতবুদ্ধিকর চরিত্র অনাবৃত হয়। একজন নিঃসংশয় সাধুপুরুষ, আবার মহাজন পরিবারের সদস্য হিসেবে কুসীদজীবিতার সুহৃদ, দেশভক্ত, অথচ রাজনীতিক হিসেবে ভারতের অতিনীচ বস্তি-সম্পত্তির সুবিধাভোগী, পশ্চিমী আধুনিক জীবনের (জোকপ্স দিয়ে) ঘোর বিরোধী, অথচ ফোর্ড গাড়িতে চড়ে ভ্রমণে কখনো সঙ্কোচবোধ করেন না। মি. গাঁধি সেই সব বর্ণবহুল এবং হতবুদ্ধিকর প্রতিতুলনার প্রতীক, যা পশ্চিম জগতের বিজ্ঞজন ও ধৈর্যের সামনে স্মরণীয় এবং উত্তেজনাকর চ্যালেঞ্জ জানায়।

ইউরোপ ও দাসপ্রথা

পূর্বাকথন। দাসপ্রথা। মধ্যযুগীয় ভূমিদাস প্রথা। নতুন বিশ্বে বাণিজ্যিক ফসল আবাদে ক্রীতদাস নিয়োগ। স্পেনের তুলনামূলক মানবিকতা। ইংরেজদের দাস ব্যবসা। দাসপ্রথা বিলুপ্তির জন্য আন্দোলন। মুক্তিদাতাগণ। সংসদের গুরুত্ব। ওয়েসলেয়ানগণ। অর্থনীতিবিজ্ঞান। ১৮০৭ এবং ১৮৩৩ সালের আইন। বৈদেশিক দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আফ্রিকার লিভিংস্টোন। আধুনিক আইনে মানবিকতার ছোঁয়া।

আমরা যতদূর জানি, ইউরোপের ইতিহাসের দুটি পর্ব সবিশেষ কুখ্যাত। প্রথম পর্বে রোমক প্রজাতন্ত্রের লুণ্ঠনকারী এবং দস্যুরা প্রাচ্যের সম্পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে (এই সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা খুব মজবুত ছিলো না), যখন ঈজিয়ান সাগরে দাসব্যবসায়ীদের আনাগোনা ছিলো খুব বেশি, আর ডেলোস (১৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মুক্ত বন্দরে পরিণত হয়) কুখ্যাতি কুড়ায় ইউরোপীয় দাস ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে। এই ডেলোসে, আমরা যদি ইতিহাসকার স্ট্র্যাবোকে বিশ্বাস করতে পারি, মাত্র এক দিনে দশ হাজার ক্রীতদাস বেচাকেনা হতো। কিন্তু এই নিদারুণ লোলুপতা ও লুণ্ঠনের যুগ, চলার সময় ভয়ানক রূপ পরিগ্রহ করলেও, দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সাম্রাজ্যের সৎ সরকার ক্রীতদাস শিকার বন্ধ করে দেয়, তাছাড়া স্টয়িকদের মৃদু ও মানবিক দর্শন ক্রীতদাস শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হয়। ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের জন্য কোনো আন্দোলন না হলেও, এই প্রথার অনেক জঘন্য বৈশিষ্ট্য বিদূরিত হয়, তথা ভূমিদাসত্বের রূপ লাভ করে, যা নগরের দক্ষতাপূর্ণ ও মার্জিত অনেক পেশার অনুরূপ ছিলো। সাম্রাজ্যের সর্বশেষ পর্যায়ে ক্রীতদাসরা নামে না হলেও কার্যত মুক্ত মানুষ হিসেবে জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছেন। তাদের অনেক সময় প্রভুর সামাজিক কাঠামোয় প্রবেশের সুযোগ ঘটেছে, প্রভুর জ্ঞানচর্চা ও চিন্তাধারায় অংশগ্রহণ করেছেন, শিল্পকলা এবং কারিগরি ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, রাজনৈতিক জীবন পরিচালনায় তাদের ইতিবাচক প্রভাব অনেক সময় কার্যকর হয়েছে। স্টোয়িক দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম মহৎ এবং বিজ্ঞ এপিক্টেটাস ক্রীতদাস হিসেবে বিন্দুমাত্র পরিতাপ বোধ করেন নি। ব্যক্তিগত জীবনে মানবিক অনুভূতির অবাধ কার্যকারিতা, সরকারের ক্রমবর্ধমান দায়িত্ববোধ, খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাব, সাম্রাজ্যের এসিয়া এবং আফ্রিকার প্রদেশগুলির সংগঠন, যান্ত্রিক উপায়ে ব্যাপক উৎপাদনের সূচনা ক্রীতদাসের সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে, তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটায়, কল-কারখানায় ক্রীতদাস নিয়োগের গুরুত্বও হ্রাস পায়।

রোমক সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পরও এই অমঙ্গলজনক প্রথার পুনরাবির্ভাব ব্যাপক হারে ঘটেনি। মধ্য যুগে যেহেতু কৃষি কর্মে ভূমিদাস প্রথা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে এবং শহরে শ্রমিকের প্রয়োজনও সহজে মেটানো সম্ভব হয়, সেহেতু তখন দাস ব্যবসা ব্যাপক হারে সংকুচিত হয়। কেবল কৃষ্ণ সাগরের উপকূল বরাবর এই ব্যবসা চলতে থাকে। তবে রোমক

প্রজাতন্ত্রের সময় যে হারে ক্রীতদাস শিকার করা হতো, কিংবা নতুন বিশ্ব আবিষ্কারের পর লোলুপতার যে বিস্তার ঘটে তার সঙ্গে তুলনা চলে না।

খ্রিষ্টান সভ্যতার জন্য ভয়ানক ব্যাপার এই যে পশ্চিম ইউরোপে খ্রিষ্টধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার হাজার বছর পর ইতিহাসের দীর্ঘতম ক্রীতদাস শিকারের যুগ অতিবাহিত হয়। এবার এই ব্যবসার সূচনা করে স্পেন ও পর্তুগাল, ফ্রান্স, হল্যান্ড এবং বৃটেন। আরো, এবার যে ক্রীতদাস প্রথা চালু হয় তা ছিলো প্রাচীন যুগের প্রথার চেয়ে বাজে এবং অমানবিক। প্রাচীন বিশ্বে গার্হস্থ্য দাস প্রথা ছিলো শিক্ষামূলক এবং মানবিক, খনি বা বাণিজ্যিক কৃষিক্ষেত্রে শ্রম দানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নতুন বিশ্বে ব্যাপারটা ছিলো ভিন্ন প্রকৃতির। যন্ত্রের সাহায্যে বিপুল উৎপাদন চালু হয়েছে। ইউরোপের চিনি, তামাক ও তুলার চাহিদা পূরণ করা হয়েছে আফ্রিকার ক্রীতদাসদের শ্রমের সাহায্যে। এই শ্রমিকদের সংগ্রহে এবং তাদের প্রতি আচরণে কোনো মানবিকতার ছোঁয়া ছিলো না।

পশ্চিমের ক্রীতদাস শিকারী দেশগুলির মধ্যে (এই দেশ গুলিই নির্যাতনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে) স্পেন তুলনামূলক মানবিকতার পরিচয় দেয়। সাগরের ওপারে সাম্রাজ্য সূচনার প্রাথমিক স্তরে এবং অবসানের শুরুতে স্পেন অন্যান্য দেশের মতোই ক্রীতদাসদের প্রতি নির্দয় আচরণ করে (তাদের আমেরিক্যান উপনিবেশগুলিতে) ; তবে মাঝখানে একটা সময় যায় যখন রোমান চার্চ স্পেনের উপনিবেশগুলির শ্রমিক জনসংখ্যার অবস্থার উন্নতির জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়। ক্রীতদাসদের অপ্সুদীক্ষা দান করা হয়। তাদের তৈরি করা হয় মাস (Mass) উৎসবের জন্য, তাদের পরিবারে থাকতে দেয়া হয় এবং স্পেনের প্রথায় চার্চের সদস্য হিসেবে প্রবেশ লাভ করে। বৃটিশ উপনিবেশ গুলির জন্য চার্চ অব ইংল্যান্ড অনুরূপ কিছু করেনি। "কৃষিকর্মে ব্যবহৃত পশুর ক্ষেত্রে যে আচরণ করা হতো নিগ্রোদের ক্ষেত্রে হিসেব কষে তার অধিক কিছু করা হয়নি", বলেন জর্জ ক্যানিং। যেখানে স্পেনীয় যাজকরা মিশনারি উদ্যোগে জোর দিয়েছে, সেখানে বৃটিশ কৃষি খামার মালিকরা কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসের বিস্তারকে সুনজরে দেখতে পারেনি। পরিতাপের ব্যাপার এই যে, উক্ত মনোভাবের বিরুদ্ধে অ্যাংলিক্যান চার্চ কার্যকর প্রতিরোধ খাড়া করার কোনো চেষ্টাই গ্রহণ করেনি।

এই কুখ্যাত ব্যবসার ভয়াবহতা হ্রাসে প্রটেষ্টান্ট ধর্মের তুলনামূলক ব্যর্থতা ছিলো সর্বাধিক গুরুতর। কারণ সকল ইউরোপীয় দাস ব্যবসায়ীদের মধ্যে বৃটিশরা সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করে, ফলে দোষের দায়ভাগ বৃটিশদেরকেই বৃহদংশে গ্রহণ করতে হবে। হিসাব কষে দেখা গেছে যে, ১৬৮০ থেকে ১৭৮৬ সালের মধ্যে বৃটিশ উপনিবেশ গুলিতে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে যে ক্রীতদাসদের আমদানী করা হয় তাদের মোট সংখ্যা দুই মিলিয়নের অধিক না হয়ে যায় না। চ্যাথামের মতো রাজনীতিক এই ব্যবসাকে সমর্থন করেন জাতীয় শক্তির স্তম্ভ হিসেবে ; কীর্তিখ্যাত নাবিক নেলসন দাবি করতেন যে বাণিজ্যিক নৌবহরের জন্য দাস ব্যবসা হলো আবশ্যিক খুঁটি। লিভারপুল নগরীর সমৃদ্ধি, ব্রিস্টল নগরীর সাফল্যের বৃহদংশও নির্ভর করেছে দাস ব্যবসার উপর। অতএব দাস ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কায়েমি স্বার্থের মূলে আঘাত হানা ছিলো বিপজ্জনক ব্যাপার। উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চিনি উৎপাদনকারী উপনিবেশগুলির চেয়ে মূল্যবান উপনিবেশ অন্য কোথাও ছিলো না। আর যেহেতু এখানে চিনি উৎপাদনে শ্রমদান করেছে আফ্রিকার ক্রীতদাসরা তাই দাস ব্যবসা হ্রাস

বা হ্রাস করার কোনো প্রস্তাব পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করেছে। কারণ চিনি ব্যবসার উপরই মুনাফা মূলত নির্ভর করেছে। এই শক্তিশালী স্বার্থপুষ্ট চক্রের সঙ্গে যখন হাত মিলিয়েছে সেই সব ইংরেজরা যারা আমেরিকান মহাদেশে ক্রীতদাসদের শ্রমে উৎপাদিত কমলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো তখন দাস ব্যবসা নামক কুপ্রথা সমূলে উৎপাদন সুকঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় বৈকি। আরো উল্লেখ করতে হয় যে মূল দেশের সঙ্গে আমেরিকান উপনিবেশগুলির সম্পর্ক ছেদের আগে আমেরিকানদের বিরাট একটি অংশ দাস ব্যবসার অনুকূলে কাজ করেছে।

তবু, বৃহত্তম দাস ব্যবসায়ী তথা জঘন্যতম অপরাধী বৃটেন থেকেই একটা আন্দোলন উদ্ভব লাভ করে। এই আন্দোলন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ১৭৭২ সালে বৃটিশ দ্বীপগুলি থেকে দাস প্রথা বিলুপ্ত করে। ১৮০৬ সালে বিলুপ্ত করে দাস ব্যবসা। অতঃপর ১৮৩৩ সালে বৃটিশ ডমিনিয়নগুলি থেকে দাসত্ব উঠিয়ে দেয়া হয়। পরিশেষে বিশ্ব বিবেককে এতটা নাড়া দেয় যে এই কুপ্রথা সমূলে নির্মূল করার জন্য প্রায় সর্বজনীন ঐকমত্য গঠিত হয়। জেমস সমারসেটের মামলা ব্যাপারে (১৭৭২) লর্ড ম্যান্সফিল্ডের সুপ্রসিদ্ধ রায় লাভ করা যে সম্ভব হয় তার জন্য সুনাম করতে হয় গ্রানভিল শার্পের (লর্ড ম্যান্সফিল্ড রায় দেন যে দাসপ্রথা ইংল্যান্ডের কমন ল বা অলিখিত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়), যিনি ছিলেন একজন সিভিল সার্ভেন্ট, তার সম্পদ ও অবস্থান হয়তো খুব সুদৃঢ় ছিলো না, কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চ হৃদয়ের, তার চারিত্রিক গুণ ছিলো সুদৃঢ়। একবার লন্ডনের রাস্তায় নিগ্রো ক্রীতদাসের প্রতি নির্দয় আচরণ লক্ষ্য করে ক্রোধে জ্বলে ওঠেন, অতঃপর বৃটিশ দ্বীপগুলির দাসপ্রথার কালিমা মুছে ফেলার রায় আদায় করার আগে ক্ষান্ত হননি। অতঃপর দাসদের মুক্তির আন্দোলনে অনেকেই যোগ দেন যাদের নাম ইউরোপের সাধারণ ইতিহাসেও চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে : উইলিয়াম উইলবারফোর্স, জেমস ক্লার্কসন, জাকারি মেকলে[১] এবং জেমস স্টেফেন, আন্দোলনে প্রাথমিক শ্রমদানে এরাই এগিয়ে আসেন, দীর্ঘ বিশ বছর নিরলসভাবে আন্দোলন চালিয়ে যান, ফলে ক্রমে দাস ব্যবসা বন্ধ করতে সমর্থ হন। বিলোপের পক্ষপাতীদের সংসদীয় নেতা টমাস ফাউয়েল বাক্সটন কমন্স সভাকে দাসপ্রথা বিলোপের পক্ষে কাজ করতে রাজি করান ; কুহাম গোটা দেশে এই আন্দোলনের শিখা ছড়িয়ে দেন ; পুর্তগাল এবং ব্রাজিলের মধ্যে দাস ব্যবসা বন্ধ করেন পামারস্টোন ; আরো কাজ করেন মিশনারিগণ, সৈনিকরা, রাজনীতিকরা, ডেভিড লিভিংস্টোন, চার্লস গর্ডন, স্যার জন কার্ক এবং লর্ড লুগার্ড। এদের প্রচেষ্টার ফলে আফ্রিকা মহাদেশ আরব্য ক্রীতদাস শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা পায়। ইতিহাসকার লিকি বলেন, এবং সংগতকারণেই, দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ক্রুসেডকে "হয়তো জাতিসমূহের ইতিহাসের সবচেয়ে পুণ্যবান তিন কিংবা চার পৃষ্ঠা বলে গণ্য করা চলে।"

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে দাস প্রথা বিলুপ্তির আন্দোলন সফল হয় আমেরিকান উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করে সফল হয় বলে। এতে দাস প্রথার সমর্থক শক্তিশালী একটি দল বিতর্ক থেকে সরে দাঁড়ায়। আইরিশ ইউনিয়নও এই আন্দোলনে বিরাট সহায়ক

---

১ সুবিখ্যাত ইতিহাসকার লর্ড মেকলের পিতা। ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সর্বজনপ্রিয় হন। অনু

শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই ইউনিয়ন ইংরেজ কমন্স সভায় একদল ছোটো সংখ্যা হাসে, এদের কোনো বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিলো না, তারা স্বাধীনতার ও ন্যায়ের বিষয়ে মাথা দেয়ার মতো অবস্থানেও ছিলেন। যাহোক এদের আর্থিক সমর্থনের জন্যই আন্দোলন সফল হয় বলে মনে করা চলে না। গুটিকয় লোক, তদুপরি তারা রাজনীতিতে সামনের কাতারে স্থান পাবার যোগ্য নয়, একটা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসার কায়কর বিরোধিতা করতে মতো অবস্থানে ছিলেন না। উপরন্তু উক্ত ব্যবসা শুধু লাভজনক নয়, জাতীয় সমৃদ্ধি এবং নৌবাহিনীর সহায়ক হিসেবে গণ্য হয়। বস্তুত সংসদের সহায়তা ব্যতিরেকে আন্দোলন সফল হওয়ার কোনো সুযোগ ছিলে না। ইংল্যান্ডের কমন্স সভায় গোপন ঘটনা অনাবৃত করার সুযোগ ছিলো, লজ্জাজনক ঘটনাও লজ্জাকর হিসেবে দেখানো যেত। গোটা জাতিকে বোঝানো যেত যে দাস প্রথা নিছক ঘৃণ্য ব্যাপার, যাতে উক্ত প্রথার শক্তিশালী সমর্থন কাবু করা সম্ভব হয়। বিরোধীপক্ষীয়দের সংসদীয় নেতা উইলিয়ম উইলবারফোসকে যে 'সংসদের নাইটেঙ্গেল' বলা হতো সেটা তাৎপর্যহীন ছিলো না। সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংসদীয় বাগ্মী চার্লস জেমস ফক্স যে ১৮০৭ সালে দাস ব্যবসা বন্ধ করেন সেটাও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

সংসদে কথিত আলোড়নের নেপথ্যে গভীর ধর্মীয় এবং নৈতিক আবেগ থেকেও একটা আন্দোলনের সূচনা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে কোয়েকার ও মেথডিষ্ট সঙ্ঘ এই আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য সুখ্যাতি কুড়ায়। ছয় জনের যে দল প্রথম ১৭৮৩ সালে দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করে গোটা দেশে সেটা মূলত ছিলো কোয়েকারদের সঙ্ঘ। "ক্লাফাম সম্প্রদায়" (উইলবারফোর্সের দল এই নামেই পরিচিতি লাভ করে) জন ওয়েসলের উদাহরণে উজ্জীবিত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিগত ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ব্যাপক প্রচার করেন, তার ব্যক্তিগত জীবনের উদাহরণও অনেককে অনুপ্রাণিত করে। যদিও অন্যান্য প্রভাবও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে, যদিও অ্যাডাম স্মিথের অর্থনৈতিক সুপরামর্শ বিরাট অবদান রাখে, জেরেমি বেন্থাম তার যুক্তিশীল মনবিকতাবাদ দ্বারা সহায়তা করেন, তবে দাস প্রথা বিলুপ্তি সম্ভব করে তোলার পক্ষে প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে গভীর ধর্মানুরাগ এবং প্রগাঢ় নৈতিকতাবোধ। এতে অনেক তেজস্বী ইংরেজের বিবেক ধাক্কা যায়, তারা সাব্যস্ত করেন যে এই অন্যায়ের প্রতিকার না করে স্থির বসে থাকা ঠিক হবে না।

এই দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের প্রথম বিজয় লর্ড ম্যান্সফিল্ডের রায়ের তাৎক্ষণিক ফলাফল এই ছিলো যে মোটামুটি পনেরো হাজার নিগ্রোকে মুক্ত করে দেয়া হয়, এদের আমদানি করা হয়েছিলো ইংল্যান্ডে, এদের ক্রয় ও বিক্রয়ও করা হতো অবাধে। তাদের প্রভুরাই একাজটি করতেন। এই আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব ছিলো অধিকতর জটিল, কারণ দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে দীর্ঘতর সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। বার বার উইলবারফোর্স এবং পিটের সমন্বিত প্রভাব সত্ত্বেও, দাস ব্যবসা বিলোপের প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হতে যেত মন্ত্রিসভা, সংসদ এবং দেশের অভ্যন্তরের দাস মালিকদের বিরোধিতার জন্য। অতঃপর পিট মৃত্যুবরণ করেন, আর ফক্স, আইরিশ ভোটের সাহায্যে দাস ব্যবসা বিলোপ করেন, ল্যাংকেশায়ারে দাসদের শ্রমে উৎপাদিত তুলা আসা শুরু হওয়ার আগেই। চিনি উৎপাদনের সঙ্গে যাদের স্বার্থ জড়িত তাদের সমর্থন করারও সময় পাননি ল্যাংকেশায়ারপন্থী। ফলে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দুটি ব্রীতদাস প্রথার অনুকূলে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারে নি। এই আরও পরে হয় একেবারে সঠিক

সমবেত, আর ১৮১১ সালে অপর একটি আইন দ্বারা উক্ত আইন সত্যিকারভাবে কার্যকর করা হয়। এতে বলা হয় যে দাস প্রথা ডাকাতি কিংবা অগ্নিসংযোগের সমতুল্য অপরাধ, এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

এখন আমরা স্মরণ করি যে দাস ব্যবসার অবসান ঘটানো হয় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ লড়াই চলাকালে এবং নেলসন থেকে শুরু করে প্রতিটি নাবিক ঘোষণা দেন যে দাস ব্যবসার অবসান ঘটানে বৃটিশ নৌ বাহিনীর ধ্বংস ডেকে আনা হবে, তবু পিট ও ফক্স যে সহাসিকতার পরিচয় দিয়ে নৌযুদ্ধবিশারদদের পরামর্শ পুরোপুরি অশ্রদ্ধা করেন এবং সত্যিকার যুদ্ধ চলাকালে মানবতার প্রতি এই বিরাট অবমাননা মুছে ফেলার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে চাপ প্রয়োগ করেন, তা সত্যিই মহত্ত্বের লক্ষণযুক্ত। এই প্রথম কিংবা এই শেষ বার রেসমবিক নেতারা বিস্তৃততর বিজ্ঞতার সঙ্গে সেনাপতিদের আত্মবিশ্বাসী পরামর্শ খারিজ করে দিলেন না।

এবার ইংল্যান্ড নতুন ও চকচকে দাসপ্রথা বিলোপকারীর পরিচয়সহ ভিয়েনা সম্মেলনে (Congress of Vienna) যোগ দেয় এবং আটটি নেতৃস্থানীয় শক্তির তরফ থেকে ঘোষণা আদায় করে যে দাস ব্যবসার সার্বজনীন বিলোপ "তাদের মনোযোগের বিশেষ দাবিদার এবং এটা খৃষ্টধর্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ।" বৈদেশিক দাস ব্যবসার অবসান এবং বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে দাসপ্রথা বন্ধ করা এখন থেকে বৃটিশ কর্মপন্থার অন্যতম প্রধান নীতিতে পরিণত হয়, এই নীতি অনুসরণও করা হয় দৃঢ়তা ও সততার সঙ্গে, জাতির গুরুচিত্ত জনগণও এ ব্যাপারে আবেগাত্মক উৎসাহ প্রদর্শন করে। অবশেষে সংসদ যখন উপলব্ধি করে যে উপনিবেশগুলিকে দাস প্রথা বিলোপের জন্য রাজি করাতে পারবে না তখন তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আইন প্রণয়ন করে। ১৮৩৩ সালের আগস্ট মাসে একটি বিল পাস করা হয় সকল বৃটিশ ডমিনিয়নে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করার জন্য। অবশ্য ইতিমধ্যে বিশ মিলিয়ন পাউন্ড আলাদা করে রাখা হয় দাস মালিকদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদানের জন্য।

বৈদেশিক দাস ব্যবসা বন্ধ করার প্রচেষ্টা ছিলো কঠিনতর। মাত্র ১৮৩১ সালে ফ্রান্স, ১৮৩৫ সালে স্পেন দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে কার্যকর জরিমানার ব্যবস্থা করে, আর বৃটেন ইতিমধ্যেই, একাই, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রণীত আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এদিকে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র আপত্তি উত্থাপন করে যে বৃটিশ নৌযান তল্লাসির অধিকার ভোগ করতে পারবে না, এবং নিজস্ব নৌযান নজরদারির কোনো ব্যবস্থা রাখেনি, ফলে অধিকাংশ দাস ব্যবসায়ী শাস্তি এড়ানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা ব্যবহার শুরু করে। বিশেষত দাস ব্যবসা কিউবায় চলতে থাকে অবাধে, আব্রাহাম লিংকন কর্তৃক দাসদের মুক্তি সংক্রান্ত ডিক্রি জারি করা পর্যন্ত (১৮৬২)।

সামুদ্রিক তদারকির দরুন খুবই সাফল্য অর্জিত হয়। তবে প্রতিটি নৌশক্তিসম্পন্ন দেশ তদারকিতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করলে সাফল্যের পরিমাণ হতো অনেক বেশি। যাহোক, বৃটিশ নৌবাহিনীর দৃঢ়তার জন্যই পশ্চিম গোলার্ধের সঙ্গে পর্তুগিজদের দাস ব্যবসা শেষ হয়ে যায়।

তবু রয়ে গেল দুরূহ এবং প্রায় দুঃশাস্য দুটি সমস্যা : কিভাবে আরব্য শিকারিদলের হাত থেকে আফ্রিকানদের রক্ষা করা যায়। কিংবা ইউরোপ মধ্যদেশের ছত্রিশটি যে গার্হস্থ্য দাস ব্যবসা চলছে তাতে টানা যায় লাগাম। সমুদ্রে তদারকির ব্যবস্থা যতই চমৎকার বা

নিখুঁত হোক না কেন, চল্লিশের দশকে বৃটিশ নৌবাহিনীর ৬ষ্ঠ ভাগের এক ভাগ আফ্রিকায় তদারকিতে নিয়োগও করা হয়, তবু এত বড়ো অপরাধ দমনের ব্যবস্থায় অবশ্যই ঘাটতি ছিলো। স্কটিশ মিশনারী ডেভিড লিভিংস্টোন, যিনি প্রধানত পদব্রজে এবং স্বল্পসংখ্যক সঙ্গীসহ ১৮৫৩ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে আফ্রিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পরিভ্রমণ করেন, তিনি উদ্বোধন করেন নতুন যুগের, প্রদর্শন করেন নতুন পথ। লিভিংস্টোনের আফ্রিকা পরিভ্রমণের খবর আরবদের দাস ব্যবসার ভয়াবহতা সম্পর্কে বৃটিশ জনগণকে অবহিত করে, এই ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্র ছিলো জাঞ্জিবার। ফের বিলোপপন্থিদের কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। এর ফসল আমরা প্রথম পাই ১৮৭৩ সালে, যখন বৃটেন এবং জাঞ্জিবারের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। উক্ত চুক্তিবলে জাঞ্জিবারের দাসদের আড়ৎ বন্ধ করে দেয়া হয়। এই সময় থেকে একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে শুরু করে যে আফ্রিকা মহাদেশ যদি উন্মুক্ত করা না হয়, খামারজীবী এবং মিশনারিরা বসতি স্থাপন করতে এগিয়ে না আসে, এবং উক্ত মহাদেশকে শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণে আনা না হয়, তাহলে দাস প্রথার বিষ সম্পূর্ণ বিনাশ করা যাবে না। নেতৃস্থানীয় ইউরোপীয় শক্তিগুলি কর্তৃক শান্তিপূর্ণভাবে আফ্রিকা মহাদেশকে ভাগাভাগি করে নেয়া ছিলো সম্ভবত শতাব্দীর আশির ও নব্বই-র দশকের ইউরোপীয় রাষ্ট্রপরিচালনা ক্ষমতার সবচেয়ে উজ্জ্বল কৃতিত্ব। আর এর জন্যই উপরোক্ত কর্মপন্থা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। বৃটেনের পাশাপাশি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশও এই সময় থেকে ব্যাপক ও সুদৃঢ় প্রস্তুতি গ্রহণ করে, দাসপ্রথা দমনের জন্য আফ্রিকার সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যও তারা উদ্যোগী হয়। বৃটিশ সরকারের পরামর্শে বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড ১৮৮৯ সালে ব্রাসেলসে যে সম্মেলনের আহবান করেন এবং যাতে সতেরোটি দেশের প্রতিনিধিরা হাজির হয় তাতে একটি আইন গৃহীত হয় (অনুসমর্থন লাভ করে ১৮৯২ সালে)। এই আইন আফ্রিকার ক্রীতদাসদের কাছে ম্যাগনা কার্টা (মুক্তির সনদ) হিসেবে গণ্য। এই আইনের ধারাগুলির গুরুত্ব ছিলো সুদূর প্রসারী এবং প্রায় সম্পূর্ণ। অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ (পারস্য, জাঞ্জিবার এবং তুর্কি সাম্রাজ্য এর অন্তর্ভুক্ত) ধারাগুলি চলার জন্য অঙ্গীকার করে। তবু এই অমঙ্গলের রেশ থেকে যায়, ইউরোপীয়দের ক্রুসেড চলতে থাকে, এবার ক্রমবর্ধমান সাফল্যের প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা যায়।

দাসপ্রথা এবং দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম ছিলো মানবিক কর্মপন্থা বিস্তারের একটি অংশ। এই পন্থার ফলে উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন ধর্মীয় মিশনের, ব্যাপকতর সমাজ সেবার, উপরন্তু শিশু ও প্রাণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত হয় বিভিন্ন সমাজ। যে সব কারণে আধুনিক সমাজ পুরাকালীন সমাজ থেকে ভিন্ন ও বৈশিষ্টসূচক তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক। তাছাড়া যারা মানবতার অপরাধ, অসদাচরণ ও নির্বুদ্ধিতার জন্য বিষণ্ন বোধ করেন তাদের কাছে এটি মোটামুটি সান্ত্বনা এবং ভরসাস্বরূপ। আধুনিক ইউরোপের গণতান্ত্রিক সভ্যতার অনেক ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু যে মানবিকতা দ্বারা এটি অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা থেকে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীকে রক্ষা করে তা বিরূপ বিচার নিয়ন্ত্রণে অজুহাত হিসেবে কাজ করে, বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের চমৎকারিত্বকে চ্যালেঞ্জ জানায়, সম্পদের বৃদ্ধির ঝলকানিকে ম্লান করে দেয়॥

বলক্যান অঞ্চলে যুদ্ধ ও শান্তি

ড্রাইকাইজারবান্ড সত্ত্বেও বিসমার্ক আতংকিত। অস্ট্রীয় সমস্যা এবং দ্বৈত রাজতন্ত্র। নিখিল স্লাভীয় আন্দোলন। রুশ নীতিতে তার প্রভাব। দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কার কর্মসূচি। বুলগেরিয়া, বলক্যান বিদ্রোহ, ১৮৭৫। বুলগারীয় হত্যাকাণ্ড। রুশ আক্রমণ এবং স্যান স্টেফ্যানোর সন্ধি। লর্ড বিকন্সফিল্ড এবং কংগ্রেস অব বার্লিন, ১৮৭৮। ড্রাইকাইজারবান্ড ফাইল, গ্লাডস্টোন এবং ডিজরেলি।

ফ্রাংকো-প্রুসীয় যুদ্ধের অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে প্রায় প্রতিটি লক্ষণ মিলিয়ে অনুভূত হয় যে, জার্মান রাইখ স্থায়ী এবং গৌরবোজ্জ্বল। এর এক মাত্র গুরুতর শত্রু অধঃপতিত। সামনে কোনো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। একটি বিরাট জাতি বিজয়ে উৎফুল্ল হয়ে সম্রাটের কর্তৃত্বের প্রতি সমর্থন জানায় এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রতি স্বেচ্ছায় দাসভাবাপন্ন কায়দায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার দিক থেকে ভয়ের কিছু নেই। ঐ দুটি দেশের শাসকেরা জার্মান কাইজারের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব দ্বারা আন্তরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। ১৮৭২ সালে এই তিন সম্রাট বার্লিনে মিলিত হয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা ইউরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, বলক্যান সমস্যা ব্যাপারে সমঝোতার ভেতর কাজ করার কথা বলা হয়, সমাজতন্ত্রের নিকুচি এবং সংস্কার কর্ম হাতে নেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বোঝা যায়, নতুন জার্মান সাম্রাজ্যের অবস্থান শত্রুপক্ষের ধাবছোঁয়ার বাইরে। কোন শত্রু ড্রাইকাইজারবান্ডের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনে সাহস করবে? কিন্তু বিসমার্ক কিছুতেই সুস্থির বোধ করতে পারেন না, ফ্রান্স কখন প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয়। এখানে একটা মজার ব্যাপার উল্লেখ করতে হয়, দশক পুরো হবার আগেই সার্বিয়াতে গেমবেটা ঘোষণা দেন যে রাইখের একটা গোড়ালি অখিলেসের, যা তাকে ধুলায় গড়াগড়ি খেতে বাধ্য করবে। অনেক আগেই স্লাভদের মধ্যে জাতিগত তোলপাড়ে মনে হয় তা টিউটনিক কর্তৃত্বের নীতির প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে এবং ইউরোপের রক্ষণশীল ভিত্তিতে মারাত্মক আঘাত হানবে। অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সব সময়ই জটিল থাকে জাতিগত বিরোধের কারণে। বোহেমিয়ান এবং হাঙ্গেরিয়ান বিদ্রোহ যথাক্রমে ১৮৪৮ এবং ১৮৪৯ সালে দমন করার পর থেকে পরিস্থিতির উত্থান-পতন ঘটে বেশ কয়েকবার। প্রথমে পুরো একটি দশকে কঠোর স্বেচ্ছাচারী কেন্দ্রীকরণ লক্ষ্য করা যায়, যেখানে জার্মানরা সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করে। হাঙ্গেরির প্রশাসনের দায়িত্ব জার্মানরা পালন করে, হাঙ্গেরির সেনা বাহিনীর হাল তাদের হাতেই ধরা থাকে। দেশের বুদ্ধিজীবীমহল এবং শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় ক্যাথলিক চার্চের অভিভাবকত্বে (১৮৫৫ সালের ১৩ আগস্ট পোপের সঙ্গে মতৈক্যের [Concordat] শর্তাধীনে)। যাহোক, এটা মনে করলে ভুল করা হবে যে স্লাভ এবং ম্যাগিয়ার জাতিগোষ্ঠীগুলি স্থায়ীভাবে জার্মান জাতির আধিপত্য মেনে নেবে

হিতকর ঐশ্বরিক আজ্ঞা হিসেবে। একটি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা, অ্যালেকজান্ডার বাখ কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং শাসিত, যিনি ইহুদি বংশোদ্ভূত চতুর রাজনীতিক হলেও সদিচ্ছাপ্রণোদিত ছিলেন, ছিলেন দেশের শ্রীবৃদ্ধির মানসিকতাসম্পন্ন, তবু তাকে কয়েকটি জাতি অসহনীয় দুঃস্বপ্ন হিসেবে দেখেছে। এই জাতি গোষ্ঠীগুলির কাছে জার্মান ঐতিহ্য, জার্মান জীবনযাপন পদ্ধতি, জার্মানদের উর্ধ্বারোহণের শক্তিকে নিতান্ত অরুচিকর গণ্য হতো। দরকার ছিলো একটা বড়ো ধরনের বিপর্যয়, যাতে বোঝা যায় জনগণের কি ঠুনকো আস্থার উপর সরকারের ভিত গঠিত, সরকারের প্রতি আনুগত্যের অভাব কতোটা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। অস্ট্রিয়া যখন ইতালীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তখন সাম্রাজ্যের গোটা কাঠামো প্রচণ্ড কাঁপুনি অনুভব করে, যেন সাম্রাজ্যের ভিত গড়া হয়েছে চোরাবালিতে। মেজেন্টা এবং সলফেরিনোতে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে ম্যাগিয়ার এবং চেকরা খোলাখুলি আনন্দ প্রকাশ করে। যুদ্ধ ঋণ ছিলো বিপর্যয়কর ব্যর্থতা। অনুভব করা হয় যে জাতিগত অসন্তোষের জোয়ার ঠেকানোর জন্য অবশ্যই কিছু করতে হবে। এবং তা করতে হবে অতিরিক্ত বিলম্ব হওয়ার আগেই, নচেৎ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা যাবে না। অতঃপর শাসনতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা হয় (১৮৬০-৬৭)। সূচিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বদৌলতে শুধু এটুকুই পরিষ্কার হয় যে, অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সংঘের মধ্যে একত্রীকরণের সমস্যা কতোটা দুরূহ।

বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে ফেডারেলতন্ত্র গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সংসদীয় কেন্দ্রীকরণের উদ্যোগও বড়ো একটা সাফল্য অর্জন করেনি। ম্যাগিয়ারগণ ভিয়েনার পার্লামেন্টে যোগ দিতে রাজি নন, যেহেতু তাদের জার্মান ভোটের মাধ্যমে পরাস্ত করার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। অনুরূপভাবে আলস্টারম্যানরা ডাবলিনের জাতীয়তাবাদী পার্লামেন্টে যোগ দিতে রাজি হন না। অবশেষে, ১৮৬৫ সালে ফ্রান্সিস জোসেফ পেস্ট সফর করেন এবং ম্যাগিয়ার ও ক্রোটদের আহ্বান জানান তাদের প্রস্তাবগুলি উপস্থাপনের জন্য।

এই সংকটের সময় হাঙ্গেরি ডিকের মধ্যে একজন দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনেতা খুঁজে পায়, যার ছিলো অধিনায়কসুলভ গুণাবলি, তার দৃষ্টিভঙ্গিও ছিলো নমনীয়। তিনি মনে করতেন, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকলে তার দেশ অনেক লাভবান হতে পারে, এ জন্য তিনি বিচ্ছিন্নতাকামীদের তীব্র বিরোধিতা করতেন। কিন্তু ম্যাগিয়ার জাতির জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আত্মসম্ভ্রম আদায়ের ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প। অস্বীকার করা যায় না যে প্রুসিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার যুদ্ধের ফলে তার কাজটা অনেক হালকা হয়ে যায়। ভিয়েনায় নিদারুণ হতাশা পেস্টের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। তবে রাষ্ট্রনেতাদের দায়িত্ব হলো সুযোগের উদ্ভূত ন্যাকড়া লুফে নেয়া। এখানে ডিকের সুনাম করে বলা যায় যে, স্যাডোয়ায় অস্ট্রীয়দের পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে তিনি অস্ট্রীয় চ্যান্সেলর বিউস্টের সঙ্গে ১৮৬৭ সালে দ্বৈতরাজতন্ত্র গঠন করেন।

এই অদ্ভুৎ শাসনতন্ত্র অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয় এজন্য যে, সাম্রাজ্যের দুটি সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি গোষ্ঠী, জার্মান ও ম্যাগিয়ারদের, সমান ক্ষমতা ভোগ করতে দেয়া হয়। অস্ট্রিয়ার সতেরোটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত সিস্লিথানিয়ায় জার্মানরা হয় প্রাধান্যশীল, ট্রান্সলিথানিয়ায় (হাঙ্গেরি, ক্রোয়েশিয়া, স্লাভোনিয়া এবং আরো কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত) প্রাধান্য লাভ করে ম্যাগিয়ারগণ। "তুমি তোমার রাজ্যের বর্বরদের উপর কঠোর থাকো", বলেন

হাঙ্গেরির অভ্যাসি জার্মান বিউস্টকে, "আমরা আমাদের গুলিকে বশে রাখবো।" সাম্রাজ্যের দুটি অংশে দু'টি পার্লামেন্টের ব্যবস্থা করা হয়, স্থানীয় সভারও ব্যবস্থা থাকে, উভয় অংশের নিজস্ব সরকারি ভাষা থাকবে। সাম্রাজ্যের জন্য সমর মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, বিদেশ মন্ত্রী, ইত্যাদি থাকবে, তবে একক কোনো পার্লামেন্ট থাকবে না। দশ বছরের জন্য বাণিজ্য চুক্তির মতো অভিন্ন স্বার্থের ব্যাপারে অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরি উভয় দেশ থেকে ষাট জনের প্রতিনিধি দল আলোচনার জন্য মিলিত হবে, একবার ভিয়েনায় হলে পরের বার পেস্টে। আলোচনা এবং আদান-প্রদান ছাড়াও, অবিশ্বাসের পরিস্থিতি বিরাজিত বিধায়, উভয় পক্ষের মধ্যে মতামত বিনিময় হবে লিখিত দলিলের মাধ্যমে। উপরন্তু দুটি রাজ্যের সার্বভৌম স্বাধীনতা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করার জন্য দু'টি দেশের জনগণ বা সরকারের মধ্যে কোনো বন্দোবস্ত হবে না, বরং উভয় দেশ সার্বভৌম হ্যাবসবার্গ রাজবংশের সঙ্গে পৃথকভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে।

এইভাবে অনায়াস সমঝোতা স্থাপনের পর দুটি স্ব-শাসিত শক্তি পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ কঠিন সময় অতিক্রম করে, তারা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টি ফেরায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল অভিমুখে, কারণ প্রুসিয়ার কামানগুলি তাদের জার্মানি এবং ভেনিসিয়া থেকে বিতাড়িত করে, তারা গভীর থেকে গভীরতরভাবে নিমজ্জিত হয় বলক্যান আবর্তে। এদিকে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রমাণস্বরূপ পশ্চিম ইউরোপীয় সংসদীয় সরকার, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সেকুলার শিক্ষার নীতি গ্রহণ করে। এসব এখন পশ্চিম ইউরোপে ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। প্রুসীয়দের বিজয়ের ফলে কি বিশাল পরিবর্তন সাধিত হলো। ১৮৬৭ সালে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয়, এবং এক বছর পর শিক্ষাক্ষেত্রে গির্জার একচেটিয়া অধিকার রহিত করে।

অবশ্য একটা গুরুতর সমস্যা অনিষ্পন্ন থেকে যায়। দুটি প্রাধান্যশীল জাতিগোষ্ঠীর গোড়ালির নিচে স্লাভদের নেপথ্য জগৎ রয়ে গেল। বোহেমিয়ার চেক, স্লোভাক, ক্রোট এবং হাঙ্গেরির সার্বজাতিগোষ্ঠীরা উপর্যুক্ত পরিপাটি ব্যবস্থা সহজে মেনে নিতে পারে না। অভিনন্দন জানানো তো দূরের কথা। উপরন্তু অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের খুটির একটি গর্বিত ম্যাগিয়ার জাতির অভিজাত শ্রেণীভুক্ত, অপর খুটি জার্মনরাও এসেছে ডিউক, ব্যারন থেকে। সত্য যে, দ্বৈত রাজতন্ত্রের স্লাভ জাতিগোষ্ঠী ভৌগোলিক কারণে বিভক্ত, তাদের ভাষা ও প্রথাও বিভিন্ন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিভেদও রয়েছে। তাছাড়া চেক জাতিগোষ্ঠী স্লোভাক থেকে পৃথক, স্লোভাকরা পৃথক সর্ব জাতি গোষ্ঠী থেকে, আবার এরা সবাই ক্রোট ও স্লোভেনদের থেকে পৃথক। তারা যে এক ও অভিন্ন বৃহৎ স্লাভ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এ ব্যাপারে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অচেতন ছিলো। এই অবস্থা ক্রমান্বয়ে দূর হচ্ছে। নিখিল স্লাভনিক আন্দোলন এই রুক্ষ্ম এবং পশ্চাদপদ জাতি গোষ্ঠীগুলির স্বপ্ন-কল্পনা উসকে দেয়। তারা উপলব্ধি করে যে যদিও তারা দীর্ঘকাল ইতিহাসের চাকায় পিষ্ট হয়েছে, এদের কোনো শাখাকে পদদলিত করেছে তুর্কিরা, কোনো শাখাকে ম্যাগিয়াররা, তবু তারা একটি মহাশক্তিধর সমাজের সদস্য। এই সমাজ আর্কটিক ওসেন থেকে ইডক্সিন, বাল্টিক অঞ্চল থেকে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই আন্দোলন শুরু করেন স্লোভাক কবি কোলার (Kollar) ১৮২৪ সালে, এবং আন্দোলনের জোয়ার অবিলম্বে প্লাবিত করে বোহেমিয়া। এখানে ভাষা বিজ্ঞানী এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে সাড়া পড়ে যায়। প্রথমে স্লাভ সংস্কৃতির অভিন্ন

ঐতিহ্যবশত এবং জগৎজোড়া স্লাভ জাতির চিন্তা-ভাবনার ভাণ্ডার অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা কাজ করে, যাতে মামুলি কৃষকও (যেহেতু সে বিদেশী প্রভুর ভূমি কর্ষণ করে) বোধ করতে পারে যে তারা বৃহৎ ভ্রাতৃসংঘের সদস্য, ফলে সমগ্র সভ্যতার জন্য অবদান রাখতে পারে। কিন্তু অতঃপর যেমন প্রায় ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে, কবি ও পণ্ডিতদের দ্বারা প্রচারিত ভাবধারাসমূহ বিতর্কিত কর্মপন্থায় পরিণত হয়। নিখিল প্যান-স্লাভবাদ ১৮৪৮ সালের বোহেমীয় বিপ্লবে একটা ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বোহেমী মঞ্চ ছিলো অতিক্ষুদ্র; অবিলম্বে বোহেমী বিপ্লবের অবসান ঘটে এবং ঘটানো হয়। অতঃপর একটি বৃহত্তর মঞ্চ এবং বৃহত্তর আন্দোলনের অনুকূলে কাজ করে। মোটামুটি বিশ বছর পর, তখন রুশ দেশের জার হলেন দ্বিতীয় আলেকজান্ডার, মস্কোর কর্মপন্থায় নিখিল স্লাভ আন্দোলনের ধারণা অনুপ্রবেশ করে। এখন থেকে এই জাতিগত দর্শন একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বলক্যান অঞ্চলে তুর্কিদের চ্যালেঞ্জ জানায়। তাছাড়া দ্বৈত রাজতন্ত্রের সীমান্তগুলিতে বসবাসকারী বিভিন্ন মাত্রায় দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ কয়েক মিলিয়ন স্লাভ জাতিগোষ্ঠী গুলির মধ্যে অস্থির নড়াচড়া শুরু হয়ে যায়।

মিস ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল যেমন ভিক্টোরীয় যুগের নারী সমাজের মুক্তির জন্য নতুন নতুন দিক আবিষ্কার করেন, জার আলেকজান্ডার ক্রিমিয়া যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সমানভাবে গুটিকয় প্রবুদ্ধ অভিজাত ব্যক্তি এবং সরকারি অফিসারদের সহায়তায় অভ্যন্তরীণ সংস্কার কর্মে হাত দেন। মাত্র এক দশক সময়কালের মধ্যে তিনি দায়বদ্ধ কৃষকদের (serfs) মুক্ত করে দেন, বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ঢেলে সাজান, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সূচনা করেন, সেন্ট পিটার্সবুর্গ এবং মস্কোয় সংবাদপাপত্রের স্বাধীনতা অনুমোদন করেন এবং দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ব্যাপক বিদ্যায়তিক (academic) সুবিধা প্রদান করেন। দীর্ঘকাল পর সংস্কারপন্থি জার এবং তার সহযোগিরা যে বিরাট কাজগুলি সম্পাদন করেন তাকে একটা গৌরবময় যুগের অসাধারণ কৃতিত্ব বলে আখ্যায়িত করা হয়। আচার ও প্রথার কুয়াসা পরিষ্কার করার জন্য সত্যিই অনেক কিছু করা হয়, সুস্থতর সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপনের জন্যও যে প্রচেষ্টা নেয়া হয় তাতে আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র অভাব ছিলো না। কিন্তু রাশিয়া এমন একটি দেশ যেখানে বড় বড় মহৎ পরিকল্পনা অতি সহজে রচনা করা হয়, কিন্তু যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করার ঘটনা ঘটে খুবই কম। অনেক বড়ো বড়ো কাজ নেয়া হয়, তবে কাজগুলি সম্পাদনের জন্য যাদের নির্বাচিত করা হয় তাদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। ফলে যেটুকু সাফল্য অর্জন করা হয় তা প্রত্যাশার ধারেকাছেও যেতে পারেনি। সরকারি দপ্তর গুলিতে আস্থা ও দক্ষতার অভাব ছিলো, কর্মচারী ও কর্মকর্তারা ছিলো কলুষিত চরিত্রের, রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে বিরূপ মনোভাব সর্বত্র লক্ষ্য করা গেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদার মনোভাবাপন্ন সদস্যরা জারের সংস্কারকর্মে বিন্দুমাত্র সহায়তা করেনি। কারণ তারা বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করতেন যে জার কোনো ভালো কাজ করতে পারেন না। ফলে জার কোনো মহৎ কাজে হাত দিলেও তারা বিরোধিতার মনোভাব থেকে এক চুল নড়তেন না।

দ্বিতীয় আলেজান্ডারের রাশিয়ার উপর্যুক্ত চিত্র অবশ্য সম্পূর্ণ নয়। জারের সংস্কার কর্মসূচি চোখে দেখা যেত মাত্র। দেশে তিনি কঠোর নির্যাতন এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন, বিশেষ করে ১৮৬৩ সালে পোলদের বিদ্রোহ এবং নিহিলিস্টদের দমনে নির্যাতনের

মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। তার শাসনামলে কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তি পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেতেন না, আকস্মিকভাবে গৃহস্থের বাড়িতে হানা দিয়ে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো, এবং প্রায়ই প্রেরণ করা হতো সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে, বিপরীতক্রমে, জার থেকে শুরু করে সরকারি প্রতিটি ব্যক্তি ছিলেন ধারালো অস্ত্র কিংবা বোমার লক্ষ্য। এই সময়ে রাশিয়ার তরুণ বুদ্ধিজীবীরা সংস্কার কর্মের ধীরগতিতে ধৈর্যহীন হয়ে পড়েন, এদিকে নতুন ভৌত বিজ্ঞানের নেশায় উন্মাতাল। তারা লাগামহীন ভাবে গোটা কাঠামোকে আক্রমণ শুরু করেন, অথচ বিকল্প কোনো পরিকল্পনা প্রস্তাবিত করতে ব্যর্থ হন, ফলে নিহিলিস্ট বা সার্বিক ধ্বংসকামী হিসেবে অপযশ কুড়ান। তুর্গেনিফের ফাদার্স অ্যান্ড সান্স এবং টলস্টয়ের আনা কারেনিনাতে যে সময়ের চিত্র অংকন করা হয়েছে তখন পুরাতন সমাজের সকল মূল্যবোধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, পারিবারিক সংহতিও ধ্বংসের সম্মুখীন, কারণ তরুণদের অবাধ্য নিরীশ্বরবাদিতা প্রথাগত ধার্মিকতা অস্বীকার করে বসে। এই সব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যে জারের সরকার দম নেয়ার সময় পায় না। জার সরকার দেশের ভেতর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানোর সঙ্গে-সঙ্গে তিনটি কাজ হাতে নেয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং একত্রীকরণ, মধ্য এশিয়া বিজয়, এবং তুর্কি অধীনতার নাগপাশ থেকে বলক্যান অঞ্চলের স্লাভ জাতিগোষ্ঠীগুলিকে মুক্ত করা। এই পন্থাগুলির প্রথমটি ছিলো তুচ্ছাতিতুচ্ছ। দ্বিতীয়টিতে বিজয় অর্জিত হয় (কারণ ১৮৬৮ সালে রাশিয়া সমরখন্দ জয় করে), কিন্তু তৃতীয়টি যেটি ছিলো নিখিল স্লাভ আন্দোলনের মূলনীতি, বিরাট বিপর্যয় ডেকে আনে, রাশিয়া, ইউরোপ এবং গোটা পৃথিবীর জন্য।

নিখিল স্লাভ আন্দোলন অবশ্যই একটা নিখুঁত আন্দোলন হতো যদি বলক্যান এলাকার স্লাভরা একটি বৃহৎ পরিবারের মতো একতাবদ্ধ হতেন, কিংবা অন্যান্য শক্তি ইউরোপীয় তুরস্কে জার সরকারের আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকার না করতেন। এর একটি শর্তও বাস্তবায়িত হয়নি। যখন দীর্ঘ তুর্কি শাসন ভেঙে পড়ে তখন এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে বুলগার এবং স্লাভদের মধ্যে যে প্রচণ্ড শত্রুতা আর চেয়ে বড়ো ঘৃণার ব্যাপার বলক্যান অঞ্চলে নেই। অতঃপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে একটা ঘটনা ঘটে। জানা যায় যে, তুরস্কের যে জাতিকে রাশিয়া প্রধান স্লাব জাতি হিসেবে নির্বাচন করে, এবং যাদের পক্ষে বছরের পর বছর প্রচারণা চালায়, তাদেরকে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্লাভরা ভিন্ জাতীয় এবং শত্রু হিসেবে গণ্য করে। তাছাড়া রুশ বাহিনীর সাহায্যে শক্তিশালী বুলগেরিয়া রাষ্ট্র কায়েম করার ফল দাঁড়ায় উল্টো। এতে নিখিল স্লাভ আন্দোলনকারীরা যেমন খুশি হয়নি, তেমনি রুশ প্রভাব বলয় এতোটুকু বৃদ্ধি পায় নি। নবগঠিত বুলগেরিয়া রাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করে, এদিকে সার্বরা এই ঘটনায় ঈর্ষা পোষণ করে এবং ব্যাপারটা তাদের কাছে আপত্তি জনক বলে বোধ হয়। যাহোক, এসব বিষয়ে সত্তরের দশকের শেষের দিকে কোনো সন্দেহের উদ্রেক করেনি। কিন্তু এই সময়ে রাশিয়া নিকট প্রাচ্যে প্রায় মিত্রহীন হয়ে পড়ে এবং দুর্ভেদ্য ড্রাইকাজারবান্ডের প্রাথমিক দৃঢ়তা বিনষ্ট হয়। তিন সম্রাটের সুদৃঢ় বন্ধনের ফলেই ইউরোপীয় শক্তি কাঠামোয় এ পর্যন্ত কোনো প্রকার অস্থিরতা দেখা দেয় নি।

১৮৭৫ সালে তুর্কি অপশাসনের বিরুদ্ধে বসনিয়া এবং হার্জিগোভিনায় বিদ্রোহ শুরু হয়। কৃষকরা সরাসরি বিদ্রোহের সূচনা করে চরম দুর্দশা এবং নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে। এই বিদ্রোহের বায়ু প্রবল বেগে মন্টেনেগ্রা, সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়ায় আছড়ে পড়ে। বলক্যান

অঞ্চলে স্লাভ জাতি গোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ এত বড় আকারে ইতিপূর্বে ঘটেনি তাদের প্রতি অন্যায় এতটা বড় আকারে ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপিতও হয়নি। কিন্তু তুর্কিরা অনেক বেশি শক্তিশালী। তাদের আক্রমণের সামনে সার্বিয়া এবং মন্টেনেগ্রোর বাহিনী দাঁড়াতেই পারে নি। বুলগেরিয়ার বারো হাজার খ্রিষ্টান অনিয়মিত বাহিনীর হাতে খুন হয় (মে, ১৮৭৬), এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বুলগেরীয় জাতির বিদ্রোহী কৃষকদের উপর তুর্কিদের কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলো।

বলক্যান এলাকায় স্লাভদের উত্থানের অবসান রাশিয়া মেনে নিতে পারে না। রাশিয়া যুদ্ধের ঘোষণা দেয় (এপ্রিল, ১৮৭৭), এশিয়া এবং ইউরোপে তুর্কিদের উপর একযোগে আক্রমণ চালায়, এবং করস ও প্লেভনায় সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হবার পর সবত্র জয়ী হয়। ১৮৭৮ সালের ৩মার্চ রুশ বাহিনী তাদের রাজধানীর অনতি দূরে শিবির স্থাপন করে, স্যান স্টেফানোয় তুর্কিরা একটি সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়, উক্ত সন্ধির শর্তানুসারে বিশাল স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্র গঠিত হয়, এই রাষ্ট্র প্রশাসনে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবে রাশিয়া, তাছাড়া রুশ সৈনিকরা উক্ত রাষ্ট্রে শিবির স্থাপন করবে দুই বৎসরের জন্য।

এদিকে ইংল্যান্ডে টোরি দলের মধ্যে ক্রিমিয়া যুদ্ধের সাহসী প্রেরণা এখনো জীবিত। এখানে রুশদের বিজয়ের খবর অত্যন্ত ক্রোধ এবং আতংকের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। তুরস্ক রুশদেশের উপগ্রহে পরিণত হলে প্রাচ্যে বৃটেনের সামগ্রিক অবস্থান বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। রাণী, মেট্রোপলিট্যান প্রেস এবং 'উচ্চতর দশ হাজার' যুদ্ধংদেহী মনোভাব গ্রহণ করে। এসময় একটি সাধারণ ছড়া বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে মিউজিক হলগুলিতে

'We don't want to fight, but by jingo if we do
we have got the ships, we've got the men,
We've got the/money too!'

১৮৭৮ সালের বসন্ত কালে ইউরোপে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা আগে কখনো লক্ষ্য করা যায় নি। লর্ড বিকন্সফিল্ড পার্লামেন্টে আসেন ছয় মিলিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে, রণতরী সমূহকে দার্দানেলেস অতিক্রম করার জন্য আদেশ দেয়া হয়, রিজার্ভ সৈনিকদের ডাকা হয়, এবং তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রিসভা থেকে ডার্বি এবং কার্নারভনকে বাদ দেয়া হয়, কারণ তারা শান্তির পক্ষে কথা বলেন। এদিকে লর্ড সলসবেরি, যিনি মাত্র কয়েক মাস আগেও উপলব্ধি করেছেন যে রাশিয়ার কোনো নৌবাহিনী নেই, নেই নৌসেনা, তার সিভিল সার্ভিস দুর্নীতিগ্রস্ত, অতএব তারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বৃটেনের অবস্থানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এখন তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত। অন্যথায় তার সরকারকে স্যান স্টেফানো সন্ধির সকল দলিলপত্র সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলির পরীক্ষার জন্য জমা দিতে হবে। এবং সন্ধির শর্তাবলি পরিবর্তনের জন্য সম্মত হতে হবে।

এই সময় ইউরোপে যে শান্তিভঙ্গ হয়নি তার জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন বিসমার্ক, সলসবেরির অসাধারণ দক্ষতাও অবদান রাখে। তাছাড়া অস্ট্রিয়া বৃটেনের পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য প্রস্তুত থাকে।

রাশিয়া উপলব্ধি করে যে সে মিত্রহীন হয়ে পড়ছে। অতএব তাকে বোঝানো যায় সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলির কাছে সন্ধির কাগজপত্র জমা দেয়ার জন্য। অন্যান্য প্রস্তাবও সে মেনে নিতে সম্মত হয় মিত্রহীন হবার ভয়ে। অন্যথায় সে দাবিগুলিকে জাতীয় গর্বের জন্য আঘাতস্বরূপ

গণ্য করতো। বার্লিন সম্মেলনে (জুন ১৮৭৮) নিকট প্রাচ্য সংক্রান্ত গোটা প্রশ্নের যে মীমাংসা হয় তাতে বৃটেনের স্বার্থ রক্ষা প্রায়, অস্ট্রিয়ার প্রভাব বলয় হয় সম্প্রসারিত, উপরন্তু জার সরকারের নিখিল স্লাভপন্থি উচ্চাভিলাষ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়। অপরদিকে এগারো মিলিয়ন খ্রিষ্টানদের তুর্কি অধীতা থেকে মুক্ত করা হয়, বসনিয়া এবং হার্জিগোভিনা প্রশাসনের দায়িত্ব লাভ করে অস্ট্রিয়া। যে বিশাল ও বেঢপ বুলগেরীয় রাষ্ট্র স্যান স্টেফ্যানো সন্ধির অধীনে সৃষ্টি হয়, এবং যা রুশ প্রচেষ্টার প্রধান ফসল এবং বৃটিশদের জন্য মূল উদ্বেগের কারণ, তাকে খাটো করে সহনশীল আকার প্রদান করা হয়। রাশিয়া এতো সব ক্ষতি স্বীকার করে বলে তাকে উপহার হিসেবে প্রদান করা হয় বেসারাবিয়া, এসিয়া মহাদেশে তার বিজিত অঞ্চল গুলিকেও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, পশ্চিমী শক্তিগুলি অত্র এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হবার মতো অবস্থানে ছিলো না।

রাশিয়ার প্রত্যাশা ছিলো বিরাট। বাস্তবে, বলতে গেলে, সে কিছুই পেল না। শুধু তাই নয়। অতঃপর যখন জানা গেল যে, তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড সাইপ্রাসের দখল লাভ করেছে এই অজুহাতে যে এখানে বৃটিশদের স্থায়ী সামরিক শিবির থাকলে তুর্কি সাম্রাজ্যের এসীয় ভূখণ্ড প্রতিরক্ষায় অধিক সুবিধা হবে, তখন রুশদের মনে শুধু একটা ভাবনাই উঁকি দিলো, সমগ্র ঘটনায় যে আদান-প্রদান হয় তাতে তাদের চূড়ান্ত কূটনৈতিক পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা গোপন করে কিংবা ছদ্মবেশ অবলম্বন করে, কিংবা যে ভাবেই হোক বিকন্সফিল্ড এবং সলসবেরি গর্টস্যাকফের উপর বিজয়ী হয়েছেন। তাদের হাতে বলক্যান অঞ্চলের যে মানচিত্র তুলে দেয়া হয় তা রুশ নয়, অ্যাংলো-অস্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে অংকিত হয়। তুর্কদের উপর তারা কর্তৃত্ব নিশ্চিত করেছে, এবং সমগ্র কূটনৈতিক প্রক্রিয়া চলাকালে ভিয়েনা এবং বার্লিনের উৎসাহ লাভ করে। "মর্যাদার সঙ্গে শান্তি" নিয়ে দু'জন বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞ যখন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন তখন লন্ডন নগরীতে তাদের বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। এদিকে জার শুধু ভেবে দেখেন যে তার দুই বন্ধু অস্ট্রিয়া এবং জার্মানির সম্রাটরা যদি পূর্ণ কূটনৈতিক সমর্থন প্রদান করতেন তাহলে কি ভিন্ন ফলই না পাওয়া যেত। এই সময় থেকে ড্রাইকাইজারবান্ডের বন্ধন নড়বড়ে হতে শুরু করে। বস্তুত তিন সম্রাটের বন্ধন টুটে যায় এই বলক্যান সংকটের ফলে। সমস্ত ঘটনার মোট ফল এই দাঁড়ায় যে জারশাসিত রাশিয়া ফরাসি প্রজাতন্ত্রের আলিঙ্গনে ধরা দিতে বাধ্য হয়। তুর্কি অপশাসনের বিরুদ্ধে স্লাভদের বিদ্রোহের এটিই ছিলো সর্বাধিক সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া।

ইত্যবসরে ইংল্যান্ডে একটি ঘটনার দরুন বিরাট তোলপাড় শুরু হয়। এটি ছিলো একটি তীব্র এবং স্মরণীয় অভ্যন্তরীণ বিরোধ। লিবারাল দলের ঐতিহ্য এবং গর্ব এই যে তারা সারা জগতের স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী। লিবারালরা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালিকে এবং জার্মানির বিরুদ্ধে ডেনমার্ককে সমর্থন করে। তাছাড়া ফ্রাংকো-প্রুসীয় যুদ্ধের গোড়ার দিকে বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখার সন্ধির পক্ষে দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। যে দল এ ধরনের ঐতিহ্য অনুসরণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তার কাছে ইউরোপীয় সরকারগুলির মধ্যে তুর্কি সরকার যে সবচেয়ে ঘৃণ্য বস্তু বলে বিবেচিত হবে তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ করা চলে না। তুর্কি সাম্রাজ্যের খ্রিষ্টান অধিবাসীরা নির্যাতন প্রদানের শিকার। বুলগেরিয়ায় যে অকথ্য নির্যাতন চলে তার খবর পাওয়া মাত্র লিবারালদের শ্রেষ্ঠ বেতা অবসর জীবনে ইতি টেনে টোরি সরকারের তুর্কি নীতির বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা শুরু

করেন। গ্লাডস্টোন অনতিবিলম্বে সত্তর বছর বয়সে পা রাখবেন। তাব মনে পড়ে ক্যানিং-এর নাম। তিনি দেশের সেবা করেছেন ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে। প্রথম 'সংশোধিত' সংসদেব তিনি সদস্য ছিলেন। তিনটি সাধারণ নির্বাচনে লড়াই কবার অভিজ্ঞতা তার বয়েছে। পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি একটি সুবিখ্যাত বাজেট প্রণয়ন করেন। ষাট বৎসব বয়সে তিনি প্রশাসনের প্রধান হন (১৮৬৮–৭৪), সার্বজনীন শিক্ষা এবং গোপনে ভোট প্রদানের প্রথা চালু করেন, ধর্মীয় পরীক্ষার বন্ধন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে অব্যাহতি দেন, বাহিনীতে সংস্কাব সূচনা করেন। সর্বোপরি, আয়ারল্যান্ডে ইংরেজ ও প্রটেস্ট্যান্টদের অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানেন। একজন অনুরাগী অ্যাংলিক্যান হওয়া সত্ত্বেও তিনি আয়ারল্যান্ডের অ্যাংলিকান চার্চ উৎখাতে দ্বিধা বোধ করেন নি। নিজে বিরাট জমিদার হওয়া সত্ত্বেও, স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে আইরিশ ল্যান্ড অ্যাক্ট কার্যকর করেন ভগ্নিপ্রতিম দ্বীপের দরিদ্রে পরিণত এবং তিক্ত কৃষি গণতন্ত্রের অনুকূলে। দীর্ঘকাল নজিরবিহীন সংসদীয় জীবন কাটানোর পর হাউয়ার্ডেনের বনাঞ্চলে অবসর জীবন শুরু করেন। খেলা করেন বৃক্ষের শিকড় নিয়ে, বার বার পাঠ করেন হোমার, তাছাড়া প্রিয় বিষয় ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে চর্চা চালিয়ে যান। এই সব আরামদায়ক ব্যস্ততা ঝেড়ে ফেলে তিনি বুলগেরীয়দেব দুদশা থেকে উত্থিত করুণ ক্রন্দনে সাড়া দেন।

অতঃপর তিনি যে প্রচারাভিযান শুরু করেন পার্লমেন্টেব ভেতরে এবং বাইরে তাকে ইংরেজদের ইতিহাসে অসাধারণ দৈহিক শক্তি এবং বাগ্মিতার কৃতিত্ব হিসেবে চিহ্নিত। রাজদরবার, অভিজাত শ্রেণী, সংবাদপত্র জগতের সিংহভাগ, রোমাঞ্চসন্ধানী চিত্তাবর্জিত এবং অগভীর জনগণ প্রবল আবেগের বশে তার বিরোধিতা শুরু করে। রুশিয়ার প্রতি হিংস্র ঘৃণা, তুর্কদের প্রতি চিরাচরিত বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, অত্যুৎসাহী যুদ্ধংদেহী হুংকার (যেমন জাতীয় ভারতীয় বাহিনী আহবান, দার্দানেলেস প্রণালীতে রণবহর প্রেরণ) তার বক্তব্য জাতির কানে পৌছতে দেয়নি। তথাপি দেশবাসীর নৈতিক অনুভূতির কাছে তার আবেদনের মহিমা ও শক্তি এতটা প্রবল ছিলো যে বছর তিনেক যেতে না যেতেই তিনি বিকন্সফিল্ড ও সলসবেরির সুনাম ম্লান করে দেন, বাগ্মিতার জোরে টোরি দলের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটে, তিনি নিজ দলের নেতৃত্ব পুনরায় লাভ করেন, রাজার পরামর্শদাতাদের মধ্যেও তিনি হন পয়লা নম্বর ব্যক্তি। তার সকল যুক্তি ও বক্তব্যের সারমর্ম এই ছিলো যে ইংরেজ ভোটারগণ মানবতার স্বার্থিক কল্যাণ ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না। এ সময় তিনি স্বীয় নির্বাচনী এলাকা মিডলোথিয়ানে বলেন, "মনে রাখবেন, আফগানিস্তানের বরফাচ্ছাদিত পাহাড়ী গ্রাম গুলিতে জীবনের পবিত্রতা সৃষ্টিকর্তার কাছে যতটুক অলঙ্ঘনীয় তোমাদের জীবন তার চেয়ে বেশি নয়।" তিনি বুলগেরিয়াকে ভয় করতেন না। তিনি সহজাত অনুভূতির উপর নির্ভর করে ঘোষণা দেন যে বলক্যান অঞ্চলে রুশ প্রভাবের বিরুদ্ধে একটি স্বাধীন জাতির চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক আর কিছু হতে পারে না। কয়েক বছর পরই পরিস্থিতি সম্পর্কে তার অনুমান সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। বুলগেরিয়া রাষ্ট্র দুটি ভাগে বিভক্ত করা ছিলো ১৮৭৮ সালে রুশিন কূটনীতির প্রধান লক্ষ্য। এবার দুটি ভাগ জাতীয় অনুভূতিকে বলে, গ্রেট বৃটেনের আদর্শবাদ এক হয়। এদিকে রুশ সম্রাজ্যের হয় দারুণ ক্ষতি।

তার ডিজরেলীর দুরন্ত সমালোচনার মধ্য থেকে বড়ো ধরণের ছবির মতন ডিজরেলি এবং গ্লাডস্টোনের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব। সে সময় ইংলন্ডবাসীর মনোভাব এই ছিলো যে চেরী ফল একজন

হয়ে দুঃসাহসী প্রতিভার নেতৃত্ব গ্রহণ করে যিনি তার রাজনৈতিক আদর্শ প্রকাশ করতেন কোমাঞ্চ প্রধান উপন্যাসের মাধ্যমে। অপর দিকে লিবার‍্যাল দলের নেতা হবেন হাই চার্চের লেকায়ার, ইটন এবং অক্সফোর্ডের শ্রেষ্ঠ সন্তান, যে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন কঠোর এবং অনমনীয় টোরিদের আশা-ভরসা হিসেবে। সে কালের দার্শনিক র‍্যাডিক্যালিজমের সঙ্গে গ্লাডস্টোনের মোটেই সংশ্রব ছিলো না, আবার বায়ুর সামান্যতম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় মনের পরিবর্তনে ডিজরেলির মতো কেউ পারঙ্গম ছিলেন না। ভিক্টোরীয় যুগের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আন্দোলন উদারনীতিক গ্লাডস্টোনকে এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি। যদিও তিনি একটি প্রগতিকামী দলকে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে এবং অতুলনীয় সংসদীয় দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করেছেন তবে তার দৃষ্টি ভবিষ্যৎমুখীন ছিলো না। ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুকানো আছে সেটা অনুমান করা তার ক্ষমতায় কুলাতো না। সময়ের প্রকৃত প্রয়োজন সম্পর্কে যে বাস্তব বোধ মিলের পলিটিক্যাল ইকনমি কিংবা ডিজরেলির সিবিল পুস্তকে মেলে তা গ্লাডস্টোনের রাজনৈতিক বক্তৃতাগুচ্ছে খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্লাডস্টোন বিশেষ ক্ষমতাশালী হন এজন্য যে সংসদীয় কায়দা-কানুন ছিলো তার পুরো নিয়ন্ত্রণে। তার আগে কোনো সংসদ জরুরি অবস্থার জন্য তার মতো তৈরি থাকতে পারতেন না, শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিবর্তনশীল মনোভাবও তার মতো দ্রুত কেউ আঁচ করতে পারতেন না। শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রয়োজনে অপ্রস্তুত করার তার ক্ষমতাও ছিলো অপরিসীম। সরকারি দল বা টেজারি বেঞ্চ থেকে বার বার দাঁড়িয়ে, তার কৃষ্ণবর্ণ চোখ থেকে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে, তার পরিবর্তনশীল আবেগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কণ্ঠস্বর ওঠানামা করে, বিতর্কের তালে তালে তার অ্যাথলেটিক দেহ কাঁপিয়ে তিনি বিরুদ্ধ পক্ষকে করতেন নাস্তানাবুদ, স্বীয় দলের সম্ভাবনাকে করতেন সুরক্ষিত। নিতান্ত বৃদ্ধ বয়সে সংসদীয় গ্লাডিয়েটরদের সম্মুখীন হয়েও তিনি কমন্সভাকে বাগ্মিতা দ্বারা বশ করতেন, আইরিশ সদস্যরা থাকতেন পায়ের উপর, তাদের প্রকম্পিত না করা পর্যন্ত। প্রয়োজনে উপরে তুলে নাচাতেন, উল্লাস প্রকাশ করতেন বিকারগ্রস্তের মতো।

যেখানে গ্লাডস্টোনের প্রভাবে হুইগ দল লিবার‍্যাল দলে পরিণত হয়, সেখানে ইংরেজদের রাজনীতিতে (১৮৫২-৮০) ডিজরেলির অবদান হলো ধীর-স্থির। পিল কর্তৃক রূপায়িত ধীরগতি রক্ষণশীল দলে তিনি দ্রুত গতির রোমান্টিক এবং গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটান। কনিংসবিতে 'তরুণ ইংল্যান্ডের হিতার্থে টোরি গণতান্ত্রিক তত্ত্ব' উপস্থাপন করেন। জনসাধারণকে বিশ্বাস করতে তিনি মোটেই ভয় পেতেন না। রক্ষণশীলদের নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ১৮৬৭ সালে উচ্চতর বেতনভোগী কারিগরদের ভোটাধিকার প্রদান করে স্বীয় দলের অনুসারীদের বিরাগভাজন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি ছিলেন ভূমির মালিক এবং বড়ো ব্যবসায়ীদের চেয়ে বিজ্ঞ। তিনি দেখতে পান যে ইংরেজ কর্মজীবী শ্রেণীর বিরাট একটি অংশ রাজসিংহাসনের প্রতি আনুগত্যশীল, তারা দেশের প্রয়োজনে অবশ্যই সাড়া দেবে। তার অপর একটি বিশ্বাস ছিলো যে নৃপতির ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক সভ্যতার জন্য অনেক কিছুই করার আছে। তার এই বিশ্বাস বাস্তবে প্রমাণিতও হয়। তিনি আরো দেখতে পান যে রাজসিংহাসনের প্রভাব অপরিসীম, সাম্রাজ্যের বন্ধনও টিকে আছে উক্ত বন্ধনের জন্যই। সাম্রাজ্য তার কাছে ছিলো সমধিক আকর্ষণীয়, যেহেতু এই সাম্রাজ্যের প্রধান জুয়েল প্রাচ্যে অবস্থিত। ভারত তার কল্পনার জন্য শক্তি

যোগায়, তার নীতিপন্থাগুলির জন্য অনুপ্রেরণার কাজ করে। তার মাথায় ভারত সকল সময় ভর করে থাকে বলে রাশিয়াকে তিনি চিরস্থায়ী শত্রু গণ্য করেন; তুরস্ক তার কাছে সহায়ক বন্ধু। ভারতের কথা মনে রেখেই তিনি সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণকারী অংশীদারিত্ব ক্রয় করেন। উপরন্তু, স্বভাবসুলভ সাহসিকতার সঙ্গে কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় খেতাবের সঙ্গে সাম্রাজ্ঞী পদবী জুড়ে দেন।

গ্লাডস্টোন যেখানে সর্বদাই ধর্ম প্রচারক ছিলেন, সেখানে ডিজরেলি ছিলেন অনমনীয় রোমান্টিক। তিনি জানতেন রানী অত্যন্ত সংবেদনশীল, অতএব তার সঙ্গে আচরণ করতেন প্রেমিকসুলভ। তার সংসদীয় জীবনের সবচেয়ে আয়াসসাধ্য পরে তিনি দিনে দু'তিনটি রোমান্টিক মেজাজের পত্র লিখতেন লেডি ব্র্যাডফোর্ড কিংবা তার ভগ্নীকে। তার এই পত্ররচনার অবসান ঘটে সর্বশেষ উপন্যাস এন্ডিমিয়ন রচনার সময়। কারণ এটি লিখতে গিয়ে তার রোমান্টিকতা প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করেন।

তার বিদেশ নীতি সে সময় প্রশংসা কুড়ালেও, তা যথেষ্ট আকর্ষণীয় হলেও (কল্পনা প্রধান ও তেজস্বী সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ জনগণের বীরত্বব্যঞ্জক অংশের কাছে আকর্ষণীয় বোধ হতে বাধ্য), তা খুব সুস্থ নীতি ছিলো না। বলক্যান অঞ্চলের সমস্যা তিনি সঠিক উপলব্ধি করতেন পারেন নি, ইংল্যান্ডকে প্রায় যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে অত্র অঞ্চলের খ্রিষ্টানরা তুরস্কের অধীনে থেকে যেতেন। তার লিবার‍্যাল বিরুদ্ধ পক্ষ যথার্থই আশংকা করেন যে মর্যাদার প্রতি তার যে আসক্তি তাতে দেশ ভয়ংকর বিপদে নিমজ্জিত হতে পারে।

পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজদের চিন্তায় ও কর্মে যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, তার আদি প্রেরণার উৎস এই হিব্রু প্রতিভাবান ব্যক্তিটি। ইংরেজ জাতিকে ডিজরেলি যে পথে নিয়ে যান অতঃপর তা অনুসরণ করেন কিপলিং ও রোজবেরি, চেম্বারলেন এবং মিলনার, বেলফোর এবং কার্জন।

সমুদ্র অতিক্রমী ইংরেজদের প্রভুত্বশীল পুরাতন কঠোর বৃটিশ নীতির সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘটে আমেরিক্যান উপনিবেশগুলির সার্থক বিদ্রোহের পর। কিন্তু ভারতে বৃটিশ শাসনের চমৎকারিত্বের প্রতি রোমান্টিক এবং আবেগদীপ্ত বিশ্বাস এবং বৈদেশিক কলনিগুলির সঙ্গে মূলদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের মূল্য বিষয়ে গভীর আস্থা ডিজরেলির বক্তৃতায় প্রকাশ পায়। এবং তা যথানিয়মে রক্ষণশীল দলের নীতিমালায় স্থান পায়, ফলে দলটির জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

গ্লাডস্টোনের আশ্চর্যজনক এবং ঝটিকাপূর্ণ বৃদ্ধ বয়সের অনুপ্রেরণা ছিলো একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। সাম্রাজ্য, মর্যাদা, যুদ্ধ, আধিপত্য এসব শব্দ যে প্রচণ্ড আবেগের জোয়ার সৃষ্টি করে তা লিব্যারাল দলের ধর্মীয় নেতার কাছে কোনো প্রকার আবেগের সৃষ্টি করতে পারে নি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানোর আকাঙ্ক্ষা তো দূরের কথা, তিনি চাইতেন তার দেশের দায়িত্ব যতো দূর সম্ভব কাটছাট করা যায়। বলক্যান অঞ্চলে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, আয়ারল্যান্ডে জাতীয় আশা-ভরসার সন্তুষ্টি ছিলো তার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অনেকের কাছেই নিকট মনে হলেও এর জন্য তিনি নিজের এবং দলের পক্ষে ঝুঁকি গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি আয়োনীয় দ্বীপ গ্রিসের হাতে প্রত্যর্পণের পরামর্শ দেন, বৃদ্ধ বয়সে টান্সভাল প্রদেশ বুয়ারদের ফেরৎ দেয়া উচিত বলে মনে করেন।

তার দ্বিতীয় প্রশাসন (১৮৮৩-৮৫) গ্রামীণ কৃষকশ্রেণীদের মুক্তি দিয়ে সুখ্যাতি কুড়ায়; প্রণয়ন করেন আইরিশ ভূমি আইন, এতে ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত হয়, কৃষকদের ভোগদখল হয় স্থায়ী। তবে মিশর ও সুদানে ব্যর্থতার জন্য দুর্নাম কুড়ায়। তার সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বেপরোয়া প্রতিশ্রুতিও বড়ো একটা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। আয়ারল্যান্ডের প্রোটেস্ট্যান্টদের স্বার্থ উপেক্ষা করে, বৃটেনের অধিকারী শ্রেণীর তোয়াক্কা না করে দ্য গ্রান্ড ওল্ডম্যান আয়ারল্যান্ডের জন্য হোমরুল প্রস্তাবিত করেন (১৮৮৬); চেম্বারলেন, হার্টিংটন, জোসেফ প্রমুখ তার প্রভাবশালী অনুসারিবৃন্দ তার পথ অনুসরণ করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু এই ক্ষমতাশালী লোকদের হারানোর পরও, এবং একথা জানার পরও যে তার ইতঃপূর্বেকার বিজয়গুলি ম্লান হয়ে গেছে, তবু তার মূল লক্ষ্য দুর্বল হয়নি। তিরাশি বছর বয়সে টানা ছয় বছর বিরোধী দলে কাজ করে, এই অদম্য ঝানু রাজনীতিক ক্ষমতায় ফিরে আসেন, এবং অননুসাধারণ দৈহিক ও মননশক্তির আশীর্বাদে কমন্স সভায় তার বিলের পক্ষে অনুমোদন আদায় করেন। কিন্তু লর্ডসভা অপারগতা জ্ঞাপন করে দৃঢ়তার সঙ্গে, ফলে আইরিশ সংসদীয় দলকে পুনরায় নিরাশ হতে হয়। ইতিমধ্যে সলসবেরির ইউনিয়নিস্ট প্রশাসন আয়ারল্যান্ড সমস্যা একটি নতুন দিক থেকে আক্রমণ করে। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের মতো একটি বলিষ্ঠ ও মৌলিক পরিকল্পনা দেশের মানুষের প্রভূত বস্তুগত উন্নতি সাধন করে। এই পরিকল্পনার পক্ষে প্রথমে সুপারিশ উপস্থাপন করেন জোসেফ চেম্বারলেন, পরিকল্পনা কার্যকর করেন সাহসিকতা এবং বুদ্ধিসত্তার সঙ্গে এ.জে. বেলফোর। কিন্তু স্বপ্নচালিত এই জাতি স্বপ্ন বিসর্জন দিতে অস্বীকার করে। বোঝা যায়, একটি সৎ সরকারই যথেষ্ট নয়। গ্লাডস্টোন যথার্থ উপলব্ধি করেন যে ক্যাথলিক আইরিশরা চায় তারা তাদের দেশ নিজেরাই শাসন করতে। সময় যতো এগোয় তাদের দাবির তালিকা ততোই বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ১৯১১ সালে কিয়ৎ পরিমাণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয় একটি দাঙ্গাবাজ পার্টিকে। দেখা যায় এই স্বাধীনতার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য গ্লাডস্টোনের বিল অনেক দূর অতিক্রম করে গেছে। উপরন্তু উক্ত বিল আশি এবং নব্বই-র দশকে ইংল্যান্ডের রাজনীতি এবং সমাজকে যেভাবে আলোড়িত বিক্ষুব্ধ করেছিলো।

আইরিশ হোমরুল নিয়ে সংঘর্ষে আবেগের যে তিক্ততা এবং তীব্রতা ইংরেজদের রাজনীতিতে প্রবেশ করে এ-সময় তা সঠিক অনুধাবন করা যাবে যদি আমরা স্মরণ করি কি পন্থায় আইরিশ আন্দোলন পরিচালনা করা হয় এবং এর ফলে কি আতংকজনক পরিস্থিতির দ্বার উন্মোচন করা হয়। যে আইরিশ হোমরুল লিগ ১৮৭০ সালে আইস্যাক বাট সূচনা করেন বৈধ পার্লামেন্টারি চাপ প্রয়োগ করে আয়ারল্যান্ডের জন্য হোম রুল নামক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে তা ছিলো একটি বৃহত্তর আন্দোলনের অংশবিশেষ মাত্র। ইতঃপূর্বে, বস্তুত চৌদ্দ বছর পূর্বে, আইরিশ রিপাবলিক্যান ব্রাদারহুড নামক গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। এই সমাজের অনন্য লক্ষ্য ছিলো বলপ্রয়োগ করে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্ক ছিন্ন করা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে। আইরিশম্যানদের ওয়েস্টমিনস্টারে নিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রম সহায়তা লাভ করে কথিত সীমানার বাইরে বৈপ্লবিক আন্দোলনের দরুন, আরো সহায়তা লাভ করে ইউরোপে আই.আর.বি.র কার্যক্রমের ফলে, আমেরিকার ক্লান না জেল (Clan na Gael)-এর সহায়তাও কাজে লাগে। এসব ছিলো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভ্রাতৃসংঘ, যারা বাগ্মিতায় নয়, ডিনামাইট নামক মারণাস্ত্রের কার্যক্রমে অধিকতর আস্থাশীল। কথোপকথন, বাগ্মিতায়,

যুক্তিশীলতাকে তারা মোটেই পাত্তা দিতেন না। আইরিশ আন্দোলনের অন্ধকার দিকটায় এই সময় ফেনিয়ান সমাজ ভীষণবর্ণ আলোক নিক্ষেপ করে তাদের অপকর্ম দ্বারা। এবং ইংরেজরা ডাবলিন পার্লামেন্টের পক্ষে ভোট দিতেন যদি আয়ারল্যান্ড একটিমাত্র ছাড় পাবার কারণে নমনীয়তা প্রদর্শন করতো। উপরন্তু যেদি আয়ারল্যান্ডে রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিক্ষুব্ধ কৃষকরা জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়। সরকার বরাবর মাইকেল ডেভিটের ল্যান্ড লিগ দল দমনের চেষ্টা করে। কারণ লেডিস ল্যান্ড লিগ কাজটা চালিয়ে যায়।

গুটিকয় প্রটেস্ট্যান্ট ব্যতিরেকে আইরিশ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সবাই এক কাট্টা ছিলেন হোম রুলের পক্ষে। পার্লামেন্টে এই প্রতিনিধি দলের কাজই ছিলো সংসদীয় কার্যক্রমে পরিকল্পিত উপায়ে বাধা প্রদান, সংসদকে অকার্যকর করে তোলা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের দাবি সুবিচার লাভ করে। সারারাত সংসদে কাটিয়ে ক্লান্ত, অবসন্ন এবং উৎপীড়িত হয়ে, ঠাট্টা উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়ে, ফেনিয়ান সংঘের জঘন্য অপরাধে ক্ষুব্ধ হয়ে, প্রজাতন্ত্রবাদের আন্দালনে আতংকিত এবং আইরিশদের প্রতি সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের শত্রুতা এবং অবিশ্বাসে হতবুদ্ধি হয়ে, সাধারণ ইংরেজ সাংসদরা আইরিশ হোম রুলের প্রবল বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে।

অতএব ১৮৮৬ সালের মতো গ্লাডস্টোন নিশ্চিত আশা পোষণ করেন যে সাম্প্রতিক পুনর্বণ্টন আইনের অধীনে যেহেতু ওয়েস্টমিনস্টারে হোমরুলের পক্ষে তিরাশিটি অধিভক্ত ভোট রয়েছে, ফলে রক্ষণশীল দল এবার আইরিশ স্ব-শাসনের ব্যাপারটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবে। বস্তুত, এক মুহূর্তের জন্য রক্ষণশীল দলের সদস্যরা সে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে। কারণ কারনারভন এবং জাতীয়তাবাদী নেতা পারনেলের মধ্যে কথাবার্তা হয়। তবে উক্ত কথাবার্তা থেকে সুফল কিছু পাওয়া যায় নি। যে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব প্রদান করা উচিত ছিলো দলগুলির একটি জোটের কাছে, তা ছেড়ে দেয়া হয় লিবারাল দলের কমজোর এবং খণ্ডিত একটি অংশের কাছে।

এই খণ্ডিত অংশের ভূমিকা উপরন্তু কঠিনতর করে তোলেন আইরিশ পক্ষের মূল সরদার। এরিন (Erin)-এর যাবতীয় বিদ্রোহাত্মক ঐতিহ্যের মূর্ত প্রকাশ ঘটে চার্লস স্টুয়ার্ট পারনেলের মধ্যে। তিনি আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার গুপ্ত সমিতিগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেন, ল্যান্ড লিগের প্রেসিডেন্ট এবং হাউস অব কমন্সে আইরিশ দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরিণত হন আইরিশ জাতির মুকুটহীন সম্রাটে। যে সকল সংস্থা ইংল্যান্ডের কাছে ছিলো অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু, সেই সংস্থাগুলি অদ্ভুৎ ও রহস্যময় বরফ ও অগ্নিশিখার সংমিশ্রণ এই নেতার প্রভুত্ব স্বীকার করে। কমন্সসভায় এই অহংকারী, সুশ্রী দর্শন, অসামাজিক আইরিশ জমিদার কৃষ্ণবর্ণ দাড়ি এবং ঘনকালো এবং উজ্জ্বল চোখের মানুষটি স্থির, গোমড়া মুখে বসে থাকেন অনুগত অনুসারীদের মধ্যে। শুধু তার উপস্থিতিই সবার মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। যদিও তিনি অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত অ্যাংলোআইরিশ কাউন্টি বংশোদ্ভূত, তবু তিনি পরিচিতি লাভ করেন ইংরেজদের অনমনীয় শত্রু হিসেবে।

জনকে তাকে মনে করতেন অমানবিক এবং বিবেকবর্জিত। বস্তুত, গ্লাডস্টোন হোমরুল বিল উপস্থাপনের আগে এই লোকটিকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে বাধ্য হন।

সময় সময় এই ভয়ানক আইরিশ লোকটি এমন সব কথা বলতেন বা মন্তব্য করতেন যা তার নিবারাল সমর্থকদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিত। একবার তিনি বলেন, "কোনো জাতির অগ্রযাত্রার সীমা নির্ধারণ করে দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। একবার মার্কিনি শ্রোতাদের বলেন (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০) : "আমরা যেখানেই বাস করি না কেন, সে আমেরিকায় হোক কিংবা আয়ারল্যান্ডে, কিংবা অন্য কোনো খানে, আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ইংল্যান্ডের শেষ বন্ধন পর্যন্ত ছিন্ন হবার আগে আমরা সন্তুষ্ট হবো না।" এই ঘোষণাগুলির মুখোমুখি হয়ে লিবারালরা এখন শুধু আশা করতে পারেন যে সমঝোতা ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটাবে, সংস্কার কমে হাত দিলে বিপ্লব এড়ানো যাবে, তাছাড়া প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নৌশ পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করা গেলে আইরিশদের দাঙ্গাবাজনীতি থমকে যাবে।

তবু পারনেল মার্কিনী বক্তৃতামালার প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করতে সমর্থ হন, দ্য টাইম পত্রিকার রুদ্ধ আক্রমণও কাটিয়ে ওঠেন। উক্ত পত্রিকায় পারনেলবাদকে জঘন্য অপরাধের সংগোত্র করা হয়। অবশেষে তার অভ্যন্তরীণ নৈতিকতার কারণে দমে যান। কারণ গ্লাডস্টোনের অনুসারীদের ননকনফর্মিস্ট বিবেক আহত হয়। আইরিশদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক জনৈক রমণীর কারণে সর্বস্বান্ত হন। তথাপি তার অন্তিম ট্র্যাজিক বছরগুলিতে আইরিশ পার্টি বিপর্যস্ত হলে আইরিশ জাতীয়তাবাদের অগ্রযাত্রা বিঘ্নিত হয় বটে (সাময়িকভাবে), কিন্তু আন্দোলনের মূল লক্ষ্যের এতটুকু ক্ষতি করতে পারেনি। ক্যাথলিক আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তারাই পরিচালনা করবে, তারা জীবনযাপন করবে নিজেদের উদ্ভাবিত উপায়ে, তাদের এই বাসনা এতোটা প্রবল ছিলো যে, একজন নেতার কলঙ্ক কিংবা মৃত্যুতে তার অবসান ঘটতে পারে না।

দলে অভ্যন্তরীণ বিভেদ কিংবা সংসদীয় বিতর্কের খেলায় যে উত্থান -পতন হয় তাতেও বড়ো একটা ক্ষতি হতে পারে না॥

বিসমার্ক ও জার্মান রাইখ

বিসমার্ক, ১৮৭০-৯। জার্মানির অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বিসমার্ক ও সংরক্ষণবাদ। জার্মান রিম আইন। নিষ্পেষণ নীতি। কূটনৈতিক বিপ্লব। ১৮৭৯ সালের দ্বৈত মৈত্রী। ১৮৮৫ সালের বলকান সংকট। ইংল্যান্ডের সঙ্গে বিসমার্কের সম্পর্ক। বিসমার্কের ভয়। ফ্রাংকো-প্রুসীয় যুদ্ধের পর জার্মান জনগণের কৃতিত্ব।

জার্মান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের পরও লৌহমানব বিসমার্ক তার দেশের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন, জগতের ভাগ্যও তার ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়। বড়ো বড়ো কাজগুলি সম্পন্ন হবার পর তিনি সন্তুষ্ট বোধ করেন যে জার্মানি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং বৈদেশিক যুদ্ধ থেকে রক্ষা পাবে। তিনি কখনো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের আকাঙ্ক্ষা করেননি, পূর্বাঞ্চলে সম্প্রসারণও তার লক্ষ্য ছিলো না। তাছাড়া তার কর্মপন্থার মূল ভিত্তি এই ছিলো যে সামুদ্রিক জলভাগে কোনো প্রকার শক্তি বৃদ্ধি করে ইংল্যান্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব বিপদগ্রস্ত করা যাবে না। নতুন কোনো দুঃসাহসিক কর্মপন্থা গ্রহণ করলে বিপদ ডেকে আনা হবে। তিনি দেখতে পান যে ফ্রান্স অসন্তুষ্ট, রুশদের মনোভাব অনিশ্চিত, অস্ট্রিয়া এখনো বার্লিনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ। ইংল্যান্ডকে বিচ্ছিন্ন না করে কিভাবে রাশিয়ার বন্ধুত্ব লাভ করা যায়, রাশিয়াকে দূরে না সরিয়ে কিভাবে অস্ট্রিয়াকে কাছে টানা যায় — এই সব মহাদেশীয় সমস্যা তার কূটনীতির জন্য ছিলো বোঝাস্বরূপ। ফ্রান্সকে মিত্রহীন করা, শক্তিশালী বাহিনী দ্বারা ইউরোপে জার্মানির প্রাধান্য বিস্তার, এবং তার নিজের স্বেচ্ছাচারী শাসন টিকিয়ে রাখা ছিলো তার কর্মপন্থার মূলনীতি। দীর্ঘায়ু জীবন তার সাফল্যে বিস্ময়কর অবদান রাখে। সম্রাট প্রথম উইলিয়াম নবতিপর বৃদ্ধ হিসেবে ১৮৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এত দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন যে সবশেষে ক্রাউন প্রিন্স ফ্রেডারিক যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি ককটি রোগে কাবু, অশক্ত। সংক্ষিপ্ত নব্বই দিনের শাসনে ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হননি। সে ক্ষমতা তখন তার ছিলো না। এই উদারনীতিক নৃপতির করুণ মৃত্যুর পর বিসমার্কের কর্মপন্থা বাস্তবায়নের আর কোনো বড় ধরনের বাধা রইলো না।

ইত্যবসরে জার্মানির অর্থনীতির বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসছিলো ; অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয় ইংরেজদের শিল্প বিপ্লবের সময়। তবে জার্মানিতে পরিবর্তনের বেগ ছিলো দ্রুততর। ফ্রাংকো-প্রুসীয় যুদ্ধের পর জার্মানির শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্ময়কর প্রসার ঘটে। একটি দরিদ্র দেশ অকস্মাৎ বিত্তবান দেশে পরিণত হয়। দেশের জনসংখ্যা প্রধানত ছিলো গ্রামীণ, এই জনসংখ্যার বিরাট অংশ শহরাভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ফলে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এক সময় দেখা যায় যে গোটা ব্যাপারটা পাল্টে গেছে। এখন গ্রামের চেয়ে শহরে লোকসংখ্যা অধিক। শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন দুটি শাখা, রসায়ন ও বিদ্যুৎ শিল্পের নেতৃত্ব জার্মান জনগণ লাভ করে তাদের উচ্চতর শিক্ষার

স্বাভাবিক পূর্বশর্ত হিসেবে। কয়লা উৎপাদন বাড়তে থাকে দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হারে, দেখা যায় কয়লা উৎপাদন যেখানে ১৮৭১ সালে ছিলো তিরিশ মিলিয়ন টন তা ১৯১৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে একশো নব্বই মিলিয়ন টন। ইংল্যান্ডে একটা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হয়, যার সঙ্গে টমাস ও গালক্রিস্টের নাম জড়িত। এই প্রক্রিয়ায় লুক্সেমবার্গ এবং লরেনের মৌল আকরিক অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার সম্ভব। এতে শিল্পের বিরাট সমৃদ্ধি অর্জন হয় এবং ওয়েস্টফেলিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলের রূপ বদলে যায়। এই অঞ্চল এখন ইংরেজদের ব্লাক কান্ট্রির সমতুল, কয়লার জোয়ারে এবং শিল্পকারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে। মাত্র এক দশকের (আলির দশকে) সময় পরিধিতে জার্মান সাম্রাজ্য তার ইস্পাত উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, মৌল উৎপাদনও প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এভাবে শিল্প কারখানা যখন জার্মান জনগণের উন্নতি সম্ভব করে তুলছিলো, তাদের চরিত্র এবং পেশাগত জীবনের ঘটাচ্ছিল বিরাট রূপান্তর, তখন নৌ বাণিজ্য উন্নতির জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করার জন্য, আফ্রিকার বন্দর গুলিতে নোঙর ফেলার জন্য, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং দূর প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য। জার্মান সওদাগরি জাহাজের সংখ্যা দ্রুত বাড়ানো হয়। জার্মান বণিকপ্রধান নগর সংঘের শক্তি বা হ্যান্সিয়াটিক শক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয়। ১৮৭০ থেকে ১৮৯০, এই বিশ বছরের মধ্যে জার্মান সাম্রাজ্যের শক্তি চালিত জাহাজের মোট আকৃতি বৃদ্ধি পায় সাত গুণ। এবার রণধ্বনি ওঠে উপনিবেশের সংখ্যা বৃদ্ধি, মার্কিনী গম এবং ইংরেজদের শিল্পজাত সামাগ্রীর বিরুদ্ধে সংরক্ষণের ব্যবস্থা, এবং বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে জঙ্গী নীতি অবলম্বনের জন্য। এই দাবি গুলির চাপ এতটা প্রচণ্ড ছিলো যে, কোনো রাষ্ট্রনায়ক, তার মর্যাদা যাই হোক না কেন, খুব বেশি দিন ধামাচাপা দিয়ে টিকতে পারতেন না। বিসমার্ক জনগণের দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। ১৮৭৯ সালে রাজস্ব নীতির অংশ হিসেবে সংরক্ষণবাদ চালু করেন, এবং তিন বছর পর, প্রয়োজনের দোহাই পেরে, জার্মানিকে ঔপনিবেশিক শক্তি হওয়ার পথে পরিচালিত করেন। এখানে একটা মজাদার কাকতালীয় ঘটনা হিসেবে আমরা লক্ষ্য করি যে, যে বছর রাইখস্ট্যাগে উপনিবেশ গোষ্ঠী গঠিত হয় (১৮৮৩) সেই বছরই ভূমিষ্ঠ হয় এ.ই.জি. (Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft)। এটি জার্মানির সর্ববৃহৎ বিজ্ঞানভিত্তিক বৈদ্যুতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান।

ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো জার্মানিতেও শিল্পায়নের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সত্তর ও আশির দশকে জার্মানি মুখোমুখি হয় অকারণ দারিদ্র্যের এবং অস্থির, দুর্দশাগ্রস্ত এবং শোষিত সর্বহারার মিছিল দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। একদিকে ভাগনার ইউরোপের সংগীত অনুরাগীদের আনন্দ যুগিয়েছেন বেরুথের অপেরা উৎসবের মাধ্যমে, অপর দিকে জার্মান শ্রমিকরা খনি ও কারখানায় কঠোর পরিশ্রম করেছে। এই অবস্থার সঙ্গে তুলনা চলে কারখানা আইন গৃহীত হওয়ার আগের ইংল্যান্ডের সঙ্গে। ইংল্যান্ডের শ্রমিকরা তখন অনুরূপ দুর্দশার ভেতর দিন কাটায়। বিসমার্ক বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন, তিনি এই সামাজিক সমস্যা ব্যাপারে অন্ধ থাকতে পারেন না। তিনি বুঝতে পারেন, তার সাধের সৌধ ধসে যাবে যদি শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট থাকে। তিনি বিশ্বাস করেন নি যে ব্যক্তি মালিকানায় দেশ গড়ার কাজ লাগামহীন ভাবে চলতে

দিলে সর্বাধিক সংখ্যার সর্বাধিক মঙ্গল সূচিত হতে পারে। পিতৃসুলভ শাসন, যা প্রুশীয় পুরাতন প্রথার অঙ্গ, শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট বর্তমান পরিস্থিতিতে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত। এ ধরনের সদাশয় স্বৈরশাসনের আওতা আরো বিস্তৃত করা দরকার। বৃদ্ধদের সম্ভাব্য অভাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, অসুখ এবং দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে কর্মজীবীদের জন্য বিমার ব্যবস্থা জরুরি। বিসমার্ক শ্যাফটস্‌বেরি ছিলেন না। তিনি কোনো কারখানা আইন প্রণয়ন করেন নি, কিন্তু রুগ্নতা (১৮৮৩), দুর্ঘটনা (১৮৮৪), বার্ধক্য (১৮৮৯) ইত্যাদির জন্য তিনি যে বাধ্যতামূলক বিমার মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন সে ব্যাপারে ইউরোপে তিনি ছিলেন অগ্রদূত। তবে বেকারির বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রকার বিমার ব্যবস্থা করেন নি। এই কাজটি পরবর্তী কালে ইংল্যান্ডে করেন মি. লয়েড জর্জ, অ্যাসকুইথ মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে।

জার্মান বিমা আইন ছিলো মাইলফলক। উনিশ শতকের যাবতীয় রাজনৈতিক উদ্ভাবনের মধ্যে এটি ছিলো সবচেয়ে মূল্যবান। সমাজ সুরক্ষার জন্য এই বিমাপ্রথা কার্যকর করা হয় রাষ্ট্রে, নিয়োগকর্তা এবং কর্মীদের প্রদত্ত চাঁদার ভিত্তিতে। শিল্প কারখানায় কায়িক শ্রম দিতে গেলে যে মারাত্মক ঝুঁকি বহন করতে হয় বিমা চালু হওয়ার পর তা বহুলাংশে হ্রাস পায়। এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণের জন্যই জার্মানিত বৈপ্লবিক উপদ্রব বহুকাল ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থা গুলির আশীর্বাদেই বিসমার্ক সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিকে দমিয়ে রাখতে সমর্থ হন। দলটি দরিদ্র জনগণের মধ্যে আবেদন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। অথচ এক সময় নির্দয় নিষ্পেষণ সহ্য করেও অগ্রযাত্রা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে।

লৌহকঠিন চ্যান্সেলর হিসেবে এক দিকে তার বহুর গড়ায় অপরদিকে তিনি বিরুদ্ধ পক্ষ সম্পর্কে আরো অসহিষ্ণু এবং কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকেন। ইতিমধ্যে সম্রাটের প্রাণ নাশের জন্য দু'টি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এই ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে তিনি সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে একটি আইন পাস করেন। পরবর্তীকালে কালে উক্ত আইন তিনবার নবায়নও করা হয়। আইনটি এতটা তীব্র ছিলো যে সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রজার স্বাধীনতা পুলিশ বাহিনীর গোড়ালির নিচে চলে যায়। কেবল প্রবল আতংকে বিহ্বল একটি দেশই শুধু অন্যায় এবং স্বৈরাচারী ব্যবস্থার কাছে বিনা বাক্যে নতি স্বীকার করতে পারে। এই কঠোর বিধানের প্রতি সম্মতি স্থাপন করে সাম্রাজ্যের গোড়ার দিককার প্রধান খুঁটি ন্যাশনাল লিবারাল পার্টি নিজেদের উদারবাদের দেউলেপনার ঘোষণা দেয়। অথচ এই দলই যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক সময় সরকারকে সমর্থন যোগায়। এই জাতি নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে যায় এবং পরবর্তী ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

ফ্রান্স সম্পর্কে বিসমার্কের মধ্যে যে অনুভূতি কাজ করতো তাতেই তার সমগ্র বিদেশ নীতির ব্যাখ্যা মেলে। তিনি ফ্রান্সকে তার দেশের বিপজ্জনক শত্রু হিসেবে গণ্য করতেন, যার সঙ্গে কোনো দিন সমঝোতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই দেশকে সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখতে হবে, তাকে দুর্বল করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং ইউরোপে তাকে করতে হবে মিত্রহীন। উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় এলাকা ক্রত উচ্চাভিলাষের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে। এটি তার ফরাসি-বিরোধী কূটনীতির সহায়ক হয়। তিনি ফ্রান্সকে উৎসাহ প্রদান করেন তিউনিস অধিগ্রহণের জন্য, যাতে ইতালির সঙ্গে তার বিবাদের সৃষ্টি হয়। আর ইংল্যান্ডকে বলা হয় মিশরে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য যাতে ফ্রান্সের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাঙনের পথ ধরে। লর্ড সলস্‌বেরি কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৮৭ সালের

অ্যাংলো-ইতালীয় যোগাযোগও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চক্রান্তের ফলশ্রুতি। যাতে ইউরোপে ফ্রান্সের কোনো মিত্র না থাকে। প্যারিসের রাজনৈতিক শক্তিগুলির লীলাখেলা সম্পর্কেও উদাসীন ছিলেন না। জার্মানির ক্ষেত্রে তিনি রাজতন্ত্রী। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তিনি প্রজাতন্ত্রের অনুরাগী কারণ তাঁর অভিমত অনুসারে, প্রজাতন্ত্র হলো সকল শ্রেণীর সরকারের মধ্যে দুর্বলতম। মতলবহীনও বটে।

ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে ফরাসিদের বদ্ধমূল শত্রুতার দরুন কোনো জোট গঠিত হলে তিন সম্রাটের মৈত্রী জার্মানির অনুকূলে প্রধান কূটনৈতিক রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। তবে ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে এই মৈত্রী রচিত হয় ১৮৭৩ সালের জুন মাসে, ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত এটি ক্রিয়াশীল ছিলো। কিন্তু এই সময় বার্লিন কংগ্রেস সম্পর্কে রুশ জার মন্তব্য করেন যে "এটি হলো ইউরোপে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রিন্স বিসমার্কের নেতৃত্বে একটি জোট বৈ কিছু নয়।" এই মন্তব্যের ফলে তিন সম্রাটের মৈত্রীবন্ধনে গুরুতর টান পড়ে। তবে ডাইকাইজারবান্ড সংকট কাটিয়ে ওঠে। জোড়াতালি দিয়ে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা হয়। মৈত্রী নবায়ন করা হয় বার বার। প্রতি তিন বছর পর ইউরোপ মহাদেশে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া হয় যে তিনটি সুবৃহৎ সামরিক রাজতন্ত্রের শাসকরা নতুন বন্ধুত্বে আবদ্ধ। রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলে অনেক সুবিধা পাওয়া সম্ভব কিন্তু বিসমার্ক কোনোদিন মস্কোবাসীদের বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি মনে করতেন রুশদের বন্ধুত্ব অনিশ্চিত, তাদের কূটনীতি কুটিলতাপূর্ণ। তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী গর্টস্যাকফকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। যদি তাকে রাশিয়ার এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে কোনো একটি দেশকে বেছে নিতে হয় তাহলে তিনি সব সময় অস্ট্রিয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তিনি এটি করবেন অংশত অস্ট্রিয়ার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে বলে। অংশত এই কারণে যে, অস্ট্রিয়া যদি কোনো কারণে প্রুসিয়ার সঙ্গে পুরোনো বিবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটায় তাহলে সে সাইলেসিয়া, লরেন, দিনেমার ডাচি ইত্যাদির উপর ঐতিহাসিক দাবিগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটাবে। মূল রাইখের গঠনকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। তাহলে হেউপ্তলিক দ্য গ্রেটের ক্ষমতারোহণের পর প্রথম বারের মতো হোয়েনজোলার্ন রাজবংশের কর্তৃত্বাধিত সকল কৃতিত্ব বিতর্কিত করে ছাড়বে। অতএব ১৮৭৮ সালের বলক্যান অঞ্চলের অশান্ত অবস্থা শান্ত হবার পর, বিসমার্ক তার মিত্র রাশিয়াকে না জানিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে গোপন সন্ধি স্থাপনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তার এই পদক্ষেপ ছিলো ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণকারী। নিখিল স্লাভবাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে বিসমার্ক গোপনে এবং বিশ্বাস ভঙ্গ করে তার দেশকে অস্ট্রিয়ার পক্ষে দাঁড় করান। ১৮৭৯ সালের দ্বৈত মৈত্রীতে ১৮৮১ সালে ইতালি যোগ দেয়ায় তা ত্রিপক্ষীয় মৈত্রীতে পরিণত হয় এবং মহাযুদ্ধের (প্রথম) সূচনা পর্যন্ত টিকে থাকে।* উক্ত যুগান্তকারী ঘটনার পূর্ব-বর্তিয় ঘটনার প্রতি মনোযোগী ছাত্ররা সহজে উপলব্ধি করবে যে বিসমার্ক এবং আন্দ্রাসি ১৮৭৯ সালে জার্মানি এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের মধ্যে যে মৈত্রী রচনা করেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং গোপনে, তা একটা যৌলিক উৎস হিসেবে কাজ করে। ঐ সময় এটা লিখিত হয়ে যায় যে বলক্যান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেলে জার্মান বাহিনী তার মিত্র অস্ট্রিয়ার পক্ষে দাঁড়াবে। ১৮৭৯ সালের যুগান্তকারী সন্ধির মূল অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, "যুক্তিসঙ্গত

---

* মি. ফিশার 'ইউরোপের ইতিহাস' রচনা সম্পূর্ণ করেন ১৯৩৫ সালে।

পক্ষগুলির কোনো একটি যদি তাদের প্রত্যাশা এবং অনুগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাশিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহলে চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলি আক্রান্ত দেশকে সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকবে, নিয়োজিত করবে তার সাম্রাজ্যের সকল শক্তি, অতঃপর শান্তি সম্পাদন করবে একত্রে এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে"। এই সন্ধির সঙ্গে জার্মানি কর্তৃক রাশিয়াকে প্রদত্ত অঙ্গীকারের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সে জন্যই কথিত সন্ধি ব্যাপারে সর্বাধিক সতর্ক গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হোক, এটা বিসমার্কের কাম্য ছিলো না। বরং তিনি আশা করেন যে এ ধরনের যুদ্ধ যেন এড়ানো সম্ভব হয়। জার্মানি কিংবা ইউরোপের বৃহত্তর কোনো বিপদ যেন ঘনিয়ে না আসে, এ কথাটাই তিনি সব সময় মনে রাখতেন। তবু কতো সহজে সামান্য একটি স্ফুলিঙ্গ অতিদাহ্য বলক্যান রাষ্ট্রগুলিতে নিক্ষেপ করা যায়, যা গোটা ইউরোপে, নেভা থেকে ইজিয়ান পর্যন্ত অগ্নিকান্ডের সূচনা করবে। যখন পূর্ব রুমালিয়া ১৮৮৫ সালে বুলগেরিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়, এবং সার্বরা তাদের ঘৃণিত প্রতিবেশীর আকস্মিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তড়িঘড়ি করে মারণাস্ত্র হাতে তুলে নেয় এবং স্লিভিৎসনার (Slivitzna) রণক্ষেত্রে বুলগেরিয়ার রাজা আলেকজান্ডারের হাতে পরাস্ত হয়, তখন গোটা ইউরোপে যুদ্ধের সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। কথিত সবাই জানতেন, অনেকে সঠিক না জানলেও সন্দেহ করতেন যে, অস্ট্রীয়দের প্রণোদনায়ই সার্বরা তৎপর হয়। আবার সবাই একটা ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে, রাজা আলেকজান্ডার (জন্মসূত্রে ব্যাটেনবার্গের প্রিন্স) ব্যক্তিগতভাবে রুশ জারের কাছে যতোই অপছন্দনীয় লোক হোন না কেন, বুলগেরীয়ারা ছিলেন রুশ সাম্রাজ্যের পেয়ারের মক্কেল। বুলগেরিয়া এবং সার্বিয়ার মধ্যেকার বিবাদ যদি বেশি দূর অগ্রসর হতে দেয়া হয় তাহলে এতটুকু বুঝতে কোনো বেগ পেতে হয় না যে এই বিবাদে উভয় দেশের পৃষ্ঠপোষকরা অবশ্যই জড়িত হয়ে পড়বে, সূচনা হবে ঘোরতর শত্রুতার এবং অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে প্রথম গুলি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে গোটা জার্মানি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এধরনের যুদ্ধ এড়ানোর জন্য বিসমার্ক সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করেন। কারণ তিনি মনে করেন বলক্যানদের জন্য পোমেরারিয়ান একজন পদাতিক সৈনিকের হাড়ও খরচ করা চলবে না। বিসমার্ক এই যুদ্ধ এড়াতে সমর্থও হন। তার কথা ভিয়েনায় পৌঁছে। একদিকে তিনি রুশদের উসকোখুসকো পালক মসৃণ করেন অপর দিকে তিনি অস্ট্রীয়দের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেন নি। তার কৌশল ও দক্ষতাকে ধন্যবাদ জানাতে হয় এ জন্য যে বড়ো ধরনের আলোড়নের সৃষ্টি হয়নি, বুলগেরীয় সংকট নিঃশব্দে উত্তীর্ণ হয়। বিশ্রী ধরনের একটি ক্ষুদ্র অভিযানের অতি দ্রুত অবসান ঘটে। বুলগেরীয় বিবাদপূর্ণ শূন্য সিংহাসন বিনা ফ্যাসাদে পূর্ণ করা হয়। প্রিন্সলি জার্মানির অফুরন্ত উৎস থেকে একজন নৃপতি নির্বাচিত হন, এই নৃপতি ভিয়েনার কাছে গ্রহণযোগ্য, সেন্ট পিটার্সবুর্গের কাছেও সে বদ্ধমূল ঘৃণার পাত্র নন। তিনি ছিলেন দীর্ঘ-নাসা, দীর্ঘমুন্ডুবিশিষ্ট পক্ষীপ্রেমিক কোরবুর্গের ফার্দিনান্দ, "বলক্যান অঞ্চলের ধূর্ত ব্যক্তি, "যিনি শেষ পর্যন্ত বুলগেরীয় জনগণকে মহাযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেন, বুলগেরিয়া যুদ্ধে পরাজিত হয়। তার চাতুর্য এবং সূক্ষ্মতা কোনো কাজে লাগেনি।

এটি-গ্যালিক্যান সন্ধিসমূহের বাইরে ইংল্যান্ড তার 'চমৎকার বিচ্ছিন্নতা' বজায় রাখে। কোনো সরকার, তা সে লিবার‍্যাল কিংবা রক্ষণশীল হোক, ইংরেজদের মহাদেশীয় ঝামেলায় জড়াতে পারেনি। দ্বীপটি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে, তার মনোভাব বোঝা যায় না, উপরন্তু

মহাদেশীয় লোকেদের কাছে দ্বীপটিকে একই সঙ্গে উদ্ধত এবং হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হয়। ইংল্যান্ডের লক্ষ্য ইউরোপীয় কেন্দ্রভূমি থেকে বহুদূরে নিবদ্ধ। মাত্র কয়েকজন ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করে। অস্ট্রেলেসিয়া এবং কেপে তাদের প্রভাব ছড়ানো ছিটানো। জার্মানদের পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে বলা সম্ভব নয় ইংরেজদের এই কাঠামো কতোটা শক্ত। ইংরেজদের বাণিজ্য, নৌবাহিনী, সাম্রাজ্য জার্মানরা মেনে নিতে বাধ্য, কিন্তু কি আপতিক ঘটনার ভেতর তারা এসব অর্জন করেছে, এই সুখী, স্বচ্ছন্দ-গতি দস্যুর দল এসব রক্ষা করে চলেছে! মনে হয় জার্মনরা শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত : ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে রুশদের শত্রুতা ক্রয় করতে হবে; ইংল্যান্ডের সঙ্গে যদি গোপনে সন্ধি করা হয় তাহলে রাশিয়াকে সন্ত্রস্ত না করেও ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে। এ রকম একটি কৌশল অনেক রাজনৈতিক জার্মানবাসীর কাছে পছন্দনীয়। বিসমার্ক এবিষয়ে ডিজরেলি, অতঃপর সলসবেরির সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখেন। কিন্তু ইংরেজরা বার বার জানিয়ে দেয় যে কোনো প্রকার গোপন সন্ধি তারা পছন্দ করে না। তারা বলে যে, যা কিছু ঘটুক না কেন তা পার্লামেন্ট এবং রানী ভিক্টোরিয়াকে জানাতে হবে। তাছাড়া ইংরেজ সরকারের উপর কিভাবে আস্থা রাখা যায়? আজ টোরি দলের সরকার, আগামী কাল লিবারাল দলের সরকার এবং সকল সময়ই নির্বাচকমণ্ডলীর খেলনার পাত্র! টোরি সরকারের কর্মকাণ্ডের জন্য লিবারাল দল কি জবাবদিহি করতে পারবে? সলসবেরি কূটনৈতিকভাবে সন্দেহভাজন আর বিসমার্ক বিশ্বাস করেন যে গণতন্ত্রের পক্ষে কাজের কাজ কিছু করা সম্ভব নয়।

ফলে বিসমার্কের জীবিতকালে জার্মানি এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে কোনো সন্ধি হতে পারেনি। এই লৌহ কঠিন চ্যান্সেলর যদিও ইংরেজদের বন্ধুত্বকে খুবই মূল্য দিতেন, ইংরেজদের বন্ধুত্ব তার কাম্যক্ষণীয়ও ছিলো (যদিও ব্যাপারটা তেমন বিজ্ঞাপিত করতে চাইতেন না) কিন্তু এমনকি কোনো টোরি সরকারের কাছ থেকেও তিনি এমন কোনো অঙ্গীকার আদায় করতে পারেন নি যাতে তিনি সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন। এদিকে সুদৃঢ় এবং গোপন অঙ্গীকার ছাড়া তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। আবার জার্মানি উপনিবেশিক শক্তি হিসেবে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ সূচিত হবার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। ইতিমধ্যেই বিবাদ চলছে ফিজি ও নিউ গিনি নিয়ে, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকা, জামাইকা এবং জাঞ্জিবার বিষয়ে। যদি রুশদের সঙ্গে জার্মানির সম্পর্ক ভালো থাকে তাহলে বিসমার্ক ইংল্যান্ডের সঙ্গে মাস্তানি করতে পারেন। ঐ দ্বীপবাসীদের হেনস্তা করা গেলে জার সরকার এবং জার্মান জনগণ অত্যন্ত প্রফুল্ল বোধ করেন। কিন্তু ইংল্যান্ডকে নিরাপদে খোঁচাতে হলে আগে রুশদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিশ্চিত করতে হবে। রুশো-জার্মান সম্পর্কে বরফের স্পর্শ লাগার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ড পুনরায় বিসমার্কের হৃদয়ে স্থান লাভ করে।

বিসমার্ক তবু নিরাপদ বোধ করেন না। ড্রাইকাইজারবান্ড এবং ত্রয়ী শক্তির মৈত্রী সত্ত্বেও, ইতালি ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বোঝাপড়া থাকতেও, উপরন্তু অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সার্ব ও রুমানীয়রা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলেও, ১৮৮৭ সালে রাশিয়ার সঙ্গে পুনঃ নিশ্চয়তা সন্ধি সম্পাদিত হলেও, বিসমার্ক সন্ত্রস্ত বোধ করেন। দুই রণাঙ্গনে যুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া তাকে সর্বদা তাড়া করে বেড়ায়। ক্ষমতার রাজনীতি সম্পর্কে এটি একটি বিষণ্ন ভাষ্য এই যে ১৮৮৭ সালে দীর্ঘ বিশ বছর স্বেচ্ছাচারী শাসন চালানোর পর বিসমার্ক রাইখস্ট্যাগে (সংসদে) হাজির হন। আশ্চর্য এই, এতকাল পর তিনি বোধ করলেন যে সাত শত হাজার সৈনিকের একটি বাহিনী গঠন করতেই হবে।

ফ্রাংকো-প্রুসীয় যুদ্ধের ব্যাপক উত্থান-পতনের পর যে বিশ বছর ব্যাপী বিসমার্কীয় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময়কার জার্মান জনগণের কৃতিত্বকে বাড়িয়ে দেখা দুরূহ ব্যাপার। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট উন্নতি সাধিত হয়, তবে জার্মান জাতির সংগঠন শক্তিকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। জনশিক্ষার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা বিজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। বিদ্যালয়গুলি ছিলো অত্যন্ত কার্যকর, বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো সংখ্যায় অনেক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের প্রেরণা কাজ করেছে অত্যন্ত বেশি। বিজ্ঞান ও শিল্পোদ্যোগের মধ্যে সুসমন্বয় ঘটালে যে সুফল পাওয়া যায়, তা জার্মানদের মতো দ্রুততা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এবং সার্বিকভাবে কেউ অর্জন করতে পারেনি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জার্মান জনগণের সহজাত সাংগঠনিক শক্তি কার্টেল (Kartells) প্রথার গোড়াপত্তন করে, এতে পণ্য মূল্য এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা সম্ভব হয়। বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র বিষয়ে প্রতি বছর পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে প্রচুর সংখ্যায়। ইউরোপের অন্য কোনো জাতি জার্মানদের মতো গুরুত্ব দিয়ে পড়াশুনা করেনি। সংগীতের ছড়াছড়ি ছিলো সর্বত্র — ফ্রান্সের চেয়ে সস্তা, ইংল্যান্ডের চেয়ে সার্বজনীন, এবং পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের চেয়ে উৎকৃষ্ট (ভিয়েনা বাদে)।

শিল্প বিপ্লব যে গুরুতর সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয় সে বিষয়েও জার্মানরা সমান সচেতনতার পরিচয় দেয়। নগর পরিকল্পনা, রসায়ন ও বৈদ্যুতিক শিল্পে তারা ছিলো অগ্রদূত। শিল্পায়িত ইংল্যান্ডের স্রষ্টারা কঠোর পরিশ্রম করে মৃত্যুবরণ করেছে জঘন্য বস্তিতে, অথচ এবিষয়েও জার্মানরা অগ্রিম সচেতনতা এবং পরিকল্পনার স্বাক্ষর রাখে। তাদের শহর ও শহরতলী গুলি গড়ে ওঠে সুন্দর পরিকল্পনা মাফিক, সুবিধাজনক অবস্থান এবং জনস্বাস্থ্যের সমস্যাও তারা পরিকল্পনার বাইরে রাখেনি। নতুন শহুরে প্রজন্ম এমন একটি জগতে জন্মগ্রহণ করে যে জগৎ তাদের গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলো।

এই তেজস্বী এবং বহুমাত্রিক সভ্যতায় দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করে যুদ্ধের চিন্তা। যুদ্ধ অনেকের কাছে ভয়ানক বস্তু, অনেকের কাছে অভিনন্দন যোগ্য। কিন্তু যুদ্ধের চিন্তা সবার মাথায় নিয়ত ক্রিয়াশীল। জার্মানিতে চলছে শান্তিপর্ব, তবে সে অতিরিক্ত সমর সম্ভারে সজ্জিত, অভ্যন্তরীণ অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগে আচ্ছন্ন। সে প্রতিবেশীদের ভয়ের চোখে দেখে, প্রতিবেশীরা তাকে ভয় করে চলে। বিসমার্কের কূটনীতি ইউরোপের আশংকা কমাতে পারেনি। একাধিকবার তিনি হুংকারের ভাষা ব্যবহার করেছেন, প্রদর্শন করেছেন প্রুসীয় ইস্পাতের ঝলক। ইংরেজ ও ফরাসিদের বিরুদ্ধে বার বার সরীসৃপ মুদ্রণ-মাধ্যম ব্যবহার করেছেন। বার বার চার পাশের পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে প্যাক্স জার্মানিকা জার্মান বাহিনীর বেয়নেটের উপর নির্ভরশীল। তার রাষ্ট্রবিদ জীবনের একটি প্রধান কলঙ্ক এই যে, তিনি অসদাচরণ এবং প্রতারণায় বিশ্বাস করতেন। তবে তার পক্ষে আমরা এ টুকু বলতে পারি যে তিনি জার্মানিকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেননি। তিন বার মহাবিপদের সংবাদ রটে। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তালগোল পাকানো অবস্থা গুছিয়ে ফেলেন। অন্যথায় হোয়েনযোলার্ন সাম্রাজ্য কোথায় হারিয়ে যেত। জার সরকার এবং ফরাসি প্রজাতন্ত্রের মৈত্রীবন্ধন, নৌশক্তির ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, এবং বলক্যান অঞ্চলে বিবাদের সূচনা এতটা গুরুতর ছিলো যে, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ভয়ানক হুমকির সম্মুখীন হয়, প্রকারান্তরে যা স্লাভ ও টিউটনিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে রূপান্তরিত হওয়া ছিলো অবশ্যম্ভাবী॥

বৃটেনের বিচ্ছিন্নতার অবসান

দ্বিতীয় উইলিয়ামের অভ্যারোহণকালে জার্মানি। কাইজারের চরিত্র। ফ্রাংকো-রুশ মৈত্রী। মহাদেশীয় ভারসাম্য ইংলান্ড। অ্যাংলো-জাপানিজ সন্ধি। অ্যাংলো-জার্মান আঁতাতের প্রশ্ন ইংলান্ডের প্রতি জার্মানির শত্রুতা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত প্রশ্ন। খনি আবিষ্কার। মজুরা। রুগার ও সিসিল রোডস। দক্ষিণ আফ্রিক্যান যুদ্ধ। বুয়ারগণ ও সন্ত্রস্ত কাইজার। জার্মানি কর্তৃক হাই সিস ফ্লিট নির্মাণ। মিশর—ইংল্যান্ড কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ। সুদান পুনর্বিজয়। ফাসোডা। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু। ভিক্টোরীয় যুগ। সন্ত্রস্ত এডওয়ার্ড। অ্যাংলো-ফরাসি আঁতাত।

সৈনিক ও কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্র, একটি সমাজ; যেখানে আধিপত্য সামরিক শ্রেণীর, একটি জনগোষ্ঠী, এখনো বিজয়ের নেশায় উন্মাতাল, একটি ইম্পিরিয়াল পার্লামেন্ট, সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হয় বটে, তবে সাত বৎসর পর পর সামরিক বাজেটের পক্ষে ভোট দিতে বাধিত হয় এবং একটি গুরুত্বহীন ও নির্যাতিত সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী থাকলেও, সরকারে কিছুমাত্র পরিবর্তন আনতে পারেনি, ছিলো প্রুসীয় পার্লামেন্ট, সংকীর্ণ মুষ্টিমেয়র ভোটে নির্বাচিত, এবং গুরুতর সংস্কার বিরোধী, সেই ১৮৫০ সালের প্রতিক্রিয়াশীল সংকটকালীন সময়ের মতো, এবং সর্বোপরি, সবার উপর দাঁড়িয়ে আছেন প্রভুত্ব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব বিসমার্ক। এটিই ছিলো জার্মান রাষ্ট্রের ও সমাজের দৃশ্য ১৮৮৮ সালের জুন মাসে, যখন দ্বিতীয় উইলিয়াম, একত্রিশ বছর বয়সের যুবক, পিতার শূন্য সিংহাসনে আরুঢ় হন। 'এই দেশে কেবল একজন প্রভু আছেন, এবং আমিই সেই ব্যক্তি,' তিনি সবাইকে সচেতন করেন। বিসমার্কীয় বংশের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার চেয়ে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের জন্য প্রস্তুত হন। ১৮৯০ সালের মার্চ মাসে, যে বছর অচেনা ওয়েলশ ব্যাপ্টিস্ট ডেভিড লয়েড জর্জ ওয়েস্টমিনস্টার এলাকায় প্রবেশ করেন, সে বছর বিসমার্ককে বরখাস্ত করা হয়। যে পাইলট দীর্ঘ আটাশ বছর রাষ্ট্র নামক জাহাজ পরিচালনা করেছেন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে আবেগের শাসনাধীন কাইজার রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কেড়ে নেন, এবং দেখতে পান যে জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ করছেন।

নতুন স্বৈরাচারী শাসক তাৎক্ষণিকভাবে ইউরোপীয় সমাজের জন্য একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও বিঘ্ন সৃষ্টিকারী শক্তি হিসেবে পরিচিত হন। তার কিছু প্রশংসার যোগ্য, তথা মেধাবী গুণাবলি ছিলো, সেটা প্রথমেই ঠাহর করতে পারা যায়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো বলিষ্ঠ এবং প্রশস্ত, তার নানাবিধ কৌতূহল ছিলো প্রগাঢ় এবং সর্ব ব্যাপক, ছিলেন বিপুল পরিশ্রমী, খুটিনাটি ব্যাপারে তার স্মৃতিশক্তি ছিলো প্রখর এবং যথাযথ।

তিনি ছিলেন ধার্মিক, কর্তব্যপরায়ণ, দেশপ্রেমিক এবং কখনো কখনো, বিশেষ যখন সমুদ্রের কথা বলতেন, প্রেরণাসঞ্জাত বাগ্মিতার পরাকাষ্ঠা দেখাতেন। এই সব সমুজ্জ্বল গুণাবলির সঙ্গে মিশে যেত নিচু মানের খাদ, বাজে অহংকার, লাগামহীন মেজাজ, নাটকীয়তার মোহ, যা তাকে বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে। তার মধ্যে পরশ্রীকাতরতাও ছিলো। এতে তিনি পরিণত হন নিন্দার পাত্রে। চাটুকারিতায় পুলকিত হবার জন্য তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত, তা সে চাটুকারিতা যতো নিম্নমানের হোক। চূড়ান্ত বর্বরতাও তিনি আর্কস্মিক উন্মত্ততার প্রকোপে রাজকীয় অনুমোদন প্রদান করতেন। তিনি অল্পতেই উত্তেজিত হতেন, তার মধ্যে ছিলো গভীর আবেগপ্রবণতা। এতে হয়তো তার সঙ্গ সব সময় খারাপ লাগতো না, তবে এর জন্য তিনি বিপজ্জনক শাসকে পরিণত হন। অতএব দেখা যায়, এই সম্রাট অনেক সতর্কতা ও প্রমোদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পর, মন্ত্রীরা ভয়ে-ভয়ে নিজেদের কাছে প্রশ্ন করেন, গোঁয়ার ও বালস্বভাব জার্মানির এই প্রভু বস্তুত উন্মাদরোগগ্রস্ত কি-না।

সম্রাট কাইজারকে যুদ্ধবাজদের কাতারভুক্ত করা অন্যায় হবে। উইলিয়াম তার দেশে দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর শান্তি বজায় রাখেন। প্রতি বছরের গোড়ার দিকে তিনি প্রুশিয়ান ল্যান্ডট্যাগে (আইনসভা) ভাষণ প্রদানকালে শান্তির পক্ষে ঘোষণা দেন। তার এই ঘোষণায় আন্তরিকতার অভাব ছিলো বলে মনে হয় না। অন্তত সে রকম সন্দেহ করার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার দরবারের আবহ ছিলো সমরবাদের ধুয়ায় আচ্ছন্ন। কাইজার কখনো ভুলতে পারতেন না যে তিনি সর্বোচ্চ সমরনেতা। সৈনিক ও নাবিকদের সমাবেশে অসংখ্য বক্তৃতায় তিনি জাতির সামরিক উৎসাহ-উদ্দীপনা উস্কে দেয়া কর্তব্য বলে জ্ঞান করতেন। তার ভাষার অসংযত রূপ, তার কর্মকাণ্ডের বিশৃঙ্খলা, লাগামহীন ও অপরিমিত উচ্চাভিলাষের হাজারো ইংগীত ইউরোপের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে এবং এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ সুস্থিরভাবে ও সহজে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

বিসমার্কের পতনের পর একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত প্রবীণ চ্যান্সেলরের কূটনীতির প্রধান লক্ষ ছিলো এ ধরনের সন্ধি প্রণয়ন ঠেকানো। দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠার পর, ফ্রান্স রাশিয়ায় বিশ্বস্ত মিত্র খুঁজে পায়। এই যে একটি দেশ, রাশিয়া, যুদ্ধ সামগ্রীর প্রয়োজন তার খুব বেশি, ফ্রান্স তাকে সরবরাহ করার জন্য ইচ্ছুক ও দেশের রেলপথের জন্য অর্থের যোগান দিতে প্যারিস প্রস্তুত (বার্লিন নয়), এবং বলকান অঞ্চলের সম্ভাব্য ঘটনাবলির কারণে (যেহেতু রুশ সম্রাট জারকে ১৮৮৮ সালে জানানো হয় যে নয় বৎসর আগে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে গোপনে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে) সে একজন বন্ধু খুঁজছে, মধ্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সমর সজ্জার ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য। যদিও ইউরোপের কোনো অঞ্চলে ১৭৮৯ সালের নীতিমালা রুশ সাম্রাজ্যের চেয়ে বেশি অবহেলা করা হতো না, তবুও ফরাসিরা রুশ ভল্লুকের আলিঙ্গন উপেক্ষা করতে পারে না। চুক্তির একটি রূপরেখা ১৮৯১ সালে স্বাক্ষরিত হয়। ১৮৯৪ সালের ৪ জানুয়ারি সম্পূর্ণ হয় গোপন সামরিক বোঝাপড়া। এতে বলা হয় যে জার্মানি এই দুটি দেশের যে কোনোটির বিরুদ্ধে আক্রমণ সূচনা করলে অপর দেশ বিরাট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসবে সহায়তা করার জন্য। দলিলে উল্লেখ করা হয় যে, দু'টি দেশের জেনারেল স্টাফ নিয়মিত সলাপরামর্শ এবং মত বিনিময় করবে। কি যুদ্ধ কালে কিংবা শান্তিকালে। ত্রয়ী শক্তির কোনো একটি দেশ সৈন্য সমাবেশ শুরু করলেই

সংবাদ পাওয়া মাত্র ছাব্বিশ কোর দুটি সৈন্য সমাবেশে নিয়োজিত হবে। বস্তুত উক্ত দলিল ছিলো অত্যন্ত বাস্তব প্রকৃতির। একে সৈনিকের দলিল বলে অভিহিত করা চলে। "জার্মানির হাতে ফ্রান্স ১,৩০০,০০০ সৈন্য মোতায়েন করতে পারবে ; রাশিয়া সক্ষম হবে ৭০০,০০০ কিংবা ৮০০,০০০ সৈন্য। এই বাহিনীগুলো পুরোপুরি নিয়োজিত হবে দ্রুততার সঙ্গে। যাতে জার্মানিকে যুগপৎভাবে পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়।

জার্মানি, ইতালি ও অস্ট্রিয়া (এরা ত্রয়ী শক্তি গঠন করে) এখন রাশিয়া ও ফ্রান্সের দ্বৈতশক্তি সংঘের মুখোমুখি। দুটি পক্ষই সমর সম্ভারে সমৃদ্ধ, প্রতিটি পক্ষ শত্রুর কু-মতলব টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। তবে প্রকৃত সংঘর্ষের সময় কোন পক্ষ অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণিত হবে তা কেউ বলতে পারেন না। সম্ভাব্য যে, শক্তির ভারসাম্য যদি অনুরূপ এবং অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে তাহলে ইউরোপে শান্তি বজায় থাকবে। ইতিমধ্যে ফ্রাংকো-রুশ মৈত্রীর খবর যত্নের সঙ্গে গোপন রাখা হয়।

ইংল্যান্ড ছিলো মূর্তিমান হেঁয়ালি। সে কোনো পক্ষে যোগ দিলে শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। ইউরোপের দুটি মৈত্রী জোট যখন পরস্পরের মুখোমুখি তখন এই বিরাট নৌশক্তি যদি কোনো পক্ষে যোগ দেয় তাহলে শক্তির ভারসাম্য বলতে কিছু থাকবে না। এক পক্ষের আত্মবিশ্বাস চূড়ায় চেকবে, অপর পক্ষ ভুগবে নিদারুণ আশংকায়। ইংল্যান্ড দ্বৈত শক্তির পক্ষে যোগ দিলে জার্মানিতে স্নায়ু দৌর্বল্য শুরু হয়ে যাবে, তারা মনে করবে যে তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। রুশ দেশে শুরু হবে লক্ষ্যহীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ হঠকারিতা।

কাইজার ছিলেন রানী ভিক্টোরিয়ার নাতি। এই শ্রদ্ধেয় ভদ্রমহিলার প্রতি নাতি হিসেবে যোগ্য শ্রদ্ধা জানাতে তিনি সব সময় প্রস্তুত। অন্য কোনো তরফ থেকে নয়, মহারানীর কলম নির্গত তীব্র অথচ সস্নেহ ভর্ৎসনা তিনি বিনয়ের সঙ্গে মেনে নেবেন। কাইজার ইংরেজি ভাষা খুব ভালো জানতেন, ইংরেজদের মধ্যে তার আত্মীয় বন্ধু ছিলো অনেক। তিনি তার মাতৃমহীর দ্বীপকে প্রিয় ক্রীড়াক্ষেত্র গণ্য করতে পারেন। উইন্ডসর প্যালেসে আতিথ্য গ্রহণ, কস রেগাটাস পালতোলা নৌকোয় ভেসে বেড়ানো, ইংরেজ জেন্টলেমেনের ব্যাজ পরিধান, লন্ডন জনতার হর্ষধ্বনি উপভোগ, কিংবা কোনো ইংরেজ ভদ্রলোকের পল্লীর বাড়িতে আরামে বিশ্রাম নিয়ে তিনি গভীর সন্তোষ বোধ করবেন। তার স্বভাবের একটি দিক ইংরেজ ও ইংরেজ ভূমের প্রতি ভক্তিশীল, অপর দিকে তিনি তাদের ঈর্ষা করেন, এমনকি অপছন্দ করেন।

ইউরোপ মহাদেশ এখন দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি শিবিরে বিভক্ত। অতএব স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা করা যায় যে এই দ্বীপ সাম্রাজ্যের অনুকূল্য লাভের জন্য ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা শুরু হবে। আশ্চর্যের ব্যাপার, সে রকম কিছু ঘটেনি। কাইজারের রাজত্বের প্রথম চৌদ্দ বছরে অনুকূল্য লাভের প্রচেষ্টা শুরু হওয়া তো দূরের কথা, বৃটেনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করা হয়েছে তিক্ততার সঙ্গে, কখনো কখনো বিপজ্জনক বিরাগ প্রকাশ করেছে সম্মিলিত তিনটি মহাশক্তি : ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়া। এই ছিলো বৃটেনের প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনের চেহারা। এবং ব্যাপারটা এতোই বিপজ্জনক বলে বোধ হয় যে, ১৯০২ সনে ক্যানিং, পামারস্টোন, গ্লাডস্টোন, সলসবেরি, প্রমুখ কর্তৃক অনুসৃত পন্থা বিসর্জনের সঙ্গে পরিত্যাগ করে বেনজেমার সরকার অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে ; শুরু হয় গোপনে জাপানের সঙ্গে লেন-দরবার, অতঃপর প্রকাশ্যে দেশটির সঙ্গে সম্পাদিত হয় মৈত্রীচুক্তি।

যে দ্রুততার সঙ্গে জাপান নামক এশীয় এই দ্বীপটি ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান আত্মস্থ করে তা সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম পরম বিস্ময়। আমেরিকান কমোডর পেরি কর্তৃক জাপানে (১৮৫৪) পশ্চিম বিশ্বের সমরাস্ত্রের শক্তি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা দেখে আসার আগে, জাপান ছিলো মধ্যযুগীয় অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত। দুইশত আটাশটি ডেইমিও বা জমিদার, এবং তাদের বেতনভোগী সশস্ত্র লোকেরা (এদের সামুরাই বলা হয়) দেশটি শাসন করতেন। দেশে কোনো নৌ কিংবা গোলন্দাজ বাহিনী ছিলো না। গোলাবারুদ থাকার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ছিলো না বণিক শ্রেণী, জনশিক্ষার ব্যবস্থা কিংবা সর্বসাধারণের জন্য আইন-কানুন। জনগণের নৈতিকতা ছিলো ম্যাকবেথের সময়ের হাইল্যান্ড গোত্রের তাহলে কমোডর পেরির নাবিক দলের কেউ কি তখন কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে শতাব্দী অস্তাচলে যাওয়ার আগেই জাপান তার জমিদারি, জায়গিরদারি প্রথা বিলোপ করবে (১৯৭১-৩), কেন্দ্রীয় সরকার দাঁড়িয়ে যাবে, দেশে গঠন করা হবে নৌ ও স্থলবাহিনী, প্রণয়ন করা হবে আধুনিক ধরনের আইন-কানুন, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ; তাছাড়া একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ভূমিকা পালনের জন্য সর্ব প্রকারে প্রস্তুত হয়ে যাবে। অথচ মিকাডো মুটসুহিটোর (১৮৬৭-১৯১২) দীর্ঘ ও স্মরণীয় শাসনে এই অতি সাধারণ কাজগুলো সাধিত হয় অত্যন্ত দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে। ফলে ১৯০২ সালে ইংল্যান্ড যখন জাপানের মিতালি করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন, অর্থাৎ ইতিমধ্যেই দেশটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সবচেয়ে বড় নৌশক্তি হিসেবে পরিগণিত। বৃটিশ আদলে গঠিত নৌবাহিনী এবং জার্মান আদর্শ অনুসরণে সজ্জিত স্থলবাহিনীর সাহায্যে জাপান সংক্ষিপ্ত অভিযান চালিয়ে চৈনিকদের কাবু করে। জলে ও স্থলে সে এতোটা শক্তিশালী হয় যে, পশ্চিমী মেকানিজম এবং সামন্ত যুগের দুঃসাহসের সমন্বয় ঘটিয়ে সে এতোটা ভয়ানক হয়ে ওঠে যে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের তিন বৎসর পর রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়। ফলে গোটা প্রাচ্য উল্লাসে কম্পন শুরু করে, আর পাশ্চাত্যে হলুদ বিপদ সম্পর্কে বলাবলি শুরু হয় যায়, তারা অবাক হয় হলুদ মানুষদের কিনা কি সন্নিকটবর্তী।

বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস পুরোনো। ভারতের নিরাপত্তার কারণে ভয়, কন্সট্যান্টিনোপল সম্পর্কে ভয়, উপরন্তু আলাস্কা পাছে রুশ নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরে ঢুকে পড়ে, এসব দুটি দেশকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যথেষ্ট ছিলো। ইংরেজ গণতন্ত্রের রুশ স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের প্রতি বদ্ধমূল অবজ্ঞা তো ছিলোই। বরং অ্যাংলো-জার্মান আঁতাত বা মৈত্রীর কথা সহজে ভাবা যায়।

এ ক্ষেত্রে সুপ্রাচীন বদ্ধমূল কোনো অনীহা কাজ করবে না। ইংরেজ ও জার্মানরা একই টিউটনিক পরিবারের বংশধর। তারা যে ভাষায় কথা বলে তার ভিত্তি অভিন্ন, তারা অনেক সময়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। কোনো ক্যাথলিক শাসকের আনুগত্য স্বীকার করার চেয়ে ইংরেজরা বরং আহ্বান জানিয়েছে জার্মান রাজবংশের কোনো ব্যক্তিকে তাদের দেশ শাসন করার জন্য। তারা প্রথম জর্জের কুখ্যাত জার্মান ডিসপ্রেসকে গ্রহণ করে, দ্বিতীয় জর্জের বদ মেজাজ অনুপস্থিতি, তৃতীয় জর্জের জন্য সাদাসিধা জার্মান স্ত্রী এবং ভিক্টোরিয়ার জন্য সুদর্শন জার্মান স্বামী কবুল করে। রাজবংশীয় রাজপরিবার মতোই এখনো বহু ক্ষুদ্র দেশের মধ্যে আদান-প্রদান, আত্মীয়তিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক লেন-দেন চলে বাড়তে থাকে। জার্মানরা বৃটিশ পণ্যের সবচেয়ে বড় বিদেশী ক্রেতায় পরিণত হয়। ইংরেজরা পরিণত হয়

ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় বৈদেশী ক্রেতা। অনেক মেধাবী জার্মান প্রুসীয় সমরবাদ দ্বারা মুহ্যমান হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ইংল্যান্ড ছুটিয়ে পড়ে, গড়ে তোলে স্থায়ী আবাস, সুখ ও সমৃদ্ধির সন্ধানে। এই প্রত্যাখ্যাত জার্মানরা ইংল্যান্ডের তুলাশিল্পে সমৃদ্ধি অর্জনে প্রভূত সাহায্য করে। ম্যানচেস্টার ও লিভারপুল যথাক্রমে কাপড় ও ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য পায়। সাম্প্রতিক শতাব্দীতেও আমরা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখি। অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার* দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার পর (১৮৭১) টিউটনিক বিদ্যার সুর ধ্বনিত হয়েছে, বার্লিন ও গটিনগেনের সুখ্যাত অধ্যাপকরা ইংরেজদের মধ্যে দেখতে পেতেন অনেক ভক্ত। এই ভক্তরা তাদের সমধিক সভ্য অথচ অপেক্ষাকৃত কম বিদ্বান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ইংরেজ জ্ঞান বিজ্ঞানের বাস্তবসিকতা প্রচার করতেন।

উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে এটা বিস্ময়কর নয় যে কোনো কোনো বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞ 'চমৎকার বিচ্ছিন্নতা'র বিপদে বিহ্বল হয়ে জার্মানদের বন্ধুত্ব লাভের কথা ভাবছেন। উপনিবেশ সংক্রান্ত শক্তিশালী মন্ত্রী জোসেফ চেম্বারলেন (১৮৯৯, ২৯ নভেম্বর) বলেন, "সবচেয়ে স্বাভাবিক মৈত্রী হতে পারে আমাদের সঙ্গে জার্মান সাম্রাজ্যের।" (চেম্বারলেন ছিলেন সলসবেরি মন্ত্রিসভার সদস্য)। কিন্তু জার্মানরা ভাবতেন অন্য রকম। তাদের কাছে বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞ যে স্বাভাবিক মৈত্রীর কথা বলছেন তা অপবিত্র ও দূষিত বন্ধন ভিন্ন কিছু নয়। একটা সুন্দর ও অর্থপূর্ণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জার্মানির সর্বত্র জঘন্য চিৎকার ওঠে এবং প্রস্তাবটি মাঠে মারা যায়।

যে অনুভূতি এই অসাধারণ বিস্ফোরণ ঘটায় তার ইতিহাস অনুসন্ধান খুব কষ্টকর নয়। বিসমার্কের অনুলেখকের পাঠ প্রুসীয়রা অধ্যবসায়ের সঙ্গে মনে গেথে নেয়। তারা বিশ্বাস করে যে উদারবাদ হলো ইংরেজ বিষ। এটি উক্ত দ্বীপের আভিজাতিক গুণাবলি বিনষ্ট করার পর প্রুসীয়দের সবল গঠন ধ্বংস করার কথা ভাবছে। যে গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষগুলো জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে তা থেকে ইংরেজরা সব সময় দূরত্ব বজায় রেখেছে। তাদের সুচিন্তিত নিরপেক্ষতা থেকে কোনো সাহায্য মেলেনি। তারা সহানুভূতি প্রকাশ করে ডেনমার্কের প্রতি। কিছুটা অস্ট্রীয়দের প্রতি, এবং যখন মল্টকির কামান প্যারিসের সড়ক ও স্কোয়ারগুলোতে খেলা করছে তখন ইংরেজরা প্রকাশ্যে ও সহানুভূতির সঙ্গে ফরাসিদের পক্ষ নিয়েছে। এই অনুভূতি দ্বিতীয় উইলিয়ামের সময় আরো খারাপের দিকে যায়। নতুন সম্রাট বিসমার্কের এই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে পারেননি যে জার্মানি একটি পরিতৃপ্ত জাতি। প্রজারা আরো কম মনে করেছে। ১৮৯৩ সালে গঠিত প্যান-জার্মান লিগ যেখানে প্রস্তাব করে যে অস্ট্রিয়া, জার্মান সুইজারল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডকে জার্মান রাইখের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, সেখানে জার্মান সম্রাট তিনটি সম্ভাব্য নতুন প্রভাব বলয় চিহ্নিত করতেন। আর এই ক্ষেত্রগুলোতে তিনি ইংরেজদের বিরোধিতার আশংকা করতে পারেন। প্রথমটি হলো তুর্কি সাম্রাজ্য। দ্বিতীয় হলো উপনিবেশসমূহ, তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সামুদ্রিক জলভাগ। জার্মান জনগণের জন্য এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে অষ্ট্রীয় যুদ্ধোপযোগী নৌবহর নির্মাণ ছিলো কাইজারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিলাষ।

---

* সেকালে ঐ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার প্রথম শর্ত ছিলো গ্রীক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

ইংল্যান্ডেও অনুরূপ আত্মনির্ভরশীলতার অভাব সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এখানে সাম্রাজ্যবাদ স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এই সাম্রাজ্যবাদের পয়গম্বর জুডিয়াড কিপলিং, জোসেফ চেম্বারলেন এর প্রবক্তা। ভারতের পায়ে পায়ে আফ্রিকা চকচকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে শাসন ও বাণিজ্যের জন্য। মিশর, উগান্ডা এবং নাইজেরিয়ায় ইংরেজরা সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিক নিয়মেই তারা উৎকৃষ্ট জায়গাগুলোর নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে। তাদের উপনিবেশগুলো জার্মানদের চেয়ে উন্নত, ফরাসিদের চেয়েও, এদের দখলে রয়েছে তিউনিস, আলজেরিয়া এবং সেনেগাল, বেলজিয়ানদের চেয়েও উন্নত, এদের ভাগে পড়েছে কঙ্গোর বিশাল ভূ-খণ্ড। তবু ইংরেজরা সন্তুষ্ট নয়। ধারাবাহিকভাবে তারা ষাট, সত্তর ও আশির দশকে তাদের পরিধি সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে। পূর্বদিকে, পশ্চিমদিকে, এবং উত্তর দিকে কেপ কলনি থেকে এগিয়ে দু'টি বুয়ার রিপাবলিক পর্যন্ত। এই দুটি প্রজাতন্ত্র পুরানো ওলন্দাজ সভ্যতার মৌলিক ভাবধারা বজায় রেখেছে। বাদ গেছে শুধু ডেলাগোয়া উপসাগরে যাওয়ার পথ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এতদঞ্চলে চরম অবস্থায় পৌঁছে ১৮৮৯-৯১ সালে যখন সিসিল রোডস, ভাগ্যান্বেষী এবং সাম্রাজ্য নির্মাতা, রোডেশিয়া কুক্ষীগত করেন। কোনো জার্মান এ ঘটনাগুলো হিতকর নজরে দেখেননি।

তবু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজ জাতীয়তাবাদে তাদের দুর্বল স্থান খুঁজে পায়। কেপ কলনির ওলন্দাজ বসতিস্থাপনকারীরা সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। অভ্যন্তরীণ ভূ ভাগে তাদের ছাড়িয়ে পড়তে দেখা যায় না। আরো, কেপ কলনির ওলন্দাজরা যদিও বৃটিশদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে শেখেন, তবে তারা ছিলেন আন্তরিক প্রজাতন্ত্রী, তারা এমন একটা সময়ের জন্য অপেক্ষা করছেন যখন কোনো রকম হিংস্র পন্থা ব্যতিরেকে বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদলে সূচনা করা যাবে ফেডারেল রাষ্ট্রের, দক্ষিণী ক্রসের অধীনে চমৎকার স্বাধীন অবস্থায়। এ ধরনের কাগুজে অনুভূতিতে বিবাদের গন্ধ পাওয়া যায় কেপ কলনির উত্তরাঞ্চলের ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্র দুটির মনোভাবে।

১৮৩৬ সালে একদল ওলন্দাজ কৃষক বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকার দরুন কেপ কলনি থেকে উঠে এসে গঠন করে দুটি প্রজাতন্ত্র, ভাল নদীর উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে (এখানে বৃটিশ সরকার ক্রিতদাস প্রথার বিলোপ সাধন করে ক্রিতদাস মালিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না করে)। এই সব সূর্যকরোজ্জ্বল ও মজাদার উচ্চ ভূমিতে বুয়াররা শিকার করে বেড়ায়, গড়ে তোলে খামার, বেত্রাঘাত করে ক্যাফিদের, পাঠ করে বাইবেল। বুয়াররা কক্ষ্য, পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী। তারা উনবিংশ শতাব্দী নয়, সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। তারা তাদের মুক্ত আলো-হাওয়ার নির্জন জগৎকে অনেক ভালো মনে করে। শহরের বাড়তি লাভ তারা চায় না, শহুরে জীবনের আনন্দ-ফূর্তি তারা কামনা করে না। অতঃপর আফ্রিক্যান সমাজের সহজ সরল কাঠামোয় একটি গুরুতর জটিলতা জায়গা করে নেয়। প্রথমে আবিষ্কৃত হয় হিরক (১৮৬৯-৭০), অতঃপর স্বর্ণ (১৮৮৫)। যে জায়গায় প্রচুর পরিমাণে হিরকের সন্ধান পাওয়া যায় পরবর্তীকালে তার নাম হয় কিম্বার্লি, স্বর্ণ আবিষ্কৃত হয় ট্রান্সভাল রাজ্যের সীমানার মধ্যে। নির্দিষ্টভাবে জায়গাটির নাম হয়েছে জোহানেসবার্গ শহর। এই শহর এখন প্রভূত সম্পদশালী। সমতল, নিষ্পাদপ তৃণভূমির (veldt) নির্জনতায়, যেখানে জীবন গরুর গাড়ির গতিতে চলার অভ্যস্ত ছিলো, আকস্মিকভাবে দলে দলে আগমন ঘটে শহর জীবনে

অভাগত ভাগ্যান্বেষীদের, তারা সঙ্গে নিয়ে আসে কোলাহল, বিলাসিতা এবং শাহরিক ইউরোপের প্রযুক্তি। আমরা সহজে অনুমান করতে পারি জগতের বৃহত্তম স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় ট্রান্সভালের কৃষিজীবী শাসকরা কি অসুবিধার সম্মুখীন হন।

এদিকে, সোনার খোঁজে পড়ি কি মরি বেগে ছোটার আগে, একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য দুটি শ্বেত জাতির মধ্যে উত্তেজনাকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৮৭৭ সালে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির কারণে ডিজরেলি র‍্যান্ড দখল করেন, আবার গ্লাডস্টোন ১৮৮১ সালে উক্ত ভূখণ্ড বুয়ারদের ফেরৎ দেন। এটি ঘটে মুজাবা হিলে বৃটিশ বাহিনীর গুরুতর পরাজয় বরণ করার মুহূর্তে। বিজয়ের পর উদার হওয়া বিজ্ঞতার লক্ষণ, কিন্তু পরাজয়ের মুহূর্তে ঔদার্য বিলট ঝুঁকি বহন করে। অজ্ঞ বুয়াররা শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা থেকে মহানুভবতা প্রদর্শনকে ভীরুতা ও দুর্বলতা হিসেবে ব্যাখ্যা করে। অতঃপর বুয়াররা ইংরেজদের অবজ্ঞা করতে শুরু করে। আর ইংরেজরা অবজ্ঞা সয়ে এবং পরাজয়ে দিশেহারা হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে বুয়ারদের আত্মশক্তির প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা যায় না।

দুজন অসাধারণ ব্যক্তি, একজন ওলন্দাজদের পক্ষে, অপর জন বৃটিশ জাতির পক্ষে, দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণ করেন। ক্রুগার, বুয়ার প্রজাতন্ত্রী ; রোডস, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী। ছেলেবেলায় ক্রুগার অন্যান্যদের সঙ্গে কেপ কলনি থেকে দূর পদযাত্রায় শরিক হন। তাঁর গুলি ছোড়ার দক্ষতা, তার ঘোড়া ও গরু পালনে সাফল্য, তার বিরাট সামর্থ ও শারীরিক শক্তি, তাকে সেই কম বয়সেরই খ্যাতি এনে দেয়। পূর্ণ বয়সে তার উন্নতি নিশ্চিত হয় কঠোরতা, সহিংসতা, প্রচণ্ডতা, ধার্মিকতা ও কৌশলের জন্য। কৃষিজীবীসুলভ সুন্দর কৌতুকপ্রিয়তা, এবং ধর্মব্যাখ্যামূলক বাগ্মিতা, তার জাতির প্রতি ঐশ্বরিক ভালবাসায় গভীর বিশ্বাস, (যেন ঈশ্বরই তার জাতিকে পরিচালনা করেন) তার রুক্ষ চরিত্রের প্রতি বাড়তি আকর্ষণের সৃষ্টি করে। প্রিটোরিয়ার তার সাধারণ মানের কুটিরের বারান্দায় (stoep) বসে যখন তিনি পাইপের ধুয়া ছাড়েন, কথা বলেন ব্যাক-ভেল্ট বুয়ারদের সঙ্গে, তখন তাকে প্রজাতান্ত্রিক সরলতার প্রতিমূর্তি মনে হয়। তবে দেশের (Rand) লুক্কায়িত সম্পদ তাকে অবিচল রাখতে পারে না। তার নবগঠিত প্রজাতন্ত্রের জন্য স্বর্ণ যে কি কাজ দেবে তিনি তা উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি বোঝেন খনি থেকে উপার্জন দিয়ে রেলপথ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, বাহিনী সজ্জিত করা যায় সমর সম্ভারে, হয়তো এক সময়, অগণন তরুণদের ইচ্ছানুসারে, বৃটিশদের উৎখাত করে নিক্ষেপ করা যাবে সমুদ্রে। বর্তমানে তিনি আত্মরক্ষার নীতিতে বিশ্বাসী। জোহানেসবার্গের বিদেশী সম্প্রদায় (Uitlanders) প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করায় তিনি নিশ্চিত হন যে এই ধনাঢ্য ও শক্তিশালী লোকেরা বৃটিশ সরকারের সহায়তায় ষড়যন্ত্র করছে তার রাজ্য উৎখাত করার জন্য।

সিসিল রোডস (১৮৫৩-১৯০২) ইংল্যান্ড ও অক্সফোর্ডের সকল সুবিধা ভোগ করেন। ছিলেন উদার মনের মানুষ। সুঠাম শরীর। বুয়ারদের মতো তিনিও দেশটিকে ভালোবাসতেন। যদি তিনি তার প্রচেষ্টার সিংহভাগ ব্যয় করে থাকেন অর্থ উপার্জনের জন্য, তবে টাকা কামানোই তার মূল লক্ষ নয়, টাকা দিয়ে ক্ষমতা ও প্রভাব ক্রয় করা যায় বলে অর্থের পেছনে ছোটেন। কম বয়সে তিনি স্বপ্ন দেখতেন জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন স্কলারশিপের বৃহৎ পরকল্পনা গ্রহণ করে। এতে ইংরেজ ও আমেরিকানদের মধ্যে মিলন ঘটবে অক্সফোর্ডের পবিত্র চত্বরে, ছাত্রদের জীবনের সহজতরল অধ্যায়ে। এই স্বপ্ন তিনি সংশোধন

করেন, সম্প্রসারণ ঘটান, স্পষ্ট রূপ দেন। তিনি এই স্বপ্ন দ্বারা তাড়িত হন সারাজীবন। সবশেষে বাস্তবায়িত করেন শিক্ষাক্ষেত্রে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করে। তিনি অন্যান্য বহিরাগতদের (Uitlander) থেকে ভিন্ন চরিত্রের ছিলেন। তিনি ছিলেন না যাযাবর পাখি। তিনি বাস করতেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, কাজও করতেন দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিলো শ্বেত জাতির দুটি শাখা মিলে-মিশে বসবাস করুক। ওলন্দাজদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো গভীর ও অকৃত্রিম। এদের মধ্যে ছিলো এক ধরনের ধীর সরলতা, যা তিনি নিজের মধ্যে খুঁজে পেতেন। হৃদপিণ্ডের অনিয়মের জন্য তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েন। বহিরাগতদের দাবি–দাওয়া নিয়ে বিরতিহীন চিৎকার, ন্যায়সংগত সংস্কার ঠেকানোর জন্য প্রেসিডেন্টের প্রচণ্ড জেদ, তার সুস্থির বিচারবোধ প্রভাবিত করে। এক বিপর্যয়কর মুহূর্তে তিনি ট্রান্সভালে আক্রমণ অনুমোদন করেন। আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করেন জেমিসন। লক্ষ্য : প্রজাতন্ত্র-উৎখাত এবং দেশটিকে ইউনিয়ন জ্যাকের অধীনে ন্যস্ত করা। বৃটিশ সরকার বৃথাই এই আক্রমণের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার এবং নিন্দা করেন। যা ক্ষতি হবার তা কিন্তু হয়ে যায়। জাতিগত বিভেদের আবেগে দেশটি প্লাবিত হয়। ক্রুগারের জ্বালাময় এবং দুর্দমনীয় নেতৃত্বে ব্যাপারটা সার্বিক যুদ্ধের রূপ নেয়। নতুন হাই কমিশনার স্যার আলফ্রেড মিলনার সংস্কার কর্মের জন্য চাপ দেন। তার দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। সে সময় তরুণ বুয়াররা যে মারমুখো মেজাজের পরিচয় দেন তাতে বোঝা যায় তখন শান্তি বজায় রাখা কতোটা অসুবিধাজনক ছিলো। এই ব্যাপারটা সম্প্রতিকালে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

বহিরাগতদের নিদারুণ ক্ষোভের প্রতিবেদন লন্ডনের পত্রপত্রিকাগুলোতে ফলাও করে প্রচারিত হলেও, তা বৃটিশ গণতন্ত্রের শক্তিকে উত্তেজিত করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয়নি। এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের কেউ জোহানেসবার্গে বসতি স্থাপন করতে আহবান জানায়নি। কেউ তাদের প্রত্যাহারে বাধা দেয়নি। তারা ট্রান্সভালে পদপাত করে স্রেফ অর্থ উপার্জনের জন্য। তাছাড়া প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনেক 'ত্রুটি' থাকা সত্ত্বেও তারা অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয়। অনেক সময় তারা উপার্জন করে ব্যাপক হারে। দক্ষিণ আফ্রিকার খনি অঞ্চলের বিবাদ নিয়ে বৃটিশদের মাথা ঘামানোর কথা নয়। কিন্তু বর্তমানে যে বিবাদ সূচিত হয় তা স্থানীয় প্রকৃতির ছিলো না। সন্দেহ করা হয় প্রেসিডেন্ট ক্রুগার রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার করছেন বৃটিশ বিরোধী ব্যাপক ষড়যন্ত্রে অর্থ যোগানোর জন্য। শুধু কি তাই, তিনি এ ব্যাপারে জার্মানদের সহানুভূতি লাভ করেছেন। এমনকি তিনি জার্মান রাইখের সমর্থন আশা করতে পারেন। ফলে জেমিসনের পরাজয়ের অনতি পর জার্মান সম্রাট কাইজার যখন ক্রুগারকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম করেন তখন ইংল্যান্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে। কাইজারের হস্তক্ষেপকে অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর বলে গণ্য করা হয়। এটি যা ঘটেছে তার জন্য খারাপ। যা ঘটার আশংকা দেখা দিয়েছে তার জন্য ততোধিক অমঙ্গলজনক। ভাগ্য ভালো, লন্ডনে তখন জানা ছিলো না যে কাইজার হঠকারিতার আশ্রয় গ্রহণ করে একটা চরমপত্রের খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন, যা জনৈক রাষ্ট্রদূত বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে যথাস্থানে প্রেরণ করতে অস্বীকার করেন। লন্ডনে এ বিষয়টাও অজ্ঞাত ছিলো যে কাইজারের সরকার ইংলান্ডের

হকছে মহাদেশীয় জোট গঠনের জন্য ষড়যন্ত্র করছেন। তবে উক্ত জোটের পরিকল্পনা ভেঙে যে ফরাসিদের ঔদাসীনতার কারণে।

নীচ তিনটি বছর চলে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিবাদ গুরুতর যুদ্ধের রূপ নেয়। যদিও এই যুদ্ধের কারণে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল থেকে স্বেচ্ছাসেবীরা এসে দলে দলে যোগদান করে সেখানে মূল সৈন্যকে সাহায্য করার জন্য, তবে এতে অর্থ ভাণ্ডারে ভীষণ টান পড়ে এবং মহাদেশীয় সামরিক পর্যবেক্ষকরা বৃটিশ বাহিনীর নানা ত্রুটি ও ঘাটতির বিষয় উল্লেখ করেন। যদিও বৃটিশ পক্ষ নয়, বুয়ররা যুদ্ধের ঘোষণা দেয়, তবে দেখা যায় মহাদেশীয় সহানুভূতি প্রজাতন্ত্রী সরকারের বাহিনীর অনুকূলে। যে দক্ষতা, ধৈর্য এবং সাহসিকতার সঙ্গে বুয়ররা কয়েকটা একটা বিরাট সাম্রাজ্যের পেশাদার সৈন্যদের প্রতিরোধ করে তা সার্বজনীন প্রশংসা কুড়ায়। দূরের পর্যবেক্ষকরা বোধ করেন যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে সরলতা ও বিলাসিতার মধ্যে, স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের মধ্যে, সর্বোপরি সৃষ্টিকর্তা এবং অর্থলিপ্সার দেবতার (Mammon) মধ্যে। বুয়রদের প্রতিটি বিজয় অভিনন্দিত করা হয় উক্ত উৎসাহের সঙ্গে, তাদের যে কোনো বিপর্যয়ে তুলনীয় হতাশা ও বিক্ষুব্ধতা প্রভাব বিস্তার করে। জার্মানি এবং ফ্রান্সে বৃটিশ বিরোধী স্রোত ফুসে উঠে। এমন কি রুশ দেশের জার (যে সরকার কোনো অর্থে মানব মুক্তির আদর্শ হিসেবে গণ্য নয়) ঐ জনন্দিত এবং একগুঁয়ে দ্বীপের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় জোট গঠনের প্রস্তাব করেন।

তথাপি ইউরোপের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা নেই। ইংলন্ডের প্রতি যে বৈরিভাবের সৃষ্টি হয়েছে তাতে দেশটির বিরুদ্ধে তখন কোনো যুদ্ধের সূচনা করা যায়। কিন্তু রবার্টস ও কিচেনার যখন বৃটিশ বাহিনীর প্রথমিক বিপর্যয়ের প্রতিকার করেন এবং বুয়রদের প্রতিরোধ ভেঙে দেন, তখন তা শুধু নিরবে পর্যবেক্ষণ করা একঘরে কাত হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপ মহাদেশের কোনো শক্তি, মহাদেশীয় কোনো জোটের বৃটিশ নৌবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা নেই। পরিস্থিতি সমুদ্রে নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন, সাম্রাজ্যিক ভূলভাগ বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় অন্যদের যে কি অসুবিধা, ইউরোপ মহাদেশ এখনো পরিষ্কারভাবে অতীতে উপলব্ধি করতে পারেনি। এই শিক্ষা কাইজার ও তার উপদেষ্টাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। টিরপিৎস নামের জনৈক জার্মান তরুণ অফিসার এতে সবার চেয়ে বেশি প্রভাবিত হন। তিনি জেমিসনের আক্রমণের সময় এদিকে এসে ছাইটস ড্রিফ নির্যাতনের পক্ষে জোর দিয়ে ওকালতি করেন। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধের কারণে জার্মানিতে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, ফ্রান্সবিরোধী প্রজাতন্ত্রী জারতন্ত্রী-জার্মান মৈত্রীর পথ নিশ্চিতরূপে অবরুদ্ধ হয়, দ্বিতীয়ত, এই প্রতিটি জার্মানদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে একটি প্রথাগত নৌবহর নির্মাণ করতে হবে, যে নৌবহর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৌবহরের ছত্রাগুলি তীরের সন্ধার করতে পারবে। বুয়র যুদ্ধের শিক্ষা হৃদয়ে রেখে সম্রাট কাইজার সমরসজ্জা শুরু করেন তার দ্বিধা প্রকাশ বাতাবরণের কারণ। যদি তিনি সঠিক উপলব্ধি করেছিলেন যে ইংল্যান্ডের অস্তিত্বের নির্ভর করে সমুদ্র পথে সাম্রাজ্যের উপর, তাহলে উত্তর সাগরে ইংলন্ডের সমকক্ষ শক্তিশালী নৌবহরকে সে তীব্র অস্তিত্বের জন্য বিপজ্জনক বলে গণ্য করবে। কাইজার বিবেচনা করেন যে তার দ্বিধা প্রকাশ জোরে প্রথার ইংরেজদের আন্তরিক কামনায়, তার ব্যক্তিগত মর্যাদার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এবং জোরে প্রথার কূটনৈতিক জন্য ইংরেজদের জন্য উপযোগী নয়। ইংরেজ পছন্দ করতে তার সমালোচনা সমস্ত সমস্যার পথে

এগোতে হবে। অতএব তিনি কয়েকটি নৌবাহিনী সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করেন। আর এইসব বিল পাস করতে হলে দেশের জনগণের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব চাঙ্গা করতে হবে মহাদেশীয় শক্তির ভারসাম্য বিবেচনায় এ ধরনের পদক্ষেপ যে খোদ জার্মানির জন্যই বিপজ্জনক তা কাইজারের তেজস্বী অথচ নিয়ত পরিবর্তনশীল মনে একবারও উদয় হয়নি।

১৮৮২ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডকে বিভক্ত করা মিশরের জন্য ছিলো জটিল সমস্যা। ইংল্যান্ড ভাগ্যের ফেরে পড়ে। ফরাসিরা এই ভাগ্যকে নিদারুণ দুর্ভাগ্য এবং বিড়ম্বনাকর বলে রায় দেয়। এর জন্য ইংল্যান্ড এমন একটি জায়গায় হস্ত প্রসারিত করে, যে জায়গা ফরাসিরা বিশেষভাবে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছে। নেপোলিয়ন ইউরোপের জন্য মিশর উদ্ধার করেন। মেহমেত আলি, নেপোলিয়নের ভক্ত ও শিষ্য, মিশরকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন ; প্রতিভাবান ফরাসি প্রকৌশলী দা লেসেপস ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খনন করেন। এই তিন জনের বিরোধিতা করে ইংরেজরা। কিন্তু ফরাসিরা নয়, ইংরেজরা ১৮৭৫ সালে খেদিবের মালিকানা অংশ ক্রয় করে। এতে সুয়েজ খালের উপর ইংরেজদের প্রভুত্বশীল নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। আবার ইংরেজরাই কায়রো থেকে মিশরের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণ শুরু করে ১৮৮২ সাল থেকে। এসবের জন্য ফ্রান্স শুধু নিজেদের ধন্যবাদ জানাতে পারে। বিসমার্কের উস্কানিতে তারা ইংরেজদের সঙ্গে একযোগে মিশরের বন্ড মালিকদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। দু'টি শক্তি অমিতাচারী খেদিব ইসমাইলকে উৎখাত করে, এবং প্রতিষ্ঠিত করে যুগ্মশাসন, দেশটির বিপর্যস্ত আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য। উক্ত যুগ্ম দায়িত্ব পালন থেকে ফরাসিরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। মিশরীয় বাহিনীর অসন্তুষ্ট কর্নেল আরাবির বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব ইংরেজদের একাই পালন করতে হয়। তাছাড়া ক্ষমতাচ্যুত খেদিবের শাসনামলের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক জট তাদের একক দায়িত্বে খুলতে হয়। এটি একটি বিকট পরিস্থিতি। গ্লাডস্টোন-এর লিবারেল সরকার কোনো প্রকার ইম্পিরিয়াল অঙ্গীকার পালনে আগ্রহী নয়, বরং প্রথম সুযোগেই মিশর থেকে হাত গুটিয়ে নিতে তিনি ইচ্ছুক। অথচ সে নিল নদ অঞ্চলের কাজায় কঠিনভাবে নিমজ্জিত হতে বাধ্য হয়। এদিকে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কোনো নৈতিক দ্বিধা নেই, মিশরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগেও আপত্তি নেই, সে হঠাৎ দুর্বলচিত্ত দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মিশরের কাদামাটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির জন্য রেখে বিদায় গ্রহণ করে।

মিশর দেশটি যদি স্থায়ীভাবে দখল ইংরেজ লিবারেলদের কাছে নিতান্ত অরুচিকর ঠেকে থাকে, তাহলে সুদান দেশটি জয় করার জন্য কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করাকে তারা সর্বাধিক রুচিহীনতা মনে করে। লিবারেলরা চায় শান্তি, ব্যয়সংকোচ এবং সংস্কার। অচেনা পোকামাটিতে গোঁড়া দরবেশ দলের মোকাবেলা করার জন্য সামরিক অভিযান মোটেই উক্ত নীতিমালার সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু মিশরের নতুন শাসকেরা একটি ভূ-খণ্ডের মুক্তাঞ্চলের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না যে ভূ-খণ্ড তাদের জাতীয় পতাকার অধীন। উক্ত ভূ-খণ্ডে রয়েছে সেনা ছাউনি। এই সেনা ছাউনিগুলোর জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি বিশাল আয়োজন। এ ধরনের আয়োজন মাঝে মাঝেই মোটা মুনাফার অপপ্রচারে আয়োজিত হয়ে। কর্তাদের জন্যে এ নিষ্পত্তিজনক বৈপ্লবিক উদ্যমের পেছে অনেক যোক্তিকতা আছে। তাঁরা ভাবেন লোকে নির্ভরযোগ্য। যদি ১৮৮৯ সালে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বা ফেডারেল হেড ঘোষণা করেন ; সারা বিশ্ব জয় করার আগে একজনকে বলে তিনি প্রোক্লেম করেন।

একটা দুর্বল মিশরীয় বাহিনী করডোফানের অরণ্যে নালায়েকের মতো হাজির হয়। বরণ করে চূড়ান্ত পরাজয়। আর উক্ত পরগম্বর ভোগ করেন নিরঙ্কুশ জয়ের আনন্দ। এদিকে যেহেতু মিশরীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জনৈক ইংরেজ হিক্স পাশা, ফলে বৃটিশ সরকারের জন্য একটা হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উক্ত প্রদেশ থেকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক হবে, মিশরীয় ছাউনিগুলো নিরাপদে গুটিয়ে ফেলাও সম্মানজনক। প্রথম কাজটি করা মোটেই অসুবিধাজনক নয়। তবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেনা ছাউনিগুলো প্রত্যাহার একটু কঠিন। অন্তত খরচ বাঁচিয়ে, দুঃসাহসিক অভিযানে না গিয়ে কাজটি কিভাবে করা যায় তা বাৎলে দেয়া বিজ্ঞতম ব্যক্তির জন্যও সমস্যা।

একটি দুর্ভাগ্যজনক মুহূর্তে বৃটিশ সরকার 'পলমল গেজেটে'র পরামর্শে কান পাতে। এই পত্রিকা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি তার অসাধারণ আকর্ষণ এবং বিরল প্রতিভাবলে প্রাচ্যের জনগণকে বশ করতে সক্ষম। এর পক্ষে সম্ভব সুদানীদের মাহদির বিপক্ষে উত্তেজিত করা। উপরন্তু দাস ব্যবসা দমন করতে পারবেন, মুক্ত করতে পারবেন সেনা ছাউনিগুলো, এবং ইংল্যান্ডের লোকবল ও সমরসম্ভার ছাড়াই পারবেন মন্ত্রিসভার উদ্বেগ দূর করতে। এই মানুষটি হলেন 'চৈনিক' গর্ডন, একজন স্বপ্নচারী বীর, যিনি চিনের গৃহযুদ্ধে মন্ত্রমুগ্ধ জীবন যাপন করেন। নেতৃত্ব দেন বাহিনীর। দূর করেন বিভেদ। সুদানেও তার মর্যাদা গগনস্পর্শী। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে গর্ডন সবার প্রিয় পাত্রে পরিণত হন, গণ্য হন আমাদের অন্যতম জাতীয় সম্পদ হিসেবে। তিনি অদৃষ্টের বরপুত্র, বর্তমানে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার কাজে নিয়োজিত। কেউ একবার ভেবে দেখার জন্য অবসর নেননি যে, এই অকুতোভয় এবং রহস্যময় ব্যক্তিত্ব এতো বড় একটা কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন কিনা। এখানে শুধু এটুকুই যথেষ্ট মনে করা হয় যে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সম্মত হয়েছেন। ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে গর্ডন খার্তুমে হাজির হন। অতঃপর গাদাগাদা টেলিগ্রাম আসতে থাকে। টেলিগ্রামের বাণী খুবই হতবুদ্ধিকর। তবু মন্ত্রিসভা যে সুদানের গবর্নর-জেনারেল হিসেবে সঠিক লোক নিয়োগ করেননি, সেটা বোঝা যায়। এর চেয়েও বড় ভুলের সময় আসছে। এক বৎসর পর (২৬ জানুয়ারি, ১৮৮৫) দরবেশদের বর্শার আঘাতে গর্ডন নিহত হন। সরকারের ক্ষমার অযোগ্য বিলম্বের কারণে একটি বৃটিশ উদ্ধারকারী বাহিনী যখন উপস্থিত হয় তখন সময় পার হয়ে গেছে। ফলে তারা একটি ছত্রভঙ্গ নগরীর ততোধিক ছত্রভঙ্গ সেনা ছাউনি এবং উক্ত ছাউনির অদক্ষ অধিনায়ককে বাঁচাতে সমর্থ হয় না।

এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির নগণ্য ফলশ্রুতি হলো বৃটিশ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কারণ বিবেচনা করা হয় যে এই সরকার একজন সাহসী ব্যক্তিকে প্রেরণ করে একটি অসম্ভব কাজকে সম্ভব করার জন্য, এবং তাকে বিনাশ হতে দেয়া হয় অযথা বিলম্ব করে উদ্ধারকারী দল পাঠিয়ে। এই ঘটনার বৃহত্তর ফলশ্রুতি হলো সুদান পুনরায় জয় করার প্রতিজ্ঞা ইংরেজরা তাদের কর্মপন্থার অন্তর্ভুক্ত করে। সুয়েজ খাল প্রহরা ছিলো বৃটিশদের বড় রকমের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এর সঙ্গে যুক্ত হলো আরো কিছু কারণ। এর ভিত্তি রচনা করে মিশর থেকে প্রত্যাহার করার বিরুদ্ধে জনপ্রিয় আবেগ। জনগণ এখন চায় গর্ডনের পরিণতির জন্য উচিত শাস্তি। বর্বরদের অপশাসন থেকে সুদানের মুক্তি এবং সামরিক বাহিনীর হৃত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা। ইংরেজ মন্ত্রীরা ঘোষণা করতে পারেন যে সরকারি নীতি হলো প্রথম সুযোগেই

প্রত্যাহার শুরু করা, তবে সে সুযোগ কখনো আসেনি। নিল উপত্যকায় ইংরেজদের উল্লেখযোগ্য কাজ করা বাকি আছে। ইভলিন ব্যারিং, পরবর্তীকালে লর্ড ক্রোমার, কনসাল জেনারেল নামক সাদামাটা খেতাবের আচ্ছাদনে এতোকাল তাঁর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা গোপন রেখেছেন। এবার তিনি প্রশাসনিক সংস্কার কর্মে হাত দেন, এতে মিশরে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে এবং দেশটি সমৃদ্ধির পথে এগোয়।

এগারো বছর চলে যায় (১৮৮৫-৯৬)। মাহদির প্রয়াণ ঘটে, এবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন খলিফা আবদুল্লাহ এল তাশি; কিন্তু শাসকের পরিবর্তন হওয়াতে সুদানের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। আগের মতো হিংস্র গোড়ামি, বর্বরতা বিশাল এই দেশটির উপত্যকায় শাসকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যান্ডের অফিসারদের নেতৃত্বে মিশরীয় বাহিনী সীমান্ত এলাকার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনে সক্ষম। খলিফা এবং তার সহযোগীদের একাধিক মোকাবেলায় পরাস্তও করতে পারে, তবে দেশটিকে দরবেশদের স্বৈরশাসন থেকে নিরঙ্কুশভাবে মুক্ত করতে হলে একটি বৃহত্তর ও সমধিক সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সে ধরনের উদ্যোগ প্রায় আসন্ন। ব্যারিং ও কিচেনার এ ব্যাপারে যত্নের সঙ্গে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি হলেন মিশরীয় বাহিনীর সর্দার বা অধিনায়ক। ১৮৯৬ সালে কিচেনার ডংগোলা অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। দুই বৎসরে, রেলওয়ের সাহায্যে দূরত্ব হ্রাস করে এবং মেশিনগানের সাহায্যে শত্রু বাহিনীর সংখ্যা কমিয়ে ওমডুরমানের রণক্ষেত্রে তিনি শত্রু বাহিনীকে করেন নিশ্চিহ্ন, অতঃপর ঢুকে পড়েন খার্তুমে। সেখানে বৃটিশ ও মিশরীয় পতাকা তলে গঠন করেন যুগ্ম সরকার। কিচেনার যে বিজয় অর্জন করেন তার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য শৃঙ্খলা ও কৌশলের। ইসমাইলের ব্যয়বহুল চিত্তবিনোদনের সমান খরচে এই বীর্যবান ও নিয়মনিষ্ঠ প্রকৌশলী সুদান পুনরায় জয় করেন।

এই সাহসিকতাপূর্ণ বিজয় অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টপূর্ব একটি ঘটনা মিশরে বৃটিশদের অবস্থানের বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টি করে। কাপ্তান মর্চার অধীনে একদল ফরাসি তথ্যসন্ধানী তিন বৎসর যাবৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকার ভেতর দিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছিলো। অবশেষে ১৮৯৮ সালের গ্রীষ্মকালে তারা ফ্যাসোডায় পৌঁছে। এটি আপার নাইলের একটি পল্লী এলাকা, এখানে তারা ফরাসি পতাকা উড়ায়। বৃটিশ সরকার কিচেনারকে নির্দেশ দেন মর্চার সঙ্গে দেখা করতে এবং অত্র অঞ্চল থেকে ফরাসিদের চলে যাওয়ার জন্য দাবি জানাতে বলেন।

তাৎক্ষণিকভাবে দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কে দারুণ টান পড়ে। সুদানে যুদ্ধাভিযানে ইংল্যান্ডের যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তার পর ফ্যাসোদায় ফরাসি তথ্য অনুসন্ধানী দলের উপস্থিতির কারণে নাইলের আপার ভ্যালি ছেড়ে দিতে হবে, এটা ইংরেজরা মানতে পারে না। অপর দিকে, ফরাসি জনমতকে এটা বোঝানো কষ্টকর যে, একজন মেধাবী ফরাসি অফিসার, স্মরণীয় অনুসন্ধান অভিযান পরিচালনার পর, যে ভূ-খণ্ডে প্রথম পদপাত করেছেন সেখান থেকে প্রত্যাহার করলে ফ্রান্সের জন্য তা পরাজয়ের সামিল বলে গণ্য হবে না। সৌভাগ্যক্রমে ডেলকাস্যাস, ফরাসি বিদেশ মন্ত্রী, ছিলেন বিজ্ঞ রাষ্ট্রবিদ। তিনি আপার নাইলের একটি দুই পল্লীর জন্য তার দেশকে জড়িয়ে ফেলতে রাজি নন। বিশেষত নিরানব্বই শতাংশ লোক যে ক্ষুদে পল্লীর নামই শোনেনি। উপরন্তু তিনি আলোকসামান্য দূরদৃষ্টির কারণে দেখতে পান যে অদূর ভবিষ্যতে ফ্রান্স ইংরেজদের বন্ধুত্ব লাভ করতে পারলে বরং খুশিই হবে। তিনি

ফরাসিদের প্রতারিত করে নেবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়। তবে নৌ সংঘর্ষ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছিলো, ফলে যুদ্ধের বিভীষিকা নিকটবর্তী।

গ্লেডস্টোন, যিনি ১৯৯৮ সালে ক্ষান্তিভঙ্গ হতে দেননি, এবং জনগণের সংস্কার থেকে প্রতিটি মুক্ত ছিলেন যে, ফাসোদা এবং বুয়ার যুদ্ধের কারণে ইংরেজ বিদ্বেষ হিংস্ররূপ ধারণ করলেও, তিনি সাহসিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বোঝাপড়া অত্যন্ত কাঙ্ক্ষণীয় এবং তা অর্জন করা সম্ভব। হাতিয়ার নির্বাচনে তিনি সর্বদাই স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। ফলে পল ক্যামবনকে লন্ডন প্রেরণ করেন আঁতাতের পক্ষে কাজ করার জন্য। ১৯০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে মালবারা হাউসের এক পার্টিতে আড়াল থেকে শোনা যায় যে জোসেফ চেম্বারলেন ও ক্যামবন মিশর ও মরক্কো বিষয়ে কথা বলছেন। জার্মানির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতাশালী ইংরেজ উপনিবেশ সংক্রান্ত মন্ত্রী এখন ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী রচনার কথা ভাবছেন।

১৯০১ সালের ২২ জানুয়ারি রানী ভিক্টোরিয়ার দীর্ঘ শাসনামলের অবসান ঘটে। যে রাজতন্ত্রকে তিনি শুরুতে দুর্বল ও কলঙ্কে নিমজ্জিত দেখতে পান, তিনি চলে যাবার সময় তা দেশের জনগণের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অসামান্য অভিজ্ঞতার জন্য তিনি অসাধারণ বিচার বোধ এবং অসামান্য কর্তৃত্বের অধিকারী হন। এখানে আমরা এলিজাবেথের শাসনামলের শেষ দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে পারি। অবশ্য তার রাজকীয় কার্যকর্মের যোগ্যতা, যার খবর জনগণ প্রায় কিছুই জানতেন না, এবং তার মনের গড়ন সম্পর্কে জানতেন আরো কম, যার জন্য উৎসাহের সঙ্গে জনগণ তার প্রতি আনুগত্য জানায়, এসবের জন্য নয়, বরং তার টিউটনিক সরলতা ও হৃদয়ের উষ্ণতা, তার সদা ও অবিরল ধার সহানুভূতি, সাধারণ মানুষের আনন্দ বেদনার সঙ্গে মিশে যাবার অসাধারণ ক্ষমতা, এই সাধারণ মানুষের সঙ্গে, বুদ্ধিজীবী কিংবা অভিজাতদের সঙ্গে নয়, তিনি একাত্ম হতে পারতেন, ইত্যাদি কারণে অসাধারণ কর্তৃত্ব ভোগ করতে সমর্থ হন। তার দরবার অমিতাচার ও কেলেঙ্কারিমুক্ত ছিলো বলে প্রজাদের আন্তরিক ভক্তি কুড়ায়। এই প্রজারা চতুর্থ জর্জের ব্যক্তি জীবনের ঘটনাবলির জন্য অত্যন্ত মনঃকষ্ট ভোগ করে। সেকালে অনেক কিছু, এমনকি আড়ম্বরে ঘাটতি, সদ্‌গুণের জন্য ক্ষমা করা হতো।

এই খুদে ভদ্রমহিলা, যিনি ছিলেন অত্যন্ত গর্বিত ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক, অথচ জীবন যাপনে ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহবধূর জীবনধারা এবং চিন্তা-ভাবনার কাছাকাছি, দীর্ঘ তেষট্টি বছর ইংল্যান্ডের শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তার রাজত্বকালে জাতির প্রতিভার অসাধারণ বিচ্ছুরণ ঘটে। তার তরুণ বয়সে লেখনি সচল ছিলো থ্যাকারে ও ডিকেন্সের। তার পূর্ণ বয়সের লেখকরা হলেন মেরেডিথ, কিপলিং, হার্ডি, এবং আর. এল. স্টিভেনসন। ইচ্ছে করলে তিনি সান্ধ্য ভোজনে আপ্যায়ন করতে পারতেন একদল মেধাবী ঐতিহাসিককে। এদের নাম শুরু করতে হবে মেকলেকে দিয়ে। শেষ করতে হবে মেইটল্যান্ডের নাম করে। কারো শাসনামলে এতো বেশি সংখ্যক মেধাবী ঐতিহাসিক দেখা যায়নি। বড় মাপের বুদ্ধিজীবীদের নাম করতে হলে প্রথমেই নাম করতে হয় কার্লাইল, মিল ও রাসকিনের নাম। কবিদের মধ্যে সুখ্যাতি অর্জনকারী প্রধান কজন হলেন টেনিসন ও ব্রাউনিং, সুইনবার্ন ও ম্যাথু আর্নল্ড। ধর্মের ক্ষেত্রে নিউম্যান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ডারউইন এবং ওয়ালেস, ভূ-অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে লিভিংস্টোন। চিকিৎসা শাস্ত্রে লিস্টার, রোমান্সের ক্ষেত্রে থ্যাকারে ও

ডিকেন্স, এন্থনি ট্রলোপ, শার্লোট ব্রন্টি, জর্জ এলিয়ট, এবং আর এল স্টিভেনসন, বিজ্ঞান জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে এবং অভিজ্ঞতার বুদ্ধিবাদী ভাষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে টি এইচ হাক্সলি এবং হার্বার্ট স্পেনসার, তুলনামূলক আইনে হেনরি মেইন। এসব মাত্র কয়েক জনের নাম, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। কিন্তু আমাদের মহারানী ভিক্টোরিয়া কোনো মননব্রতী ছিলেন না। তার কল্পনাঋদ্ধ প্রজারা বৃথাই অতীব সুন্দর দৃশ্যপটের জাল বুনেছেন তার রাজকীয় দৃষ্টির সামনে অনাবৃত করার জন্য। তাদের উদ্ভাবনী উৎসাহের আবেদন কোনো কাজে লাগেনি। সুখ্যাত অক্সফোর্ড আন্দোলন, সমাজতন্ত্রী আন্দোলন, বুদ্ধিবাদী আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন, এসবই তার সাদামাটা ও দৃঢ়চিত্ত রক্ষণশীলতার কাছে সমান অবজ্ঞেয়। অগ্নিগর্ভ ইংরেজ দেশপ্রেমিক এবং ইংরেজ রাজনীতিতে আপোষহীন দলীয় মনোভাবাপন্ন, তিনি জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম এবং দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও জার্মান বালিকার আবেগোচ্ছল মানসিকতা লালন করে গেছেন।

ডেলকাস তার উত্তরাধিকারী এডওয়ার্ডের জন্য অপেক্ষা করছেন। ইংল্যান্ডের নতুন রাজা অমায়িকতার পরাকাষ্ঠা। নতুন রাজা কারো প্রতি শত্রুতা বা ঈর্ষা পোষণ করেন না। তবে আত্মম্ভরি জার্মান ভাইপোর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিরাগ পোষণ করেন। আবার আন্তরিকভাবে বাসনা পোষণ করেন যে গোটা বিশ্বের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সুসম্পর্ক গড়ে উঠুক—জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া—সবার সঙ্গে। বিশেষত ফ্রান্সের সঙ্গে, যেখানে ইংরেজ বিদ্বেষ এখনো প্রবলভাবে কাজ করে। প্রিন্স অব ওয়েলস হিসেবে তিনি প্যারিসে প্রভূত আনন্দের ভাগী হয়েছেন, ফরাসিদের মধ্যে তার বন্ধুর সংখ্যাও কম নয়। ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে বৃটিশ সরকার এই রাজার চেয়ে যোগ্য সদিচ্ছার দূত খুঁজে পাবে না।

তবে বেলফোর মন্ত্রিসভা কূটনীতির ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূচনা করেন তার কৃতিত্ব সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্য নির্দিষ্ট করলে ভুল করা হবে। রাজা সহায়তা করেছেন, তবে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সুসম্পর্ক (entente cordiale) সৃষ্টির ধারণার তিনি উদ্গাতা নন। প্যারিসে তার সরকারি সফরের দরুন শত্রুতার অবসান ঘটে এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আঁতাত হতে পারে এ জন্য যে ফরাসি ও ইংরেজ সরকার আবিষ্কার করে যে তারা এখন যে অবস্থায় তাতে উভয়পক্ষের জন্য লাভজনক দরকষাকষি হতে পারে উপনিবেশ বিষয়ে। উভয় পক্ষের মধ্যে যে আদান-প্রদান হয় তার মর্মবাণী হলো : ফ্রান্স মিশরে ইংল্যান্ডের বিশেষ অধিকার স্বীকার করে, পক্ষান্তরে ইংল্যান্ড মরক্কোয় ফরাসিদের বিশেষ অবস্থানের গুরুত্ব মেনে নেয়। চুক্তিতে একটি গোপন সমঝোতাও যুক্ত করা হয়, তাতে বলা হয় যে স্পেনের সঙ্গে বোঝাপড়া হলে মরক্কোয় ফরাসিদের প্রভাববলয় নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। একই সময়ে নিউফাউন্ডল্যান্ড, শ্যামদেশ, মাদাগাস্কার এবং নিউ হিবরাইডসে দুটি দেশের মধ্যে যে বিভেদ রয়েছে তা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। উপনিবেশ সংক্রান্ত বিরক্তিকর ক্ষোভের এই অপসারণ ছিলো সবচেয়ে আনন্দদায়ক ও যুক্তিশীল। মরক্কো ব্যাপারে ক্যামবন যৎপরোনাস্তি উৎফুল্ল। হাউস অব কমন্স খুশি হয় যে এই চুক্তির বদৌলতে মিশরে ইংল্যান্ডের অবস্থান নিশ্চিত হলো। কিন্তু লর্ড রোজবেরি, যিনি লক্ষ্য করেন যে, ইউরোপের সর্ব প্রধান সামরিক শক্তি জার্মানির সঙ্গে মরক্কো ব্যাপারে সলাপরামর্শ করা হয়নি। তিনি এর সমালোচনা করেন এবং গোপন বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করেন যে ফ্রান্সের সঙ্গে আঁতাতের দরুন ইংল্যান্ডকে অবশ্যই জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে।

উদারনৈতিক সংস্কার এবং আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা

ভেরিনিজিং-এর সন্ধি। ইংরেজদের ঘরোয়া রাজনীতি। শিক্ষা আইন। উদারবাদীদের বিজয়। মিতাচার। চৈনিক মজুর। শুল্ক সংস্কার। উদারবাদী যুগ (১৯০৫-১৫)। জার্মানির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বৃদ্ধি। মরক্কো। ইংরেজ-ফরাসি আঁতাত। ইংরেজ-জার্মান নৌ প্রতিযোগিতা। বোয়ার কনফারেন্সের ব্যর্থতা। ইংরেজ-রুশ আঁতাত, ১৯০৭। ১৯০৮ সালের অস্ট্রীয় কূটনীতি। যুদ্ধের বিপদ।

জাতি হিসেবে ইংরেজরা দ্বীপমণ্ডুক ও সমরবিমুখ। যে কূটনৈতিক বিপ্লব 'চমৎকার বিচ্ছিন্নতার' দীর্ঘ যুগের অবসান ঘটায় তার তাৎপর্য তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। গোপনে প্রণীত জাপানের সঙ্গে সন্ধি কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করেনি; ফ্রান্সের সঙ্গে আঁতাতকে গণ্য করা হয়েছে অনুকূল ঔপনিবেশিক সমঝোতা হিসেবে। এটা সার্বিক সামঞ্জস্য বিধান করবে। ইউরোপীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা কারো মনে উঁকি দিচ্ছে না। বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের বিরুদ্ধে মনোভাব এতোটা কঠোর যে ক্লিমেন্সুর মতো ফরাসি ভদ্রলোক আঁতাতকে গণ্য করেন ফ্রান্সের জন্য বাস্তব বিপদ হিসেবে।

উপরন্তু, ইংল্যান্ড তার ঘরোয়া রাজনীতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও দেশটি বুয়ারদের বিপর্যয়কর প্রতিরোধের কথা ভেবে নিদারুণ চিন্তাকুল। এই বুয়াররা ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের রাজধানী প্রিটোরিয়া এবং ব্লুমফন্টেন ইংরেজদের দখলে থাকা সত্ত্বেও, ভূমি আকড়ে থাকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের যুদ্ধকৌশল পলায়নপর, দেশের প্রতিটি খামার তাদের অশ্বারোহী বন্দুকধারীদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। তারা বাহিনীর লোকদের পেলেই হয়রান করে। তাছাড়া উক্ত বাহিনী একেবারে ক্ষুদ্র, বিশাল ভূ-খণ্ড নজরে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এজন্য দেশে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ফলে ব্লকহাউস নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, খামার বাড়ি ভস্মে পরিণত করার কথা উঠে, নারী ও শিশুদের বন্দীশালায় আটকে রাখার চিন্তা-ভাবনা চলে। এ ধরনের পদক্ষেপ সৈনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে যতোই অনিবার্য মনে করা হোক না কেন, শিষ্ট একটি জাতির কাছে তা ঘৃণ্য কাজ বলে গণ্য হয়। এবং যদিও উদারবাদী নেতা ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান বর্বরোচিত পদ্ধতির কথা বলেন এবং তা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তবে যুদ্ধের দ্রুত অবসানের জন্য উক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ অতিরিক্ত যুক্তি হিসেবে কাজ করে। কিচেনার শর্তহীন আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী, সরকার তাকে সমর্থন করে কিন্তু মিলনার চান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ। ভেরিনিজিং (Vereeniging)-এর সন্ধি ছিলো সমঝোতা সৃষ্টির বাস্তব প্রচেষ্টা। যদিও বুয়ারদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিলো, তবে তাদের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি না করে বরং তাদের তিন মিলিয়ন পাউন্ড প্রদান করা হয় খামার বাড়িগুলো পুনর্নির্মাণের জন্য। অনতিকাল পর

জেনারেল বোথা লন্ডন সফরে আসেন। তিনি দেখতে পান যে এখানে তাকে জনপ্রিয় বীর মনে করা হয়। এতে তাকে বেশ অবাক মানতে হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহানগরীর প্রায় সবাই জনগণ 'সৎ বৃদ্ধ বোথা' বলে অভিনন্দন জানায় সাম্প্রতিককালের তাদের সবচেয়ে ভয়ানক শত্রুকে, খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, সৎ পরাজয় স্বীকারকারী এবং একজন বন্ধু হিসেবে।

যুদ্ধের একটা ছোট্ট ঘটনা ইংরেজ জনতার মনে সতত আনন্দের কারণ হয়। ট্রান্সভালের পশ্চিম সীমান্তে খুদে একটি শহর অবরোধ থেকে মুক্ত হয়। মেফকিং শহর অবরোধ হওয়াতে কোনো ঘটনা বলেই মনে হতো না যদি না তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি, যার উদ্ভাবনী দক্ষতা ও হালকা কৌতুকপ্রিয়তার খবর অবরোধ চলাকালেই দেশে পৌঁছে যায়। তিনি রাতারাতি দেশবাসীর প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। গোটা সাম্রাজ্যে ব্যাডেন-পাওয়েলের নাম যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য ছড়িয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ব্যাডেন-পাওয়েল বেসরকারি ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য অধিক সুনাম কুড়ান। দক্ষিণ আফ্রিকার পল্লী (Veldt) সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকে মেফকিং-এর রক্ষাকারী তরুণদের শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখেন। বয়-স্কাউট এখন বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান। সমাজের চরিত্র গঠনে এর অবদান সর্বত্র স্বীকৃত। অতএব দেখা যায়, দুটি যুদ্ধ থেকে (ক্রিমিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা) মানুষের মঙ্গলের জন্য দুটি অপ্রত্যাশিত কিছু আমরা পেয়েছি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণে নার্সিং পেশার জন্য পেয়েছি ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলকে। দক্ষিণ আফ্রিকার উদাহরণে ব্যাডেন-পাওয়েলের মনে জাগে নৈতিক প্রশিক্ষণের কথা, যা গড় মানের ছেলেদের জন্য খুবই উপযোগী। তাছাড়া বয়-স্কাউট প্রথার আশীর্বাদে শাহরিক ক্লাস-রুমের একঘেয়েমি দূর হতে পারে মুক্ত আকাশের নিচে স্বাধীনতা এবং অরণ্য জীবনে শৃঙ্খলার জন্য।

যে টোরি দল 'ভেরিনিজিং শান্তি'র সময় সরকারে ছিলো সেই দল ১৯০০ সালের 'খাকি নির্বাচনে' বিপুল ভোটে জয় লাভ করে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে। প্রধানমন্ত্রী হন লর্ড সলস্‌বেরি, তার প্রধান সহযোগী হলেন এ. জে. বেলফোর এবং জোসেফ চেম্বারলেন। একজন আন্তরিক মানবতাবাদী এবং দার্শনিক উপরন্তু সংসদীয় বিতর্কে সার্থকাম, অপর জন বার্মিংহ্যামের ইউনিট্যারিয়ান, যিনি সফল কারবারি হিসেবে সুনাম অর্জনের পর নিজ শহরের মিউনিসিপ্যাল রাজনীতিতে হাত পাকান, পার্লামেন্টের সদস্য হন, প্রথম জীবনের আমূল সংস্কারবাদী নীতির পরিবর্তে গঠনধর্মী সাম্রাজ্যবাদ কবুল করেন। এখন তিনি ইউনিয়নিস্টদের সর্বাগ্রগণ্য নেতা। যুদ্ধের উত্তাপ ও প্রবল আবেগের ভেতর ভোট গ্রহণ করা হলে রাজনীতিক শক্তিগুলোর পরিষ্কার ভারসাম্য পাওয়া যায় না, এবং রক্ষণশীল সরকার (ম্যান্ডেট দিয়ে ক্ষমতায় বসানো হয় বুয়ার সমস্যা নিরাকরণের জন্য) যখন ঘরোয়া সমস্যার ব্যাপারে মনোযোগ দেন তখন শক্তি দ্রুত ও সংগত কারণে ক্ষয় হতে থাকে। ননকনফর্মিস্ট টোরিদলের শিক্ষা ও মিত্যাচার বিষয়ক নীতিতে বিরাগ পোষণ করে। শ্রমিক দল বিরক্ত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার খনিগুলোতে চিনের শ্রমিক নিয়োগ করায়। বাণিজ্য ও শিল্প গোষ্ঠী ফ্রি ট্রেডের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানায় বেঁকে বসে।

১৯০২ সালের শিক্ষা আইনের প্রকৃত প্রণেতা ছিলেন স্যার রবার্ট মর্যান্ট। এই স্যার মর্যান্ট ছিলেন অসাধারণ রাজ কর্মকর্তা। দপ্তরের প্রধানদের চেয়ে এই রাজকর্মকর্তারাই দেশের

কর্মপন্থা অধিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই শিক্ষা আইন ছিলো বৃহৎ, বৈপ্লবিক, হিতকর ব্যবস্থা। এতে শিক্ষা ব্যবস্থার স্থানীয় প্রশাসন স্কুল বোর্ডের পরিবর্তে কাউন্টি ও বরোর বিশেষ কমিটিগুলোর দায়িত্বে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ এখন দায়িত্ব পালন করবে রেটপেয়ারদের ভোটে নির্বাচিত সংস্থাগুলো। এই সংস্থাগুলোর অর্থের যোগান ব্যাপারে ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকবে। যুক্তি দেখানো হয় যে, যে সংস্থা রেট নির্ণয় করতে পারে, তার পক্ষে শিক্ষার জন্য অনেক কিছু করা সম্ভব। পক্ষান্তরে স্থানীয় প্রশাসন শুধু পরামর্শ দিতে পারে। কার্যত উক্ত আইন প্রতি কাউন্টি ও বরোর জন্য ছিলো চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এগুলোর উন্নতি সাধনও করতে পারবে নিজেদের সমর্থতা অনুসারে। উপরন্তু এই সংস্থাগুলোর ক্ষমতা শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। প্রচলিত নিয়ম থেকে সাহসিকতার সঙ্গে সরে এসে এতে মাধ্যমিক শিক্ষায় জনগণের সাহায্যের ব্যবস্থা রাখা হয়।

তথাপি, ননকনফর্মিস্টদের বিরাগের অবধি থাকেনা, ফলে লিবার‍্যাল দলের বিরাট অংশ উক্ত শিক্ষা আইনকে আপত্তিজনক গণ্য করে। কারণ সম্প্রদায়ভিত্তিক বিদ্যালয়গুলোকে একই ব্যবস্থার অধীনে নেয়া হয়, এবং রেটপেয়ারদের সাহায্য লাভের উপযোগী করা হয়। জনপ্রিয় রব উঠে যে, 'রোম রেটভোগী।' যুক্তি দেখানো হয় যে, এটা কি করে সংগত হয়, এটা কি করে ধর্মীয় বিবেকের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় যে, একজন ব্যাপটিস্ট রেট প্রদান করবে এমন বিদ্যালয় টিকিয়ে রাখার জন্য যেখানে অ্যাংলিক্যানদের ছড়াছড়ি কিংবা রোমান আবহ বিদ্যমান? সমধিক তীব্র আপত্তি উঠে যে, যেসব এলাকায় মাত্র একটা বিদ্যালয় (সংখ্যায় প্রায় আট হাজার) সেখানে ননকনফর্মিস্টরা বাধ্য হবে গির্জা পরিচালিত বিদ্যালয়ে তাদের ছেলেদের পাঠাতে। এ বিতর্ক গোটা দেশে প্রতিবাদের ঝড় তোলে এবং রোমানিজম, অ্যাংলিকানিজম এবং ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সুপ্ত ঈর্ষা জাগ্রত হয়। অনুভূতি এতোটা তীব্র হয় যে অনেক ধার্মিক ভিন্নমতাবলম্বী 'নিষ্ক্রিয়ভাবে' এর প্রতিরোধ করেন এবং রেট প্রদানের চেয়ে কারাগারের অন্তরালে যেতে রাজি হন।

মিতাচার অপর একটি প্রশ্ন। লিবার‍্যালরা যেখানে মিলিত হয় সেখানেই এই প্রশ্ন নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। মদ্যাসক্তির অমঙ্গল বিষয়ে সবাই এক মত। এর সঙ্গে অপরাধ ও সামাজিক দুর্দশার যে সংযোগ রয়েছে তা সবাই স্বীকার করেন। প্রতিটি সমাজকর্মী সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে মদ্যাসক্তিকে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক মনে করে। এর জন্য একাধিক প্রতিকার প্রস্তাবিত করা হয়। যেমন, মদ্যপান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ, স্থানীয় সুবিচার, কঠোর লাইসেন্স প্রথার অধীনে বাড়তি পাবলিক হাউসের (সংক্ষেপে পাব) সংখ্যা কমানো। অতএব ১৯০৪ সালে যখন আইন পাস করা হয় যে পাবমালিকদের লাইসেন্স সম্পত্তি বিশেষ, এই সম্পত্তি থেকে তাকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যাবে না, করা হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে, তখন উক্ত আইনকে অবনতিমূলক পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হয়। শিক্ষানীতি ব্যাপারে রক্ষণশীল সরকারের বিরুদ্ধে যে বিরোধিতা জমে উঠেছিলো তার সঙ্গে এবার যুক্ত হলো দেশের মিতাচার কর্মীদের প্রবল ক্রোধ।

যাহোক, চৈনিক শ্রমিক এবং রাজস্বনীতি সংক্রান্ত বিপ্লবের ভীতি যে আবেগ উসকে দেয় তার তুলনায় অন্য কোনো সমস্যা পাত্তা পায়না। ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলো যে অবস্থানে পৌঁছেছে, তারা যে কর্তৃত্ব ভোগ করে, ইউরোপ মহাদেশের অন্য কোনো সংগঠন তার ধারে-কাছে যেতে পারে না। ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলো সরকারি প্রস্তাবে দেখতে পায় যে যদি চিন

থেকে শ্রমিক দক্ষিণ আফ্রিকার খনিগুলোতে কাজ করার জন্য অগ্রিম দান করা হয় তাহলে সেটা এ দেশের শ্রমিকের জীবনের মানের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। অনেক কষ্ট স্বীকার করে, তিন প্রজন্মের অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টা দ্বারা এদের জীবনের মান উন্নত করা হয়। এখন যদি একদল সস্তা শ্রমিক চিন থেকে জোহানেসবার্গে প্রেরণ করা হয়, তাহলে পশ্চিমাঞ্চলীয় ল্যাংকাশায়ার এবং অকর্শায়ারের কারখানাগুলো পূর্ণ করার জন্য প্রাচ্যের সস্তা এবং অদক্ষ শ্রমিক আমদানি করতে সমান অনুপ্রাণিত বোধ করবে না? আর যদি তাই করা হয় তাহলে বৃটিশ শ্রমিকদের অবস্থা কি দাঁড়াবে? মজুরি কমে যাবে, জীবনের মানের অবনতি ঘটবে, নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকের মধ্যেকার ব্যবধান সম্প্রসারিত হবে ব্যাপক হারে। যদিও ইংল্যান্ডের শ্রম বাজারে প্রাচ্যের শ্রমিকদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা বহুদূরের ঘটনা এবং এটি প্রধানত দলীয় আবেগ থেকে সৃষ্ট সমস্যা। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে 'চৈনিক দাসত্ব' একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা মানুষের মনের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটায় এবং উদারবাদী দল ১৯০৬ সালে ক্ষমতায় আসতে পারে।

একটা বৃহত্তর ও গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয় জোসেফ চেম্বারলেনের শুল্ক সংস্কার নীতিকে কেন্দ্র করে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময়, ১৯০৩ সালে, উপনিবেশ সংক্রান্ত মন্ত্রী তার একটা নীতির বিশদ ব্যাখ্যা দেন। এতে দেশবাসীর মন গির্জা পরিচালিত বিদ্যালয় কিংবা পাবলিক হাউসের মতো ছোট-খাটো বিবাদ থেকে সরে আসে এবং তাদের মনে পড়ে যায় ইউনিয়নিস্ট দলে প্রভাব হ্রাসের ঘটনা। তারা এর সঙ্গে সাম্রাজ্যিক সংহতির জাঁকালো ভাবধারা মিলিয়ে দেখে। টোরি দল শিক্ষা, পাবলিক হাউস এবং চৈনিক মজুর নীতির জন্য যে ভোটগুলো হারায় তা পুনরায় ফিরে পেতে পারে ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স সংক্রান্ত বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করে। চেম্বারলেন ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেন ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে, এবং মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে দেশব্যাপী প্রবল প্রচারাভিযান শুরু করেন। ইত্যবসরে রক্ষণশীলরা নিজেদের দুর্গ আকড়ে থাকে, প্রধানমন্ত্রী, বেলফোর, শুল্ক প্রশ্নে জটিলতায় একটা ভারসাম্য তৈরি করেন। অতঃপর ফরাসিদের সঙ্গে সকল ব্যবস্থা সুসম্পাদিত হবার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে এবার নির্বাচকমণ্ডলীর মুখোমুখি হওয়া যায়।

অবাধ বাণিজ্য নীতি ষাট বছর যাবৎ ইংল্যান্ডে চালু। এই সময় জাতীয় সমৃদ্ধি ব্যাপক প্রসার লাভ করে। একদিকে বৃহৎ শিল্প বিকশিত হয়, বিপুল সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠে, জনগণের খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র আসে এবং উন্নত হয়। তাছাড়া বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য ও ফলমূল আমদানি করায় এসবের দাম কমে যায়। অপরদিকে ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্র ব্যবসার সমৃদ্ধি নির্ভর করে প্রাচ্যের বাজারের উপর। তুলার দাম কিছুমাত্র বৃদ্ধি পেলে ব্যবসা সঙ্কুচিত হয়। এটি হতে পারে শুল্ক সামান্য বাড়ালেও। কারণ এতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়। আবার, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজে পরিবহণ, ব্যাংকিং, কয়লা-খনি ইত্যাদি প্রধান শিল্প হিসেবে গণ্য। এদের মুনাফা হয় অবাধ নীতি চালু থাকলে। শুল্ক আরোপ করলে এই শিল্পগুলোর ক্ষতি হয় বিপুল। দেশে লোহা ও ইস্পাতের দাম হওয়া উচিত সম্ভাব্য ন্যূনতম। কারণ এদেশে ইস্পাতের ব্যবহার হয় অসংখ্য ক্ষেত্রে। যন্ত্রপাতির ব্যবহারও ব্যাপক ও বিচিত্র। গোটা বিশ্বের অর্থকেন্দ্র হিসেবে লন্ডনের অবস্থান, বাণিজ্যিক জাহাজের বহন ক্ষমতা, কারখানার শ্রমিকদের জীবিকা (সুতা ও কাপড়ের কলের), সবই নির্ভর করে রাজস্ব সংক্রান্ত

স্বাধীনতার উপর। যদিও একথা সত্য যে অন্যান্য দেশ ইংল্যান্ডের অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করেনি, বিশেষত দুটি দেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি, সংরক্ষণের আশীর্বাদে বিরাট সমৃদ্ধি অর্জন করে। তবু ইংরেজদের উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে বাজার পায়। বিদেশের বাজারে চড়া শুল্কের মোকাবেলা করতে হলেই, সস্তা দরের পণ্য দিয়ে বিদেশী বাজার জয় করা যায়, ফ্রি ট্রেডের এই স্বতঃসিদ্ধ যে এখনো মূল্যবান তার প্রমাণ মেলে। এ ধরনের নিঃসংশয় সুবিধা পরিত্যাগ জুয়া খেলার সামিল বলেই মনে হয়। কারণ সস্তা পণ্য ভিত্তিক সমৃদ্ধ বৃত্তান্ত বাণিজ্যের সাহায্যেই শুধু বৃটেন তার জনগণের জন্য খাদ্য ক্রয় করতে পারে। চেম্বারলেন প্রথম যখন তার প্রচারাভিযান শুরু করেন 'চল্লিশের দশকে'র ক্ষুধার স্মৃতি তখন গোটা দেশকে তাড়া করে। কিন্তু তার কর্মপন্থার অংশ এতোটা আক্রান্ত হবার যতো নয় খাদ্যের উপর কর আরোপ করলে যতোটা হবে (কলনি ও ডমিনিয়নগুলোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতে গিয়ে)।

এইসব আপত্তির (বৃটিশ ব্যবসা কাঠামো এবং পরিচালনা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে) বিরুদ্ধে চেম্বারলেন একটি পরিকল্পনার কথা বলেন। তিনি দেখতে চান রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির জন্য গোটা সাম্রাজ্য সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ। তিনি স্বদেশে সকল আমদানি পণ্যের উপর (খাদ্য ও কাঁচা মালসহ) সংরক্ষণমূলক শুল্ক বসাতে বলেন, প্রথমত এতে ডমিনিয়ন ও উপনিবেশগুলো বিদেশী পণ্যের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারবে। উপরন্তু দেশে বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। শুল্ক সংস্কারের পয়গম্বর হিসেবে সুন্দর পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে, জামার বোতামে অর্কিড গুজে, চোখে মনোকল এটে, সারা দেশ সফর করে বেড়ান তেজস্বিতার সঙ্গে তার মূল ধারণাগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে। এক সময় জাগ্রত করেন ইমপিরিয়াল সেন্টিমেন্ট। এক সময় বিদেশী প্রতিযোগিতার কঠোরতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, বিশেষত জার্মানির শিল্পে দ্রুত উন্নতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাকে অনুসরণ করেন অ্যাসকুইথ, ফ্রি ট্রেড লিবারাল্যালদের মেধাবী মুখপাত্র। এই বিতর্ক একাধিক বিষয় ধরে টান দেয়, ঘরে ঘরে এই বিতর্ক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এর প্রথম রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইউনিয়নিস্ট দল বিভক্ত হয়। এই দল ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলো ডিউক অব ডেভনশায়ার এবং গসেনের বিদায়ে। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হলো এতে ১৯০৬ সালে লিবারাল দল বিরাট বিজয় অর্জন করে। তখনকার শুল্ক সংস্কার প্রত্যাখ্যাত হয়। ফ্রি ট্রেডের জয় হয় বাচালতার জন্য নয়, সমৃদ্ধির জন্য।

এভাবে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে লিবারাল্যাল দল দীর্ঘ দশ বৎসর (১৯০৫-১৫) দেশ শাসন করে। এই দল শান্তি এবং অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী। এদের কাছে বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বিরোধের ব্যাপার নয়, বরং বন্ধু পক্ষগুলির মধ্যে পারস্পরিক সুবিধার ব্যাপার। এই দলের লক্ষ্য সামরিক খাতে ব্যয় সংকোচ এবং সমাজ সেবামূলক কর্মের সম্প্রসারণ। গির্জা পরিচালিত বিদ্যালয় এবং মিতাচার ব্যাপারে নন্‌কনফর্মিস্টদের নিদারুণ ক্ষোভের প্রতিকার করা তাদের লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক পক্ষপাত বাতিল করা হয়। কি ধরনের সাম্রাজ্যবাদ এই দল সমর্থন করে তা পরিষ্কার হয় যখন ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান, নতুন প্রধানমন্ত্রী, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটকে দায়িত্বশীল সরকার প্রদান করেন। আধুনিক ইতিহাসে এ ধরনের সাহসী পদক্ষেপের নজির খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় না। তিক্ত দ্বন্দ্বের পর পরাজিত পক্ষের হাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার পরিচালনার দায়িত্বভার তুলে দেয়া মুখের

কথা নয়। যে আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে 'সি. বি' একাজটি করেন তা অসার প্রমাণিত হয়নি। এর আট বছর পরই দেখা যায় জেনারেল বোথা পুরোনো বন্ধুদের বিদ্বেষ দমন করে তার দেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বৃটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করছেন।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই শান্তিপ্রিয়, শান্তি সন্ধানী সরকার সরাসরি ইউরোপীয় লোকা সংকটে জড়িয়ে পড়ে। গত দুই বছরে ইউরোপে জার্মানির অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ় হয় ধারাবাহিক কয়েকটি ঘটনায়। আবার এই ঘটনাগুলোর দরুন ফ্যাশোদা-রুশ মৈত্রীর সূচনা হয় খুব বেশি। প্রথম ঘটনাটি হলো জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়া, দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে জাপানের কয়েকটি বিস্ময়কর বিজয়, তৃতীয়ত, রুশ দেশে বৈপ্লবিক সাহিত্য প্রবেশ। শেষোক্ত ঘটনা ঘটে রণাঙ্গনে রুশ ইম্পিরিয়াল বাহিনীর সামরিক বিপর্যয়ে। ১৯০৫ সালে এই বিপর্যয়গুলো যখন একের পর এক ঘটছিলো তখন জার্মান চিফ অব দি স্টাফ কাউন্ট শ্লিফেন সময়টা ফ্রান্সের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন। অন্তত কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি সে ধরনের প্রস্তাবই রাখেন। এই অমানবিক ধারণা তখনকার জার্মান বৈদেশিক নীতি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত দুজন হঠকারী ও দুষ্ট ব্যক্তির কাছে মোটেই অপরাধমূলক কিংবা রুচি বিগর্হিত বলে মনে হয়নি। আপাত চ্যান্সেলর কাউন্ট বুলো, এবং সিংহাসনের নেপথ্যের নির্মম শক্তি, ব্যারন হলস্টেন অভিন্ন মত পোষণ করতেন যে সময়টা এখন পরিপক্ক, যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হলেও, জোরদার কূটনৈতিক আস্ফালন করে ইংরেজ-ফরাসি আঁতাতের শক্তি পরীক্ষা করার। মরক্কো দেশ লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেয়া হয় আক্রমণের জন্য। কারণ মরক্কোয় ফরাসিদের অবাধ অধিকার স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজরা মিশরে ফরাসিদের বলাৎকার ঠেকিয়েছে। উপরন্তু কাউন্ট বুলো এবং ব্যারন হলস্টেন সঠিক অনুমান করেন যে ইংরেজরা যদি ফরাসিদের সহায়তায় (যুদ্ধ বাঁধলেও) এগিয়ে না আসে তাহলে ইংরেজদের বন্ধুত্বের মূল্য ফরাসিদের চোখে চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হয়ে যাবে।

অতএব আক্রমণাত্মক গতিবিধি শুরু হয়ে যায়। সম্রাট কাইজারকে তাঞ্জিয়ারে প্রেরণ করা হয়। তিনি সুলতানকে নিশ্চিত করবেন যে জার্মানদের তার প্রতি শুভেচ্ছা রয়েছে, জার্মানরা তাদের সমর্থনও করে। এরপরই যুদ্ধের হুমকি থাকায় ফরাসিরা ডেলকাসের পদত্যাগপত্র গ্রহণে বাধ্য হয় এবং আলজিসিরাসে সম্মেলন আহবানে সম্মতি দেয়। যাহোক, ধিক্কার ও চোখ রাঙানো কূটনীতির মাধ্যমে শত্রুপক্ষের উপর গ্লানি চাপিয়ে জার্মানরা অবশ্য বড়ো একটা সুবিধা লুটতে পারেনি। নতুন লিবারাল বিদেশ মন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড গ্রে সঠিক উপলব্ধি করেন যে তার দেশের মর্যাদা জড়িত হয়ে পড়েছে, ফলে তিনি আলজিসিরাস সম্মেলনে ফরাসিদের পূর্ণ কূটনৈতিক সমর্থন প্রদান করেন। তাছাড়া ফরাসিদের উপর জার্মান আক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে, এটা বুঝতে পেরে তিনি ফরাসি ও ইংরেজ সামরিক স্টাফদের মধ্যে গোপন কথাবার্তা চালানোর জন্য অনুমতি দেন।

মরক্কো ব্যাপারে ফ্রান্সের উপর জার্মানি চাপ প্রয়োগ করায় অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ আঁতাত শিথিল না হয়ে আরো জোরদার হয়। এটিই ছিলো জার্মান কূটনৈতিক চাপের তাৎক্ষণিক ফলশ্রুতি।

যদিও খোলাখুলিভাবে তখন কিছুই জানা যায়নি, এবং মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই অ্যাসকুইথের মতো অজ্ঞানতার অন্ধকারে ছিলেন, তবু জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন, এটা ধরে নিয়ে একটা পলিসি গ্রহণ করা হয়। ইংরেজ ও ফরাসি

ব্রাকসাবদের বলা হয় জাহাজ যুদ্ধের জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরি করতে। যদিও যত্নের সঙ্গে বলা হয় যে দুটি দেশের অফিসারদের মধ্যে যে কথাবার্তা হবে তা সরকারের অনুমোদন বহন করবে না। সবকিছু নির্ধারিত ও নিশ্চিত হবে পার্লামেন্টে ও দেশের নৈতিক মনোভাব অনুসারে। তবু চ্যানেলের উভয় তীরের সৈনিকদের মধ্যে একটা ধারণা জন্ম লাভ করে যে ইউরোপে জোটবদ্ধতার সূচনা হলে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে। এ ব্যাপারে পারস্পরিক অনুমোদন বিনিময় চলে, গোপন সামরিক কৌশল বিষয়ে আলোচনা হয়। এই সব সাম্প্রতিক মত বিনিময়ের অর্থ হলো, ইংরেজ-ফরাসি আঁতাত শুধু উপনিবেশ সংক্রান্ত পার্থক্য দূর করার জন্য নয়, এতে এমন বোঝাপড়াও থাকে যে যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া গেলে এবং পার্লামেন্ট অনুমতি দিলে ইংলান্ড ইউরোপীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে।

ইতাবসরে জার্মানদের নৌশক্তি বৃদ্ধি ইংরেজরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। ইংরেজ নৌবাহিনী কর্তৃপক্ষের নজর এদিকে দীর্ঘকাল যাবৎ নিবদ্ধ। নৌবাহিনী ইংল্যান্ডে কোনো দলীয় প্রশ্ন নয়। সবাই জানেন যে যুদ্ধ চলাকালে দেশের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সমুদ্রে কার্যকর আধিপত্যের উপর নির্ভরশীল। শুধু তাই নয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অখণ্ড সত্তা হিসেবে টিকে থাকার জন্য চূড়ান্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে দেশের নৌবহরকে। বৃটিশদের সমুদ্র পথ হতে হবে শত্রুমুক্ত। নৌবাহিনী কর্তৃপক্ষের জন্য কষ্টকর নির্দেশ হিসেবে জাতীয় কর্মপন্থার লক্ষ্য হলো দ্বৈত-শক্তি। জগতের পরবর্তী শক্তিধর দু'টি নৌশক্তিকে কার্যকরভাবে মোকাবেলার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু জার্মান শক্তির উত্থানের ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। ইংরেজ কোনো নাবিক জার্মান সামুদ্রিক যুদ্ধ জাহাজের মর্যাদাকে খাটো করে দেখে না, জার্মান গোলন্দাজদের নিশানা, জার্মান নাবিক দলের সাহস ও সমুদ্র পথের কৌশলও তাদের শ্রদ্ধা কুড়ায়। যেহেতু ইংরেজ নাবিকরা জার্মান নাবিকদের সমীহ করে, ফলে তারা জার্মান নৌবাহিনীর নীতিপন্থার বিপদ সম্পর্কে সর্বদাই সতর্কতা জ্ঞাপন করে। ইংরেজ নাবিকরা যা ভাবেন, ইংরেজ সরকার ও জনগণ তার থেকে ভিন্ন কিছু ভাবেন না। যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে জার্মানদের অতিক্রম করে যেতে হবে। ১৯০৬ সালে লিবারাল সরকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এতে বোঝা যায় এই সরকার বিপদ সম্পর্কে উদাসীন কিংবা অন্ধ নয়। প্রথমে ড্রেডনট (Dreadnought, ১৯০৬-৬ সালের সম্পূর্ণ সারির যুদ্ধ জাহাজ) জলে ভাসানো হয়। অতঃপর বৃটিশ হোম ফ্লিটের সমাবেশ ঘটানো হয় উত্তর সাগরে। জার্মানরা ভবিষ্যৎ নতুন নৌ আইন কার্যকর করে। নৌ শক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এখন আর গোপন ব্যাপার নয়। বৃটিশ নৌবাহিনী (Admiralty) এটাও লক্ষ্য করেন যে ভারি বর্মাবৃত প্রচণ্ড সি ক্রুইজ নির্মাণ করা হয় দূর সাগরে যুদ্ধাভিযানের জন্য নয়, বরং শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তর সাগরে যুদ্ধ করার জন্য।

এই যে বিপজ্জনক নৌশক্তি প্রতিযোগিতা তার জন্য দায়ী কাইজার ও টিরপিৎজের ভ্রমাত্মক ধারণা। এদের ধারণা, জার্মান নৌবাহিনীর জন্য একটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল সময় যাবে, যখন ইংরেজ নৌবাহিনী তাদের নৌশক্তিকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। তবে এই দুর্বল সময়কালটা একবার অতিক্রম করা গেলে, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই প্রতিজ্ঞা থেকে মনে করা হয় যতো তাড়াতাড়ি অধিক সংখ্যায় জার্মান যুদ্ধ জাহাজ জলে ভাসানো যাবে, ততো তাড়াতাড়ি বিপজ্জনক অবস্থান অতিক্রম করা সম্ভব হবে। উপরন্তু, যুদ্ধজাহাজ দ্রুত গতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্মুখে জুটবে। এ ধারণার ফলাফল ও যুক্তিপরম্পরা থেকে সম্রাট কাইজার এতোটুকু নড়তে রাজি নন।

বৃটিশদের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো ইংগিত যে নৌশক্তি সীমিতকরণ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছে যায়, যাতে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা জার্মানদের চেয়ে বেশি থাকবে, তা বার্লিনে চরম ধৃষ্টতা বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। যখন চার্লস হার্ডিঞ্জ (১১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮) ক্রোনবর্গে নৌশক্তি সীমিতকরণ বিষয়ে আলোচনা শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন কাইজার তাকে মুখের উপর বলে দেন এর চেয়ে বরং তিনি যুদ্ধ ঘোষণার কথা ভাবতে পারেন।

এই বছরগুলোতে (মে ১৮৯৯-জুলাই ১৯০৭) ইউরোপের আন্তর্জাতিক আবহ ছিলো যুদ্ধের আশংকা ও ভীতি দ্বারা আক্রান্ত। রুশ সম্রাট জারের উদ্যোগে হেগ নগরীতে দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে আলোচনা একটুও এগোয়নি। পরিস্থিতি শান্ত করার বদলে বরং তা আরো ঘোলাটে করে তুলেছে। জার্মানরা সামরিক সম্ভার কিংবা নৌশক্তি হ্রাসের ঘোর বিরোধী। তারা আশংকা করে যে জার সীমিতকরণের প্রস্তাব করেন, অথচ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সে সব সময়ই অনেক এগিয়ে আছে, উপরন্তু তাদের রেলপথ উন্নয়নের পুরানা পরিকল্পনা কাটছাট করার দাবি তোলা যাবে না। বৃটেনের ভূমিকাও সন্দেহজনক, অন্তত দ্ব্যর্থবোধক। একদিকে ইংরেজরা আন্তরিকভাবে সামরিকসরঞ্জাম হ্রাসের জন্য চাপ দিচ্ছে। সমুদ্রে একান্ত সম্পত্তির নিরাপত্তা ব্যাপারে জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রতিরোধ করছে। অতএব জার্মানি এখন প্রকাশ্যে বলতে পারে যে, ইংরেজরা মহাদেশে নিরস্ত্রীকরণের জন্য খুবই আগ্রহী হলেও, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৌশক্তি যুদ্ধ চলাকালে নিরপেক্ষ বাণিজ্য উপেক্ষা করে যুদ্ধংদেহী হবার অধিকার সংরক্ষণের প্রস্তাব করে। এসব আলোচনা থেকে শেষ পর্যন্ত মঙ্গলজনক কিছু বেরিয়ে আসেনি।

ইতিমধ্যে আরো একটি শক্তি জোট ভূমিষ্ঠ হয় (১৯০৭)। এই শক্তি জোটের সম্ভাবনা বার্লিনের নীতি নির্ধারকগণ একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত শক্তি জোট সত্যিই বাস্তবায়িত হয়। ইংল্যান্ড ও রাশিয়া, প্রাচ্যের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মহাশক্তি ও সাম্রাজ্য, মধ্যপ্রাচ্যে তাদের স্ব স্ব প্রভাব বলয় সংক্রান্ত জটিলতার সামঞ্জস্য বিধান করে। উপনিবেশ সংক্রান্ত জটিলতা বিষয়ে ইংরেজ-ফরাসি মৈত্রী অনুসরণ করে রুশ ও ইংরেজরা আঁতাত গঠন করে এসীয় প্রভাব বলয় প্রশ্নে। দুটি দেশ কূটনৈতিক সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা চালাবে, এর চেয়ে বাস্তবধর্মী কাজ আর কিছু হতে পারে না। এবং যদিও অ্যাংলো-রুশ আঁতাতের কেউ কেউ সমালোচনা করে বলেছে যে এটি পারস্যের স্বার্থের জন্য ন্যায্য নয়, তবে ইংল্যান্ডে এটি ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়। জোর দিয়ে বলা হয় যে, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির উন্নতি এবং স্থায়ী করার জন্য আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। অবশ্য উক্ত ঘটনায় বার্লিন সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিলো একেবারে ভিন্ন। এখানে অ্যাংলো-রুশ বোঝাপড়াকে রাজা এডওয়ার্ড এবং স্যার এডওয়ার্ড গ্রে-র যেকিভাভেলীয় ষড়যন্ত্রের অতিরিক্ত মজির বলে গণ্য করা হয়। বার্লিন জারো অভিমত ব্যক্ত করে যে এটা জার্মানিকে শত্রু দেশ দ্বারা ঘিরে ফেলার প্রচেষ্টা।

জার্মানি চায় না শত্রুপরিবেষ্টিত হতে। বিশেষত সে বলকান অঞ্চল হয়ে নিকট প্রাচ্য ও পারস্য উপসাগরে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যেহেতু তার বন্ধু ও মিত্র অস্ট্রিয়ার হাতে রয়েছে এরেডিয়ারের চাবিকাঠি, ফলে জার্মান নীতির অপরিহার্য অঙ্গসিদ্ধ হলো ভিয়েনা এবং বার্লিনের নিবিড় সহযোগ কোনো অবস্থাতেই বিনষ্ট হতে দেয়া যাবে না।

এই অতি দরকারি বন্ধন অবিলম্বে একটা লক্ষণীয় নিদর্শনের সম্মুখীন হয়। আমরা দেখেছি যে বলক্যান অঞ্চলের রাজনৈতিক মানচিত্র তৈরি করে ১৮৭৮ সালে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলো। কাজটি করতে অনেক জটিল বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। বার্লিন কংগ্রেস বুলগেরিয়ার আকৃতি নির্দিষ্ট করে, মেসিডোনিয়া তুরস্কের অধিকারে ছেড়ে দেয়। আর অস্ট্রিয়াকে নিমন্ত্রণ করে তুরস্কের সার্বভৌমত্বের অধীনে বসনিয়া এবং হার্জিগোভিনা প্রশাসনের জন্য। এই দুটি প্রদেশের অধিবাসীরা জাতিতে সার্ব, তাদের ভাষাও সার্বীয়। বার্লিন সন্ধি নিখুঁত ছিলো না, কারণ তুরস্কের শাসনাধীনে মেসিডোনিয়া ছিলো নির্যাতনের শিকার। সেখানে গোলমাল লেগেই থাকতো। তবে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় বৃহৎ শক্তিগুলোর সম্মতিক্রমে। ফলে নিরাপদে এবং যথাযথ উপায়ে এই ব্যবস্থার হেরফের করতে হলে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ শক্তিগুলোর সম্মতি আদায় করতে হবে। অতএব যখন জানা যায় যে অস্ট্রিয়া চায় বসনিয়া ও হার্জিগোভিনাকে কুক্ষীগত করতে (এমন কি মিত্রদেশ জার্মানির অজ্ঞাতে), কিংবা জানা যায় যে বুলগাররা অস্ট্রিয়ার সমর্থনে পোর্ট (Porte) থেকে স্বাধীনভাবে নিজেদের রাজতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেছে, তখন ইউরোপে যে কি আতংক বিস্তার লাভ করে। এই পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে অনেক কথা বলা যায়। অস্ট্রিয়া দু'টি স্লাভ রাষ্ট্র প্রশাসনের বোঝা বহন করে দীর্ঘ তিরিশ বছর। অত্যন্ত সুনামের সঙ্গেই তারা প্রশাসন চালায়। জাতীয় গর্ব ও স্বাধীনতার দৃঢ় মনোভাব বুলগেরিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে তাদের উদ্দেশ্য গ্রহণযোগ্য হলেও তারা যেভাবে এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়াসী হয় তা ইউরোপের সাধারণ আইনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য হতে বাধ্য। শান্তির জন্য সুনির্দিষ্ট হুমকিও বটে। এটা কি করে প্রত্যাশা করা যায় যে সার্বরা বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার হঠাৎ হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি প্রশান্ত মেজাজে মেনে নেবে, যেখানে প্রদেশ দুটির জনগণকে তারা অভিন্ন বংশজাত, অভিন্ন হাড়-মাংস থেকে উদ্ভূত বলে মনে করে। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা কুক্ষীগত করায় গোটা সার্বিয়ায় ক্রোধের সীমা থাকে না। এটি প্রকৃতই একটি ভয়ংকর অবস্থা। কারণ সার্বিয়ার পশ্চাতে রুশ সাম্রাজ্যের ভয়ানক শক্তি সদা প্রস্তুত।

আবার মনে হয় যুদ্ধ জাতিসমূহের দোর গোড়ায় পৌঁছে গেছে। জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার চিফ অব স্টাফ যথাক্রমে মল্টকি এবং কনরাড ফন হটৎসেনডর্ফ বার বার ঘণ্টাধ্বনি উচ্চারণ করেন যে ফ্রান্স এবং রাশিয়ার সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার সময় এসে গেছে। সেন্ট পিটার্সবুর্গে ভাবাবেগ তখন তুঙ্গে; এই সময় রুশ কূটনীতিক ইসভলস্কির সঙ্গে এহরেনথাল, অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী, একটা চালাকি করেন। উক্ত চালকির ফাঁদে পা দিয়ে ইসভলস্কি অস্ট্রিয়ার কপটতা ব্যাপারে জ্বালাময় ভাষায় নিন্দা করে রুশ মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, অস্ট্রিয়ার আকস্মিক ও উচ্চণ্ড পদক্ষেপে বলক্যান অঞ্চলের শক্তির ভারসাম্য স্লাভদের প্রতিকূলে চলে গেছে। এই সময়টা হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের ভাগ্যের জন্য সহজেই অত্যন্ত সংকটজনক হতে পারতো। কিন্তু হোয়েনযোলার্ন রাজবংশের উইলিয়াম ফ্রান্সিস জোসেফের পাশে দাঁড়ায়। রুশ সম্রাট জারকে গুরুত্বের সঙ্গে ধারণা প্রদান করা হয় যে (২৩ মার্চ, ১৯০৯) বলকান অঞ্চলের বিবাদে তিনি যদি তরবারি কোষমুক্ত করেন তাহলে তাকে বিশাল জার্মান সাম্রাজ্যের বিরোধিতা হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে। এই হুমকি ছিলো যথেষ্ট, কিন্তু গ্লানিবোধটা থেকে যায়। পরবর্তী বছর সম্রাট কাইজার ভিয়েনায় বুক চিতিয়ে বলেন যে তিনি অস্ট্রিয় বন্ধু ও মিত্রের পক্ষে 'চকচকে বর্মে' আচ্ছাদিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এভাবে

গোটা বিশ্বের দরবারে জানান দেয়া যে তিনি শান্তি বিনষ্ট হতে দেবেন, নিছক প্রাধান্যতার পরিচায়ক বৈকি। এবার সেন্ট পিটার্সবার্গের অনেকে প্রতিজ্ঞা করেন যে বলকান অঞ্চলে অনুরূপ সংকটের পুনরায় পুনরাবৃত্তি হলে কাইজার রাশিয়াকে স্বাধের মতো তার ইচ্ছার কাছে অসহায় অবস্থায় পাবে না।

এই সময়ে আন্তর্জাতিক স্নায়ুবৈকল্যের প্রধান লক্ষণ হলো, দু'জন মধ্যম মাপের লোক, অর্ধ সেমেটিক এহরেনথাল, অস্ট্রীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, এবং ইসভলস্কি, রুশ, শূন্যগর্ভ, কলহপ্রিয় রুশ কূটনীতিক, শুধু ইউরোপকে যুদ্ধের মুখে প্রায় ঠেলে দেননি। তাঁরা ব্যক্তিগত হিংসোদ্ভূত পারস্পরিক ঘৃণা দ্বারা দু'টি বৃহৎ সাম্রাজ্যের মধ্যে বিপজ্জনক মাপের শত্রুতা সৃষ্টিতে সমর্থ হন। বোহেমিয়ার একটি পল্লীর সম্ভ্রান্ত কুটিরে মিলিত হয়ে এই দু'জন উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সাব্যস্ত করেন যে অস্ট্রিয়া বলকান অঞ্চলের দুটি প্রদেশ পাবে, আর রাশিয়ার ভূমধ্য সাগরে যাওয়ার পথ হবে উন্মুক্ত। এটি ছিলো গোপন ষড়যন্ত্র, এতে বার্লিন সন্ধি দু'ভাবে ভঙ্গ করার প্রতিশ্রুতি থাকে। উপরন্তু এতে বৈধতারও কোনো নামগন্ধ ছিলো না। তাছাড়া অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া উক্ত পরিকল্পনা ব্যাপারে অবিচল থাকলে, প্রণালী এলাকা উন্মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা ইংরেজরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতেন। কিন্তু এহরেনথাল ইসভলস্কির সঙ্গে প্রতারণা করেন। রুশ লক্ষ্য হাসিলের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগেই অস্ট্রিয়ান ষড়যন্ত্রকারী পররাজ্য গ্রাস করার খবর বাতাসে ছড়িয়ে দেন। রুশরা এতে মর্মান্তিক আঘাত পায়। যে চতুর নকশা বাস্তবায়িত হলে তিনি দেশের চিরায়ত কৃতজ্ঞতা ভোগ করতেন, তা ধূলায় মিশে যায়। কারণ রাশিয়া প্রণালীর ত্রিসীমানায় যেতে পারেনি। অস্ট্রিয়া দু'টি প্রদেশ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়। আহত গর্ব এবং উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে গিয়ে হতাশ হয়ে ইসভলস্কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে এহরেনথালের জন্য অস্ট্রিয়াকে উচ্চ মূল্য প্রদান করতে হবে। এ যুগের যুদ্ধবাজদের মধ্যে এই রুশ কূটনীতিকের স্থান অনেকের উপরে। এ ক্ষেত্রে তার স্থান প্রায় ইউরোপের অগ্নিগর্ভ ও সদা যুদ্ধদেহী কনরাড ফন হটৎসডর্ফের সমপর্যায়ভুক্ত। ইনি অস্ট্রীয় বাহিনীর ফ্যানাটিক্যাল চিফ অব জেনারেল স্টাফ।

ইত্যবসরে দূর লন্ডনে এই সব বিধিবহির্ভূত কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্যার এডওয়ার্ড গ্রে ইউরোপীয় সম্মেলনের ডাক দেন। বলকান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্স যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাহলে ইংল্যান্ড কি করতে পারবে সে ব্যাপারে বৃটিশ মন্ত্রিসভা কিংবা পার্লামেন্ট তখনও কোনো স্থির ধারণায় পৌঁছতে পারেনি।

সার্বিয়া এবং দ্বৈত রাজতন্ত্র

ফ্রান্সিস জোসেফ। দ্বৈত রাজতন্ত্রে জাতিবিদ্বেষ। ক্রোয়েশিয়া কর্তৃক বস্তের দাবি অনুভব। সার্বীয় দীপক। ভিয়েনায় বিড়ম্বনা। ১৯০৮ সালের তুর্কি বিপ্লব-এর প্রকৃত রূপ। তুর্কি সাম্রাজ্যে বলকান অঞ্চলের খ্রিস্টান দেশগুলির ঐক্য। অগাদির ও ত্রিপলি। ১৯১২ সালের বলকান লীগ। লন্ডন সম্মেলনের ফলে ইউরোপীয় যুদ্ধ স্থগিত। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ। বুখারেস্টের সাম্রাজ্য। বলকান অঞ্চলে সার্বদের অগ্রগণ্য জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ। হাপসবুর্গের ভেতর ভিয়েনা।

ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়ার বয়োবৃদ্ধ সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফ ভিয়েনায় বাস করেন, তাকে ডেস্কে কঠোর পরিশ্রম করতে দেখা যায়, সরকারি কাগজপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং পড়েন, পড়েন এবং স্বাক্ষর করেন, ভোরে, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করেন, ক্ষান্তি দেন রাতে, একটা ট্র্যাজিক ব্যক্তি অস্তিত্ব, তিনি কি তার ট্র্যাজিক অবস্থা অনুভব করেন, কারণ তার স্ত্রী ভ্রাতৃজায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন, তার একমাত্র পুত্র স্বহস্তে জীবন সংহার করেন, এবং তার ভাইপো এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রেম করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজের সম্মান নষ্ট করেছেন, তাকে কোনো দিন ক্ষমা করা হয়নি, কারণ তিনি রাজকীয় মর্যাদার নিচের স্তরের পাত্রী নির্বাচন করেন। কিন্তু সম্রাটের ভেতর থেকে সকল আবেগ শুকিয়ে গেছে বলে, কিংবা তার রাজসিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অতি প্রভুত্বশীল বোধের জন্য, কিংবা তার প্রকৃতি অগভীর এবং সাদামাটা বলে, বৃদ্ধ ব্যক্তিটি স্বীয় কাজকর্ম চালিয়ে যান। সম্রাট আত্মনিরোধী, কাজকর্ম করেন রোবটের মতো, স্বীয় সাম্রাজ্যের সর্বাগ্রগণ্য অশ্বকোবিদ হিসেবে প্রশংসিত এবং ইউরোপের অগ্রগণ্য ভদ্রলোক। কঠোর রাজকীয় নিয়ম-কানুনের অন্তরালে থেকে বহির্জগতের কোলাহল থেকে মুক্ত থাকেন। সামরিক অভিজাততন্ত্র তার সিংহাসনের নিরাপত্তা রক্ষা করে। তিনি মন্ত্রী সরবরাহ পান ইম্পিরিয়াল অভিজাততন্ত্র থেকে। তার সুদীর্ঘ রাজত্ব কালে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের বড়ো রকমের আঘাত এসেছে কয়েকবার, লোম্বার্ডি এবং ভেনেসিয়া হস্তচ্যুত হয়েছে, দিনেমার ডুচিগুলি সয়েছে বলাৎকার, জার্মান রাইখ থেকে হয়েছে বিচ্যুত। তবু মনে হয় দেশটি চলছে চমৎকার। অথচ, প্রকৃত প্রস্তাবে, অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য দ্রুত বিগঠনের পথে এগিয়ে চলেছে।

সম্প্রদায়গত ও জাতীয়তাবাদী আবেগের সম্প্রসারণে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বৈত রাজতন্ত্রের ভীত হবার হেতু সবার চেয়ে বেশি। বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র জাতিগত ভাবাবেগের বন্যা লক্ষ্য করা যায়। এটি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে জাপানে। রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছে ভারতবর্ষে, বৃটিশ ডমিনিয়নগুলিতে এ ব্যাপারে উৎসাহের প্রাবল্য সহজে লক্ষ্যগোচর। তাছাড়া বলকান অঞ্চলের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের রূপান্তর ঘটাচ্ছে অতি দ্রুত। দ্বৈত রাজতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে ওঠে জাতিগত বিভেদনীতি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। এটি যে ধারণার উপর নির্ভর করে সচল তা হলো, সাড়ে আট মিলিয়ন চেক, পাঁচ মিলিয়ন পোল, চার মিলিয়ন রুথেনি, পাঁচ মিলিয়ন

সাত শত হাজার সার্ব ও ক্রোট, তিন মিলিয়ন তিনশত হাজার রুমানীয়, এক মিলিয়ন তিন শত হাজার স্লোভেন একটা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট বোধ করবে, যে ব্যবস্থার অধীনে সাম্রাজ্যের এক অর্ধেক অংশে চূড়ান্ত প্রভাব থাকবে দশ মিলিয়ন ম্যাগিয়ারদের, অপর অর্ধাংশে কর্তৃত্ব করবে বারো মিলিয়ন জার্মান। বেশ কয়েক শতাব্দী উক্ত অনুমানভিত্তিক শাসন খুবই কাজে দিয়েছে। অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য একটা অভিন্ন মতবিশ্বাস, অভিন্ন সৈন্য বাহিনী, অভিন্ন রাজমুকুট ইত্যাদির জোরে টিকে ছিলো। যতদিন লোকেরা একে আন্তর্জাতিক প্রয়োজন মনে করেছে, মনে করেছে যে, এটি একটি সংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, এবং এতে অসংগতির মাত্রা যতোই বিস্তৃত হোক না কেন, এর কার্য পরিচালনা যতই অসুবিধাজনক হোক না কেন, এটি প্রয়োজনে প্রচুর কাজে লেগেছে। এখন যদি এটি বিলুপ্ত করা হয় তা তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মে শূন্য স্থান থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে রাজতন্ত্র অভ্যন্তরীণ কারণে বিপদাপন্ন । এমন কি দুটি প্রভাবশালী, ম্যাগিয়ার এবং জার্মানদের মধ্যে হয়রানিমূলক ঘটনা ঘটে, ম্যাগিয়াররা প্রতি দশ বছর অন্তর ১৮৬৭ সালের অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির মধ্যেকার চুক্তির সংশোধন দাবি করেন। লক্ষ, অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরির মধ্যে ঐক্যের মূল বিষয় গুলি দূর করা। শুধু থাকবে দুই রাজ্যের মধ্যে নিরাভরণ ব্যক্তিগত বন্ধন। হাঙ্গেরি রাজ্যের ম্যাগিয়ার এবং অ-ম্যাগিয়ার জনগণের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো আরো খারাপ।

আয়ারল্যাণ্ডের কৃষককুল তাদের ইংরেজ প্রভুদের প্রতি যে তিক্ততা বোধ করে তার অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয় শ্লোভাক, রুথেনি, রুমানীয় এবং সার্বদের একটা গর্বিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত অভিজাততন্ত্রের প্রতি। এই অভিজাততন্ত্র জোর করে দেশটিকে ম্যাগিয়ারকরণ করতে চায়, চাপিয়ে দিতে চায় বিদেশী ভাষা, বিদেশী বিদ্যালয় ব্যবস্থা , আর নির্বাচন প্রথা পরিবর্তন করতে চায় সুবিধা মতো, যাতে জাতীয় ডায়েটে (Diet) দুর্বলতর শ্রেণীর প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রতারণা করা যায়। তাদের বঞ্চিত করা যায় ন্যায্য হিস্যা থেকে।

সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক সমস্যার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান, ১৯০৭ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃতি, ইত্যাদি অস্ট্রীয়-হাঙ্গেরি রাজতন্ত্রের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেকার তীব্র বিভেদ কিছু মাত্র শিথিল করতে পারেনি। আসল প্রশ্ন যখন উঠেছে তখন জাতিবিভেদ সর্বাধিক শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। মত বিশ্বাস, শ্রেণী, অর্থনৈতিক কিংবা পেশাগত সমিতির বন্ধন কোনোটা জাতিবিভেদের সমান শক্তিশালী উপাদান বলে মনে হয়নি। প্রতিটি পার্লামেন্ট এবং প্রাদেশিক ডায়েটকে হৈ হল্লা, বিশৃঙ্খলার স্থান মনে হয়েছে। একজন অস্ট্রীয় লেখক উল্লেখ করেছেন যে, "ইম্পিরিয়াল উর্দির চেয়ে জাতিগত কোর্তা বুকের অনেক বেশি কাছে থাকে।"

এমন সম্ভাবনার আশংকা অনেকেই করেন যে, এইসব বিবাদ-বিসংবাদের ভেতর থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদের মনোভাব দেখা দেবে, ছিন্নভিন্ন হবে গোটা সাম্রাজ্য। স্টিরিয়ার স্লোভেনরা এবং দক্ষিণ টাইরলের ইতালীয়রা বিচ্ছিন্ন হবার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। প্রদেশের পশ্চিম ভাগে (পূর্ব গ্যালিসিয়ার) রুথেনিরা যে কারণে পোলদের সঙ্গে যুক্ত তা দুর্বল করে তুলেছে। ট্রানসিলভানিয়ার (হাঙ্গেরির একটি প্রদেশ) কৃষকরা শুধু রক্তের বন্ধনের কারণে রুমানীয় নয়, রাজনৈতিক সহানুভূতিবশতও। রেলপথগুলিতে জোর করে ম্যাগিয়ার ভাষা চাপিয়ে দেওয়ায় ক্রোয়েশিয়া দারুণ অস্বস্তি বোধ করে। এদের মধ্যে একটা দল দ্রুত গজিয়ে ওঠে, সংখ্যায় ও দাপটে, যে দল হাঙ্গেরি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় এবং দক্ষিণের স্লাভদের সঙ্গে ফেডারেশন গঠন করতে ইচ্ছুক। এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হবে বসনিয়া, হারজিগোভিনা এবং

সার্বলেইখানিয়ান ডালমাটিয়া, এমনকি অনেকে সাহসিকতার সঙ্গে বৃহত্তর সার্বীয় রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেন। এ ধরনের প্রেক্ষা রাষ্ট্রবিদগণ হালকাভাবে দেখতে পারেন না, কিংবা সহসাই বাতিল করে দিতে পারেন না। ভিয়েনা সরকার সঠিকভাবে যুগোস্লাভ কিংবা দক্ষিণ স্লাভ রাষ্ট্রের সম্ভাবনাকে আশংকা এবং আতংক হিসেবে গণ্য করেন। স্লাভনিক জাতীয়তাবাদ এতটা ভাববার বিষয় নয় যে বিচ্ছিন্নতা মেনে নিতে হবে। ক্রোয়েশীয়রা শুধু হতাশাগ্রস্ত অস্ট্রীয় প্রজা নয় যে তাদের শুধু পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমস্যার সমাধান করা যাবে। এরা রোমান চার্চের অনুসারী হলেও, ভাষার দিক থেকে সার্ব, জাতিগত ভাবেও সার্ব। সার্বিয়া তুর্কি সাম্রাজ্যের অবহেলিত প্রদেশ থাকাকালে ক্রোয়েসীয়রা হ্যাবসবার্গ রাজবংশের সেবা করে অনুগতভাবে, তবু তারা রক্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেনি। বেলগ্রেড যখন তুরস্কের অধীনে ছিলো, তখন ক্রোয়েসিয়ার ভক্তি ছিলো ভিয়েনার প্রতি ; কিন্তু সার্বিয়া যখন স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়, তুর্কি ও বুলগারদের বিরুদ্ধে স্বীয় শক্তিতে দাঁড়ানোর সামর্থ অর্জন করে, এবং বলক্যান অঞ্চলের স্লাভনিক জাতির অধিবক্তার মর্যাদা লাভ করে তখন ক্রোটদের মধ্যে বিভক্তির লক্ষণ এবং অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দেয়। একদিকে তারা দীর্ঘকাল ইম্পিরিয়াল বাহিনীতে কাজ করেছে, অনেক রণাঙ্গনে বিপুল রক্ত ঢেলেছে, খ্যাতি কুড়িয়েছে যোদ্ধাতার পরিচয় দিয়ে, তাদের সম্মানিতও করা হয়েছে উদারভাবে ; অপর দিকে সীমান্তের ওপার থেকে ডাক পেয়েছে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ লোকদের। এরা হয়তো কিছুটা রুক্ষ, কিন্তু সাহসী এবং রোমান্টিক প্রকৃতির। এই রক্ত সম্বন্ধীয়েরা বিশ্বে উন্নতি করতে সমর্থ না হলেও, এবং তাদের সভ্যতা আদিম পর্যায়ে থেকে গেলেও, তারা রাজনৈতিক মুক্তি ছিনিয়ে নেয় তরবারির জোরে। তাদের যে ডাক দেয়া হয় তার ভিত্তি অভিন্ন ঘৃণা। ক্রোট ও সার্বরা ম্যাগিয়ারদের অত্যন্ত ঘৃণা করে। সার্বিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে যে কুখ্যাত শুল্ক যুদ্ধ শুরু হয় তা রুষ্ট অনুভূতির লক্ষণ, এই অনুভূতি দিগন্তপ্রসারী আন্তর্জাতিক নীতি অতিক্রম করে ভয়ানক বিস্ফোরণের আকার ধারণ করতে পারে।

অতএব এখানে কিছু মাত্র বিস্মিত হওয়া চলে না যে অস্ট্রীয় সরকার সার্বিয়াকে শত্রু গণ্য করে। রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, আয়তনে এবং জনসংখ্যার হিসাবে। কিন্তু দেশটি সশস্ত্র, যুদ্ধ প্রিয়, উদ্যোগী। এদের জাতিগত আনুগত্য অস্ট্রীয়া এবং হাঙ্গেরি অতিক্রম করে বহুদূর ছড়িয়ে। এটি স্লাবজনগণের প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দু, স্লাভনিক আক্রমণের প্রধান কেন্দ্রও বলা যায়। এটা কোনো অলস কল্পনা নয় যে, একটি আন্দোলন যদি সার্বদের মধ্য থেকে উত্থিত হয়ে সাম্রাজ্যে কুটুম্বদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে তাহলে সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে ব্যাপক ধস শুরু হতে পারে। মধ্যাঞ্চল এবং উত্তরের অসন্তুষ্ট ও আবেগাপ্লুত জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যের অনুকূলে সহানুভূতির প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

অস্ট্রীয় সরকারের সন্দেহ ও শত্রুতা আরো গভীর হয় একটা ভয়াবহ ঘটনার দরুন। সার্বীয় বাহিনীতে একটি গোপন চক্র ছিলো, এদের বলা হতো 'কালো হাত', এরা বৈপ্লবিক এবং জাতীয়তাবাদী। এরা বর্তমান শাসককুল, ওবরেনোভিচ রাজবংশকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। প্রতিদ্বন্দী ওবরেনোভিচ এবং কারাজিগোর্ভিজ রাজবংশের মধ্যে সুপ্রাচীন ও রক্তক্ষয়ী বিবাদের কারণে শুধু নয়, বর্তমান রাজা আলেকজাণ্ডার রক্ষণশীল ও অস্ট্রিয়াপন্থি হিসেবে নিন্দিত বলে। 'কালো হাতে'র অফিসারেরা কোনো কাঁচা কাজ করেননি। তারা রাজকীয় পরিবারে ঢুকে পড়ে (১৯০৩), জবাই করে রাজা ও রানীকে, অতঃপর পার্লামেন্টকে আদেশ করে পিটার কারাজিওরগিভিচকে নিমন্ত্রণ করে শূন্য সিংহাসনে বসানোর জন্য। এই

কারাজিওরগিভিচ বয়োবৃদ্ধ ও মৃদু স্বভাবের এবং তখন তিনি নির্বাসনে। অস্ট্রীয়দের কাছে এটা সান্ত্বনা হতে পারে না যে সার্বিয়ার নতুন রাজা একজন অমায়িক ভদ্রলোক। এই নতুন রাজা জন স্টুয়ার্ট মিলের অন লিবার্টি তর্জমা করেছেন, এটাও অস্ট্রীয়দের কাছে সান্ত্বনার কথা হতেই পারে না। তারা বিশ্বাস করে যে আলেকজাণ্ডার ও তার রাজ্য বলকে কালো হাতের কব্জায় চলে গেছে। উপরন্তু এই চক্র, যে চক্র সার্বিয় রাজার অধীনে গোটা দক্ষিণাঞ্চলীয় স্লাবদের নিয়ে সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন করার কথা ভাবছে তারা উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কোনো অপরাধ করতে দ্বিধা করবে না।

রাষ্ট্রবিদরাও মানুষ, সাধারণ মানুষ না হতে পারেন। একটা বিন্দুতে এসে, রাজ্যের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা পুঞ্জীভূত হবার পর, আত্মবিশ্বাস বলতে আর কিছু থাকে না। বিশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ভিয়েনার রাষ্ট্রবিদগণ দ্রুত সেই সংকটজনক বিন্দুর কাছাকাছি সরে আসছিলেন। কোনো কিছুই ঠিকঠাকভাবে চলছিলো না। চার দিকে প্রতিবন্ধকতা, কঠোর পরিশ্রম করেও তা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। বিবাদ যে রূপ ধারণ করেছে তা শান্ত করতে যে-কোনো কায়দা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে, যে বিপদ ঘনায়মান তার বিস্তৃতি ও গভীরতা কোনেটাই কারো পক্ষে ঠাহর করা সম্ভব নয়। চারদিকে ক্রোধ ও অধৈর্যের আবহ। সার্বদের সালাম জানিয়ে দেওয়া, এই ভুঁইফোড় আততায়ী ও ষড়যন্ত্রকারী জাতিকে চরম শিক্ষা দেওয়া, প্রতিটি কমবখত সার্বকে তার সঠিক স্থান নির্দেশ করে দেয়া চূড়ান্ত অভিলাষে পরিণত হয়। সৈনিকরা বার বার নিবারণমূলক যুদ্ধের জন্য চাপ দিতে থাকে। পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও, বলা যায় সম্ভবত জার্মানরা নিরুৎসাহ করে বলে ভিয়েনার বেসামরিক নাগরিকেরা সৈনিকদের আহ্বানে গুরুত্ব দিয়ে কান পাতে নি।

যে বছরের বসন্তকালে (১৯০৮) এহরেনথাল সফল অথচ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা সম্ভব করে তোলেন, সে বছর তুর্কিদের মধ্য একটা অদ্ভুৎ বিপ্লবের সূচনা হয়। মূলত বর্বর এই এশীয় জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল পশ্চিম বিশ্বের সঙ্গে মেলামেশার ফলে কিছুমাত্র প্রভাবিত হয়নি একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আমেরিকার যাজকবৃন্দ, ফরাশি উপন্যাস, প্যারিস ও বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি তুর্কি সমাজের ধনাঢ্য অংশকে দুনিয়া সম্পর্কে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করে। দুর্নীতিপরায়ণ ও অবক্ষয়ী একটি সমাজে দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদের উত্তেজনা প্রবল আকার ধারণ করে। এই সমাজ এতকাল দুর্বল ও খেয়ালি আবদুল হামিদের শাসনে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলো। ক্রমান্বয়ে এই জাতীয়তাবাদ রূঢ় বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস নামের একটি সংগঠন গোপনে গঠন করা হয় অটোম্যান সাম্রাজ্যের পশ্চিমী শক্তিগুলির গ্লানিকর দাসত্ব নিরাকরণ করার জন্য। সংগঠনের দ্বিতীয় লক্ষ্য, আধুনিক ও সচল অটোম্যান রাষ্ট্র সৃষ্টি। এই সংগঠন প্রথম মিলিত হয় জেনেভায় (১৮৯১), অতঃপর নিঃশব্দে প্যারিসে পাড়ি জমায়, সবশেষে স্থির হয় স্যালোনিকাতে (১৯০৮)। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ব্যবহারজীবী এবং ডাক্তার, এদের কেউ কেউ ইহুদি সম্প্রদায় থেকে এসেছেন, অন্যেরা সৈনিক। যে অংশ সাধারণভাবে আলোকিত তারা রুশ পার্বত্য আনাতোলিয়ার তুরস্কবাসী নয়, তারা সমুদ্র বন্দর ঘিরে গড়ে ওঠা শহরগুলির শিক্ষিত শ্রেণী। এদের ভাবধারা ও সংস্কৃতি ইউরোপীয়। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে একজন হলেন এনভার (আনোয়ার?), একজন তরুণ অফিসার, যিনি সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন বার্লিনে; অপর একজন হলেন তালাত, স্যালনিকার টেলিগ্রাফ দপ্তরের সামান্য কেরানি; এবং জাভিদ (Djavid), জনৈক ইহুদি মহাজন। যখন তৃতীয় আর্মি কোর, মেসিডোনিয়ায় কর্তব্যরত, তাদের সংগঠনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা

করে, তখন উক্ত সংগঠন সব রকমের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে, ঘোষণা করে ১৮৭৬ সালের তুর্কি শাসনতন্ত্র এবং রাজধানী অভিমুখে অভিযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়।

গোটা ইউরোপকে অবাক করে দিয়ে তরুণ তুর্কিদের বিপ্লব তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জন করে। মিথ্যা সহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে সুলতান শাসনতন্ত্র মেনে নেন, পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, তার গোয়েন্দা বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেন, উপরন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সাম্যের পক্ষে ঘোষণা রাষ্ট্র করেন। এর অনতিকাল পর (২৭ এপ্রিল, ১৯০৯) সুলতান তার ঘোষণাদির দায়িত্ব অস্বীকার করেন এবং তাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। তরুণ তুর্কিরা এখন দেশের নিরঙ্কুশ প্রভু। হামিদ বংশের দীর্ঘ রাজত্বকাল, যার ভিত্তি ছিলো নিষ্পেষণ ও গোয়েন্দা নির্ভর, অবশেষে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে অবসানের ভেতর। নতুন সুলতান, পঞ্চম মোহাম্মদ হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অনুপ্রাণিতের মতো পর্যবেক্ষণ করেন যে তুরস্কের নিরাপত্তা ও সুখ নির্ভর করে "দ্রুত এবং গুরুত্বের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপর।"

কয়েক সপ্তাহের জন্য পশ্চিম বিশ্বের পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে, তুর্কিদের সম্পর্কে সাধারণ্যে যে ধারণা প্রচলিত তা সংশোধন করতে হবে। এখানে একটি মুসলিম সরকার গঠিত হয়েছে, যে সরকার অতীতে তুরস্ক দেশটি শাসনের জন্য যত কর্মপন্থা তৈরি হয় তার সবগুলি অস্বীকার করার জন্য তৈরি। এই সরকার উদারপ্রকৃতির এবং গণতন্ত্রী। এই সরকার সংসদীয় ব্যবস্থায় আস্থাশীল এবং মানবিকতা বোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তারা খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে (বলক্যান এলাকার) রাষ্ট্রীয় সকল সুবিধা ও ক্ষমতা প্রদান করতে ইচ্ছুক, তুর্কি রাষ্ট্রকে তারা গড়ে তুলতে চায় পশ্চিমী আদর্শে। আধুনিক সভ্যতার সকল সুবিধা প্রবর্তনও তাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ইংল্যান্ডের সর্বত্র তুর্কি রাষ্ট্রের নামে জয়ধ্বনি শুরু হয়। সর্বত্র বলাবলি শুরু হয় যে, তরুণ তুর্কিরা স্বাধীনতা নামক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য উন্মুখ, তারা চায় বসফরাসের তীরে ওয়েস্টমিনস্টার প্রতিষ্ঠা করতে।

এই আস্থাগুলি অতিবিলম্বে বন্যতম অসার বলে প্রমাণিত হয়। উদারপন্থি বলতে যা বোঝায় তরুণ তুর্কিরা তার ধারে কাছে ছিলেন না। তাদের আন্দোলনের চালিকা শক্তি ছিলো উত্তপ্ত ও উগ্রজাতীয়তাবাদ। খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে কোনো প্রকার সুবিধা প্রদান তাদের কল্পনায়ও ছিলো না। হামিদ বংশের নোংরা চাঁদা আদায়ের কায়দা এবং অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের স্থলে তারা প্রতিষ্ঠিত করে পদ্ধতিগত ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন নির্যাতন এবং নিষ্পেষণ। দেশে শুরু হয় নিদারুণ বিশৃঙ্খলা, ঘোর দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায় বহুগুণ। মেসিডোনিয়া রাজ্যের মিশ্র জনসংখ্যা, বুলগার, গ্রিক এবং সার্বদের অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে যায়। নতুন করে কর আরোপ করায় আলবেনীয়রা ক্ষিপ্ত হয়। ক্রিট দ্বীপের সঙ্গে গ্রিসের সংযুক্তির উপর জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। মাত্র দুই বৎসরের কম সময়ের মধ্যে এইসব তুর্কি জাতীয়তাবাদীদের সরকার অভাবিত সাফল্য অর্জন করে, যা কোনো রাষ্ট্রবিদ কল্পনাও করতে পারবেন না। একটা বলবান ও ভয়ানক মুসলিম স্বৈরতন্ত্র আকস্মিকভাবে বলক্যান অঞ্চলের বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটায় এবং খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীগুলিকে একতাবদ্ধ করে গঠন করে সামরিক লিগ। এদের লক্ষ্য বিরূপ বিশ্বে সর্বশেষ বেপরোয়া প্রচেষ্টা দ্বারা তুর্কি সাম্রাজ্য শক্ত মাটির উপর দাঁড় করানো।

যে বলক্যান নাটকের সূচনা হয়েছিলো সালোনিকাতে তুর্কি বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তা এবার সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছায়। এই মুহূর্তের জন্য আমাদের আলোচনা একটু ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হবে। আমরা এবার তাকাবো মরক্কোর আটলান্টিক উপকূলের অখ্যাত বন্দর

অগাদির-এর দিকে। ফেজ নগরে ফরাসিরা সামরিক অভিযান প্রেরণ করায় উদ্বিগ্ন হয়ে জার্মানরা অবিজ্ঞের মতো অগাদির বন্দরে প্যান্থার নামক গান বোট প্রেরণ করে। এই ঘটনার দরুন প্যারিস, লন্ডন এবং রোমে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ইংল্যান্ডের চ্যান্সেলর অব দি এক্‌চেকার মি. লয়েড জর্জ তার ম্যানসন হাউস বক্তৃতায় স্বীয় অবস্থান অতিক্রম করে জার্মানিকে হুঁসিয়ার করে দিয়ে বলেন যে এই সমস্যাকে ছুতো করে তার সরকার যদি ফ্রান্সের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তাহলে ইংল্যান্ড চুপ করে বসে থাকবে না। মরক্কোর উপকূলে জার্মান গান বোট প্রেরণ করায় রোমে সাম্রাজ্যিক অভিযানের উদ্দীপনা জাগ্রত হয়: কারণ ইতালির গায়ে ইতিমধ্যে চলতি জ্বর স্পর্শ করেছে। যে ইতালীয় ভূখণ্ডগুলি এখনো অস্ট্রীয় জোয়ালের অধীনে রয়েছে সেগুলি দাবি করে সে এখন সন্তুষ্ট হতে চায় না। তার এখন খায়েস আফ্রিকান সাম্রাজ্য। ইতালির নজর এখন ত্রিপোলির দিকে, সে মনে করে জার্মানির যদি উত্তর আফ্রিকান উপকূল সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা থেকে থাকে তাহলে তার পক্ষে আর সময় নষ্ট করা চলে না। এমনকি গিলোট্টি, যিনি নিখুঁত পার্লামেন্টারি শিল্পী হিসেবে গণ্য, কোনো দিন দুঃসাহসিক অভিযান পছন্দ করেন নি, কিন্তু তিনি সব সময় মাটিতে কান পেতে থাকেন, অনুভব করেন যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। প্রায় কোনো প্রকার অজুহাত ছাড়াই তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ইতালীয় বাহিনী লিবিয়ায় প্রেরণ করেন।

এখন এটা পরিষ্কার যে বলক্যান এলাকার খ্রিস্টান জনগণ যদি তুরস্কের উপর আক্রমণ চালাতে চায় তাহলে এটি সুবর্ণ সুযোগ। কারণ তুর্কি বাহিনী এখন আফ্রিকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, ইতালীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করছে তাতে তুর্কিরা জয়ী হতে পারবে না। তথাপি, বলক্যান লিগ গঠন ছিলো বিস্ময়কর কৃতিত্বের ব্যাপার। এই কৃতিত্ব অর্জন প্রধানত সম্ভবপর হয় তরুণ তুর্কিদের সহিংস অপশাসনের জন্য। এ সময় কয়েকজন অসাধারণ রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাবের কারণেও কাজ দ্রুত এগোয়। এদের একজন হলেন জে. ডি. বুরচিয়ার টাইমস পত্রিকার বুলগেরীয় প্রতিনিধি, আর একজন হলেন ক্রিট দ্বীপের ভেনিজেলোস, স্বীয় দ্বীপের গৃহযুদ্ধের কারণে তার মন কঠিন হয়ে যায়, তাছাড়া দ্বীপবাসী হওয়ার দরুন মহাদেশীয় অন্যান্য গ্রিক রাজনীতিবিদের চেয়ে তার চলতি ঘটনাবলি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অনেক বেশি নিরাসক্ত।

লিগ গঠনের ঘটনা যদি হয় উল্লেখযোগ্য, তাহলে বলতে হয় যে এর সাফল্য ছিলো বিস্ময়কর। প্রতিটি ক্ষেত্রে তুর্কি সেনাপতিদের কৌশলের ক্ষেত্রে পরাভব মানতে দেখা যায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে তুর্কিরা পরাজয় বরণ করে। বুলগাররা মূল অটোম্যান বাহিনীকে পরাস্ত করে থ্রেসে, প্রথমে কার্ক কিলিসে, ১৯২২ সালের ২৩ অক্টোবর, অতঃপর লুলে বুরগাসে, শত্রু বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে চাটালজার পশ্চাতে সরে যায়। বুলগাররা যখন পূর্বাঞ্চলে এই বিস্ময়কর বিজয়গুলি অর্জন করেন (বিস্ময়কর এজন্য যে তারা অর্জন করে সম্পূর্ণ বিজয় এবং দ্রুততার সঙ্গে), তখন গ্রিক বাহিনী প্রাণপণ লড়াই করে স্যালোনিকাতে ঢুকে পড়েছে, সার্বরা কুমানভোতে প্রচণ্ড লড়াই করে জয়ী হয়, অনেক কাল আগে কসভোর লড়াই-এর গৌরবময় স্মৃতি তাদের মন থেকে মুছে যায়। চতুর্দশ শতকের উচ্চ লড়াই-এ সার্বীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। এই বিজয়ের তাৎপর্য তখন বড়ো একটা উপলব্ধি করা যায়নি। অথচ ইউরোপের পার্শ্ব রক্ষার জটিল সমস্যায় এই বিজয় গুরুত্বপূর্ণ পালন করে। এই বিজয় সম্পূর্ণ এবং অপ্রত্যাশিত বিজয়। এ ধরনের বিজয়ে একটি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। এই বিজয়ে

উক্ত অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার পথ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সার্বিয়ার প্রাচীন রাজধানী পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। মধ্য মেসিডোনিয়ার প্রবেশ দ্বার মনাস্টিরও যুক্ত হয়। মাত্র ছয় সপ্তাহের অভিযানে ছয়শত হাজার সৈন্যের সাহায্যে কনস্ট্যান্টিনোপলের বাইরের সকল ইউরোপীয় তুর্কিদের কার্যত ধ্বংস করে।

এইসব অসাধারণ ঘটনাবলি অস্ট্রিয়ার জন্য কতোটা হতাশাব্যঞ্জক ছিলো তা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। অস্ট্রিয়ার আশংকার প্রধান উৎস সার্বিয়া এই যুদ্ধে তার সুনাম বহুগুণ বৃদ্ধি করে, তার ভূ-খণ্ড বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, তার আশা-ভরসা হয় উদ্দীপিত। বলকানদের জন্য নতুন মানচিত্র তৈরির লক্ষ্যে লন্ডনে আহূত সম্মেলনে অস্ট্রীয়দের মূল লক্ষ্য এই ছিলো যে সার্বদের আড্রিয়াটিক সাগরে যাওয়ার পথ করে দেয়া যাবে না। ফলে ক্ষুদ্র পার্বত্য ভূ-খণ্ড আলবানিয়া তীব্র কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। অস্ট্রিয়া চায় আলবানিয়ায় সার্বদের কোনো হাত থাকবে না। এদিকে রাশিয়া সার্বিয়ার সমুদ্রে যাওয়ার অধিকারের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে। ইউরোপে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, অবশ্য যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়। জার্মানি প্রভাব খাটিয়ে অস্ট্রিয়াকে শান্ত করে, ইংরেজরা রুশদের মস্কুর হতে পরামর্শ দেয়, আর সমস্যা এড়ানো হয় স্বাধীন রাষ্ট্র আলবানিয়া সৃষ্টি করে। দেশটি শাসন করবেন একজন জার্মান রাজকুমার।

লন্ডনে যখন সম্মেলন চলছে তখন এনভারের (Enver) নেতৃত্বে তরুণ তুর্কিরা একটি বিপ্লব সম্পন্ন করে কনস্ট্যান্টিনোপলে, সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধের সূচনা করে। এবার যুদ্ধাভিযানে দুটি বিজয় এবং একটি বিপর্যয় ঘটে। গ্রিকরা দখল করে ইয়ানিনা, সার্ব ও বুলগেরা আদ্রিয়ানোপলকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। কিন্তু জনৈক আততায়ীর আঘাতে গ্রিসের রাজা জর্জ নিহত হন। এই রাজা ছিলেন অতীব বিজ্ঞ শাসক ; তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো স্বীয় প্রজাদের প্রভাবিত করতেন। লন্ডন সন্ধি (৩০ মে, ১৯১৩) তুর্কিদের ইউরোপের দুটি জায়গায় সীমাবদ্ধ করে, কনস্ট্যান্টিনোপল এবং গ্যালিপলিতে।

সন্ধিপত্রের কাগজের কালি শুকাতে না শুকাতে বিজয়ী পক্ষগুলির মধ্যে পরস্পর ধ্বংসকর বিবাদ বেঁধে যায়। যে তিন মিত্র দেশ তুর্কিদের প্রচণ্ড আঘাত হানে, তাদের মধ্যে বুলগাররা রণক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক সৈন্য পাঠায়, তাদের আত্মত্যাগ এবং ক্ষতিও স্বীকার করতে হয় সব চেয়ে বেশি। তাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতার জন্যই তুরস্কের প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। তারা শত্রু পক্ষের কব্জা থেকে থ্রেস কেড়ে নিতেও সমর্থ হয়। অধিকাংশ পর্যবেক্ষক তখন অনুমান করেন যে বলক্যান যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে অত্র অঞ্চলের সর্বাগ্রগণ্য শক্তি হিসেবে বুলগেরিয়ার অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা খুব বেশি।

বুলগারদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল সুনিশ্চিতভাবে। এর জন্য পশ্চিম ইউরোপের পর্যটকরা তাদের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হতেন। পর্যটকরা একই সঙ্গে আশ্বস্তও বোধ করতেন। সার্বদের মতো তারা অতোটা মাথা গরম করতেন না, পলায়নী মনোবৃত্তি কিংবা অস্থিরচিত্ততা তাদের মধ্যে গ্রিকদের চেয়ে অনেক কম ছিলো, তারা তুর্কিদের মতো মূর্খ এবং নির্বোধ ছিলো না। তাদের ফার্দিনান্দ (কোবার্গের) খুব জনপ্রিয় ছিলেন না, তবে তিনি ছিলেন কৌশলী এবং উচ্চাভিলাষী নেতা। জানা যায়, একে ভিয়েনায় খুব পেয়ার করা হতো। বুলগাররা ভূ-খণ্ড লাভের জন্য অত্যন্ত ক্ষুধিত ছিলো, তারা দুটি যুদ্ধাভিযানে যোগ দিয়ে লুটতরাজ যে ভাগ পায় তাতে মোটেই খুশি হয়নি। তারা কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করতে শুধু ব্যর্থ হয়নি, তারা এটাও

জানতো যে, তুর্কিরা যতোই দুর্বল হোক না কেন, বসফরাসের তীরে অবস্থিত শহরে রাশিয়া তাদের কিছুতেই যেতে দেবে না। যুদ্ধের বড়ো বড়ো পুরস্কারগুলি কেড়ে নেয় তার মিত্ররা, প্রথমত গ্রিকরা, যারা স্যালোনিকা দখল করে ; আর সার্বরা, যাদের বাহিনী এখন মধ্য মেসিডোনিয়ায় অবস্থান করছে। তারা এটাও সন্দেহ করে যে, বাস্তবে দেখা যায় তাদের সন্দেহ অমূলক ছিলো না, সার্বরা ও গ্রিকরা যা লাভ করেছে তা কোনো কিছুরই বিনিময়েই হাত-ছাড়া করবে না। যেহেতু মেসিডোনিয়ার বিরাট একটা অংশ ছিলো বুলগার বংশোদ্ভূত, ফলে বুলগেরিয়া ভাবাবেগের বশে অত্যন্ত বোকামি করে তাদের সাম্প্রতিক মিত্রদের আক্রমণ করে বসে (আগস্ট, ১৯১৩)। সার্ব ও গ্রিকরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন বলা চলে, রুমানীয়রাও উত্তর দিক থেকে আক্রমণে শরিক হয়, বুলগাররা ভয়াবহ পরাজয় বরণ করে, অতঃপর গ্লানিকর শান্তি স্থাপনে বাধ্য হয়।

ভিয়েনার রাজনীতিজ্ঞরা বলক্যান অঞ্চলের এইসব ঘটনা ছরাক্রান্ত উদ্বেগ এবং গভীর হতাশার ভেতর লক্ষ্য করেন। অতএব বলক্যান অঞ্চলের সামগ্রিক ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় যে, ভিয়েনার মিত্র বুলগেরিয়া হয় বিধ্বস্ত, তুরস্ক হয় দুর্বল, যার মধ্যে কাইজার সম্প্রতিকালে একজন মিত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। এদিকে সার্বদের শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এই খুদে জনগণ অর্থাৎ সার্বরা যে সামরিক বিজয় অর্জন করে তা ছিলো সত্যিই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তারা তুর্কিদের পরাজিত করে, তাদের সাহায্য মেলে আড্রিয়ানাপোল দখল করার জন্য। তারা বুলগেরিয়াকে গভীর গ্লানিতে নিমজ্জিত করার জন্য বাস্তব সহায়তা যোগায়। গ্রিক ও সার্বরা এখন সম্মুখ সারির লোক ; বিজয়ে অনুপ্রাণিত, রুশ সাহায্য লাভের ব্যাপারটা সুনিশ্চিত, তারা এখন স্বপ্ন দেখে বসনিয়া এবং হারজিগোভিনার কটুম্বদের সংযুক্তি (তাদের সঙ্গে), উপরন্তু এমন একটা রাজ্যের কল্পনা করে যা আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূল বরাবর বিস্তৃত। অস্ট্রিয়ার জেনারেল স্টাফ তাদের সরকারকে বারবার বলেছেন, এই বিপজ্জনক ছোট্ট জাতিকে (কৃষক সৈনিক দ্বারা গঠিত) চরম শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। এবং এটা করতে হবে তারা অতিরিক্ত শক্তিশালী হওয়ার আগেই। এখানে প্রলুব্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট তাগিদ রয়েছে। কারণ ভিয়েনা উৎকট স্বাদেশিকতাবোধ দ্বারা আক্রান্ত এবং যুদ্ধংদেহী মনোভাবপুষ্ট, তবু সৈনিকদের আহ্বান অগ্রাহ্য করা হয়। তাহলে কি কি বিকল্প থাকে? ধৈর্যশীল আত্মরক্ষা, নাকি ইম্পিরিয়াল শাসনকাঠামোর আমূল সংস্কার, স্লাবদের আশা-ভরসা মোকাবেলা করার জন্য? দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা একটা সমাধানের কথা ভাবেন। তাদের প্রস্তাব হলো, দক্ষিণাঞ্চলের সার্বদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হোক, তাছাড়া সাম্রাজ্যের কর্মকাণ্ডে তারা যেন আগের অধিক হারে প্রভাব খাটাতে পারে। কথিত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুক্তি দেখান যে, এটা কি সম্ভব নয় ম্যাগিয়ার এবং জার্মানদের অধীনে দ্বৈত রাজতন্ত্রের পরিবর্তে তেসুরো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যাতে স্লাভ, ম্যাগিয়ার এবং জার্মানরা সমান প্রভাব ভোগ করবে? এই সময়ে জোর গুজব রটে যে, স্বয়ং প্রিন্স ফ্রানজ ফার্দিনান্দ (তিনি অস্ট্রীয় সিংহাসনের দ্বৈধ উত্তরাধিকারী) এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা করছেন। কিন্তু বেলগ্রেড এবং আগ্রামের উৎসাহী সার্বীয় জাতীয়তাবাদীরা যে স্বপ্ন দেখে তা প্রিন্স ফার্দিনান্দের পরিকল্পনার একেবারে বিপরীত।

বৃটিশ এবং আইরিশদের মধ্যে বিরোধ

ইংল্যান্ডে কমন্সসভা নিয়ে প্রশ্ন। বর্ধমান সামাজিক সংঘর্ষ। সমাজ সেবা বৃদ্ধি। ইংরেজ শ্রমিক আন্দোলন। আইরিশ প্রশ্ন। জাতীয়তাবাদ ও আলস্টার। আইরিশ সংসদীয় দল ও সিনফিন। গৃহবিবাদের পায়তারা। আইরিশ আমেরিক্যানস। ইংল্যান্ডে প্রচণ্ড দলীয়তা। যুদ্ধের প্রস্তুতি। শান্তির মনস্তত্ত্ব প্রবহমান।

১৯০৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল, জাতীয়তাবাদী এবং শ্রমিকদের বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করে লিবার‍্যাল পার্টি ক্ষমতায় আসে। বস্তুত তারা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতাও লাভ করে। তবে ক্ষমতায় এসেই তারা একটা বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়। দলের কর্মসূচি অনুসারে প্রধান যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়, যেমন মিতাচার (মদ্যপান ব্যাপারে), ধর্মীয় গোষ্ঠী নিরপেক্ষ শিক্ষার প্রসার, ওয়েলশের অস্তিত্বের অবসান, আইরিশ হোম রুল, এগুলিকে ঝেটিয়ে বিদায় করা হয়, অথবা সম্ভাবনা দাঁড়ায় যে লর্ডসভা এই ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লাগবে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় নাম-কা-ওয়াস্তে চালু গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অধীনে, কোনো দলই, তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার আকৃতি যতই বড়ো হোক না কেন, নির্বাচকমণ্ডলীর কাছ থেকে আজ্ঞা প্রাপ্তি যতই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা হোক না কেন, বংশানুক্রমিক চেম্বারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে দল কোনো বিল পাস করতে পারবে না। লিবার‍্যাল দলের সদস্যরা যুক্তি দেখান যে গণতান্ত্রিক সভ্যতায় কোনো সংস্থার পক্ষে এ ধরনের ভিটো প্রদানের ক্ষমতা বিরাট অনিয়ম বৈ কিছু নয়। এ রকম অনিয়মের পক্ষে কোনো কথা চলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তারা দাবি করেন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে গণভিত্তিক চেম্বার। লর্ড সভার সদস্যরা যখন নজিরবিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১৯০৯ সালের বাজেট বাতিল করার প্রচেষ্টা চালায় তখন মি. অ্যাসকুইথ, যিনি আগের বছর দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, দেশের সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং দ্বিতীয় চেম্বারের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য আজ্ঞা লাভের প্রার্থনা জানান। লর্ড সভার সদস্যরা যদি সত্যিই বড়ো বেশি জেদ ধরেন তাহলে তিনি রাজশক্তিকে চারশত পিয়ার[১] তৈরির জন্য সুপারিশ করতে মনস্থির করেন। এরকম গুরুতর শাসনতান্ত্রিক বিবাদের মাঝখানে সপ্তম এডওয়ার্ড দলগুলির বিরোধ মিটিয়ে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করেন এবং মারা যান, অতঃপর সিংহাসনে আরোহণ করেন পঞ্চম জর্জ, সপ্তম এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় এবং একমাত্র জীবিত পুত্র সন্তান।

দ্বিতীয় চেম্বার প্রশ্নে আবেগের যে উগ্রতা সৃষ্টি হয় তা তৎকালীন প্রজন্মের কাছে বিকট ব্যাপার বলে গণ্য হতে বাধ্য। কারণ উক্ত প্রজন্ম ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট অ্যাক্টে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। উক্ত অ্যাক্ট পার্লামেন্টের আয়ুষ্কাল কমিয়ে মাত্র পাঁচ বছর করেছে, লর্ডসভা কর্তৃক

---

১. Peer-ডিউক, আর্ল ইত্যাদি।

ফিনান্স বিল বাতিলের ক্ষমতা করা হয়েছে রহিত, তাছাড়া ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে জনস্বার্থের অনুকূলে তৈরি কোনো বিল যদি সংসদের[২] পর পর দুটি অধিবেশনে তিন বার পাশ হয় তাহলে লর্ডসভা তা কোনো অবস্থায় বাতিল করতে পারবে না। যাহোক, তখন এটা উপলব্ধি করা হয় নি যে লাল বিপ্লবীদের কোনো সরকার বিধি থাকা সত্ত্বেও বিল পাসের জন্য দু'বছর অপেক্ষা করবে না, কারণ এই সরকার অতি সহজে এবং দ্রুততার সঙ্গে ধনীদের সর্বস্বান্ত করতে সক্ষম মুদ্রার অবমূল্যায়ন করে, তদুপরি সৈনিক ও পুলিশ বাহিনীর পেশাসংঘে অবনতি ঘটাতে পারে আইন-শৃঙ্খলার। রক্ষণশীলরা বিশ্বাস করতেন যে লিবারালরা যদি দ্বিতীয় চেম্বারের প্রতিরোধ অতিক্রম করে তাহলে বিপ্লবের প্রবল জোয়ার রোধ করা যাবে না, তাদের মতে এই জোয়ারেই গোটা বিশ্ব প্লাবিত হচ্ছে। ১৯০৯ সালের বাজেট পরীক্ষা করে তারা আতংকিত হয়ে পড়েন, কারণ উক্ত বাজেটে জমি থেকে অনুপার্জিত আয় বৃদ্ধির উপর কর বসানো হয়। তারা আরো দেখতে পায় যে ভবিষ্যতে পার্লামেন্টে আর্থিক লুণ্ঠনের কোনো সীমা থাকবে না। তাদের কাছে সব চেয়ে তিক্ত ব্যাপার মনে হয়েছে এই সম্ভাবনা যে লর্ড সভার চূড়ান্ত ভিটো প্রদানের ক্ষমতা যদি আর না থাকে তাহলে আইরিশ হোম রুল পাসের বিরুদ্ধে শেষ প্রতিবন্ধকতারও অবসান ঘটবে। পর পর দুটি নির্বাচনে লিবারালরা ১৯০৬ সালে অর্জিত সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। ফলে তারা জোর করে দেশে বিরাট ধরনের পরিবর্তন আনবে। কারণ এখন তারা আইরিশ ও শ্রমিক ভোটের উপর নির্ভরশীল। রক্ষণশীল দলের কাছে এটা অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু নয় (ভোট লাভের জন্য পরিবর্তন আনয়নের ব্যাপারটা)।

বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে আতংকিত বোধ করার অনুকূলে কিছু আপাতত কারণ ছিলো। যে সামাজিক অবস্থার মধ্যে মানবতার বৃহদংশ বাস করতে বাধ্য হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনের লক্ষণ সর্বত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। এ ধরনের আন্দোলনের ফলে অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাছাড়া ইউরোপ মহাদেশে সমাজতন্ত্রবাদী এবং শ্রমিকতান্ত্রিক (syndicalist) আন্দোলন ব্যাপক প্রসার লাভ করে। শ্রমজীবীরা উন্নততর মজুরি ও উন্নততর জীবনের নিশ্চয়তা দাবি করে, তারা আরো চায় অবসর ভোগের সুবিধা, অধিকতর আমোদ-প্রমোদ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। ইংল্যান্ডে শ্রেণীচেতনার প্রচণ্ডতা জার্মানি ও ফ্রান্সের চেয়ে অনেক কম ছিলো, তবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, তরুণদের আকর্ষণ করছিলো মার্ক্সের মতবাদ। সংগঠিত বিক্ষোভের মাধ্যমে শ্রমিকরা নিয়োগ কর্তাদের কাছ থেকে আদায় করছিলো মজুরি বৃদ্ধি। ইংল্যান্ডে ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক সংঘর্ষ কতোটা তীব্রতা লাভ করে তা এই হিসাব থেকেই বোঝা যাবে যে শিল্পকারখানাগুলিতে বিচ্ছুরতা বজায় থাকার দরুন এক বছরে এগারো মিলিয়ন কর্মদিবস বিনষ্ট হয়।

কি ভাবে এমন একটা সভ্যতা গড়ে তোলা যায় যেখানে জনগণকে অর্থের অভাবে সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হতে হবে না সে সমস্যা ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপের প্রতিটি প্রগতিশীল সরকার চিন্তাগ্রস্ত হন। বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন মাত্রায় সাফল্যও অর্জন করেন। যুক্তিশীল সুখ-সুবিধা জার্মানির লোকেরা সবচেয়ে বেশি

---

২ নিম্ন কক্ষের।

উপভোগ করবে। এখানে নগর পরিকল্পনার ব্যাপারটা ছিলো সুদীর্ঘ কালের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা। পার্ক ও উদ্যান, সস্তা নাট্যঘর, কনসার্ট হল, বাউলিং খেলার ব্যবস্থা, খেলার মাঠ প্রভৃতি দোকান কর্মচারী, গৃহভৃত্য এবং কারখানা কর্মীদের আয়ত্তে ছিলো। তারা এসবের সুযোগ অবাধে গ্রহণ করতে পারতেন। অল্প ব্যয়ে এবং অনায়াসে নির্মল আনন্দ লাভের ক্ষেত্রে জাপানের জনগণ ইংল্যান্ডের জনগণের চেয়ে অন্তত এক প্রজন্ম অগ্রবর্তী ছিলো। বৃটিশ কারখানা প্রধান শহরগুলিতে শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি ছিলো ভয়ানক। মানুষের আত্মাকে শুধু ক্ষত-বিক্ষত করেছে। তবে উনিশ শতকের শেষার্ধে সামাজিক বিবেকের জাগরণ ঘটে। সৎ মানুষের তীব্র বিরোধিতার মুখে ১৮৪৭ সালে লর্ড শ্যাফটবেরির প্রস্তাবে টেন আওয়ার্স অ্যাক্ট পাস করা হয়। এতে এই বাস্তবতার স্বীকৃতি প্রদান করা হলো যে অবসর ভোগ মানব সন্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অবসর ভোগের অধিকার রয়েছে। ১৮৭০ সাল এবং ১৮৯১ সালের এডুকেশন অ্যাক্ট এই সত্য স্বীকার করে নেয় যে লোকেরা উক্ত অবসর উদারভাবে ব্যবহার করার অধিকার রাখে। তবু ভিক্টোরীয় যুগে সামাজিক আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও অনেক কাজ পেছনে পড়ে থাকে। এই কাজগুলি করতে হবে। বৃটিশ শ্রমজীবীরা এখনো 'একটা ছায়ার নীচে' বাস করে, এর জন্য তাদের কোনো ত্রুটি ধরা যাবে না। জগতের দূর কোনো অঞ্চলে হয়তো শস্যহানি ঘটেছে, ফলে তাদের নিদারুণ দুরবস্থা। পুওর ল ব্যতিরেকে রাষ্ট্র রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য কিছু করেনি, বৃদ্ধরা হয়েছে অবহেলিত, গর্ভবতী নারীর জন্যও কিছু করা হয়নি, শিশু জনসংখ্যার স্বাস্থ্যের মান রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থাই ছিলো না। শিশু শ্রম শোষণ নিবারণের ব্যাপারে ফ্যাক্টরি আক্টস ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করলেও সুখী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সমাজ গঠনের পথে অন্তরায় থেকেই যায়। ইংরেজ পল্লীর বাড়ি-ঘরগুলি সৌন্দর্য, আরাম এবং মার্জিত রুচির জন্য সুপ্রসিদ্ধ। তবে বড়ো বড়ো কারখানা শহরগুলি যত্রতত্র গড়ে উঠতে দেয়া হয়, এগুলি ছিলো হতশ্রী এবং বসবাসের অযোগ্য। অর্থ উপার্জনের জন্য অতিরিক্ত লোভের সঙ্গে যদি বিশুদ্ধচারিতার অদ্ভুৎ মিলন ঘটে তাহলে উপরোক্ত ঘটনা না ঘটার কারণ থাকে না।

যুদ্ধের আগের আট বছরে এই সামাজিক অমঙ্গলগুলি দূর করার জন্য দুটি সুদক্ষ লিবারাল প্রশাসন সাহসী প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। শ্রমজীবীদের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেকারত্বের বিরুদ্ধে বিমার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বৃদ্ধদের জন্য চালু করা হয় অবসর ভাতা। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইন অনুমোদন করা হয় ছোটদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য। ১৯০৯ সালের Sweated Industries Act অনুসারে ট্রেড বোর্ড গঠন করা হয় শিল্পকারখানার শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের লক্ষ্যে। অন্তত যেখানে মজুরি একেবারে কম সেখানে এই আইন অবশ্যই কার্যকর হবে। দোকান কর্মচারীদের এবং খনি শ্রমিকদের দিনের কার্যকাল হ্রাস করা হয় পার্লামেন্টে আইন পাস করে। সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয় গৃহায়ণ এবং নগর পরিকল্পনা আইন। কৃষি কর্মে নিয়োজিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কাউন্টি কাউন্সিলগুলিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয় বাধ্যতামূলক ক্রয়ের নিয়মে জমি অধিগ্রহণের। এইসব জমি কৃষকদের মধ্যে বরাদ্দ করা হবে। অ্যাসকুইথ সরকার বিসমার্কীয় সমাজতন্ত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণে কুণ্ঠিত হননি, কিংবা সংবিধিতে সংযুক্ত করেছেন ন্যূনতম মজুরির বৈপ্লবিক নীতি।

গ্লাডস্টোনপন্থী লিবারাল্যদের কাছে (যারা লালিত হয়েছেন অবাধ বাণিজ্যের ঐতিহ্যে) রক্ষণশীলদের মতোই মনে হয়েছে যে জনসাধারণের হিতসাধনের জন্য এই যে উদার নীতি

গ্রহণ করা হলো, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের নীতিও অনুমোদন করা হলো তা নৈতিক স্বাধীনতার মূলে আঘাত করবে এবং দেশের আর্থিক শক্তির বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। এর চেয়ে গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হয় লিবারাল্যালদের অন্য দুটি কর্মপন্থার বিরুদ্ধে। নীতি দুটি হলো সংগঠিত শ্রমশক্তি এবং আইরিশ হোম রুল।

ইউরোপীয় মহাদেশে যেখানে শ্রমিকদের শিল্প সংগঠন গঠিত হবার আগেই সমাজতান্ত্রিক দলগুলির অভ্যুদয় ঘটে, সেখানে বৃটেনের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা ছিলো একেবারে বিপরীত। এখানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয় অনুমোদিত তথা অর্থনৈতিক প্রশাসন যন্ত্রের আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে, আর এটি ঘটে সমাজতান্ত্রিক দলের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অনেক আগে। ফরাসি ও ইতালিয় সিন্ডিক্যালিস্টরা চেয়েছে বৈপ্লবিক উপায়ে সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই উৎখাত করতে। তুলনায় ইংরেজদের শ্রমিক আন্দোলন ছিলো বাস্তববাদী মিতাচার ও ঐকান্তিকতার ব্যাপার। দূরবর্তী স্বপ্নের চেয়ে নিকটবর্তী বাস্তবতাকে তারা বেশি মূল্য দিয়েছে। তারা বাস্তবায়িত করতে চেয়েছে যে শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হোক, তাদের দিনের কার্যকাল হোক আট ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ। হিংসাত্মক উপায়ে সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনকে তারা কখনো লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেনি। এ জন্যই গ্রেট বৃটেনের খনি শ্রমিকদের ফেডারেশন গঠিত হয় ১৮৮৮ সালে, তারা খনি শ্রমিকদের সুবিধা দানের বিশেষ রীতির বিরোধিতা করে (রীতিটা স্লাইডিং স্কেল নামে অভিহিত)। অপর পক্ষে, পরবর্তী বছর জন বার্নস ও টম মানের নেতৃত্বে ডক শ্রমিকরা যে ধর্মঘট পালন করে তার লক্ষ্য ছিলো লন্ডন ডক শ্রমিকদের প্রতি ঘণ্টার জন্য অতিরিক্ত পয়সা আদায়। এমন কি কেইর হার্ডির মতো শ্রমিক নেতারাও, যারা সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেন, যেমন মনে করতেন উৎপাদনের উপায়, বিতরণ ও বিনিময়ের জন্য যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তারা বিশ্বাস করতেন যে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে বিপ্লব সাধন সম্ভবপর। পার্লামেন্ট কোনো শত্রু নয় যে তা ধ্বংস করতে হবে, বরং পার্লামেন্টকে মিত্র হিসেবে জয় করতে হবে। ১৮৮৮ সালে কেইর হার্ডি মিড-লানার্ক থেকে নির্বাচনে দাঁড়ান স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে, আর পাঁচ বছর পর গঠন করেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি। ঐদিন থেকে বৃটেনের শ্রমজীবীরা কমন্স সভায় অবরোধ আরোপ করে, আর তাতে যে সাফল্য আসে সেটাই বিপ্লবের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। ১৯০৬ সাল থেকে মাত্র পঞ্চাশ জন 'লেবার' কর্মী সে কালের লিবারাল সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন সামাজিক প্রয়োজনের দিকে।

সুনিশ্চিতভাবে বিজয়ের পরিচায়ক ছিলো যে শ্রমজীবী লোকেরা যেন সহজে পার্লামেন্টে প্রবেশ করতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, নিয়মমাফিক এবং শাসনতান্ত্রিক প্রগতির শর্তই হলো প্রতিটি বৈধ বিক্ষোভের কারণ খুঁজে বের করতে হবে, উক্ত প্রশ্ন ব্যাপারে সুস্থ বিতর্ক হবে, তাছাড়া প্রতিটি বৈধ রাজনৈতিক লক্ষ্য সন্তুষ্টি লাভ করবে কমন্স সভার অধিবেশনে। যুদ্ধের আগে লিবারাল্যাল মন্ত্রিসভাগুলি এটা উপলব্ধি করে। তারা সদস্যদের বেতন প্রদানের প্রথা চালু করে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির শক্তি বৃদ্ধি করে তাদের তহবিল টর্ট বা সামাজিক অন্যায়ের দায় থেকে মুক্ত করে, তাছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অধিকার প্রদান করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলি সংসদের অনুমোদন লাভ করে তিক্ত বিতর্কের পর। অভিযোগ উত্থাপন করে বলা হয় যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এখন অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থান

লাভ করবে। সুযোগ পাবে অন্যায় স্বেচ্ছাচারিতার। এই যে একটা নতুন শ্রেণী ধ্বংসকারী কাজের ক্ষমতা লাভ করবে, একে অভিহিত করা হয় ইংরেজদের পরীক্ষিত এবং প্রাচীন সংসদীয় জীবন থেকে তাড়াহুড়ো করে এবং অন্যায়ভাবে সরে যাওয়া।

আয়ারল্যান্ডের অনেকে চলতে থাকে এবং ইংরেজ পার্লামেন্টে নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মারাত্মক বিভেদের সৃষ্টি করে। দক্ষিণ ভাগের ক্যাথলিক জাতীয়তাবাদীরা লিবারালদের মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে, আলস্টারের উগ্র প্রটেস্ট্যান্টরা টোরিদের সমর্থন পায়। একটি দলের সমস্যার প্রতিকার হলো হোম রুল, তার অর্থ ডাবলিনে পোপ অনুসারী সরকার ; অপর দলের অভিপ্রায় হলো ইউনিয়ন সুরক্ষা ; ব্যাপারটাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য বসানো হবে রেলপথ, জমি ক্রয়, এবং সামাজিক অবস্থার সাধারণ উন্নয়ন। যেহেতু আয়ারল্যান্ডের প্রতিটি পক্ষ ছিলো অদম্য, ফলে কোনো পক্ষ পরাভব মানতে রাজি নয়, বৃটিশ রাজনীতির দেয়া-নেয়ার প্রথা হতবুদ্ধিকর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় ফলশ্রুতিতে। হোম রুলের সমর্থকরা দয়াধর্মের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি নয়। জাতীয়বাদীরা ঘৃণার সঙ্গে বিভাজনের নীতি প্রত্যাখ্যান করে। ডাবলিন পার্লামেন্টের অধীনে যাওয়ার চেয়ে আলস্টারের প্রটেস্ট্যান্টরা স্যার এডওয়ার্ড কারসনের নেতৃত্বে বরং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে এবং রক্তক্ষয়ী বিবাদের জন্য তৈরি হয়। প্রতিটি পক্ষই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের অবস্থান নিশ্ছিদ্র ও ন্যায়সংগত। ক্যাথলিক এবং কেলটিক আয়ারল্যান্ডে সুপ্রাচীন অন্যায়ের স্মৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করে জাতীয়তা, স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিরাট আকাঙ্ক্ষা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে এটা কোনো অর্থই বহন করে না যে আইরিশ জনগণের বাস্তবসম্মত বিক্ষোভ সামগ্রিকভাবে কিংবা বৃহদংশে দূর করা হয়েছে, কিংবা সেই ১৮২৯ সালেই ক্যাথলিকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অযোগ্যতা অপসারণ করা হয়, বন্ধ করা হয় প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের কার্যক্রম, বিতরণ করা হয় কৃষকদের মধ্যে আবাদযোগ্য জমি, পশ্চিম ভাগের জনবহুল জেলাগুলির দারিদ্র্য দূর করা হয়, পঁচাশি জন আইরিশ সদস্য ওয়েস্টমিনস্টারে বসতে পারেন, প্রতিভাবান আইরিশম্যানরা ভাগ্যান্বেষণে গ্রেট বৃটেন কিংবা সাম্রাজ্যের সর্বত্র যেতে পারেন। এসব তাদের তুষ্ট করতে পারে না। তাদের অহংকার আহত তথা বিদ্রোহী হয় যখন তারা দেখতে পায় যে প্রশাসন চালানো হয় ডাবলিন কাসলের ভয়ানক চার দেয়ালের ভেতর থেকে, নেতৃত্ব প্রদান করেন ইংরেজ লর্ড-লেফটেনান্ট এবং ইংরেজ সচিব, আর এদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে কুরাগ থেকে ইংরেজ বাহিনী। বৈদেশিক শক্তির অধীনতা বা দাসত্বের নিন্দা করে আয়ারল্যান্ডবাসীরা দাবি করে যে তাদের আইরিশ পার্লামেন্ট দ্বারা শাসিত হবার অধিকার রয়েছে, এই পার্লামেন্ট জবাবদিহি করবে শুধু আইরিশ নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে। ওয়েস্টমিনস্টারে জন রেডমন্ড এবং তার অনুসারীরা সাম্রাজ্যের ভেতর সুরক্ষিত হোম রুল মেনে নিতে রাজী ছিলেন। ইংরেজ লিবারালদের পরামর্শও তাই ছিলো। অন্যদের দাবি ছিলো এর চেয়ে বেশি। যে অ্যাংলো-আইরিশ পার্লামেন্ট ইংরেজ রাজশক্তির সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, এবং বৃটিশ সংবিধির শৃঙ্খলায় আবদ্ধ, তার অস্তিত্ব মেনে নিতে তারা প্রস্তুত নয়। ১৮৯২ সালে গঠিত হয় গেইলিক লিগ। এই লিগ বৃটিশ আওতার বাইরে, মধ্যযুগীয় কুয়াসার আচ্ছন্ন আয়ারল্যান্ডের কাছে আবেদন রাখে। অপর দিকে আর্থার গ্রিফিথস দাবি করেন 'ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস'। তার দল সিন ফিন নামে পরিচিত হয়। এদের দাবি বৃটিশদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার, স্বদেশজাত

আর্স ভাষার পুনরুজ্জীবন, এবং জাতীয় প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নতুন করে সম্বন্ধ স্থাপন এক দল মেধাবী পণ্ডিত ও কবি আভিজাতিক আদর্শবাদ দ্বারা পুষ্ট করতে চেষ্টা করেন এই আন্দোলনকে। তবে নিচের দিকে যোগ দেয় ষণ্ডা-পাণ্ডা ও বন্দুকধারী ব্যক্তিরা।

আলস্টারের অধিবাসীরা এই আন্দোলনগুলির ছিলেন ঘোর বিরোধী। তাদের বিবেচনায় তিনটি প্রধান কারণ, বিদ্যালয়গুলিতে প্রটেস্ট্যান্ট শিক্ষা, বৃটেনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য, এবং মিতাচার ডাবলিন পার্লামেন্টে প্রণীত আইন দ্বারা বিপদগ্রস্ত হবে। হোম রুলের মধ্যে তারা খুঁজে পান বিচ্ছিন্নবাদিতার প্রথম পদক্ষেপ, আর আয়ারল্যান্ডে সরকার প্রতিষ্ঠার অর্থ বৃটিশ সংযোগের প্রতি স্থায়ী শত্রুতা সৃষ্টি এবং পৃথিবীর সর্বত্র বৃটিশ স্বার্থ বিনষ্টির প্রচেষ্টা। যখন এটা অনিবার্য বলেই মনে হয় যে, পার্লামেন্ট অ্যাক্টের বদৌলতে হোম রুল বিল সংবিধিতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন সূচনা হয় দুঃসময়ের। কারণ গোপনে আলস্টারে অস্ত্রশস্ত্র চালান শুরু হয়ে যায়। অতঃপর যখন গৃহবিবাদের কালো মেঘ আকাশে জমতে শুরু করে তখন রাজা বাকিংহ্যাম প্রাসাদে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন, বিবাদ নিরসনের সম্ভাবনা দেখা যায় না। এর চেয়ে গুরুতর ব্যাপারে গণ মন খুব বেশি দগ্ধ হয়নি। আলস্টারের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিরুদ্ধে সরকার বল প্রয়োগের সাহস করবে কি? আয়ারল্যান্ডের বিবাদ ইংল্যান্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করতে কিভাবে ব্যর্থ হতে পারে? ইংল্যান্ড কি সেনাবাহিনীর সমর্থনের উপর নির্ভর করতে পারে? ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে এটা সম্ভাব্য বলেই মনে হয় যে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কঠিন কাঠামো হয়তো, সপ্তদশ শতাব্দীর পর, আর একবার গৃহবিবাদে ছিন্নভিন্ন হবে।

মনে হয় ব্যাপারটা দ্বীপের সীমান্তের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকবে না, স্থানীয় ব্যাপার হবে না এটি। সারা জগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আইরিশ জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ, ক্যাথলিক আইরিশরা আয়ারল্যান্ডে বাস করে। প্রতিটি বৃটিশ কলনি এবং ডমিনিয়নের আয়ারল্যান্ডবাসী উক্ত দ্বীপের সুখ-শান্তি কামনা করে, আর নিকুচি করে তাদের নির্যাতনকারীদের। প্রতিটি অস্ট্রেলীয় পার্লামেন্টে আইরিশ হোমরুলের পক্ষে প্রস্তাব পাস করা হয়। আমেরিকায় প্রচুর সংখ্যায় আইরিশ বাস করে, সেখানে তারা দারুণ শক্তিশালী। এদের পূর্ব পুরুষদের অধিকাংশই আমেরিকায় অভিবাসন শুরু করে উনিশ শতকের মধ্যভাগে। সে সময় আইরিশদের দুর্দশা চরমে পৌঁছে ছিলো। এবং তখনও দুর্দশা প্রতিকারের জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। এই আইরিশরা আমেরিকায় তাম্মানি (Tammany) নিয়ন্ত্রণ করেছে, এটি ছিলো নিউ ইয়র্কের একটি বিরাট রাজনৈতিক যন্ত্র। এদের কব্জায় চলে যায় বিশুদ্ধাচারী (Puritan) বোস্টন। মধ্য পশ্চিম অঞ্চলে তারা ব্যাপক বৃটিশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে। একমাত্র শিকাগো শহরেই শতাধিক ডলার-কোটিপতি ছিলেন। হার্স্ট নামক শক্তিশালী পত্রিকাগোষ্ঠী আইরিশদের শুভেচ্ছা অর্জনের জন্য বৃটিশদের মতলব ও বৃটিশদের কর্মপন্থা সম্পর্কে কুৎসা রটাতে শুরু করে। এদিকে আমেরিকান রাজনীতিকরা আইরিশ জনবহুল নির্বাচনী এলাকাগুলিতে 'বৃটিশ সিংহের লেজে আঘাত' করার মতো জনপ্রিয় উপায় অবলম্বন করে। কিংবা বলা যায় করতে বাধ্য হয়। 'ক্ষুধার্ত চল্লিশে'র দশকের পর থেকে যে আয়ারল্যান্ডের অবস্থার বিস্তর উন্নতি হয় তাতে আমেরিকান আইরিশদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের তেজ বিন্দু মাত্র কমেনি। সেই ভয়ানক দিনগুলির স্মৃতি তখনও তাদের সমান তাড়া করেছে, বোস্টন ও নিউ ইয়র্কের নিতান্ত দরিদ্র কর্মজীবী নারীরা আইরিশ আন্দোলনের

জনা নিয়মিত চাঁদা দিয়েছে কিংবা তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হয়েছে। আমেরিকার কাছেই পার্নেল আর্থিক সাহায্যের প্রার্থনা জানান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য। আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা আমেরিকার কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ লাভ করে। আর যেহেতু ইংরেজ লিবারাল নেতৃবৃন্দের প্রধান লক্ষ্য ছিলো অ্যাংলো-আমেরিক্যান বন্ধুত্বের পথ থেকে আইরিশ প্রতিবন্ধকতা দূর করা, ফলে তারা সবচেয়ে বেশি হতাশা আক্রান্ত হয় যখন আমেরিকান প্রজাতন্ত্র আইরিশ আন্দোলন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়।

বুয়ার যুদ্ধ এবং আরমাগেডনের সূচনার বছরগুলির মাঝখানে ইংল্যান্ডে এক অসাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। একটা বিলাসী জগৎ আক্রান্ত হয় সংকীর্ণ মনোভাব দ্বারা, কারণ তারা নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছিলেন। ধর্মানুরাগী ভিক্টোরিয়ানপন্থীরা আইন ভঙ্গ করতে রাজি হন তবু শিক্ষা অভিকর প্রদানে কুণ্ঠিত বোধ করেন। অভিজাত ও মার্জিত রুচির মহিলারা জানালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন, পুলিশের সঙ্গে লিপ্ত হয়েছেন বিবাদে, এবং যেন-তেন প্রকারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবার চেষ্টা করেছেন, যেহেতু সরকার তাদের ভোটাধিকার স্বীকার করছে না। লর্ড সভা ও আয়ারল্যান্ড ব্যাপারে দলীয়তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে, ফলে সামাজিক সম্পর্ক নস্যাৎ হবার জোগাড় হয়। অনেকের কাছে সাম্রাজ্যবাদ ও শুল্ক সংস্কার ছিলো ধর্মনিষ্ঠ অনুরাগের সমতুল্য। তারা এর জন্য চাপ দিতে খোলাখুলি উদ্দীপনা বোধ করে। অন্যেরা মনে করতেন এসব নিন্দনীয় ব্যাপার। এতে নির্বিবেচক মুনাফা শিকারীরা নিপীড়িত জনগণকে শোষণের সুযোগ পাবে, অপর পক্ষে দুশাসন ও কায়েমি স্বার্থবাদীরা আইনের বিকৃতি ঘটাতে উৎসাহী বোধ করবে। দেশের কল-কারখানাগুলিতে তখন ভয়ানক অস্থিরতা বিরাজ করছে, ধর্মঘটের দীর্ঘ ছায়া খনি অঞ্চল, রেলওয়ে, এবং কারখানা থেকে শুরু করে বিদ্যালয়গুলিতে বিস্তার লাভ করেছে। এমন কি, ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে কুরাগের অফিসারদের মধ্যে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তারা আতংকিত যে আলস্টারের বিরুদ্ধে বিবাদে তাদের হয়তো অংশগ্রহণ করতে হবে। তাহলে বৃটিশ সাম্রাজ্য কি শেষ পর্যন্ত অবক্ষয় স্পর্শ করতে শুরু করলো? কিপলিং কর্তৃক প্রচারিত এবং শ কর্তৃক উপহসিত স্পার্টান গুণাবলি তলিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির নিম্নতম কুটুরিতে? দিল্লিতে ভারতীয় ছাত্ররা উল্লাসের সঙ্গে লক্ষ্য করে আলস্টার বিদ্রোহের সফল সংগঠন। জার্মানদের কাছে শক্তিধর সমৃদ্ধশালী বৃটেন জড়িত হয়ে পড়েছে ধ্বংসাত্মক আলোড়নে।

তবু দেশটি যুদ্ধের জন্য তখন যতটা প্রস্তুত ছিলো কোনো সময় ততটা ছিলো না। আইনবিশারদ এবং দার্শনিক হ্যালডেন লেখাপড়া করেন জার্মানির গটিংগেনে, শোপেনহর-এর পুস্তকাদি অনুবাদ করেছেন ইংরেজি ভাষায়, তিনি দেশের সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন জার্মানদের নীতি অনুসারে, তবে একটি বীপ শক্তির উপযোগী করে, আবার তা যেন মহাদেশীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে। তার অসাধারণ প্রশাসনিক প্রতিভার জন্যই বৃটেন লাভ করে একটি জেনারেল স্টাফ, একটা এক্সপিডিশনারি ফোর্স, একটা টেরিটোরিয়াল ফোর্স এবং একটা অফিসার্স ট্রেনিং কোর। অনুরূপভাবে নৌশক্তিকে তৈরি করেন স্যার ফিশার, সামুদ্রিক জলতাগে এই নৌবাহিনীকে এক সময় কার্যত মোকাবেলা করতে হবে জার্মান শক্তির। এই নৌবাহিনীর উত্তরাঞ্চলীয় জলতাগে এমনভাবে মোতায়েন করা হয় যে বাহিনীর আধি ভাগ কামান-বন্দুক তাক করা থাকে জার্মান উপকূল

এলাকার দিকে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং নবগঠিত ক্ষুদে একটি বিমান বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ইমপিরিয়াল ডিফেন্স কমিটি ! গোপন নির্দেশনা সম্বলিত একটি পুস্তকে (প্রকাশ করা হবে সৈন্য সমাবেশের পর) মহাদেশীয় যুদ্ধের প্রাথমিক প্রয়োজন সম্পর্কে যে বর্ণনা থাকে তা ছিলো অত্যন্ত নিখুঁত।

এইসব সুচিন্তিত প্রস্তুতি সম্পর্কে সাধারণ লোকদের বলতে গেলে কোনো ধারণাই ছিলো না। মি. লয়েড জর্জ ট্রেজারির অবস্থান থেকে 'সোনালি মাছ বিষয়ে মস্করা করতেন, স্যার এডওয়ার্ড কারসন অগ্রাহ্য করতেন জন রেডমন্ডকে, মিসেস প্যাংকহার্স্ট এবং তার অশান্ত-উদ্বেল ভোটাধিকার দাবিদার মহিলা অনুসারিগণ, বব স্মিলি এবং তার একগুঁয়ে খনি শ্রমিকরা প্রতিভাত হন জনগণের মাঝখানে সবচেয়ে অসুবিধা সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে। অন্যথায় ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়ে সবকিছু ঠিকঠাক চলছিলো, সর্বত্র শান্তি বিরাজিত। যুদ্ধযন্ত্রের কারিগরি প্রস্তুতির কোনো প্রতিরূপ জনগণের মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার মধ্যে ছিলো না। যদিও কোনো কোনো সাংবাদিক লন্ডনে আতংকের বাণী শোনান, কিন্তু শিল্পোন্নত উত্তরাঞ্চলে তাদের আওয়াজ পৌছেনি। এখানে সকলের মনে তখন গ্রীষ্মাবকাশের চিন্তাভাবনা, আর বৈদেশিক যুদ্ধের সম্ভাবনার চেয়ে কম বিষয়ই অধিক দূরবর্তী মনে হয়েছে।

জার্মানি এবং রুশদেশে বিপজ্জনক গতিবিধি

ইউরোপে মহাদেশে জার্মানির প্রাধান্য। জার্মান সমরবাদ। ইংল্যান্ডের প্রতি ঘৃণা। কাইজার-এর বিজ্ঞতার অভাব। বৃটিশ জনগণ এবং বৃটিশ মন্ত্রিসভা। জার্মানির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা। দ্বিপক্ষীয় জোটের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক। রুশদেশে আসন্ন বিপ্লবের হুমকি। স্বৈরতান্ত্রিক সরকার : প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নিকোলাসের দুর্বলতা। যুদ্ধ ও বিপ্লবের মধ্যে প্রতিযোগিতা।

বিংশ শতকের সূচনালগ্নে জার্মানি, তার সুনির্ধারিত লক্ষ্য, সম্পদের সংহতকরণ, জনগণের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের প্রতিষ্ঠা, সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা, ইত্যাদির জন্য ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে গণ্য হয়। ইতালি এবং অস্ট্রিয়া তার উপগ্রহ। সুইডেন জার্মানির পূজারি এবং মিত্র। এদিকে তুরস্কের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছে। জার্মানির বাণিজ্য বিশ্বজোড়া ; এই বাণিজ্য আকারে এবং গুরুত্বের দিক থেকে কেবলি স্ফীত হচ্ছে। কারণ সরকার বাণিজ্যে সহায়তা যুগিয়ে যাচ্ছে, গুরুত্ব প্রদান করছে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সমান। প্রতিটি বন্দরে এখন জার্মান পতাকাবাহী বাণিজ্য জাহাজ দেখা যায়। জার্মান সরকার রাষ্ট্রীয় কোনো ক্ষেত্র অবহেলা করেন না। সরকার রেলপথ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। পণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার সংরক্ষণ করা হয়, রপ্তানী বাণিজ্যের এবং পরিবহনের জাহাজের ক্ষেত্রে সরকার নিয়মিত ভর্তুকি দিয়ে থাকে। সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যদেশীয় কোনো রাষ্ট্র জার্মান সাম্রাজ্যের সমতুল্য নয়। শান্তি বজায় থাকবে না যুদ্ধ শুরু হবে তা এখন নির্ভর করে বার্লিন সরকারের মর্জির উপর। জার্মানির সম্রাট যে কোনো দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ইউরোপের শক্তির দুর্বল ভারসাম্য বিনষ্ট করতে পারেন।

এই উল্লেখযোগ্য প্রাধান্যের মধ্যে তিনটি বিপদের ইশারা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিটি সরল, সুস্থ জার্মানবাসী সৈনিক, অতীতে ছিলো কিংবা ভবিষ্যতে সৈনিক হবে। সেনাবাহিনীতে রয়েছে একটা বিশাল অফিসার শ্রেণী, আর অগণন লোক মারণাস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফলে জনগণের মধ্যে যুদ্ধের কলাকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যাপারে পেশাদার আগ্রহ খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। প্রায় প্রতিটি জার্মান যুবক প্রত্যাশা করে যে পিতৃভূমির জন্য তাদের এক সময় লড়তে হবে, এবং সেটা হবে তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা। তাদের পরিকল্পিতভাবে শেখানো হয়েছে যে পিতৃভূমির (Fatherland) জন্য তারা যে যুদ্ধ করবে সেটা সভ্যতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য হবে না, বরং তা বিভিন্ন রাষ্ট্রের নৈতিক ইতিহাসের জন্য কল্যাণকর এবং প্রয়োজনীয় দাওয়াই হিসেবে কাজ করবে। এ জন্য জার্মানরা, অধিকাংশ ইংরেজের মতো, যুদ্ধকে মানব প্রকৃতির জন্য অবমাননাকর বর্বরতার অবশেষ হিসেবে দেখে না। যুদ্ধের নামে তারা আতঙ্কে কিংবা ঘৃণা, কোনোটাই বোধ করে না। বরং তারা যুদ্ধের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানায় পুরুষত্বের চূড়ান্ত পরীক্ষার সুযোগ

ঘটবে বলে। তাদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ থেকে অনুমান করা যায় যে, তারা মনে করে পরবর্তী যুদ্ধ হবে সংক্ষিপ্ত এবং আনন্দদায়ক। তাছাড়া এই যুদ্ধে যে জার্মানি জয়ী হবে সে বিষয়ে তারা এক রকম সুনিশ্চিত। এটিই যদি সাধারণ জার্মানবাসীর মনোভাব হয়, তাহলে সেনাবাহিনীর অফিসার শ্রেণী এবং জেনারেল স্টাফ যে উস্কানীমূলক এবং যুদ্ধংদেহী পক্ষ অবলম্বনের জন্য প্রবল চাপ দেয় তা সহজে অনুমান করা চলে। এবং অফিসার শ্রেণী দীর্ঘ শান্তির সময় বাহিনীর তেমন উন্নতি হয়নি বলে নিদারুণ অস্থিরতা বোধ করেছে।

এবার দ্বিতীয় বিপদ সম্পর্কে বলবো। আত্মার যতো বিলাসিতা কল্পনা করা যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো আন্তর্জাতিক ঘৃণা। জার্মানরা সহজ-সরল এবং আবেগপ্রবণ জাতি, তাদের সাফল্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঘৃণায় আপ্লুত করা সম্ভব হয়। বুয়ার যুদ্ধের অনেক আগেই ইংরেজদের প্রতি জার্মানদের ঘৃণা এতোটা প্রসার লাভ করে যে দুটি দেশের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার যে কোনো প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ফন বিউলোর মতো জার্মান রাষ্ট্রবিদগণ এই অবস্থাটা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। অবস্থা পরিবর্তনের আশা আর করা যায় না। অর্ধ শতাব্দীকাল যাবৎ ইংরেজবিরোধী প্রচারণা চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। প্রতিটি নেভি বিল গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রচারণা হয়েছে আগের চেয়ে জোরদার। ফলে হঠাৎ করে অবস্থার পরিবর্তন মুখের কথা নয়। জার্মানবিরোধী অনুভূতি বৃটেনেও ছিলো, কোনো কোনো জার্মানবিরোধী প্রতিষ্ঠান প্রবল ঘৃণার অনুভূতিও ব্যক্ত করেছে। তবে, অনেক তথ্যাভিজ্ঞ জার্মানবাসীও স্বীকার করেছেন যে, বিলেতে এই অনুভূতিটা কোনোকালে সার্বজনীন রূপ পায়নি। উপরন্তু তাদের ঘৃণাবোধ ছিলোনা ভাসা-ভাসা। বদ্ধমূল ঘৃণাবোধের অভিজ্ঞতা তাদের ছিলো না। সমাজের বৃহত্তর পরিসরে এই ঘৃণাবোধ একেবারে ছিলো না বলা চলে।

জার্মান সম্রাট কাইজারের চরিত্র ছিলো উপরন্তুস্বরূপ দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর অস্থির আত্মগরিমা, তাঁর রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, তাঁর অতি নাটকীয় প্রদর্শনপ্রিয়তা, বায়ুরোগীসুলভ হিংস্র আচরণ ইউরোপ মহাদেশটাকে একবারও সুস্থির হবার সুযোগ দেয়নি। তিনি জার নিকোলাসের সঙ্গে যে এক গাদা অদ্ভুৎ পত্র বিনিময় করেন (উইলি-নিকি পত্রবিনিময়) তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি যখন ইংরেজভূমের সঙ্গে হার্দ্য সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষে ওকালতি করছেন তখন তিনি ঐ দেশের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় বৃহৎ শক্তিগুলির জোট গঠনে সক্ষম। তার কথাবার্তা ছিলো নিয়ন্ত্রণহীন, অনেক সময় মনে হতো লোকটা পাগল নাকি। ১৯০০ সালে যখন কয়েকটি রণতরী চিন অভিমুখে যাত্রা শুরু করে তখন তিনি বাহিনীর সদস্যদের যে ভাষায় আদেশ বা উপদেশ দেন তা গোটা বিশ্বে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয় : 'তোমরা শঠ, সশস্ত্র এবং নির্দয় এক শক্তির মোকাবেলা করতে যাচ্ছো। তার মোকাবেলা করো এবং তাকে পরাস্ত করো! কোনো সুযোগ দেবে না! যুদ্ধবন্দী হিসেবে কাউকে গ্রহণ করবে না! সুযোগ পেলে সবাইকে বধ করবে। এক হাজার বছর আগে রাজা আত্তিলার অধিনায়কত্বে হুনরা যে যশ কুড়ায় তা এখনো আতংকের সঙ্গে অতিকথা এবং গল্পগাথায় স্মরণ করা হয়', এই যশ আমাদের কুড়াতে হবে। অতঃপর চিনের হাজার বছরের ইতিহাসে যেন জার্মানদের নাম স্মরণ করা হয়। একান্ত আপন জনের কাছে তিনি যে ধরনের কথা বলতেন তা নিজের দেশ এবং গোটা দুনিয়ার জন্য ছিলো সমান বিপজ্জনক। সার্বিক শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন ছিলো অস্ট্রিয়া বলকান, অঞ্চল ব্যাপারে মত পার্থক্যের জন্য

বাশিয়াকে যুদ্ধের উস্কানি দেবে না। অনুরূপভাবে, জার্মানির উচিত ছিলো অস্ট্রিয়ার মিত্র হিসেবে ঐ দেশের বৈদেশিক নীতির লাগাম টেনে ধরা। এদিকে ভিয়েনার আগ্রাসী মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। তাছাড়া অস্ট্রিয়া অন্তত দু'বার ১৯০৮ এবং ১৯১২ সালে, জার্মানিকে প্রায় যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছিল। অথচ সম্রাট কাইজার তার মিত্রকে বিশ্বাস করতে উৎসাহ যোগান যে, "ভিয়েনার বিদেশ দপ্তর যা বলবে সেটা তিনি আদেশ হিসেবে গণ্য করবেন।" ১৯১৩ সালের ২৬ অক্টোবর ভিয়েনার বিদেশ দপ্তরে অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী কাউন্ট বেরখটোল্ডের সঙ্গে কাইজার মত বিনিময় করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক লিখিত উক্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণ পাঠ করলে বোঝা যায় এই অস্থিরমতি সম্রাটের মধ্যে বিজ্ঞতার কতোটা অভাব ছিলো। তার চিন্তাধারা ছিলো লাগামহীন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অবশ্যই যুদ্ধ বাঁধবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না, সার্বদের জন্ম হয়েছে অন্যের সেবা করার জন্য, তাদের শাসক হবার অধিকার থাকতে পারে না। সার্বদের ঘুষ দিয়ে কিংবা বল প্রয়োগ করে বাধ্য করতে হবে তাদের সেনাবাহিনী অস্ট্রীয় বাহিনীর অধীনে ন্যস্ত করার জন্য। অন্যথায় তাদের রাজধানী দখল এবং বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত করতে হবে। সম্রাট তার মিত্রকে আশ্বাস দেন যে রুশদের ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ বাল্টিক অঞ্চলের জনৈক জার্মান তাকে জানিয়েছেন যে, পরবর্তী ছয় বছরে রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব হবে না। কাউন্ট বেরখটোল্ড লিখেছেন, "আমাদের মধ্যে দীর্ঘ দেড় ঘন্টা কথা হয়। এই সময়ে যতোবার সুযোগ হয়েছে মহামান্য অতিথি অত্যন্ত জাঁকের সঙ্গে ঘোষণা দিয়েছেন যে আমরা তার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি।" এই নিশ্চয়তা এবং পরামর্শগুলো অস্ট্রিয়ার জন্য, জার্মানির জন্য, গোটা বিশ্বের জন্য কতোটা বিপর্যয়কর ছিলো তা অনতিকাল পর স্পষ্ট হয়।

ইংরেজরা সহজাত ও সুগভীর রাজনৈতিক বুদ্ধির কারণে ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। অবশ্য ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে একজন সাধারণ ইংরেজ ভাবতেও পারেন নি যে তাকে মহাদেশীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে। তাকে যোগ দিতে হবে রণাঙ্গনে। যদিও বৃটেনের প্রতিটি লোক ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে বোঝা-পড়ায় উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে। কারণ তারা দেখতে পায় যে এতে শান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। ইউরোপে শক্তির যে ভারসাম্য তারও উন্নতি হবে। কিন্তু ইংরেজরা তখন সামরিক প্রথা সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানতো না, তারা ভাবতে পারেনি যে তাদের দেশটিকে অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পালন করতে হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সম্পর্কে তাদের কোনো ধারনাও ছিলো না। বলকান অঞ্চলে কাইজার-ফ্যাসাদের জন্য ইংল্যান্ড ইউরোপে সার্বিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে, এই যে ধারণা, এই ধারণাটা ইংরেজদের কাছে অস্বাভাবিক বলে বোধ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জার্মান নৌবাহিনীর প্রবৃদ্ধি একজন সাধারণ ইংরেজকেও আতংকের মধ্যে ফেলে দেয়। কারণ এই নৌবাহিনী একাধিকবার আতংক ছড়িয়েছে। অতএব সে অস্থির বোধ না করে পারে না। জার্মানি যখন বেলজিয়ামকে হেলায় পদদলিত করে, ফরাসি দেশকে করে বিধ্বস্ত, দখল করে চ্যানেল বন্দরগুলো, তখন তার পক্ষে হাত গুটিয়ে বসে থাকা না মনে হয় শোভন; না মনে হয় নিরাপদ। একজন সাধারণ ইংরেজ খবরের কাগজ পড়ে জার্মান জাতির উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে যতোটুকু জেনেছে তাতে সে ভরসা রাখতে পারেনি যে এতোগুলো বিজয় অর্জনের পর জার্মানি বৃটিশ সাম্রাজ্যের

প্রতি অনুরাগ বোধ করবে। ফ্রান্স ও রাশিয়া পর্যুদস্ত হবার পর জার্মানি কি ইংল্যান্ডের সঙ্গে ঐতিহাসিক শত্রুতার কথা স্মরণ করে ধেয়ে আসবে না? ইংরেজদের মন এখনো নিষ্পাপ এবং সন্দেহহীন হলেও ঘটনাবলির অভিঘাত যে তাদের মধ্যে কাজ করবে সেটা সঠিক অনুমান করতে সমর্থ হন অ্যাসকুইথ, গ্রে এবং হেলডেন। এই তিন ব্যক্তি তখন ইংরেজদের কর্মপন্থা নির্ণয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত।

বৃটিশ মন্ত্রী পরিষদের একটা দুর্বলতা হয়তো এই ছিলো যে তারা দূরের এবং কাল্পনিক জিজ্ঞাসার মোকাবেলা করতে সাহস করতেন না। যদি বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করা হয়, কিম্বা জার্মানি আঘাত হানে মরোক্কোয়, কিংবা সার্বীয় প্রশ্নে সার্বিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তাহলে বৃটেন কি করবে, এ ব্যাপারে দশ ডাউনিং স্ট্রিটে কিছুমাত্র ভেবে দেখা হয়নি এখানে প্রচলিত তত্ত্ব এই ছিলো যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে পার্লামেন্ট, আর পার্লামেন্ট কাজ করবে নৈতিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে ধারণা অনুসারে। তাছাড়া সে রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই শুধু পার্মামেন্ট নড়ে-চড়ে বসবে। অবশ্য বার্লিনে জার্মানদের হ্যালডেন সাবধান করে দেন যে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন বৃটেন গুরুতর পরিস্থিতি হিসেবে গণ্য করবে। এদিকে লন্ডনে জার্মানির যোগ্য রাষ্ট্রদূত মেটারনিককে হ্যালডেন বুঝিয়ে দেন যে ফ্রান্স ধ্বংস হয়ে যাবে, এটা বৃটেনের জনমত কিছুতেই মেনে নেবে না। অনেক সময় জোর দিয়ে বলা হতো যে বৃটেনের মন্ত্রী পরিষদ আরো সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে হয়তো যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হতো। এই বিষয়টা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। ১৯১২ সাল থেকে বার্লিনের প্রকৃত এবং কার্যকরী ক্ষমতা আর সম্রাটের একার হাতে ছিলো না। জার্মান জেনারেল স্টাফের হাত ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছিলো। জেনারেল স্টাফের সুযোগ্য সৈনিকরা ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে বৃটেনের যুদ্ধ করার ক্ষমতাকে অনেক খাটো করে দেখতেন। অবশ্য নৌযুদ্ধে যে ইংরেজরা বিপজ্জনক হতে পারেন সেটা স্বীকার করে নেয়া হতো। আবার, বার্লিন সরকার এই অভিমতও পোষণ করতেন যে যুদ্ধ যদি সত্যিই শুরু হয় তাহলে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। ফ্রান্সের মাটিতে বৃটিশ এক্সপিডিশনারি ফোর্সের উপস্থিতির জন্য যুদ্ধে হতাহতের তালিকা হয়তো দীর্ঘ হবে, কিন্তু তা যুদ্ধের জন্য নির্ধারিত সময় সীমার খুব একটা হেরফের করতে পারবে না।

স্যার এডওয়ার্ড গ্রে-র কাছে কখনো মনে হয়নি যে যুদ্ধ অনিবার্য। তিনি আশা পোষণ করতেন যে রাশিয়া এবং ফ্রান্সের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার পরও জার্মানির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করা সম্ভব হবে। এই অভিপ্রায় সামনে রেখে একাধিকবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তবে প্রতিবারই উদ্যোগ নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক। জার্মানিকে বার বার বলা হয় নৌ-সামরিক উপকরণ কমিয়ে ফেলার জন্য। কিন্তু আলোচনায় কোনো অগ্রগতি হয়নি। অথচ বৃটেন সাধু মতলব থেকেই নৌ-সামরিক উপকরণ হ্রাসের প্রস্তাব রাখে। বৃটেন চেয়েছে দু'টি দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুতামূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হোক। অথচ বার্লিন সরকার বৃটেনের প্রস্তাবকে মেকিয়াভেলিসুলভ ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করে ; বৃটেন নাকি তার নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্যই এই প্রস্তাব করেছে। স্যার হেনরি ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান শান্তির প্রস্তাব করেন, এই প্রস্তাবকেও ছলচি এবং চরকপত্র বলে গণ্য করা হয়। উইন্সটান চার্চিল ব্যাতাল হলিডে বা জাহাজনির্মাণ এক বছরের জন্য বন্ধ রাখার প্রস্তাব করেন। জার্মান সম্রাট এই প্রস্তাবকেও 'নিরেট দম্ভোক্তি' বলে নিন্দা করেন। ১৯১২ সালে

হ্যালডেনের বার্লিন মিশনও সমান নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। ইংল্যান্ড বিনা উস্কানিতে যুদ্ধ করবে না কিম্বা বিনা উস্কানিতে বেঁধে যাওয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না, এ ধরনের আশ্বাসে জার্মানি মোটেই সন্তুষ্ট নয়। তারা যা দাবি করে তা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে মেনে নেয়া মোটেই সম্ভব নয়। জার্মানি সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা চায় যে যুদ্ধ বাঁধলে বৃটেন নিরপেক্ষ থাকবে। তথাপি বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাছোড়বান্দার মতো শান্তির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন। বলক্যান সম্মেলনের দরুন পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়, এবং ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে বাগদাদ রেলওয়ে এবং পর্তুগীজ কলনিসমূহ বণ্টনের ব্যাপারে ইংল্যান্ড ও জার্মানি একটা চুক্তিতে প্রায় উপনীত হয়। যাহোক, উক্ত সময়ে দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে এটা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় যে ফ্রান্সের উপর কোনো প্রকার আক্রমণ হলে ইংল্যান্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। বৃটিশ মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক (১৯১২) ফ্রান্স ভূমধ্যসাগরে নৌবাহিনী প্রস্তুত রাখে। এখন এটা ধরে নেয়া যায় যে যুদ্ধ বাঁধলে বৃটিশ নৌবাহিনী ফরাসি চ্যানেল উপকূল প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে বৃটিশ সরকার দু'বৎসর পর রাশিয়ার সঙ্গে নৌবাহিনী সংক্রান্ত আলোচনা অনুমোদন করে।

রুশ সাম্রাজ্যের অধীনে রয়েছে বিরাট সামরিক বাহিনী। উক্ত বাহিনীর ভবিষ্যৎ কর্মতৎপরতা বিষয়ে নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলতে পারেন না। জারের সাম্রাজ্য এখনো মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে জার সরকার কয়েকটি মহাদুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়। ১৮৯৯ সালের ছাত্র হাঙ্গামা; ১৯২০ সালের কৃষক বিদ্রোহ; ১৯০৫ সালে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়; ১৯০৫ সালের মহাবিদ্রোহ, প্রায় সম্পূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট এবং ইউরোপের মাটিতে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র নিয়ে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু একটা সফল যুদ্ধ ছাড়া কি এই সাম্রাজ্য নিরবচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকতে পারবে? অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল শক্তিসমূহ রাষ্ট্রকাঠামোর চিড় ধরানোর জন্য চেষ্টারত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক বিরাগ কাজ করছে। পশ্চিমী ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী সুদূরপ্রসারী শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের দাবিতে অশান্ত। দরিদ্র-নিঃস্ব কৃষক সম্প্রদায় কৃষি জমির দাবিতে সোচ্চার, কারখানার শ্রমিকদের অস্থির করে তুলেছে মার্ক্সীয় তত্ত্বাবলি, নিষ্পেষিত জাতিসমূহের চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, সাইবেরিয়ায় নির্বাসিতের দল এবং অন্যায়-অবিচারের শিকার অন্যান্য গোষ্ঠী আর চুপ করে থাকতে রাজী নয়। এদের সমবেত শক্তি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য বিরাট হুমকি।

রুশ অভিজাততন্ত্র এখন সমাজের প্রতিটি শ্রেণী কর্তৃক আক্রান্ত। এদিকে জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে সুনাম যথেষ্ট নষ্ট হওয়ায় বিপ্লবীদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ইচ্ছুক। প্রথমেই অভিজাততন্ত্র গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর কেন্দ্রীয় পর্ষদের সভা আহবান করে রাজধানীতে। অতঃপর শাসনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হয়ে নির্বাচিত পার্লামেন্ট বা ডুমা (Duma) গঠন করে। অন্ধকারাচ্ছন্ন স্বৈরতন্ত্রের জীবন্ত আদর্শ (model) রাশিয়া পশ্চিমের সংসদীয় প্রথা গ্রহণ করেছে, এই খবর পশ্চিম বিশ্বে পৌছানোর পর ইংরেজ উদারনীতিকদের মধ্যে খুশির জোয়ার বয়ে যায়। অথচ আনন্দে আত্মহারা হবার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। কারণ এই সব রুশ সংসদ একটার পর একটা গঠিত হতে থাকে। অথচ এসব জারের কুখ্যাতি তথা অর্জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র হ্রাস করতে পারেনি। বিবদমান দলগুলোর হিংসাবৃত্তিও কমাতে ব্যর্থ হয়। বাস্তবিক পক্ষে, যেহেতু সরকার ডুমা-র প্রতি আস্থাশীল ছিলো না, ডুমাও সরকারকে

সন্দেহের চোখে দেখেছে, ফলে আইনসভায় সক্ষম ও দেশপ্রেমিক লোকদের ব্যাপক হারে সমাবেশ ঘটলেও জনগণ তা থেকে কোনো সুবিধা আদায় করতে পারেনি। গুরুতর বিশৃঙ্খল অবস্থায় কাজ করার যোগ্যতা নিকোলাসের ছিলো না। সোড়শ লুইয়ের মতো নিকোলাস হয়তো সুগৃহী ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক যোগ্যতায় তাঁর ঘাটতি ছিলো। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত এবং কিছুটা জেদি প্রকৃতির, ঘাটতি ছিলো বুদ্ধিসুদ্ধির। ঘটনার আকৃতি কিংবা লোক চরিত্র বোঝার ক্ষমতা তার ছিলো না, উপরন্তু এ সবের সঙ্গে যুক্ত ছিলো অতীতের লোচনীয় কুসংস্কার। অতএব তা একাধিকবার রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জার্মানির জন্য দুর্ভাগ্য ছিলো যে কাইজার ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী; রাশিয়ার জন্য সমান দুর্ভাগ্যজনক এই ছিলো যে সর্বশেষ জার ছিলেন ব্যক্তিত্বহীন, এবং যদিও তিনি গৃহী হিসেবে নানা গুণের অধিকারী ছিলেন, তাঁকে নিখুঁত ভদ্রলোক বলা যায়, ছিলেন অনুগত স্বামী, স্নেহময় পিতা, কিন্তু তিনি রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতিধারা সঠিক ঠাহর করতে পারতেন না, দৃঢ়তার সঙ্গে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণেও সক্ষম ছিলেন না। অনেক জটিল রাজনৈতিক ঘটনা বিশ্লেষণের জন্য ঝানু রাষ্ট্রবিদের পরামর্শের দরকার করে, অথচ তিনি তেমন প্রয়োজনে জনৈক অজ্ঞ সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হতেন। তাকে এ ব্যাপারে প্রভাবিত করতেন তার ট্র্যাজিক ও বিষণ্ন স্ত্রী, যিনি অপরিসীম মোহগ্রস্ত ছিলেন বদমাস, লম্পট এবং প্রতারক রাসপুতিনের প্রতি। এটা সাধারণ মনোবিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ বিষয় হতে পারে।

সৈনিক ও কূটনীতিকদের যে বিরাট চক্র রুশ সিংহাসন ঘিরে ছিলো তারা কখনো শান্তিবাদী ছিলেন না। যেহেতু রাশিয়া দূর প্রাচ্য থেকে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হয়েছে, অতএব তারা দেখতে চায় দেশটি একদিন যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে গরম পানির বন্দর বসফরাসে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতীতে জার রাজ্যের বিদেশ নীতি ছিলো আক্রমণাত্মক। আজও এই নীতির পরিবর্তন হয়নি। তবে বর্তমানে যুদ্ধের খায়েস খুব তীব্র নয়। রেলপথের উন্নয়ন এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। সার্বদের প্রতি অন্যায় আচরণ যদি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে না যায় তাহলে রুশরা শান্তির পথ পরিত্যাগ করবে না। ১৯১৪ সালের ৮ জুলাই সেন্ট পিটার্সবুর্গের কারখানাগুলোতে যে ভয়াবহ ধর্মঘট দেখা দেয়, পরিণামে শুরু হয় রাস্তা অবরোধ এবং সংঘর্ষ, তাতে মনে হয় যুদ্ধ এবং বিপ্লবের মধ্যে প্রতিযোগিতায় জয় হবে বিপ্লবের।

যুদ্ধের সূচনা

বিংশ শতকের সূচনায় ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীগুলোর জীবনের মান ও সভ্যতা নজিরবিহীন উন্নতির শীর্ষ স্পর্শ করে। ক্ষুদ্র বলকান এলাকার কিয়দংশ অবশ্য ব্যতিক্রম ছিলো। প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানাদি যদিও মহাদেশের অনেক এলাকায় দৃঢ়মূল ছিলো না, কাজেও লাগানো হতো না যথাযথভাবে, অনেকে প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের অর্থও সঠিক বুঝতেন না, তবে এর অস্তিত্ব সর্বত্র লক্ষ্য করা গেছে। তখন সমরবাদী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরেসোরে চলেছে। তবু মনে হয়েছে যে, বিশ্ব ঐক্যের পথে এগিয়ে চলেছে বলে যে বিশ্বাস তা দিনের পর দিন বলবান হচ্ছে। বিচক্ষণ কূটনীতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ (Concert of Europe) আফ্রিকা মহাদেশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এর জন্য ইম্পিরিয়াল এবং উপনিবেশ স্থাপনকারী শক্তিগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার বিরোধ বাঁধেনি। আন্তর্জাতিক সমস্যাদি সালিসির মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আন্তর্জাতিক ডাকবিভাগ (১৮৭৫), অভিন্ন গ্রন্থস্বত্ব আইন, এবং আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য দফতর (১৯০৭) ইত্যাদির মতো সংগঠন প্রতিষ্ঠা থেকে ধারণা করতে বেগ পেতে হয় না যে বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো অভিন্ন কর্মসূচি ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। মনে হয় যেন অবশেষে রাষ্ট্রবিদগণ বুঝেছেন যে রাজনীতি হলো মানুষের সুখ বৃদ্ধির কৌশল। মহাদেশের প্রতিটি আইনসভায় সমাজের দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্রের বাজেট থেকে অন্যায় সুবিধাদি অপসারণ করা হয়। অপরাধ আইন কোষ থেকে ছেঁটে ফেলা হয় মধ্যযুগীয় বর্বরতা। ইউরোপ মহাদেশের গরিষ্ঠ অংশে শিক্ষা ব্যবস্থা সার্বজনীন এবং উন্নতিশীল করা হয়। প্রতিরোধমূলক ওষুধ মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি করে। অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলোর সামাজিক অকল্যাণের তালিকা থেকে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা বিলুপ্ত হয়।

মনে হয় বৃহত্তর ইউরোপীয় সমাজ একটা অকল্যাণ থেকে কার্যকরভাবে মুক্ত। বিজ্ঞানের শক্তির উন্নয়নের সঙ্গে-সঙ্গে যদিও বিভিন্ন সরকারের অধীনে ন্যস্ত সামরিক বাহিনীর শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে মননর্চার ক্ষেত্রে কোনো শূন্যতার সৃষ্টি হয়নি। এখন মহাদেশের প্রতিটি প্রান্ত সজাগ। যে লেখক প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে লিখেছেন এবং চালু মূল্যবোধের সমীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন তার সুনাম হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ভিক্টোরীয় যুগে ম্যাথু আর্নল্ড কঠোর ভাষায় মধ্যবিত্ত ফিলিস্তিনদের ব্যঙ্গ করেছেন। শতাব্দীর অন্তিম দিনগুলোতে ম্যাথু অর্নিল্ডের চেয়েও শক্তিশালী সমালোচকরা মঞ্চ দখল করেন। ইবসেন এবং টলস্টয়, নিৎসে এবং আনাতোল ফ্রাঁস, বার্নার্ডশ এবং এইচ. জি. ওয়েলস অধিকতর দুঃসাহসিক বিষয়ে বৃহত্তর শ্রোতামণ্ডলীর সঙ্গে কথা বলেন।

তড়িৎ বিজ্ঞান উপহারের বন্যায় মানবজাতিকে ভাসিয়ে দেয়, আলো, উত্তাপ, ট্রাকসন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সিনেমা, রেলওয়ের সহযোগী হিসেবে আসে বাই-সিকল, মোটর কার

এবং উড়োজাহাজ। ভালো-মন্দ, সকল শ্রেণীর সাহিত্য উৎসাহী পাঠকের জন্য সহজলভ্য হয়ে যায়। কারণ গণপাঠাগার বিস্তার, প্রকাশকদের প্রতিযোগিতামূলক উদ্যোগ এবং মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির কারণে এ ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক বিদ্যালয় অতিক্রম করে যাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয়নি তাদের কৌতূহল নিরসন করার জন্য সস্তা সংবাদপত্র এগিয়ে আসে। তবে মহাযুদ্ধ সূচনার আগের কয়েক বছরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে তখন এই বিশ্বাস সবার মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করে যে দরিদ্র কর্মজীবী নরনারীর জন্য রাষ্ট্রীয় খরচে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা উচিত। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর কোনো সরকার জনগণের প্রমোদের জন্য কখনো এতোটা গুরুত্ব প্রদান করেনি। মানুষের সুখান্বেষণও ইতিপূর্বে এতোটা পরিতুষ্টি লাভ করেনি। এক দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনের খবর একালে যতো তাড়াতাড়ি অন্য দেশে পৌঁছে যায়, ইতিপূর্বে তাও ঘটেনি। ব্রামের সংগীত, ইবসেনের নাটক, টলস্টয় এবং আনাতোল ফ্রাঁসের উপন্যাস, গিলবার্ট এবং সালিভানের লঘু অপেরা এবং ইংরেজ নাটঘরের জনপ্রিয় গানগুলো ইউরোপের সাধারণ সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। সত্য বটে, ভাষা গুরুতর প্রতিবন্ধক ছিলো। অন্যথায় আমরা আশা করতে পারতাম যে এক শতাব্দীকাল শান্তির যুগ চললে এরিস্টটলের নগরীর মতো ইউরোপকে গড়া যেতো শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাহায্যে।

সভ্য সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের এই উর্ধারোহণ আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় একটা জঘন্য অপরাধের জন্য। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ বসনীয় রাজধানী সারায়েভো গ্যাবরিলো প্রিন্‌সিপের গুলিতে নিহত হন। আততায়ী বয়সে তরুণ এবং অতিরিক্ত দেশানুরাগী। সে যাই হোক, ঘটনার গুরুত্ব এই যে মনে করুন ইংল্যান্ডের প্রিন্স অব ওয়েলস রাজনৈতিক উত্তেজনার চরম মুহূর্তে আয়ারল্যান্ডে নিহত হয়েছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যে ক্রোধের ঝড় বয়ে যায়। অনেকে বিশ্বাস করেন, অনেকে আবার বিশ্বাস করা কূটকৌশলপূর্ণ বলে মনে করেন যে, এই জঘন্য অপরাধ বসনিয়া মাটিতে সংঘটিত হলেও কাজটি করেছে কুখ্যাত 'কালো হাত', সার্বীয় সরকারের[১] কর্মকর্তাদের সরাসরি কিংবা নিরব সমর্থনে।

অস্ট্রীয় প্রতিনিধিরা স্থানীয়ভাবে একটি তদন্তানুষ্ঠান পরিচালনা করে। এতে সার্বীয় সরকারের ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবু অস্ট্রীয় সরকার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্তের দাবিদার। এবং এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে এই ষড়যন্ত্রের শেকড়ের প্রান্ত সার্বীয় রাজ্য এবং বসনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে। এ ধরনের তদন্ত দল গঠন করলে সার্বীয় সরকার বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। কিন্তু তখন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া চলছিলো বলে কিংবা সার্বীয় মন্ত্রিসভা জানতেন যে আর্চডিউকের জীবন হরণের জন্য একটা প্রচেষ্টা চালানো হবে, এবং তারা গুজবের খবর ভিয়েনা সরকারকে জানাতে ব্যর্থ হন বলে কোনো প্রকার তদন্ত দল গঠনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। এদিকে দানিয়ুবের উভয় তীরের খবরের কাগজগুলো হিংস্র শত্রুতা বিনিময় শুরু করে। আর ভিয়েনা, জার্মানির সমর্থন দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে, দ্রুত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। ২ জুলাই সার্বীয় সরকারের কাছে একটি চরমপত্র প্রেরণ করা হয়। এই চরমপত্র সম্পর্কে স্যার এডওয়ার্ড গ্রে

---

১. বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে ১৯০৩ সালে আলেকজাণ্ডার এবং তার পত্নী ব্রাগাকে এবং ১৯১৪ সালে ফার্দিনান্দকে খুন করে কালো হাতদের নেতা অ্যাডিস।

ঠাণ্ডা মাথায় মন্তব্য করেছেন যে তিনি কখনো "দেখেননি বা শোনেননি যে কোনো দেশ অপর একটি স্বাধীন দেশে এ ধরনের ভয়ানক বৈশিষ্ট্যের দলিল পাঠিয়েছে।" যেহেতু চরমপত্র কার্যকর করা হলে সার্বীয় রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে, অতএব সার্বরা উক্ত চরমপত্র মেনে নেবে না, ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। চরমপত্র রচয়িতাদের অন্বিষ্টও তাই। সর্বোপরি, উক্ত চরমপত্র এমন সময়ে প্রেরণ করা হয় যখন ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পঁয়েকার এবং প্রধানমন্ত্রী ভিবিয়ানি জলযানে দেশে ফিরছেন জারের রাজ্য রাশিয়া সফর করে। বার্লিন দৃঢ়তার সঙ্গে ভিয়েনাকে সমর্থন করে। সকল জার্মান জলযানকে সতর্ক করে দেয়া হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গ, প্যারিস এবং লন্ডন সরকারকে জানিয়ে দেয়া হয় যে অস্ট্রিয়া এবং সার্বিয়ার মধ্যে বিবাদে হস্তক্ষেপ করলে 'ভয়াবহ পরিণতি'র সম্মুখীন হতে হবে।

আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি এই খবরে ইউরোপের চ্যান্সেলারিগুলোতে কি ধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তাৎক্ষণিকভাবে সার্বজনীন মনোভাব এই দাঁড়ায় যে অস্ট্রিয়া এবং জার্মানির সরকার বসনিয়ার রাজধানীতে আর্চডিউকের হত্যাকাণ্ডকে একটা অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের লক্ষ্য সার্বিয়ার স্বাধীনতা হরণ করা, এবং হয়তো রুশ রেলপথ তৈরি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই রাশিয়া এবং ফ্রান্সের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া। ইউরোপের এই অনুভব দৃঢ়তর হয় যখন দেখা যায় যে সার্ব সরকার কর্তৃক অস্ট্রিয়া সরকারের চরমপত্রের দশটি দাবির সাতটি মেনে নেবার পরও বিদেশ মন্ত্রী কাউন্ট বেরখটল্ডের উপদেশক্রমে ফ্রান্সিস জোসেফ সার্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। অস্ট্রীয় সেনাবাহিনী অনেক কাল যাবৎ 'আততায়ী জাতি'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৃষ্ণায় কাতর, তারা বর্তমান সুযোগ হাতছাড়া করার জন্য ইচ্ছুক নন।

অপর দিকে এটা কখনো কারো প্রত্যাশার মধ্যে ছিলো না যে বলকান মানচিত্র থেকে সার্ব জাতিগোষ্ঠী একেবারে মুছে যাবে, আর রাশিয়া চুপ করে বসে থেকে ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করবে। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যাজনব তার পদের জন্য উপযুক্ত ছিলেন না। ঘটনা অত্যন্ত গুরুতর। অথচ তিনি ছিলেন প্রায় রোমাঞ্চ সন্ধানী। স্যাজনব মধ্য ইউরোপীয় দুটি শক্তির নিকট প্রাচ্য সংক্রান্ত পরিকল্পনায় যৎপরনাস্তি আতঙ্কিত বোধ করেন। এক জার্মান রাজকুমারকে আলবানিয়া প্রেরণ করা হয় দেশটি শাসন করার জন্য, অপর এক জার্মান জেনারেলকে কন্সট্যান্টিনোপল প্রেরণ করা হয় তুর্কি সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করার জন্য। সার্বরা যদি ধূলিস্যাৎ হয়ে যায় তাহলে হামবুর্গ থেকে বাগদাদ পর্যন্ত জার্মান খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা কে ঠেকাতে পারবে? স্যাজনব অস্ট্রিয়দের প্রতি কোনো প্রকার মমত্ববোধ করেন না। এবং যদিও রুশ সেনাবাহিনী ১৮৪৯ সালে হাঙ্গেরি সিংহাসনে ফ্রাঞ্জ জোসেফকে বসাতে সাহায্য করে তবুও অস্ট্রীয়-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য একাধিকবার রুশ পথে কাঁটা বিছিয়েছে। ফলে যদিও স্যাজনব আন্তরিকতার সঙ্গে শান্তি বজায় রাখার উপায় খুঁজছিলেন তবুও তিনি যুদ্ধের উন্মদনা বোধ করতেন এবং সৈনিকদের চাপ ঠেকানোর মনোবল তার ছিলো না, অতঃপর যখন বেলগ্রেডে বোমার্ষণের খবর রাশিয়ায় পৌঁছে তখন তিনি প্রথমত আংশিক, অতঃপর সার্বিক সৈন্যসমাবেশের নির্দেশ আদায় করেন।

সারাজেভোতে যে অপরাধ সংঘটিত হয় তাতে কাইজার স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফারদিনান্দ ছিলেন তার ব্যক্তিগত বন্ধু। আর সারাজেভোর হত্যাকাণ্ড ছিলো জঘন্য, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তথাপি, এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে

ভিয়েনার সঙ্গে যোগাযোগের গোড়াতেই জার্মান সম্রাট কাইজার সার্বদের প্রকাশ্যে নিন্দা করেন এবং জানিয়ে দেন যে তাদের অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত।

এটি এমন একটি সময় যখন রোমাঞ্চ সন্ধানের অবকাশ থাকবার কথা নয়। এখন দরকার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে অস্ট্রীয় চরমপত্রের অন্তস্থ মতলব হলো সার্ব রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করা। অতএব এই বিবাদকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করা অযৌক্তিক। অন্য কোনো দেশ এতে জড়িত হবে না মনে করাও অমূলক। অস্ট্রিয়াকে ঘটনা ব্যাপারে নমনীয় হবার জন্য প্রভাবিত করে জার্মানি ইউরোপ মহাদেশকে সেবা করতে পারতো। আর এই কাজটি হতো ইউরোপের অনুকূলে সর্বোৎকৃষ্ট সেবা। জার্মানদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এই যে তারা অনেক বিলম্ব হওয়ার আগে ভিয়েনা সরকারকে নমনীয় হওয়ার জন্য প্রভাবিত করার চেষ্টা করেনি এবং যখন চেষ্টা করে তখন অস্ট্রীয় সেনাবাহিনী গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। অস্ট্রীয় চরমপত্রে বেঁধে দেয়া সময় সীমা বর্ধিত করার জন্য স্যার এডওয়ার্ড গ্রে সুপারিশ করেন, জার্মানরা তা সমর্থন করেন নি। অতঃপর স্যার গ্রে বিবাদ মীমাংসার জন্য লন্ডনে সম্মেলন আহবানের প্রস্তাব করেন, জার্মানরা সেটিও অগ্রাহ্য করে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের সরকারে বদমেজাজি কর্মকাণ্ডের প্রতিটি পর্যায়ে তাদের ধারণা প্রদান করা হয় যে তাবা জার্মান সেনাবাহিনীর সমর্থন পাবে। ইউরোপের একটি শক্তির পক্ষে শান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব ছিলো, কিন্তু সে শক্তি শান্তি প্রচেষ্টায় কোনো প্রকার সহযোগিতা করেনি। জার্মান সরকার যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে পারতেন। তা না করে বরং যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বসেন। জার্মান জনগণ সম্পর্কে বলতে হয়, তাদের দীর্ঘকাল পড়ানো হয় যে তারা মেকিয়াভেলিয়ান শত্রুচক্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ফলে তারা সহজে বিশ্বাস করে যে এখন তাদের পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। বিশেষত তারা দেশের পূর্ব সীমান্তে বিশাল রুশ সেনাবাহিনীর অবস্থিতির জন্য বরাবর আশংকিত। এটা মনে করা অমূলক যে, তীব্র উত্তেজনাকর মুহূর্তে জার্মান জনগণ স্মরণ করবে সাম্প্রতিক ইতিহাসে তাদের সরকার যুদ্ধের হুমকি দিয়ে কূটনৈতিক মতলব হাসিল করার চেষ্টা করেছে। কিংবা স্মরণ করবে যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি দ্বারা পর রাজ্যে নিদারুণ শংকা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে।

অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব ছিলো আরো বড়ো। যদিও জুলাই মাসের ১৩ তারিখের মধ্যে জানা যায় যে বসনীয় রাজধানী সারাজেভোতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সার্বীয় সরকার জড়িত নয়, তবু তিনি শাস্তিমূলক অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে জেদ ধরেন। উপরন্তু তিনি এটাও জানতেন, নিঃসংশয়ভাবে জানতেন যে, রাশিয়া সার্বীয় জনগণের পক্ষে দাঁড়াবে। অবশ্য এটা স্বীকার করতে হবে যে তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সার্বীয় বিপ্লবীদের অপপ্রচার অস্ট্রীয়দের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবু এটা বিশ্বাস করা কষ্টকর যে, একটি ক্ষুদ্র দেশের সামরিক শক্তি অস্ট্রিয়ার জন্য ভয়ের কারণ হতে পারে। তাছাড়া দেশটি দু'দুটি যুদ্ধে জড়িত থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং দেশটি দক্ষিণ ভাগের নতুন প্রজাকুল আত্মীকরণ সমস্যায় পীড়িত। পরিণতি সম্পর্কে কিছুমাত্র না ভেবে অস্ট্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সারাজেভোতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দরুন দেশের অভ্যন্তরে যে ক্ষোভ বন্যা বয়ে যাচ্ছে তাকে কাজে লাগিয়ে ঐ ক্ষুদ্র অথচ উদ্বেগজনক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সকল সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে হবে।

সে সময় যদি রুশ সিংহাসনে আসীন থাকতেন কোনো সবল ও বিজ্ঞ নৃপতি, তাহলে তিনি হয়তো বলকান স্লাভদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করেও প্রয়োজনের সময় সাধদের পরিত্যাগ করতেন এবং হয়তো কুখ্যাতি কুড়াতেন। উক্ত সবলচেতা নৃপতি হয়তো যুক্তি প্রদর্শন করতেন যে রাশিয়া যে প্রকাণ্ড ভূখণ্ডের অধিকারী তাই সামলানো একটা বাপারহু পরবাজ্য জয় করলে সে এমন কিছু পাবে না যা তার শক্তি বৃদ্ধি করবে; এবং সার্বিয়ার জন্য যার রক্ত ও ধনক্ষয় অলস বিকটতার পেছনে ছোটার সামিল এবং এতে হয়তো গোটা সাম্রাজ্যের কাঠামো ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। যাই হোক সম্রাট নিকোলাস দূরচেতা ছিলেন না। তার মধ্যে ছিলো এক ধরনের শক্তি, অতীন্দ্রিয় আত্মভোলা প্রকৃতির রুশদের অনেকের মধ্যেই এটি লক্ষ্য করা যায়।) তিনি সক্ষম ছিলেন নিরন্তর ও সবল চিন্তায়: তিনি শান্তির বারতা পুনরাবৃত্তি করেন এবং হেগ আদালতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তথাপি সকল সময় এবং সর্বাবস্থায় প্রস্তুত ময়দানে নামার জন্য তৈরি জেনারেল স্টাফকে অনুমতি দেন জার্মানি কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার আগেই রুশ সৈন্য সমাবেশের জন্য। অবশ্য তার সিদ্ধান্তের অনুকূলে এটুকু বলা যায় যে, তিনি সার্বীয় সরকারকে অস্ট্রিয়ার চরমপত্রের অধিকাংশ দাবি মেনে নেবার আহবান জানান। এদিকে জার্মান সম্রাট কাইজার জানিয়ে দেন যে সার্বীয় সরকার চরমপত্রের যে দাবিগুলো মেনে নিয়েছে তা যুদ্ধ এড়ানোর জন্য যথেষ্ট। সার্বীয় জবাব প্রথমবার পাঠ করার পরই তিনি উক্ত ঘোষণা দেন।

ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারক দিনগুলোতে (মোট এগারো দিন) ইংল্যান্ড অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। যুদ্ধ বাঁধার জন্য ইংল্যান্ডকে দায়ী করা চলে না। যদিও ইংল্যান্ড তখন তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি যে, যুদ্ধ বেঁধে গেলে এবং তার মিত্র ফ্রান্সের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে, সে নিশ্চুপ বসে থেকে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবে না। সে অবশ্যই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। কারণ ফ্রান্সের গঙ্গাপ্রাপ্তি তার কাম্য নয়। ইংরেজদের যুদ্ধ করার খায়েস মোটেই ছিলো না। জার্মানি বেলজিয়াম আক্রমণ না করলে বৃটিশ মন্ত্রিসভা এবং সংসদ যুদ্ধে যোগদান ব্যাপারে বিভক্ত হয়ে যেত। বিনা উস্কানিতে একটি নিরপরাধ দেশ আক্রমণ করায় (যে দেশটির নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রাশিয়া নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলো) অ্যাসুকইথ সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুবিধা হয়। সংসদে বিরোধী দলেরও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যায়। জনগণও সন্তুষ্ট হয় যে বৃটেন যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে তা ন্যায়যুদ্ধ, একটি শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশ কর্তৃক একটি ক্ষুদ্র ক্যাথলিক দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় করায় জন রেডমন্ডের নেতৃত্বে আয়ারল্যান্ডের সংসদীয় দল জার্মান যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়।

এই যে মনে করা হয় পুঁজিবাদীদের জন্য মহাযুদ্ধ বাঁধে, এটা নিছক ভিত্তিহীন উপাখ্যান ছাড়া কিছু নয়। কতকগুলো সমরসম্ভার কেন্দ্র ব্যতিরেকে, অগ্রগণ্য সকল বণিক শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনায় যৎপরোনাস্তি বিষণ্ন বোধ করে। তবু বণিক সম্প্রদায় কিংবা সমাজবাদী দলগুলো এতোটা বল রাখেন নি যে বৃহৎ সমরযন্ত্রগুলোর অগ্রযাত্রা ঠেকাতে পারবেন। যখন সংকট সমুপস্থিত, তখন আন্তর্জাতিক পুঁজি এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সমান হতবল। সমাজতন্ত্রীরা বিশ্বজোড়া শান্তির কথা ভুলে বার্লিন ও প্যারিসে যুদ্ধ ঋণের পক্ষে ভোট দেয়। বিদ্বেষ এবং আবেগাপ্লুত জাতীয়তাবাদ অপরাপর শক্তি কেন্দ্রগুলোর উপর প্রভুত্ব কায়েম করে।

ইউরোপীয় কোনো দেশেই শান্তিবাদী চিন্তা-ভাবনা থেকে নীতিপন্থা প্রণয়ন করা হয়নি। প্রতিটি পররাষ্ট্র দপ্তর যে স্বপ্ন দেখেছে তা কেবল যুদ্ধের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা সম্ভব। ফ্রান্স

চায় আলসেস-লরেনের উপর দখল কায়েম। জার্মান বাড়া করে আরো আরো ইপনিবেশ, আরো বড় নৌবাহিনী এবং নিকট প্রাচ্যে আধিপত্য। অস্ট্রিয়া চায় সার্বিয়ার স্বাধীনতা হরণ করতে এবং স্যালনিকাতে একটি নৌ বন্দর। রাশিয়া চায় বসফরাস ও দারদানেলেস। সার্বিয়ার ছিলো বোসনীয়া এবং হার্জিগোভিনার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি, ইতালির লক্ষ্য ট্রিয়েস্ত এবং ট্রেনটিনো, রুমানিয়া চায় ট্রানসিলভ্যানিয়া, কেড়ে নিতে হবে হাঙ্গেরির অধিকার থেকে, অথবা চায় বেসারাবিয়া, কেড়ে নিতে হবে রাশিয়ার করতল থেকে। সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে, এই উচ্চাভিলাষগুলো আর অগোপন থাকবে না। অগ্নিবৃষ্টির আকারে উন্মীলিত হবে। তবে যুদ্ধ অনিবার্য ছিলো না, সবাই যে যুদ্ধ চাইতেন তাও নয়। ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, সার্বিয়া, কেউ যুদ্ধ চায়নি। বাস্তবিকপক্ষে ইউরোপের কেবল একটি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ শান্তিভঙ্গের পক্ষে ছিলেন। কথিত রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অস্ট্রিয়ার। তারা মদদ পায় অশুভ এবং অতি প্রভাবশালী বার্লিন জেনারেল স্টাফের। এই জেনারেল স্টাফ আর্চডিউকের নিহত হওয়ার কয়েক মাস আগে থেকেই জার্মান সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করছিলেন অবিলম্বে যুদ্ধ শুরু করার জন্য।

ইউরোপে যুদ্ধ বেঁধে গেছে, এই হতবুদ্ধিকর সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের চাকা দ্রুত ঘুরতে থাকে। এখন সবাই ব্যস্ত, উত্তেজিত, উল্লসিত; নতুন ধরনের বল চায়, নতুন প্রয়োজনে লাগতে চায়। জাতীয় জীবনের জন্য গুরুতর বিপদ উপস্থিত হওয়ায় নিজেদের মধ্যেকার বিবাদের অবসান ঘটে। সেন্ট পিটার্সবুর্গে ধর্মঘটী শ্রমিরা পুনরায় কাজে যোগদান করে। লন্ডনে ভোটের দাবিতে আন্দোলনকারী মহিলারা চুপ হয়ে যায়। ইতালিতে কয়েক দিন আগেও বেনিতো মুসোলিনি বিপ্লবী ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছেন; তিনি এবার যুদ্ধে হস্তক্ষেপের জন্য আহবান জানান। প্রতিটি জাতি বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তারা ন্যায়ের পক্ষে রয়েছে, একটা দুষ্ট শত্রু তাদের নির্যাতন করছে এবং তাদের দেশটিকে ধ্বংস করতে চায়, এবং জগতে যদি নৈতিক কাঠামো টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে তাদের পক্ষকে যুদ্ধে অবশ্যই জয়ী হতে হবে। এদিকে যদিও জার্মানরা নিজেদেরকে এই গ্রহে প্রতিষ্ঠিত এতদকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার ধারক ও বাহক মনে করে, কিন্তু তার বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর কাছে মনে হয়েছে যে দেশটি পূর্বেকার প্রজন্মের মানবিক আদর্শের পরিবর্তে বর্তমানে গ্রহণ করেছে প্রাশিয়ানদের নগ্ন ও নির্বিবেক শক্তির মতবাদ। লুভ্যার (Louvain) গ্রন্থাগারের অগ্নিশিখা মহৎ সংস্কৃতির ধ্বজাধারী এই দেশটির উপর বীভৎস আলোকসম্পাত করে।

আগস্টের সুন্দর আবহাওয়ায় সূচিত সেই যুদ্ধের চরিত্র ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনেককে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলা হয়। সাধারণ ধারণা এই যুদ্ধ হবে সংক্ষিপ্ত এবং তীব্র। বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যুদ্ধ হবে জলে ও স্থলে। এর জন্য ব্যাপক ও সতর্ক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

কি ধরনের উপাদান যুদ্ধের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে তা আগে থেকে কেউ অনুমান করতে পারেন নি। কেউ বুঝতে পারেন নি যে প্রায় গোটা দুনিয়া এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। এই যুদ্ধের জন্য যে বিভিন্ন জাতির ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হবে, তাও কেউ অনুমান করতে পারেন নি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্পকারখানার ক্ষমতা কি পরিমাণে এই যুদ্ধের চরিত্র নিরূপণ করবে, কতোটা প্রভাবিত করবে যুদ্ধের পরিণতি, সেটাও সবার অনুমানের বাইরে থেকে যায়। গত শতাব্দীর পোল্যান্ডের জনৈক লেখক প্রায় সত্য কথাটা বলে ফেলেন, যখন তিনি বর্ণনা করেন যে, আগামী দিনের যুদ্ধ হবে নিশ্চল-প্রক্রিয়ার।

ভয়ংকর আত্মবিধ্বংসাত্মক। এ ধরনের যুদ্ধে সেই জাতিই জয়ী হবে যে জাতি লাগাতার খাদ্যের সরবরাহ চালিয়ে যেতে পারবে।[১]

রাজনীতিবিদগণ জনগণের চেয়ে অধিকতর দূরদর্শী ছিলেন না। জার্মানরা তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনায় বেলজিয়ামের নিষ্ক্রিয়তা, ইংল্যান্ড, ইতালি এবং রুমানিয়ার নিরপেক্ষতা ব্যাপারে চূড়ান্ত নিশ্চিন্ত বোধ করে। বার্লিনে হিসেব কষা হয় যে জার্মান সেনাদল এক পক্ষকালের মধ্যে প্যারিসে পৌঁছে যাবে এবং ছয় সপ্তাহের মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে ফিরে যেতে পারবে। লন্ডনের জেনারেল স্টাফ ভাবে চারটি খণ্ডযুদ্ধের কথা। প্রতিটি খণ্ডযুদ্ধ তিন দিন চলবে। তারা সে অনুসারে তৈরি হয়। তথ্যাভিজ্ঞ ইংরেজ রাজনীতিবিদগণ এই অভিমতের দিকে ঝুঁকে পড়েন যে (যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর শীতকালে) আসন্ন আগস্ট মাস বিদায় হওয়ার আগেই যুদ্ধ শেষ হবে। আর এটা ঘটবে অর্থাভাবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র নতুন সমরমন্ত্রী কিচেনার আসন্ন বিবাদের সঠিক হিসাব কষতে সক্ষম হন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে তার দেশকে অন্তত তিন বৎসর যুদ্ধ করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। ইতিপূর্বে মনে করা হয় যুদ্ধের জন্য গ্রেট বৃটেনের এক হাজার মিলিয়ন স্টার্লিং ব্যয় করতে হবে। তখন ঐ পরিমাণকে মনে করা হয়েছে অতিকায় এবং হতবুদ্ধিকর। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে ব্যয় হয় ঐ পরিমাণের দশগুণ।

অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে, এই নতুন ধরনের যুদ্ধের মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যসূচক প্রকৃতি তৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। যুদ্ধের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডে জনরব এই ছিলো যে 'কাজ-কারবার স্বাভাবিক' চলবে। সে সময় মনোভাবটা এরূপ ছিলো যে, দেশে বিশেষ কিছু ঘটছে না ধরে নিয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে গেলে মিত্রদের যুদ্ধের প্রচেষ্টায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের সর্বাধিক সুবিধা পাওয়া যাবে। যাহোক, ক্রমান্বয়ে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে জাতিসমূহের মধ্যে এ ধরনের বিবাদে যুধ্যমান এবং অ-যুধ্যমানের মধ্যেকার তফাৎ বিলীন হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, মানবিক এবং বস্তুগত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমেই শুধু এ ধরনের যুদ্ধে জয়ের আশা করা যেতে পারে। এই যুদ্ধের নৈতিক পরিণাম ছিলো সত্যিই বিস্ময়কর। আগে কখনো দৃঢ়তা দেখাতে গিয়ে কোনো সেনাদল এতটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। আগে কখনো বেসামরিক জনগোষ্ঠী এতোটা আন্তরিকতা এবং ভক্তির সঙ্গে দেশের জন্য কাজ করেনি। নারীরা পুরুষের অনুরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করে। আজ আমরা বীরাঙ্গনা হিসেবে দেখি সমরাস্ত্র কারখানাগুলোতে, ট্রেনিং স্টেশনে এবং হাসপাতালে। উপরন্তু তারা সোফ্রেজেটদিগের ক্ষেত্রে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, শিক্ষা ও শান্তিময় জীবন সাহসিকতার প্রতিকূল, এই যে ধারণা, তা একেবারে ভিত্তিহীন। এই যুদ্ধে পূর্বেকার সাহসিকতার সকল মাইলফলক চূর্ণ হয়ে যায়। সে সময় জার্মানি যে সুশৃঙ্খল শৃঙ্খলার পরিচয় দেয় তারও কোনো তুলনা চলে না। এই শৃঙ্খলার জোরেই দেশটি দীর্ঘ নৌ অবরোধের বিষম প্রতিক্রিয়া ঠেকাতে সক্ষম হয়। পক্ষ বাহিনীর জন্যও সামরিক নিতীবিকা হিসেবে দাঁড়াতে পারে।

---

১ Jean de Bloch. La Guerre. Traduction de l'ouvrage russe "La Guerre future aux points de vue technique, economique et politique." Paris. Guillaumin. 1898-1900. 6 Vols.

মহাযুদ্ধ : প্রথম পর্যায়

জার্মান যুদ্ধ পরিকল্পনা। গোড়ার দিকে জার্মানদের সাফল্য। জোফর (Joffre)। টেনেনবার্গ এবং ম্যানুরীয় হ্রদ। মার্নে মিত্র বাহিনীর বিজয় অর্জন। চ্যানেল বন্দরগুলি দখলের জন্য জোর প্রতিযোগিতা। এপ্রেস প্রতিরক্ষা, পরিখা যুদ্ধ। বৃটেনের প্রসারমান যুদ্ধ প্রচেষ্টা। বৃটিশ নৌবাহিনী। পূর্বাঞ্চল। দার্দানেলেস। ইতালির মিত্রপক্ষে যোগদান। ইতালির গঠনতন্ত্র ফলকেনহেইন পরিকল্পনা। প্রাচ্যে জার্মানির অভাবিত বিজয়। জার্মানির পশ্চিম সীমান্তে মিত্র বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত। ভারদুন ও সোম, ১৯১৬। ট্যাঙ্ক বাহিনী নিয়োগ। ব্রুসিলভের সাফল্য। রুমানিয়ার যুদ্ধে যোগদান। জার্মানি কর্তৃক রুমানিয়া বিজিত। মধ্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর নিদারুণ অর্থনৈতিক দুর্দশা। নৌঅবরোধ আরোপ।

চিফ অব জার্মান স্টাফ এবং একটি প্রসিদ্ধ বংশের মাঝারি মানের উত্তরাধিকারী, মল্টকির স্কন্ধে ছিলো সামরিক উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব। তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় কাউন্ট শ্লিফেনের নকশার আদলে। কাউন্ট শ্লিফেন ১৯০৫ সালে জার্মান চিফ অব স্টাফ ছিলেন। মল্টকির পরিকল্পনা এই ছিলো যে গুটিকয় ডিভিসন সৈনিক দিয়ে দেশের পূর্ব সীমান্ত পাহারা দেয়া হবে, এদিকে বেলজিয়াম এবং লুক্সেমবার্গের ভেতর দিয়ে বিরাট বাহিনী পরিচালনা করে সম্ভাব্য দ্রুততার সঙ্গে ফ্রান্সকে করা হবে অকেজো। এই কাজটি সম্পন্ন করা হলে পূর্ণ শক্তির জার্মান বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করবে। বার্লিনে অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে প্রত্যাশা করা হয় যে, ইংরেজরা ফ্রান্সে লক্ষাধিক সৈন্য পাঠিয়ে ফ্রান্সের শক্তি বৃদ্ধি করলেও শ্লিফেন পরিকল্পনায় যেমন অনুমান করা হয়েছে, জার্মান রাইখের পাঁচ ভাগের চার ভাগ শক্তির বাহিনীকে ফরাসিরা কিছুতেই কার্যকরভাবে প্রতিহত করতে পারবে না। জার্মান সম্রাট কাইজার দু-বার পৃথক পরিস্থিতিতে স্যার এডওয়ার্ড গ্রেকে বলেন যে, "ভুলবেন না, আমরা এক পক্ষ কালের মধ্যে প্যারিস নগরীতে পৌছে যেতে সক্ষম।"

জার্মান সম্রাটের এই গর্বিত উচ্চারণকে একেবারে বাজে এবং অমূলক মনে করাও সংগত কাজ হবে না। শৃঙ্খলার প্রতিটি ক্ষেত্রে, সরঞ্জাম এবং দক্ষতায় ১৯১৪ সালের জার্মান বাহিনী ছিলো সবচেয়ে ভয়ানক। পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এই বাহিনীর অধীনে ছিলো চার মিলিয়ন তিনশত হাজার সম্পূর্ণ প্রশিক্ষিত এবং এক মিলিয়ন আংশিক প্রশিক্ষিত সৈনিক। বাহিনীর ভারি কামানগুলো ছিলো আতংক উদ্রেককারী। তারা যে রীতিতে সৈন্য সমাবেশ করে তাকে রীতিমতো শিল্পকর্ম বলে মানতে হয়। হাজার হাজার রেলগাড়ি যথাসময়ে সৈন্য প্রেরণ করেছে দীর্ঘ রেলপথের পাশে নানান কেন্দ্রে। রেলপথগুলো বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের সীমান্ত বরাবর 'বিশেষ দিনে'র কথা স্মরণ করেই নির্মাণ করা হয়। যদিও জার্মান বাহিনী নিয়েজে অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়, তাদের অগ্রযাত্রায় কিছুটা বিঘ্ন ঘটে, এবং চল্লিশ হাজার সৈন্য নিহত হল, তবু বাহিনীর অগ্রযাত্রা সময়ের হিসেবে তেমন হেরফের হয়নি। বিশাল জার্মান বাহিনী বন্যার জলের মতো প্রবাহিত হয় এবং ব্রাসেলস নগরীতে পৌছে

যায় আগস্ট মাসের বিশ তারিখে। পথিমধ্যে ভারি কামানের গোলার আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয় দুটি দুর্গ, নামুর এবং মউবিউজ। অবরুদ্ধ করা হয় এন্টউরপ, কারণ এখানে বেলজিয়ান বাহিনী পশ্চাদপসারণ করে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদিকে ফরাসি ও ইংরেজ বাহিনী অপর্যাপ্ত সেনা ও যুদ্ধ সরঞ্জামের সাহায্যে শার্লেরয়, মন্স এবং লে ক্যাটুতে (২,৩ আগস্ট) জার্মান বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। তাদের বিতাড়িত করা হয়। ২ সেপ্টেম্বর ফন ক্লকের অধীনস্থ সেনাদল সর্ব দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে প্যারিস নগরী অভিমুখে যাত্রা করে। ফরাসি সরকার বর্দুতে পালিয়ে যায়। স্যার জন ফ্রেন্চের নেতৃত্বাধীন ইংলিশ এক্সপিডিশনারি ফোর্স এদের অনুসরণ করে। মনে হয় যেন ফরাসি সরকারের পতন এবং জার্মান সামরিক কর্মসূচির প্রথম ভাগের পরিকল্পনা কয়েক দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে।

ফরাসি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুঠামদেহী এবং সুরসিক জোফর। তাঁর ছিলো অনমনীয় মন, খোলামেলা মেজাজ, প্রশান্ত আশাবাদ এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি। বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব সম্ভাব্য সকল প্রকার ভুল করে। কর্তৃপক্ষ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রতিরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এদের ধারণা ছিলো যে জার্মানরা আড্রেনেসের পথ ধরে আক্রমণ করবে। তারা জার্মান বাহিনীর আকৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই করতে পারেনি। বুঝতে পারেনি যে, পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে রিজার্ভ বাহিনীও যোগ দেবে এবং যদিও ম্যাশিন গান উদ্ভাবনের দরুন যুদ্ধের চরিত্র বদলে যায়, তবু সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব অতি ইচ্ছুক অফিসারদের মনে আগ্নেয় আক্রমণের বিপর্যকর মতবাদ গেথে দেয়। এই ভুলগুলোর জন্য ফরাসি বাহিনী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তথাপি, যদিও ফরাসি বাহিনীর বাম পার্শ্ব হয় বিতাড়িত, ফলে প্যারিস নগরী প্রতিরক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে, কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্ব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করে। তৌল, ন্যান্সী এবং ভার্দুনে দ্বিতীয় এবং প্রথম ফরাসি বাহিনী সফলতার সঙ্গে ভূমি আকড়ে থাকে।

ইত্যবসরে, বহুদূরে, পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে রুশ সাম্রাজ্যের কিম্ভূতকিমাকার, তথা দুর্বহ সমরযন্ত্রকে আহ্বান জানানো হয় চোখ-কান বন্ধ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কারণ ফ্রান্সের জন্য যে বিপজ্জনক চাপের সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা জরুরি। গ্রান্ড ডিউক নিকোলাস অস্ট্রীয়দের বিরুদ্ধে তীব্র বেগে গ্যালিসিয়ার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। রেনেনক্যাম্প এবং স্যামসনভের বাহিনীদ্বয় (একটি উত্তরাভিমুখী, অপরটি ম্যাসুরীয় হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত) পূর্ব প্রাশিয়ায় আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করে। এই ঘটনায় সমগ্র জার্মানিতে ভয়ানক আতংকের স্রোত বয়ে যায়। অতঃপর আকস্মিকভাবে বার্লিনে খবর আসে যে, টেনেনবার্গে (আগস্ট ২৫-৩১) স্যামসনভ বাহিনীর ও গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে। আর টেনেনক্যাম্পের বাহিনী বিশাল পরাজয় বরণ করেছে ম্যাসুরি হ্রদ এলাকায় (সেপ্টেম্বর ৮-১৫)। স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সুপরিচিত বলে হ্যানোভারবাসী জনৈক বৃদ্ধ জেনারেলের অবসর জীবনে ছেদ টেনে এখানে নিয়োগ করা হয়। তার সঙ্গে কাজ করেন লিয়েজের রণক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জনকারী এক তরুণ অফিসার চীপ অফ স্টাফ হিসেবে। এরা ঐ দুটি রণাঙ্গনে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন। উপরন্তু কয়েকটি অতুলনীয় প্রচেষ্টার সাহায্যে পূর্ব প্রাশিয়ার পতন ঠেকান। তারা যে অপর একজনের পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করেন তা অবশ্য তখন জানা যায় নি।[২]

---

২. কর্নেল হকম্যান, অপারেশন বিভাগের প্রধান।

সেই সময় থেকে হিন্ডেনবুর্গ এবং লুডেনডর্ফ বিজয় অর্জনের জন্য সুনৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম হিসেবে চিহ্নিত হয়।

তবু ম্যাসুরীয় বনাঞ্চল এবং জলাভূমিগুলোতে রুশদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও তাদের মতলব আংশিক হাসিল হয়। আর এই আসল মতলবের জন্যই তারা একটি ত্বরিত ও বিকট অগ্রাভিযান পরিচালনা করে। রুশদের অভিযান ঠেকানোর জন্য জার্মানরা পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে দুটি বাহিনী পূর্ব রণাঙ্গনে প্রেরণ করে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের সমতলভূমিতে এই দুটি বাহিনীর উপস্থিতি হয়তো জার্মান পরাজয়কে বিরাট সাফল্যে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হতো।

কারণ মার্ন উপত্যকায় পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈনিকদের দিকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জোফর (সেপ্টেম্বর ৪-৯) এই যুদ্ধের ভাগ্যনির্ধারণকারী একটি বিজয় অর্জন করেন। তিনি যে সফলতা পান প্যারিসের সামরিক গবর্নর গ্যালিয়েনির পরামর্শ মোতাবেক কাজ করে, কিংবা এমন পরিস্থিতির জন্য, যে পরিস্থিতির উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলোনা (যেমন জার্মানরা সরবরাহের কথা না ভেবেই অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলো, জন ফ্রেঞ্চ দ্বিতীয় জার্মান বাহিনীর অনুরোধে সাড়া দিয়ে হঠাৎ দক্ষিণ পূর্ব দিকে রওয়ানা হন একটা ফাঁক পূরণের জন্য, ফলে প্যারিস পার্শ্বদেশ আক্রমণের সুযোগ পেয়ে যায়) কিংবা রুশ বাহিনী বেলজিয়ামে অবতরণ করছে বলে বিশ্বাস করে (ইংল্যান্ডে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়) জনৈক জার্মান স্টাফ অফিসার পশ্চাদপসারণের আদেশ দেন, তবু এতে, তার কৃতিত্ব বড়ো একটা হ্রাস পায় না। জেনারেলদের কাজই হলো বন্ধুদের সুপরামর্শ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের ভুলগুলো থেকে সুবিধা আহরণ। অসাধারণ গুণাবলির অধিকারী একজন জেনারেলই কেবল দীর্ঘ ও অবমাননাকর পশ্চাদপসরণের পর ঘুরে দাঁড়াতে পারেন। পুনর্গঠিত করতে পারেন বাহিনী এবং বিরাট রণাঙ্গনে সমন্বয়সাধক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাহিনীর সৈনিকদের আকস্মিকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন বিজয় অর্জনের জন্য।

প্যারিস নগরী দখলের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হবার পর জার্মানরা অদ্ভুৎ অসর্তকতার জন্য চ্যানেল পোর্ট দখলের সুযোগও হাত ছাড়া করে। ব্যাপারটা অদ্ভুৎভাবে তাদের নজর এড়িয়ে যায়। অশ্বারোহী বাহিনীর অস্থিরমতি সমরনায়ক স্যার জন ফ্রেঞ্চ-এর রণ ব্যাপারে সামরিক সমালোচনা অত্যন্ত মুখর, অথচ কিচেনার ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ না করলে তিনি বৃটিশ বাহিনী রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাহার করতেন পুনর্গঠনের জন্য। এখানে মনে রাখতে হবে যে, জার্মানরা যখন মার্ন থেকে এইসনে (Aisne)-তে পশ্চাদপসারণ করে এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পরিচালিত সকল প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়, তখন স্যার ফ্রেঞ্চ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর বাহিনীকে চ্যানেল অভিমুখে পরিচালিত করে (অক্টোবর) তিনি শত্রু বাহিনী অতিক্রম করে যান এবং ইপ্রেসের প্রাচীন দুর্গ হলের চার পাশে কয়েকটি মরণ-পণ লড়াই করে বাহিনীর বিন্যাসকে টুকরো টুকরো করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করেন। ইপ্রেসের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডযুদ্ধ যে দৃঢ়তার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয় তার নজির সচরাচর কম মেলে। ইপ্রেসের যে যুদ্ধের গুরুত্ব তাও অন্য কোনো যুদ্ধের ছিলো না। থাকলেও কম যুদ্ধেরই ছিলো। জার্মানরা যদি ক্যালাইস এবং বৌলেনে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন তাহলে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মধ্যেকার যোগাযোগের দ্রুততম সূত্র ছিন্ন হয়ে যেত। উপরন্তু দু'টি দেশের মধ্যেকার সহযোগিতার সমগ্র পরিকল্পনা

পুরুত্বভাবে, কিম্বা হয়তো মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। (অক্টো-নবে ১৯১৪ এপ্রি-মে ১৯১৫)।

প্রকৃতির সমস্যা যে কতোটা গুরুতর ছিলো তা উভয় পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ আঁচ করলেও বোঝা যায়। চ্যানেল বন্দরগুলোর উপরে অধিকার লাভের জন্য নিয়োজিত শরৎ ও বসন্তকালীন সংঘর্ষে ইংল্যান্ডের প্রবীণ ও পেশাদার সৈনিক এবং জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিশ্রুতিশীল তরুণরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যদিও মিত্র বাহিনীর আত্মত্যাগ (ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের) একেবারে বৃথা যায় নি, কিন্তু জার্মানরা একদল সংরক্ষিত অফিসারকে হারায়, এই অফিসারদের শূন্যস্থান পূরণ করা আর সম্ভব হয়নি। ফলে যুদ্ধের শেষ বছর এদের অভাব খুবই অনুভূত হয়।

বৃটিশ পরিখাগুলোর বাম পার্শ্বে রাজা এলবার্টের অধিনায়কত্বে বেলজিয়ামের সৈনিকরা দাঁড়িয়ে যায়, এবং অংশত প্লাবনের দরুন সুরক্ষিত থেকে, বেলজিয়াম ভূখণ্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ অক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে। বেলজিয়াম সেনাবাহিনী এমনিতেই ক্ষুদ্র। যুদ্ধে হতাহতের দরুন আকার আরো হ্রাস পেয়েছে। তবু এখানে প্রয়োজনীয় এবং কার্যকর তৎপরতা প্রদর্শন করে। ইংরেজদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী সময় মতো এন্টউইর্পে প্রেরণ করায় এই বাহিনী উক্ত বিপর্যস্ত নগরী থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিতে পারে এবং চ্যানেলে বন্দরগুলো প্রতিরক্ষায় সমর্থ হয়।

শীতকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে পরিস্থিতির বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সক্রিয় যুদ্ধের স্থান দখল করেছে সাজসজ্জার যুদ্ধ (War of attrition)। ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্রগুলোর উপর আঘাতের পরিবর্তে সূচিত হয় মন্থর এবং বৈজ্ঞানিক জার্মানি অবরোধ। চ্যানেল থেকে ভোসজেস পর্যন্ত দীর্ঘ পরিখা সারি বরাবর প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীদ্বয় পরস্পরের প্রতি তীব্র নজর রাখে এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, অথচ অমিত সাহসিকতা সত্ত্বেও রণাঙ্গনের আটসাট পরিধির অভ্যন্তরে কমই সুবিধা করতে পারে। এই ভয়নাক এবং প্রাণান্তকর দ্বন্দ্বে জার্মানরা প্রারম্ভিক সুবিধাদি ভোগ করে। তারা সংখ্যায় ছিলো অনেক বেশি, তাদের প্রশিক্ষণও ছিলো উন্নততর। তাদের ম্যাশিন গান ও কামান, বিমান ও ফ্লেমথ্রোয়ার-এর সংখ্যাও ছিলো অনেক বেশি। উপরন্তু তাদের দখলে ছিলো উচ্চ ভূমিগুলো। তারা নিয়ন্ত্রণ করেছে বেলজিয়ামের আর্থিক সম্পদের সকল উৎস। তারা নিয়ন্ত্রণ করেছে উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চলগুলো, আশি শতাংশ কয়লা এবং সম্ভবত দেশের মওজুত প্রায় সমস্ত লৌহসম্পদ। সমুদ্র এবং আলপস পর্বতমালা সংলগ্ন তাদের অবস্থানগুলো ছিলো অত্যন্ত সুদৃঢ়।

ফরাসি এবং বৃটিশ সরকারদ্বয় তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করেন যে ছয় ডিভিশন সৈন্যের একটি বৃটিশ স্থল বাহিনী যুদ্ধের গোড়ার দিকে পর্যাপ্ত মনে করা হলেও এখন দেখা যাচ্ছে যে শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে বৃহত্তর বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে হবে। বৃটিনের সমরমন্ত্রী কিচেনার জনগণকে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে নাম লেখানোর জন্য আহ্বান জানান। তিনি পরবর্তী তিন বৎসরে সত্তর ডিভিশন গঠনের কথা ভাবেন। তাঁর নেতৃসুলভ ভাবমূর্তি এবং অতুলনীয় মর্যাদাবোধের জন্য উক্ত আহ্বান বিশেষ সমাদর লাভ করে। দলে দলে লোক কিচেনার বাহিনীতে (সে সময় মাঝে মাঝে এ রকমই বলা হতো) যোগদানের জন্য ভিড় করে। সত্যি বলতে কি, এদের সংখ্যা এক সময় দাঁড়ায় তিনি ' কি এই

সংখ্যাও যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হয়। অতঃপর ১৯১৬ সালে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে ভর্তির আদেশ জারি করা হয়। এখানে আমাদের একটু সন্দেহ করতে হয় যে অন্য কোনো দেশ স্বেচ্ছায় লেখানোর ভিত্তিতে এতো সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হতো কি-না ; যেখানে এই স্বেচ্ছাসেবকদের সমুদ্র পেরিয়ে যোগ দিতে হবে রোমাঞ্চহীন খুনাখুনির যুদ্ধে। যখন নব গঠিত বাহিনী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলো এবং অপেক্ষা করছিলো সমরসম্ভারে সজ্জিত হবার জন্য, তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করে ফরাসি পয়লুস (poilus- তালিকাবহির্ভূত সেনাদল)।

স্থলভাগে সার্বিক যুদ্ধের জন্য বৃটেন যদিও প্রস্তুত ছিলো না, তবে জলভাগে তার ছিলো নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। বৃটেনের রণতরীগুলো কৌশলগত প্রশিক্ষণের জন্য জুলাই মাসে সমাবেশ করা হয় এবং উইনস্ট্যান চার্চিলের বিজ্ঞ দূরদৃষ্টির কারণে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হবার পরও সমাবেশ বজায় রাখা হয়। রণতরীগুলো স্কাপা ফ্লো এবং রসিথে যুদ্ধের জন্য অবস্থান গ্রহণ করে। এদের সামরিক কার্যক্রমে সহায়তা করে বীরত্ব ও দক্ষতায় অতুলনীয় শক্তি দ্বারা পরিচালিত একটি বিশাল বাণিজ্যিক নৌবহর। নৌবাহিনীর দায়িত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে বৃটিশ নৌদপ্তর এবং নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেলিকোর সম্পূর্ণ ধারণা ছিলো। রণতরীগুলো প্রয়োজনে দুনিয়ার যে কোনো স্থানে সেনাদল নিরাপদে পরিবহণের দায়িত্ব পালন করবে, এদের কাজ হবে জার্মান ক্রুজার এবং বহির্বাণিজ্য ধ্বংস করা, জার্মান উপনিবেশগুলো কেড়ে নেয়া এবং জলপথে শত্রু দেশসমূহের জন্য খাদ্য ও সমরসম্ভার বহনকারী জাহাজগুলোর গতি রোধ করাও এদের দায়িত্ব। এই দায়িত্বগুলো বৃটিশ নৌবাহিনী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পালন করে। এ ক্ষেত্রে তারা প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর এবং ভূমধ্যসাগরে জাপান ও ফ্রান্সের সহায়তা পায়। যুদ্ধের অন্তিম দিনগুলোতে লাভ করে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষ এবং অত্যন্ত প্রশিক্ষিত নৌবাহিনীর সাহায্য।

স্থলভাগের জন্য বৃটিশ রণকৌশল প্রণয়ন অনেকাংশে প্রভাবিত হয় জলভাগে তাদের প্রাধান্যের দরুন। বিবদমান দলগুলোর মধ্যে একমাত্র বৃটেনের পক্ষে সম্ভব ছিলো দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করা। ফলে যখন বোঝা গেল যে পশ্চিমের রণাঙ্গনের যুদ্ধে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে তখনই বৃটিশ মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে একটা দল দাঁড়িয়ে গেল, যারা পূর্ব রণাঙ্গনে বৃটিশ সেনাদল প্রেরণের পক্ষপাতী। পূর্ব রণাঙ্গনে বৃটিশ বাহিনী নিয়োগের পক্ষে যারা ছিলেন তাদের যুক্তি এই ছিলো যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানদের অবস্থানগুলো অত্যন্ত দৃঢ়, প্রায় দুর্ভেদ্য, এদের ছত্রভঙ্গ করার প্রচেষ্টা নিতে গিয়ে আক্রমণকারী বাহিনী আত্মরক্ষাকারী বাহিনীর চেয়ে সব সময় বেশি ক্ষতি স্বীকার করেছে। তাছাড়া মিত্রশক্তিগুলোর রণকৌশল হলো শুধু নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখা। এখানে বৃহত্তর জনবল এবং রণসম্ভার নিয়োগ তুলনামূলকভাবে অকার্যকর। অতএব এখানে জার্মানরা যদি আক্রমণ করা যুক্তিসংগত মনে করে তাহলে সেটা তারা করুক। আমরা বরং পূর্ব রণাঙ্গনে ফলাফল অন্বেষণ করি, যেখানে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র একটি অ্যাংলো-ফরাসি বাহিনী বলকান জনগণকে কাছে টানতে পারবে। ফলে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানা যাবে। কিংবা হয়তো রাশিয়ায় অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের জন্য নিরাপদ চ্যানেল তৈরি করা সম্ভব হবে। এই মতবাদের পক্ষে দুজন প্রধান প্রবক্তা হলেন লয়েড জর্জ এবং উইনস্ট্যান চার্চিল।

স্বাভাবিকভাবেই ফরাসিদের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সমগ্র শক্তি ছিলো এই মতবাদের বিপক্ষে। প্রতিটি ফরাসি নাগরিকের কাছে জাতীয় ভূ-খণ্ড মুক্ত করার চেয়ে অন্য কোনো লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। ইংরেজরা যতো বেশি সংখ্যক কামান-বন্দুক এবং সৈনিক ফ্রান্সে প্রেরণ করবে ফরাসিদের কাঁধে চেপে যাওয়া যুদ্ধের বোঝা ততো হ্রাস পাবে। এবং তুলনামূলক দ্রুততার সঙ্গে ফরাসি দেশ দখলদার বাহিনী থেকে মুক্ত হবে। স্যার জন ফ্রেন্চ এবং স্যার ডগলাস হেগ, দৃঢ়চিত্ত স্কটিশ অফিসার (তিনি জন ফ্রেন্চের স্থলাভিষিক্ত হন), ফরাসিদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন। তারা ইংরেজদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা খণ্ড-বিখণ্ড করার বিরোধী ছিলেন। ফরাসি সেনানায়ক জোফর-এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে চক্‌চকে আশা পোষণ করতেন যে অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা বড় ধরনের আঘাত হানা সম্ভব হলে বিজয় অর্জন করা সম্ভব হবে। একমাত্র কিচেনার ছাড়া দেশের প্রায় প্রতিটি ঝানু সেনানায়ক অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। এদের আস্থা পশ্চিম রণাঙ্গনের উপর।

তবু পূর্বাঞ্চলে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা আঁতাত শক্তিগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করে। রাশিয়া তুরস্কের জাত শত্রু, অথচ এই যুদ্ধে তুর্কি সাম্রাজ্যের সরকারের শত্রু রাশিয়া ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড আবার তুরস্কের অনেক দিনের বন্ধু, অতএব সুলতানের উচিত ছিলো নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা। কিন্তু এই স্বাভাবিক পথ সুলতান অনুসরণ করেননি কয়েকটি কারণে। আনোয়ার পাশার মর্যাদা এবং চাপ, তাছাড়া কন্সট্যান্টিনোপলের দেয়ালগুলোতে সে সময় ঠেকে দু'টি জার্মান ক্রুজার, গোয়েবেন এবং ব্রেসলৌ। পরন্তু তুর্কি সরকার বিরক্ত ছিলো যে বৃটিশ ডকে দু'টি তুর্কি যুদ্ধ জাহাজ আটক করে রাখা হয়েছে। এই জাহাজের মূল্য পরিশোধ করা হয় জনগণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে। তুর্কি ভীরু রাজদরবারের চূড়ান্ত ইতস্তত অবস্থা জয় করা হয় সুচতুর এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ কায়দা কাজে লাগিয়ে। জার্মানরা এই কায়দাটা খাটায় গোয়েবেন এবং ব্রেসলৌ থেকে বৃহৎ রুশ বন্দর ওডেসায় বোমা বর্ষণ করে (অক্টোবর ২৮, ১৯১৪) যাতে তুর্কিরা দ্রুত এবং নিশ্চিতরূপে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এদিকে ক্রুজার দুটি তুর্কি সরকারের কাছে বিক্রয় করা হয় কাল্পনিকভাবে। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে অটোম্যান সাম্রাজ্য জার্মানদের পক্ষে চলতি সংঘর্ষে যোগদান করে।

এই ঘটনার ফলশ্রুতি ছিলো গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। রাশিয়া জনবলের দিকে থেকে হীন না হলেও আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনার উপযোগী কলকারখানার অধিকারী ছিলো না। ১৯১৪ সালের শরৎকালের মধ্যে দেশটির সমর সম্ভারের মওজুদ শেষ হয়ে যায়। বাহিনীসমূহের দৈনিক প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশের বেশি সরবরাহ করার সমর্থতা তার থাকে না (স্বীয় উৎস থেকে)।

এখন তাঁর কাঁধে ককেশাস অঞ্চলে তুর্কিদের বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধ পরিচালনার বোঝা চেপে বসলো। ১৯১৫ সালের ২ জানুয়ারি কিচেনার গ্রান্ড ডিউক নিকোলাসের আবেদন গ্রহণ করেন। এতে ককেশাস রণাঙ্গনে যুদ্ধের চাপ কমানো ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য আবেদন জানানো হয়। তাৎক্ষণিকভাবে দার্দেনেলেসে বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দার্দেনেলেস অবরুদ্ধ থাকলে সরবরাহের অভাবে রাশিয়া যুদ্ধে থেকে হাত গুটাতে বাধ্য হতে পারে। দার্দেনেলেস খোলা থাকলে সারা বছর দেশটিতে খোলা-বারুদ, কামান-বন্দুক প্রেরণ করা যাবে। শুধু তাই নয়, দেশটির উৎসাহে যে ভাঁটা পড়েছে তাও দূর হতে পারে। পশ্চিম

রণাঙ্গনের সামরিক শিক্ষা থেকে রুশ বাহিনীর কৌশলও উন্নত হবে। অন্যান্য বিবেচনার গুরুত্বও কম নয় এবং সেগুলোও অভিন্ন লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত। অন্যান্য বিবেচনাগুলো হলো : কন্সট্যান্টিনোপলে একটি বৃটিশ নৌবহর তুর্কি বাহিনী দ্বি খণ্ডিত করবে। দার্দানেলিসের পথ উন্মুক্ত করা হবে এবং দক্ষিণ রাশিয়ার ফলনের প্রাচুর্য মিত্র শক্তিগুলোর জন্য করা হবে সহজলভ্য। স্থল ও নৌবাহিনীর প্রথম এবং সবচেয়ে লক্ষণীয় ভিন্ন পথ অনুসরণ ছিলো দার্দেনেলেস অভিমুখে অভিযান প্রেরণ। পেছনে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে : সকল খ্রিস্টান বলকান শক্তি মিত্র বাহিনীর পক্ষে আনয়ন ; তুর্কিদের দখল থেকে গোটা আরব বিশ্বের সম্ভাব্য মুক্তি ; বৃটেনের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের সম্ভাব্য জাগরণ ; ভারতে এবং মিশরে বৃটিশ শক্তির সম্ভাব্য ধ্বংস সাধন কিংবা ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশে নন-অটোম্যান জাতিসমূহের উপর অটোম্যান সাম্রাজ্যের দীর্ঘকালের শাসনের অবসান। গ্যালিপলি উপদ্বীপে যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্য ছিলো রাশিয়ার মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা। এটিই ছিলো পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনের যুদ্ধে প্রথম বড়ো আঘাত এবং যদিও এটি প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়নি, তবে অটোম্যান সাম্রাজ্য বিগঠনের পথ প্রশস্ত হয়।

এই ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ কার্যকর করতে গেলে একাধিক ত্রুটি ধরা পড়ে। শুধু নৌবহরের সাহায্যে প্রণালী দখল করতে গেলে তা বাঞ্ছাল হয়ে যায় অনুদ্ঘাটিত মাইনফিল্ডের জন্য। অনেক বিজ্ঞ নাবিকের মতে উক্ত প্রচেষ্টা দ্বিতীয় বার গ্রহণ না করা অবিজ্ঞের কাজ হয়েছে। ফলে শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণ সতর্ক হয়ে যায়, এবং অযথা দীর্ঘ বিলম্বের পর স্যার ইয়ান হ্যামিলটন যখন উক্ত উপদ্বীপে অবতরণের জন্য তৈরি, শত্রুপক্ষও তখন পূর্ণ প্রস্তুত। অতঃপর বৃটিশ উদ্যোগ যে কতোটা অসুবিধার সম্মুখীন তা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। উক্ত উপদ্বীপ গাছপালা শূন্য, ঢালু বেয়ে উপকূলের দিকে নেমে গেছে। আত্মরক্ষাকারীরা সর্বত্র সুবিধাজনক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত। আক্রমণকারী বাহিনী ছিলো অতি ক্ষুদ্র এবং নৌবহরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাদের মোকাবেলা করতে হয় জার্মান বিজ্ঞান এবং তুর্কি অধ্যবসায়ের, অর্থাৎ সকল রকম বাধার। তথাপি কম গোলাগুলির ভেতর উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগের পাঁচটি জায়গায় অবতরণ করা সম্ভব হয়। শুধু কয়েক মাস তুর্কি বাহিনীর প্রধান অংশ গুরুতর চাপের মধ্যে থাকে। তাদের অবস্থান সুরক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন একটা সময়ও আসে (জনবল ও সমরসম্ভার বৃদ্ধি পেলে) যখন মনে হয় সাফল্য বৃটিশদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। ৬ আগস্ট সুভলা বে-তে নতুন করে অবতরণ করা হয়। এখানে দেখা যায় তুর্কিরা একেবারে প্রস্তুত নয়। অতঃপর দ্রুত ও বলিষ্ঠ অভিযানের মাধ্যমে হয়তো স্টপফোর্ডের বাহিনী আনাফার্টা শৈলশিরা দখল করতে পারতেন, কিন্তু সুযোগটা হাত-ছাড়া করা হয়। আনাফার্টা শৈলশিরা ছিলো কৌশলগত অবস্থানের জন্য অতি উত্তম স্থান। একদিকে আক্রমণকারীরা যখন মূল্যবান আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় অযথা নষ্ট করে তখন জনৈক তুর্কি তরুণ অফিসার মুস্তফা কামাল বে যথেষ্ট সংখ্যক সৈনিকের সমাবেশ ঘটান, এবং অতি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনেন।

অতঃপর বৃটিশ বাহিনী উপদ্বীপ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে। প্রত্যাহার করতে গিয়ে বৃটিশ বাহিনী কোনো প্রকার হতাহতের সম্মুখীন হয়নি (ডিসেম্বর ১৮, ১৯১৫—জানুয়ারি ৮, ১৯১৬)। অথচ ইতিপূর্বে অনেকে গুরুতর আশংকা ব্যক্ত করেন। প্রত্যাহার কার্যে বৃটিশ

বাহিনী যে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখে তার পরিচয় গোটা অভিযানে পাওয়া যায়। এই উদ্যোগে একলক্ষ বিশ হাজার বৃটিশ সৈনিক প্রাণ হারানোও মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয়নি। জার্মান ও তুর্কদের প্রতিরোধের মুখে রাশিয়া অভিমুখী দক্ষিণ ভাগের জলপথ উন্মুক্ত করা যায়নি। তখাপি এটা মনে করলে ভুল করা হবে যে, বৃটিশরা উক্ত নিষ্পাদপ উপদ্বীপে এতটা আত্মত্যাগ স্বীকার করলো, অনেকের জীবন গেল, প্রকৃত সম্পদ বিনষ্ট হলো, কিন্তু প্রতিদান হিসেবে সে কিছুই পেল না ; মিত্র পক্ষের কোনো কাজে লাগলো না। বৃটিশরা যখন অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিলান্ড থেকে প্রেরিত বিরাট বাহিনীর সাহায্যে তুর্কিদের প্রবেশদ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হানছিলো, রাশিয়া তখন এই যুদ্ধে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মিত্র পক্ষ তাকে কন্সটান্টিনোপল প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়, আশ্চর্যজনক ভাগ্যের ফেরে বৃটেন তখন এমন একটি অভিযানে শরিক, যে অভিযান সফল হলে উক্ত পুরস্কার তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। যুদ্ধের বদৌলতে এর চেয়ে বড় পুরস্কার রুশরা প্রত্যাশা করে না। সর্বদেব দুর্ভাগ্যে তাদের কিছু এসে যায় না ; পশ্চিম অঞ্চলে রাজ্য জয়ের ক্ষুধা তাদের নেই। তাছাড়া অনতিবিলম্বে তারা এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয় যে তাদের পক্ষে জার্মানদের পরাস্ত করা সম্ভব। তবে বৃটেন যদি জারিগ্রাদ (Tzarigrad) কব্জা করতে সক্ষম হতো তাহলে ম্যাসুরীয় হ্রদে, এবং পোল্যান্ডে যে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে তা পুষিয়ে যেতো। অতএব, যদিও দার্দেনেলেস অভিযানের স্বপক্ষে এ কথা বলা যায় যে এতে তুর্কিদের শ্রেষ্ঠ বাহিনীগুলো দখল এবং হয়রান করা সম্ভব হয়, তবে এই অভিযানের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ফলশ্রুতি এই ছিলো যে এতে রুশরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত বোধ করে।

গ্যালিপলিতে অবতরণের পর পরই (মে ২৪) ইতালি দীর্ঘকাল সমস্যা ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রেখে চললেও প্রাচীন পন্থার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিক হয়। অস্ট্রিয়া তখন একাধিক ভাগে বিভক্ত এবং অপ্রস্তুত। বেলজিয়ামের উপর বেআইনি আক্রমণ পরিচালনার জন্য ইতালির উদারনৈতিক সরকার যদিও খুবই প্রভাবিত হন, তবে এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূলে অধিক কাজ করেছে ইতালির ট্রেনটিনো এবং ত্রিয়েস্তের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি। এই দুটি প্রদেশ ইতালিকে ফিরিয়ে দিতে অস্ট্রিয়া সম্মত হয়নি। এদিকে মিত্রপক্ষ তাকে ঐ দুটি প্রদেশ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পুরস্কার হিসেবে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। লন্ডনের গোপন সন্ধিকে (১৬ এপ্রিল, ১৯১৫), যা ইতালিকে মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুক্ত করে, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে নিন্দা করা হয়। কারণ উক্ত গোপন সন্ধিতে প্রস্তাবিত করা হয় যে, জার্মান টাইরোলিজদের বাইরের প্রভুর কাছে হস্তান্তর করা হবে, এ ক্ষেত্রে তাদের মতামত পাত্তা দেয়া হবে না, তাদের ইচ্ছারও কোনো মূল্য দেয়া হবে না। কারণ প্রয়োজন কোনো আইন মানে না। লন্ডন ও প্যারিসের গণতান্ত্রিক সরকারদ্বয় বাধ্য হয়েই ন্যায় বিচারের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন।

ইতালীয়দের হস্তক্ষেপের ফলশ্রুতি হিসেবে অস্ট্রীয় বাহিনীর জন্য একটা নতুন রণাঙ্গন ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। ইতালির সেনাদল অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হলেও, আলপস এলাকায়, ইসনজো উপত্যকায় এবং কারসোর শিলাময় মালভূমিতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষগুলোতে তাদের দুইশত আশি হাজার সৈনিক প্রাণ হারায়। অতঃপর যদিও তারা ক্যাপোরেটোর যুদ্ধে প্রচণ্ড মার খায় এবং

এতোটা বিভ্রান্তির ভেতর পলায়ন করে যে মনে হয় যেন তারা জাতিগতভাবে ভেঙ্গে পড়েছে কিন্তু ইতালি সরকার ও জনগণের ছিলো প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং দুর্জয় সাহসের মওজুদ, যা উক্ত বিপর্যয়ও বিনষ্ট করতে পারেনি। ফরাসি ও ইংরেজ বাহিনীগুলোর দৃঢ়তার সাহায্যে ইতালীয় বাহিনী নতুন নেতার অধীনে পিয়েভে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। উপরন্তু ইতালীয় বাহিনী কয়েকটি সংঘর্ষে যোগ দিয়ে যে শক্তি ও আস্থা অর্জন করে তা কাজে লাগায় যুদ্ধের অন্তিম সময়গুলোতে (৩০ অক্টোবর, ১৯১৮)। ভিত্তোরিও ভিনেতোর রণক্ষেত্রে বিপর্যস্ত এবং হৃত মনোবল অস্ট্রীয় বাহিনীর উপর হানেন প্রচণ্ড আঘাত, ফলে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য হয় বিগঠনের সম্মুখীন। জাতীয় এই বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয়রা ক্ষমার যোগ্য কিছু বাড়তি কৃতিত্বও দাবি করে। তারা দাবি করে যে তাদের জন্যই হ্যাবসবার্গ বংশের পতন ঘটে এবং মিত্র বাহিনী জয়ী হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধে ইতালি প্রচণ্ড সহযোগিতা করে, অন্যান্য দেশের তুলনায় জনসংখ্যার অনুপাতে ইতালির লোক-ক্ষয় হয় বেশি। ফলে তারা শান্তি সম্মেলনে অসন্তোষ প্রকাশ করে। জানায় যে তাদের যথেষ্ট পুরস্কৃত করা হয়নি।

ইত্যবসরে, ১৯১৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর যখন ইতালির মনোভাব অনিশ্চিত অবস্থায়ই রয়েছে, তখন ভগ্নহৃদয় ও পরাস্ত মল্টকির স্থলাভিষিক্ত হন মেধাবী ফলকেনহেইন। নতুন চিফ অব স্টাফের রণকৌশল ছিলো একই সঙ্গে বলিষ্ঠ এবং নমনীয়। যদিও পশ্চিমাঞ্চলে তার শরৎকালীন অভিযান মূল উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হয়, তবু ফলকেনহেইন সন্তুষ্ট ছিলেন যে ফ্রান্স ও ফ্লান্ডার্সে (কিংবা ফ্লাঁদরে) জার্মানদের অবস্থান এখন অনেক বেশি সুরক্ষিত। ফলে আগামী বছর যদি শত্রু বাহিনী আঘাত হানে তাহলে সে আঘাত ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হবে এবং জার্মান বাহিনীর বড়ো একটা ক্ষতি স্বীকার করতে হবে না। অতএব পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে চূড়ান্ত কিছু ঘটতে পারে, যেখানে গ্যালিসিয়ায়, গ্রান্ড ডিউক নিকোলাস ক্রাকৌ এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের প্রতি হুমকি প্রদর্শন করছেন। শরৎকালীন সংঘর্ষে হিন্ডেনবুর্গ রুশদের অগ্রযাত্রা রোধ করেছেন, এটা যথেষ্ট নয়। দরকার হলো অত্র অঞ্চল থেকে রুশদের একেবারে হটিয়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরে ফেরৎ পাঠাতে হবে। রুশ বাহিনী যদি সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় তাহলে অপরিমেয় সুবিধা ভোগ করা যাবে। এতে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য বিরাট উদ্বেগের বোঝা থেকে মুক্ত হবে। মধ্য ইউরোপীয় শক্তিগুলো সমর্থ হবে তুর্কিদের সাহায্য করতে, সার্বদের যাবে পিষে মারা, বুলগারদের দলে টানা সহজ হবে। গ্রিকদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকবে, এবং যদি ইতালি শেষ পর্যন্ত মিত্র পক্ষে যোগ দেয়, তাহলে তাদের বৃহত্তর বাহিনী দিয়ে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় আঘাতে যদি রুশ দানব অপসারণ করা যায় তাহলে পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যার নিষ্পত্তি হবে এই মুহূর্তের জন্য এবং বার্লিন থেকে কন্সট্যান্টিনোপল হয়ে বাগদাদ পর্যন্ত সড়ক হবে নিরুপদ্রব। এই লক্ষ্যগুলো হাসিল করা গেলে পশ্চিমাঞ্চলীয় অধিকতর জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। এই রণাঙ্গনে ইংল্যান্ডকে গণ্য করা হয় জার্মানির সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং বিপজ্জনক শত্রু হিসেবে, একে কাবু করতে হবে দুটি পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। প্রথমত, সমুদ্র চালাতে হবে এলোপাথারি ডুবোজাহাজ। দ্বিতীয়ত, স্থলভাগে ফরাসি জনশক্তিকে করতে হবে সম্পূর্ণ ধ্বংসে। তাদের যুক্তিধারা এই ছিলো যে পূর্বাঞ্চল আত্মসমর্পণ করার পর জার্মানির উচিত ফ্রান্সের এমন প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানা যার জন্য দেশটি সর্বাধিক ক্ষতি স্বীকার করবে। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ

শত্রুরা এগিয়ে আসবে আত্মত্যাগের জন্য। এখানে তাদের ঘটবে সার্বিক বিনাশ। ফরাসিদের হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য যে জায়গা বেছে নেয়া হয় তার নাম ভার্দুন।

এই আড়ম্বরপূর্ণ নকশা বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে জার্মানরা অসাধারণ সাফল্য কুড়ায়। মেকেনসেন কর্তৃক বেশে গ্যালিসিয়ায় রুশদের কেন্দ্র হতে এগিয়ে যান ১৯১৫ সালের ২ মে (গরলাস টারনোর যুদ্ধ) এবং প্রতিপক্ষের চেয়ে অধিক ও উন্নত কামান-বন্দুক থাকায় রুশদের সহজেই তাড়িয়ে নিয়ে যান রাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত। রুশদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছাড়াও খুব বেশি। লেমবার্গ, গ্যালিসিয়ার রাজধানী, ওয়ার্স, পোল্যান্ডের রাজধানী, কোবনো এবং ভিলনা, লিথুয়ানিয়ার দুটি প্রধান শহর, ইত্যাদির পর্যায়ক্রমে পতন ঘটে জার্মানদের ভারি কামানের আঘাতে। এদিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্মান জেনারল ফন বুলো প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে যান কুরল্যান্ডের ভেতর দিয়ে রিগা অভিমুখে, পেট্রোগাদ (সেন্ট পিটারসবার্গের বর্তমান নাম) থেকে সীমান্তের রুশ বাহিনীর সঙ্গে কি ধরনের সামরিক বার্তা বিনিময় করা হচ্ছে তা জানার জন্য। জার্মানদের অগ্রাভিযান এতোটা দ্রুত এবং অপ্রতিরোধ্য ছিলো যে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে মনে হয় জারের স্থলবাহিনী সদর দপ্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং ভেঙে পড়বে। হয়তো আগামী বছর জার্মানরা পেট্রোগ্রাদে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত দেখবে। কিন্তু জার্মানদের সে বিজয় কখনো আসেনি। উত্তরের রণাঙ্গনে রাসকি এবং দক্ষিণের রণাঙ্গনে ইভানভ ঐ মাসে যে সাফল্য অর্জন করেন তাতে জার্মানদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। আর জার সরকারের হৃদয়ে নতুন আশার আলো জ্বলে উঠে। জার্মান উদ্যোগের বেগ নিঃশেষিত হলেও, অভিযানের ফলাফল ছিলো যথেষ্ট মূল্যবান। রুশদের তিনশত পঁচিশ হাজার সৈনিক বন্দী হয়। তাদের হস্ত-ছাড়া হয় তিন হাজার বন্দুক। এই আঘাত জারের বাহিনী যুদ্ধের অবশিষ্ট দিনগুলোতে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

অতঃপর শুরু হয় বলক্যানদের স্বাধীনতা হরণের প্রক্রিয়া। তুর্কিদের সহায়তা করা হয় দার্দেনেলেসে বৃটিশ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। বুলগারদের দলে টানা হয় (৬ সেপ্টেম্বর)। বিগত শরৎ মৌসুমে সার্বিয়ার বাহিনী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। এবার তাদের প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। তাদের করা হয় বিতাড়িত, তারা আশ্রয় গ্রহণ করে আলবেনীয় বরফাচ্ছাদিত পার্বত্য অঞ্চলে। বিলম্বে মিত্র পক্ষের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী স্যালোনিকাতে উকি দেয়। সার্বীয় বাহিনীকে তারা কোনো প্রকার সহায়তা করতে পারেনি। যখনই কোনো জার্মান জেনারেল পদপাত ঘটায়, মনে হয় সে বিজয় ছিনিয়ে আনবে। হিন্ডেনবার্গ পূর্ব প্রাশিয়া এবং পোলান্ডে, মেকেনসেন গ্যালিসিয়া এবং সার্বিয়ায়, লিমান ফন স্যান্ডার্স গ্যালিপলি উপদ্বীপে জয়ী হন। পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে জার্মানরা বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে তখন বৃটিশ ও ফরাসি বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ ঠেকিয়ে ভূমি দখল করে আছে। মিত্র বাহিনী কয়েকটি পরিকল্পিত আক্রমণ চালায় ফ্লান্ডার, আর্টয় এবং শ্যাম্পেনে। তবে শুধু নিউভ স্যাপলে (মার্চ ১০-১৩) সকল হলেও তাদের ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয় জার্মানদের চেয়ে অনেক বেশি। ফরাসিরা অসার পাটিগণিতের তত্ত্বের ভিত্তিতে যুক্তি দেখায় যে, সাজসজ্জার যুদ্ধে সকল সুবিধা ভোগ করবে মিত্রপক্ষ। এক্ষেত্রে জার্মানরা প্রদর্শন করে প্রকৃত বিজ্ঞতা। ইপ্রেসে প্রথম বারের মতো হতভম্ব হবার পর তারা অনায়াসভাবে পরজন গ্যাস (২২ এপ্রিল) ব্যবহার করে যদিও কোনো সুবিধা করতে পারেনি, তবে পূর্ব ও পশ্চিম, উভয় রণাঙ্গনের সংঘর্ষে তাদেরই জয় হয়।

উভয় রণাঙ্গনে মিত্র বাহিনীর বিপুল ক্ষতি হলে (১৯১৫ সালে), রণকৌশলে পরিবর্তন আসে এবং উচ্চ পর্যায়ে। সমরসম্ভারে ঘাটতি এবং রণক্ষেত্রে ব্যর্থতায় ইংরেজ জনমত বিক্ষুব্ধ হয়। জনগণ দাবি তোলে সর্বদলীয় সরকার (Coalition government) গঠনের। তারা অধিনায়ক পরিবর্তনেরও দাবি জানায়। তাদের দাবি ফ্রেঞ্চের পরিবর্তে হেগকে সর্বাধিনায়ক করা হোক। এ সময় রাশিয়ায় যে পরিবর্তন আসে তার ফলশ্রুতি দাঁড়ায় গুরুতর। গ্রান্ড ডিউক নিকোলাসকে প্রেরণ করা হয় ককেশাস অঞ্চলে। জার স্বয়ং সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আলেক্সিয়েফকে নিয়োগ প্রদান করা হয় তার চিফ অব স্টাফ হিসেবে। আলেক্সিয়েফ অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে রাশিয়ায় এই পরিবর্তনগুলোকে গণ্য করা হয় দেশের সরকারের অভ্যন্তরে সেই সব শক্তির বিজয় হিসেবে, যারা সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিপরায়ণ এবং তারা দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাহত করতে ইচ্ছুক। জার ছিলেন জারিনার (জারের পত্নী) আজ্ঞাবাহী। জারিনা ছিলেন রাসপুতিনের মন্ত্রমুগ্ধ। এই রাসপুতিন ছিলেন নোংরা, অসচ্চরিত্র সন্ন্যাসী। তিনি ছিলেন দ্রষ্টা, ওঝা এবং লম্পট। এসব গুণাবলীর জন্য তিনি উচ্চবংশীয় রুশ রমণীদের উপর অপরিসীম প্রভাব খাটাতে সমর্থ হন। মনে করা হয় রাসপুতিন ছিলেন জার্মান আরোপিত শান্তির অনুকূলে। যেহেতু গ্রান্ড ডিউক নিকোলাস ছিলেন এই আজব ব্যক্তিটির ভয়ংকার শত্রু, অতএব তার মর্যাদাহানিকে সর্বসাধারণ গণ্য করে উক্ত অসৎ সন্ন্যাসীর বিজয় হিসেবে। একে জার্মানির জয় হিসেবেও দেখা হয়। আরো দেখা হয় জারের সুনামে কলঙ্ক হিসেবে। এই সময় থেকে জনগণের কাছে লিটল ফাদার হিসেবে গণ্য নিকোলাসের মর্যাদার দ্রুত ও নির্বাধ অবক্ষয় শুরু হয়।

পরবর্তী বছর (১৯১৬) সবিশেষ স্মরণীয় ফরাসি ভূ-খণ্ডে দু'টি খণ্ড যুদ্ধের জন্য। একটি চলে সাত মাসের বেশি। অপরটি চলে চার মাস। ভার্দুন আক্রমণ ও রক্ষা এবং সম-এর যুদ্ধ যেমন মানবিক সহিষ্ণুতার বিরাট নিদর্শন, তেমনি অতীব দুঃখজনক নজির মানবসম্পদ অপচয়ের। বছর শেষে দেখা যায় কিছুই অর্জন করা যায়নি। পূর্বেকার অবস্থানগুলো পুনরায় দখল করতে সমর্থ হয়। ইংরেজরা সমে প্রথম দিনের যুদ্ধে ষাট হাজার সৈনিক হারায় এবং জার্মানদের পরিকল্পিত ও জটিল ব্যূহ ভেদ করতে ব্যর্থ হয়। তবু বাস্তবে এই দু'টি জঘন্য হত্যাকাণ্ড ভাগ্যের ভারসাম্য পরিবর্তন করে। ফরাসিরা জুলাই মাসে যখন ভার্দুন থেকে আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করে এবং সমে নবগঠিত বৃটিশ সেনাদলের বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার অবসান ঘটে (অক্টোবর মাসে), তখন জগতের এতদকালের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষিত এবং অতি দক্ষ ওল্ড জার্মান আর্মি বিদায় গ্রহণ করেছে।[১] অতঃপর জার্মানদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয়েছে তরুণ যোদ্ধাদের উপর (এদের সংগ্রহ করা হয় বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদান অধ্যাদেশের ভিত্তিতে)। এই তরুণ সৈনিকদের সামরিক প্রতিভা বৃটিশ ও ফরাসি সৈনিকদের চেয়ে অধিক ছিল না। জার্মান সদর দপ্তরে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই সময় রণাঙ্গনে উপস্থিত হয় বিশাল এক বৃটিশ বাহিনী। এই বাহিনী জার্মানদের সমতুল্য হিংস্র এবং দীর্ঘস্থায়ী বোমাবর্ষণে সক্ষম। অপিচ, সম-এর সম্ভাবহ যুদ্ধে কাজে লাগানো হয় ট্যাঙ্ক

---

১. সমে পাঁচ শো হাজার জার্মান সৈনিক মারা যায়। বৃটিশ পক্ষ হারায় চার শো দশ হাজার। ফরাসিরা হারায় একশত নব্বই হাজার।

(খাজকাটা চাকার উপর বসানো সশস্ত্র মোটর গাড়ি)। এই ট্যাঙ্ক তার, পরিখা এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে সক্ষম। সম-এর যুদ্ধে ট্যাঙ্কের ব্যবহার হয় প্রথম। এটি বৃটিশ উদ্ভাবন। পশ্চিম রণাঙ্গনের হেঁয়ালি দূর করার জন্য এই যন্ত্র বৃহত্তর ভূমিকা পালন করে। যাহোক, সমে অবশ্য এই মেধাবী যন্ত্র বড়ো একটা কাজে লাগেনি। কারণ রণাঙ্গনে প্রেরণ করা হয় আংশিকভাবে, অনেকটা নির্বোধের মতো এবং অসময়ে। ১৯১৮ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ এই যন্ত্রের সাহায্যেই জয় করা সম্ভব হয়।

জার্মান বাহিনী যখন পশ্চিম রণাঙ্গনে গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন, পূর্ব রণাঙ্গনে তখন ভাগ্য বার বার ললাট বদল করছে। ব্রুসিলভ (সম্ভবত রুশ জেনারেলদের মধ্যে যোগ্যতর) পশ্চিম অভিমুখে একটি সাহসী ও সুদক্ষ যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। এতে আরো একবার প্রমাণিত হয় যে রুশ বাহিনী সুসজ্জিত, এবং যোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত হলে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের বহুজাতিক ও আনুগত্যহীন, বিধি বলে সংগৃহীত সৈনিকরা তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। মাত্র দশ সপ্তাহের অভিযানে ব্রুসিলভ চারশত পাঞ্চাশ হাজার সৈনিক যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করেন। তার সাফল্যকে একটু বড় করে দেখা হয় এ জন্য যে অব্যবহিত পূর্বের অভিযানে বড়ো ধরনের বিপর্যয় কুড়াতে হয়েছিলো। তাছাড়া ইউরোপ অনুভব করে, যে জাতির কব্জায় রয়েছে যুদ্ধোপযোগী বয়সের পনেরো মিলিয়ন সন্তান তার সম্ভাবনার উৎস শুকিয়ে যায়নি। উপরন্তু এই ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রুমানিয়া মধ্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে। রুমানিয়া ছিলো শষ্য, তেল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। অতএব তার মিত্রপক্ষে যোগদানকে আঁতাত দেশগুলোর জনগণ উৎফুল্লতার সঙ্গে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু যাকে আশীর্বাদ হিসেবে দেখা হলো তা প্রকারান্তরে বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলকেনহেইন এবং মেকেনসেনের সামনে রুশো-রুমানীয় জেনারেলদের পাত্তা মেলে না। ফলকেনহেইন এবং মেকেনসেন সম্মুখের সকল বাধা অতিক্রম করে ডিসেম্বর মাসের ছয় তারিখে বুখারস্টে ঢুকে পড়েন। জার্মান অভিযানের দ্রুততা এবং বিচক্ষণতা, এবং যে দক্ষতার সঙ্গে দু'জন মহান সৈনিক, একজন কারপাথিয়ানের ভেতর দিয়ে অপর জন ডব্রুজার ভেতর দিয়ে, এবং উভয়ের কর্মপন্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, শেষ পর্যন্ত রাজধানী বুখারেস্টে মিলিত হন, তা সামরিক পর্যবেক্ষকদের বিশেষ প্রশংসা কুড়ায়। এখন থেকে রুমানিয়ার সকল ঐশ্বর্য (অবশ্য ইংরেজরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে দেশের তেলের খনিগুলোর উপরি ভাগের সকল কাঠামো ধ্বংস করে যায়) জার্মানির মিত্রদের হাতের মুঠোয় চলে গেল। ফলে তাদের যুদ্ধে টিকে থাকার ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

জার্মানরা অবিলম্বে উপলব্ধি করে যে কাঁচামাল এবং খাদ্যশষ্যের যোগান হবে তাদের ভবিষ্যতের কঠিনতম সমস্যা। ওয়াল্টার রেথেনও ছিলেন ইহুদি, পণ্ডিত, বিজ্ঞান ও ব্যবসাশাস্ত্রে বুৎপন্ন। এই ভদ্রলোক দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কাজ করেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং উদ্ভাবনী পরিকল্পনা মোতাবেক। অনেকানেক লোকপ্রিয় খাদ্য এবং কাঁচামালের বিকল্প আবিষ্কার করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও সংগঠনের সাহায্যে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও নৌ অবরোধের জন্য জনগণের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের দুর্দশা চরমে পৌঁছে। ১৯১৫ সালেই দুর্ভিক্ষের নমুনা দেখা যায় ; যা ছিলো নমুনা মাত্র তা প্রকটতর হয় ১৯১৬ সালে। রুমানিয়া থেকে সরবরাহ শুরু হলেও চাপটা

ক্রমান্বয়ে গুরুতর রূপ ধারণ করে। জনগণ বীরত্বব্যঞ্জক উদাসীনতার সঙ্গে সকল কষ্ট মেনে নেয়। কারণ তারা অনবরত শুনে আসছে বিজয়ের আওয়াজ এবং চূড়ান্ত বিজয়ের আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশার বাণী। যখন, ভার্দুন রণাঙ্গনে ব্যর্থতার পর হিণ্ডেনবুর্গ এবং লুডেনডর্ফের স্কন্ধে ন্যস্ত সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব, তখন গোটা জাতি নতুন আশায় বুক বেঁধে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার জন্য প্রস্তুত হয়। ইতোমধ্যে আদেশ জারি হয় যে পনেরো থেকে ষাট বছর বয়সের সকল নাগরিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কাজে লাগতে বাধ্য।

যুদ্ধ সূচনার গোড়া থেকেই বৃটিশ নৌবাহিনী সামুদ্রিক জলপথ নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথমে এক্সপিডিশনারি বাহিনী, অতঃপর নবগঠিত সেনাদল পরিবহণে কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটেনি। হতাহতের সংখ্যা ছিলো শূন্য। বৃটিশ সেনাদল অবাধে দার্দেনেলেস, থ্রালেকজান্দ্রিয়া, স্যালনিকা সফর করেছে নির্বিঘ্নে। জার্মানদের ক্রুজার বহরকে সামুদ্রিক জলভাগ থেকে সমূলে বিতাড়িত করা হয়। জার্মান বহির্বাণিজ্য হয় রুদ্ধ, জার্মান উপনিবেশগুলো পিতৃভূমি থেকে হয় বিচ্ছিন্ন। এগুলো এখন অনায়াসে অন্যদের দখলে চলে যেতে পারে। বৃটিশ নৌবাহিনীর কল্যাণে বৃটিশ কাঁচামাল, খাদ্য এবং সমরসম্ভার মিত্র দেশগুলোতে পৌঁছে যেত ঠিকই, কিন্তু শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোতে পৌঁছাতে পারতো না। এই সামুদ্রিক আরক্ষা বাহিনীর চাতুর্য যতোই হোক না কেন নিরপেক্ষ বণিকদের কাছে এটা পছন্দনীয় ছিলো না। তারা তাদের মালামাল ইউরোপে পৌঁছাতে ইচ্ছুক। যখনই কোনো মার্কিন বাণিজ্য জাহাজকে ইংরেজ যুদ্ধজাহাজ গতিরুদ্ধ করতো তল্লাসি চালানোর জন্য, তখনই আমেরিকান বণিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়ে যেতো। একটি যুধ্যমান শক্তি অন্যের নিরপেক্ষ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করবে, এটা তাদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এতে নিরপেক্ষদের নিষ্পাপ অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। যে পারস্পরিক সম্ভ্রমবোধ স্যার ই. গ্রে এবং লন্ডনে মার্কিনী রাষ্ট্রদূত ওয়াল্টার পেইজের মধ্যে মিলন ঘটায় তা বর্তমান বন্ধুরতা নিরাকরণে অনেক কাজ দেয়। তারা সুচারুভাবে ব্যাপারটা মোকাবেলা করেন, নতুবা গুরুতর দুর্যোগ ঘনিয়ে আসা অসম্ভব ছিলো না। যদিও ইংরেজরা আমেরিকান আপত্তির ন্যায্য জবাব দেয় এই বলে যে যেহেতু জার্মানরা বৃটিশ উপকূল অবরোধের সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, অতএব তারা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পারে না। তবে এটা আশা করা যায় না যে নিরপেক্ষ বণিকরা এই যুক্তি গ্রহণ করবে। স্বয়ং আমেরিকা কর্তৃক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে সমুদ্র পথে অবাধ চলাচলের স্বাধীনতার কথা বিস্মৃত হওয়া যায় নি। কিন্তু মার্কিনী অনুভূতিতে আঁচড় লাগলেও অবরোধ পূর্ণ কঠোরতার সঙ্গে পালন করা হয়। অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইনী বিবেক দ্রুততার সঙ্গে পরিত্যাগ করে (যুদ্ধে যোগদানের পর)। মার্কিনী পররাষ্ট্র দপ্তরের সি. পক (Polk) বলেন, "মি. বেলফোর, অবরোধ সংক্রান্ত সকল আইন ভঙ্গ করতে বৃটেনের দীর্ঘ তিন বৎসর সময় লাগে। আপনি দেখতে পাবেন, আপনাদের মতো বড় ক্রিমিনাল হতে আমাদের লাগবে মাত্র দুই মাস সময়।"

বৃটিশ নৌবাহিনীর আইন-কানুনের উপর এখনো প্রভুত্ব খাটায় নেলসনের ভূত। নেলসন যাদুমন্ত্র, মেধাবী এবং উদ্যোগী সুযোগ সন্ধান, রণক্ষেত্রে রণতরীসমূহ পরিচালনায় দ্রুততা এবং নিশ্চিত কৌশল, ইত্যাদিকে মনে করা হতো বৃটিশ নাবিকদের বিশেষ সম্পদ। জাতি প্রত্যাশা করে উত্তর সাগরে হিংস্র সংঘর্ষ এবং এটা প্রমাণ করা যে ইংরেজ নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব কোনো শক্তি চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। ইংরেজরা এটা আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাসও করে। আসলে সে ধরনের কিছু ঘটেনি। বিরাট রণবহর স্কটল্যান্ডের কুয়াসায় হারিয়ে যায়। জার্মান ডুবোজাহাজ

সাতটি বৃটিশ ক্রুজার ডুবিয়ে দেয়। মাসের পর মাস চলে যায়, জার্মান যুদ্ধ জাহাজগুলি তাদের পাতা মাইন অঞ্চলের পশ্চাতে নিরাপদ অবস্থানে থাকে, এদিকে ইংরেজদের প্রধান রণতরীসমূহ খোঁয়াড় বা নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসে না, শত্রু বাহিনীরও মোকাবেলা করে না। নৌ যুদ্ধের ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, মাইন, টরপেডো, ডুবোজাহাজ, ধূম্রজাল নতুন বিপদের সৃষ্টি করে, দরকার হয় নতুন সাবধানতার। দূর ফকল্যান্ডের অদূরে একটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে সদ্য বিজয় অর্জনকারী ফন স্পি-র ক্রুজার ডুবিয়ে দেন অ্যাডমিরাল স্টার্ডি। এই ঘটনায় ইংরাজরা অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠে। কারণ এতে সমানভাবে প্রমাণ মেলে বৃটিশ নৌ কমান্ডের বুদ্ধিমত্তার, অ্যাডমিরালের সমর্থতা এবং গোলন্দাজদের সঠিক নিশানার। ১৯১৬ সালের মে মাস পর্যন্ত সার্বিক ধরনের যুদ্ধের সূচনা হয়নি। যেটুকু সংঘটিত হয় তা ছিলো বৃটিশ জনগণের কাছে হতাশাব্যঞ্জক। তারা প্রত্যাশা করেছিলো চূড়ান্ত বিজয়। তারা একটা সম্মুখ যুদ্ধের খবর পায়। তাতে দেখা যায় আলোর স্বল্পতার জন্য তাদের গ্রান্ডনেভি নিশ্চিত বিজয় ছিনিয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু লোকবল এবং যুদ্ধ যানের ক্ষয় হয়েছে শত্রুপক্ষের দ্বিগুণ। জাটল্যান্ড যুদ্ধের প্রথম খবর যা লন্ডন নগরীতে পৌছে তা গণমনে অবিস্মরণীয় বিষণ্ণতার সৃষ্টি করে। তাহলে ইংরেজদের সমুদ্রে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য কি এখন অতীতের ঘটনা মাত্র? তাদের নৌ শক্তি কি এখন সর্বত্র জার্মানদের কার্যকর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন? কিংবা জেলিকো কি সমর সম্ভার রক্ষা এবং অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি না নিয়ে সঠিক কাজটি করেছেন? জবাব পাওয়া যায় নাটকের সর্বশেষ অঙ্কে। অতঃপর হাই সি ফ্লিট কখনো বৃটিশ নৌবাহিনীকে টেক্কা দিতে আসেনি। যা অন্যান্য নৌ অভিযানে চূড়ান্ত পরাজয় থেকে আসে। জাটল্যান্ডের যুদ্ধে যদি জার্মানদের বিজয় হয়ে থাকে, তবে এর ছিল একাধিক পরিণাম।

যদিও উভয় বাহিনীর নাবিকরা শৃঙ্খলাবোধ এবং সাহসিকতার জন্য সমান প্রশংসা দাবি করতে পারেন, তবে জার্মানদের বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি প্রস্তুতি ছিলো অনেক উন্নত। টারপিজ সঠিক অনুমান করতে সমর্থ হন যে উত্তর সাগরে আলোর স্বল্পতার দরুন কি ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। এক্ষেত্রে ইংরেজদের কোনো প্রস্তুতি ছিলো না। জার্মান যুদ্ধ জাহাজগুলি যে নকশা অনুসারে নির্মাণ করা হয় তা দ্রুতগতি কিংবা বিস্তৃত অঞ্চলে যুদ্ধের উপযোগী ছিলো না। দূরবর্তী অঞ্চলে অভিযানেরও উপযোগী করেও সেগুলি নির্মাণ করা হয়নি। এসব নির্মাণ করা হয় নিজস্ব জলসীমায় সীমাবদ্ধ লক্ষ্য অর্জনের কথা মনে রেখে। এগুলি বহন করে অতি সামান্য কয়লা ; এই জাহাজগুলি নাবিকদের রাতে মাথা গোজার যে ব্যবহা করে তাকে মোটেই যথেষ্ট বলা চলে চলা। কিন্তু তাদের কামানের গোলা ছিলো লক্ষ্যভেদী, তাদের গোলন্দাজদের নিশানো ছিলো নির্ভুল। উপরন্তু তাদের যুদ্ধ জাহাজগুলি ছিলো ভারি ইস্পাতে আবৃত। অতএব সেগুলি সহজে ডুবিয়ে দেয়া যেত না। একদিকে যেমন বৃটিশ কামানের গোলা লক্ষ্যভেদী ছিলো না বলে হাই সি ফ্লিটের বিরুদ্ধে কোনো সুবিধা করতে পারেনি। অপর দিকে জার্মানদের বৃটিশ ক্রুজার নাগালের মধ্যে পেলে সহজে বর্মভেদ করেছে এবং সহজে লোকবলসহ সমুদ্রের তলদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজগুলির ইস্পাতের মোড়ক ছিলো খুবই হালকা, তাদের ধাতব আচ্ছাদনও ছিলো প্রায় অকার্যকর।

অবশ্য একটা অসুবিধা যা পরবর্তীকালে মারাত্মক দুর্বলতা হিসেবে দেখা দেয়, তা জার্মান নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠতা কিংবা প্রাধান্যগুলি বিনষ্ট করে। বৃটিশ নাবিকদের যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা সময় কেটেছে সমুদ্রে, সেখানে জার্মান নাবিক দলের প্রায়ই থাকতে হয়েছে তীরের সেনা ছাউনিগুলিতে। এই ব্যবস্থার পরিণাম শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে শুভ হয়নি। তীরের নাবিকরা মুক্ত বায়ুর সকল প্রকার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। সংঘর্ষের অন্তিম মাসগুলিতে কিয়েলে ভয়ংকর নৌ বিদ্রোহের সূচনা হয়। এতে জার্মান নৌবহর প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে ইম্পিরিয়াল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ নষ্ট হয়।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলি

সরকারি বৃটিশ সামরিক ইতিহাসগুলি হলো : বিগ্রেডিয়ার জেনারেল জে. ই. এডমন্ডস (ফ্রান্স), ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সি. এফ. অ্যাসপিন্যাল. ওগল্যান্ডার (গ্যালিপলি), সাইরিল ফল্‌স (প্যালেস্টাইন এবং মেসিডোনিয়া), ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ. জে. মবার্লি (মেসোপটেমিয়া) ; নৌযুদ্ধের সরকারি ইতিহাস প্রণয়ন করেন স্যার জুলিয়ান করবেট এবং স্যার হেনরি নিউবল্ট, যুদ্ধে বিমান বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে সরকারি দলিল রচনা করেন স্যার ওয়াল্টার বলে এবং এইচ. এ. জোনস ; ১৯১৪ সালের যুদ্ধের উপর সুন্দর আলোকপাত করেন ই. এল. স্পিয়ার্স (Liasion, 1930), জি. এম. ট্রিভিলিয়ান যুদ্ধে ইতালির ভূমিকা বিষয়ে লেখেন (Scenes from Italy's War), জিব্রুগির উপর ইংরেজদের আক্রমণের সুন্দর বর্ণনা দেন স্যার ই. হিল্টন ইয়াং (By Sea and Land, 1424)। আরব্য অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য দেখুন, টি. ই. লরেন্স, Revolt in the Desert (1927), The Seven Pillars of Wisdom (1935)।

মহাযুদ্ধ : শেষ পর্যায়

ইউ-বোট অভিযান এবং আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান। রাশিয়ার বিপ্লব। কেরেনস্কি অন্তর্বর্তীকাল। বলশেভিকদের বিজয়। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়া যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়। বৃটেন কর্তৃক ইউ-বোট ঘায়েল। নিভেলের পরাজয় এবং পাসখেনডেইলের হত্যাকাণ্ড। ইংরেজদের বাগদাদ ও জেরুজালেম বিজয়। শান্তির পথে বাঁধা। ১৯১৮ সালের যুদ্ধাভিযান। ফচ ও হেগ কর্তৃক বিজয় অর্জন। জার্মানীতে বিপ্লব। যুদ্ধবিরতি। বিশ্ব ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতি।

পরবর্তী বছরে (১৯১৭) দুটি বড়ো ধরনের ঘটনা ঘটে এবং দুটি ঘটনাই গোটা বিশ্বের ইতিহাসে যে প্রভাবের সৃষ্টি করে তার ফলশ্রুতি ছিলো সুদূরপ্রসারী। একটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ, অপরটি রাশিয়ায় বিপ্লব।

উস্কানী প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতা সৃষ্টির জন্য জার্মান নৌ ও স্থল বাহিনীর প্রধানদের অবশ্যই অপরাধ স্বীকার করতে হবে। জার্মান নৌ এবং সামরিক বাহিনীর অধিনায়করা চোখ খোলা রেখে বেথম্যান-হোলভেগ এবং সম্রাট কাইজারকে বাধ্য করেন, 'অনিয়ন্ত্রিত ইউ-বোট যুদ্ধ' পরিচালনার আদেশ প্রদানের জন্য। এতে যে কতো বড় বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করা হবে তাও বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়নি। কারণ অনিয়ন্ত্রিত ইউ-বোট যুদ্ধাভিযানের তাৎপর্য হলো দেখা মাত্র যে কোনো জাহাজ, এমনকি বাণিজ্য জাহাজগুলি ডুবিয়ে দেয়া। অধিনায়করা জানতেন, দস্যুতার এই খোলাখুলি ঘোষণার দরুন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতা ক্রয় করা হবে। সতেরো-আঠারো মাস আগে জার্মান ডুবোজাহাজ আয়ারল্যান্ড উপকূলের অদূরে যাত্রীবাহী জাহাজ লুসিটানিয়া ডুবিয়ে দেয়। এই আক্রমণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছিলো। তবে জার্মান কর্তৃপক্ষ শ্রেণী হিসাব কষেছিলো যে, আমেরিকার বাহিনীসমূহ ফ্রান্সের রণাঙ্গনে কার্যকরভাবে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই বৃটেন খাদ্যের অভাবে পরাজয় মেনে নেবে। একে মস্ত জুয়াখেলা ছাড়া অন্য কিছু মনে করা চলে না। কারণ তারা সাফল্যের দোর গোড়ায় পৌছে যায়, কিন্তু বৃটিশ নৌ কর্তৃপক্ষের ডুবোজাহাজ বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বনের দরুন জার্মানরা বিফল হয়। আর ঐ বিফলতার জন্য তাদের সাফল্যের সকল সম্ভাবনার ইতি ঘটে। ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে জার্মান সরকার এতটা লাগামহীন ছিলেন যে, মেক্সিকোকে প্ররোচণা দেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য। অংশগ্রহণের জন্য তারা পুরস্কার হিসেবে পাবে আমেরিক্যান ইউনিয়নের তিনটি অঙ্গরাষ্ট্র : টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো এবং আরিজোনা। এই প্রস্তাবের খবর বৃটিশ নৌ কর্তৃপক্ষ সামরিক কায়দায় জানতে পারে এবং ওয়াশিংটন সরকারকে যথাসময়ে জানিয়ে দেয়। ফলে আমেরিকা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ঐ বছরের (১৯১৭) এক জ্যোতির্ময় প্রভাতে লন্ডনবাসীরা সবিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করে যে ওয়েস্টমিনস্টারে ভিক্টোরিয়া টাওয়ারের উপর বৃটিশ পতাকার পাশাপাশি আমেরিক্যান

পতাকা উড়ছে। পূর্ব উপকূলীয় নেতৃস্থানীয় রিপাবলিকানদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট উইলসন সবচেয়ে বেশি ইচ্ছুক ছিলেন বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের প্রতিবাদে যুদ্ধে যোগদানের জন্য। কিন্তু তিনি এক দিকে যেমন ছিলেন শান্তিবাদী, অপরদিকে তেমনি মার্কিনী সমাজের কিছু অংশের অনুভূতিকে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য ছিলেন। এই কিছু অংশের মধ্যে ইংল্যান্ডবিরোধী প্রবল অনুভূতি কাজ করে। তবু তিনি দেখতে পান যে যুদ্ধবিধ্বস্ত পক্ষগুলি তার সাহায্য কামনা করে, এবং তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছে ক্ষত শুকানোর জন্য হিতকর সালিসির প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসতে। তিনি নিজেকে নিকট ভবিষ্যতে সালিসির ভূমিকায় কল্পনা করেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে সৃষ্টিকর্তাও তাকে সালিসের ভূমিকায় দেখতে ইচ্ছুক। অন্তত এটুকু বলা চলে যে লুডেনডর্ফ এবং টারপিজ কর্তৃক অন্ধ নির্বুদ্ধিতার আশ্রয় গ্রহণের চেয়ে ছোট কোনো ঘটনা প্রেসিডেন্ট উইলসনের ঠাণ্ডা এবং হিতকর আগ্রহহীনতা টলাতে পারতো না। মার্কিনী আবেগানুভূতির প্রবল আলোড়নের কালে জনৈক ফরাসি পর্যবেক্ষক উল্লেখ করেন যে, এখানে কাজ করেছে পিতৃপিতামহের কূলের প্রতি সুপ্ত সহানুভূতি বা অনুরাগ। কারণ মার্কিনী জাতির বৃহদংশ ইংরেজদের উত্তরপুরুষ।[২] ইংরেজ ভূমি ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেখার চেয়ে তারা বরং দীর্ঘকালের বিদেশে বিবাদে লিপ্ত হওয়ার বিতৃষ্ণা পরিত্যাগ করবে।[৩] লাফায়েতের স্মৃতির ভিত্তিতে ফরাসিদের প্রতি সহানুভূতি আরো অনেক সুস্পষ্টভাবে অনেকানেক বার প্রকাশিত হয়েছে, তবে তুলনামূলকভাবে তার গভীরতা ছিল অনেক কম।

শেষ পর্যন্ত আমেরিকার অংশগ্রহণের ফলে যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। আমেরিকান নৌবহরের সহায়তায় অবরোধ অধিকতর কার্যকরী করা হয়। মিত্র পক্ষের অর্থনৈতিক বোঝা এ পর্যন্ত প্রধানত বহন করে এসেছে গ্রেট বৃটেন, এখন থেকে জগতের সবচেয়ে ধনাঢ্য সম্প্রদায় শরিক হলো। একদিকে যেমন আমেরিকান ঋণে আঁতাতের অর্থনৈতিক উদ্বেগ দূর হয়, অপরদিকে তেমনি পশ্চিম রণাঙ্গনে বিরাট ও সুসজ্জিত মার্কিনী বাহিনীর অংশগ্রহণের ফলে মধ্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির অনুকূল ও সুবিধাজনক শান্তির শর্ত লাভের সুযোগ বিনষ্ট হয়। তাই বলে, কোনো বাহিনীই মুহূর্তের মধ্যেই দক্ষতার কাম্য সীমায় পৌঁছাতে পারে না। আমেরিকানরাও ইতিপূর্বে বৃটিশ বাহিনীর মতো যুদ্ধ পরিচালনায় যথেষ্ট গতি সঞ্চার করতে সময় নিয়েছে। যে কয় মাস তাদের বাহিনী সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ার ভেতর ছিল, তখন আঁতাত শক্তিগুলি যুদ্ধ সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগের মধ্যে দিন যাপন করেছে।

মার্চ মাসের ১৫ তারিখে, কংগ্রেস কর্তৃক আমেরিকার যুদ্ধে অংশগ্রহণ ভোটে অনুমোদনের ১৫ দিন আগে, রাশিয়ার জার সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যে বিপ্লব প্রস্ফুটিত হওয়ার কথা ছিলো অনেক আগে তা এই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হয়। তবে তা আশংকা অনুসারে হিংস্র এবং সংগঠিত উত্থান ছিলো না, তা আসে কয়েকটি আকস্মিক এবং

---

২ ঝাঁত্রে সিগফ্রিড।

৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল সিমস ১৯২০ সালে লিন্ডহলে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন যে, "যদি এমন সময় আসে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্য ইউরোপীয় জোটের হুমকির সম্মুখীন হবে তখন গ্রেট বৃটেন আশা রাখতে পারবে যে সমুদ্রের ওপারের জাতিবর্গ তাদের শেষ যুদ্ধ জাহাজ, শেষ ডলার, শেষ মানুষ এবং শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে সাহায্য করবে।" (সিমস, The Victory at Sea. p. 65)

অপারিকল্পিত প্রতিবাদ হিসেবে। এই বিপ্লবের আকৃতি ও তাৎপর্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এক সময় এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে রাজন্যবর্গ এবং বুর্জোয়া শ্রেণী, সৈনিক এবং উদারপন্থী ও সাংবিধানতন্ত্রীরা আর মহাপরাক্রমশালী রুশ জারের প্রতি আনুগত্য বোধ করেন না। প্রথমে সাধারণ ধর্মঘটের সূত্রপাত হয় পেট্রোগ্রাদে (৮ মার্চ), এর সঙ্গে শুরু হয় কাজের প্রতি সার্বজনীন অনীহা, অতঃপর সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়; ১০ তারিখে সূচিত হয় ট্রাম ধর্মঘট, ১১ তারিখে একটি বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ১২ তারিখে রাজপ্রাসাদের বাহিনী পক্ষ ত্যাগ করে। এই আন্দোলন চার দিকে বিস্তার লাভ করে ভয়াবহ প্রেইরি অগ্নিকাণ্ডের মতো। এই বিপ্লব ছিলো সার্বজনীন ক্ষুধা, দুর্দশা এবং অবসাদের বহিঃপ্রকাশ। এর সঙ্গে সাম্প্রতিককালে রুশ বাহিনী ধ্বংসে হয়ে যাওয়ার স্মৃতিও বন্য বিক্ষোভের অনুভূতি জানায়। সাম্প্রতিক যুদ্ধে রাশিয়া সামরিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। রুশ পক্ষে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় চার মিলিয়ন। সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রশাসনিক দুর্নীতি ঢুকে পড়ে। তাছাড়া প্রবল সন্দেহ উঁকি দেয় যে জারপত্নী লম্পট রাসপুতিনের প্রভাবে জার্মানদের খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছেন। গণ মনে চূড়ান্ত বিক্ষোভ দেখা দেয় জারের উপদেষ্টাদের ভেতর সবচেয়ে নির্মম ও নির্বোধ প্রটোপোপফ–এর প্রতিক্রিয়াশীল এবং নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ডে (এই প্রটোপোপফ ছিলেন জারের সর্বশেষ উপদেষ্টা)। রুশ সংসদ ডুমার একটি কমিটি প্রিন্স লভভের নেতৃত্বে রাজ্য শাসন এবং যুদ্ধ পরিচালনার চেষ্টা করে।

এ ধরনের সরকার মেনে নেবার মর্জি তখন রুশ জনগণের ছিলো না। প্রিন্স লভভের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মিলিউকফ এবং গুচকের দক্ষতা, সামাজিক বিপ্লববাদী কেরেনস্কির অনলবর্ষী বক্তৃতা সোভিয়েটদের বিরুদ্ধে, কিংবা শ্রমিক ও সৈনিকদের কাউন্সিলগুলির বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ কিছু করতে পারেনি। এই কাউন্সিল দেশের প্রতিটি অঞ্চলে গঠন করা হয় এবং এপ্রিল মাসের মধ্যে পেট্রোগ্রাদে মিলিত হয় কেন্দ্রীয় সম্মেলনে। বিদ্রোহাত্মক জড়তার সার্বজনীন মনোভাব সরকারকে পঙ্গু করে দেয়। টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ অপারেটর, টাইপিস্ট এবং বার্তাবাহক এবং আধুনিক রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রতিভূরা রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করতে অস্বীকার করে। খোদ সোভিয়েতগুলিতে চরম পন্থানুযায়ী বোলশেভিকদের চাছাছোলা যুক্তি সরল ও ক্ষুধার্ত মানুষের বিশৃঙ্খল আবেগ এবং এলোমেলো চিন্তার উপর দ্রুত প্রভুত্ব কায়েম করে। এই বোলশেভিক দলের পরিকল্পনা ছিলো অতিকায় এবং প্রলুব্ধকর, সবার জন্য খাদ্য, অবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, কৃষকের জন্য জমি এবং সর্বহারার জন্য একনায়কতন্ত্র। ফলে কেরেনস্কি যেখানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান সৈন্যদের যুদ্ধ তৎপরতায় আবার লিপ্ত হবার জন্য অনুপ্রাণিত করায়, বোলশেভিকরা সেখানে বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস পান। এদের সাফল্য প্রায় সম্পূর্ণ এবং আসন্ন। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে, রুশ বাহিনী শত্রু পক্ষের সামনে ভেঙ্গে পড়ে। নতুন বিপ্লবের নতুন শ্লোগান ছিলো "পররাজ্য গ্রাস নয়, ক্ষতিপূরণ নয়।"

কেরেনস্কির বাগ্মিতা ভিন্ন অন্য কোনো দক্ষতা ছিল না। শুধু বাগ্মিতার উপর নির্ভর করে এতটা গুরুতর ও নাজুকে পরিস্থিতি তিনি সামাল দিতে পারেন না। যদিও বোলশেভিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব ঘটে অসময়ে, জুলাই মাসে, তবু তারা অস্থায়ী সরকারের দুর্বলতা, জার্মানদের বিজয় এবং জনগণের চরম দুর্দশার জন্য অতি দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়। কেরেনস্কি, যিনি রিগার সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি এবং বিপ্লবীদের হাতে–নাতে আটক করার পরও তাদের বধ করার সাহস করেন নি, তিনি কি করে এতটা ক্ষমা-বিমূঢ়

পরিস্থিতি সামাল দেবেন। নবেম্বর মাসের সাত তারিখে (পুরাতন নিয়ম অনুসারে ২৫ অক্টোবর) বোলশেভিকরা চরম আঘাত হানে, এর জন্য তারা দীর্ঘদিন প্রস্তুতি নিয়েছে। বিপ্লবীরা সরকারের শীতকালীন প্রাসাদের চারদিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লে অস্থায়ী সরকার তাসের ঘরের মতো ধসে যায়।

অক্টোবর বিপ্লবের সংগঠক ছিলেন নির্বাসিত দুজন অখ্যাত ব্যক্তি। তারা সদ্য স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন। একজন হলেন উলিয়ানফ, তিনি নিজেকে লেনিন হিসেবে পরিচয় দেন, অপর জন ইহুদি ব্রনস্টেইন। তিনি ট্রটস্কি নাম গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে এদের চেয়ে ভয়াবহ এবং অঙ্গীকারবদ্ধ কোনো দুঃসাহসী ব্যক্তি এত বড় রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেনি। তিন মাস সময়ের মধ্যে তারা রাশিয়াকে যুদ্ধের পথ থেকে সরিয়ে আনে, সমূলে ধ্বংস করে রাষ্ট্রের ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, আর রুশ প্রজাতন্ত্রের সংসদীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য যে অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিলো তাকে ঝেটিয়ে বিদায় করে। লেনিন যেমন দেশপ্রেমের তোয়াক্কা করতেন না, তেমনি পার্লামেন্টের। জার্মানীর সঙ্গে ব্রেস্ট-লিটভস্কের (৩ মার্চ, ১৯১৮) সন্ধি অনুসারে তিনি বিশাল রুশ ভূ-খণ্ড[৪] বিসর্জন দেন। এতে তার কোনো লজ্জা কিংবা যন্ত্রণাবোধ হয়নি।

১৯১৭ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ পুনরায় শুরু করা লুডেনডর্ফের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। কয়েক মাইল সরে এসে তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সুরক্ষিত অবস্থান গ্রহণ করেন। এই অবস্থানকে জার্মানরা সিগফ্রিড এবং ইংরেজরা হিন্ডেনবুর্গ লাইন নামে অভিহিত করে থাকে। লুডেনডর্ফ এখানে প্রতিপক্ষকে ব্যয়বহুল আক্রমণ পরিচালনার সুযোগ দেন। প্রতিপক্ষও এ ধরনের আক্রমণ পরিচালনায় প্রবল ইচ্ছুক। তিনি আগ্রহী কৌশল অবলম্বন করে অতিরিক্ত লোকবল ক্ষয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ছয় মাসের মধ্যে বড় জোর বারো মাসের মধ্যে সামুদ্রিক জলভাগে যুদ্ধের অবসান ঘটবে। আর ফ্রান্সের উপকূল বরাবর মার্কিনী সেনা দল অবস্থান গ্রহণের আগেই ইউ-বোটের দরুন অনাহারক্লিষ্ট ইংল্যান্ড যুদ্ধে পরাজয় মেনে নেবে।

অনেক সৎ নাগরিকের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে জার্মানরা বর্তমানে যে ধরনের যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় অবতীর্ণ, মানবতার বিবেক তার নিন্দা করবে চিরকাল। একটা বাণিজ্যিক কিংবা যাত্রীবাহী জাহাজ ডুবোজাহাজের টরপেডোর আঘাতে ডুবে যাচ্ছে সকল আরোহীসহ। অথচ উদ্ধারকার্য পরিচালনার কোনো উপায় নেই। ইউ-বোটের সাহসী অধিনায়কদের যে আদেশ প্রদান করা হয়, একজন নৌ অফিসারের কাছে তার চেয়ে বীতস্পৃহ আদেশ আর কিছু হতে পারে না। তাকে বলা হয় জলপথে অনুসৃত স্মরণাতীত কালের সকল নীতি এবং সৌজন্য বর্জন করতে হবে। তথাপি এটি অস্বীকার করা যায় না যে, এই নতুন ও বেআইনী যুদ্ধনীতির মধ্যে সাফল্যের প্রতিশ্রুতি ছিলো। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে দেখা যায় গ্রেট বৃটেনে মাত্র ছয় মাসের খাদ্য মওজুদ রয়েছে।

অতএব বৃটিশ সরকার তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করেন যে, জার্মান ডুবোজাহাজের তৎপরতা হ্রাস করতে না পারলে দ্বীপের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে না। সমস্যার জট সহসা খুলে যায়। অশেষ কনভয় সিস্টেম (লয়েড জর্জ জোর করে নৌবাহিনীর কর্তৃপক্ষের

---

৪ ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লিভোনিয়া, পোলান্ড, লিথুয়ানিয়া এবং রুশ পোলান্ড।

উপর আক্রমণ করেন), অংশত ডেপথ চার্জ এবং উন্নত ধরনের হাইড্রোফোন ব্যবহার করে এবং আরো অনেক কায়দা বাটিয়ে (সবগুলির নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়) ইউ-বোটের কার্যক্রম স্তব্ধ করা হয়। একটা সময় আসে যখন এই ডুবোজাহাজগুলির একটিও হয়তো নিজ ঘাঁটিতে ফিরতে পারেনি। অর্থাৎ বৃটিশ নৌ কর্তৃপক্ষ সাবমেরিন সমস্যা সমূলে নিরাকরণ করেন। জার্মান নাবিকদল অসমসাহসী। তুলনীয় আত্মশক্তির অধিকারী ছিলেন বৃটিশ বাণিজ্যিক জাহাজের অফিসারগণ, যাদের কোনো প্রকার বিপদের ভয়, তা যতোই নিশ্চিত হোক, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বিতাড়িত করতে পারেনি। স্থলভাগের সংঘর্ষে কোনো পক্ষের নিশ্চিত বিজয় না হলেও জার্মানদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। জোফর-এর পরিবর্তে স্থলাভিষিক্ত করা হয় ফরাসি কমান্ডের দায়িত্বে) আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং অধিক সমাদৃত প্রফেসর নিভেলকে। এর সতর্ক পরিকল্পনা মোতাবেক Aisne-তে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। উপরন্তু বাহিনীর এতটা ক্ষতি স্বীকার করতে হয় যে ফরাসি বাহিনীর একটা অংশে বিদ্রোহ দেখা দেয়, তাছাড়া সিভিলিয়ান, সৈনিক নির্বিশেষে সবার মধ্যে আকস্মিক আস্থার অভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে একটা সময়ে ফরাসি জাতির সামরিক দক্ষতা বিনষ্টের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অবশ্য অচিরে পরিস্থিতি সামলে নেয়া যায়। ভর্দুনের বীর পেতা ফরাসি বাহিনীর পচন রোধ করেন। ক্লিমেসু, দ্য টাইগার, প্যারিসের পরাজয়বাদী ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটান। তবু মিত্র বাহিনীর অধিনায়কদের উদ্বেগ কাটে না। অতএব হেগ মনস্থ করেন যে বৎসরের অবশিষ্ট দিনগুলি শত্রুপক্ষের দৃষ্টি বৃটিশ ফ্রন্টের দিকে নিবদ্ধ রাখবেন। ইপ্রেসের বিধ্বস্ত কুথ হলের চার পাশের নিম্নাঞ্চলগুলিতে গোটা গ্রীষ্ম এবং শরৎ মৌসুমে অবিরাম প্রবল বর্ষণ হয়। এখান থেকে বৃটিশ বাহিনী অতিরিক্ত কামান বন্দুকের সাহায্যে বলপূর্বক বেলজীয় উপকূলে ঢুকে পড়ার প্রচেষ্টা চালায়। এদিকে জার্মানরা যখন উঁচু জায়গায় তুলনামূলকভাবে নিরাপদ অবস্থানে রয়েছে, বৃটিশদের পরিখাগুলি তখন কোমর উঁচু জলে নিমজ্জিত। তীব্র ও অবিরাম বোমা বর্ষণের আতংক তো রয়েছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয় এই ভয় যে, একবার একজন আহত হলে সে হয়তো জলে ডুবে যেতে পারে, কিংবা কাদা-মাটিতে লেপ্টে হতে পারে তার শ্বাস রুদ্ধ। তথাপি পাসখেনডেইলের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হয় বাটি নদছেড়বান্দার মতো। জার্মানরা হয়তো সামান্য ভূমি ছাড়ে, কিংবা তাদের সামান্য ক্ষতি হয়। কিন্তু বৃটিশ পক্ষে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় বিহ্বলকর তিনশত হাজার। সারের শান্ত পল্লীগুলি থেকে পাসখেনডেইলের কামানের যে অসার গর্জন শোনা যায় তা অন্যতম জাতীয় ট্র্যাজেডির ঘোষণা দেয়। এই ট্র্যাজেডিকে আরো ভয়াবহ মনে করা হয় এ জন্য যে এই স্লোকহেলের আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিলো কি-না তা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যুক্তিসঙ্গতভাবেই মনে হয় যে, ফরাসিদের সর্বাত্মক ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য এতগুলি বৃটিশ জীবনের অপচয় কি সঠিক ছিলো (তিনশ হাজার) কিংবা যেহেতু পরবর্তী বছর আমেরিকান বাহিনী যুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগ দিচ্ছে, ফলে বৃটিশ জনবল সংরক্ষণ করা হলে কি বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়া হতো না? মি. লয়েড জর্জ পাসখেনডেইলের যুদ্ধের বিপক্ষে জোরের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু সৈনিকদের আন্তরিক আবেদনের মুখে তিনি পিছিয়ে যান। নবেম্বর মাসে ক্যাম্ব্রেইর চারপাশে বিং-এর যুদ্ধের সময় চাক্ষুষ প্রমাণ মেলে পাসখেনডেইলের যুদ্ধে আত্যন্তিক অপচয়ের, কারণ এখানে ট্যাংক বাহিনীর সাহায্যে প্রচণ্ড ও আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। কিন্তু মওজুদ সৈনিকের ঘাটতি থাকায় সাফল্য অর্জন করা যায় নি।

এই গুরুত্বপূর্ণ বছরে মিত্র পক্ষের বিপর্যয়ের তালিকা সম্পূর্ণ হয় ক্যাপোরেটোতে (২৪ অক্টোবর), যখন ইতালীয় বাহিনী কর্তৃক ত্রিয়েস্ত দখলের সম্ভাবনায় কম্প দেখা দেয়েছে।

অথচ ফল দাঁড়ায় তাদের বিতাড়ন। তারা আশ্রয় গ্রহণ করে পিয়েভে। ইতালীয় বাহিনী প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করে এবং পলায়ন করে তালগোল পাকানো অবস্থার ভেতর। এই দুর্দশাগ্রস্ত পরিণতি ছিলো অতিরিক্ত আতংকজনক। কারণ স্বভাবত দৃঢ়চেতা ও সাহসী একটা বাহিনীর মধ্যে মনোবলের অভাব এবং যুদ্ধ-ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুদ্ধে ভয়ানক স্নায়ুর পরীক্ষার সম্মুখীন হবার পরও একটি বাহিনীর মনোবল ধরে রাখা যায়, যদি প্রয়োজনীয় সুবিধাদি বর্তমান থাকে। সত্যিই এ বিষয়ে ইতালীয় সর্বাধিনায়কদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়নি। সৈন্য বাহিনীর খাদ্য সরবরাহ ছিলো অনিয়মিত, কামান বন্দুকের ঘাটতি ছিলো সংখ্যায় ও মানে, আর আমোদ-প্রমোদ ও শিক্ষার সুযোগ বিপক্ষ বাহিনীগুলির ব্যূহের পশ্চাতে যতটা ছিলো তাদের ততোটা মেলেনি। বিরল বিরতির সুযোগে কারসোর অগ্নিদগ্ধ চুনাপাথর মালভূমি থেকে ছুটিতে একজন ইতালীয় সৈনিক গ্রামে ফিরে দেখতেন তার পরিবার অনাহারে দিন যাপন করছে। রাষ্ট্রের তরফ থেকে যে সামান্য ভাতা প্রদান করা হয় তা দিয়ে নিরাভরণ প্রয়োজন পর্যন্ত মেটানো যায় না। এহেন পরিস্থিতিতে আশ্চর্য হওয়া চলে না যে একজন সৈনিকের বিজয়ী বীর হওয়ার ইচ্ছা নড়বড়ে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সে ক্যাথলিক হলে মনোযোগ দিয়ে শুনবে পুরোহিতদের বাণী। সমাজতন্ত্রী হলে শুনবে সোভিয়েটদের উপদেশ। এই দুই পৃথক তরফ থেকেই সে শেখে যে যুদ্ধ এখনি, অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।

সামরিক মনোবল এতটা গলে যাবার পর ইতালীয় বাহিনী যে আবার দাঁড়িয়ে যায় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য নজরানা দিতে হয় করডোনার দক্ষতা এবং ইতালীয় জাতির স্থিতিস্থাপকতাকে। পিয়েভকে দখলে রাখা হয়, আর বাঁচানো হয় ভেনিস নগরীকে। কিন্তু শীতকাল আসার পরও অনিশ্চিত থেকে যায় যে ইতালীয় বাহিনী নতুন অধিনায়ক ডিয়াজের অধীনে এবং ফরাসি, বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক শক্তিশালী হবার পরও নতুন আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে ঠেকাতে পারবে কি-না।

রুশ, ফরাসি এবং ইতালীয় রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ যখন এই বিপর্যয়গুলি ভোগ করছিলো, বৃটিশ বাহিনী তখন সর্বাত্মক আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করে (তুর্কিদের বিরুদ্ধে) প্রাচ্যের প্রসিদ্ধ দুটি নগরী, বাগদাদ ও জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করে। এই সামরিক বিজয়গুলি অর্জন করার দরুন আরব জগতের তুর্কিমুখীনতা ঢিলে হয়ে যায়। প্রাচ্যে গ্রেট বৃটেনের মর্যাদাও পুনর্বাসিত হয়। প্যালেস্টাইন বিজয়ের আরো কিছু ফলশ্রুতি ঘটে, যা যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ভোগ করা সম্ভব হয়। গ্রেট বৃটেন সাড়ম্বরে ঘোষণা দেয় যে যুদ্ধের শেষে দুনিয়ার সকল ইহুদির জন্য প্যালেস্টাইনে একটি আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে যখন টাকার প্রয়োজন খুবই জরুরি, তখন সকল ইহুদি মিত্র শক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। আর এই শক্তিশালী এবং বিশ্বজনীন সম্প্রদায় (শুধু নিউইয়র্ক থেকে নয়) গোটা বিশ্বের ধার-দেনার জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে।[৫]

জার্মানরা দূরকল্পনা করেছিলো যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কব্জা থেকে তদের বিশাল ভূ-খণ্ড কেড়ে নেবে। তারপর বিস্তর সময় গড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাদের বাহিনীগুলি এতটা সফল ছিলো যে, তাদের প্রচারকার্য এতটা উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং ভ্রান্তি উৎপাদক ছিলো যে, তারা

---

৫. প্যালেস্টাইন অন্যের হাতে পড়বে না, আবার এক্ষেত্রে একটি পয়সাও ব্যয় হবে না, এটা দেখাও যন্ত্রিসভার লক্ষ্য ছিলো।

মিত্রপক্ষগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেনি। বৃটিশ মন্ত্রিসভার কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ ছিলো যে, বেলজিয়াম থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে। আলসেস ও লরেন নামক প্রদেশ দুটি ফ্রান্সকে ফেরৎ দিতে হবে এবং মিত্র শক্তিগুলিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ করতে হবে। জেনারেল স্টাফ এই শর্তগুলি নিয়ে আলোচনার অনুমতি দেয়নি। চ্যান্সেলর বেথমান-হোলভেগ শর্তাদির অনেকাংশ পূরণের পক্ষপাতী, এটা বুঝে নিয়ে লুডেনডর্ফ তার পদচ্যুতি আদায় করেন (জুলাই, ১৯১৭) এবং নিজে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত জার্মানীর প্রকৃত প্রভুর মর্যাদা ভোগ করেন। নেতৃস্থানীয় সৈনিকদের কারণে জার্মানীর জনগণ এই প্রথম জখম হলো না। জেনারেল স্টাফের কারণেই ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এই জেনারেল স্টাফই শান্তির সরল পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, নতুবা হোহেনযোলান এবং হ্যাবসবার্গদের সিংহাসন থেকে সরে দাঁড়াতে হতো না। বিশেষত জার্মান নৌ বাহিনীর কাছে (যাদের শেখানো হয় যে ইংল্যান্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ আসন্ন) বেলজীয় বন্দরের সুবিধাজনক অবস্থানগুলি পরিত্যাগ করা ছিলো একেবারে অগ্রহণযোগ্য প্রস্তাব।

রুশ রণাঙ্গন থেকে চল্লিশ ডিভিশন সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়ে, লুডেনডর্ফ যুক্তিসঙ্গত কারণে আশা করতে পারেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে সর্বশেষ সার্বিক প্রচেষ্টা সফল হলেও হতে পারে। ১৯১৮ সালের এই যুদ্ধাভিযানে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেন তা হলো, ফরাসি এবং ইংরেজ বাহিনীর ব্যূহসমূহের সংযোগস্থলে প্রচণ্ড আঘাত হেনে দুটি বাহিনীকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। অতঃপর তাদের পরাভূত করতে হবে আলাদা আলাদাভাবে মোকাবেলা করে। তার এই কৌশলের বড় রকম মহড়া হয় রিগায়। কৌশলটা নতুন এবং মেধাবী। বোমা-নিক্ষেপক, অগ্নি নিক্ষেপক এবং মেশিন গানের সাহায্যে সেনাদল তীব্র বেগে এগিয়ে যাবে একটুও না থেমে এবং বিরতি না নিয়ে। তাদের বাহন হবে লরি। শক্তিশালী মর্টার এবং বিরাট সংখ্যক মওজুদ সেনার দরকার ছিলো লক্ষ্য অর্জনের জন্য। লুডেনডর্ফেরও এসবের কোনো ঘাটতি ছিলো না।

হাতুড়ির আঘাত পড়ে ২১ মার্চ। ঐ ভয়াবহ দিনে চার হাজার কামান থেকে অবিরাম গোলা বর্ষণ করা হয় জেনারেল গফের নেতৃত্বাধীন পঞ্চম বৃটিশ বাহিনীর উপর। এটি ছিলো সাত মাস দীর্ঘ খণ্ডযুদ্ধে প্রথম প্রবল গোলাবর্ষণ। বৃটিশ ব্যূহের একেবারে বাম পার্শ্বের আরাস ব্যতিরেকে, আক্রমণকারীরা ঘন কুয়াশা এবং কঠিন মাটির সুবিধার ভেতর সর্বত্র জয়ী হয়। ফিফথ বৃটিশ আর্মি হয় ছত্রভঙ্গ। কয়েক দিনের মধ্যে জার্মান কামানগুলি অ্যামিয়েন্সের দক্ষিণের রেলপথের উপর ক্রীড়া শুরু করে এবং মনে হয় লুডেনডর্ফের দুটি বাহিনীকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য বুঝি হাসিল হবে। কিন্তু তা হয়নি। জার্মানরা অগ্রযাত্রার দ্রুততার মধ্যে মনে হয় প্রারম্ভিক গতি হারিয়ে ফেলে। অ্যামিয়েন্সের আগেই তাদের গতি রোধ করা হয়। যে মারাত্মক আঘাত হানা হয়েছিল তার গতি বজায় রাখা হয়নি। মনে হয় এবার তারা মূল পরিকল্পনা থেকে সরে আসে এবং মিত্র বাহিনীর ব্যূহের অন্যান্য অংশে আঘাত করার জন্য মনস্থির করে। প্রথমে ইপ্রেসের রণাঙ্গনে (৯-১৯ এপ্রিল) বৃটিশ বাহিনী আক্রান্ত হয় এবং তাদের বারো মাইল পেছনে হটিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর (১৭ মে) শেমিন দ্য ডেমে (Chemin des Dames) ফরাসিরা বিরাট পরাজয় বরণ করে। তবে এই আঘাতগুলি ভয়ানক এবং ধ্বংসাত্মক হলেও, এক সময় রোধ করা সম্ভব নয়। এখানে রণকৌশলবিদরা

জার্মানদের বিজ্ঞতা ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন, কারণ জুন মাসের শেষ দিকে জার্মান ব্যূহের তিনটি জায়গায় অতি স্ফীতি লক্ষ্য করা যায় যা সক্রিয় প্রতিপক্ষের কাছে সহজ টার্গেটে পরিণত হয়।

এই বিপজ্জনক অগ্রযাত্রায় জার্মানরা বিপুল পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করে। তা হতেই হবে। আকাশ থেকে প্রবল বোমা বর্ষণ এবং স্থলভাগ থেকে কামানের অগ্নিবৃষ্টির ভেতর স্বাধীনভাবে অগ্রসর হলে ক্ষতি না হয়ে যায় না। মিত্র বাহিনীও গোলাবর্ষণ কিংবা বোমাবর্ষণ সাহসিকতা এবং দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। আরো একটি পরিণতি খুব সহজে না হলেও অনুমান করা গেছে ঠিকই। যেখানে এই যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী গ্রহণ করেছে সর্বোৎকৃষ্ট খবার সেখানে তাদের প্রতিপক্ষদের প্রায়ই দিন কেটেছে খাদ্য ঘাটতির ভেতর। ফলে যখন জার্মান সৈনিকরা বৃটিশ ব্যূহ ভেদ করে গেছে এবং দেখেছে যে সর্বত্র প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছড়িয়ে আছে, তখন তারা আকস্মিকভাবে চরম হতাশায় ডুবে গেছে। তখন এবং তখনই শুধু তারা উপলব্ধি করেছে যে এই যুদ্ধের প্রকৃত বাস্তবতা এতদিন তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে। তারা আরো বুঝেছে যে, এতদিন যে বলা হয়েছে শত্রুপক্ষ অভাব ও খাদ্যাভাবজনিত অবসাদের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা নিছক বাজে কথা। তারা বরং চরম বিলাসিতায় সাঁতার কেটেছে। আর জার্মানরা অনেক দিন যাবৎ এ ধরনের বিলাসিতার গন্ধও পায়নি। নানা প্রকার মাধ্যমে প্রতারণা সম্পর্কে এই আকস্মিক চেতনার খবর রণাঙ্গন থেকে স্বদেশে দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে এবং জার্মান বিপ্লব সংঘটনে ব্যাপক অবদান রাখে।

ইতিমধ্যেই চরম নৈরাশ্য দ্বারা সংক্রমিত এই বাহিনীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষ জুলাই মাসের আঠারো তারিখে সূচনা করে ধারাবাহিক আক্রমণাত্মক আন্দোলন, যা তাদের বিস্মিত করে (কারণ তারা মনে করেছিলো এই সংঘর্ষ আরো এক বছর চলবে) যুদ্ধের অবসান ঘটায় ১১ নবেম্বর। এখন সকল লক্ষণ সাফল্যের অনুকূলে। এই ধারাবাহিক আক্রমণ পরিচালনা করতে গিয়ে মিত্র পক্ষ যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার বেশি পুষিয়ে যায় ছয় শত হাজার মার্কিন সৈনিক এই যুদ্ধে যোগদান করায়। যদিও সেপ্টেম্বর মাসের আগে জেনারেল পার্শিং-এর অধীনে মার্কিনী বাহিনী যুদ্ধে যোগ দিতে পারেনি। তবে স্বতন্ত্র কয়েকটি মার্কিনী ডিভিশন ফরাশি ও ইংরেজদের পাশাপাশি যুদ্ধ করে এবং শাতু থিয়েরির (Chateau-Thierry) রণাঙ্গনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। একমাত্র পরিখা মর্টার বাদে, অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিটি বিভাগে এখন মিত্রপক্ষ জার্মানদের চেয়ে উন্নত। আকাশ পথে তাদের এখন সুস্পষ্ট আধিপত্য। এদের অধীনে এখন শত শত হালকা এবং গতিশীল ট্যাংক। এগুলি দিয়ে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ছিন্ন-ভিন্ন করা অত্যন্ত সহজসাধ্য। উপরন্তু যে গুরুতর ত্রুটি তাদের পূর্ববর্তী যুদ্ধাভিযানগুলি বহুলাংশে ব্যাহত করেছে তার প্রতিকার করা হয়। বিগত মার্চ মাসের বিপর্যয়ের কারণে বৃটিশ জনগণ উপলব্ধি করে যে তাদের বাহিনীকে পশ্চিম রণাঙ্গনে ফরাসি জেনারেল ফচের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে। ফচ ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী অধিনায়ক, তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির অধিকারী, সর্বোপরি প্রেসিডেন্ট উইলসনের ব্যক্তিগত বন্ধু। তবে ফচ একা ছিলেন না। তার পাশে চিফ অব স্টাফ হিসেবে দৃঢ় পায়ের উপর দাঁড়ান ধূর্ত ও বুদ্ধিমান ওয়েগ্যান্ড। উপরন্তু তিনি ছিলেন নির্ভুল তথ্যভাণ্ডার। এই নির্বাচন ছিলো ন্যায়সঙ্গত। জুলাই মাসের আঠারো তারিখ থেকে, যখন ম্যানগিন দক্ষিণাংশের জার্মান সৈন্য সমাবেশের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালান তিনশত হালকা ট্যাংকের সাহায্যে এবং আটক করেন তিরিশ হাজার সৈনিক যুদ্ধবন্দী

হিসেবে, তখন থেকে নভেম্বর মাসের যুদ্ধের শেষ দিনটি পর্যন্ত কখনো সন্দেহ করার সুযোগ আসেনি যে মিত্রপক্ষ রণক্ষেত্রে প্রভুত্ব কায়েম করতে পারেনি। তবে সুদীর্ঘ ঐ সংঘর্ষের কোনো দিনকে যদি আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে সেই দিনটিকেই বেছে নিতে হবে যে দিনটিকে লুডেনডর্ফ বর্ণনা করেছেন "জার্মান বাহিনীর জন্য কালো দিবস হিসেবে।" আগস্ট মাসের ৮ তারিখ, অ্যামিনেন্সের নিকটে জেনারেল হেগের আকস্মিক আক্রমণের দিন। এই দিনটি জার্মানদের কাছে কালো দিবস হিসেবে গণ্য যতনা তাদের বিশ হাজার সৈনিক শত্রুর হাতে আটক হয় বলে তার চেয়েও বেশি তাদের পর্যাপ্ত সেনাবল থাকা সত্ত্বেও তাদের নিরাপদ অবস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হয় বলে। এ অবস্থায় লুডেনডর্ফ উপলব্ধি করেন যে, বাহিনীর মধ্যে মনোবল আর কিছু অবশিষ্ট নেই। অপর দিকে জেনারেল হেগ বোধ করেন যে, সমগ্র রণাঙ্গনে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে হিংস্র আক্রমণ পরিচালনা করা যায় তাহলে চূড়ান্ত বিজয় হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে। বৃটিশ বাহিনী যখন সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ তারিখে সিগফ্রিড লাইনে প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করে তখন জার্মানদের প্রতিরোধের ক্ষমতা ভেঙ্গে পড়েছে।

পরদিন লুডেনডর্ফ তার দেশের সরকারকে শান্তি অন্বেষণ করতে বলেন। জার্মানিতে বিপ্লব সূচিত হওয়ার এক মাস আগে জেনারেল স্টাফের প্রধান সংঘর্ষ পরিত্যাগ করে।

মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মিত্র বাহিনীর বিস্ময়কর এবং ধারাবাহিক বিজয়ের ফলে মধ্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির দীর্ঘ ও সাহসী প্রতিরোধের অবসান ঘটে। প্রথমে বুলগেরিয়া, তারপর তুরস্ক, অতঃপর অস্ট্রিয়া এতটা পরাস্ত হয় যে শান্তির জন্য প্রার্থনা জানায়। জার্মান বাহিনী এখনো রণক্ষেত্রে, যদিও তাদের অবস্থা করুণ, সৈন্য সংখ্যা হ্রাস সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর। তবু শরৎকালীন ঘনায়মান ছায়ায় শত্রু ভূ-খণ্ডে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু জার্মান জনগণ ক্ষুধার্ত, দুর্দশাগ্রস্ত, তারা শান্তি চায়, এবং এখনি ; এবং যেহেতু প্রেসিডেন্ট উইলসন, যার মধ্যে ইউরোপ দেখতে পায় তার ভাগ্যের একজন নির্ধারককে, বার্লিনের সিংহাসনে কাইজার থাকা অবস্থায় সংসদীয় সরকারের সঙ্গেও কথা বলতে ইতস্তত করেন, ফলে জার্মানরা এখন চায় যে সম্রাট কাইজার সিংহাসন ত্যাগ করুন। এটা বোঝা যায় যে মিত্রপক্ষ জার্মান সমরবাদের সঙ্গে কোনো প্রকার সমঝোতা করবে না। অতএব যখন নৌবহরকে যুদ্ধাভিযানে বের হওয়ার আদেশ প্রদান করা হয় তখন কিয়েলে নৌবিদ্রোহ দেখা দেয়, এর পরই (৯ নবেম্বর) সম্রাট কাইজার ক্রাউন প্রিন্সসহ হল্যান্ডে পালিয়ে যান। ঐ দিনই বার্লিনে দেশটিকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সাহসী তাদেরকেই বলতে হবে যারা হতাশাক্লিষ্ট দিনগুলিতে এগিয়ে আসে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। মধ্যবিত্ত জার্মান সমাজতন্ত্রীরা ইউরোপের সবচেয়ে গর্বিত রাজতন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়। এরা সাহসী এবং দেশানুরাগী। তবু জার্মানিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুতর দুর্ভাগ্য এই ছিলো যে নতুন সরকারকে প্রথমেই যে দায়িত্ব পালন করতে হয় তা হলো একটা যুদ্ধ বিরতি মেনে নেয়া। এই যুদ্ধ বিরতির শর্তের অধীনে জার্মানিকে বিজিত বা অধিকৃত সকল ভূখণ্ড খালি করে দিতে হয়। শুধু তাই নয়, তাদের সমর্পণ করতে হয় সকল উড়োজাহাজ, ভারতীয় কামান-বন্দুক এবং অস্থাবর মওজুদ। নৌবহরের বৃহদংশও মিত্র পক্ষের হাতে তুলে দিতে হয়।[৬] এসবই এখন জার্মান গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে। কিন্তু সে সময় গোটা

---

৬. পরিশিষ্ট ঘ দেখুন।

ইউরোপে একটা অনুভূতিই কাজ করেছে (যেমন নবেম্বর মাসের এগারো তারিখে সকাল এগারোটায় রণাঙ্গনে আকস্মিকভাবে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়) যে যাক অবশেষে দীর্ঘ ও বীভৎস দুঃস্বপ্নের অবসান হলো।

যুদ্ধে জয়ী হয় ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলি। এই যুদ্ধের অবসানে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের তিনটি সামরিক রাজতন্ত্র পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মুছে যায়। যদিও সন্ধি-এ বিবাদ চলাকালে সংসদীয় বিতর্ক তেমন একটা আমল পায়নি, কিন্তু এই সময়ের প্রধান নেতাদের চিন্তা নিরূপিত হয় সংসদীয় মঞ্চেই : অ্যাসকুইথ, লয়েড জর্জ, চার্চিল, বেলফোর, বোনার ল ইংল্যান্ডে,পয়েকার, পেইনলিভ, ব্রিয়া এবং ক্লিমেসু ফ্রান্সে। বার বার সুস্পষ্ট হয় ব্রিয়ার এই বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য : "যুদ্ধ এতটা গুরুতর ব্যাপার যে এর দায়িত্ব কিছুতেই সৈনিকদের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না।" জার্মানি তার জাতীয় জীবনে সৈনিকদের খুব বড় আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রধানত এর জন্যই যে তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়, তাতে কোনো সন্দেহ করা চলে না।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সাময়িকভাবে হরণ, তৎসঙ্গে বর্ধমান রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আধুনিক যুদ্ধের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। ইংরেজরা অন্যান্য জাতির চেয়ে কঠোর শৃঙ্খলা (Regimentation) কম পছন্দ করে। তবু তারা বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদান এবং খাদ্যাদির সংবিভাগ মেনে নেয়। পানীয় নিয়ন্ত্রণও তাদের মেনে নিতে হয়। শান্তির সময় এটা কিছুতেই সম্ভব হতো না। প্রতিটি দেশে জাতীয় সংহতি নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার দরকারি বলে সাব্যস্ত করা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত হবে শত্রুদেশ সম্পর্কে শ্লেষ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। যুদ্ধের নির্দয়তা এবং হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত হয় প্ররোচিত কুসংস্কার এবং মিথ্যাচার। এক্ষেত্রে যুধ্যমান কোনো দেশই দাবি করতে পারবে না যে সে দোষমুক্ত ছিলো। যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের আশংকা, উদ্বেগ এবং বিমূঢ়তা যতই ঘনীভূত হতে থাকে ততই যৎপরোনাস্তি উগ্র এবং দৃঢ়চিত্ত নেতৃসুলভ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ব্যক্তিরা সামনের কাতারে চলে আসতে থাকে এবং বিরাজিত অবস্থার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ইংল্যান্ডে লয়েড জর্জ, ফ্রান্সে ক্লিমেসু, জার্মানিতে লুডেনডর্ফ এবং রুশদেশে লেনিন সিংহাসনে জেঁকে বসেন। ১৯১৬ সালের শীতকালে বৃটেনের মন্ত্রিসভায় যে তোলপাড় হয় তা তখনকার ক্রমবর্ধমান হারে কর্তৃত্ব ঘনীভূত হওয়ার বৈশিষ্ট্যসূচক। সে সময়কার কঠিন পরিস্থিতিতে সেটা ছিল স্বাভাবিক। সর্বদলীয় মন্ত্রিসভার পরিবর্তে এক ক্ষুদ্র যুদ্ধ কমিটি গতিশীল একজন সভাপতির অধীনে দিনের পর দিন কাজ করেছে। এই কমিটির কাজ করার সমর্থতা ছিলো, তবে অভ্যন্তরে বড়ো বেশি মতভেদ দেখা যায়। কমিটির একজন সদস্য মি. উইনস্ট্যান চার্চিলের ভাষায় "প্রতিটি সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে একই কৌশল, গড়িমসি এবং ক্লান্তির ভেতর। অর্থাৎ শান্তির সময় হাউস অব কমন্সে কোনো বিলের অংশ বিশেষ নিয়ে প্রবল বাদানুবাদ সূচিত হলে যে দৃশ্যের অবতারণা হয় তার অনুরূপ।" এই সরকার লয়েড জর্জের নেতৃত্বে এবং ডমিনিয়নগুলির বিশিষ্ট নেতাদের সহায়তায়, যুদ্ধের শেষ দুই বৎসর ইংল্যান্ড এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য শাসন করেছে।

যুদ্ধ যেহেতু স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচারের শত্রু, ফলে হয়তো কল্পনা করা হয় যে যুধ্যমান দেশগুলিতে গণতন্ত্রের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছিলো। অবশ্য বন্দুকের গোলা সবাইকে সমান করে দেয়। অনেকানেক কারণে ইংল্যান্ডে (অন্যতম হলো সৈন্য দলে নিযুক্তি বাধ্যতামূলক ছিলো না) সমতার বোধ ফ্রান্স ও ইতালির চেয়ে কম দেখা গেছে। এখানে শ্রেণী চেতনা লজ্জায় নিমজ্জিত হয়। কারণ সাধারণ মানুষ সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায়

চূড়ান্ত বিপদের মোকাবেলা করে। যে ভূ স্বামী বিপদের সময় সাহায্যের হাত বাড়ায় নি সে তার বাসভবনের আহত মালীর সামনে নিজেকে ছোট মনে করতে বাধ্য হয়েছে। রাজনীতিকগণ নিজেদের প্রশ্ন করেছেন, যে জনগোষ্ঠী দেশের নিরাপত্তার জন্য সবপ্রকার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত, তাদের মঙ্গলের জন্য কি করলে যথেষ্ট হবে? এমন কি যুদ্ধ চলাকালে বৃটিশ মন্ত্রিসভা শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে, নারীদের ভোটের অধিকার দেয় এবং জাতীয় বীরদের জন্য গৃহ নির্মাণের চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। সাধারণ নর-নারীর অবস্থার কথা তারা সব সময় মনে রেখেছে। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সময় বৃটিশ মন্ত্রিসভা এমনটা করেনি।

বিস্ময়কর এবং তাৎক্ষণিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে বৃটিশ ডমিনিয়ন এবং উপনিবেশগুলি মাতৃদেশের পেছনে দাঁড়ায়। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আয়ারল্যান্ডে কিছুটা বিদ্রোহের ভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে তা অবিলম্বে দমন করা হয়। এতে বোঝা যায় অবাধ্য উপাদান একেবারে অনুপস্থিত নয়। তবে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলো না। যে সশস্ত্র ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছে তার সামনে তারা দাঁড়াতে পারেনি। ভারতের নৃপতিগণ এবং সাধারণ মানুষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের পাশে দাঁড়ায়। ফ্রান্স, গ্যালিপলি এবং মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করে। নিউজিল্যান্ডের লোক ক্ষয় হয় বেলজিয়ামের চেয়ে বেশি। জার্মান পশ্চিম আফ্রিকা জয় করা সম্ভব হয় জেনারেল বোথার সহায়তায়, জার্মান পূর্ব আফ্রিকা কব্জায় আসে জেনারেল স্মাটসের কারণে, নিউগিনি কেড়ে নেয়া হয় অস্ট্রেলিয়া থেকে দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে। ফরাসি কানাডাবাসীরা অন্য কোনো ধরনের বিবাদের ব্যাপার হলে হয়তো অবাধ্য প্রমাণিত হতো, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তারা ফ্রান্সের উদ্ধারে এগিয়ে আসতে পেরে সন্তুষ্ট বোধ করে। তবু উৎসাহের এই ব্যাপকতা থেকে যতোটা ফলাফল আশা করা গিয়েছিলো তা হয়নি। অতএব সাম্রাজ্যের বন্ধন আরো শক্ত হওয়ার পরিবর্তে শাসনতান্ত্রিক গ্রন্থি আরো ঢিলে হয়ে যায় (যুদ্ধের ফলে)! অথচ শাসনতান্ত্রিক গ্রন্থিই অতীতে এই বিশাল কমনওয়েলথকে একতাবদ্ধ করে।

যুদ্ধের আগে লন্ডনে লোকেরা বলাবলি করেছে একটা ফেডারেল পার্লামেন্টের অনুকূলে। পরবর্তী সময়ে ইম্পিরিয়াল সমস্যার উক্ত সমাধান এতোটা অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় যে, তা আর বিধিবদ্ধভাবে উপস্থাপন করা যায়নি। কোনো কোনো ডমিনিয়নে যুদ্ধে সাফল্য এবং আত্মত্যাগের দরুন, কোনো কোনো ডমিনিয়নে আইরিশ এবং ওলন্দাজ শত্রুতার কারণে যে প্রবল জাতীয়তা বোধের জাগরণ ঘটে তা বশ্যতার ক্ষীণমাত্র আশঙ্কাও অবশিষ্ট রাখেনি।

ডমিনিয়নগুলি পৃথক পৃথক জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পৃথক জাতি হিসেবে তারা শান্তিচুক্তিসমূহে স্বাক্ষর করে। তারা জাতিপুঞ্জের সদস্যও হয় পৃথক জাতি হিসেবে। ফলে তারা অভিন্ন রাজমুকুটের অধীনে মূল দেশের কাছে সমান মর্যাদা দাবি করে। বৃটেনে যেহেতু সার্বভৌম নৃপতি বৃটিশ মন্ত্রিসভার পরামর্শ মোতাবেক কাজ করেন, অতএব দাবি করা হয় যে, গভর্নর জেনারেলকে (যিনি রাজ প্রতিনিধি) কেপে টাউন এবং প্রিটোরিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রিসভার, আটোয়ায় কানাডীয় মন্ত্রিসভার এবং ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের মন্ত্রিসভার পরামর্শ মোতাবেক কাজ করতে হবে। এই দাবি মেনে নেয়া হয়। নতুন আশা-ভরসাসহ কমনওয়েলথের নতুন একটি চিত্র ওয়েস্টমিনস্টার স্ট্যাচুতে (১৯৩১) স্থান পায়। এই যুদ্ধে দুনিয়ার সামনে ইম্পিরিয়াল সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বটে, তবে সাম্রাজ্য

বিগঠনের ভেতর দিয়ে সমান মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের[৭] অবাধ সঙ্ঘ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করে। ভারত এবং ক্রাউন কলনিগুলিকে এই মুহূর্তের জন্য বিবেচনায় আনা চলবে না।

ইতঃপূর্বে কেউ হয়তো ভাবেননি যে এই যুদ্ধের লক্ষ্য হবে সমূহ নিপাত গোটা জনসংখ্যা যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। গোটা জনগোষ্ঠীকে যমালয়ে প্রেরণ করা বেশ বলে বিবেচিত হয়েছে। যদিও তখন আকাশযুদ্ধ ছিলো শৈশবাবস্থায়, কিন্তু যুদ্ধবিরতির পূর্বক্ষণে যুদ্ধের এই বিভাগ এতটা উন্নতিসাধন করে যে বিবদমান পক্ষগুলি নগরবিনাশ এবং বেসামরিক লোকদের যমালয়ে প্রেরণের ঘৃণাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। একটা ভয়ঙ্কর বোমা যে কোনো স্থানে পড়তে পারে, বর্ষিত হতে পারে পড়াশুনায় নিয়োজিত ছোট ছেলেমেয়েদের মাথার উপর, পড়তে পারে গির্জায় প্রার্থনারত লোকদের উপর, আরো পড়তে পারে রুগ্নের সেবা শুশ্রূষাকারী সেবিকাদের মাথার উপর। এই যুদ্ধের ঘটনাবলী ব্যাপারে যারা নিরপেক্ষ থাকার ঘোষণা দিয়েছেন তাদের মৌলিক অধিকারও লংঘন করা হয়। জার্মানি কর্তৃক বেলজিয়াম আক্রমণ, যুদ্ধে ইউ-বোটের লাগামহীন ব্যবহার কিংবা শ্বাসরোধকারী বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ, এই সব অপকর্মগুলি আন্তর্জাতিক অইন লংঘনের দৃষ্টান্ত, এবং এর জন্য জার্মানি এককভাবে দায়ী। অপরদিকে, কর্ফু দ্বীপ মিত্রপক্ষের স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে দখল, বৃটিশ নৌবাহিনী কর্তৃক নিরপেক্ষ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ, ফরাসি নৌবাহিনী কর্তৃক গ্রিস অবরোধ (রাজা কন্সট্যানটাইন শত্রুপক্ষে যোগ দিতে পারেন, এই আশংকা থেকে কাজটি করা হয়), এই সব অপকর্মের পক্ষে সাফাই গাওয়া আইনজ্ঞ হিসেবে শুদ্ধাচারী কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হবে না। যুধ্যমান দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক সুপরামর্শ বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি ; তার পরিষ্কার দৃষ্টান্ত (আমরা আগেই উল্লেখ করেছি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধে যোগদানের আগে দেশটি গলার জোর সবটুকু কাজে লাগিয়ে নিয়মিত বলেছে যে সে সামুদ্রিক জলভাগের স্বাধীনতার প্রতি অচলাভক্তি পোষণ করে। কিন্তু একবার যুদ্ধে অবতীর্ণ কিংবা পক্ষালম্বন করলে নিরপেক্ষ ভূমিকা বর্জন করে যুধ্যমান দেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। জার্মানির উপরে অবরোধ আরোপ এক সপ্তাহ আগেও ছিলো আন্তর্জাতিক অপরাধের সামিল। এখন তা মার্কিনীদের কাছে পুণ্যের কাজ বলে গণ্য। সামুদ্রিক জলভাগের স্বাধীনতার বাণী মিলিয়ে যায় হাওয়ায়, আর জার্মানির উপর অবরোধ আরোপে কর্মঠ মার্কিনী নৌবাহিনী যে নিখুঁত কৃতিত্বের পরিচয় দেয়, তা বৃটিশদের কাছে দুরাশা মাত্র।

ইউরোপীয় জাতিসমূহের সুদীর্ঘ কালের যাতনা ও দুর্ভোগের বর্ণনা করতে গেলে যথাযথ শব্দ কিংবা উপযোগী ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকে হয়ে পড়েন যুক্তিবিবর্জিত, অনেকেই হয়ে যান অন্ধ, অনেকের মৃত্যু ঘটে শ্বাসরোধী গ্যাসের প্রভাবে। কিংবা অনেকের অঙ্গহানি ঘটে যুদ্ধে ব্যবহৃত বিস্ফোরক দ্রব্যের কারণে। এখানে অতীব বিস্ময়ের এবং মানব প্রকৃতির জন্য সুনামের ব্যাপার এই যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সার্বজনীন প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাগেনি আতংকিত মনোভাব, কিংবা নতজানু হবার মানসিকতা। বরং জেগেছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

---

৭ ১৯২৬ সালের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স ডমিনিয়নগুলির অবস্থান ও মর্যাদার নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করে, "সবার মর্যাদা সমান এবং কোনো অবস্থাতেই একটি অপর কোনোটির অনুগত নয় অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে, যদিও তারা সার্বভৌম নৃপতির প্রতি অভিন্ন আনুগত্যের কারণে ঐক্যবদ্ধ এবং তারা স্বাধীনভাবে জাতিসমূহের বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে" একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

হওয়ার জেদ। যতবার ইংল্যান্ডের আকাশে জার্মানরা বিমান যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে ততবার দেশটির লোকদের মধ্যে যুদ্ধে যোগদানের প্রেরণা নতুনভাবে জাগ্রত হয়েছে। রণাঙ্গনে একটা সপ্তাহ ব্যবধান গেলে দেশের অভ্যন্তরে অস্ত্র কারখানার শ্রমিকরা উৎপাদন কাযে দ্বিগুণ উৎসাহ বোধ করেছে। ব্রেলাঁজিয়ামে জার্মানরা যতটা কঠোরতা দেখিয়েছে, যুদ্ধে জার্মানির জয়ের সম্ভাবনা ততই ক্ষীণ হয়েছে। ভাবীকাল যদি গুরুত্ব দেয়া দরকার বিবেচনা করে তাহলে বলা যায় এই যুদ্ধের প্রধান শিক্ষা হলো, ইউরোপের প্রগতিশীল এবং সুসভ্য জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী নীতি নিষ্ফল প্রমাণিত হতে বাধ্য। ডানকার্কের উপর বার বার আঘাত হয়েছে আকাশ থেকে, অথচ জনগণ শান্তিকালীন সময়ের মতো স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছে। যেসব যুধ্যমান দেশে সভ্যতা ব্যাপারটা স্থায়ী হয়েছিলো সেখানে দীর্ঘায়িত এবং নির্দয় এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে ব্যাপক গণ প্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করে। সেনাদলে লোকদের ভর্তির জন্য আকৃষ্ট করতে হয়েছে যুদ্ধসম্পর্কে উদ্দীপনামূলক ভাষণের সাহায্যে। বক্তৃতায় যুদ্ধের কারণকে রঙিন করে তুলতে হয়েছে বিশ্বাসযোগ্য। এমনকি ইংল্যান্ডে বসবাসরত শত্রুদেশের নাগরিকদের প্রতি করা হয়েছে ঘোরতর অন্যায়। তাদের করা হয়েছে বন্দী, তাদের সম্পত্তি করা হয়েছে বাজেয়াপ্ত এবং শেষ দিনগুলিতে জার্মানিতে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। শত্রু দেশের আকাশ থেকে লিফলেট ছেড়ে ঐ দেশের বাহিনীর আত্মবিশ্বাস বিনষ্ট করার চেষ্টা নেয়া হয়। যুদ্ধের শেষদিনগুলিতে এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকে। জার্মানরা রুশদেশে বিদ্রোহের উস্কানী দেয়। ইংরেজদের ব্যাপক প্রচারের কারণে অনেক জার্মানবাসীর মধ্যে সন্দেহ জাগে যে তারা সত্যিই ন্যায়যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন কি–না, প্রচারের মাধ্যমে জার্মান নেতাদের আদর্শচ্যুত করার চেষ্টাও চলে। অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের শিথিল সংবদ্ধ বাহিনী বিগঠন ত্বরান্বিত করা হয়, অধীনস্ত জাতিসমূহের মধ্যে দক্ষ ও চাতুর্যপূর্ণ আবেদন লিফলেট আকারে প্রচার করে। এই লিফলেট লন্ডনে প্রণয়ন করা হয়, আর বিতরণ করা হয় আকাশ থেকে উড়োজাহাজের সাহায্যে। অধীনস্ত জাতিসমূহ অবশ্য ইতিমধ্যেই অস্ট্রীয় দুঃশাসনে পীড়া বোধ করছিলো।

সম্ভবত যুদ্ধকালীন প্রচারণার সবচেয়ে বড় সাফল্য লাভ করা যায় অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসে থেকে। কারণ আকস্মিকভাবে অভ্যুদয় ঘটে চেকোস্লোভাকিয়া প্রজাতন্ত্রের। অধিকাংশে দেশ গঠন করা হয় বলপ্রয়োগ করে। কিংবা উপনিবেশগুলি থেকে জন্ম নেয়। চেকোস্লোভাকিয়া হলো যুদ্ধ প্রচারণার সন্তান। কিভাবে দুই নির্বাসিত নেতা, স্লোভাক কোচম্যানের পুত্র ম্যাসারিক এবং চেক খামারকর্মীর পুত্র বেনেস চেক ও স্লোভাকদের মুক্তির জন্য আন্দোলনের সূচনা করেন, কি পাইকারী হারে অস্ট্রীয় বাহিনী পরিত্যাগ করে প্রচেষ্টার সাফল্য কুড়ায়, কিভাবে ফরাসি ও ইংরেজ বুদ্ধিমত্তা তাদের জাগরণের পক্ষে কাজ করে, কি প্রবল উৎসাহের সঙ্গে চেকবাসীদের মুক্তির সাক্ষাৎ অবতারকে শিকাগো নগরীতে গ্রহণ করা হয় (পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম চেক নগরী) এবং কি সহানুভূতির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট তাকে গ্রহণ করেন, কিভাবে রাশিয়ায় পয়তাল্লিশ হাজার চেক যুদ্ধবন্দী বাহিনী গঠন করে, সাইবেরিয়ার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়, অতঃপর চালান হয় মাতৃভূমিতে— এই ঘটনাটির বর্ণনা আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর অধ্যায় সৃষ্টি করে। এটা আশ্চর্যজনক নয় যে প্রাগ রেল স্টেশনের নাম কোনো চেক সেনাপতির নাম অনুসারে রাখা হয়নি কিংবা রাখা হয়নি বিজয়ের স্মারক হিসেবে, কারণ এই কৃষিজীবী ও পরাধীন জাতির অনাড়ম্বর ইতিহাসে তেমন কোনো নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে স্টেশনের নাম রাখা হয় মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম অনুসারে, যিনি দুই নির্বাসিত নেতার দক্ষ প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে আড়ম্বরের সঙ্গে ঘোষণা দেন যে চেকোস্লোভাক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলো মিত্রপক্ষসমূহের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার অন্যতম লক্ষ্য।

শান্তিচুক্তিসমূহ

যুদ্ধের উত্তরাধিকার। শান্তির রূপদানকারী শর্তাবলী। প্রেসিডেন্ট উইলসন। তাঁর ব্যাপক প্রভাব। আত্মনিয়ন্ত্রণ মতবাদ। লিগের চুক্তিপত্র। জর্জ ক্লিমেন্সু। ডেভিড লয়েড জর্জ। ক্ষতিপূরণ সমস্যা এবং বিলেতে নির্বাচন। ইতালীয় দৃষ্টিকোণ। ভার্সাই সন্ধির ত্রুটিসমূহ। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য বিগঠন। উইলসনের মতবাদের বিজয়। আমেরিকার প্রত্যাহার। ক্ষুদ্র আঁতাতের সঙ্গে ফ্রান্সের মৈত্রীবন্ধন। জাতিসমূহের সংঘ সংগঠন। চুক্তিপত্রে গৃহীত শর্তাদি। আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনবসিত। ১৯৩৫ সালে যুদ্ধের আভাস।

যুদ্ধবিরতির সময় ইউরোপের অবস্থা ছিলো নজিরবিহীন দুর্দশাপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর। পরাস্ত সাম্রাজ্যগুলি টুকরো টুকরো হয়ে যায়, অথচ নতুন প্রজাতন্ত্রগুলি তখনও যথেষ্ট কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কিংবা আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। এবং ইত্যবসরে, গোটা মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ জুড়ে নতুন সরকারগুলি, সামান্য অভিজ্ঞতার অধিকারী, তাদের দক্ষতাও সামান্য, তাদের আনুগত্য অনিশ্চিত এবং দ্বিধাবিভক্ত, সীমান্ত সদা পরিবর্তনের ভেতর রয়েছে, তাদের সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ার জোগাড়, ফলে মানবদরদী ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রবিদদের স্কন্ধে এত বড়ো চাপের সৃষ্টি হয় যে, আনুমানিক হিসেব করে দেখা গেছে মানুষের আয়ত্তে প্রতিকারের যে স্বাভাবিক শক্তি রয়েছে তাতে কুলায় না। উক্ত সময়ে শ্রেষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ আট মিলিয়ন যুবক এই যুদ্ধে নিহত হয়। এর অধিক সংখ্যক যুবক হয় স্থায়ীভাবে পঙ্গু। এর চেয়ে অধিক না হলেও সমান গুরুতর ছিলো অনাহার, অপুষ্টি এবং রোগব্যাধিজনিত ক্ষতির হিসেব।[১] এই দুর্বিপাকগুলি রুশ দেশে সবিশেষ ভয়ানক রূপ ধারণ করে, যেখানে কলেরা, টাইফাস এবং খাদ্য ঘাটতির আতংক বাস্তবে বহুগুণ বৃদ্ধি পায় বিপ্লব এবং যুদ্ধ চলতে থাকার জন্য। মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপে এর ভয়াবহতা ছিলো কালাপাহাড়ী, যুদ্ধবিধ্বস্ত পোল্যান্ডের বেঁচে থাকতে হয়েছে গাছের শেকড়, ঘাস, ওকগাছের বীজ এবং লতাগুল্ম খেয়ে। জার্মানিতে প্রায় অনাহারের কারণে ১৯১৮ সালে প্রকৃত জন্মহার ছিলো মৃত্যু হারের চেয়ে কম। অস্ট্রিয়ার কারখানাগুলিতে যেহেতু কয়লা এবং অন্যান্য কাঁচামাল সরবরাহ করা যায়নি ফলে প্রায় প্রতিটি গরীব বাড়িতে দুর্ভিক্ষ হানা দেয়। সার্বিয়ার অর্ধেক জনসংখ্যা যুদ্ধে নিহত হয়। পঁয়ত্রিশ শতাংশ ভোগে তীব্র ক্ষয়রোগে। এই ভয়ানক দুর্দশার জন্য যে হতাশার জন্ম হয় তার ব্যাপকতা কল্পনা করা কঠিন বৈকি। চার বছরের অসহ্য পীড়া এবং অপুষ্টির জন্য ইউরোপের জীবনের মান কি দাঁড়ায় তাও কল্পনা করা যায় না। উচ্চমানের বিস্ফোরকের আঘাতে স্থায়ী মূলধনের যে ক্ষতি হয় তা তুলনামূলকভাবে অবহেলাযোগ্য বিপর্যয় মাত্র।

---

১. হিসেব করা হয়েছে যে যুদ্ধের কারণে পঁচিশ মিলিয়ন লোক প্রাণ হারায় (গিলবার্ট বারে Then And Now)।

এই দুর্দশাগুলি যদিও বিশেষ করে বাল্কিয়া এবং পরাস্ত দেশগুলিতে দেখা দেয়, তবে তা কোনো মতেই শুধু উক্ত দেশগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিলো না। বিজয়ী এবং নিরপেক্ষ দেশগুলিকেও দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ফ্রান্সের নিহত ও আহতের সংখ্যা বিরাট। তার খামারগুলি হয় বিধ্বস্ত। তার কারখানা, খনি অঞ্চল এবং যন্ত্রপাতির যে ক্ষতি হয় তার হিসেব কষা দুরূহ কম। বস্তুত যুদ্ধের ভয়ানক পরিণতি গোটা বিশ্বের সর্বত্র অনুভূত হয়। আর এই দুর্দশা সেই দেশগুলির বেশি অনুভূত হয়েছে যেখানে খাদ্যের মূল্য সামান্য বাড়লেই জনগণের অনাহারে থাকার বিকল্প থাকেনি। এ ধরনের বিপর্যয় নেমে আসে ভারতের জনগণের উপর, যেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় মারাত্মক আকারে দেখা দেয়। অথচ অবস্থা ভিন্ন হলে হয়তো ছয় মিলিয়ন লোকের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটতো না।

এই সব এবং অন্যান্য দুর্ভোগের চূড়ান্ত বিস্তারে গণমনে চিন্তা জাগ্রত হয় যে একটা নতুন ও উন্নত পরিকল্পনা মোতাবেক বিশ্ব গড়া যায় কি-না। আশাটা প্রবল বলে বিশ্বাসও জাগে যে এ ধরনের বিশ্বের জন্ম দেয়া সম্ভব। রুশ দেশের আশা-ভরসা লেনিনকে ঘিরে চলতে থাকে। পশ্চিম ইউরোপ তাদের মুক্তির জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট উডরো উইলসনের দিকে তাকায়।

শান্তিচুক্তিসমূহ প্রণীত হয় তিনজন গণতান্ত্রিক নেতার সরাসরি নির্দেশক্রমে। এই তিনজনই ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান। এঁরা হলেন উইলসন, ক্লিমেসু এবং লয়েড জর্জ। কিন্তু যদিও এই বিশেষ মর্যাদাবান চুক্তিপত্রের বিশেষ বিশেষ অংশে প্রত্যেকে স্বীয় প্রভাব খাটান, তবু বন্দোবস্তের মূল বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়ে যায় অপ্রতিরোধ্য ঘটনাবলির কারণে। এরা এসব হজম করতে বাধ্য হন। এই তিন ব্যক্তি হঠাৎ আততায়ীর হাতে নিহত হলেও এদের চেয়ে আলোকিত নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এসেও বন্দোবস্ত হেরফের কিংবা অগ্রাহ্য করতে পারতেন না।

প্রথমেই যুদ্ধের কারণে রুশ, জার্মান এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরির পুরাতন সরকারগুলির বিলুপ্ত হওয়ার দরুন এবং পোল, চেক, রুমানীয় এবং সার্বীয় জনগণ স্ব স্ব নতুন জাতীয় সরকার লাভ করে বলে একটা আনকোরা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। যদি মিত্রপক্ষীয় নেতৃবৃন্দ প্যারিসে বসে এইসব জাতীয় আন্দোলনগুলি প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তাহলে তাদের সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে হতো বল প্রয়োগ করে। এর জন্য প্রয়োজনীয় বাহিনী সরবরাহ কোন তরফ থেকে হতো? ফরাসি, ইংরেজ এবং ইতালীয় বাহিনী ইতিমধ্যেই যুদ্ধ-ক্লান্ত। একটা সজীব বাহিনী অবশ্যই ছিলো, কিন্তু সে বাহিনী সদ্য তাদের বিশেষ দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছে। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক মুহূর্তের জন্যও তাদের বাহিনী ব্যবহার করতে দিতেন না পোল কিংবা চেকদের জাতীয় আশা-ভরসা নস্যাৎ করার জন্য।

দ্বিতীয় পরিস্থিতি হলো ইউরোপীয় যুধ্যমান দেশগুলির তখনকার মেজাজ। এই দেশগুলি কোনো মতে, এবং অন্তিম মুহূর্তে, সার্বিক বিনাশ থেকে রেহাই পায়। তারা যুদ্ধের জন্য দায়ী করে জার্মানিকে। তারা লক্ষ্য করে যে সার্বরা অস্ট্রিয়া আক্রমণ করেনি, কিংবা বেলজীয়রা আক্রমণ করেনি জার্মানি, উপরন্তু জার্মানির কাইজার সরকারই রাশিয়া, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা ছিলো ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং অশান্ত। তারা খুঁজেছে অন্যায়ের প্রতিকার এবং নিরাপত্তা। গণতান্ত্রিক যুগের কোনো রাষ্ট্রবিদ, তিনি যতই স্বাধীন হোন না কেন, নিজ দেশের লোকদের পরিষ্কার ও আবেগঘন ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে

পারেন না। ক্লিমেসু ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন না, ইতালিতে অরল্যান্ডোরও তাই একই পরিণতি, যদি তারা শত্রুপক্ষের শক্তি খর্ব করার জন্য পরিশ্রম না করতেন, কিংবা নিজ নিজ দেশের সুরক্ষার জন্য উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ না করতেন। লয়েড জর্জ নিজ এলাকা থেকে সরব আজ্ঞা লাভ করেন যে শত্রুপক্ষকে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার জন্য অবশ্যই চরম মাশুল দিতে হবে, এবং লয়েড জর্জ যদি ইতিমধ্যেই জার্মান নৌবহর আটক না করতেন তাহলে তাকে অবশ্যই জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হতো। এই তিন জন রাষ্ট্রবিদদের মধ্যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পরিস্থিতি উদার দৃষ্টিতে দেখার জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। স্বাভাবিক তিনি উচিত শাস্তিবিধানের জন্য ছিলেন সবচেয়ে বেশি অঙ্গীকারাবদ্ধ।

তৃতীয়ত, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে শান্তি সম্মেলন আহ্বান করা হয় এমন একটি দেশের রাজধানীতে যে দেশ যুদ্ধের ধকল তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, পারেনি কাটিয়ে উঠতে লাগামহীন বোমাবর্ষণের আঘাত। প্যারিসের রোষকাষায়িত আবহে তোষণ নীতির আদর্শ উচিত শাস্তির আদর্শের সঙ্গে অসম পাঞ্জা লড়ে। ইংরেজরা সম্মেলন আহ্বানের জন্য সুইস কোনো ঠাণ্ডা নগরী বেছে নিতে বলেছিলেন। তা করা হলে হয়তো সম্মেলনের সুখকর পরিসমাপ্তি ঘটতো।

যাহোক, প্যারিস নগরীতেই ১৯১৯ সালের আঠারো জানুয়ারি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে যে লোকসমাবেশ ঘটে তা গোটা দুনিয়ার ইতিহাসের এক অদ্বিতীয় দৃশ্য। কারণ এই যুদ্ধ সর্বত্র সবার স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্ন ঘটায়, সব ধরনের ক্ষোভ জাগ্রত, হেন দাবি নেই যা উত্থাপিত হয়নি। তাছাড়া জন্ম নেয় নানা জাতের ভবিষ্যৎ দাবি,প্রত্যেক ধরনের তীব্র ক্ষুধা, এবং এই সব ক্ষুধা, দাবি, ভবিষ্যৎ-চিন্তা, ক্ষোভ-এর মোকাবিলা করতে হবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুদ্ধ-ক্লান্ত রাষ্ট্রবিদকে। তারা আবার নিজ দেশের গণতান্ত্রিক দাবির কাছে দায়বদ্ধ, উপরন্তু রয়েছে দেশের চরিত্রভ্রষ্ট খবরের কাগজওয়ালাদের খেপামি। জনৈক মেধাবী পর্যবেক্ষক এই দৃশ্যের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। ড. ডিলন লিখেছেন, "সম্মেলনের প্যারিস আর ফ্রান্সের রাজধানী থাকেনি। এটা পরিণত হয় বিশাল ও বৈশ্বিক এক কাঁরাভাসরাই-এ। নানাজাতি ও উপজাতির অদ্ভুত নজির এখানে জড়ো হয়, শোনা যায় চার মহাদেশের অগণন ভাষা। এরা সবাই এসেছে রহস্যাবৃত আগামীকালের জন্য অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণের জন্য।

"দ্রুবমান দৃশ্যপটে আরব্য রজনীর আবহ মিলিয়ে দেয় তার্তার, কুর্দিস্তান, কোরিয়া, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, পারস্য এবং হেজাজের অদ্ভুত প্রতিনিধিরা—কারো মুখে ঐতিহ্যবাহী দাড়ি, কারো নাক খঞ্জর আকৃতির। আরো কেউ কেউ এসেছে মরুভূমি ও মরুদ্যান থেকে, সমরখন্দ ও বোখারা থেকে।

"অতঃপর আসে বিত্তবান, মেধাবী এবং শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিরা, আসে নতুন নীতিকাঠামোর জন্য বীজ বহনকারিগণ, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ইতালি, পোলান্ড, রাশিয়া, ভারত ও জাপানের অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির সদস্যরা। দেখা যায় ন্যাফথা শিল্প এবং দূর-দূরান্তের কয়লাখনিগুলির প্রতিনিধিদের, তীর্থযাত্রীদের, অতিপ্রত্যয়ী ও অসার বিদ্বানদের, সকল ধর্মের পুরোহিতদের, নানা মতবাদের প্রবক্তাদের। এরা অবাধে মেলামেশা করে, রাজন্যবর্গ, ফিল্ড মার্শাল, রাষ্ট্রবিদ, নৈরাজ্যবাদী, রাজ্য নির্মাতা এবং ধ্বংসে বিশ্বাসীদের সঙ্গে। এদের জলন্ত বাসনা হলো ধাতু গলানোর পাত্রের ধারে-কাছে থাকা। এই পাত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গলিয়ে ফের নতুন রূপ দেয়া হবে।"

এইরূপ দৃশ্যপটে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট সম্মেলন উদ্বোধনের দিন উপস্থিত হন আশ্রুত মেসায়াহ (Messiah) ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে। এক সময় যুধ্যমান জাতিগুলির কাছে ছিলেন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। তিনি সুপারিশ করেছিলেন নিরপেক্ষ মনের পক্ষে, যেন নীতিগত বিভেদের অস্তিত্ব স্বীকৃত করা যায় না, এক সময় কথা বলেছেন 'বিজয়হীন শান্তি'র পক্ষে, যেন এই যুদ্ধ কারো মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেনি। এখন এসব সমূলে বিস্মৃত। প্রিন্সটন প্রফেসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধের শরিক করে, কয়েকটি উঁচু তারের এবং বাঙ্ময় ভাষায় তিনি মিত্রপক্ষের যুদ্ধের লক্ষের কথা বলেন, উপরন্তু ইঙ্গিত দেন ইউরোপের নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর। তিনি উল্লেখ করেন যে শত্রুপক্ষ হলো 'প্রাশীয় সমরবাদে'র প্রতিভূ, তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ হলো এটা 'বিশ্বকে গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ' করতে হবে। তাঁর কাছ থেকে মিত্রপক্ষ জানতে পারে যে ফ্রান্স আলসেস-লরেন পুনরুদ্ধার করে এটাই শুধু যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য নয় পুনরুজ্জীবিত করতে হবে পোলান্ড রাষ্ট্র, তাদের থাকবে সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য অবাধ সড়ক, গঠন করতে হবে নতুন প্রজাতন্ত্র চেকোস্লোভাকিয়া। তিনি সূত্রবদ্ধ করেন 'চৌদ্দ দফা'[১]। তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন জার্মানির শাসকদের সঙ্গে, তিনি সামরিক যুদ্ধ যুদ্ধবিরতির উপর জোর দেন। তাঁর দেশ কোনো ভূ-খণ্ড চায়না, ক্ষতিপূরণ তাদের দাবিসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি জার্মান রাষ্ট্রে তাকে নিরাসক্ত নৈতিকতার যাজক ও প্রজ্ঞা হিসেবে গণ্য করা হয়। যেন তাকে নতুন বিশ্ব পাঠিয়েছে পয়গম্বর হিসেবে পুরাতন বিশ্বের জঞ্জাল দূর করার জন্য। যেখানে অন্যান্য পয়গম্বরের বাণী ছিলো অরণ্যে রোদন মাত্র। সেখানে উইলসন ছিলেন এক বিশাল ও শক্তিধর রাষ্ট্রের প্রভু।

প্রেসিডেন্ট উইলসনের অবলম্বন একটা জায়গায় খুব দুর্বল ছিলো, যা মার্কিনীরা জানতেন, তাদের কাছে স্পষ্ট ছিলো, কিন্তু ইউরোপীয়রা তখন সঠিক ঠাহর করতে পারেন নি। তিনি তাঁর দেশবাসীর প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি গণতন্ত্রী দলের সদস্য এবং আদর্শবাদী। তখন প্রজাতন্ত্রী দলের সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আর মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকার সিনেটসভার জন্য সংরক্ষিত। তাহলে দেখা যায় যে, প্যারিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন যদি তিনি ক্ষমতাবান রিপাবলিক রাজনীতিকদের সহায়তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মেজাজ বিচারে স্বেচ্ছাতন্ত্রী এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে কঠোর দলীয় মনোভাবাপন্ন। তিনি প্যারিস সফরে যান রিপাবলিক্যান প্রতিনিধি ছাড়া, আর রিপাবলিক্যানরা তাঁর সকল পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দেয়।

কারণ চুক্তিপত্রসমূহে উইলসনের চিন্তার ছায়া ছিলো। ইউরোপের নতুন মানচিত্র আঁকা হয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি অনুসারে (কথাটা বোলশেভিকরা প্রথম ব্যবহার করেন)। এই নীতি প্রেসিডেন্ট উইলসন ঘোষণা করেছিলেন অমঙ্গলের শোলকধাঁধা পেরিয়ে ন্যায় ও শান্তির রথে আরোহণের জন্য। পোল জাতি ও তাদের করিডোর এবং চেক স্লোভাক, জাতির উপর তিনি তাঁর অজস্র আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। হয়তো তিনি চেয়েছিলেন ইতিহাসের ভ্রান্তি দূর করতে। হয়তো তিনি এটা ভেবেছেন যে স্বদেশে পোলিশ ভোটের মূল্য খুব বেশি, আর শিকাগো শহরে চেকদের কদর খুব বেশি, তারা সেখানে সংখ্যায়ও অনেক। আমেরিক্যানরা

---

১. পরিশিষ্ট গ দেখুন।

বলতে পারেন না, যেমন অনেকে বলে থাকেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার এই মৌলিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় নোংরামি মার্কিনী আদর্শ তছনছ করে দেয়। ইউরোপের নতুন মানচিত্র আঁকা হয় উইলসনের আদর্শ অনুসারে। এবং এমনভাবে আঁকা হয় যে দেখা যায় ইউরোপীয় মহাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র তিন শতাংশ বিদেশী শাসনের অধীনে রয়ে গেল। আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি দ্বারা পরীক্ষা করলে বলতে হয় যে, আগেকার কোনো সময়ের ইউরোপীয় সীমান্তরেখাগুলি এতটা সন্তোষজনক ছিলো না।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অনুসারেও চুক্তিগুলি ছিলো উইলসন অনুসারী। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উপস্থিত না থাকলে জাতিপুঞ্জের চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হতো না, চুক্তিসমূহের কাঠামোর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা যেত না। লীগ অব নেশন্স প্রতিষ্ঠার কথা প্রেসিডেন্ট প্রথম ভাবেন নি। এই ধারণার আদি উদ্ভাবনা অ্যাংলো স্যাকসন, ল্যাটিনরা এই ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিলো না। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক শান্তিকামী মানুষের মনে এই ধারণা প্রথম দানা বাঁধে যুদ্ধ চলাকালে। অতঃপর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের রূপ পায়, যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ রচনা করেন স্যার ফিলিমোর এবং জেনারেল স্মাটস। কিন্তু প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন যেমন একটা ব্যাপার, তার চেয়ে বড় ব্যাপার হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নানা দাবির মধ্যে উক্ত প্রস্তাব কার্যকর করা। প্রেসিডেন্ট উইলসন ফিলিমোর-স্মাটস প্রণীত খসড়াগুলি গ্রহণ করেন, শান্তি সম্পর্কিত আলোচনার সম্মুখভাগে লিগের সমস্যা উপস্থাপনের উপর জোর দেন, চুক্তিপত্র প্রণয়নকারী কমিশনের কর্মকাণ্ডে স্বয়ং পৌরহিত্য করেন, এবং স্বীয় অসীম কর্তৃত্ব বলে কাজটার চূড়ান্ত রূপ দিতে সমর্থ হন। চুক্তিপত্রটি সকল শান্তি চুক্তির আবশ্যিক অঙ্গে পরিণত করে তিনি তা সিনেট কর্তৃক গৃহীত হবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এতে মূল্যবান দুটি মাস কেটে যায়। অতঃপর সম্মেলন শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব কাজে হাতে দিতে পারে।

অতএব এটা বলা ঠিক নয় যে, শান্তিচুক্তিসমূহে কোনো প্রকার আদর্শবাদ ছিলো না, কিংবা তাতে ছিলো সুনীতির ঘাটতি। তাতে রয়ে গেছে চুক্তিপত্রের আদর্শ। তাতে রয়ে গেছে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি। তবে উক্ত আদর্শ ইউরোপ মহাদেশের সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো না। আর নীতিটি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ছিলো পুরোপুরি বিপজ্জনক এবং অভিনব। কারণ এর দরুন কয়েকটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই রাষ্ট্রগুলির স্থায়িত্ব নিঃসংশয় ছিলো না। তাছাড়া ম্যাগিয়ারদের প্রতি অবিচার করে বিশাল ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যা হস্তান্তর করা হয়।

জার্মান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবসানে আমূল পরিবর্তনকামী এবং বৈপ্লবিক শান্তি সূচিত হয়। এটা করেন বৈপ্লবিক নেতৃবৃন্দ। এই শান্তি জাতিসমূহের মুক্তির স্বীকৃতি দেয়, কতিপয় নতুন প্রজাতন্ত্রকে বিধিবদ্ধ করে, এবং সংখ্যালঘুর সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখে। ইউরোপ মহাদেশের সাধারণ ঝোঁক ছিলো জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র অভিমুখে। এই ঝোঁক ১৮৪৮ সালে প্রথম অনুভূত হয় এবং ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এখন এটা স্বাভাবিকভাবে মি. উইলসনের শান্তির রূপ পরিগ্রহ করলো।

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লিমেসু। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁর কোনো বিচারবিমূঢ় মোহ ছিলো না। কিন্তু তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল সংসদীয় এবং সাংবাদিক জীবনে তিনটি জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত মোহ বোধ করতেন। এই

মাইলস্টোন হলো বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং স্বাধীনতা। এসব ছাড়া তিনি অ্যাংলো-স্যাকসন জাতিকে ভালো বুঝতেন এবং তাদের পছন্দ করতেন। তিনি সঠিক উপলব্ধি করতে পারতেন অ্যাংলো স্যাকসন জাতির সঙ্গে বন্ধুত্বের মূল্য। এই বাহ্য। তিনি ছিলেন যুক্তিশীল ও বাস্তববাদী ফ্রান্সের দর্পণ। রিশেলিউ, ম্যাজারিন, চতুর্দশ লুই, দাঁতো প্রভৃতির কর্মপন্থাগুলি এই মহৎ এবং তেজোদীপ্ত প্রজাতন্ত্রীর মাথায় পুনরায় প্রাণ ফিরে পায়। তিনি তার দেশকে দ্রুত আক্রমণের শিকার হতে দেখেন। এ যাত্রা দেশটি সামগ্রিক ধ্বংস থেকে রক্ষা পায় বৃহৎ শক্তি জোটের শরিক হওয়ার দরুন। তিনি জানতেন ১৯৪০ সালের মধ্যে জার্মানি ফ্রান্সের স্বাধীনতা সম্পর্কে কাঁপানে পাঠাতে পারবে, তবে তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন যে তখন কোনো শক্তি জোট পাওয়া যাবে তার দেশটিকে রক্ষা করার জন্য। ১৯১৪ সালের শক্তি জোটের পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। আমাদের কি অবাক মানতে হবে যে ক্লিমেসু শুধু ক্ষতিপূরণের কথা ভাবতেন, গত যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, আর ভবিষ্যতের জন্য নিরপেক্ষতা? কিংবা মার্শাল ফচ যখন বিজয়ীর ভঙ্গিতে রাইনের সেতুমুখগুলি দাবি করলেন, তখন ক্লিমেসু, যিনি জার্মানদের বিশ্বাস করতেন না, কি জোর দিয়ে উক্ত দাবি সমর্থন করতে পারতেন না? কিন্তু এ ক্ষেত্রে ফ্রান্স দুজন অ্যাংলো-স্যাকসন রাষ্ট্রবিদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এঁরা যুক্তি দেখান যে রাইনল্যান্ডকে রাইখ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে দ্বিতীয় আলসেস-লরেনের সৃষ্টি করা হবে। এটা হবে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজ বপনের সামিল।

এ ক্ষেত্রে মি. লয়েড জর্জ খুবই জেদ ধরেন। রাইনল্যান্ডের বদলে ফ্রান্সকে প্রস্তাবিত করা হয় যে জার্মানিতে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আইনের অবসান ঘটবে, ঐ দেশে একশত হাজারের অধিক সৈন্য থাকতে পারবে না, দক্ষিণ তীরে বেসামরিক এলাকা গঠন করা হবে, আর থাকবে একটি নিশ্চয়তা চুক্তি, এতে স্বাক্ষর করবেন উইলসন এবং লয়েড জর্জ। তারা স্ব স্ব দেশের হয়ে প্রতিজ্ঞা করবেন যে ভবিষ্যতে ফরাসি ভূ-খণ্ড আক্রান্ত হলে তারা দেশটি প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসবেন। ক্লিমেসু অ্যাংলো-স্যাকসন নেতৃবৃন্দের কাছে নতি স্বীকার করেন। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেস যখন নিশ্চয়তা চুক্তি অনুমোদন করতে অস্বীকার করে, ফ্রান্স তখন অনুভব করে যে এক টুকরো কাগজের জন্য রাইনল্যান্ডের উপর তার দাবি প্রত্যাহার করতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে ফরাসিরা যুদ্ধে জয় ছিনিয়ে আনে, আর ক্লিমেসু শান্তি বিক্রয় করেন।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে, তিনি যে বিজয়স্মারকগুলি দেশে নিয়ে আসেন তা দেখে স্বয়ং চ্যাথাম ঈর্ষা বোধ করতেন। বৃটেন পাবে অধিকাংশ জার্মান যুদ্ধজাহাজ (যুদ্ধ বিরতির সময় আত্মসমর্পণ করে এবং স্কাপা ফ্লোতে ডুবিয়ে দেয়া হয়) এবং বাণিজ্যিক নৌবহর। জার্মানির মূল্যবান উপনিবেশসমূহ, যেমন মেসোপটেমিয়া, প্যালেস্টাইন এবং টাঙ্গানিকায় প্রভাববলয় (এ দিকে কম গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশগুলি সাউথ আফ্রিকান ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া এবং ডমিনিয়ন অব নিউজিল্যান্ডের জন্য থাকবে)। এই স্বীকৃতিও আদায় করা হয় যে ডমিনিয়নগুলি পৃথকভাবে শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে এবং জাতিপুঞ্জেও তারা পৃথকভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য যা কিছু আদায় করা যায় তার সবই লয়েড জর্জ আদায় করতে সমর্থ হন।

ক্ষমতার রাজনীতির প্রথাগত মানদণ্ড অনুসারে বিচার করলে অন্য কোনো বিজয় এর চেয়ে সম্পূর্ণাঙ্গ হতো না। কিন্তু তাঁর মেধাবী যুদ্ধ নেতৃত্ব সত্ত্বেও, তাঁর দেশ সামুদ্রিক জলভাগে

এবং স্থলভাগে বিরাট বিজয় অর্জন করলেও মি. লয়েড জর্জ সম্মেলনে হাজির হন একটা দুর্বলতা নিয়ে। ইংল্যান্ডে তখন আয়োজন চলছে সাধারণ নির্বাচন নামক অনিবার্য বিপদের সর্বত্র প্রতিহিংসাপরায়ণ মেজাজ। নারীর ভোটাধিকার প্রাপ্তিতে এই রূঢ় মেজাজ প্রশমিত না হয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচকমণ্ডলীকে করে তুলেছে উত্তেজিত। সবার বিশ্বাস হয়েছে যে জার্মানিকে যুদ্ধের সমুদয় খরচ বহন করতে হবে। সম্রাট কাইজারকে ঝুলাতে হবে ফাঁসিকাষ্ঠে, তাছাড়া যে সকল জার্মান ব্যক্তি যুদ্ধের আইন লঙ্ঘন করেছে তাদের বিচার করতে হবে। তাদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দিতে হবে। যুদ্ধ অপরাধ বিশেষ, এই তত্ত্ব অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচার করা হয়, বাণিজ্যিক জাহাজ যুদ্ধের সময় ডুবিয়ে দেয়া হয় ডুবোজাহাজের সাহায্যে, এই স্মৃতি তাদের মনে এতটা সজাগ ছিলো যে, বৃটিশ নির্বাচক মণ্ডলী যখন বলেন যে যারা যুদ্ধ বাঁধিয়েছে তাদের অপরাধী হিসেবে গণ্য করতে হবে, তখন নিশ্চয় তাদের ক্ষমা করা যায়। অবশ্য রাজনীতিকরা ঘটনাধারা আরো ভালো বুঝতেন। ফলে জাতীয় উন্মত্ততার এই বহিঃপ্রকাশ তাদের কাছে বিরক্তিকর বিস্ময় হিসেবে প্রতিভাত হয়। নির্বাচনী বক্তৃতায় বক্তারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। প্রধানমন্ত্রীও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। জাতীয় পুনর্গঠনের মহৎ আবেদন নিয়ে তিনি নির্বাচনী অভিযান শুরু করেছিলেন। সার্বজনীন অনুভূতির চাপে তিনি এই অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। তাঁর 'বীরদের জন্য গৃহায়ণ'; এই শ্লোগান আবেদন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলী এখন শুধু শুনতে চায় শত্রুর শাস্তি বিধানের কথা। একজন বাগ্মী শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বাধ্য। প্রধানমন্ত্রী মি. লয়েড জর্জের সুরও কঠিন হয়। তিনি জরিমানার ব্যাপারটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দেন। দেশের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বিরাট অংকের ক্ষতিপূরণ দাবি করে। তিনি উক্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি একটি আইনসিদ্ধ অভিমত প্রস্তাবিত করেন। তিনি অভিমত পোষণ করেন যে পরাজিত পক্ষকে অবশ্যই যুদ্ধের খরচ বহন করতে হবে। তিনি দেশবাসীকে এটা বোঝাতে সমর্থ হন যে, শত্রুপক্ষের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করা যাবে এবং আদায় করা উচিত। অনতিকাল পর এটা আবিষ্কার করে তিনি অবাক মানেন যে, জার্মানরা খুব বেশি হলে দুই হাজার মিলিয়ন পরিশোধ করতে পারে। অথচ বৃটিশ বিশেষজ্ঞ কমিটি বিরাট অংকের প্রস্তাব করেছে। এই পরিমাণ হলো চব্বিশ হাজার মিলিয়ন। কিন্তু তৎকালীন অদ্ভুত ও অসার প্রত্যাশার আবহে এত কম পরিমাণ দাবির ঘোষণা নেহাৎ বেয়াদবি বলে গণ্য হতো। তখন চুক্তিসমূহে পরিমাণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। বিজ্ঞতা এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞসুলভ কায়দায় এই ব্যাপারটা ক্ষতিপূরণ কমিশনের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এই কমিশনের দায়িত্ব পালনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানানো হয়। মার্কিন প্রতিনিধি নির্ণয় করে ক্ষতিপূরণের সঠিক পরিমাণ কি হতে পারে।

ক্ষতিপূরণের অনিষ্পন্ন শর্তাবলী প্রভূত তিক্ততার জন্ম দেয় এবং জার্মান প্রজাতন্ত্রের ভিত দুর্বল করে। ইউরোপের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যোদ্ধারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এটি ছিলো ক্ষণস্থায়ী দুর্বিপাক। আগে হোক পরে হোক, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী যেমন সঠিক অনুমান করেছেন, ব্যবসায়ীরা এক সময় মুখোমুখি বসবে, আর আমেরিক্যান সাহায্য পাওয়া যাক আর না যাক, তারা একটা পরিমাণ নির্ধারণ করবেন, যা অধমর্ণ পক্ষ প্রদান করতে সমর্থ হবে, উত্তমর্ণ পক্ষও ভেবে দেখবে যে তা গ্রহণ করা লাভজনক। ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে এটাই বাস্তব

অবশ্য সীমান্তরেখা হয়তো কখনো বলপ্রয়োগ ছাড়া পরিবর্তন করা যায় না, কিন্তু টাকা-পয়সা পরিশোধের মত বার বার পরিবর্তন করা যায়। ক্রমান্বয়ে, অবশ্য অনেক বুকজ্বালা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার পর, জার্মানি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ পরিশোধের পরিমাণ লুসান সম্মেলনে (১৯৩২) একেবারে কমিয়ে ফেলা হয়।

ইংলান্ড যদিও ফ্রান্সের মতো মনে করে যে জার্মান সমরবাদ বিপজ্জনক, সে ইচ্ছাও পোষণ করে যে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার অ-জার্মান ভূ-খণ্ড কেড়ে নেয়া উচিত, তবে সে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ফ্রান্সের সঙ্গে একমত পোষণ করে না। জার্মানি অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করলে, সে সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত হলে সেটা ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক বৃত্তির অনুকূলে যায়। ইংলান্ডের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ হয় জার্মানি যদি শান্তিপ্রিয় ও সন্তুষ্ট জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অতএব মি. লয়েড জর্জ কাজ শুরু করেন উত্তেজনা প্রশমনের অনুকূলে। তিনি রাইনল্যান্ডকে রাইখ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ধারণার বিরোধিতা করেন, তিনি আপার সাইলেসিয়ার সকল সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল পোল্যান্ডের হস্তে অর্পণেরও বিরোধিতা করেন। চুক্তির অধীনে মিত্রপক্ষ জার্মান ভূ-খণ্ড ১৫ বৎসর দখলে রাখবে, এই ধারণাও তার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। প্যারিসে তিনি এটা নিশ্চিত করেন যে আপার সাইলেসিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ করবে সে অঞ্চলের অধিবাসীরা গণভোটের মাধ্যমে (ইম্পিরিয়াল ক্যাবিনেট তার সঙ্গে ছিলো)।

ইতালি কঠোর জাতিগত স্বার্থে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। কোনো প্রকার দানশীল আদর্শ মন্টে সিটোরিও-র (Monte Citorio) কঠোর বাস্তববাদী রাজনীতিকদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করতে পারেনি কিংবা তাদের হৃদয় গলাতে পারেনি। জাতিপুঞ্জ অনেকানেক অ্যাংলো-স্যাক্সন নেতাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, কিন্তু রোম কিংবা মিলানের নেতাদের একটুও টলাতে পারেনি। বিবদমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মধ্যস্থ করার যে অধিকার ভ্যাটিক্যান স্মরণাতীত কাল থেকে ভোগ করে আসছে জাতিপুঞ্জ কি তাতে হস্তক্ষেপ করেনি? আলপস পর্বতমালার চূড়া পর্যন্ত সীমান্ত এবং আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূল বরাবর কয়েকটি বন্দর লাভ করা কি জেনিভার পার্লামেন্টের চেয়ে মূল্যবান নয়? ইতালি নিজের কাছে বলেছে : "ফ্রান্স পাচ্ছে আলসেস ও লরেন, ইংল্যান্ড পাচ্ছে অধিকাংশ উপনিবেশ, আমরা কি পাচ্ছি?" অবশেষে তাকে দেয়া হয় ট্রেনটিনো, ত্রিয়েস্ত এবং জারা, তদুপরি আড্রিয়াটিক সাগরের মোহনায় অবস্থিত হাঙ্গেরীয় বন্দর পেতে তাকে সাহায্য করা হয়। ফিউম প্রধানত দখল করেন কবি দ'আনুনজিও আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করে। এতো সব সত্ত্বেও ইতালি খুশি হয়নি। কারণ ডালমাটিয়াকে খ্রিস্টধর্মে বরণ করে ইতালিয় ধর্মযাজকরা, অধিবাসীদের মধ্যে সভ্যতার বিস্তার ঘটায় ইতালির শিল্পীরা। অথচ অঞ্চলটি যুগোস্লাভিয়ার হাতে তুলে দেয়া হয়।

খসড়া চুক্তিপত্রের শর্তাবলী যখন জার্মানদের জানানো হয় তখন তারা সেটিকে হতবুদ্ধিকর কঠোর এবং পালনের অযোগ্য বলে গণ্য করে। মনে করা হয় যে গোটা পরিকল্পনার নকশা আঁকা হয়েছে দেশটিকে স্থায়ী অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করার জন্য। একদিকে জার্মানির সকল সমরসম্ভার কেড়ে নেয়া হবে, তাকে শত্রুর সামনে করা হবে নিরাভরণ, অপর দিকে মিত্রপক্ষ পর্বত প্রমাণ অর্থ দাবি করতে পারবে, আর দখল করতে পারবে জার্মান ভূ-খণ্ড উক্ত অর্থের জামানত হিসেবে। উচ্চস্বরে প্রতিবাদ ওঠে যে উইলসনের চৌদ্দ দফা এবং পরিবর্তনকালীন তাঁর বক্তৃতাদির আদর্শ থেকে খসড়া

চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর ব্যবধান বিস্তর। অথচ উইলসনের আদর্শের প্রতি আস্থা রেখেই তখন অস্ত্র সংবরণ করা হয়েছিলো। দুই প্রজন্ম জুড়ে সমূলে ধ্বংসকারী নজরানা দিতে হবে, দীর্ঘকাল দখলদার বাহিনীর অধিকারে থাকবে জার্মান জাতীয় বাহিনীর অবকাঠামো এবং সমরসম্ভার মিত্রপক্ষীয় কমিশনের চোখের সামনে বলপূর্বক ধ্বংস করা হবে, বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আদেশ বিলুপ্ত করা হবে, এতসব অবমাননা সহ্য করা যায় না। সব চেয়ে অগ্রহণযোগ্য হলো পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তের জন্য নতুন বন্দোবস্ত, পোল্যান্ড রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবন, ব্রান্ডেনবুর্গ থেকে পূর্ব প্রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে পোল্যান্ডের সমুদ্রে যাওয়ার পথ পোলিশ করিডোর তৈরি (যদিও এসব প্রেসিডেন্টের চৌদ্দ দফায় ছিলো) এবং সাইলেসিয়ার বৃহৎ শিল্পাঞ্চল পোল্যান্ডকে প্রদান। এখানে মনে রাখতে হবে জার্মান মেধা ও পুঁজি পেছনে না থাকলে উক্ত অঞ্চল এত দ্রুত উন্নতি করতে পারতো না। মহান ফ্রেডারিক বিজিত এসব অঞ্চল বাধ্য হয়ে হাত-ছাড়া করতে হবে (চুক্তিপত্রের শর্তাবলীতে এ রকমই উল্লেখ করা হয়েছে), এতে জার্মান জাতির গর্ব আহত হয়। এটা তারা সহজে মেনে নিতে পারে না। তুলনায় আলসেস ও লরেন হাত-ছাড়া হওয়া সহ্য করা অনেক সহজ (এটি একটি সব সময়ের জন্য ঝগড়াটে সমস্যা)। কিংবা জার্মান বাহিনী কর্তৃক ফরাসি খনিগুলির ক্ষতিসাধনের জরিমানা স্বরূপ সার উপত্যকার অধিকার সাময়িকভাবে পরিত্যাগ অতি তুচ্ছ (bagatelle) ব্যাপার।

ভার্সাই সন্ধির স্বাক্ষরদাতা দেশগুলি পোলিশ জাতির উপর আস্থা স্থাপন করে ; তার ন্যায্যতা প্রমাণ করার দায়িত্ব এখন পোলান্ড প্রজাতন্ত্রের উপর বর্তায়। এটি তাদের করতে হবে বিজ্ঞতা, সুবিচার এবং সহনশীলতা দ্বারা।

ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিলো অতিশয় কঠোর। এই সন্ধি জার্মান প্রজাতান্ত্রিক সরকারের অবস্থান সুদৃঢ় হতে দেবে না। অথচ মিত্রপক্ষের উচিত ছিলো উক্ত প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সহায়তা করা। আবার, ইংরেজরা যেখানে ভার্সাই সন্ধির কঠোরতা ব্যাপারে নিন্দামুখর, সেখানে ফ্রান্সে প্রচলিত অভিমত এই যে, ক্লিমেসু (ফরাসি প্রধানমন্ত্রী) অ্যাংলো-স্যাকসনদের দাবি মেটাতে গিয়ে জার্মানিকে যথেষ্ট দুর্বল করেনি। দেশটি এখনো ইউরোপ এবং গোটা বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক।

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা করে বলা হয়ে থাকে যে, এই সন্ধি আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রণীত হয়নি। বরং উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তাহলে বলতে হয়, বিজয়ী এবং বিজিতের মধ্যে প্রণীত সকল সন্ধির রূপ অভিন্ন। বুখারেস্ট সন্ধি, যা জার্মানি রুমানিয়ার উপর চাপিয়ে দেয় ; বেস্ট-লিটোভস্কের সন্ধি, যা জার্মানির আদেশে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত হয়। এসবই উক্ত বর্বর ধরনের সন্ধির নজির। যখন আমরা স্মরণ করি কি কি বিশাল এলাকা নিয়ে সন্ধিপত্রের প্রণেতাদের ভাবতে হয়েছে, সৈন্য অপসারণের মুহূর্তের জন্য যুদ্ধ ক্লান্ত বাহিনীগুলি কতোটা অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন, আলোচনা দীর্ঘায়িত হলে হয়তো সকল ব্যবস্থা ভণ্ডুল হয়ে যেত, তখন আমরা মিত্রশক্তি এবং সহযোগী শক্তিগুলির ইচ্ছেটা কি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। জার্মানি খসড়া সন্ধিপত্রের লিখিতভাবে সমালোচনা করে, জবাবে মিত্রপক্ষ লিখিতভাবেই জানিয়ে দেয় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেয়াত দেয়া হবে। তখনকার

উত্তেজনাপূর্ণ, আবেগাপ্লুত প্যারিসীয় আবহে মিত্রপক্ষীয় কোনো রাষ্ট্রবিদ এর চেয়ে উদার, খোলামেলা এবং স্থিতিস্থাপক কার্যধারার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।[১]

এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রধান সূচনাকারী দেশ অস্ট্রিয়া। এই দেশটিকে সর্বাধিক দুর্ভোগ পোহাতে হয় তার উদ্দেশ্যহানির জন্য। রাজবংশ, সেনাবাহিনী, সাম্রাজ্য ঘূর্ণিঝড়ের ভেতর কোথায় হারিয়ে যায়। হাঙ্গেরিয় জনগণ স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়, তাদের আক্রমণ করে রুমানিয়া, চেক ও স্লোভাকরা বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ ধরে। দক্ষিণাঞ্চলে সার্বরা তাদের বিজয়ের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। বেঁচে থাকে শুধু একটি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র, যার জনসংখ্যা মাত্র ছয় মিলিয়ন। শুধু তাই নয়, সেইন্ট জার্মেইন সন্ধির শর্তাবলীর অধীনে বলা হলো যে দেশটি জাতিপুঞ্জের সম্মতি ছাড়া (এই সম্মতির ভিত্তি হবে অবিভক্ত ভোট) জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে না। এটিই একটি সুখ্যাত রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তিম দশা। এই দেশ পনেরোটি জাতির উপর রাজত্ব করেছে দীর্ঘকাল। মধ্য ইউরোপের জন্য সে ছিলো বিধান প্রণেতা। এর ছিলো বৃহৎ নগরী রাজধানী হিসেবে। আমন্ত্রিত প্রয়োজনের চেয়ে বহুগুণ বড়ো। বিশাল সাম্রাজ্যের জন্য গঠন করা হয়েছিলো উপযোগী সিভিল সার্ভিস। শত্রু প্রতিবেশীগুলি দেশটির বাণিজ্যের ক্ষতি করেছে ট্যারিফ আরোপ করে, শহরবাসীরা বোলশেভিক মতবাদ দ্বারা আক্রান্ত। দেশের কৃষককুল ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের কৃষকদের মতোই মধ্যযুগীয় এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। অতএব অস্ট্রিয়া এখন গভীর হতাশায় নিমজ্জিত। নবগঠিত দেশগুলির মধ্যে জাগ্রত হয়েছে মারমুখী জাতীয়তাবাদ। ফলে কোনো দানবীয় জেলভেরেইনকে সিংহাসনে বসানো কিংবা টিকিয়ে রাখা একেবারে অসম্ভব। তমসাচ্ছন্ন এই দৃশ্যপটে কেবল দুটি আলোকরেখা লক্ষ্য করা যায়। ভিয়েনার অপেরা হাউস এবং জাতিপুঞ্জের প্রতিষেধক কর্মপন্থা। অথবা ১৯২২ সালের সংকটে এই নতুন প্রজাতন্ত্রটি দেউলিয়া হয়ে যেত।

ট্রিয়াননের সন্ধির শর্তানুসারে হাঙ্গেরির সঙ্গে যে আচরণ করা হয় তা ছিলো সামগ্রিক শান্তি ব্যবস্থার অংশবিশেষ। অবশ্য এক্ষেত্রে বিরাট ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। হাঙ্গেরীয়দের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয় স্লোভাকিয়া, ট্রানসিলভানিয়া এবং ক্রোয়েসিয়া। স্লোভাকিয়া হস্তান্তর করা হয় চেক প্রজাতন্ত্রের কাছে। রুমানিয়া ছিনিয়ে নেয় ট্রানসিলভানিয়া। সার্বো-ক্রোট-স্লোভেন রাজ্যের যুগোস্লাভিয়ার অংশ হয় ক্রোয়েসিয়া। ম্যাগিয়ার জাতির ছয়শত হাজার নারী-পুরুষ, সাবেক হাঙ্গেরিয় রাজ্যের সাড়ে চার মিলিয়ন প্রজা বৈদেশিক শাসনের অধীনে চলে যায়।[২] গর্বিত ম্যাগিয়ার অভিজাততন্ত্রের কাছে তাদের রাজ্য কুলমানহীন কিংবা অখ্যাত গণতন্ত্রের অধীনে চলে যাওয়া নিদারুণ অসহনীয় অবমাননা। ট্রানসিলভানিয়ার রমণীয় পার্বত্য অঞ্চল হারানোও ছিলো সম্মান দুঃখজনক ঘটনা। এই পার্বত্য অঞ্চল ছিলো ম্যাগিয়ার কুলপতির প্রমোদ ক্রীড়া ক্ষেত্র। কুলপতির আহত অনুভূতি আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি। স্কটিশ হরিণ বনের মালিক যেমন সহজে অভিনন্দন জানাতেন লানার্কে আইরিশ অভিবাসীদের মধ্যে উক্ত বনের বলপূর্বক বণ্টনের খবর।

---

১. ১৯২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাধাবাধকতাহীন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, তাতে জার্মানি যুদ্ধাপরাধ ধারাসহ ভার্সাই সন্ধির অনেক ধারা মেনে নেয়। অথচ এখন আপত্তি জানাচ্ছে।

২. এই সংখ্যাগুলি হয়তো খুব বেশি হাঙ্গেরীয় দাবির অনুকূলে যায়। হাঙ্গেরি সরকারের ১৯১০ সালের লোকগণনা অনুসারে নতুন রাষ্ট্রগুলিতে ম্যাগিয়ার জাতির অধিবাসীর সংখ্যা ২, ৯৪৫, ২৭৩।

তাহলে দেখা যায়, উক্ত সন্ধি বিভিন্ন ক্ষতের সৃষ্টি করে। অস্ট্রিয়া প্রজাতন্ত্র এখন অতি ক্ষুদ্র, এতটা দুর্বল যে একলা চলতে অপারগ। অথচ সে জাতিপুঞ্জের সম্মতি ব্যতিরেকে জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে না। রয়ে গেল স্থানান্তরিত ম্যাগিয়ার জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা, রয়ে গেল প্রেসিডেন্ট উইলসনের পয়দা পোল্যান্ড, তার করিডোর ও সাইলেসিয়া সংক্রান্ত বিবাদসহ। পরাধীন হলো ২৩০,০০০ জার্মান টাইরলের অধিবাসী। ১,৩০,০০০ যুগোস্লাভ চলে গেল ইতালীয় শাসনের অধীনে। ইউপে ও ম্যালমেডি নামক দুটি বনস্থল জার্মানদের অধিকার থেকে কেড়ে বেলজিয়ামকে দেয়া হয়। অঞ্চল দুটি অতি ক্ষুদ্র, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জার্মানরা বড় মাপের আঘাত পায়। তাছাড়া সার জেলা সাময়িকভাবে জাতিপুঞ্জের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তবু সঠিক পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে দেখলে, এতসব ত্রুটি সত্ত্বও এই প্রথম বারের মতো ইউরোপের মানচিত্র অংকন করা হয় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনজাতিগোষ্ঠীগুলির দৃষ্টিভঙ্গি বা ইচ্ছানুসারে। ইতিপূর্বে কোনো সময় সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ইচ্ছার মর্যাদা এতটা দেয়া হয়নি। একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

তথাপি, Galeie des Glaces-এ যখন ভার্সাই সন্ধির দলিলে চূড়ান্ত স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় (যেখানে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে হোয়েনজোলার্ন সাম্রাজ্যের পক্ষে ঘোষণা দেয়া হয়) তখন সবাই অনুভব করেন যে একটা সুবর্ণ সুযোগ হাত-ছাড়া করা হলো। রাষ্ট্রবিদদের সবাই ঘটনাবলির গুরুত্ব সমান উপলব্ধি করেন নি। তারা শান্তির জন্য একটা দলিলে স্বাক্ষর করেন, তবে এটা কোনো শান্তি নয়। আমেরিকার আদর্শবাদীরা সন্তুষ্ট ছিলেন যে রেড ইন্ডিয়ান এবং আফ্রিকানদের ক্ষেত্রে আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার মতবাদ লঙ্ঘন করা হবে। তারা হাত মেলায় ইংরেজ আদর্শবাদীদের সঙ্গে। শেষোক্ত ব্যক্তিরা ভারত বা মিশর ছেড়ে চলে আসতে প্রস্তুত নয়। অথচ এই দুই পক্ষই সন্ধিসমূহে আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার মতবাদ প্রশ্নে সামান্য ত্রুটি থাকায় জোর নিন্দা জ্ঞাপন করে। সর্বত্র অনুভব করা হয় যে মানব প্রকৃতির পরাজয় ঘটেছে। ইউরোপ মহাদেশকে গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করা হয়নি। বিজয়ের উজ্জ্বল উল্লাস অবিলম্বে মোহমুক্তি, বিক্ষোভ এবং নিদারুণ নৈরাশ্যের কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়।

সন্ধি প্রণেতাদের সাফল্য ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান সম্ভব নয়। তারা যে সব নতুন রাষ্ট্রগঠন করে সেই রাষ্ট্রগুলি কতোটা সাফল্য অর্জন করতে পারে তা দেখে আমরা হয়তো বিচার করতে পারবো। এই রাষ্ট্রগুলি হলো নতুন পোলান্ড, নতুন রুমানিয়া, নতুন যুগোস্লাভিয়া এবং নতুন গ্রিস। এখন থেকে একশো বছর পর ইতিহাসবিদগণ সঠিক বিচার করতে পারবেন। আমরা সর্বাধিক সংঘর্ষ ও অস্বাচ্ছন্দের ভেতর দিন যাপন করছি (যখন যুদ্ধের আবেগ এতটুকু প্রশমিত হয়নি, সংখ্যালঘুরা নতুন প্রভুদের অধীনে ব্যাথায় কুঁচকে উঠছে, কিংবা অপমানে সঙ্কুচিত হচ্ছে), এদিকে নতুন রাষ্ট্রের দেখভাল প্রকৃত প্রস্তাবে শুরু হয়নি। নবগঠিত রাষ্ট্ররথের উৎসে অভ্যাসের তৈল নিকেষ শুরু হয়নি, তাদের পক্ষে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কোনো প্রকার অনুমান করা সম্ভব নয়।

সবাই আশা করতেন এবং মিত্রপক্ষগুলির মধ্যে আশাটা খুব প্রবল ছিলো যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবে না (এই সন্ধিপত্রের রূপদান করা হয় প্রধানত প্রেসিডেন্ট উইলসনের আদর্শ অনুসারে) সে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করবে। আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা সমস্যার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের ধারণা ছিলো মার্কিন রাষ্ট্রবিদের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য অবদান। এই দুটি ক্ষেত্রেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের প্রত্যাশাকে অসীম প্রমাণ

করে আমেরিকা যেমন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেনি, তেমনি যোগ দেয়নি জাতিপুঞ্জে। অতএব, এই আশা করা হয়েছিলো জাতিপুঞ্জ লীগের ব্যাপারে আমেরিকান সহযোগিতা পাওয়া যাবে, ফ্রান্সকে আংলো-আমেরিকান নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে, জাতিপুঞ্জের সদস্য হিসেবে আমেরিকা যুদ্ধের সূচনাকারী দেশের অর্থনৈতিক বোঝা লাঘব করবে, তার একটিও বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ আমেরিকান ইতিহাস এবং আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি আরো একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে ইউরোপীয়রা হুঁসিয়ার হতে পারতেন যে, ইংল্যান্ডের যেমন প্রয়োজন জার্মানরা বেলজিয়াম থেকে প্রত্যাহার করুক, কিংবা ফ্রান্স যেমন আলসেস ও লরেন ফিরে পেতে চায়, তেমনি আমেরিকার জন্য স্বাভাবিক হলো ইউরোপ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা যখন লঙ্ঘন করা হয় তখন আমেরিকা যুদ্ধে শরিক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি, লুসিতানিয়া জাহাজ ডুবিয়ে দেবার পরও নয়। জার্মান ডুবোজাহাজগুলি মার্কিনী বণিকদের জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া শুরু করলে আমেরিকা যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই বেয়াদবির শাস্তি প্রদানের জন্য তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। শাস্তি প্রদানের পর তারা ইউরোপীয় ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়ার অভ্যাসে ফিরে যায়। এই অভ্যাস তারা ঐতিহ্য হিসেবে অর্জন করে জর্জ ওয়াশিংটনের কাছ থেকে। বাস্তবিকই প্রেসিডেন্ট উইলসন ছিলেন আদর্শবাদী, কিন্তু তিনি নিজের দেশেই ছিলেন প্রায় নিঃসঙ্গ।

আমেরিকায় তখন রিপাবলিক্যান প্রতিক্রিয়ার ভরা জোয়ার চলছে। ইউরোপের দিকে সরাসরি পিঠ দিয়ে, আমেরিকানরা এখন স্বদেশের গৌরবে সন্তুষ্ট। তার সম্পদ, ধনলিপ্সার স্বপ্ন বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে, অবশ্য, ক্ষত-বিক্ষত দুনিয়ার উপর সে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অতঃপর একটা ভয়ানক সমস্যার আবরণ উন্মোচিত হয়। কেন্দ্রীয় শক্তিগুলি একটি জোটের কাছে পরাস্ত হয়, হয়তো এরকম ঘটনা ভবিষ্যতে আর ঘটবে না। এই জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিলো সাতাশটি দেশ। যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য এর অন্তর্ভুক্ত ; দুটি সিভিলিয়ান রাষ্ট্র। এই দুটি রাষ্ট্র যুদ্ধ চলাকালে বাহিনীর প্রভূত উন্নতি সাধন করে। এদের সমন্বিত সামরিক প্রচেষ্টা, অন্য কিছু নয়, সে সময়ের জন্য জার্মান সমরযন্ত্রের ধ্বংস সাধন করে। জার্মানি এখন ইউরোপের জনগণকে সন্ত্রস্ত করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু আমেরিকা এখন ইউরোপ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে, ইংল্যান্ড অনুভূতির বিরল একাত্মতার সাহায্যে বর্জন করেছে বাধ্যতামূলক সেনাদলে ভর্তির আইন, খাটো করে ফেলেছে তার স্থল ও নৌবাহিনী, ইতালি অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলে বিপর্যস্ত। ফ্রান্স নিজেকে বোধ করছে সহায়শূন্য, সে নিরস্ত্র জার্মানির মুখোমুখি বটে, কিন্তু এই জার্মানি ক্ষুব্ধ, অবাধ্য অপকর্মের জন্য পুরোপুরি সম্ভাবনাময়। অতএব ফ্রান্স নিজেকে ইউরোপে পুলিশী দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্র বলে মনে করে। শান্তিচুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনজীবন ব্যবস্থা সচল রাখা তার দায়িত্ব। জেনেভায় সে কিছু বন্ধু পায়। বেলজিয়াম ও পোল্যান্ড তার বন্ধু হিসেবে এগিয়ে আসে। এগিয়ে আসে আরো তিনটি রাষ্ট্র, যে তিনটি রাষ্ট্র অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের পতনের দরুন বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। এরা এখন যুদে জাজত (petite Entente) নামক শক্তিজোটের অন্তর্ভুক্ত। এই ছোট বড় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ফ্রান্স বিশেষ রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা যে জোট গঠন করে তা পূর্বাঞ্চলে জার্মান জাতিসমূহের বিরুদ্ধে শক্তি হিসেবে রাশিয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়।

যাহোক, জাতিপুঞ্জের ইংরেজ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান প্রবক্তারা ইউরোপের ভবিষ্যৎ ঠিক এভাবে বিচার করতেন না। তারা যে বিপদ এড়ানোর জন্য নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে বাস করেন তা হলো ইউরোপ যেন ফের দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে না যায়, যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি গোষ্ঠীতে পরিণত না হয়। এরা শুধু অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করে যাবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে, এটা মোটেই কাম্য নয়। পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি নবগঠিত, প্রায় স্থিতিহীন, প্রজাতন্ত্রী রাশিয়ার অনিশ্চিত বাহিনীর সন্নিকটবর্তী, অতএব তারা যে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা মোটেই সন্তোষজনক নয় যে তাদের এই প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনটা বোধ করতে হবে। তারা চায় যে সমরসম্ভার একটা সঠিক সংগঠনের অধীনে সমষ্টির নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং কোনো বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিলে তা মিটিয়ে ফেলা হবে সালিসী কিংবা সমঝোতার মাধ্যমে।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই যুদ্ধের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে বৃটেনের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মুনাফা ব্যতিরেকে সে দেশের লোকদের মুখের অন্ন জোটাতে পারে না। এখানে খুব জোরের সঙ্গে, এমনকি ফ্রান্সের চেয়েও, প্রচার ও বিশ্বাস করা হয় যে যুদ্ধ সূচনা করা হয়েছে, সকল যুদ্ধের অবসানের জন্য। যুদ্ধের জন্য নয়, শান্তির জন্য সংগঠিত একটি বিশ্বের স্বপ্ন মানুষ প্রায়ই দেখে, এবং প্রায়ই তাদের হতাশ হতে হয়। এই স্বপ্ন আরো একবার মানুষের মনে নবজীবন লাভ করে। যুদ্ধের সুগভীর যন্ত্রণার পর জাতিপুঞ্জের চুক্তিপত্র অধিকাংশ ইংরেজের মনে সান্ত্বনা ও আশার ক্ষীণ আলো জাগাতে সক্ষম হয়।

জাতিপুঞ্জের গুরুত্ব এখানে যে এটি বিশ্বের কাছে এমন একটি বিশ্ব সরকার প্রস্তাবিত করে, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। চুক্তিপত্রের প্রণেতাগণ সাব্যস্ত করেন যে জাতীয় রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা অগ্রাহ্য করার জন্য একটি অতি-রাষ্ট্র সৃষ্টি করা কোনো কাজের কাজ হবে না। ফলে তারা এমন ধারণা বাতিল (ধারণাটি ফ্রান্সে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে) করেছেন যে জাতিপুঞ্জের অধীনে একটা সেনাবাহিনী কিংবা একটা পুলিশ বাহিনী থাকবে। কিংবা এমন একটি পূর্ব নির্দিষ্ট উপায় থাকবে যা দিয়ে কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে বাইরের কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য করা যাবে। কোনো লেখা বা কোনো খেতাব লঙ্ঘন করার চেয়ে চুক্তিপত্রের প্রণেতাগণ চেয়েছেন যে তাদের প্রতিষ্ঠান হবে জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের সঙ্ঘ, এবং প্রতিটি দেশ, সে যতোই গুরুত্ববর্জিত হোক না কেন, সমান সুবিচার এবং সুবিবেচনা লাভ করবে। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ বিশেষাধিকার সংরক্ষণ করা হবে। এর জন্য বিধান থাকবে যে জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

অতীতে কতোবার সদিচ্ছাপ্রণোদিত লোকেরা মিলিত হয়েছেন শান্তির সম্ভাবনা সম্প্রসারণের পক্ষে কাজ করার জন্য এবং প্রভূত বাগ্মিতা করার পর পুণ্যবান প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন যে অতঃপর কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। সবশেষে সবাই বাড়ি ফিরেছেন কিছুই না করে। জাতিপুঞ্জ হবে এইসব ক্ষণস্থায়ী এবং অকার্যকর চিন্তা-ভাবনা থেকে ভিন্ন। এটি হবে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সরকারগুলি হবে এর পৃষ্ঠপোষক, আন্তর্জাতিক কাজ কারবার সম্পাদন করা হবে এর লক্ষ্য। একটি সংসদ থাকবে এটি সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে, প্রতি বছর এক মাসের জন্য জেনেভায় মিলিত হবে, আর থাকবে একটি পরিষদ (কাউন্সিল), এর সদস্য সংখ্যা হবে ৯ (বৃহত্তর দেশগুলি থেকে পাঁচ জন সদস্য নেয়া হবে), এরা যখন তখন অধিবেশন ডাকতে পারবে, কিন্তু সংসদ ও পরিষদের কাজ কারবার

নির্বাহ করবে একটি আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস বা সচিবালয়। পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি সংগঠন এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়, সারা বিশ্বে শ্রমিকদের মধ্যে সমতা বিধানের জন্য গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর। এবং হেগ নগরীতে স্থাপন করা হয় একটি আন্তর্জাতিক আদালত। সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পিত এই বিশ্ব সরকারযন্ত্রের জন্য কোনো দেশ ইচ্ছেমতো অবদান রাখতে পারে।

চুক্তিপত্রের অন্তঃসার হলো : প্রতিটি সদস্য-দেশ তাদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য জাতিপুঞ্জের দরবারে হাজির হতে বাধ্য। এর আগে সে অস্ত্র ধারণ করতে পারবে না। চুক্তিপত্রে যুদ্ধের সম্ভাবনা বাতিল করে দেয়া হয়নি, তবে বিচার সভার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে (পরিষদ ও বিচারালয়)। সংশ্লিষ্ট পক্ষ বিচারসভাকে বিবাদ সম্পর্কে অবহিত করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটা সময় বেঁধে দেবে (কারণ জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে)। অন্তর্বর্তী কালে বিক্ষুব্ধ পক্ষ শান্তি বজায় রাখবে। জাতিপুঞ্জ যদি সার্বজনীন হয়, সদস্য রাষ্ট্রগুলি যদি চুক্তিপত্র অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহলে সমঝোতা, সালিসী এবং ইত্যাদি যেসব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাতে দুনিয়া থেকে যুদ্ধের ভূত দূর হবে।

জাতিপুঞ্জকে অপর একটি দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সদস্য দেশগুলির সম্মতিক্রমে এবং ক্রমান্বয়ে বিশ্বের সমর সম্ভার কমিয়ে ফেলা। প্রতিযোগিতামূলক অস্ত্রসজ্জার অমঙ্গল বিষয়ে সবাই এক মত হন, অস্ত্রের বোঝার জন্য সবাই দুঃখ প্রকাশ করেন, অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনের অধিক অস্ত্রসজ্জায় নিয়োজিত হওয়া উচিত নয়, এই তত্ত্ব সবার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কিন্তু সমস্যা হলো এই নীতিগুলি কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায়। এদিকে জার্মানি বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণের জন্য অস্থির বোধ করছে, ফ্রান্স ভয় পায় সে হয়তো সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের সামনে যথেষ্ট নিরাপদ নয়। অতএব দেখা যায় যে, জাতিপুঞ্জের সুদৃঢ় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ১৯৩৫ সালে ইউরোপ যে অস্ত্রের চাপ অনুভব করেছে তা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ঢের কম ছিলো।

শান্তি পর্বে সব ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য চুক্তিপত্রে আরো কিছু সুফলপ্রসূ চিন্তা-ভাবনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটিই যথেষ্ট নয় যে সদস্য রাষ্ট্রগুলি শুধু অস্ত্র পরিহার করবে, কূটনীতির পথ বেছে নেবে, কিংবা অস্ত্র ভাণ্ডার হ্রাস করবে। তাদের শিখতে হবে মিলেমিশে জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে কাজ করার নিয়ম। তাদের শুধু মানবতার জন্য বড় ধরনের দায়িত্ব পালন করলে চলবে না, বরং সব ধরনের অভিন্ন স্বার্থে তাদের কাজ করতে হবে। যেমন শ্রমিক শ্রেণীতে জীবনের মান বজায় রাখতে হবে, নারী ও শিশু ব্যবসা রোধ করতে হবে, কিংবা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অহিফেন ব্যবসা, কিংবা আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। হয়তো এই লোকহিতকর ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ সর্বাধিক সাফল্য কুড়াতে পারবে।

নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের অবসানে ভিয়েনা সম্মেলন (Congress of Vienna) দাস ব্যবসা বিলোপের প্রশ্ন উত্থাপন করে। অনুরূপ মনোভাব থেকে চুক্তিপত্রের প্রণেতাগণ সচেতন হন যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দায়িত্ব রয়েছে তাদের মাঝে বসবাসকারী জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের প্রতি। এদের প্রতি সুনজর দিতে হবে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য মহাদেশের যেসব দুর্বল ও পশ্চাদপদ শ্রেণী তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে তাদের প্রতিও শাসক তার সকল ক্ষমতা

প্রয়োগ করবে শান্তির মঙ্গলের জন্য, ন্যায় রক্ষকের এই যে নীতি, এই নীতির সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচিত। এই নীতি (রোমান আইনের পরিভাষা থেকে গৃহীত) নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় মিত্রপক্ষ কর্তৃক জার্মান ও তুর্কদের কাছ থেকে নেয়া ভূ-খণ্ডগুলির ক্ষেত্রে। অধিকৃত ভূ-খণ্ডগুলিকে (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) মিত্রপক্ষ ও সহযোগী শক্তিগুলি আজ্ঞাধীন বলে গণ্য করে, আর যে দেশগুলির অধীনে ভূ-খণ্ডগুলি ছিলো তার আজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশ। এদের কাজ হবে নির্ধারিত সময় বিরতি দিয়ে জাতিপুঞ্জ কমিশনের কাছে প্রতিবেদন পেশ করা। প্রতিবেদনে আজ্ঞাধীন দেশের হাল-হকিকতের পূর্ণ বিবরণ থাকবে। এই ব্যবস্থা যে গ্রহণ করা হলো এবং এতে সবাই সম্মতি প্রদান করলো তা আন্তর্জাতিক নৈতিকতা উন্নতির সুস্পষ্ট লক্ষণ।

প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক কাঠামো তৈরির কাজে মনোনিবেশ করে প্রেসিডেন্ট উইলসন এবং তাঁর ইংরেজ সহযোগীরা একটি শান্তি সংস্থা গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এর অন্তর্ভুক্ত বিশ্বের সকল জাতি। অ্যাংলো-স্যাকসন জাতি এর সুদৃঢ় কেন্দ্রীন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সরকার এবং যুক্তরাষ্ট্র এর প্রধান হাতিয়ার ও প্রভাব। কিন্তু এই বৃহৎ স্বপ্নগুলি অচিরে বিনষ্ট হয়। ১৯২০ সালের শরৎকালে জেনেভায় যখন এই সংস্থার সংসদের অধিবেশন প্রথম ডাকা হয় তখন দেখা গেল মাত্র চুয়াল্লিশটি দেশের প্রতিনিধিরা হাজির হয়েছে। রাশিয়া দূরে সরে থাকে। জার্মানি, তুরস্ক এবং অন্যান্য সাবেক শত্রু দেশগুলিকে সদস্যপদে বরণ করার যোগ্য বিবেচিত হয়নি। তবে সব চেয়ে বড় আঘাত আসে এমন একটি তরফ থেকে যে তরফ অনুপস্থিত থাকে। অথচ এই তরফের সম্মতি ছাড়া অপরাধী সদস্যদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা সম্ভব নয়। উপরন্তু এই তরফের নিরপেক্ষতার উপর খুব বেশি আস্থা স্থাপন করা হয়। প্রেসিডেন্ট উইলসনের সাফল্য তাঁর নিজের দেশেই অগ্রাহ্য করা হয়। আমেরিকা জাতিপুঞ্জে যোগ দিতে অস্বীকার করে।

জাতিপুঞ্জ কখনো তার সদস্য দেশগুলির চেয়ে উন্নত হতে পারে না। সদস্য দেশগুলি যদি শান্তি প্রত্যাশা করে তাহলে সংস্থাটি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যাতে শান্তি অধিকতর নিরাপদ হয় এবং বজায় থাকে। কিন্তু জাতিপুঞ্জের অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক, যদি কোনো দেশ যুদ্ধ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তাহলে সে যে কোনো সময় যুদ্ধের সূচনা করতে পারবে। যতক্ষণ না মানুষ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করবে যে আধুনিক যুদ্ধ সভ্যতার জন্য মহাবিপদ ডেকে আনে, এতটা যে একে অপরাধ বলে গণ্য করতে হয় এবং এর জন্য সমুচিত শাস্তি ভোগ করতে হবে (কারণ একটি দেশ স্বীয় স্বার্থের জন্য যুদ্ধের সূচনা করে) ততদিন মানুষ কার্যকরভাবে যুদ্ধের হুমকি থেকে মুক্ত হবে না। বর্তমান মুহূর্তে মানুষ এই প্রশংসাযোগ্য ও বুদ্ধিমান বিশ্বাস অনুসারে চলার জন্য প্রস্তুত নয়। এ ধরনের বিশ্বাস পোষণও করে না।

ইত্যবসরে জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক চরিত্রের অনেকগুলি কার্য সম্পাদন করে, যার জন্য বিকল্প কোনো ব্যবস্থা ছিলো না, এবং না থাকলেও তা উদ্ভাবনের দরকার করেনি। জেনেভায় প্রাদুর্ভূত বহুজাতিক সলাপরামর্শের আবহের সঙ্গে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রবিদরা পরিচিত এবং অভ্যস্ত হন। সচিবালয় এমনভাবে গঠিত হয় যে তা আস্থার ভাব সৃষ্টি না করে পারে না। প্রতিদিন কাজের পরিমাণ বাড়ে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কয়বছর সংসদে জাতিপুঞ্জের আদর্শ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করেন রবার্ট সিসিল। তাঁর

ভাষণে লক্ষ্য করা যায় দৃঢ়তা এবং আস্থা। রবার্ট সিসিল ছিলেন চুক্তিপত্রের অন্যতম প্রণেতা। জেনেভায় বার্ষিক সাধারণ সভায় ক্ষুদ্র দেশগুলির প্রধান নেতারা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখতে পারেন। এখানে বেলজিয়ামের হিমান্স, সুইডেনের ব্রান্টিং, নরওয়ের নানসেন, সুইজারল্যান্ডের মোট্টা, চেকোস্লোভাকিয়ার বেনেস, গ্রিসের পলিটিস ইউরোপীয় সাধারণতন্ত্রের জন্য অবদান রাখেন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, জাতিপুঞ্জের আন্তর্দেশনমূলক বন্ধুত্ব গঠনের ক্ষেত্রে বিরাট সুযোগের সৃষ্টি করে, বিভিন্ন ধারণা তুলনা প্রতি-তুলনার সুযোগ ঘটে, জ্ঞানের প্রসার ত্বরান্বিত হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির ও সুযোগ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক জীবনের প্রবল ঝাঁকুনি এবং পীড়নের মধ্যে জেনেভায় প্রতি বছর এক মাসের ঠাণ্ডা সমঝোতা, যুদ্ধংদেহী জাপানিদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও, খ্রিস্টমাস দিবস কিংবা অনেকটা সৃষ্টিকর্তার মধ্যযুগীয় যুদ্ধবিরতি বলেই মনে হয়।

তবু জাতিপুঞ্জ প্রথম পনেরো বছর নানা ক্ষেত্রে সেবা করলেও, আমরা দেখেছি, ইউরোপে নৈতিক কিংবা বাস্তবিক কোনো প্রকার নিরস্ত্রীকরণের সূচনা করতে পারেনি। যদিও কিভাবে সামরিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফরাসি দাবির সঙ্গে জার্মানির সমান সুযোগের দাবির সমঝোতা করা যায় তা নিয়ে বিস্তর পরিশ্রম করা হয়েছে, তবু জার্মানির বৃহত্তর জনসংখ্যা এবং উচ্চতর জন্মহারের জন্য সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি। বৃটেন ছাড়া অন্য কোথাও স্থল বাহিনীর সমরসম্ভার হ্রাসের আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। বৃটিশ শান্তিবাদের সঙ্গে সুর মেলায়নি প্যারিস, বার্লিন, রোম, মস্কো কিংবা টোকিও-র সরকার। ইতালির ফ্যাসিবাদী প্রভু বলপ্রয়োগে বিশ্বাসের কথা জানাতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যদিও সমঝোতা করেছে জাতিপুঞ্জের সঙ্গে, তবে সে সদা প্রস্তুত রেখেছে নব্বই চল্লিশ হাজার সৈনিক। জাপান ও জার্মানি জেনেভা থেকে হাত গুটিয়েছে। ১৯৩৫ সালে তৃতীয় জার্মান রাইখ, এক যুগেরও অধিক সময় গোপনে অবৈধভাবে অস্ত্রসজ্জা চালিয়ে যাবার পর এখন খোলাখুলি বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদাননীতি গ্রহণ করছে এবং জগতের সামনে প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তি হিসেবে হাজির হয়েছে।

নিরস্ত্রীকরণের একমাত্র সত্যিকার ভিত্তি হতে পারে রাজনৈতিক অভীষ্ট সম্পর্কে সাধারণ সম্মতি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমস্যা ব্যাপারে এ ধরনের সাধারণ সম্মতিতে পৌঁছা সম্ভব হয়েছিল ১৯২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং জাপানের মধ্যে। এতে বড়ো ধরনের নিরস্ত্রীকরণের পটভূমি তৈরি হয়। কাজ করে কূটনৈতিক পন্থা। চারটি বৃহৎ শক্তি যখন আবিষ্কার করেন যে, তারা সবাই চীনের ব্যাপারে মুক্ত দ্বার নীতির পক্ষপাতী এবং দেশটির আঞ্চলিক অখণ্ডতা সুরক্ষায় আগ্রহী, তখন নৌ নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা অনেকটা সহজ হয়ে আসে। যখন দেখা গেল রাজনৈতিক বিভেদের কোনো স্থান নেই, তখন চার প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ শক্তি বাহিনীর অনুপাত ব্যাপারে সম্মত হওয়া সম্ভব মনে করেন। প্রধান যুদ্ধ জাহাজের আকৃতি হ্রাসের ব্যাপারেও তাদের মধ্যে ঐকমত্য হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালে জাপান যখন মিত্রদের থেকে সম্পর্কছেদ ঘটায়, এবং একক প্রচেষ্টায় চিনের একটি প্রদেশ দখল করে তখন ওয়াশিংটন সন্ধিতে অন্তর্ভুক্ত নৌ নিরস্ত্রীকরণের গোটা পরিকল্পনা বিপদের সামনে দাঁড়ায়। বস্তুত জাপান বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ না করে ঘোষণা দেয় যে সে ১৯৩৬ সালের পর উক্ত সন্ধি নবায়ন করবে না। জাপান বৃহত্তর ও বিতর্কিত নীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছে চীন সম্পর্কে, এর জন্য তার বিশাল নৌ বাহিনীর প্রয়োজন।

রাজনৈতিক অতীষ্ট ব্যাপারে ইউরোপে এখনো কোনো প্রকার ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। জার্মানি চায় অস্ট্রিয়াকে আত্মসাৎ করতে। ইতালি ও ফ্রান্স স্বাধীন অস্ট্রিয়া দেখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এক গভীর অনুভূতি ও পন্থা ন্যাৎসিদের (জাতীয় সমাজতন্ত্রী) সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসকদের ব্যবধান রচনা করেছে। যে বছর সার উপত্যকা জার্মানদের হাতে ফিরে যায়, সে বছর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো সুখের বার্তা বহন করেনি, বরং ইউরোপের আকাশে জমা হয়েছে ঝড়ের কালো মেঘ। মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর এতদিনে কালো মেঘ এতটা ঘন হয়ে আর কখনো দেখা দেয়নি।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলি

Winston Chwrchill : The worl crisis 1923.
Harold Nickokson : Peace Making.
F.H. Simonds : How Europe made reace without America 1923.
J.M.Keynes: The Economic consequences of Reace, 1919.
H. willson Horvis : The league of Nations 1929.

তুরস্কের রূপান্তর

ভেনিজেলোস স্মরণনায় শ্রীকদের অবতরণ। মুস্তফা কামাল। সিভাস চুক্তি এবং গ্রিক-তুর্কি যুদ্ধ। এশিয়া মাইনরে শ্রীকদের বিপর্যয়। নিকট প্রাচ্য সমস্যার নতুন দিক। লয়েড জর্জ সরকারের পতন। লুসান সন্ধি। নবা তুরস্ক।

শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য যেসব মেধাবী ব্যক্তি প্যারিসে এসেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন ভেনিজেলোস। ইনি ছিলেন ক্রিট দ্বীপের অধিবাসী। সে কালে তাঁর মতো কম রাষ্ট্রনায়কই বিরাট বিরাট বাধা অতিক্রম করেছেন। স্বদেশী পার্বত্যাঞ্চলে অনিয়মিত বাহিনীর নেতা হিসেবে কিংবা বলকান লিগের দক্ষ কারিগর হিসেবে, কিংবা মহাযুদ্ধে আঁতাত শক্তির সঙ্গে মৈত্রীর প্রবক্তা হিসেবে। ভেবে দেখতে হবে, সে সময় এথেনীয় রাজদরবারের সমস্ত প্রভাব, পেলিপনিজ এবং আয়োনীয় দ্বীপবাসীদের সমগ্র দাবি বিপরীত পক্ষের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ভেনিজেলোসের দিগন্ত ছিলো বিস্তৃত, তাঁর বাগ্মিতা এবং আকর্ষণ ছিলো নজরকাড়া, তবে ঔদ্ধত্য ও সূক্ষ্মতা, সবই কাজে লাগান স্বীয় উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য। প্রথম থেকেই তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষ জয়ী হবে, আর গ্রিস যদি মিত্র পক্ষের হয়ে কাজ করে তবে সেটা তার স্বার্থের অনুকূলে যাবে। যদি দার্দেনলেসে গ্রিক বাহিনী বৃটিশ পক্ষের পাশে না দাঁড়িয়ে থাকে, কিংবা সার্বীয় বাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে না এসে থাকে, যখন উক্ত বাহিনী আলবানীয় পাহাড় অঞ্চলে চরম বিপর্যয় বরণ করে, সেটা তাঁর ত্রুটি নয়। এবং যদি অন্তিম লগ্নে, ফরাসি নৌবাহিনী কর্তৃক রাজা কন্সট্যান্টাইনকে বিতাড়নের পর দুই শত পঞ্চাশ হাজার গ্রিক সেনা বুলগারদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ে শরিক হয়ে থাকে তার জন্য তারিফ করতে হয় ভেনেজেলোসের। এই মেধাবী ব্যক্তিটি স্বীয় প্রবর্তনায় স্যালোনিকাতে ফিরে হন এবং মিত্রপক্ষের সমর্থক সরকার ও সেনাবাহিনী গঠন করেন। অথচ এথেন্সের রাজদরবার এবং মন্ত্রিসভা তখনও জার্মানদের প্রবলভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে। অর্থাৎ মিত্রপক্ষের হয়ে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। এখন এসেছেন প্যারিসে শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য। এখানে তিনি বড়ো ধরনের পুরস্কার প্রত্যাশা করার যৌক্তিকতা রাখেন।

মিত্রপক্ষের কর্মপন্থার অন্যতম স্বতঃসিদ্ধ এই ছিলো যে ইউরোপীয় তুরস্কের যা কিছু গ্রিক ভাষা ও গ্রিক জাতির সঙ্গে একই সমতলে বলে বোধ হবে তা গ্রিসের হাতে অর্পণ করা হবে। থেসালি, ম্যাসিডোনীয়া, পূর্ব থেস নিয়ে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। জটিলতা সৃষ্টি হয় এশিয়া মাইনর প্রশ্নে। এখানে বিস্তৃত উপকূল এলাকা জুড়ে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়েক মিলিয়ন গ্রিক বংশজাত অধিবাসী। এদের কেউ ব্যাংকার, নাবিক কিংবা দোকানদার। কেউ কেউ তামাক, দ্রাক্ষা কিংবা ধান উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। কারো পেশা গালিচা তৈরি। এদের অবস্থা গভীর উদ্বেগের কারণ হয়। আনাতোলিয়ায় তুর্কি ক্ষমতা এখনো অনবসিত।

যদিও বৃটিশ বাহিনী সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মেসোপটেমিয়া তুরস্কের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে এবং মিত্র বাহিনী কন্সট্যান্টিনোপল এবং প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু এশিয়া মাইনরে (এটিই প্রকৃত তুরস্ক) খ্রিস্টান বিদ্বেষ তীব্র আকার ধারণ করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এক মিলিয়ন আর্মেনীয় জীবন ক্রিসেন্টের হাতে বলি হয়। আশংকা করা হয় যে এরপর স্মির্নে গ্রিকদের পালা। অতএব ভেনিজেলোস বৃটিশ ও ফরাসি প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি লাভ করেন স্মির্নায় অবতরণের জন্য। আরো আশংকা করা হয় যে অনাথায় উক্ত নগরী ইতালির কব্জায় চলে যেতে পারে। আর আশা করা হয় যে যদি চরম বিপর্যয় ঘটে তবে এখানে এশীয় গ্রিকদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। এইখানে হিসাবের বিরাট ভুল হয়। স্মির্নায় ইতালীয়দের হয়তো সহ্য করা হতো, কিন্তু গ্রিসের ঘৃণ্য পতাকা এশিয়া মাইনরের কোনো অংশে উড়বে, এটা যে কোনো দেশপ্রেমিক তুর্কির কাছে সহ্যের অতীত বেয়াদবি। ১৯১৯ সালের ১৫ এপ্রিল মাসে গ্রিকরা স্মির্নায় অবতরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হয় হিংস্রতম এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তুর্কি মেজাজ। "দার্দেনেলেসের ত্রাসকর্তা", তুর্কি সেনাবাহিনীর সবচেয়ে মেধাবী অফিসার মুস্তাফা কামাল পরাস্ত সাম্রাজ্যের ছিন্ন-ভিন্ন অংশ যুক্ত করে নতুন ও স্বাধীন তুর্কি রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ পেয়ে যান।

মুস্তাফা কামালের বয়স এখন আটত্রিশ। লোকটি হিংস্র, অবাধ্য, ঝগড়াটে প্রকৃতির, দৈহিক কাঠামো ধাতব (কারণ যদিও সলনিকাতে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তিনি আনাতোলীয় বলিষ্ঠ কৃষককুলের জাতক), মনোবল ইস্পাতকঠিন। তাঁর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ছিলো শোচনীয়, বিচেতন এবং অত্যুগ্র। এটি তিনি অর্জন করেন বীর জাতিগোষ্ঠীর পরম্পরা থেকে। কিন্তু তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা, ঘটনাবলী স্বাধীনভাবে চিন্তার ক্ষমতা, তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা ছিলো স্বোপার্জিত। তুরস্ক কেবল তুর্কিদের জন্য, এটি ছিলো তাঁর গোটা জীবনের মূলমন্ত্র। যুবা বয়সে তিনি আব্দুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। এটি তিনি শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগবশত করেন নি। তিনি আব্দুল হামিদকে গদিচ্যুত করায় প্রণোদিত হন এ জন্য যে, তিনি দেখতেন রেড সুলতানের অধীনে তাঁর দেশ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, দেশটিতে বিদেশী গুপ্তচরের অতিরিক্ত আনাগোনা, দেশটি বিদেশীদের অবাধ শিকারক্ষেত্রে পরিণত। পুরাতন পক্ষাঘাতগ্রস্ত শাসন ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত করা গেলে হয়তো দেশটি আবার সবল ও স্বাধীন হতে পারবে। মুস্তাফা কামাল বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন। যেমন, লেবানন, ত্রিপোলি, বলক্যান অঞ্চল এবং সিরীয় সীমান্তে। এতে তিনি মানুষ এবং অন্যান্য বিষয়ে বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি এনভারের প্রতি ঈর্ষা বোধ করতেন। এই এনভার ছিলেন মেধাবী এবং জার্মানপন্থী। মুস্তাফা কামাল অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে এনভারের কর্মপন্থার সমালোচনা করতেন। উক্ত কর্মপন্থার জন্যই তুরস্ক জার্মানির ক্রীড়নকে পরিণত হয়। এতটা বুদ্ধিমান একজন লোক চলতি ঘটনাবলির বৃহত্তর তাৎপর্য সম্পর্কে চোখ বুজে থাকতে পারেন না। মহাযুদ্ধ থেকে মুস্তফা কামাল এই শিক্ষা গ্রহণ করেন যে তুরস্ক যুদ্ধে পরাজিত হয় পশ্চিমের চোখ রাঙানি সহ্য করে বলে। তাছাড়া দেশটি প্রগতিবিমুখ এবং বর্বর অবস্থায় রয়ে গেছে, এবং অ-তুর্কী জাতিসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে দেশের সম্পদের অপচয় করে হতবল হয়ে পড়েছে। এর নিদান হলো বিদেশীদের প্রভাব থেকে মুক্তি, অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন এবং আদি তুর্কি আবাসভূমিতে অন্তঃকেন্দ্রিক তুর্কি জাতীয়তাবাদের শিক্ষা সম্প্রসারণ। এনভার ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের পুরাতন ধরনের

উচ্চাভিলাষী সাম্রাজ্যবাদ মুখ থুবড়ে পড়েছে, একে আর গতিশীল করা যাবে না। তুর্কিদের ক্যানাল, মেসোপটেমিয়া, প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। বৃটিশ নৌবহর দার্দেনেলেসে অবস্থান গ্রহণ করেছে। সুলতান বৃটিশদের হাতের পুতুল মাত্র। শুধু হাঁক আছে এশিয়া মাইনর। অবশ্য এখানেও পশ্চিমা শক্তি কিছুটা সামরিক উপস্থিতি বজায় রেখেছে। স্মিরণায় গ্রিকদের অবতরণের চার দিন পর সুলতানের কাছ থেকে সামরিক ক্ষমতা লাভ করে মুস্তাফা কামাল এশীয় ভূ-খণ্ডে পা রাখেন। তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন। "দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমি আনাতোলিয়ায় থেকে যাবো," তিনি বললেন। ১৯১৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তুর্কিদের একটি প্রতিনিধিত্বশীল সম্মেলন সিভাসে আহূত হয়, তারা এই মর্মে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যে এশীয় ভূমি আক্রমণকারী মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। তুর্কি জাতির মধ্যে যা কিছু বীরত্বব্যঞ্জক তা মুস্তাফা কামাল এবং ন্যাশনাল প্যাক্ট ঘিরে একত্রিত হয়। আঙ্কারায় তিনি একটা সরকার খাড়া করেন (২৪ এপ্রিল, ১৯২০), কন্সট্যান্টিনোপলের সুলতানকে দেখান বুড়ো আঙুল, সঙ্গে সঙ্গে শপথ গ্রহণ করেন আনাতোলিয়ায় তুর্কি জনগণের জন্য নতুন জীবন গড়ার। এই আনাতোলিয়াতে, পশ্চিমের অস্বাস্থ্যকর বায়ুপ্রবাহ থেকে অনেক দূরে, তুর্কি জাতির পূর্বপুরুষেরা পশ্চিম বিশ্বকে প্রথম পেশীশক্তি প্রদর্শন করে।

যুদ্ধ শুরু হবার পর গ্রিকরা প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্য কুড়ায়, অতঃপর তাদের সকল আয়োজন ভেস্তে যায়। স্বদেশে একের পর এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে, শুরু হয় ধ্বংসকারী আলোড়ন, বিদেশে তুর্কিদের বিরুদ্ধে গঠিত মৈত্র জোটে পরিষ্কার ফাটল ধরে। কে অনুমান করতে পেরেছিলেন যে গ্রিসের তরুণ রাজা আলেকজান্ডার পোষা বানরের কামড়ে আকস্মিকভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন, কিংবা গণভোটে রাজ পরিবারের অনুকূলে জোয়ার শুরু হবে এবং ভেনিজেলোস ক্ষমতা হারাবেন (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২০), ক্ষমতা ফিরে পাবেন রাজা কন্সট্যান্টাইন তাঁর জার্মানি-সমর্থক অনুগামীসহ? এই ঘটনাবলী ব্যাপক প্রভাবের সৃষ্টি করে এশীয় রণাঙ্গনে। বৃদ্ধ রাজার কাছ থেকে উদ্দীপনা লাভ করে গ্রিক বাহিনী আঙ্কারার দিকে অগ্রসর হয়, সাকারিয়া নদীর তীরে বরণ করে মস্ত পরাজয় (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২১)। এদিকে ভেনিজেলোসের অনুগত অফিসারদের বরখাস্ত করায় তুর্কিদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোনো ক্ষমতাই অবশিষ্ট রইলো না। তাছাড়া মিত্র পক্ষের সহায়তা লাভের কোনো আশা নেই। ইতালীয়রা যেখানে গ্রিকদের ঘৃণা করে, সেখানে ফরাসিয়া তুর্কিদের সঙ্গে পৃথকভাবে শান্তির লক্ষ্যে সম্পর্ক তৈরি করে (২০ অক্টোবর, ১৯২১)। এথেন্সের রাজদরবার প্রস্তাবিত করে যে থ্রেসের সেনাদলকে কন্সট্যান্টিনোপল দখল করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হোক (জুন, ১৯২২), কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলি উক্ত প্রস্তাব উপেক্ষা করে। বাস্তবিকপক্ষে মিত্র পক্ষের প্রথম সারির সকল রাষ্ট্রবিদের মধ্যে একমাত্র মি. লয়েড জর্জ গ্রিক জনগণের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি চান মড এবং অ্যালেনবি তুর্কিদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার জন্য যে চমৎকার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন তা হেলাস (Hellas) ও তার দ্বীপগুলি থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ করা উচিত।

তাহলে গ্রিকদের নির্বান্ধবভাবে ঝড় সামলাতে হবে। এককভাবে এই কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা তাদের নেই। পরাজয় বরণ করে বিপর্যস্ত, নিজেদের মধ্যে বিভেদের কারণে প্রায় পঙ্গু, উচ্চতর অধিনায়কদের প্রতি আস্থায় ঘাটতি, ইত্যাদি কারণে পরবর্তী বড় ধরনের

আঘাতের মুখে একেবারে ভেঙে পড়ে (১৮ আগস্ট, ১৯২১)। এক সময় বাহিনী বিশৃঙ্খলভাবে উপকূলের দিকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। শত্রুরা নিদারুণ ক্রোধে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। পলাতক সৈনিকদের অনুসরণ করে তারা স্মিরণায় প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংসলীলা। গ্রিক ভাষাভাষী কিংবা গ্রিক বংশজাত কেউ প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে পারেনি। এশিয়া মাইনর থেকে মিত্র বাহিনীর জাহাজ পলায়নরত এক মিলিয়নের অধিক খ্রিস্টানকে উদ্ধার করে। গ্রিক ও সন্নিহিত দ্বীপগুলিতে এদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

স্মিরণার অগ্নিদগ্ধ ধ্বংসাবশেষ থেকে জেগে ওঠে অপরিচিত এবং অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ প্রাচ্য। দুটি রাজতন্ত্র দ্রুত বিলীন হয়ে যায়। একটি গ্রিক, অপরটি তুর্কি। একটি নব্বই বছরের বিদেশাগত প্রতিষ্ঠান। অপরটির শেকড় প্রোথিত ওসমান বংশের স্মরণাতীত কালের ঐতিহ্যে। কর্মঠ এশীয় অভিবাসীদের কারণে গ্রিস বিত্তশালী হয়, কিছুটা শক্তিশালীও হয়। তাছাড়া দেশটির জনসংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। মুস্তাফা কামালের নবা তুর্কি প্রজাতন্ত্রেও অনুরূপ জাতীয় শক্তির সংহত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। ফলে খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের সমস্যা, যা দীর্ঘকাল পশ্চিম জগতের বিবেক দংশন করেছে, নির্ধারণ করেছে তাদের কর্মপন্থা, তা আর বিদেশী দূতাবাসগুলির রাতের ঘুম হারাম করতে পারে না। সংখ্যালঘুদের পাইকারি হারে বধ করা হয়, কিংবা তাদের করা হয় বিতাড়িত। এই বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হওয়ায় গ্রিকো-তুর্কি শত্রুতার এক রকম অবসান ঘটে। ইউরোপীয় খণ্ডে জনসংখ্যা বিনিময়ের বিজ্ঞ ব্যবস্থা আঙ্কারা এবং এথেন্সের মধ্যে বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করতে উপরন্তু সহায়ক হয়। এভাবে অগ্নি ও তরবারির পরীক্ষাধীনে অর্ধ-বর্বর প্রাচ্যে আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি একটা রূপ লাভ করে।

গ্লাডস্টোন ধারার গ্রিক সংস্কৃতির অনুরাগী লয়েড জর্জ তাঁর হেলেনিক বন্ধুদের সঙ্গে তলিয়ে যান। টোরি দলের (রক্ষণশীল) সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ লয়েড জর্জের নেতৃত্বের অধীনে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে। লয়েড জর্জ তাঁর আমূল সংস্কারবাদ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। তিনি বিদ্রোহী আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে প্রস্তুত, তিনি চান গ্রিকদের উৎসাহী করতে এবং বিজয় উল্লাসে মত্ত তুর্কিদের বিরুদ্ধে দার্দেনেলেস প্রতিরক্ষায় ইচ্ছুক। নতুন কোনো যুদ্ধের সম্ভাবনায় দিশেহারা ও আতংকিত হয়ে টরি দলের সদস্য কার্লটন ক্লাবে জমায়েত হয় এবং প্রধানমন্ত্রীকে 'চূড়ান্ত দুঃসাহসী পাইলট' বলে আখ্যায়িত করে বরখাস্ত করে। এই চূড়ান্ত দুঃসাহসী পাইলট দীর্ঘ ছয় বছর যুদ্ধ ও শান্তির কালে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে প্রভাব খাটান ডিউক অব ওয়েলিংটনের পর রাজ্যের কোনো প্রজার পক্ষে ততটা প্রভাব খাটানো সম্ভব হয়নি। বৃটেনে কোয়ালিশন সরকারের পতনের পর তুর্কদের বিজয় নিশ্চিতরূপ লাভ করে। বিধাতৃকৃত উপায়ে গ্লাডস্টোনের ভূত এবং লয়েড জর্জের উড়োজাহাজ থেকে মুক্ত হয়ে, কার্লটন ক্লাবের সুবিধাভোগকারী মুস্তাফা কামাল নীরবে দার্দেনেলেস অতিক্রম করেন।

১৯২৩ সালের লুসান সম্মেলনে মিত্র পক্ষ তুর্কীদের বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল অনুমোদন করতে বাধ্য হয়। যা কিছু পশ্চিমী তত্ত্বাবধানের পূর্বতন শাসন ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে তা সমূলে ভেসে যায়। তুর্কিরা নিজ দেশের নিরঙ্কুশ প্রভু হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। লর্ড কার্জনের বাগ্মিতায় সর্বশেষ তোলপাড় মুস্তাফায় বিজয়ে হেরফের করতে পারেনি। চানক ও ইস্তাম্বুলে ইসলামী পতাকা ক্রিসেন্ট এখনও নির্বিঘ্নে উড়ছে।

এরপর এক দুঃসাহসী সংস্কার কর্মে হাত দেয়ার জন্য এখন ক্ষেত্র প্রস্তুত ও সুরক্ষিত। অবশ্য কীভাবে সংস্কারকর্ম বিষয়ে আলোচনা নব্যতুর্কিদের মধ্যে চলছে অনেক দিন যাবৎ। এতে মুস্তাফা প্রতিভাবান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন, তুরস্ক লাভ করে আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। খেলাফৎ করা হয় বিলুপ্ত, নারীদের পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাধ্য করা হয়। বিদ্যালয়গুলিকে করা হয় সাধারণ ও সার্বজনীন, কোরান শরিফ তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য আদেশ জারি করা হয়। আকস্মিকভাবে ঐতিহ্যের দাবি অগ্রাহ্য করে ডিক্রি (১৯২৮) জারি করা হয় যে, তুর্কি প্রজাতন্ত্রের সরকারি ধর্ম হিসেবে ইসলাম ধর্ম আর গণ্য হবে না। ছোট বড় সকল বিষয়ের প্রতি মুস্তাফা কামালের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তিনি এখন গাজি খেতাবে ভূষিত (গাজি খ্রিস্টানদের বিতাড়নকারী)। নামাজিরা যাতে কপাল দিয়ে ভূমি স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য তিনি ফেজ টুপির পরিবর্তে ইউরোপীয় টুপি ব্যবহার করার আদেশ দেন। এইসব এবং আরো অনেক আধুনিকায়ন প্রচেষ্টা, যেমন বহুবিবাহ প্রথার বিলুপ্তি, লাতিন বর্ণমালার প্রবর্তন, পশ্চিমী ব্যবহার শাস্ত্রের সূচনা, জনগণ মেনে নেয় টু শব্দ না করে। দরবেশ, যাদুকর, তাবিজকবজ বিক্রেতা, জ্যোতিষ ইত্যাদি শ্রেণীকে সমাজ থেকে উৎখাত করা হয়। গাজি এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য শুধু সুপারিশ করতেন তাতেই কাজ হয়ে যেত। একবার গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে সালতানাৎ ও খিলাফত বিলুপ্তি ব্যাপারে প্রশ্ন ওঠে। ঐতিহ্যের সঙ্গে এত বড় ব্যবধান সৃষ্টি অনেকের পক্ষে মেনে নিতে একটু বেগ পেতে হয়। মুস্তাফা কামাল এদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য বলেন, সর্বশেষ প্রকৃত খলিফাকে হত্যা করা হয় ৯২৪ সালে। অতঃপর বলেন, "সার্বভৌমত্ব অর্জন করা হয় শক্তি, ক্ষমতা এবং হিংস্রতা দ্বারা। ওসমানের (Othman) পুত্ররা হিংস্রতা দ্বারা দেশের ক্ষমতা দখল করে, তুর্কি জাতি শাসন করে দীর্ঘ ছয়শত বছর। জাতি এবার অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তাদের প্রেরণ করেছে যথাস্থানে এবং নিজেদের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেছে।"[১] বক্তৃতার উপসংহারে চিৎকার শোনা যায়, 'ভোট, ভোট!' কেবল একজনের বিরুদ্ধ কণ্ঠ শোনা যায়, 'আমি এর বিপক্ষে', কিন্তু তার বিরুদ্ধ মত হারিয়ে যায় 'থামুন', 'থামুন' শব্দের প্লাবনে। ভক্তিভাবে বিহ্বল, ভাড়াটে সৈনিকের জাতি তুর্কিরা তাদের সেনাপতির আদেশ অনুসরণ করতে থাকে।

---

১. গাজি মুস্তাফা কামাল প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ (১৫-২০ অক্টোবর, ১৯২৭), লেপজিগ। লিপজিগ, ১৯২৯।

নতুন একনায়কতন্ত্র, পুরাতন গণতন্ত্র

নতুন একনায়কতন্ত্র এবং পুরাতন গণতন্ত্র। স্বাধীনতায় বিশ্বাসে ধস। পুঁজিবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ। বোলশেভিক ধর্ম। লেনিন : লাল ও সাদাদের সংঘর্ষ। রাশিয়া ও পোল্যান্ড। ওয়ার্সব যুদ্ধ। ইতালিতে কমুনিজম। বেনিতো মুসোলিনি। ফ্যাসিবাদী বিপ্লব। এডলফ হিলটার। ভেইমার বিপ্লব। রুর অঞ্চলে ফরাসি বাহিনী। স্ট্রেসেমেন এবং সংসিদ্ধির পন্থা। নাৎসিদের জাতিগত দর্শন। হিটলারবাদের বিজয়। যুদ্ধোত্তর বৃটেন। বৃটিশ কর্মপন্থার ভিত্তি। ইউরোপের অকাল। স্মরণার্থী। স্ট্যালিন। শান্তি ও মুক্তি।

রাজনৈতিক যাঁতাকলে পিষ্ট হবার পর ইউরোপের সাধারণ মানুষের সাধারণ চিন্তা থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সমঝোতায় বিশ্বাস অনেকটা দূর হয়। অথচ এটি ছিলো উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধের আগে বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ ছিলো যে আগামী দিনের জন্য সংসদীয় প্রতিষ্ঠানাদি নিরঙ্কুশ ফরমুলা সরবরাহ করবে। সভ্য বলে দাবি করে দুনিয়ার এমন কোনো দেশ–এমনকি রাশিয়া–জনগণের কয়েকটি দাবি পুরোপুরি ঠেকাতে পারেনি। এই দাবিগুলি হলো প্রতিনিধিত্বশীল মন্ত্রিসভা, প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচকমণ্ডলী। অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি পার্লামেন্ট গঠিত হয়। ভারতে কংগ্রেস দল স্বাধীন পার্লামেন্টের দাবি উত্থাপন করে। সবাই উপলব্ধি করেন যে রাজনৈতিক প্রগতি অর্জন করতে হলে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া নির্বাচকমণ্ডলীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আর উন্নতি করতে হবে সংসদীয় সরকার যন্ত্রের। এই লিবার‍্যাল আস্থা রক্ষণশীলরা বিভিন্ন মাত্রায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। প্রতিটি নাগরিক নিজের মতো করে চিন্তা করবে, ভাব প্রকাশ করবে নিজের মতো করে, যাকে ইচ্ছে তাকে ভোট দেবে, এই ব্যাপারগুলোকে ব্যাপকভাবে গণ্য করা হয় সভ্য রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচয়মূলক চিহ্ন হিসেবে। ব্যক্তি স্বাধীনতা চর্চা করতে গেলে হয়তো কিছুটা বিপদের ঝুঁকি থেকে যাবে, তবে নিষ্পেষনমূলক ব্যবস্থার অধীনে যে অসন্তোষের জন্ম হয় তার তুলনায় এই বিপদটা কিছুই না।

অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের লেসে ফেয়ার (অবাধ বাণিজ্য) নীতি অনেক সময় রাজনৈতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এটি আমরা খুব বেশি লক্ষ্য করি ইংল্যান্ডে। ইউরোপীয় শান্তিকালীন কাঠামোর রূপদাতা কোনো সরকার নয়। ল্যাঙ্কাশায়ার কিংবা রুর অঞ্চলের সমৃদ্ধির জন্য কোনো সরকার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না, রথচাইল্ডদের আর্থিক সম্পদের পাহাড় গড়ার পেছনে কোনো সরকারের অবদান ছিলো না। এতদ্ব্যতিত ইউরোপে যে একশো তিরিশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তিনশো পঞ্চাশ মিলিয়নের বেশি তা এতদঞ্চলের শাসকদের কারণে নয়।

ইউরোপীয় সমাজের পুঁজিবাদী কাঠামোর জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারে ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ। বৈশ্বিক তরল পুঁজির পুঞ্জীভবন ঘটে ব্যক্তির সঞ্চয় অভ্যাসের জন্য, আর দেশ থেকে দেশান্তরে পুঁজি মুক্তভাবে চলাফেরা করে ব্যক্তিগত মুনাফার আকর্ষণ অনুসরণ করে। ইউরোপের সেই দেশ সবচেয়ে ধনবান যে দেশের বাণিজ্য ও শিল্পে সরকারি হস্তক্ষেপ একেবারে সীমিত। আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সরবরাহ করে বৃটিশ জনগণের বাণিজ্য থেকে লভ্য মুনাফা। অতলান্তিকের অপর পারে রয়েছে ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত একটি সমাজ। এই সমাজ উনবিংশ শতাব্দীর সময়ে পাবাধিতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি অর্জনে যে বিপুল সাফল্য কুড়ায় তা ঈর্ষণীয়। এটা সবসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে ১৯২৯ সালের মহামন্দা পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস ছিলো নজিরবিহীন এবং ধারাবাহিক উন্নতির ইতিহাস ; কিন্তু জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও দেশটির সম্পদের উৎস ছিলো বর্ধমান দাবি মেটানোর উপযুক্ত। যে বিপুল সম্পদের পাহাড় গড়েন একজন ভ্যান্ডারবিল্ট, কিংবা একজন রকফেলার বা ফোর্ড, তা গোটা মার্কিনী জাতির উচ্চতম সাধারণ জীবনের মানের সঙ্গে ছিলো সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানব জাতির ইতিহাসে জীবন যাত্রার মান এতোটা উচ্চতর স্তরে আর কখনো পৌঁছেনি।

প্রকৃতির পক্ষপাত তো ছিলোই। তবু দীর্ঘকালের ব্যক্তি উদ্যোগের ঐতিহ্য বিহ্বলকর সম্পদের পাহাড় গড়তে সাহায্য করে। সেই ঔপনিবেশিক দিনগুলোর গোড়ার দিক থেকে সম্পদ আহরণে ব্যক্তির উদ্যোগ ছিলো আমেরিক্যান সমাজের নজরকাড়া বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি অভিবাসী, নতুন বসতি স্থাপনকারী এবং প্রবর্তকদের জন্য সব কিছু সহজ ছিলো। এদের সরাসরি আগমনের জন্য উৎসাহিত করা হতো, সরকারি জমি স্বল্প মূল্যে ক্রয়ের সুযোগ ছিলো অবাধ, সন্তানের জন্য শিক্ষা ছিলো অবৈতনিক। এদের আরো জানা ছিল যে, তারা যেখানেই বসত করার জন্য মনস্থ করুন না কেন ইউনিয়নের সর্বপ্রাচীন রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তিগত অধিকার এবং শাসনতান্ত্রিক সুবিধাদি থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না। আমেরিকা 'ডলারের দেশ।' কোনো মার্কিন নাগরিককে আইন বা জনগণের অনুভূতি দ্বারা ডলার সংগ্রহে বাধা প্রদান করা যায় না। বংশগত অভিজাততন্ত্র কিংবা সম্মানিত রাজনৈতিক শ্রেণীর অবর্তমানে, এবং যেহেতু যে কেউ ধনবান হবার অভিলাষ পোষণ করতে পারেন, অসাম্যজনিত তিক্ততা অর্ধেক কমে যায়। সম্পদ জাতীয় ভক্তির লক্ষ্যে পরিণত হয়। সম্পদ সহজে আহরণ করা যায়, সহজে ব্যয় করা যায় বলেও এটি ঘটে। ধন-সম্পদে আকীর্ণ এই স্বর্গের তাক লাগানো দৃশ্য ইউরোপীয়দের নজর এড়ায়নি। আমেরিক্যান দৃশ্যপটের বেপরোয়া অগ্রগমন এবং জ্বরভাবের মধ্যে যদিও অনেক সময় শোনা গেছে ওয়াল স্ট্রিটের মহাজন এবং তৈল ও ইস্পাত শিল্পের মালিকদের তীব্র নিন্দা, তবু মহামন্দার আগে কেউ সন্দেহ করেননি যে আমেরিকায় (যেখানে মানুষের অর্জনেচ্ছু প্রতিভা আইন দ্বারা সবচেয়ে কম বাধাগ্রস্ত হয়েছে) দারিদ্র্য সমস্যা সর্বাধিক সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করা হয়েছে।

ইত্যবসরে ইউরোপে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জোয়ার লক্ষ্যাভিমুখী প্রবাহিত হলেও, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জোয়ার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার ঝোঁক দেখা গেছে। ১৮২০ সালে জেমস মিলের পক্ষে অনুমান করা এবং লেখা সম্ভব ছিলো যে সরকার কল্যাণবিরোধী শক্তির প্রতিভূ। কারণ সে কালে ইংরেজ সরকার নিয়ন্ত্রণ করতেন একটা ক্ষুদ্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত

শ্রেণী। উপরন্তু সে কালের সরকার ছিলো দুর্নীতিপরায়ণ। বিশেষ সুবিধা আদায়ের জন্য অন্যায় চলতো অবাধে। তবু সরকার সম্পর্কে এই অবজ্ঞাপূর্ণ ধারণা পোষণ করা পুরোপুরি যুক্তিশীল ছিলো না। কারণ রাজ্যের গোটা জনগোষ্ঠীকে শাসনতন্ত্রের আওতাভুক্ত করা হয়। একটি গণতান্ত্রিক সরকার হয়তো সকল সময় বিজ্ঞতার সঙ্গে কাজ করে না, তবে সামগ্রিকভাবে জনগোষ্ঠীর স্বার্থের সুরক্ষা প্রত্যাশা করা যায়। এ ধরনের সরকারের হস্তক্ষেপ মানুষের সুখ বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে।

উপরন্তু, এ ধরনের সরকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অমঙ্গল রুদ্ধ করতে পারেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অমঙ্গলজনক দিকগুলো স্পষ্ট প্রতীয়মান : প্রতিযোগিতার অপচয়, সীমিত দায়ের কোম্পানিগুলোর হৃদয়হীনতা, আইন প্রণয়নে ক্ষতিকর প্রভাবের চাপ, দুর্বল শ্রেণীর অবাধ শোষণ, মানুষে মানুষে সম্পদের বিরাট ও বিকট বৈষম্য। যুদ্ধ-পরবর্তী বছরগুলোতে পৃথিবী মুখোমুখি হয় নজিরবিহীন প্রাচুর্যের পাশাপাশি ভয়ানক দারিদ্র্যের অদ্ভুত দৃশ্যের। যখন কোটি কোটি লোক খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব বোধ করেছে, তখন শষ্যাদি বিনষ্ট করা হয়েছে লাভজনক চাহিদার অতিরিক্ত হওয়াতে। তাহলে জগতের ভাগ্যে কি লেখা আছে? তখন সবাই বলাবলি করতেন যে পার্লামেন্ট দেউলে, গণতান্ত্রিক সভ্যতা শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে, আর অবাধ বাণিজ্য নীতিকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে 'পরিকল্পিত অর্থনীতি'র জন্য। এমনকি ইংল্যান্ডে সংগঠিত শ্রমিকরা সমাজকাঠামো সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের দাবি জানায় (১৯১৯)।

গত যুদ্ধ ইউরোপে একটা বিরাট অকল্যাণ বয়ে আনে। প্রায় গোটা ইউরোপে সামাজিক শৃঙ্খলা বলতে আর কিছু থাকে না।কর্তৃত্বের প্রতি আস্থা বিনষ্ট হয়, সামাজিক রীতিনীতি সূত্রহীন হয়ে পড়ে। আর সর্বত্র পরাস্ত লোকেরা পুরাতন শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন নেতৃত্বের সন্ধান শুরু করে। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় রাশিয়ার ক্ষেত্রে। সেখানে সরকার সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় এবং দুর্বলতম। সেখানকার মৃত্তিকা বিপ্লবের জন্য সর্বাধিক প্রস্তুত দেখা যায়। এবং সেখানেই, ইউরোপের অন্যান্য এলাকার চেয়ে দ্রুত গতিতে এবং নিশ্চিতরূপে, বিশৃঙ্খলাজনিত সঙ্কটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটি মানুষ, একটি মতবাদ, একটি বিশ্বাস।

কার্ল মার্কস থেকে গৃহীত এই মতবাদ পুঁজিবাদী সমাজের বিকল্প হিসেবে আসে (উপরন্তু একে দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি মনে করা হয়)। এই মতবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস, সামাজিক ক্রমাধিকারতন্ত্র, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং যে শিল্পনীতি, নৈতিকতা, দর্শন উক্ত শ্রেণীর ভিত্তি রচনা করে, তার প্রতি চ্যালেঞ্জ জানায়। রুশদের সুসমাচারভিত্তিক গভীর ধর্মানুরাগ নতুন ধর্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এই নতুন ধর্ম খাদ্য, ভূমি এবং শান্তির প্রতিশ্রুতি ছাড়াও, এই কথাটা জোর দিয়ে বলে যে শেষ হবে প্রথম, এবং প্রথম হবে শেষ। কারণ যদিও রুশ কম্যুনিজম ধর্মকে জনগণের জন্য আফিকেন স্বরূপ বলে নিন্দা করে, তবু এটি, ইসলাম ধর্মের মতো, একটি ধর্মের সকল চিহ্ন বহন করে। এই ধর্ম বিশ্বজনীন, যুদ্ধদেহী এবং প্রচারবাদী। লেনিন এর পয়গম্বর, কম্যুনিস্ট পার্টি এর নির্জা।

লেনিন ছিলেন এক চক্ষু স্বপ্নবিলাসী। তাঁর কার্যকর ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায় এই ধারণা থেকে যে নিয়তি তাঁকে নির্দিষ্ট করেছে বিজয়ী রুশ বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক হবার জন্য। তাঁর কোনো বিত্ত বা পরিচয় ছিলো না। তবু এই অত্যন্ত ষড়যন্ত্রকারী, যার জীবনের বিরাট সময় কেটেছে সাইবেরিয়ার কারাগারে কিংবা লন্ডন বা সুইজারল্যান্ডের সস্তা হোটেলে, নিশ্চিত

স্বপ্ন দেখতেন যে একটা দিন আসবে যখন তিনি রাশিয়ার পুরাতন শাসন ব্যবস্থাসমূহ উৎখাত করার সুযোগ পাবেন, বুর্জোয়া শ্রেণীকে করবেন 'খতম', এবং সর্বহারার একনায়কত্ব কায়েম করতে সক্ষম হবেন। লেনিন ছিলেন জীবসুলভ তেজস্বিতার অধিকারী। এরই সঙ্গে শক্ত ও দৃঢ়মন মানব, তাঁর মধ্যে সমাবেশ ঘটেছিলো রুশদের বিরল ও মূল্যবান গুণ ক্ষমা, অল্পকথায় নিজেকে ব্যক্ত করার ক্ষমতা, তাঁর চিন্তা-ভাবনা ছিলো স্বচ্ছ, তাঁর কাজ কারবার ছিলো স্বচ্ছ, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো তাঁর নিজেকে অপ্রিয় করে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি তাঁর বিপ্লবী অনুসারীদের মধ্যে নিজের জন্য এমন একটা অবস্থান নির্দিষ্ট করেন যার সঙ্গে সঠিক তুলনা চলে আইরিশ পার্লামেন্টারি পার্টির চার্লস পার্নেলের। জার্মান জেনারেল স্টাফ তাঁর অনৈসর্গিক গুণের খবর পেয়ে যায়। তাঁকে সুইজারল্যান্ড থেকে (১৯১৭) রাশিয়া প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর দায়িত্ব হলো রুশ বাহিনীর আত্মবিশ্বাস বিনষ্ট করা। তিনি এই কাযে সফল হোন, তবে যুদ্ধ হবার আগেই এই ব্যক্তিটির বিকটতর জারে রূপান্তর ঘটে। ইনি অধিকতর ধ্বংসাত্মক এবং মহান পিটারের চেয়ে বেশি উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন।

লেনিন বিবেকের তোয়াক্কা করতেন না, তাঁর মধ্যে কোনো সংবাধ ও (inhibitions) কাজ করতো না। তিনি এতো বড় ও গভীর মাপের লোকহতব্রতী ছিলেন যে, তাঁর শাসনব্যবস্থা কায়েমের জন্য পাইকারি ধ্বংসলীলা প্রশান্ত চিত্তে মেনে নিতে পারতেন। দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ তাঁর কাছে শত্রুসম নয় বন্ধুসম প্রতিভাত হতো। কারণ দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করলে কৃষককুল জারের প্রতি বিরাগ হবে, যুদ্ধ এলে পুঁজিবাদী জাতিসমূহের সশস্ত্র দ্বন্দ্ব এতদকালের ভয়ানক গৃহযুদ্ধে (বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে) রূপান্তরিত হবে। এ ধরনের বিবাদের মাধ্যমেই শুধু জগতে কমুনিজমের শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। কমুনিজম প্রথমে রাশিয়ার জন্য, অতঃপর গোটা বিশ্বের জন্য। এই ছিলো তাঁর বৃহত্তর কর্মসূচি। মার্ক্সের রচনাবলী ছিলো তার কোরান। আবার যদিও তিনি ছিলেন কট্টর মতবাদী এবং কেতাববদ্ধ জীব, তবু রাষ্ট্রবিদসুলভ গুণাবলিও তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

দলীয় তাত্ত্বিকতা অগ্রাহ্য করে তিনি ১৯২১ সালে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। কারণ তিনি দেখতে পান যে নির্ভেজাল কম্যুনিজম দেশটিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। রুশ-শিল্পকারখানা বাঁচানোর জন্য যে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজন রয়েছে, সেটাও তিনি উপলব্ধি করতেন। বিদেশের মাটিতে বিপ্লবের পক্ষে জোরদার প্রচারণা পরিচালনার জন্য ট্রটস্কি ও জিনোভিয়েফ যে বন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন তা তাঁর অনুমোদন লাভ করেনি। তিনি মনে করেন, পুঁজিবাদী দেশগুলো যতোটা সহায়তা প্রদান করে তাই দিয়ে রাশিয়ায় কম্যুনিজমের অবস্থান সংহত করা অপেক্ষাকৃত জরুরি। এই লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯২১ সালে ইংল্যান্ডের সঙ্গে এবং ১৯২২ সালে জার্মানির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তিনি এমন একটি রুশদেশের স্বপ্ন দেখতেন যে দেশের প্রতিটি কৃষক পড়তে এবং লিখতে পারে, এবং তার কুটির তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা তাপিত ও আলোকিত হয়।

তাঁর ক্ষমতার হাতিয়ার ছিলো প্রথমত অত্যন্ত সংগঠিত কমুনিস্ট পার্টি, দ্বিতীয়ত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জার আমলের গুপ্ত পুলিশ বাহিনী, তৃতীয়ত, রেড আর্মি। দেশে যদি সন্ত্রাস থাকে তাহলে অবৈধ আত্মসাতের ঘটনা ঘটবে না। লেনিন ও তাঁর কমিসার বা যন্ত্রিগণ বেতন হিসেবে অল্পই গ্রহণ করতেন এবং কঠোর ও পরিশ্রমসাধ্য কৃচ্ছ্রতাসাধন অভ্যাস

করতেন। অন্যদেরও অনুরূপ জীবন যাপনের জন্য উপদেশ দিতেন। তারা জনগণের মঙ্গলের কথা ভাবতেন বলে দেশবাসীর শ্রদ্ধা কুড়াতে সমর্থ হন।

লেনিন সঙ্কটকালীন রুশদেশ শাসন করেন দীর্ঘ ছয় বছর। এই সময়ে তিনি জনগণের জীবনের ও প্রতিষ্ঠানাদির ব্যাপক রূপান্তর কার্যকর করেন। এ জন্য তাঁকেই বিশেষভাবে আধা দেবদূতের মর্যাদা দেয়া হয়। এবং তাঁর এই মর্যাদা লাভ ছিলো প্রায় তাৎক্ষণিক ব্যাপার। এই 'মুক্তিদাতা'র সব কিছু ক্ষমার চোখে দেখা হয়। তাঁর রাশি রাশি রচনার ভুল ও একঘেয়ে পাণ্ডিত্য, তাঁর শাসন নীতির করুণাহীন কঠোরতা, ধনী ও সুখী মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ দেখে তিনি যে অমানবিক উল্লাস বোধ করতেন, তাও ক্ষমা করা হয়। অনুরাগী তীর্থযাত্রীরা মস্কোতে এই বিপ্লবী পুরুষের মৃতদেহ মলমে আবৃত দেখতে পাবেন। মৃত্যুর কোলে গভীর শান্তিতে নিদ্রামগ্ন। কিন্তু এখনো রুশ দেশের আদর্শ নিরূপিত হয় তার অভিপ্রায় অনুসারে।

শুরুতেই রুশ কমিউনিজম গৃহযুদ্ধের মতো মহাবিপদের সম্মুখীন হয়। এই গৃহযুদ্ধে প্রধানত ইন্ধন যোগায় মিত্রপক্ষ এবং তার সহযোগী শক্তিগুলো। মিত্র পক্ষের মতলব জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকে ময়দানে ধরে রাখা। এই কাজটি তারা করতে চান রুশ জনগণের সেই অংশকে সহায়তা যুগিয়ে যারা জার সরকার প্রদত্ত অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এখনো ইচ্ছুক। চারদিক থেকে বোলশেভিক সরকার আক্রমণের মুখে। সাইবেরিয়া, কৃষ্ণ সাগর, মারমানস্ক, এস্টোনিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আঘাত আসার ফলে বোলশেভিকরা দিশেহারা। পূর্বাঞ্চলে কোলচাক কর্তৃক সাইবেরিয়া পদদলিত। দক্ষিণ দিক থেকে ডেনিকিন মস্কো অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে যেমন ভিন্ডিতে, বর্তমানে তেমনি বৈদেশিক হস্তক্ষেপের দরুন বিপ্লবী শাসকদের প্রতি আনুগত্য সংহত হয়। বৈপ্লবিক নেতৃবৃন্দ কুড়ান সুখ্যাতি। শ্বেত বাহিনী সর্বত্র প্রতিহত হয়, যেমন নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব, অত্যাচারপ্রবণতা এবং বোকামির জন্য, তেমনি বিরুদ্ধ পক্ষের যোগ্যতার কারণে। এক মেধাবী ইহুদি অতীতে ক্ষুদে অপরাধ করে হাত পাকান, বর্তমানে সুখ্যাতি কুড়ান বিজয়ের সংগঠক হিসেবে। এখন থেকে ট্রটস্কি গণ্য হতে থাকেন রুশ কারনট হিসেবে।

ব্যাপকতায় বোলশেভিক বিপ্লবের অশনিসঙ্কেত ইউরোপের অনুরূপ যে কোনো আন্দোলনকে ছাড়িয়ে যায়। এর কার্যকারিতা, কঠোর নির্দয়তা এবং উচ্চাভিলাষের জন্য এটি বিশেষ কৌতূহলের বিষয়ে পরিণত হয়। এমন কি রক্ষণশীল ইংল্যান্ডে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ শ্রমজীবীদের কাউন্সিল বিষয়ে কথা বলা শুরু করেন। শুধু তাই নয়, সক্রিয় কর্মপন্থা এবং সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার অপসারণের কথা ওঠে। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে রাষ্ট্রবিদগণ নিজেদের কাছেই প্রশ্ন রাখেন, এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড কতোদূর বিস্তার লাভ করতে পারে। ফিনল্যান্ডে রেড আর্মিকে নির্দয়ভাবে দমন করে জার্মানরা, হাঙ্গেরিতে রোমানরা। তবে কে অনুমান করতে পেরেছিলো নতুন রাষ্ট্রগুলোর বেষ্টনীর ভেতর বোলশেভিক প্রচারণার প্রতিক্রিয়ার কথা? এই রাষ্ট্রগুলোর কোনোটি ক্ষুদ্র, কোনোটির ভিত্তি এখনো মজবুত নয়, এবং এই রাষ্ট্রগুলোর জন্ম হয় শান্তি চুক্তিগুলোর বদৌলতে। ১৯২০ সালে পোল্যান্ডের জন্য একটা চূড়ান্ত বিপদের মুহূর্ত আসে, সাধারণ ইতিহাস বর্ণনা লক্ষ্য হলেও এ বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার।

যুদ্ধের সময় পোলদের দুর্ভোগ পোহাতে হয় সবচেয়ে বেশি। তাদের দেশটি পরিণত হয় পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান রণক্ষেত্রে। দেশটি রক্তে ভেসে যায়, বোমার আঘাতে হয় বিধ্বস্ত। এখানে

যে নৈরাজ্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পোলদের কেউ কেউ রুশ সৈন্যদলে যোগদান করে যুদ্ধ করেন, কেউ কেউ অস্ট্রিয় কিংবা প্রুশীয় বাহিনীর পক্ষে। কিন্তু সবাই যুদ্ধ করেন বাধ্য হয়ে। অতঃপর তাদের অননুসাধারণ পরিবর্তনে বিভক্তিপ্রবণ সাম্রাজ্য হয় এক লোপ উৎখাত, আর যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং দরিদ্রীকৃত পোলরা, একশো বছরের অধিক পরাধীন জীবনের পর, হঠাৎ দেখতে পায় যে তারা স্বাধীন। এখন তাদের কোনো প্রভু নেই।

এতে অবাক হবার কিছু নেই যে মুক্তির মাদকতা তাদের মাথায় ঢুকে যায়। প্যারিসে তারা হেলেনুষের মতো আচরণ করে। তাদের দাবি আকাশের চাঁদ। পূর্বাঞ্চলে তাদের অবস্থা স্বপ্নচারী পথিকের মতো, লক্ষ্য হলি গ্রেইল অনুসন্ধান। জোসেফ পিলসুদস্কির নেতৃত্বে (ইনি কট্টর সমাজতন্ত্রী এবং ষড়যন্ত্রকারী, তাঁর সময়ের অন্যতম খ্যাতিমান সমকামিক। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের পর থেকে তিনি গোপনে ছিন্নভিন্ন পোলিশ বাহিনীকে সংহত করছিলেন) পোলরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় যে তাদের সপ্তদশ শতকের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে। কিন্তু রুশদের অবস্থা তখন যতই শোচনীয় হোক না কেন, কিয়েভে একটি পোলিশ সরকারের অবস্থিতি তাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। অপরিণামদর্শী পোল আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করা হয়। উপরন্তু পোল্যান্ডের মূল ভূ-খণ্ডে উপস্থিত হয় রেড আর্মি। ওয়ার্সর পথ-ঘাটগুলোতে শোনা গেলো কমিউনিস্ট গোলন্দাজদের গর্জন, এবং ইউরোপের প্রতিটি রাজধানীতে বলাবলি শুরু হয় যে এই অপরিণামদর্শী এবং দুর্ভাগ্যপীড়িত জাতির জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। এখন তাদের শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে সম্ভাব্য সর্বাধিক সুবিধাজনক শর্তে বোঝাপড়া করতে হবে। কিন্তু পোল্যান্ডের ইতিহাস বিস্ময়ে ঠাসা। জেনারেল ওয়েগ্যান্ড এবং কতিপয় ফরাসি অফিসারের সহায়তায়, পিলসুদস্কির নেতৃত্বে বিরাট ও অভাবনীয় বিজয় ছিনিয়ে নেয়। উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিলো নাম মাত্র, তবে রুশদের সীমান্তের ওপারে হটিয়ে দেয়া হয়। এবার তারা খোঁজ করবে শান্তি। ওয়ার্সর রক্তপাতহীন যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করে পিলসুদস্কি ইউরোপের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। তিনি পোল্যান্ডকে বোলশেভিজম নামক পীড়া থেকে মুক্ত করেন। ভিস্টুলায় তিনি যদি বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে না পারতেন তাহলে উক্ত পীড়া কতো দূর বিস্তার লাভ করতো তা কেউ বলতে পারেন না।

পিলসুদস্কি তাঁর দেশের জন্য আরো দুটি বড় ধরনের কাজ করেন। পোলদের স্ব-শাসন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব ছিলো। সুদীর্ঘকালের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে হঠাৎ মুক্ত হয়ে তারা অত্যন্ত আধুনিক এবং চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক ধরনের পার্লামেন্টারী শাসনতন্ত্র গ্রহণ করে। তাদের জন্য এটাই ছিলো স্বাভাবিক। তারা গ্রহণ করে সংসদের উভয় পক্ষের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার। এবং যেহেতু দেশটিতে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দটি, অথচ কোনো দলেরই যুদ্ধের কারণে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলার যোগ্যতা ছিলো না, ফলে দক্ষতার সঙ্গে সরকার পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিস্ময়কর দ্রুত গতিতে একের পর মন্ত্রিসভার পতন ঘটতে থাকে। কর্মপন্থার ধারাবাহিকতা কিংবা চিন্তা-ভাবনায় সামঞ্জস্য কোনোটাই খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশের সঙ্কটকালে প্রধানমন্ত্রী হয়তো ঝড়ঝুটো নিয়ে খামার বাড়িতে যাচ্ছেন, এদিকে রাষ্ট্রভরী, বোলশেভিক নামক বিপদ এড়াতে সক্ষম হলেও, সংসদীয় বিভ্রান্তির ভেতর অতি সহজে অচল হয়ে যেতে পারে।

এভাবে পোল্যান্ডের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে যেতে থাকে। অবশেষে পিলসুদস্কি অবসর জীবনে ছেদ টেনে ১৯২৬ সালের ১২ মে ওয়ার্সাতে ক্ষমতায় হন এবং রাষ্ট্রীয় বোকামির অবসান ঘটান। তখন তিনি যা কিছু করেন তা মধ্য ইউরোপের জন্য বিরল বিচক্ষণতা এবং নমনীয়তার নজির। তিনি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হতে অস্বীকার করেন। এবং একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে উক্ত পদে বসান। তিনি ডায়েট বা সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন নি কিংবা ফ্যাসিবাদী দল গঠনের চেষ্টা করেন নি। পোল্যান্ডের যুদ্ধের জন্য সৈনিক, সাইবেরিয়া এবং জার্মানির কারাগারের শ্রদ্ধেয় সভ্য, বৃদ্ধ বয়সে একসময়কে পাকাতে হওয়ার খায়েস পোষণ করেননি। ডায়েটের অধিবেশন আগের মতোই বসবে। আলোচনা করবে, নিজেদের এবং জনগণকে শিক্ষিত করে তুলবে, কিন্তু ডায়েট সরকারের পতন ঘটাতে পারবে না। পিলসুদস্কি জোর দিয়ে বলেন, মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া সংসদের দায়িত্ব হতে পারে না। মন্ত্রিসভা থেকে প্রতিষ্ঠানটি বিরল শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এজন্য এক দল বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয় রাষ্ট্রীয় চাকা সচল রাখার জন্য। তাদের কার্যকালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়। অবশ্য এটুকুই যথেষ্ট যে তারা পিলসুদস্কির সমর্থন ভোগ করেন। পিলসুদস্কি নিজে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বাহিনীর সদস্যরা তাঁর প্রতি ভক্তিশীল, জনগণ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

পোল্যান্ডের হিতের জন্য দ্বিতীয় যে কাজ এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিটি করেন তা হলো দেশটিকে তিনি একটি সুন্দর বৈদেশিক নীতি দিয়ে যান। তিনি রাশিয়া এবং জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। এতে জাতি নিরাপত্তাবোধ করতে পারে। পোল জাতির সবচেয়ে বড় ভয় আবার না স্বদেশের মাটিতে যুদ্ধ শুরু হয়। বড় ধরনের অঙ্গীকারকে এরা ভয় করে। পোল্যান্ড অত্যন্ত সশস্ত্র, কিন্তু তা শুধু প্রতিরক্ষার জন্য। শুরুতে বিব্রতকর হঠকারিতা প্রদর্শনের পর পিলসুদস্কির প্রজাতন্ত্র শিখেছে যে প্রথম প্রয়োজন নিরাপত্তা।

বোলশেভিক প্রচারণা সাহিত্যবলে সৃষ্ট রাষ্ট্রগুলোতে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। নিঃসন্দেহে এর কারণ, সর্বত্র কৃষককূলের উন্নতি হয়, কৃষিক্ষেত্রের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করায়। এতে গরীব কৃষক বলতে আর কেউ থাকে না। পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া এবং বাল্টিক অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোতে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক হারে জমি বিতরণ করা হয়। অনেকে পল্লীর বড় বড় খামারগুলো বিলুপ্ত হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। কারণ এখান থেকে শিল্পকলা, শিক্ষা এবং রাজনীতির পৃষ্ঠপোষণ করা হতো। তবে এই বিরাট কৃষি বিপ্লবের অন্যতম ফলাফল ছিলো এই যে, রুশ কমিউনিজম এবং মধ্য ইউরোপের মাঝখানে বিরাট কৃষক মালিক শ্রেণী দাঁড়িয়ে যায়।

যাহোক, রুশ বিপ্লবের মতো এতো বড় বিধ্বংসী আলোড়নের প্রতিক্রিয়া একেবারে সীমিত হয়ে যেতে পারে না। আমরা যে কালে বাস করছি তার উপর লেনিনের প্রভাব এখনো অপরিসীম। রুশ দেশে একটি সশস্ত্র মতবাদ সিংহাসনে আসীন। রাশিয়া এখন মহাপ্রতাপশালী রাষ্ট্র, এখানে মানুষের স্বাধীনতা নির্দয়ভাবে দমন করা হয়। এই রাষ্ট্রে নতুন ধরনের মানুষ এবং নতুন ধরনের সমাজের চাপ খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই দৃশ্য ইউরোপ শুধু রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখে না। রুশ কমিউনিস্টদের ভয়ানক যুক্তি অন্যত্রও গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়। গণতন্ত্রের ধুম্র দিবসের এবং প্রচারণা দ্বারা ইতালি ও জার্মানির নিরীহ জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু এমন একটি সময়ে যখন সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীর ইচ্ছাশক্তি নিম্নতম

স্তরে পৌঁছেছে। অবশ্য লেনিনবাদের আবেদন যেখানে বিশ্বজনীন, সেখানে ফ্যাসিবাদ হিংস্র জাতীয়তাবাদী, তা সে জার্মান কিংবা ইতালীয় পোষাকে আচ্ছাদিত হোক না কেন। এই সরকারগুলো মানবতার মুক্তির বিরোধিতা ব্যাপারে একতাবদ্ধ। কমিউনিস্ট এবং ফ্যাসিস্টরা এই ধারণা বাতিল করে দিয়েছেন যে রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। তারা সংখ্যালঘুর সমস্যা বিবেচনা করতে নারাজ, কিংবা মনে করেন না যে হিংস্রতার পরিবর্তে যুক্তিশীল হওয়া উচিত। নতুন একনায়করা জার কিংবা পোপের মতো নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। যে নতুন ধরনের দাসত্ব প্রথা চালু হতে যাচ্ছে তার নজির ইতিহাসে মেলে না। এই দাসত্বের রূপ ভয়ঙ্কর। যুদ্ধ ও বিপ্লব থেকে সৃষ্ট অমানবিকতা এই তিনটি স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে সমান লক্ষ্য করা যায়।

কশ আদর্শ সংক্রমণের ভীতি ইতালীয় রাজনীতিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। ইতালিতেও যুদ্ধের অবসান সার্বিক অবসন্নতা ও মোহমুক্তির বোধ জন্ম দেয়। এখানে সাধারণভাবে অনুভব করা হয় যে ইতালি দুর্ভোগ বরণ করেছে বিরাট আকারে। পক্ষান্তরে কিছু মাত্র মুনাফা সে ঘরে তুলতে পারেনি। বৈপ্লবিক প্রচারণা ইতালিতে যুদ্ধের আগে জোরেসোরে চলেছে, ক্যাপরেটোর বিপর্যয়ে তা পালনও করে বিরাট ভূমিকা। অতঃপর আসে বিজয়, কিন্তু বিজয়ের সঙ্গে বলতে গেলে তেমন কিছু আসেনি, করের বোঝা ছাড়া। সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দিয়েছে খাদ্য ঘাটতি, জ্বালানির অপর্যাপ্ততা। ইতালির শ্রমজীবী শ্রেণী তখন প্রশ্ন তুলেছে, তাহলে এতো কিছু করে আমাদের কি লাভ হলো। উত্তরাঞ্চলের কারখানা শ্রমিকদের চালু সরকার সম্পর্কে মনোভাবের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। লেনিনের নাম তখন খুবই জনপ্রিয়। সর্বত্র তার ছবি দেখা যায়। লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়। বিগত যুদ্ধের বৃদ্ধ সৈনিকদের রাস্তা-ঘাটে বিদ্রূপ করা হয়। যেহেতু সংসদের নির্বাচন হয় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনুসারে, ফলে দল উপদলের সংখ্যা ছিলো অগণন, আর মন্ত্রিসভা ছিলো খুবই দুর্বল। বাক স্বাধীনতা স্বীকৃত, বিতর্ক উন্মুক্ত, তবে দেশের সরকারের মধ্যে এমন কিছু ছিলো না যা জনমত সংহত করতে পারে, জনগণকে করতে পারে উদ্বুদ্ধ কিংবা স্বদেশিকতা বোধে যে পচন ধরেছে তা ঠেকাতে পারে। অনেক সংসদীয় রাজনীতিক ছিলেন দক্ষ ও সমর্থ, তথা একাগ্রচিত্ত, কিন্তু যেখানে যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত হওয়ার কথা জাতীয় সমস্যা সমাধানে, সেখানে তা ব্যয়িত হয়েছে অসার বিতর্কে কিংবা উচ্চপদ লাভের জন্য নিরন্তর ঘৃণ্য প্রচেষ্টায়।

বেনিতো মুসোলিনির ধূমকেতুর মতো আবির্ভাবের কারণ খুঁজতে হবে এহেন জাতীয় পঙ্গুদশায়। তিনি জন্মগ্রহণ করেন সংসদীয় শ্রেণীর বাইরে। তিনি ছিলেন ফরলির জনৈক কর্মকারের পুত্র। যুদ্ধের আগে তিনি একটি সমাজতন্ত্রী পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর মতামত সুইজারল্যান্ডের জন্য ছিলো অতিরিক্ত হিংস্র। কিংবা ইতালিতে সমাজ কাঠামোর জন্য হুমকিস্বরূপ তার চেয়ে অধিক কাউকে গণ্য করা চলে না। অতঃপর রাশিয়া এবং জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। জার্মান সমাজতন্ত্রীরা এতোকাল উচ্চস্বরে শান্তির পক্ষে কথা বললেও এবার যুদ্ধ ঋণের পক্ষে ভোট দেয়। মুসোলিনি নিমেষের মধ্যে এই ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝতে পারেন সঠিক প্রয়োজনের সময় দেশের দাবি সর্বাগ্রগণ্য। সমাজতন্ত্রীরা এমনকি বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করেনি। জার্মান নেতৃবৃন্দের চেয়ে অধিক সমাজতন্ত্রী হওয়া তার সাজে না। দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন করে তিনি

ইতালির যুদ্ধে অংশগ্রহণ সমর্থন করলেন, নিজেও হাতে তুলে নিলেন মারণাস্ত্র। আহত হলেন, যুদ্ধান্তে বেরিয়ে এলেন ভিন্ন মানুষ, 'দেশপ্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ, উচ্চাভিলাষ তার মধ্যে টগবগ করছে, তিনি সৌভাগ্যের সেনাপতি, জ্বালাময়ী এবং স্বচ্ছচিন্তায় পারঙ্গম, হিংস্রতা কিংবা পাশবিকতা দেখে তিনি কুকড়ে যান না, ষড়যন্ত্রের যোগ্য রাজপুত্র।' প্রথমে তিনি গঠন করলেন একটি উদ্যোগপ্রধান রাজনৈতিক দল। তিনি দলের নামকরণ করলেন ফ্যাসিস্টি (Fiscisti), তাঁর স্মরণে ছিলো রোমের লাঠি বা fasces-এর কথা, এই লাঠি বা লাঠির আটি কোনো কর্মকর্তা রাষ্ট্রের প্রধান হাকিমের সম্মুখে বয়ে নিয়ে যেতেন কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে। এই দল হবে শৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠা, কঠোর, স্পার্টান, বীর্যবান, এবং এই দল শাসন করবে দেশ। তাঁর সংগঠন যাত্রা শুরু করে বা গঠিত হয় মিলানের একটি খবরের কাগজের অফিসে (২৩ মার্চ, ১৯১৯)। দলের আকার বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাস্তার নিয়ন্ত্রণ এখন এই দলের হাতে। কখনো ফ্যাসিস্ট দলের মাস্তানরা arditi বা ঝটিকা বাহিনীর কালো রঙের কোর্তায় আচ্ছাদিত হয়ে বেরোয়, বিরোধী দলের লোকদের খুন করে। অন্য সময় হয়তো তাদের শুধু প্রহার করে কিংবা ক্যাস্টর অয়েল বা রেড়ির তেল প্রয়োগ করে তাদের মর্যাদাহানির জন্য। অনেক সময় পুরানো কায়দায় উদার রাজনীতিকদের বাড়ি-ঘর তছনছ করে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে। বিগত যুদ্ধের সৈনিকরা এমনিতেই অবহেলার শিকার, উপরন্তু তারা ফ্যাসিবাদী দলের মিলিশিয়াদের বিশেষ আক্রমণের বস্তুতে পরিণত হয়। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখে মুসোলিনি সদলবলে রোম নগরীতে হাজির হন। রাজার কর্তৃত্ব নামমাত্র স্বীকার করে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল দায়িত্ব করায়ত্ত করেন।

এরপর যেসব ঘটনা ঘটে তার পূর্ব নজির ইতিহাসে খুব বেশি মেলে না। ফ্যাসিবাদী দল সম্ভাব্য দ্রুত গতিতে স্ফীত হতে থাকে। এক সময় দেশের প্রতিটি নাগরিক উক্ত দলের সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত হয়। ভিন্ন মত সহ্য করা হয় না। খবরের কাগজ, শিক্ষক শ্রেণী, বিদ্বানমণ্ডলী দীক্ষিত হতে বাধ্য। রেড়ির তেলের শিসি, কারাগার, বিচ্ছিন্ন দ্বীপে নির্বাসন অবাধ্যতার শাস্তির জন্য নির্দিষ্ট। সংসদে বিরোধী দলের নেতা মেট্রোওটিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে খুন করা হয়। এই জঘন্য কাজটি করে বিজ্ঞাপিত করা হলো যে ইতালিতে পুরাতন উদারতন্ত্রবাদের অবসান ঘটেছে।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মের বিরুদ্ধে উগ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে 'ডুচা' (Duce-নেতা) দেশটিকে পনেরোটি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করেন (নভেম্বর, ১৯২৩)। সঙ্গে-সঙ্গে আজ্ঞপ্তি (decree) জারি করেন যে, যে দল সর্বাধিক ভোট পাবে সেই দল সংসদের দুই তৃতীয়াংশ আসন ভোগ করবে। সংসদে ফ্যাসিবাদী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে হাজির হয়।

ক্যাথলিক, নারীবিদ্বেষী, কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিবাদী দল প্রতিটি ক্ষেত্রে উদারতন্ত্রবাদের বিরোধী। নীতি নির্ধারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে পোপপন্থিরা দীর্ঘকাল সরে থাকার সময় উদারতন্ত্রীরা ইতালীয় পার্লামেন্টারি জীবনের নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো। বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, মুসোলিনি, যিনি ১৯১৪ সালে সাধারণ ধর্মঘট সফল করেছিলেন, ঘোষণা দেন যে ধর্মঘট ও লক-আউট একেবারে নিষিদ্ধ করা হলো। তাঁর নিগম আইনের (ল অব করপোরেশন) অধীনে দেশের প্রতিটি শিল্প-কারখানা বৃহৎ সরকারি প্রকল্পের অংশবিশেষ। লক্ষ্য হলো শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ব্যবসায় উন্নতি সাধন। পশ্চিমের উদারপন্থী দেশগুলোতে ইতালীয় একনায়কের উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী

নিষ্পেষণ ভালো চোখে দেখা হয়নি। এদের মধ্যে সাবধানতা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মুখ বন্ধ করে দেয়া, পত্রিকার সম্পাদকদের শেখানো-পড়ানো আনুগত্য, জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদান-প্রদানের পরিবর্তে পাশবিক শক্তির উপর নির্ভরতা, এসবই চলতি ঝোঁকের বিরুদ্ধে যায়। অথচ চলতি ঝোঁকগুলোকে মানবতার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল বৈশিষ্ট্য বলে সাধারণভাবে গণ্য করা হয়। এদিকে প্রথম থেকেই ইতালীয়দের মধ্যেকার ভালো কিছু লোক ফ্যাসিবাদী আন্দোলন সমর্থন করেন। কারণ ফ্যাসিবাদী আন্দোলন দেশে ভয়ঙ্কর নিষ্পেষণের সূচনা করলেও ইতালির রাজনৈতিক অঙ্গনে নিয়ে এসেছে জাঁকের অনুভূতি, যা ইম্পিরিয়াল (সাম্রাজ্যবাদী) যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ডুচার (duce) অনুরঞ্জিত প্রতিভা এবং বলিষ্ঠ তেজ রাজ্যের প্রতিটি কোণ সচকিত করে। এখন সরকারি দপ্তরগুলোর প্রতিটি শাখায় যোগ্যতার নতুন মান দরকার। একেবারে নতুন। ট্রেনগুলো টাইম টেবল মেনে চলে। সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা তহবিল তছরূপের ঘটনায় কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়। সরকারি গণপূর্ত বিভাগ বিরাট প্রকল্প হাতে নেয়। পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিরাট তাগিদের সৃষ্টি হয়। রোম নগরী পুনঃগঠনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। দক্ষিণের ম্যালেরিয়া প্রবণ অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলে। কার্যত ফ্যাসিবাদকে প্রারম্ভে জনৈক উন্মাদের বন্য স্বপ্ন হিসেবে অবহেলা করা হলেও এখন তা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সামগ্রী। এখন এটি শুধু একটি কর্মপন্থা নয়। রীতিমতো ধর্মীয় মতবিশ্বাসের সমতুল। এটি আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের সমরবাদী বিশ্বাসের বিরোধী। মতবিশ্বাস হিসেবে কমিউনিজমও কম বিবাদপ্রিয় এবং নির্যাতনমূলক নয়। যে কোনো শক্তি, যদি তা জাতিকে একতাবদ্ধ করে, তাহলে ফ্যাসিবাদী দলের শ্রদ্ধা কুড়ায়, যে প্রভাব বিভক্তি ডেকে আনে, হতবুদ্ধি কিংবা আলোকিত করে তাকে কঠোরতার সঙ্গে দমন করা হয়। ক্রুসিফিক্স পুনরায় বিদ্যালয়গুলোতে সংরক্ষণ করা হয়। রাষ্ট্র গির্জা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় উপনীত হয় (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯)। সকল প্রকার সক্রিয় বিরোধিতা, তা স্থানীয়, প্রাদেশিক, ধর্মীয় কিংবা সম্প্রদায়গত হোক না কেন, তা 'ডুচা'র অভিন্ন পূজা পদ্ধতির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। স্মরণে আনে আলেকজান্ডার ও অগস্টাসের ভক্তির কথা। এর জন্য মূল্য হিসেবে যদি ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়, তবে তা বিসর্জন দেয়ার জন্য ইতালীয় জনগণ প্রস্তুত। ইতালি আবার সিজারের মাপের রাষ্ট্রনায়কের জন্ম দিয়েছে। এই স্বৈরশাসক অসাধারণ সাহসী বাগ্মী, জনগণের নিঃসংশয় ভক্তির পাত্র। এই স্বৈরশাসক স্বীয় জাতিকে সবল ও একতাবদ্ধ করতে আগ্রহী। নেপোলিয়নের মতো তাঁর মধ্যে পররাজ্য লোলুপতা কাজ করে না, অথচ দীর্ঘকাল সে রকম আশংকা পোষণ করা হয়েছে।

ইতালীয় নেতার অসামান্য বৈশিষ্ট্য, তিনি যেভাবে ইতালীয় জনগণের অবসন্নতা ও নৈরাশ্য দূর করেন, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বিগত যুদ্ধে শেখা সকল গুণাবলি সমর বিভাগে সঞ্চারিত করেন, তাঁর জনপ্রিয় স্বপ্ন-কল্পনা জাগ্রত করার দক্ষতা, উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করার ক্ষমতা, শিল্প-কারখানায় বিশৃঙ্খলা দমনে সার্থকতা, অন্যান্য দেশেও প্রশংসা কুড়ায় এবং বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী বা দল গঠন করা হয়।

ষোড়শ ব্যাভারীয় পদাতিক বাহিনীর বিজার্ভ ডিভিশনের জনৈক লান্স করপোর‍্যাল গ্যাস আক্রমণে অন্ধ হয়ে শুয়ে আছেন একটি জার্মান হাসপাতালে, যুদ্ধবিরতির দিবসে (Armistice Day)। এই লান্স-করপোর‍্যাল যুদ্ধজনিত পঙ্গুতা কাটিয়ে ওঠার পর উপলব্ধি

করেন যে কমিউনিস্ট এবং মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে জার্মান জবাব যা হওয়া উচিত তার অপেক্ষিলেখ 'ছুচা' করেছেন ইতালির জন্য। এর পিতা ছিলেন অস্ট্রিয়ার কাস্টম দপ্তরের কর্মচারী, নিজে ছিলেন পেশাদার হাউস পেইন্টার। জন্মগ্রহণ করেন ২০ এপ্রিল, ১৮৮৯ সালে এই লাল করপোর‍্যালের নাম এডলফ হিটলার। তিনি সীমান্ত রণাঙ্গনে বিভীষীর বেশে যুদ্ধ করার পর হাসপাতালের শয্যায় জেগে উঠে দেখেন যে তার পিতৃভূমির অবস্থান এখন সর্বনিম্নে, সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, দেশের বাইরে বৈপ্লবিক শক্তির জয়যাত্রা, অভ্যন্তরে সোস্যাল ডিমোক্রাটরা ক্ষমতা দখল করেছে। এই তরুণ সাব্যস্ত করেন যে ইতালীয় দলের আদর্শ অনুসারে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে। তিনি ছিলেন কঠোর, স্বপ্ন বিলাসী, ইহুদির বিরোধিতায় প্রায় অর্থোন্মাদ, হিস্টিরিয়ারোগে গ্রস্ত, নিরক্ষর, স্বদেশিকতাবোধে দীপ্ত, এবং টিউটনিক গর্বে গরীয়ান। তিনি জানতেন এই দেশ কতো বড়ো ছিলো। তিনি অনুভব করেন যে শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরে এই দেশটি আবার বড়ো হতে পারে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্মুখ সারির লোক এবং জাতিগত বিভেদনীতিতে উগ্র বিশ্বাসী বলে সোস্যাল ডিমোক্রেট, কমিউনিস্ট, ইহুদি এবং উদারপন্থীদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না। রাষ্ট্রই শক্তি, এই চিরায়ত জার্মান মতবাদ, যা হেগেল, বিসমার্ক এবং ট্রেইটশেকেরও প্রিয় ছিলো, তাঁর দেহের প্রতিটি শিরায়-মজ্জায় মিশে গিয়েছিলো।

তাঁর বন্ধুরা, যাদের অনেকেই ছিলেন নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী, আবার অনেকে ছিলেন একেবারে নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডা-পাণ্ডা, নিজেদের অভিহিত করতেন জাতীয় সমাজতন্ত্রী হিসেবে। এদের সংক্ষেপে বলা হতো নাৎসি (১৯২০ সালের দিকের কথা)। এদের দাবি হলো সকল জার্মানকে একটি কেন্দ্রীয় জার্মান রাষ্ট্রে একত্রিত করতে হবে, বাতিল করতে হবে সকল শান্তি চুক্তি, হারানো উপনিবেশগুলো জার্মান অধিকারে ফিরিয়ে আনতে হবে, ইহুদিদের করতে হবে ভোটাধিকারহীন, গঠন করতে হবে জাতীয় সেনাবাহিনী, আর বৃহৎ দোকানপাটগুলো করতে হবে রাষ্ট্রায়ত্ত। এরা হিস্ত্রেতার সঙ্গে শান্তিবাদ, বিশ্বজনীনতা এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। এরা অত্যুগ্র জার্মান স্বদেশিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ, ইচ্ছাশক্তি তাদের প্রধান সহায় (এটি তারা কিছুতেই বর্জন করতে রাজী নয়)। এর জন্য তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে সাফল্যের মুখ দেখে। প্রধানত ১৯২৩ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে লিখিত তাঁর আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী মাইন ক্যাম্পে হিটলার ইহুদি জাতি ও খ্রিস্টীয় নীতির বিরুদ্ধে জার্মান ধরনে বিষোদগার করেন : "এই জগতের বিরাট বিপ্লবগুলো সম্ভবপর হতো না যদি তাদের চালিকা শক্তি উগ্র, এমনকি হিস্টিরিক্যাল বা উন্মত্ত আসক্তি না হয়ে কেবল হতো শান্তি ও শৃঙ্খলা। তবু আমাদের বিশ্ব এক বিরাট বিপ্লব অভিমুখে এগিয়ে চলেছে, এখন শুধু একটা প্রশ্নই উঠবে : ঐ বিপ্লব কি আরিয়ান জাতির মুক্তির বাণী বহন করে আনবে, নাকি এটিও হবে চিরায়ত ইহুদিদের মুনাফার ভিন্ন একটি উৎস।" প্রকৃত জাতীয় রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য হবে একটি উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা (প্রধানত দেশের তরুণদের জন্য), যাতে দুনিয়ার সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ সিদ্ধান্তের জন্য তৈরি থাকতে পারে। এই সড়ক অনুসরণ করে যে জাতি এগিয়ে যাবে সে হবে বিশ্বজয়ী। প্রকৃত জাতীয় রাষ্ট্রের সামগ্রিক চরিত্র ও শিক্ষা সার্থকতা লাভ করবে জাতিগত বিভেদনীতি উপলব্ধির ভেতর। তরুণরা জাতিবোধে আপ্লুত হবে সর্বাংশে। কোনো বালক বা বালিকা বিদ্যালয়ের অঙ্গন পরিত্যাগ করতে পারবে না যতোক্ষণ না রক্তের বিশুদ্ধতার গুরুত্ব এবং অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়।

জার্মান প্রজাতন্ত্র যাত্রা শুরু করে গভীর হতাশা এবং সামগ্রিক পরাজয়ের ভেতর। প্রজাতান্ত্রিক সরকার যুদ্ধ বিরতিতে স্বাক্ষর করে, তারাই আবার স্বাক্ষর করে ভার্সাই সন্ধিতে যাদের ভেইমার অ্যাসেম্বলি, যা খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ১৯১৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মিলিত হয়, জার্মান জাতির ব্যাপক সমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়। অতএব বলা যাবে না যে মুষ্টিমেয় লোকেরা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেনি, তবু এর জন্ম কালে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়, এবং সূচনাতেই যে গ্লানির ভেতর নিমজ্জিত হয় তা কারো পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। কোনো কোনো জার্মানবাসী তা কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবেন না।

শুরু থেকেই প্রজাতন্ত্রের উপর ঝড়ো হাওয়ার আক্রমণ শুরু হয়। একদিকে কমিউনিস্ট এবং স্পার্টাসিস্ট, অপরদিকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং রয়ালিস্টরা প্রজাতন্ত্র উৎখাতের জন্য কাজ শুরু করে। এই বিরোধী শক্তিগুলোর একটিও কমজোর ছিলো না। সমগ্র মধ্য ইউরোপে, এবং জার্মানিতে সবচেয়ে বেশি রুশ বিপ্লবের কাহিনী কায়িক শ্রমিকদের মনে গভীর রেখাপাত করে। বোলশেভিকদের ক্ষমতা লাভের সঙ্গে যে হিংস্র পাশবিকতা ও দুর্দশা জড়িত তা এই সত্য নস্যাৎ করতে পারেনি যে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়াতেই প্রথম প্রভুদের ক্ষমতাচ্যুত করেছে এবং ঐ বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করছে দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থে। ফলে শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে স্পার্টাসিস্টদের মতবাদ ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এদের পবিত্র বিধান অনুসন্ধান করতে হবে মার্ক্সের রচনাবলীতে। এদের বিদ্রোহের দর্শন খুঁজতে হবে রোজা লুক্সেমবার্গের প্রচার পুস্তিকায়। কিন্তু স্পার্টাসিজম ছিলো অসার তর্জন গর্জন মাত্র। এদের ছিলো সামরিক নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা এবং সংগঠন শক্তির ঘাটতি। এদের বিরুদ্ধে যে সরকার, সে সরকার যুদ্ধের কারণে দুর্বল হয়ে পড়লেও, সরকারি কর্মচারিদের আন্তরিক সহায়তা পেয়েছে, নিয়মিত বাহিনীর অফিসাররাও সরকারকে নানাভাবে সমর্থন করেছে। কেরেনস্কি ছিলেন ভগ্নহৃদয়। তার চেয়ে ভাগ্যবান প্রেসিডেন্ট এবার্ট। সরকার পরিচালনার সকল উপাদান তিনি হাতের কাছে পেয়েছেন। সবার উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন নসকে—জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সময়োচিত এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নসকে স্পার্টাসিস্টদের দমন করেন। প্রজাতন্ত্র রক্ষা পায়।

কাইজারের প্রতি জনগণের সহানুভূতি কমই ছিলো। একটি সামরিক জাতির জন্য এটি যথেষ্ট নিন্দাবাদ যে তিনি পরাজয়ের মুহূর্তে বাহিনী পরিত্যাগ করেন। তবে একটি কাঁচা সমাজতান্ত্রিক সরকারকে হেনস্ত করার জন্য দেশে সামরিক, আন্তর্জাতিক এবং সাম্রাজ্যবাদী অনুভূতির ঘাটতি ছিলো না। উক্ত সমাজতান্ত্রিক সরকার আবার বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণের মূল্যে শান্তি ক্রয় করে। ১৯২০ সালের ড. কাপের বিপ্লব প্রচেষ্টা (Putsch) একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত : ভেইমার প্রজাতন্ত্রের অনিশ্চিত শৈশবাবস্থায় বলিষ্ঠ ও আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করে নগরী দখল খুবই সহজ ছিলো। একজন অখ্যাত রাজতন্ত্রী, ড. কাপ তাঁর নৌবিগ্রেড দ্বারা বার্লিনের উপর অবরোধ আরোপ করেন, সরকার স্টুটগার্টে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তবু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ক্ষত তখনো এতোটা তাজা যে কোনো আকারে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। জার্মানির জনগণ তাদের পর্যাপ্তকার প্রেসিডেন্টের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যায়, কাপ হন পরাস্ত, কোনো প্রকার সশস্ত্র সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই। শুধু সাধারণ ধর্মঘট নামক গণতান্ত্রিক তথা কার্যকর অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়।

সর্বোপরি একটি বিপদ, বৃহত্তর বিপদ একে বলা যায়, থেকে যায়। জার্মানরা এখন ক্ষুধার্ত, অবসন্ন, অধঃপতিত, নিরস্ত্র, তবু সচেতন। যদিও বিরাট অর্জন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করে প্রতারিত। এদিকে ফ্রান্স দাঁড়িয়ে আছে জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয়ী মিত্র জোটের সম্মুখভাগে। ভার্সাই সন্ধির দলিলপত্র মাথার উপরে নিয়ে আন্দোলিত করছে এবং দলিলের শর্তাদি পূরণের জন্য একের পর এক চাপ দিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্স কর্তৃক শান্তিমূলক ব্যবস্থা দাবির প্রতিভূ পঁয়েকার, একজন কাঠখোট্টা, বলিষ্ঠ এবং পরিশ্রমী আইন বিশারদ। বলা হয়ে থাকে যে সমরবাদী সাম্রাজ্যের জায়গায় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে জার্মান মানসের উন্নয়ন সাধিত হবে, কিংবা ইংরেজরা যেমন যুক্তি দেখান যে জার্মানি ধ্বংস হলে দুর্ভোগ পোহাতে হবে গোটা ইউরোপকে, তা লরনের কঠিন-হৃদয় আইনবিশারদের কাছে পাত্তা পায় না। তিনি চান ক্ষতিপূরণ এবং নিরাপত্তা-ক্ষতিপূরণ এখনই, নিরাপত্তা সকল সময়ের জন্য। এবং যেহেতু তিনি জার্মানরা দরিদ্র, এই কথাটা মানতে রাজি নন, বরং মনে করেন জার্মানরা ঋণগ্রহীতা হিসেবে প্রবঞ্চক, সব সময় অসাধু কায়দায় দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করে। অতএব তাদের উপর সামরিক দখলের বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত। কথা মতো কাজ। জার্মানদের প্রবল ক্ষোভের মুখে তিনি রাইনল্যান্ডে কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বারা গঠিত ঔপনিবেশিক বাহিনী প্রেরণ করেন। এতোটুকুতে সন্তুষ্ট না হয়ে পঁয়েকার রুর অঞ্চল দখল করেন এবং যার বিরুদ্ধে প্রতিটি বৃটিশ দল প্রতিবাদ জানায়, যা থেকে সৃষ্ট দুর্ভোগের সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে সংশোধনের পথ আপনা-আপনি খুলে যায়। ১৯২১ সালে ক্ষতিপূরণ কমিশন ফরাসি ও বেলজিয়ান চাপে জার্মানির এতদ্‌সংক্রান্ত ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করে ৬,৬০০ মিলিয়ন। এই অদ্ভুত ও অসম্ভব দায় এড়ানোর জন্য, জার্মানরা একটা উপায় উদ্ভাবন করেন। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে মার্কের মূল্য কমিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির পথ নিষ্কন্টক নয়। এই পথ একবার অনুসরণ করলে নিয়ন্ত্রণ আর নিজের হাতে থাকে না। ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে, যখন ফরাসিরা রুর অঞ্চলে প্রথম প্রবেশ করে, আশি হাজার মার্কের প্রয়োজন হতো একটা স্বর্ণমুদ্রা (সভরেন) বা এক পাউন্ড ক্রয়ের জন্য। অক্টোবর মাসের মধ্যে এই অংক দাঁড়ায় ১১২,০০০ মিলিয়ন। অনেকে রাতারাতি পরিণত হন হীন-দরিদ্রে। গোটা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এবং সকল শ্রমজীবী (যারা নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দেহ খাটিয়ে জীবন ধারণ করেন) গভীর দৈন্যদশায় নিমজ্জিত হন। উপরন্তু যখন এই আর্থিক ট্রাজেডির গভীরতা ও চরিত্র গোটা বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তখন সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ফ্রান্স ও জার্মানি, উভয়ের জন্য ক্রমান্বয়ে জটিল ও অসুবিধাজনক রূপ ধারণ করে। একদিকে ফরাসি বাহিনী রুর অঞ্চলের জার্মান শিল্পের টুটি চেপে ধরে, অপর দিকে, জার্মান খনির মালিক ও শ্রমিকরা (বার্লিন সরকার এদের অর্থ যোগায়) নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করায় ফরাসিদের মূল লক্ষ্য হাসিল হয় না। রুর অঞ্চল দখল করে তারা কিছুই পায় না। এই তিক্ত সংঘর্ষ অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে না। শরৎকালে জার্মানরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ পরিত্যাগ করে এবং ১৯২৪ সালের গ্রীষ্মকালের গোড়ার দিকে মুদ্রা সংস্কারে হাত দেয়। ফরাসি ফ্রাংকের মান পঞ্চাশ শতাংশে কমে যাওয়ায় পঁয়েকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং আমূল সংস্কারপন্থি নেতা হেরিয়টকে আহ্বান জানানো হয় ক্ষমতা গ্রহণের জন্য। ফরাসিরাই এটা করে। অতঃপর তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই তিনটি পদক্ষেপ কিছুকালের জন্য ইউরোপীয় রাজনৈতিক আবহের উন্নতি ঘটায়।

অন্তর্ভুক্ত তিনটি হলো : ১৯২৪ সালের ডস নিষ্পত্তি ; ১৯২৫ সালের লোকার্নো সন্ধি ; এবং ১৯২৬ সালে জার্মানির জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ।

যুদ্ধ ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। যুদ্ধের আগে আমেরিকা ছিলো ইউরোপের কাছে দেনাদার, অতঃপর সে এতো বড়ো মাওনাদারে পরিণত হয় যে তা কল্পনাও করা যায় না। ১৯২৩ সালের শেষ দিকে (রুর অঞ্চল দখলের বছর) যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন বৈদেশিক সরকারগুলোর কাছে দাবির পরিমাণ দাঁড়ায় কাল্পনিক অংক : ২,৩৬০ মিলিয়ন। এর মধ্যে গ্রেট বৃটেনের কাছে সুদে আসলে মিত্র দাবির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯২০ মিলিয়ন। তাহলে ওয়াশিংটনের সরকার কিভাবে দেনাদার দেশগুলোর অর্থনৈতিক সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে? যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী মন্ত্রী মি. হিউজ এ সময় বলেন (সেই ১৯২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর), "রাষ্ট্রবিদদের অবশ্যই এক মত হতে হবে যে জার্মানি কতোটা পরিশোধ করতে সক্ষম।" বিদেশ মন্ত্রী মি. হিউজ অত্যন্ত খাঁটি কথাটি বলেন, সে যা হোক, রাষ্ট্রবিদগণ যদি ব্যর্থ হন তাহলে বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদগণ নিশ্চয় একটা উপায় উদ্ভাবন করতে পারবেন। এখানেই ডস কমিটির গুরুত্ব। এই কমিটি আলোচনায় বসে জনৈক মার্কিনীর সভাপতিত্বে ১৯২৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর। এদের অনুপ্রাণিত করে আমেরিকার সরকার। এই কমিটি নির্ধারণ করবে জার্মান সরকার কতোটা পরিশোধ করতে সক্ষম। কমিটির সবাই বিশেষজ্ঞ, তারা ব্যবসায়িক পরিবেশে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করবে। এই কমিটির প্রধান সুপারিশগুলো তুলনামূলক বিচারে ছিলো মূল্যহীন। কারণ, তারা যেসব সুপারিশ করে, যেমন স্থগিতাদেশ, বৈদেশিক ঋণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ইত্যাদি সুপারিশগুলো পরবর্তীকালে ব্যাপক হারে সংশোধন করা হয়। ডস প্রতিবেদনের প্রকৃত তাৎপর্য এখানে যে, বেয়নেটের ভয় দেখিয়ে জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের বোকামিপূর্ণ প্রচেষ্টা অতঃপর বর্জন করা হয়। এরপর যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তার ভিত্তি সহযোগিতা। এর সঙ্গে দেনাদার দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরবর্তীতে, লন্ডনে এক সম্মেলনে (আগস্ট, ১৯২৪) হেরিয়ট উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং রুর অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিতে সম্মত হন। রাইনল্যান্ড থেকেও সেনা প্রত্যাহার করে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো লোকার্নো চুক্তি। একটা শান্তি চুক্তি করে জার্মানি ও ফ্রান্সের সীমান্তের নিশ্চয়তা প্রদানের ধারণা তখনকার সামরিক চিন্তা-ভাবনার এতোটা প্রতিকূলে যায় যে, এটা ভাবাই যায়নি যে বিষয়টা কোনো চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। ১৯২২ সালে এ ধরনের চিন্তা ফরাসিরা সরাসরি বাতিল করে দেয়। ১৯২৫ সালে এটি কার্যকর করা সম্ভবপর হয় এজন্য যে প্রধান তিনটি সংশ্লিষ্ট জাতির প্রতিনিধিত্বকারী তিনজন নেতা, স্ট্রেসেম্যান, ব্রিয়া এবং নেভিল চেম্বারলেন ছিলেন সেই জাতের রাষ্ট্রবিদ, যারা ঝুঁকি গ্রহণ করেও ইউরোপে শান্তি স্থায়ী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এটি একটি আনন্দদায়ক কাকতালীয় ঘটনা যে এই তিনজন নেতা শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করতেন। স্ট্রেসেম্যান (জঙ্গীবেশী সাম্রাজ্যবাদী) এমন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যে চুক্তির অধীনে আলসেস ও লরেন ছাড়-ছাড়া করতে হবে। এর জন্য তাকে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়েছে : নেভিল চেম্বারলেনও পর্যাপ্ত সাহসের পরিচয় দেন ; কারণ তার দেশকে অঙ্গীকার করতে হলো যে সে ফ্রান্সের বিরোধিতা করবে, যদি দেশটি জার্মানি আক্রমণ করে, এবং জার্মানির

বিরোধিতা করবে, যদি দেশটি ফ্রান্স আক্রমণ করে, প্যারিসের গণমত বিবেচনা করেও বলতে হয় যে ব্রিয়ার পক্ষেও কাজটি করা সহজ ছিলো না, কারণ তাঁর দেশ সব সময় স্বপ্ন দেখে এসেছে যে রাইনের ওপারের সুপ্রাচীন শত্রু দেশটির বিরুদ্ধে সে গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে আক্রমণাত্মক এবং রক্ষণাত্মক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবে। সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলোর মোকাবেলা করা হয়। চুক্তি পত্রাদিতে সবাই স্বাক্ষর করেন। ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যেকার যুদ্ধসম্ভব সীমান্তের নিশ্চয়তা প্রদানের দায়িত্ব বৃটেন, ইতালি ও বেলজিয়াম গ্রহণ করে। স্ট্রেসেম্যান এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে পূর্ব সীমান্তের মীমাংসার ব্যাপারে তিনি যদিও সন্তুষ্ট নন (এটি নির্ধারণ করা হয়েছিলো ভার্সাই সন্ধির আওতায়), তবু তিনি বলপ্রয়োগে উক্ত মীমাংসার পরিবর্তনে অগ্রসর হবেন না। ব্রিয়া বলেন, 'A Locarno nous avons parle europeen. Cest une langue nouvelle qu'il faudra bien que l'on apprenne.'[১]

লোকার্নোর পর মনে হলো জার্মানির জাতিপুঞ্জে যোগদানের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। সে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সে পশ্চিমাঞ্চলে নতুন সীমা মেনে নিয়েছে। এবং অঙ্গীকার করেছে যে পূর্বাঞ্চলে সে যুদ্ধংদেহী মনোভাবের পরিচয় দেবে না। সে যে জাতিপুঞ্জের পরিষদে (কাউন্সিল) স্থায়ী সদস্য হিসেবে আসন গ্রহণ করবে বিজয়ীদের পাশাপাশি সেটা চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছিলো। সকল সৎ ইউরোপীয়ান একে স্বাভাবিক ব্যাপার বলেও মনে করতেন। তবু জার্মানির জাতিপুঞ্জে অন্তর্ভুক্তি শেষ পর্যন্ত কয়েকটি অবমাননাকর ও কলঙ্ককজনক ষড়যন্ত্র দ্বারা বাঁধা প্রদান করা হয়। একটি নতুন বৃহৎ শক্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্য হবে এতে কয়েকটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রের মধ্যে ঈর্ষাতাড়িত সন্দেহের সৃষ্টি হয়। পোল্যান্ড, স্পেন এবং এমনকি ব্রাজিল নিজেদের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। ব্রাজিল, ইউরোপীয়দের বিরক্তির কারণ ঘটিয়ে, জার্মানির অন্তর্ভুক্তি ব্যাপারে ভোটো প্রদান করে। অতঃপর সামাল দেয়া হয় পরিষদের পরিধি সম্প্রসারণ করে। এতে ব্রাজিলের কর্তৃত্ব ও প্রভাব হ্রাস পায়।

জেনেভা জার্মানির জন্য কি করতে পারে তা এখন দেখবার বিষয়। যে অ্যাসেম্বলি সর্বসম্মতিক্রমে শাসিত হয় তার কাছে যুদ্ধসম্ভব সীমান্তের সংশোধন আশা করা যায় না। তবে অসম সমরসজ্জাজনিত যে বিক্ষোভ তার প্রতিকার করা জাতিপুঞ্জের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। নিরস্ত্রীকরণের ফলে অর্থনৈতিক সুবিধা হলেও, যেহেতু তা ভার্সাই সন্ধি বলে চাপিয়ে দেয়া, সৈনিকের জাত জার্মানরা তা স্বেচ্ছায় মেনে নেয়নি। জার্মানরা এটা দাবি করার অধিকার রাখে যে হয় তাদের সমরসজ্জা করতে দেয়া হোক, অথবা প্রতিবেশী দেশগুলোর সমর সম্ভার কমাতে হবে। বিরল আবেগাপ্লুত একাত্মতার ভেতর জার্মান তরুণরা দাবি করে যে তাদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা হোক। তারা আরো প্রতিবাদ জানায় যে, পোল ও চেক এবং ফরাসিদের বিমান, ট্যাংক এবং ভারি কামান-বন্দুকের সামনে তাদের অসহায় অবস্থায় রাখা হয়েছে। এ সময় অত্যন্ত জটিল একটি সমস্যা প্রকটিত হয়। সমস্যাটি জটিলতার রূপও ধারণ করে জার্মান খবরের কাগজগুলোর উগ্র প্রচারণার জন্য। তখন বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় যে জার্মানি নিরোস্ত্রীকরণ-প্রয়োগিত

---

১. "লোকার্নোতে আমরা ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলেছি, এটি একটি নতুন ভাষা, এই ভাষা আমাদের শিখতেই হবে।"

সমবেশ পুনরায় সংগ্রহ করছে। এবং গোপনে। সর্বসম্মত নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তনে ফ্রান্সপ্রেম প্রচেষ্টা ছিনে মহব। আধাগোড়া সশস্ত্র শক্তিগুলোও নানা কারণে এ ক্ষেত্রে শুভেচ্ছাভাব সৃষ্টি করে। ফলে একটা সন্দেহ দানা বাঁধে যে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু করার সম্ভাবনা নেই। কয়েকটি বছর চলে যায়, ১৯২৯ সালে স্ট্রেসেম্যান লোকান্তরে গমন করেন। এতে জার্মান প্রজাতন্ত্রের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হয়। অথচ নিরস্ত্রীকরণের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। জাতিপুঞ্জ দীর্ঘ বিলম্ব করায় তা সোস্যাল ডিমোক্রাটদের বিরুদ্ধে যায়। অথচ সোস্যাল ডেমোক্রাটরা সন্ধির শর্তাদি পালন করতে ইচ্ছুক। ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা অভূতপূর্বও প্রস্তুত। দীর্ঘ সাত বছর জার্মানি জেনেভাকে খুশি করার চেষ্টা করে, তবে সে চেষ্টা একেবারে বৃথা যায়।

ঠিক এই সময় জার্মান রাইখের অভ্যন্তরে বিপজ্জনক গৃহযুদ্ধের গন্ধ তীব্রতর হতে থাকে। ১৯১৯ সালের বিপ্লব রাজদরবার ও অভিজাততন্ত্রের শাসনের অবসান ঘটায়। কিন্তু শিল্প-কারখানা এবং মহাজন পুঁজির মালিকদের ভাগ্যের হেরফের করতে পারেনি। সম্পদ ও দারিদ্রের মধ্যে ব্যবধান মার্কের বিপর্যয়ের সময় যতোটা প্রকট হয় তা অন্য সময় লক্ষ্য করা যায়নি। এই নিদারুণ দুর্দশার সময় ফটকা ব্যবসায়ীরা বিপুল বিত্তের মালিক হয়। ফলে, এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, ঈর্ষা ও হতাশার ফসল কমিউনিজম এ সময় জার্মান শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

ইত্যবসরে, পূর্বেকার যে কোনো সময়ের চেয়ে তীব্রতর অর্থনৈতিক দুর্বিপাক জার্মান প্রজাতন্ত্রকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। ১৯২৩ সালের মুদ্রাস্ফীতিজনিত দুর্দশা অনুসরণ করে এসেছিলো পাঁচ বছরের জাঁকালো সমৃদ্ধি। ঐ সময় সাতশত পঞ্চাশ মিলিয়ন বৈদেশিক ঋণের বদৌলতে শিল্প ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ঘটে, নতুন ব্যাংক ও কারখানা খোলা হয়, এবং ব্যাপক ব্যয়ের হরিলুট চলে। এতে বোঝা যায় বিরাট এক মুনাফা শিকারী শ্রেণীর আবির্ভাব আসন্ন। অতঃপর ১৯২৯ সালে নিউ ইয়র্কের আর্থিক বাজারে প্রলয়ংকারী ধস নামে। তৎক্ষণাৎ জার্মানি থেকে মার্কিনী টাকা ফেরত পাঠানোর তাগিদ আসে। জার্মান ব্যবসার জন্য এর ফলাফল দাঁড়ায় বিপর্যয়কর। অনেক ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়, কারখানার শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ে। রাজস্ব খাতে জমা প্রায় শূন্যের কোঠায় ঠেকে। ছয় মিলিয়ন বেকারির জন্য কর্মসংস্থানের সমস্যা, বাজেটের ভারসাম্য আনার দায় দুর্ভাগ্যপীড়িত সোস্যাল ডিমোক্র্যাট মন্ত্রিপরিষদের স্কন্ধে চেপে বসে। অথচ এই দল সম্প্রতিকালে স্ট্রেসেম্যানের প্রয়াণে একজন অনন্যসাধারণ নেতাকে হারিয়েছে।

সংকটকালে, যখন বেকার লোকদের তিক্ত যন্ত্রণার ধ্বনি দেশের সবার কানে পৌঁছছে, কমিউনিজমের লাল নিশান রাস্তায় আন্দোলনে প্রদর্শন করা হয়, তখন গোটা দেশ একটা দলের প্রবল প্রচারণার বন্যায় ভেসে যায়। এই দলের আন্দোলনে প্রকাশ পায় ঝাবতীয় ক্ষোভ এবং একটি নেতৃহীন জাতির সকল আশা-ভরসার কথা। এই পুস্তকের পাতায় এডলফ হিটলার ইতিমধ্যেই প্রথম সারির সৈনিক হিসেবে উল্লেখিত হয়েছেন। তিনি নাৎসি দলের সংগঠক। দেশের ভাবীকাল তাঁর হাতের মুঠোয়। তাঁর লক্ষ্য দেশটিকে ইহুদিমুক্ত করতে হবে। নিরাকরণ করতে হবে কমিউনিজমের ভূত, এবং পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে জার্মান জাতির সামরিক সুখ্যাতি। ১৯২৩ সালে সামরিক 'পুচ' (Putsch) ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি সুস্পষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক পথ ধরেন। হিটলার ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী,

অল্প কথায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করতে পারতেন। দেশবাসীর ভালো মন্দ উভয় প্রকার আবেগ তাঁর বক্তৃতায় ভাষা পেত। তাঁর প্রচারণায় আধুনিক ছলাকলার কোনো অভাব হতো না। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরের অক্লান্ত প্রচারাভিযানের পর এই অস্ট্রীয় ছুদে মেসাইয়া হতাশাগ্রস্ত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত জাতির মধ্যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস প্রণিত করতে সক্ষম হন। তিনি এতোটা সার্থকতার সঙ্গে সন্ত্রাসী কায়দা রপ্ত করেন এবং তাঁর বাদামী রঙের কোর্তা পরিহিত ঝটিকা বাহিনী[১] রাস্তা দখল করে যে, তিনি রাইখের চ্যান্সেলর এবং জার্মান রাষ্ট্রের প্রভুপদ লাভ করেন। সরকার তখন এতোটা দুর্বল ছিলো যে এই ঝটিকা বাহিনীর সদর রাস্তায় কুচকাওয়াজ এবং শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি তাদের হুমকি ঠেকাতে পারেনি। সরকারের দুর্বলতা এখানেও প্রকাশ পায় যে ফন পাপেন, এক ধর্নাঢ্য ক্যাথলিক, ওয়েস্টফেলিয়ার অভিজাত ব্যক্তি, রাজতন্ত্রী, আন্দোলনের শিরোভাগে সম্রাটকে ফিরিয়ে আনার দুরাশায় তাড়িত হয়ে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ফন হিন্ডেনবার্গকে হাত করেন নাৎসি আন্দোলনের পক্ষে কাজ করার জন্য।

ভেইমার প্রজাতন্ত্র অনেক ঝড়-ঝাপটা সামাল দিতে সক্ষম হলেও ১৯৩৩ সালের নাৎসি ঝড় সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিন্দুমাত্র মমতাবোধ করা হলো না, কারণ এগুলো দেশের জন্য ভরসা বা সমৃদ্ধি কিছুই আনতে পারেনি। রাইখস্টাগ, জার্মান সংসদ, ছিলো উত্তপ্ত, বিহ্বল এবং অনভিজ্ঞ লোকদের সমাবেশ। তিক্ত মতভেদের কারণে বিভক্তি খুব বেশি। এরা কখনো সরকার পরিচালনার কার্যকর যন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারবে না। এমনকি ব্রুনিং, সর্বশেষ প্রকৃত প্রজাতন্ত্রী এবং ক্যাথলিক সমাজতন্ত্রী, চ্যান্সেলর জরুরি ডিক্রি জারি করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে বাধ্য হন।

তবু ভেইমার প্রজাতন্ত্র জার্মানির কম সেবা করেনি। তবে সেটা এখন ভুলে যাওয়া সুবিধাজনক। একটা তমসাচ্ছন্ন সময়ে ভেইমার প্রজাতন্ত্র মুদ্রার মান ফিরিয়ে আনে, বিদেশী বাহিনীর দখল থেকে পিতৃভূমিকে করে মুক্ত, প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসেবে জার্মানিকে জাতিপুঞ্জের সদস্যভুক্ত করে। এবং মিত্রপক্ষের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ একেবারে কমিয়ে এনে নামমাত্র অংকে দাঁড় করায়। ইউরোপীয় সমাজে জার্মানিকে যথাস্থানে বসানোর প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রজাতন্ত্রী সরকার, এবং তা হিটলারের অনেক আগে। এই হিটলার ক্ষমতা কুক্ষীগত করেন ঝড়ো বেগে, বৈমানিক গোয়েরিং এবং প্রচারবিদ গোয়েবলসের সহায়তায়। অতঃপর ঔদ্ধত্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জ জানান আধুনিক সভ্যতার চার মহাশক্তির বিরুদ্ধে। ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, পুঁজিবাদী এবং ইহুদি।

অকপট ও বেপরোয়া নাৎসি শাসকদের যে দর্শন তা ইতিপূর্বে ভাগনার ও নিৎসের চিন্তা-ভাবনায় খুঁজে পাওয়া যায়। এবং যুদ্ধের আগে হিউস্টন চেম্বারলেন প্রচার করেন যে জাতিই সব কিছুর অন্তঃসার, আর জগতের সকল বড়ো ও মহৎ কার্য সম্পাদিত হয়েছে নর্ডিক জাতিগোষ্ঠীদের দ্বারা। তিনি যুক্তি দেখান যে খ্রিষ্ট, বাস্তে, টমাস একুইনাস অবশ্যই নর্ডিক ছিলেন, এবং প্রাচীন জার্মান জাতির একটি অংশ, গথরা, যারা টিউটনিক জাতির সগোত্র, সভ্যতার জন্য রোমকদের চেয়ে অনেক বেশি অবদান রেখেছেন। তাছাড়া একজন হিটলার জাতিগত বিভেদনীতিতে বিশ্বাসী। কোনো ইহুদি জার্মান রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে

১. S A (Sabutz Abteilung) রূপে পরিচিত।

না। বাইবেলের পুরাতন প্রস্তাব ও ক্রুসিফিক্স সংশয়ের উর্ধ্বে নয়। একটি ইহুদিদের প্রকাশনা, অপরটি ইহুদি জাতির প্রতীক। বাস্তবিকপক্ষে, উক্ত আন্দোলনের গঠনধর্মী ভাবুকরা ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করেছেন যে, খ্রিস্টান গসপেলের নীতির সঙ্গে সেই রাষ্ট্রের দর্শনের সমন্বয় অসম্ভব যে রাষ্ট্র মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে ঠাট্টার বস্তু বলে মনে করে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে উদার ও বিশ্বজনীনতার নীতির অধ্যাপকদের তাড়িয়ে দেয়, এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে স্বাধীনতা ও দানশীলতার ধারণা সমূলে নিরাকরণ করে।

ভটান (Votan), খ্রিষ্টান নন, এদের অনেকে ঘোষণা করেন, নাৎসি ধর্মের[১] প্রকৃত ভগবান। সৌভাগ্যক্রমে, যেহেতু সন্ত্রাসবাদী কায়দায় নাৎসি দল ও নাৎসি রাষ্ট্রকে অভিন্ন করা হয়েছে, তাই অনেকে দলের পতাকা বহন করলেও দলের নীতি গ্রহণ করেননি। জার্মান রাষ্ট্র থেকে খ্রিষ্টান ধর্ম একেবারে নিরাকরণ করাও সম্ভব হয়নি। প্রটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক গির্জাগুলোতে সাহসী লোকেরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে তাদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করা হচ্ছে।

হিটলার এবং তাঁর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জার্মানির অভ্যন্তরে যে বিপ্লব সাধনে সক্ষম হন তা ছিলো অনন্যসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা। কমিউনিজম ভীতি, ইহুদি ও মুনাফা শিকারীদের প্রতি ঘৃণা, বহির্বিশ্বে পুনরায় ভীতিকর অস্তিত্ব হিসেবে গণ্য হবার অভিলাষ, শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজনীয়তা, প্রজাতন্ত্রের চেয়ে উন্নতিশীল ও আশাবাদী হবার খায়েস (যা শান্তি চুক্তিগুলো অস্বীকার করবে, এবং আরো একবার জার্মানিকে উচ্চাভিলাষ ও মর্যাদার পথে নিয়ে যাবে), ইত্যাদি হিটলারবাদ বিজয়ী হবার অনুকূলে অবদান রাখে। ইতালিতে ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি জার্মানিতে হিটলারবাদের ক্ষেত্রে পুরাতন সৈনিকরা, যারা গত যুদ্ধে দেশের সেবা করেন পরিখাগুলোতে এবং বর্তমানে দারিদ্রক্লিষ্ট, এদিকে ইহুদি মুনাফা শিকারীরা তাদের আড় চোখে দেখে, নাৎসি আন্দোলনে দলে দলে নাম লেখায়। জার্মানরা সব সময়ই সমগ্রতাবাদী। হিটলারবাদের তাৎপর্য এখানে যে, এতদ্‌কালে উদ্ভাবিত সকল প্রকার জাতীয়তাবাদের মধ্যে এটিই সবচেয়ে সমগ্রতাবাদী। কোনো শ্রেণী থাকবে না, কোনো দল থাকবে না। ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে না, আধা-স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য কিংবা পুরাতন জার্মান ফেডারেল ব্যবস্থা থাকবে না, থাকবে শুধু কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন নিগমবদ্ধ একটি রাষ্ট্র (আগাগোড়া নাৎসিদের তৈরি), সবাই একই রঙের কোর্তা পরিধান করবে, সবাই একই ধরনের অভিবাদন জানাবে, সর্বদা একই বুলি আওড়াবে, একই ধর্মবিশ্বাস পোষণ করবে। এই সমরূপ, সাধারণীকৃত জার্মানি শুধু একজন নেতার কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ করে নিজেকে গণ্য করবে স্বয়ম্ভর। তাঁর ঝটিকা বাহিনী কর্তৃক নগরীর রাস্তাগুলোর দখল কায়েম করার পর নতুন প্রধানের কাজ হবে জাতিপুঞ্জ এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে সশব্দে বেরিয়ে আসা (১৯৩৩)।

জার্মানবাদের এই যে অত্যুগ্র নিশ্চিতকরণ, এর অনেক কিছুই আমাদের কাছে সুপরিচিত। নাৎসি দলের যে বৈদেশিক নীতি তা প্যান-জার্মান লিগের নীতির সম্প্রসারিত রূপ। তারা সকল জার্মানবাসীকে জার্মান পতাকা তলে সমবেত দেখতে চায়। তাছাড়া চায়

---

১. "এ মুহূর্তে, আমরা, জার্মানরা খ্রিষ্টান ধর্মের শিক্ষা থেকে আরো অনেক দূরে সরে এসেছি।" (লুডেনডর্ফ তাঁর ৭৩ জন্মদিনে। টাইমস, ৯ এপ্রিল, ১৯৩৫)

জার্মান জনগণের জন্য নতুন ভূ-খণ্ড। নাৎশিদের যে সমরবাদ, তা জার্মানির জন্য নতুন কিছু নয়। নাৎশিদের শক্তিপূজা কিংবা ভূ-খণ্ড সম্প্রসারণ নীতিও নতুন নয়। কতো সহজে হিটলার জার্মান উদারতন্ত্র উৎখাত করেন তা জেনেও জার্মানির ইতিহাসের কোনো ছাত্র বিস্মিত হন না কারণ মনীষী শিলারের পর জার্মানদের মধ্যে উদারবাদের প্রবাসক কোনো শিক্ষক জন্মগ্রহণ করেন নি, এবং ১৮৪৮ সাল থেকে জার্মান উদারবাদ একেবারে দুর্বল, ঋদ্ধিহীন চারাগাছ। জাতীয় সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের নতুন দিকটা হলো এতে পূর্বতন ফেডারেল ব্যবস্থার বদলে জায়গা করে নেয় এক কেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ, পুরাতন সিভিল সার্ভিস, যা প্রথম বিপ্লবের উথাল-পাথালের ভেতর দিয়ে যায়, একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। তাছাড়া সমরবাদ এখন আর কোনো সাম্রাজ্য, কিংবা অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং একটা সাম্যভিত্তিক গণতন্ত্রের নীতি হিসেবে গৃহীত। যে ধরনের বিপ্লব ১৭৯২ সালে ফ্রান্সকে ভয়ানক সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করে তা ১৯৩৫ সালে জার্মানিকে সশস্ত্র জাতিতে পরিণত করে। এটি একটি নতুন বিষয়। ইউরোপ ও বাকি বিশ্বের এই ব্যাপারটা ভেবে দেখা উচিত।

হিটলারি একনায়কতন্ত্র যদি সামাজিক সাম্যের পক্ষপাতী, তবে তা আসলে গণতন্ত্রের বিপরীতধর্মী। এই তন্ত্র নাগরিকদের শুধু দাসে পরিণত করে না, রীতিমতো রাষ্ট্রের ক্রীতদাসে পরিণত করে। এই যে বিরাট গণতান্ত্রিক বুলি, রাষ্ট্র সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক সুখ নিশ্চিত করবে তা নাৎশি দর্শনের আলোকে বদলে দাঁড়ায় এই নীতি : ব্যক্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্বাধিক বৃদ্ধির জন্য প্রাণপাত করা। নারীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত রাষ্ট্রের জন্য সন্তানের জন্ম দেয়া। পুরুষের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ করা। সর্বোচ্চ মৃত্যু হলো যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ। সর্বোচ্চ সদগুণ হলো শত্রুর মোকাবেলা করা এবং যুদ্ধের যন্ত্রণা বরণ। পয়ষট্টি মিলিয়ন জার্মান অধিবাসী যদি এ ধরনের জীবন নামমাত্রও গ্রহণ করে তাহলে বুঝতে হবে যে এই সুখ্যাত জাতির ভেতর থেকে ভারসাম্য ও নমনীয়তা হারিয়ে গেছে। এই জাতি, জগতের মধ্য একই সঙ্গে অত্যন্ত বীর্যবান ও উৎসাহী, অত্যন্ত কর্মঠ ও বিনয়ী এবং অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ও আবেগপ্রবণ।

১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট ফন হিন্ডেনবুর্গ মৃত্যুবরণ করেন। বিপুল ভোটাধিক্যে, সরকারি চাপের মুখে জার্মান জনগণ 'প্রধান নেতা' হিটলারকে সমগ্রবাদী এই রাষ্ট্রের সার্বিক ক্ষমতা প্রদান করে। আর এটিই ছিলো হিটলারের মূল অভিপ্রায়। তাঁর অতীত কার্যকলাপ কিছুমাত্র বিবেচনায় আনা হলো না। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিকের নির্দয় সন্ত্রাসবাদ বিবেচনার বাইরে রইলো, তাছাড়া এই যে সন্দেহ করা হয় (আদালতের বিচারে যে সন্দেহ বিন্দুমাত্র কমেনি) তিনি গোপনে বাইখস্ট্যাগে (জার্মান সংসদ) অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা করেন (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩) কমিউনিজম ভীতি প্রচারের জন্য, কিংবা ১৯৩৪ সালের ১০ 'জুনের রক্ত-স্নান', যখন তাঁর দলের নেতৃস্থানীয় পাণ্ডাদের (তাঁর প্রথম জীবনের সাঙাৎ ক্যাপ্টেন রম এর অন্তর্ভুক্ত) আকস্মিকভাবে জবাই করা যায়। উপরন্তু তাদের দেহ করা হয় ভস্মীভূত,[১] কিংবা অস্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের চ্যান্সেলর ড. ডলফাসকে খুন করা হয়, মিউনিখের নাৎশি পাণ্ডারাই এই খুনের ব্যবস্থা করে। এর কোনোটিই তখন বিবেচনার মধ্যে আনা হয়নি। এই নিষ্করুণ হত্যাকাণ্ড, অত্যাচার ও নির্যাতন, যা তৃতীয়

১. সরকারি জবাই-র সংখ্যা ৭৭। তবে মনে হয় ১,৩০০ জন মারা গেছেন।

শতাব্দীর রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাস স্মরণে আনে, চোখ বুজে ক্ষমা করা হয়। কারণ এটুকুই যথেষ্ট ছিলো যে হিটলার, কোনো ভাগনার অপেরার বন্য বীর, গর্বিত, একতাবদ্ধ এবং বেপরোয়া জার্মানির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৩৫ সালের বসন্তকালে তিনি যখন ভার্সাই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক লোক ভর্তির নিয়ম পুনরায় চালু করেন তখন সারা দেশ প্রচণ্ড আনন্দ-উল্লাসে কেঁপে উঠে।

তিনি ছিলেন পয়গম্বর, প্রশাসক নন। তিনি নেপোলিয়ন কিংবা মুসোলিনি ছিলেন না। হিটলার দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসন পরিচালনার মেধায় বঞ্চিত ছিলেন। তাঁর সম্মোহনী বক্তৃতা এবং নাৎসি প্রচারণার (প্রক্রিয়ায় কদর্য, শাসনে কার্যকর) পেছনে দাঁড়িয়ে যায় প্রবীণ সৈনিকরা, আমলারা এবং শিল্পকারখানার মালিকরা। কোনো কোনো বিষয়, যেমন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ, কিংবা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক যুদ্ধকে এখন আর লাভজনক মনে করা হয় না। তৃতীয় রাইখের ভূ-খণ্ড সম্প্রসারণের জন্য এর চেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল মাধ্যম হলো গণভোটের সুবিধা গ্রহণ। এই সুবিধা প্রথম কাজে লাগান ফরাসিরা ১৭৯৯ সালে। সম্প্রতি কাজে লাগে সার উপত্যকা প্রশ্নে (১৯৩৫ সালে) এবং তা সুফল বয়ে আনে। অস্ট্রিয়া, জার্মান সুইজারল্যান্ড, শ্লেসভিগ এবং সাইলেসিয়ায় গণভোট থেকে কি প্রত্যাশা করা যায়? এটা স্বাভাবিক যে নাৎসিরা অনেক সুখ-স্বপ্ন দেখবে। দেশের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জার্মানরা তার সহযোগী। রেড রাশিয়া তার সাক্ষাৎ শত্রু। এই রেড রাশিয়া নামক ভূত, সুবিশাল, জনবহুল, বড়ো বেশি সমরসম্ভারে সজ্জিত, প্রচারবাদী একটি রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্র, বলা হয়ে থাকে গোপনে সাত মিলিয়ন জার্মানবাসীর আধ্যাত্মিক আনুগত্য ভোগ করে থাকে। এই ব্যাপারটা জার্মানির নীতি নির্ধারকদের সর্বদা তাড়া করে। আর এটা অন্য যে কোনো কারণের চেয়ে বেশি তৃতীয় জার্মান রাইখের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা বিধান করে।

অতঃপর দেখা যাবে যে বিংশ শতাব্দীর জন্য নতুন এই তিনটি সরকার পদ্ধতি, রুশ কমিউনিজম, ইতালীয় ফ্যাসিবাদ এবং জার্মান হিটলারতন্ত্র সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত। এই সংসদীয় গণতন্ত্রের শেকড় প্রোথিত ১৬৮৮ সালের ইংরেজ বিপ্লবে কিংবা ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবে। হেগেল ও মার্ক্সের মতবাদ বিরোধিতা করছে লক ও রুসোর দর্শনের।

এই সংসদীয় সরকারগুলোকে কিছুতেই নিখুঁত বলা যায় না। ফ্রান্সে কর্মসম্পাদনা বিভাগ খুবই দুর্বল। আবার আইন পরিষদ খুবই শক্তিশালী। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে ফরাসি মন্ত্রিসভার গড় স্থায়িত্বকাল ছিলো মাত্র আট মাস পঁচিশ দিন। মন্ত্রিসভার এতাদৃশ পরিবর্তন সরকারের দৃঢ়তা ও ধারাবাহিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এর প্রতিকার সবার জানা, এবং তা কোনো মতেই বৈপ্লবিক নয় (সন্নিযুক্ত কমিটিগুলোর বিলোপ সাধন। এই কমিটিগুলো মন্ত্রীদের দায়িত্ব কেড়ে নেয়। তাদের তোয়াক্কা করে কম। প্রধানমন্ত্রী সিনেটের সম্মতি ব্যতিরেকে চেম্বার বা সংসদ বিগঠনের ঘোষণা দেন, তার এই অধিকারও নাকচ করতে হবে। এ দুটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)। তাই বলে এই কাজগুলো করা মুখের কথা নয়। সাধারণ মানের লোকেরা এ ক্ষেত্রে সফল নাও হতে পারেন, যেখানে প্রজাতন্ত্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডুমার্গ (Doumergue) গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হন (ইনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন অস্বাভাবিক করতালির ভেতর) যখন গভীর সঙ্কট সমুপস্থিত, চেম্বারের মর্যাদা ধূলিসাৎ স্টাভিস্কি প্রতারণার কারণে। প্রশাসনিক কিংবা আইনি সংস্কার বৃহত্তর

জনগণের জন্য যতোই হিতকর হোক না কেন, তা কার্যকর করা খুবই কঠিন হয় যদি সম্পাদনের জন্য এমন কমিটির সম্মতির দরকার করে, যে কমিটির সদস্যরা মনে করেন এতে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। এক্ষেত্রে ফরাসি আইনপ্রণয়নকারী ব্যবস্থার সংস্কারের সঙ্গে ইংরেজদের লর্ডসভার সংস্কারের তুলনা সহজেই মনে আসে।

যখন ইউরোপীয় মহাদেশে একের পর এক সিংহাসনের পতন ঘটেছে, সেখানে বৃটিশ রাজতন্ত্রের শক্তি ও জনপ্রিয়তা নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যে অকৃত্রিম সরলতা ও জনসেবার মনোভাব দেখিয়েছেন রাজা পঞ্চম জর্জ এবং রানী মেরি এবং তাদের বৃহত্তর পরিবারের সদস্যগণ, তা জাতির মনে গভীর ছায়াপাত করে। ভাবী প্রজন্মও সাবালক হয়ে উঠছে না প্রজাতন্ত্রভক্ত হিসেবে। ১৯৩৫ সালে রাজার রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রজাদের মধ্যে যে রাজানুগত্যশীল উৎসাহ-উদ্দীপনার ভাব লক্ষ্য করা যায় তা দেখে যে কোনো সচেতন পর্যবেক্ষকের মনে হবে যে গণতান্ত্রিক এবং সাম্যভিত্তিক সমাজের মধ্যেও শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের জায়গা হতে পারে।

সংসদীয় সরকার নিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যারা এর মর্যাদা খাটো করতে চান কিংবা চান এই পদ্ধতি রদ হয়ে যাক, তারাই নিজেদের জন্য দুর্নাম ডেকে আনেন। এখন পর্যন্ত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না যে জনগণ এই প্রশংসার্হ বৃটিশ নীতি থেকে দূরে সরে যেতে চায় যে, দেশের সরকারের কাজের জন্য মন্ত্রিসভা কমন্স সভার কাছে জবাবদিহি করবে, এবং কমন্স সভার মাধ্যমে নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে জবাবদিহিতা করা হবে। সত্য যে, কাজকর্ম দিনের পর দিন জটিল হয়ে উঠছে বলে পার্লামেন্ট প্রশাসনিক বিভাগগুলোর উপর কিংবা সংবিধিবদ্ধ কোনো নবগঠিত সংস্থার (যেমন লন্ডন বন্দর কর্তৃপক্ষ কিংবা বৃটিশ সম্প্রচার নিগম) উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ অর্পণ করে, এবং যে রকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় এই প্রক্রিয়া আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে। তবে সব সময়ই রাজার একজন মন্ত্রী থাকেন, যিনি এই সংস্থাগুলোর হয়ে সংসদের কাছে জবাবদিহি করেন। কাজ অর্পণ বা কন্টন করা হয় বলেই দায়িত্ব জলো করার কোনো সুযোগ থাকে না। ইত্যবসরে ওয়েস্টমিনস্টারের বিধান প্রণয়নকারী সংস্থার কাছে উত্থাপন করা হয়েছে যে ইম্পিরিয়াল কাজের হিসাব বৎসরে অন্তত একবার চোখের সামনে মেলে ধরা হবে, এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা চলবে। ১৯৩৪ সালে স্যার স্যামুয়েল হোর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া বিল আইনসভায় উত্থাপন করেন। এতে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয় তা ব্যাপক ও জটিল, এবং এতে কয়েক মিলিয়ন ভারতবাসীর ভাগ্য জড়িত। ইতিপূর্বে এতো বড় বিল কখনো আইন সভায় উত্থাপন করা হয়নি। এই বিলের উপর যে দীর্ঘ বিতর্কের সূচনা হয় তা ইংরেজদের সংসদীয় রীতিনীতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের যোগ্য।

শ্রমিক দলের উত্থান উদারতন্ত্রীদলের বিরুদ্ধে ধস ত্বরান্বিত করলেও (দলটি যদিও ১৯১৬ সালের অগ্নির ফাটলের দরুন বিভক্তির পথে এগোচ্ছিলো। কারণ দেখা গেছে, কিছু উদারপন্থি মি. লয়েড জর্জের অধীনে কোটের সরকার সমর্থন করেছে, আবার কেউ কেউ গেছেন মি. অ্যাসকুইথের সঙ্গে বিরোধী পক্ষে) আতংকবাদীদের নিরাশ করেছে। বৃটিশ শ্রমিক দলের নেতারা মি. রামজে ম্যাকডোনাল্ড, মি. (পরবর্তী কালে লর্ড) স্নোডেন, মি. আর্থার হেন্ডারসন, মি. টমাস, মি. স্নাইভেল হেটেই বিপ্লবী ছিলেন না। মি. রামজে ম্যাকডোনাল্ড শান্তিবাদী হলেও হেন্ডারসন দিক থেকে ছিলেন কার্যিক ও হাইন্ডম্যান টোরি। মি. স্নোডেন

হলেন একদম অকল্পনীয়, আমূল সংস্কারবাদী। মি. টমাস পাকাপোক্ত সাম্রাজ্যবাদী। এদের কারো কাছে রাশিয়ার উদাহরণ উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা নয়। ১৯৩১ সালে শ্রমিক মন্ত্রিসভা লাগামহীন ও বেপরোয়াভাবে খরচ করে দেশটিতে বাণিজ্যিক ধস নামানোর জোগাড় করেছিলেন, তখন এই তিন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রক্ষণশীল এবং উদারপন্থিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করেন বাজেটে ভারসাম্য সৃষ্টি এবং দেশের সুনাম পুনরুদ্ধারের জন্য।

সাধারণভাবে যা প্রত্যাশা করা হয়েছিলো তার বিপরীতে দেখা গেল যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলো শিক্ষানবিশী করলে বরং ভালোই হয়। পরবর্তী সময়ে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে তা কাজে লাগে। শ্রমিক দলের নেতাদের গোলমেলে ও অবাধ্য লোকদের বশে আনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিলো। তারা নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে দরকষাকষি করেছে, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভাবের আদান-প্রদান করেছে বিদেশীদের সঙ্গে। কমন্স সভার অধিকাংশ সদস্য না জানলেও তারা জানতেন যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নর-নারী কিভাবে বসবাস করে। অতএব শ্রমিক দলের জ্ঞানের ঘাটতি বিপুল হলেও, দলটিতে ভীড় জমিয়েছে অনেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং যোগ্য ব্যক্তিত্ব। মি. রামজে ম্যাকডোনাল্ড এবং মি. হেন্ডারসন বৈদেশিক দপ্তরে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। মি. স্নোডেন অর্থ মন্ত্রণালয়ে সার্বজনীন প্রশংসা কুড়ান। অন্যত্র অনভিজ্ঞতাজনিত ত্রুটি সংশোধনে সিভিল সার্ভিসের রাজকীয় সহায়তা মেলে। শ্রমিক দল যদিও তাদের সংক্ষিপ্ত দু'টি প্রশাসনে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বড়ো একটা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি, তবে এই দল জাতিকে শিখিয়েছে যে রাজনৈতিক যোগ্যতা এখন আর উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়।

হিটলারি বিপ্লব এটা যথেষ্ট নিশ্চিত করেছে যে রাশিয়ার বিপ্লব পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারবে না। জার্মানির বলিষ্ঠ বুর্জোয়া শ্রেণী ইউরোপের মধ্যভাগের দুর্গ কঠিন হাতে আকড়ে ধরেছে। ফ্যাসিবাদ এবং হিটলারি মতবাদে এমন কিছু থাকতে পারে যা পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলো আয়ত্ত করতে আগ্রহবোধ করবে, তবে নিজেদের মৌলিক চরিত্র পরিত্যাগ করতে রাজি হবে না। প্রকৃত যুদ্ধের অবস্থার কথা বাদ দিলে, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের জনগণ কোনো কালে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে এটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।

'গৌরবজনক ইংরেজ বিপ্লবে'র পর থেকে ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে বৃটেন সর্বাধিক বিজ্ঞতার সঙ্গে শাসিত দেশ। মন্ত্রিসভা বার বার ভুল করেছে, তবে কখনো এতোটা করেনি যে সশস্ত্র প্রতিবাদের সুযোগ ঘটবে কিংবা ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে। বেসামরিক একটি জাতি, যুদ্ধের আঘাত সহ্য করেছে, মিত্রদের আর্থিক সাহায্য যুগিয়েছে, বিনা বাক্যে, তাদের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য অগ্রাহ্য করে, সেনাবাহিনীতে আবশ্যিক ভর্তির আদেশ মেনে নিয়েছে। অথচ এটিকে তারা সবচেয়ে অবজ্ঞেয় ব্যাপার বলে মনে করে। বিস্তৃত শান্তি (অনেক ক্ষেত্রে ফরাসিদের চেয়ে বেশি উৎপীড়িত হয়) তারা অতিক্রম করেছে ধৈর্য ও দক্ষতার সাহায্যে।

পাঁচ মিলিয়ন সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি বেসামরিক কর্মজগতে অনায়াসে প্রত্যাবর্তন করে। এর জন্য একটি গুলিও খরচ হয়নি। পুলিশদের ধর্মঘট, কয়লার খনি মজুরদের ধর্মঘট মি. লয়েড জর্জের জোটের সরকারকে পরপর অসুবিধায় ফেলে। কিন্তু প্রতিবারই অসুবিধা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয়। ১৯২৬ সালের নয় দিনের সাধারণ ধর্মঘট মি. বল্ডুইনের সরকার

একই সঙ্গে দৃঢ়তা ও উদারতার সঙ্গে মোকাবেলা করে। অতঃপর ধর্মঘট আর এগোতে পারেনি। দেশের জনগণের বিরাট অংশ সরকারের পাশে দাঁড়ায়। সরকার পেট্রোল চক্কন এবং অভিনব উদ্ভাবন বেতার সম্প্রচারের সুবিধা কাজে লাগায়। শ্রমিক বিমাকে অনেকে 'ভিক্ষা' বলে নিন্দা করে, তবে তা অনাহার দূরে রাখতে সমর্থ হয়। ফলে তা সম্ভাব্য দুর্ভোগের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। দেশে যে তুলনামূলক শান্তি বিরাজ করে তা ছিলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ অংশত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, অংশত যুদ্ধ চলাকালে রেলপথের বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বৃটেনের কমপক্ষে অতিরিক্ত তিন মিলিয়ন লোকের আহারের সংস্থান করতে হয়। এমনিতেই শ্রমিক নিয়োগের মতো পুঁজির সংস্থান নেই, অথচ শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েই চলে। বেকার সমস্যা (স্বাভাবিক হারের চেয়ে বেশি)। বিমা তহবিলে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। এতে যারা 'অবাধ বাণিজ্য' প্রথার সংস্কার চান তাদের দাবি জোরালো হয়। শ্রমিক দলের নেতা মি. রামজে ম্যাকডোনাল্ডকে ১৯৩১ সালে জাতীয় সরকারের প্রধান হিসেবে বলা হয় সরকারি রাজস্ব সংক্রান্ত স্বাধীনতা বর্জন করার জন্য। রাজস্ব সংক্রান্ত উক্ত নীতি প্রথম সূচনা করেন স্যার রবার্ট পিল, ১৮৪৬ সালে। এতে ঐ সময়কাল পর্যন্ত বৃটেন যে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন করে বাকি বিশ্বে তা ছিলো তুলনারহিত।

এ সময় ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে বৃটিশ জনগণ সবচেয়ে বেশি করের বোঝা বহন করে। ঋণের সুদ হিসেবেই শুধু দেশটিকে বৎসরে তিনশো মিলিয়ন স্টার্লিং গুণতে হয়েছে। যুদ্ধাবসানের পনেরো বছর পরও করদাতার আয়ের প্রতি পাউন্ডের জন্য ৪ শিলিং ৬ পেন্স কর ধার্য করা হতো। যাদের আয় দুই হাজার পাউন্ড ছাড়িয়ে যায় তাদের উপর কর আরোপ করা হতো আলাদাভাবে। এদের উপর ধার্য করা হতো অতি-কর বা সুপারট্যাক্স। তবু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্য বাণিজ্যে মন্দা এবং করের বোঝা অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও সমাজ সেবার মান বড়ো একটা কমানো হয়নি। অথচ এ দেশের মান অন্যান্য দেশের চেয়ে উঁচু ও ব্যয়বহুল। জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গৃহায়ণের প্রতি সকল দল সমান গুরুত্ব দিয়েছে। মার্কের বিপর্যয়কর পতনের পর জার্মানরা নিদারুণ দুর্ভাগের শিকার হয় কিংবা ফ্রাঙ্কের পতনের দরুন ফরাসি বিনিয়োগভোগীরা (rentier) যে চোখে অন্ধকার দেখে, যুদ্ধের পর একজন ইংরেজের ভাগ্যেও তা ঘটেনি। বেকার সমস্যার ক্ষেত্রে দারুণ মন্দা এবং হতাশা কাজ করেছে। অন্যথায়, যে মানদণ্ডেই বিচার করা হোক না কেন সঞ্চয় ব্যাংকের দাখিল, ভ্রমণ, স্কুল ছাত্রদের বুট জুতা, সিনেমা দেখার খরচ, ছুটিছাটা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি ছিলো না। আর শ্রমজীবীদের একঘেয়ে জীবনে এই ছোটখাটো জিনিসগুলোই প্রকৃত আনন্দের খোরাক যোগায়।

বিগত শতাব্দীর প্রথম তিন চতুর্থাংশ সময়কালে বৃটেনের অধিবাসীরা যে অর্থনৈতিক ঊর্ধ্বারোহণ ভোগ করে তা আর অপরিবর্তিত থাকেনি। অন্যান্য দেশ প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিজেরাই তৈরি করে এবং সংরক্ষণমূলক শুল্কের আশ্রয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের কারণে স্বনির্ভর হবার ঝোঁক বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবেই মানচিত্রে অংকিত হয় অতিরিক্ত ছয় হাজার মাইল শুল্ক সীমান্ত রেখা। অতি উৎপাদন, বেকারি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিধি সংকোচন ছিলো অবশ্যম্ভাবী অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বিকাশের সাক্ষাৎ ফলাফল। এটি বৃটেনের ক্ষতি করে সবচেয়ে বেশি। কারণ এই দেশের এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা বসি করে সমুদ্র কূলের এলাকায়।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজদের বিরাট একটা অংশ ইউরোপ মহাদেশ থেকে আলাদাভাবে নিজেদের উন্নতির জন্য চিন্তা-ভাবনা করবে। অন্যের অসুবিধার কথাও হয়তো ভুলে থাকবে। তারা চাইবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ডমিনিয়ন এবং উপনিবেশগুলোর সঙ্গে এক যোগে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্ব-নির্ভরতার পথে যেতে। উপনিবেশগুলোর প্রতি পক্ষপাতিত্বের ধারণা প্রথম কার্যকর করা হয় অটোয়ায়, ১৯৩২ সালে। উপরন্তু সমাধক আকৃষ্ট হবার মতো একটা পরিকল্পনা ছিলো। তা হলো ফ্রি ট্রেড সাম্রাজ্য গঠন। কিন্তু সাম্রাজ্যের অতিরিক্ত সংরক্ষিত ডমিনিয়নগুলোর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাড়া না পাওয়ায় সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তবুও যতোই প্রবল অনুভূতির জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একাত্মতা গড়ে উঠুক, গ্রেট বৃটেনের পক্ষে আর সম্ভব নয় কন্টিনেন্টের রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকা। কিংবা তার পক্ষে আর সম্ভব নয় স্বীয় ব্যবসা-বাণিজ্য উপনিবেশ ও ডমিনিয়নগুলোর সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা। লর্ড স্যালিসবেরির 'চমৎকার অন্তরণ' নীতির পুনরুজ্জীবনের বিপক্ষে অন্য কোনো যুক্তি না থাকলেও আকাশ-পথের বিকাশই যথেষ্ট ছিলো। বৃটেন এখন আর বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয়। যুদ্ধের আগে বৃটেনের স্বার্থ যদি হতো যে জার্মানির উচিত হবে না বেলজিয়ামে সৈন্য প্রেরণ, কিংবা চ্যানেল পোর্টগুলো দখল, কিংবা ফ্রান্সের উপর আধিপত্য বিস্তার, তাহলেও বর্তমানে বৃটেনের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউরোপে এই পরিবর্তনগুলো যেন আর না ঘটে। ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য যেন নষ্ট না হয়।

জাতিপুঞ্জের সদস্য হিসেবে, লোকার্নো চুক্তির জামিনদার হিসেবে, বৃহৎ শক্তি হিসেবে ইউরোপের শান্তি সংরক্ষণের সঙ্গে তার স্বার্থ জড়িত বলে বৃটেন ইউরোপ মহাদেশের কল্যাণ ও শান্তি বজায় রাখার জন্য কাজ করে যেতে বাধ্য। অটোয়া সম্মেলন সত্ত্বেও তার ব্যবসা-বাণিজ্য জগৎজোড়া চলতে বাধ্য, তার বণিকরা আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রে মুনাফার শিকার করবে, করতে বাধ্য। এই ভবিষ্যৎ বাণী বিপণনের ছাত্ররা নিরাপদে কবুল করতে পারে।

ইউরোপীয় মহাদেশের সর্বত্র বিজ্ঞ লোকেরা স্বীকার করেন যে গ্রেট বৃটেন যদি ইউরোপ থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকে তাহলে মহা বিপর্যয় নেমে আসবে। এ জন্য নয় যে বৃটিশরা এই মহাদেশে খুবই জনপ্রিয়। ইংরেজদের আচার-ব্যবহারের কিছু কিছু ত্রুটি সকল বিদেশির কাছে সুস্পষ্ট। কিন্তু অন্তত ফ্রান্সে জার্মানরা যতোটা অজনপ্রিয়, কিংবা জার্মানিতে ফরাসিরা যতোটা মন্দ, ইংরেজরা ততোটা নয়। এটি স্বীকার করা হয় যে এই সুস্থবিবেকসম্পন্ন, অসংলগ্ন এবং স্পষ্টত নির্বোধ জনগণ শান্তি চায়, জাতিপুঞ্জের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানায়, এবং মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে, যা অন্য কোনো ইউরোপীয় প্রথম শ্রেণীর শক্তির পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়।

বর্তমান দুনিয়া যে রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর জন্য নিদারুণ ভুগছে, তার মধ্যে জটিলতম হলো নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা। এই সমস্যা যদি কখনো কিছুমাত্র সুরাহা হয় তার জন্য অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে বৃটিশ মন্ত্রিসভা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জেনেভা সম্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দের। জেনেভা সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিলো আন্তর্জাতিক কাঠামোর উন্নয়ন এবং যান্ত্রিক সমরসজ্জা ঠেকানো। সমরসজ্জা অতীতে যেমন যুদ্ধ ডেকে এনেছে, ভবিষ্যতেও তেমনি যুদ্ধ ডেকে আনতে পারে।

একটি বিচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক দ্বীপের শান্তিকালীন অবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য দু'একজন ব্যতিক্রম বাদে বৃটিশ নীতির এই মৌলিক বিষয়টা দেশের সকল রাষ্ট্রবিদ সঠিক উপলব্ধি করতেন। বৃটিশ বৈদেশিক নীতির পক্ষে একটা কথা বলা যায় এই নীতির ভেতর মানবিকতার অনুভূতি অনুপস্থিত নয়, হতে পারে তা কখনো অসার উচ্চ আদর্শ অনুসারী এবং খেয়ালি, কিন্তু সকল সময় সৎচিন্তাপ্রসূত। এই আদর্শ আসে ওয়েসলি এবং উইলবারফোর্সের মাধ্যমে, সপ্তদশ শতাব্দীর পিউরিটান ঐতিহ্য থেকে। অবশ্য সঙ্গে মিশে গেছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রুক্ষ কঠিন হিসাব। ইউরোপের অন্য কোনো দেশ ইংরেজদের মতো সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে অপর দেশের নির্যাতিতদের জন্য আবেগাপ্লুত হয় না। Pro-vaudois, প্রো-ক্যাটালান, প্রো-ইমিগার, প্রো-সার্ব, প্রো-বুয়ার, প্রো-স্লাভ, প্রো-হেলেনিক, প্রো-ইটালিয়ান, প্রো-বুলগার, প্রো-আর্মেনিয়ান, প্রো-বেলজিয়াম, ইংরেজ আদর্শবাদী, লাভ-ক্ষতির তেমন পরোয়া না করে, তার দেশের কর্মপন্থা নির্ণয়ে সহায়তা করে। আটলান্টিকের বিশাল জলভাগ অতিক্রম করে অ্যাংলো-স্যাকসনদের অপর একটি শাখা রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে তুলনীয় মানবিকতা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভাবে (হয়তো সব সময় যুক্তিশীল হয় না)। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইংরেজদের অনুরূপ, এবং বাকি বিশ্বের জন্য এর ফলশ্রুতি কম নয়। এ জন্যই দেখা যায় যে বৃটেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ নৌ বিজয় ও গৌরবের সময় আমেরিকার সঙ্গে নৌবাহিনীর আকারগত সাম্য বিনা বাক্যে মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলো, অথচ অতীতের কয়েক শতাব্দীতে সমতা মেনে নেয়ার কোনো দাবী সে গ্রাহ্য করতো না। এ ধরনের দাবি ঠেকাতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। ইউরোপীয় মহাদেশের ভাগ্যে যাই লেখা থাক না কেন, বৃটিশরা অন্তত অ্যাংলো-স্যাকসন শান্তির ব্যাপারটা সব সময়ই তাদের কর্মপন্থার অন্তর্ভুক্ত করবে।

আমরা সংগত কারণে আশা করতে পারি যে আমেরিকান ও বৃটিশ জনগণের মধ্যে যে সুপ্রাচীন বিবাদ তার রেশ ১৯২১ সাল থেকে ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে, যদিও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। আয়ারল্যান্ডের বৃটিশ জোয়ালের অধীনে পরাধীন থাকাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা এখন আর বাঁকা চোখে দেখে না। প্রধানত ছয়টি প্রটেস্টানট কাউন্টির বৃটিশদের সঙ্গে সংযোগ কামনা করে। এদের বাদ দিলে আয়ারল্যান্ড কানাডার মতোই স্বাধীন। ডাবলিন কাসল থেকে লর্ড লেফটেনান্ট হাওয়া হয়ে গেছেন, প্রধান সচিব বিদায় নিয়েছেন ফনিক্স পার্কের লজ থেকে, কুরা এবং রয়াল আইরিশ কন্সটাবুলারির সেপাইদের এখন আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে দেখা যায় না। ডাবলিনে আইরিশ সংসদ আইন প্রণয়ন করলে আইরিশ নির্বাহী বিভাগ তা বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আইরিশ সেরোসটাট (Sorostat) বা ফ্রি স্টেট নিজস্ব পতাকা ওড়ায়, বিদেশের রাজদরবারগুলোতে নিজেদের দূত প্রেরণ করে, প্রতিনিধি প্রেরণ করে জেনেভায়, ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে। এই নতুন ডমিনিয়ন বৃটিশ পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করে, উপরন্তু এখন আইন প্রণয়ন করতে পারে যা ইম্পিরিয়াল পার্লামেন্টের সংবিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রিভি কাউন্সিলের সাম্প্রতিক একটি সিদ্ধান্ত (১৯৩৫) থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ডেইল (Dail-ডাবলিন সংসদের নাম) এমন আইনও প্রণয়ন করতে পারে যা ১৯২১ সালের সন্ধির সংস্থানগুলো রদ করতে সমর্থ হয়। অবশ্য এই সন্ধি বলেই আইরিশ ফ্রি স্টেট সৃষ্টি হয়।

[redacted]

সরকারও এই কাজটি করতে গেলে অত্যন্ত পেরেসান বোধ করবেন। অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং বণ্টনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গেলে (জনসংখ্যার বিভিন্ন দাবি পূরণের জন্য) প্রস্পরবিরোধী পড়তে হবে আরো বেশি। অথচ রুশ দেশের কমিউনিস্ট শাসকরা পোলিশ সীমান্ত থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূ-খণ্ডে এই দুটি প্রকাণ্ড আকৃতির কাজ করার জন্য চেষ্টা করেছেন।

এই যে অবস্থা, একটা বিশাল জনগোষ্ঠী নিজেদের জন্য নতুন পথ তৈরির চেষ্টা করছেন এবং বলিষ্ঠতার সঙ্গে অতীতের পুঞ্জিভূত সকল পূর্ব-সংস্কার এবং ঐতিহ্যের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করছে, তা অনেকের মধ্যে কৌতূহল জাগ্রত না করে পারে না। নতুন রুশ রাষ্ট্রের মূল অভ্যন্তরে রয়েছে দুই কিম্বা তিন মিলিয়ন নরনারীর একটি রাজনৈতিক দল, এদের নির্বাচন করা হয় সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাসের যোগ্যতা অনুসারে। প্রয়োজনে সময় সময় এভাবে নির্বাচিত সদস্যদের দলে অবাঞ্ছিত গণ্য করে বহিষ্কারও করা হয়। সাধারণত যারা নির্দিষ্ট জ্ঞান, উৎসাহ এবং বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে পারেন না তারাই হন দল থেকে বহিষ্কার। এই কমিউনিস্ট পার্টি, দরিদ্র ও আনুগত্যের প্রতি নিবেদিত, সংগঠিত হয় সোভিয়েটদের কমিটিসমূহের প্রাধান্য পরম্পরার ভিত্তিতে। এই সোভিয়েটগুলো বিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে এবং জনগণের মধ্যে কোনো প্রকার খোশখেয়াল লক্ষ্য করা গেলে নির্যাতনের মাধ্যমে বশে আনে। কমিউনিস্ট দলের সেবা করেই শুধু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা সরকারি কর্মকাণ্ডের সম্মুখভাগে যেতে পারেন, হতে পারেন জনগণের কমিসার কিম্বা মন্ত্রী, অথবা দখল করতে পারেন দলের মহাসচিবের পদ, রাষ্ট্রের কর্মপন্থার উপর সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করাও সম্ভবপর হতে পারে এভাবে। রাষ্ট্রের নাগরিকরা কোনো কমিটিতে বক্তৃতা করতে পারেন কিংবা ভোট দিতে পারেন রাজনীতিক হিসেবে। আবার অন্য কোনো কমিটিতে যোগ দিতে পারেন উৎপাদক হিসেবে, ভোক্তা হিসেবেও তৃতীয় একটি কমিটিতে একজনের পক্ষে হাজির হওয়া সম্ভব। অবশ্য একটা অধিকার তিনি কখনো ভোগ করতে পারেন না। কমিউনিজমে বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হওয়ার স্বাধীনতা কারো থাকে না।

সোভিয়েটদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছু কিছু ভালো দিকও রয়েছে। কোনো সৎ পর্যবেক্ষকের পক্ষেই তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন সার্বজনীন, তাছাড়া ১৯২৮ সাল থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুতর খামখেয়ালীপনাগুলো করা হয়েছে দূরীভূত। এখন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় স্বাভাবিক নিয়মে। জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং অবকাশ রঞ্জনের প্রতিও নজর দেয়া হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। উপরন্তু, যদিও দক্ষ শ্রমিকের জন্য বিশেষ বেতনের হার নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা এখন অনুভব করা হচ্ছে, তবু পশ্চিমের শিল্প নগরীগুলোতে যে ব্যাপক সামাজিক অসাম্য লক্ষ্য করা যায় তা রুশ সমাজদেহ থেকে প্রায় উঠে গেছে। একটি পশ্চাদপদ দেশের স্বাভাবিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিরাট সহায়তা পাওয়া গেছে তার শাসনাধলের অন্তিম দিনগুলোতে চালু হওয়া ব্যাপক যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য। অনেক নতুন শহর গড়ে উঠছে, চালু করা হয়েছে নতুন নতুন শিল্পকারখানা। তাছাড়া নিয়মমাফিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে দেশের শিল্প উদ্যোগগুলোকে মার্কিনীকরণ করার জন্য। অবশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুনাফা শিকারের সুযোগ রাখা হয়নি। যেহেতু সর্বত্র শ্রমদান বাধ্যতামূলক, অতএব অনিবার্য বেকারত্বের সুযোগ নেই।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কারাগার রেশন হিসেবে ভোগ করতে সমর্থ।

তাহলে অনিবার্য কারণে সমকালীন ইউরোপের যে কোনো পর্যবেক্ষকের সামনে দুটি প্রশ্ন দাঁড়ায় : শান্তি বজায় থাকবে কি? ব্যক্তি স্বাধীনতা টিকবে কি? অতীতেও এ ধরনের প্রশ্ন অনেকবার উঠেছে। তবে বর্তমানে প্রশ্নগুলোর যে গুরুত্ব ও বিশেষত্ব, অতীতে তা ছিলো না। কারণ আজকের প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে একেবারে নতুন ও নজিরবিহীন কিছু বৈশিষ্ট্য জড়িত। যুদ্ধে সংযোজিত হয়েছে আকাশযান। রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে প্রচারণার জন্য নতুন বৈজ্ঞানিক কৌশল ও হাতিয়ার। সুপ্রাচীন অতীত স্বেচ্ছাচারতন্ত্রকে এতোটা সর্বগ্রাসী এবং সামগ্রিকভাবে ন্যায়ভ্রষ্ট দেখেনি। আধুনিক মেকানিজমের সহায়তায় রাশিয়া, ইতালি কিংবা জার্মানিতে যতোটা সহজে কিম্ভূতকিমাকার স্বেচ্ছাচারতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব হয়েছে অতীতে তা কল্পনাও করা যেতে না। আজকের দিনে কোনো সরকারের পক্ষে মানসিক দাসত্ব আরোপ করতে বেগ পেতে হয় না। সমানভাবে, যুদ্ধ শুরু হলে কোনো পক্ষের বিমান বাহিনী যদি শক্তিশালী হয় তাহলে বিপক্ষ শক্তির নগরগুলো মুহূর্তের প্রচেষ্টায় নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব. হয়তো বিরুদ্ধ পক্ষ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার খবর জানতে পারবে। তবু ইউরোপীয়রা, যাদের লক্ষ্য করে প্রশ্ন দুটি জিজ্ঞাসা করা হয়, খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই স্মরণ করতে পারেন যে তারা হলেন দুনিয়ার সভ্যতার ন্যাসরক্ষক। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই মহাদেশের বিভিন্ন জাতি এক ধরনের শিথিল গ্রন্থিযুক্ত সমাজে বাস করছে, অনেক সময় বিবাদ করেছে হিংস্রতার সঙ্গে এবং নির্বোধের মতো। কিন্তু সকল যুদ্ধে, ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান ও সাহিত্য, শিল্পকলা ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আদান-প্রদান অব্যাহত রেখেছে, একে অপরকে ধার দিয়েছে কিংবা প্রয়োজনে ধার নিয়েছে অবাধে। ইউরোপীয় সভ্যতার অভিন্ন উত্তরাধিকার মানব জাতির সবচেয়ে চমৎকার সম্পদ। যে সমস্যাগুলো বর্তমানে ইউরোপীয় জাতিসমূহকে বিভক্ত করছে তা এতোটা গুরুতর নয় যে ইউরোপীয় ঐতিহ্যের ধ্বংসসাধন করতে পারে।

সুপারিশকৃত গ্রন্থাবলি

Arnold Toynbee : Survey of International Affairs.
W.H. Chambelin : Russia's Iron age, 1933.
Lord D' Abernon : An Ambassador of peace, 1929.
D.C. Somervell : Reign of George V. 1935.
J.S. Barnes : Facism, 1931.
H.J. Lasky : Communism. 1927.
H.J. Lasky . Liberty in the Modern State, 1930.
Rudolf Oeden : Streseman, 1930.
H.F. Armstrong : Hitler's Reich, 1933.
Sir Lews Namier : Europe in Decay1950.

উপসংহার

এই গ্রহে মোটামুটি বিশ মিলিয়ন বৎসর বসবাস করার পরও মানবতার অধিকাংশের বিধিলিপি টমাস হবসের এক সময়কার বর্ণনা অনুসারে, "নোংরা, পাশবিক, এবং ক্ষুদ্র।" গ্রহের দুই হাজার মিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে প্রায় একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন লোক দিনে দু'বেলা খেতে পায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু এসিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল ভূ-খণ্ড জুড়ে মানবতার যে দুর্দশা এবং এই বিশাল ভূ-খণ্ডগুলিতে যে হাজার হাজার মিলিয়ন লোক বাস করেছে, কাজ করেছে, মৃত্যু বরণ করেছে, অথচ কোনো স্মারকচিহ্ন রেখে যেতে পারেনি। অভিষ্যতের মানুষের জন্য কোনো অবদান রাখেনি, তাদের সম্পর্কে ইউরোপের ইতিহাস গ্রন্থে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। এখানে আমি শুধু চেষ্টা করেছি অত্যন্ত অল্প কথায় মানবতার সেই অংশের ইতিহাস তুলে ধরতে যারা ইউরোপের শীতপ্রধান আবহাওয়ার আনুকূল্য লাভ করে এতটা সমৃদ্ধি অর্জন করেছে যে স্বীয় বংশের লোক দিয়ে শুধু নতুন নতুন মহাদেশে জনসংখ্যা সরবরাহ করেনি, প্রচেষ্টা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত, স্বপ্ন ও আশা-ভরসা, সমৃদ্ধির স্তর ইত্যাদির মাধ্যমে জগতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

সভ্য ইউরোপ তার দীর্ঘকালে কেবল একবার একক সরকারের আশীর্বাদ লাভ করেছে। রোমান সাম্রাজ্য, এবং রোমান সাম্রাজ্যই শুধু, সংকটকালীন দীর্ঘ তিন শতাব্দী ইউরোপীয় জীবনের যা কিছু মূল্যবান তা হাতের কব্জায় ধরে রেখেছে। এই রাজসিক রাষ্ট্রব্যবস্থার রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যায় টিউটনিক জগতের প্রচণ্ড হাতুড়ির আঘাতে। সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়, তবে মহত্তের চিহ্ন হিসেবে রেখে যায় ভার্জিল, সিসিরো, হোরেস এবং অগস্টিনের কণ্ঠস্বর, রোমান গির্জা নামক মহান প্রতিষ্ঠান, এবং জবরদস্ত ও জমকালো রোমান আইন। কিন্তু ঐক্যের পুরস্কার, শৃঙ্খলার রহস্য, প্রাচীন কালের স্বাধীনতা ও মানবতা একেবারে হারিয়ে যায়। মূলত বর্বরদের প্রাধান্যের ভেতর সভ্যতা পুনরায় গড়তে হয় ভিত্তি থেকে। প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, গ্রিক গির্জার সঙ্গে সম্পর্ক বিযুক্ত হয় লাতিন গির্জার। সাম্রাজ্য প্রদত্ত সর্বাধিক প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি হলো পোপতন্ত্র। এই পোপতন্ত্র বিবদমান জনগণের মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। ফলে নতুন ধরনের বিশৃঙ্খলা জন্ম নেয়। সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যায় ক্ষুদ্রতম কণায় পরিণত হয়ে, জাগির ভোগকারীদের মধ্যে বিবাদের সূচনা হয়, একটি শহর অপর শহরের সঙ্গে লিপ্ত হয় বিবাদে। জাতিসমূহ বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ঘিরে জেগে ওঠে।

প্রতিটি জাতির মধ্যে ক্রমান্বয়ে গজিয়ে ওঠে অমার্জিত বিচার ও পুলিশী ব্যবস্থা। তবে জাতিসমূহের মধ্যে আইনগত কোনো অভিন্ন পটভূমি ছিলো না। অবশ্য রোমান গির্জা

এক্ষেত্রে যতটা সরবরাহ করে তা হিসাবের বাইরে রাখলে এই মহাদেশ সম্পর্কে মোটা মোটা ধরে নিরব দর্শক হিসেবে পর্যবেক্ষণ করে অপরাধ, অনাচার, মানুষে মানুষে বিরোধ। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সময় সংস্থাটি একেবারে দুর্বল হয়ে যায়। খ্রিস্টধর্মের মধ্যে যে ধর্মগত ফাটলের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পশ্চিমী জগতের ধর্ম যুদ্ধের পথ ধরে আসে সপ্তদশ শতাব্দীর বাণিজ্যিক যুদ্ধ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর উপনিবেশ সংক্রান্ত হিংস্র বিরোধ। তবে এই বিরোধগুলি থেকে একত্রে টিকে থাকার প্রবণতা জাগ্রত হয়নি, বরং বিরোধ গভীরতর হয়, ইউরোপ মহাদেশ হয়ে পড়ে একদিক ভাগে বিভক্ত। এতদসত্ত্বেও ইতিপূর্বে কোনো কালে মানুষের মন এতটা বিস্তৃত ও বুদ্ধিগতভাবে বৃহৎ মানবতার বোধ দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। তাছাড়া ফরাসি বিপ্লব সংঘঠিত হওয়ার আগের পঞ্চাশ বছরে প্রতিটি মানুষকে যেমন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে তা অন্য কোনো সময় ঘটেনি। আবার কখনো কি ইউরোপীয় মহাদেশে অভিন্ন লাতিন সভ্যতার জন্য সাধারণ রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি হবে? নেপোলিয়নের উত্থান ও পতন এই জিজ্ঞাসার একটা জবাব রেখে গেছে। রোমান সভ্যতার পতনের পর ইউরোপের এত বড় অংশ আর কখনো একক সরকারের অধীনে ন্যস্ত হয়নি। কিন্তু তখন সময়টা ছিলো অকাল; ইউরোপীয় জাতিসমূহ তখন খুবই শক্তিশালী। প্যাক্স নেপোলিয়নিকা হওয়া সম্ভব নয়। একটি শক্তিজোট, যার নেতৃত্বে ছিলো গ্রেট বৃটেন, ফরাসি আধিপত্যবাদের স্বপ্ন চুরমার করে দেয়। বৈপ্লবিক এবং নেপোলিয়নীয় যুদ্ধগুলি ইউরোপকে একেবারে শক্তিহীন করে। তবে ইউরোপীয় অন্যান্য সংঘর্ষ থেকে এই বিবাদগুলি ছিলো পৃথক। কারণ ইউরোপীয় শক্তিগুলির স্থায়ী ঐক্য সৃষ্টি হয় স্থায়ী বিপ্লবজনিত বিবাদ মোকাবেলার জন্য। ঐ জাতীয়তাবাদী যুদ্ধগুলি অনুসরণ করে আসে অবসন্নতাজনিত শান্তি। সদিচ্ছা থেকে সৃষ্ট শান্তি নয়। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী যুদ্ধগুলির কারণে ইতালি রাজ্যে পরিণত হয়, জার্মানি সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। তবু ইউরোপের অস্থিরতা কাটে না। জার্মানি বিশ্ব শক্তি হবার উচ্চাভিলাষ পোষণ করে, ফ্রান্সের লক্ষ্য হলো প্রতিশোধ গ্রহণ, আফ্রিকা বিভক্তিকরণ এবং তুরস্কের শক্তিক্ষয় উচ্চাভিলাষ প্রজ্জ্বলিত করে। উপরন্তু ইউরোপের বুকের কাছে অবদমিত জাতীয়তাবাদের ছিদ্র সময় সময় ফুঁসতে থাকে। এই জাতীয়তাবাদের জ্বরে আক্রান্ত হয় আইরিশ ও পোলরা, চেক ও রুমানীয়রা। ফ্লেট এবং সার্বরাও জ্বরভাবে আক্রান্ত। বস্তুত এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে কিছুমাত্র স্ফুলিঙ্গ দেখা দিলে তা বিরাট বিস্ফোরণে পরিণত হতে সময় লাগবে না।

বিগত মহাযুদ্ধের প্রধান ট্র্যাজেডি এখানে যে এই যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে ইউরোপের সর্বোন্নত সভ্য জনগণ। আর যুদ্ধ সংঘঠিত হয় এমন একটি ব্যবস্থাকে রোধ করে যা গুটিকয় জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মিলে ঠেকাতে পারতেন। আর জনসংখ্যার নিরানব্বই শতাংশ লোক তো এই সমস্যা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। রাষ্ট্রবিদদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এধরনের বিরাট বিপর্যয় ঠেকানো : বর্তমানে এই প্রয়োজনটা বহুগুণ বেড়ে গেছে। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে জগতে ইউরোপের যে অবস্থান ছিলো ইউরোপ এখন আর সে

অবস্থানে নেই তখন মনে হয়েছে যে এই মহাদেশের সভ্যতা নির্বিঘ্ন নিরাপত্তা ভোগ করছে। ইউরোপীয় কম শ্রমিকদের উৎপাদিত সামগ্রী সহজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাজারগুলিতে পৌঁছে গেছে, সাথেসাথে ক্রয় করেছে রাশি রাশি খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কাঁচামাল। তখন সন্দেহ করার কোনো কারণ ঘটেনি যে জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলেও শ্রমজীবীদের জীবনের মান বৃদ্ধি ও রক্ষা করা যাবে না। শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বাড়ছিলো, এবং জার্মানির মতো দেশ, যেখানে জীবন ছিলো কঠোর ও ব্যয়কুণ্ঠ, দ্রুত প্রাচুর্য এবং বিলাসিতার পথে এগোচ্ছিল। তখন যুক্তরাষ্ট্র ছিলো ইউরোপীয় অভিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত। তাছাড়া দেশটি ইউরোপীয় পুঁজির জন্য ছিলো খোলা বাজার, ছিলো অত্যন্ত লাভজনক এবং এর পরিধি ছিলো প্রায় সীমাহীন। যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের উদ্বৃত্ত লোকদের গ্রহণ করেছে। প্রেরণ করেছে উদ্বৃত্ত সামগ্রী। এভাবে দেশটি পুরাতন বিশ্বের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অবিচ্ছেদ্য উপাদানে পরিণত হয়।

বর্তমানে পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম গোলার্ধের লাতিন জাতিসমূহ এখন আর অ্যাপেনাইন পর্বতমালার ভাগ্যান্বেষীদের প্রতি আতিথেয়তা দেখায় না। ১৯২৪ সাল থেকে ইউরোপীয় অভিবাসীদের জন্য আমেরিকার দরজাগুলির অর্ধেকের বেশি বন্ধ হয়ে গেছে। পশ্চিমের খামারগুলিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে। যন্ত্রের রহস্য এখন আর ইউরোপীয় একচেটিয়া নয়, কারণ ভারত ও জাপান এখন ইউরোপ থেকে যন্ত্র আমদানি করে কিংবা নিজেরাই এখন যন্ত্র বানায়। আমেরিকার যন্ত্রনির্ভর অতি উৎপাদন, প্রাচ্যের সস্তা মজুর পৃথিবীর বিপরীত প্রান্ত থেকে ইউরোপের শ্রমজীবীদের জীবনের মানের প্রতি বিরাট হুমকি স্বরূপ। এমনকি বৃটিশদের আদিম শিল্প ক্ষেত্রও এখন আক্রান্ত। ল্যাংকাশায়ারের মিল কর্মীরা এখন জাপানে তৈরি লম্বা মুজা পরিধান করে চলাফেরা করে।

বাস্তবিক ঘটনা হলো ইউরোপ বর্তমানে এমন একটা যুগে পদার্পণ করছে যখন প্রতিযোগিতা অতীতের চেয়ে কঠোর হবে বলে ধরে নেয়া যায়। তবে এটা নিরুৎসাহব্যঞ্জক নয়। এতে চ্যালেঞ্জ জানানোর সুযোগ রয়েছে। পুরাতন বিশ্ব যদিও যুদ্ধ ও যুদ্ধের গুজব, শুল্ক ও কোটা, শ্রেণী সংগ্রাম এবং ধর্মঘটের আঘাতে প্রায় পঙ্গু। তদুপরি অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ নামক দৈত্যের সকল প্রকার নির্বুদ্ধিতার দরুন কাবু। তবু তার শিল্প ক্ষেত্রের উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। ইউরোপকে দাঁড়াতে হবে তার পণ্য সামগ্রীর মানের উপর নির্ভর করে। স্বীয় রুচি, অকপটতা ও কাণ্ডজ্ঞান হবে তার পুঁজি। অতঃপর দেশের ভেতরে ও বাইরে উন্নততর মনোভাব নিয়ে, তিক্ততা কিংবা অস্থিরতা কমিয়ে, প্রগতির পথের অন্তরায়গুলি অপসারণ করে, ইউরোপীয় পণ্যের মান প্রতিটি বাজার জয় করবে। অন্য কোনো উপায়ে আমরা কর্মীদের জীবনের মানের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারবো না। যদিও এদের জীবনের মান কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছতে পারেনি, তবু এই ভিত্তির উপরই আমাদের উচ্চতর সভ্যতার জন্য প্রত্যাশা নির্ভর করবে।

তাহলে আমাদের এই মহাদেশ ইউরোপ বর্তমানে একটা অবস্থানে উপনীত হয়েছে যখন সে দুটি পরস্পর বিরোধী সম্ভাব্য অদৃষ্টের সম্মুখীন (অতীত ইতিহাসে তাকে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি)। সে যুদ্ধের পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে, কিংবা অবাধে,

পূর্ব-সংস্কার, স্নায়ুমণ্ডলীর বিকার ইত্যাদি অতিক্রম করে স্থায়ী শান্তি সংগঠনের জন্য কাজ করে যেতে পরে। উভয় ক্ষেত্রের জন্যই বাস্তবিক সুযোগ-সুবিধার অভাব হবে না। বিজ্ঞানের উন্নতিশীল বিস্ময় আমাদের হাতের মুঠোয়। আমরা এটি যেমন কাজে লাগাতে পারি, তেমনি এর অপব্যবহার করতে পারি। আমরা এই শক্তির সহায়তায় যেমন সৃষ্টি করতে পারি, তেমনি পারি ধ্বংস করতে। বিজ্ঞানের সহায়তায় সভ্যতার ধ্বংসে সাধন করা যায়, আবার এমন প্রাচুর্য ও উন্নতির সূচনা করা যায় যার অভিজ্ঞতা মানব বংশের এ যাবৎ কাল হয়নি।

ইত্যবসরে যুদ্ধ আমাদের জন্য রেখে গেছে অমঙ্গলজনক উত্তরাধিকার। ইউরোপের নৈতিক ঐক্য বর্তমানে ছিন্ন। নর্ডিক প্যাগানবাদ আক্রমণ করছে খ্রিস্টান ধর্মকে। উন্মাদরোগগ্রস্ত জাতিবিরোধ ইউরোপের সেলাইবিহীন গাত্রাবরণ ছিন্ন করতে উদ্যত। আশা করি, ভাবিকালের প্রজন্ম দলীয় কারাক দূর করবে, ক্ষত শুকানোর ব্যবস্থা নেবে, আমাদের মানবতার, সহনশীলতার, সদিচ্ছার অপচয়িত এবং শূন্য ভাণ্ডার আবার পূর্ণ করবে।

পরিশিষ্ট : ক

কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো

কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে অবিলম্বে সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয়েছে :

১ ভূ-সম্পত্তি দখলচ্যুত করতে হবে এবং ভূমি থেকে আদায়কৃত খাজনা দিয়ে নির্বাহ করতে হবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়।

২ উত্তরাধিকার সূত্রে দাবির অধিকার বিলোপ করতে হবে।

৩. সকল অভিবাসী এবং বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

৪. রাষ্ট্রের প্রয়োজনে স্টেট ব্যাংক গঠন করে ঋণের ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

৫. পরিবহণ ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৬. কারখানা এবং উৎপাদনের যন্ত্রসমূহের একচেটিয়া মালিক হবে রাষ্ট্র। কৃষিজমি পুনর্বণ্টন ও উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে একটা পরিকল্পনা মোতাবেক চলবে।

৭ আয়কর হবে উচ্চ এবং প্রগতিশীল ধাপযুক্ত।

৮. সবাই কাজ করতে বাধ্য এবং কৃষি শিল্পের জন্য শ্রমিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

৯. কৃষি ও শিল্প শ্রমিক একত্রীকরণ করতে হবে, শহর ও গ্রামের মধ্যেকার তফাৎ ক্রমান্বয়ে দূর করতে হবে।

১০. সকল শিশুর জন্য জনশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে কারখানাগুলিতে শিশুদের যেভাবে শ্রম দিতে হয় তার বিলোপ সাধন করতে হবে। অর্থনৈতিক উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার মিলন ঘটাতে হবে।

অতঃপর সমকালীন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির বিস্তারিত সমালোচনা করে (এর ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে শুধু) ইশতাহার সুবিখ্যাত উপসংহার টেনেছে। শেষ করেছে যে রণধ্বনি তুলে তা ইতিমধ্যেই জাগরণ করেছে Kommunistiche Zeitschrift-এর নাম পত্রে :

"কমিউনিস্টরা তাদের অভিমত ও মতলবগুলি গোপন করতে ঘৃণা বোধ করে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্য হাসিল হবে যদি সমকালীন সমাজ কাঠামো সবলে উৎপাটন করা যায়।

"কমিউনিস্ট বিপ্লবের সামনে শাসকদের কম্পন শুরু হোক। সর্বহারাদের হারানোর মতো কিছু নেই, তারা শুধু হারাতে পারে শৃঙ্খলগুলি। তারা জয় করতে পারে গোটা বিশ্ব।

"জগতের সকল সর্বহারা এক হও!"

(ই. এইচ. কার, কার্ল মার্ক্স, পৃষ্ঠা ৫২-৩)।

পরিশিষ্ট : খ

১৯১৮ সালের যুদ্ধবিরতির শর্তাদি সম্পর্কে

যুদ্ধ বিরতির শর্তাদি (যার খসড়া তৈরি করে সৈনিক ও নাবিকরা) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় সর্বোচ্চ যুদ্ধ পরিষদে অক্টোবর মাসের ৫ থেকে ৭ তারিখের মধ্যে, আর কাউন্সিল শর্তগুলির চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে নভেম্বর মাসের চার তারিখে। মি. লয়েড জর্জ নভেম্বর মাসের পাঁচ তারিখে লন্ডনের ওয়ার ক্যাবিনেটকে শর্তাদি সম্পর্কে অবহিত করেন। উপরন্তু উল্লেখ করেন যে ফচ মনে করেন জার্মানরা উক্ত শর্তাবলি মানতে রাজি হবে না, তবে খ্রিস্টমাসের মধ্যে তাদের মানতে বাধ্য করা যাবে। শর্তগুলি প্রধানত প্রণীত হয় এই নীতির ভিত্তিতে যে শত্রুরা যেন পুনরায় যুদ্ধ শুরু করার মতো অবস্থানে যেতে না পারে, যদি শান্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ভেঙে পড়ে। অতএব নৌশক্তি সম্পর্কিত দাবিগুলি (৬টি যুদ্ধ ক্রুজার, ১০টি যুদ্ধ জাহাজ, ৮টি হালকা ক্রুজার, ৫০টি অত্যন্ত আধুনিক ধরনের ডেস্ট্রয়ার এবং ১৬০টি ডুবোজাহাজ) এই বাস্তবতার ভিত্তিতে করা হয় যে জার্মানির উপর যদি কোনো দাবি চাপানো না হয় তবে সে যুদ্ধ শেষ করবে ২৫টি যুদ্ধ জাহাজসহ, এর মধ্যে "১২টি হবে অত্যন্ত আধুনিক এবং জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী" (অ্যাডমিরাল হোপ) এবং তা হবে গ্রান্ড ফ্লিটের জন্য নিদারুণ উদ্বেগের উৎস। সবচেয়ে সম্মতিক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যে যে জাহাজগুলি সমর্পণ করা হবে তা মিত্র পক্ষের তত্ত্বাবধানে কোনো নিরপেক্ষ বন্দরে অন্তরীণ করলে ভালো হয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ জাহাজগুলি স্কাপা ফ্লোতে আনয়ন করা হয় (২১ নভেম্বর) এবং জার্মানরা ডুবিয়ে দেয়। নৌ কর্তৃপক্ষগুলি আত্মসমর্পণের জন্য চাপ দিয়েছিলেন, অন্তরীণের জন্য নয়। বেসামরিক কর্মকর্তারা ভেবে দেখেন যে সামরিক ও নৌ-সংক্রান্ত শর্তগুলি অত্যন্ত কঠোর হয়ে যাচ্ছে, জার্মান সরকারের পক্ষে এগুলি মেনে নেয়া কঠিন হবে, ফলে কিছুটা মৃদু বিকল্পের চিন্তা-ভাবনা করেন।

পরিশিষ্ট : গ

উইলসনের চৌদ্দ দফা

সংক্ষেপে চৌদ্দ দফাগুলি হলো :

১. সকল সন্ধি হবে প্রকাশ্যে, অতঃপর গোপন কূটনীতি চলবে না।

২ নিজস্ব জলসীমার বাইরে শান্তি ও যুদ্ধ চলাকালে নৌ চলাচলের চূড়ান্ত স্বাধীনতা থাকবে, আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের জন্য নৌপথ বন্ধ করা হলে ব্যতিক্রম হতে পারে।

৩ সম্ভাব্য সকল অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

৪. জাতীয় সমর সম্ভার হ্রাসের পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৫. উদার ভাবে এবং স্বার্থচিন্তা বাদ দিয়ে উপনিবেশের দাবিগুলি পুনরায় বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ কোন অধিকারে স্থাপিত হবে তা অবশ্যই বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগণের স্বার্থ আগে ভেবে দেখতে হবে।

৬. সমগ্র রুশ ভূ-খণ্ড থেকে প্রত্যাহার করতে হবে, রাশিয়া আত্ম উন্নতির সকল সুযোগ ভোগ করবে, বৃহৎ শক্তিগুলি তাদের এক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

৭ বেলজিয়াম পুনরায় সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

৮. সকল ফরাসি ভূ-খণ্ড মুক্ত করতে হবে, ১৮৭১ সালে প্রুশিয়া তার প্রতি যে অন্যায় করে তার প্রতিকার করতে হবে।

৯. জাতীয়তার ভিত্তিতে ইতালির সীমানা পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।

১০. অষ্ট্রো-হাঙ্গেরির জনগণ নিজস্ব উপায়ে বিকাশের সুযোগ পাবে।

১১. রুমানিয়া, সার্বিয়া এবং মন্টেনেগ্রোতে কোনো বিদেশী সৈন্য থাকতে পারবে না। সার্বিয়া সমুদ্রে যেতে পারবে। আনুগত্য এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে বলক্যান রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কের নিষ্পত্তি করতে হবে।

১২. অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীন অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী স্বাধীনভাবে বিকাশের সুযোগ লাভ করবে। দার্দানেলেস স্থায়ীভাবে সকল দেশের জাহাজের জন্য মুক্ত থাকবে।

১৩. পোল্যান্ড হবে স্বাধীন রাষ্ট্র এবং তার সমুদ্রে যাওয়ার সুযোগ থাকবে।

১৪. জাতিসমূহের একটি সংঘ গঠন করা হবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ভূ-খণ্ডগত সংহতির পারস্পরিক নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য। এই অধিকার ছোট-বড় সকল রাষ্ট্র ভোগ করবে।

যখন চৌদ্দ দফা সুপ্রিম ওয়ার কাউন্সিলে উত্থাপন করা হয় বিবেচনার জন্য (১৯১৮ সালের ৩ নভেম্বর), তখন মি. লয়েড জর্জ অনুচ্ছেদ ২, মি. হিম্যান্স (বেলজিয়াম) অনুচ্ছেদ ৩, এবং সিনর অরল্যান্ডো অনুচ্ছেদ ১ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন। মি.

লয়েড জর্জ সামুদ্রিক জলভাগে স্বাধীনতা সম্পর্কিত মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বলেন, "ইংরেজরা এটি মানবে না। তারা এ ব্যাপারে একেবারে অভিন্ন মত।" উপরন্তু তিনি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের উপর অত্যধিক জোর দেন। ফলে প্রেসিডেন্টের কাছে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রেরণ করা হয় :

"যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে জার্মান সরকারের যে যোগাযোগ হয়েছে তা মিত্র পক্ষের সরকারগুলি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখেছে। ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসে যে ভাষণ দেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে শর্তাবলির উল্লেখ করেন তার ভিত্তিতে মিত্র পক্ষের সরকারগুলি জার্মানির সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারে। পরবর্তীকালে বক্তৃতায় তিনি যে নীতিগুলি নিষ্পত্তির লক্ষে তুলে ধরেন সেগুলিও বিবেচনায় আনা চলে। মিত্র পক্ষ অবশ্য উল্লেখ করে যে সামুদ্রিক স্বাধীনতা বিষয়ক ২ নম্বর ধারার নানা প্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে, এবং এই ব্যাখ্যাগুলির অধিকাংশ তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তারা শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণের সময় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। উপরন্তু, ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি কংগ্রেসে ভাষণ দান কালে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দেন যে আক্রান্ত ভূ-খণ্ডগুলি খালি করে দিতে হবে এবং মুক্ত হবে। মিত্র সরকারগুলি মনে করে এতে কি বোঝানো হলো তা নিয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এতে মিত্র পক্ষ বোঝেন যে, বেসামরিক নাগরিকদের যে ক্ষতি জার্মান বাহিনী করেছে, এবং মিত্র পক্ষের ভূ-খণ্ড জল, স্থল ও আকাশ পথে আক্রমণ করে যে ক্ষতি করেছে তার জন্য জার্মান সরকার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

৩ নভেম্বর, ১৯১৮।

আরশাদ আজিজের জন্ম ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি টাঙ্গাইল জেলায়। ১৯৭০ সালে টাঙ্গাইল সাদত কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেন। আরশাদ আজিজ মূলত প্রাবন্ধিক। তিনি এক সময় কিছু ভালো গল্প ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধ নিজস্ব মুদ্রায় চিহ্নিত। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ সংকলন 'মন্ত্রতন্ত্র কাব্য' বিদগ্ধ পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর কিশোর পাঠ্য গ্রন্থ 'দর্শনের গল্প' (১৯৭৬) ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আরশাদ আজিজ এদেশের একজন প্রতিষ্ঠিত অনুবাদক। তাঁর প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ : আলেস্যের জয়গান (১৯৯৪), দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (যৌ. স. ১৯৯৯), শিক্ষা ও সমাজকাঠামো (১৯৯৭), বিবাহ ও নৈতিকতা (১৯৯৮), লর্ড মেকলে : নির্বাচিত রচনা (২০০১)।